

বঙ্গদর্শন

[নব পর্য্যায়]

মাসিক পত্র ।

প্রথম বর্ষ ।

১৩০৮ ।



7563
002/2A

লেখকগণের নাম ।

শ্রীবিজ্ঞেন্দ্রনাথ ঠাকুর, শ্রীচন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায়, শ্রীজ্যোতিবিন্দ্রনাথ ঠাকুর, শ্রীস্বকেশনাথ ঠাকুর (সম্পাদক), শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর জিবেদৌ, শ্রীঅক্ষয়কুমার মৈত্রেয়, শ্রীশ্রীশচন্দ্র মজুমদার, শ্রীদীনেশচন্দ্র সেন, শ্রীনগেন্দ্রনাথ গুপ্ত, শ্রীনগেন্দ্রনাথ বসু, শ্রীত্রৈলোক্যনাথ উপাধ্যায়, শ্রীশ্রীনাথ সেন, পণ্ডিত শ্রীসতীশচন্দ্র আচার্য্য বিদ্যাভূষণ, প্রফেসর শ্রীসারদারঞ্জন রায়, প্রফেসর শ্রীযোগেশচন্দ্র রায়, পণ্ডিত শ্রীশিবধন বিদ্যার্ণব, শ্রীপ্রিয়নাথ সেন, শ্রীপ্রমথনাথ রায় চৌধুরী, শ্রীজগদানন্দ রায়, শ্রীহরেন্দ্রনাথ ঠাকুর, শ্রীগিরিজানাথ মুখোপাধ্যায়, শ্রীপরেশনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীভবানীচরণ ঘোষ, শ্রীচণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীউমেশচন্দ্র দাস গুপ্ত, শ্রীনরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য, শ্রীচাক্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীবীরেশ্বর গোস্বামী, শ্রীহরিহরপ্রসাদ ঘোষ, শ্রীবীত্ত্বভূষণ আচার্য্য, শ্রীনৈশেলচন্দ্র মজুমদার প্রভৃতি ।

কলিকাতা

২০ নং কর্ণওয়ালিস্ ট্রাট

মজুমদার লাইব্রেরি হইতে প্রকাশিত ।

বিষয় ।

পৃষ্ঠা ।

স্বাধীন সত্ত্বের আলোচনা

২২১, ২৭০, ৩১২, ৪০৬, ৫৮১, ৬১৪, ৬৭০

সাহিত্য-প্রসঙ্গ—

নেপথ্য কি ? (রেন'র মত)

১৮৮

রচনা-স্বত্বের ব্যবহারের বচন

৪০

প্রবন্ধ (কবিতা)

—

৪৮০

হটনা

১

বিশুদ্ধতার একনিষ্ঠতা

৮

বিশুদ্ধ

১৭০

—

পঞ্চমবার্ষিক বঙ্গদর্শনের পুনঃপ্রচার-সময়ে ভূমিকার বহিঃস্থানু বিধিরাহিণেন—“বঙ্গদর্শনের লোপ হস্ত আমি অনেকের কাছে তিরস্কৃত হইয়াছি। সেই তিরস্কারের প্রাচুর্যে আমার এমন প্রভাবিত করিয়াছে যে, বঙ্গদর্শনে শেষের প্রয়োজন আছে। • • •

যাহা একজনের উপর নির্ভর করে, তাহার স্থায়িত্ব অনিশ্চিত। বঙ্গদর্শন বহুদিন আমার ইচ্ছা, প্রগতি, স্বাধা বা জীবনের উপর নির্ভর করিবে, ততদিন বঙ্গদর্শনের স্থায়িত্ব অসম্ভব। এতটুকু আমি বঙ্গদর্শনের সম্পাদকীয় কানা পরিচয় করিলাম। বঙ্গদর্শনের স্থায়িত্ববিধান করাই আমার উদ্দেশ্য।”

বহিঃস্থানের এ উদ্দেশ্য কি সফল হইবে না? বহিঃস্থানের দপদর্শন কি বাস্তবিক হইবে না?

এছরতনার ও সামগ্রিক-সম্পাদনে প্রভেদ আছে। সুস্থ ব্যক্তিবিশেষের প্রতিভা ও অধ্যবসায়ের ফল। কিন্তু সামগ্রিক-পত্র বহু লোকের সমবেত উদ্যমে জীবিত থাকে। ইংলেণ্ড বা ইউরোপে অনেক সংবাদপত্রের বহুজন শতাধিক বর্ষ হইয়া গিয়াছে। টাইমসপত্রের যে কখনও আয়ুষ্কর হইবে, তাহা মনে হয় না। বহুদিন ইংরাজভাষি থাকিবে, ততদিন ইংরাজের প্রধান সংবাদপত্র থাকিবে। এই বৈশ্ববাসীত্বের নূলে পারস্পর্যের নিয়ম। যোদ্ধার অভাবে রাজকাণ্ড যেরূপ স্থগিত বা বহিত হয় না, সেইরূপ এসিদ্ধ পত্রের প্রচার কখন বিলুপ্ত হয় না; কালের অদলো নিয়মে লেখক, পাঠক ও গ্রাহকের পরিবর্তন হইতে

থাকে, অসম্ভব। কেবলকি এই হস্তত্যাগ বঙ্গদেশ জাতীয় গৌরবের নিদর্শন এই পরম্পরা রক্ষা করিবে না?

এ কথা কেহ কেহ বলিবেন, এখনও বঙ্গদর্শন একটা নামমাত্র। যিনি বঙ্গদর্শনেই প্রাণ দিছেন, তিনিই বঙ্গদর্শন নামই, তখন কোন সামগ্রিকপত্রের পক্ষে ‘বঙ্গদর্শন’ নামও যাহা, অত্র নামও তাহাই। কিন্তু আমরা নামকে নামমাত্র মনে করি না। যে নামকে বহিঃস্থানে গৌরবায়িত করিয়া গিয়াছেন, সে নামের মধ্যে সেই বর্গীয়-প্রতিভার একটী শক্তি রহিয়া গিয়াছে। সেই শক্তি এখনও বঙ্গদেশ ও বঙ্গসাহিত্যের বাবদায় লাগিবে, সেই শক্তিকে আমরা বিনাশ হইতে দিতে পারি না।

বর্তমানে ও ভবিষ্যতে এ পত্রের সম্পাদক যিনিই হউন না কেন, ‘বঙ্গদর্শন’ নামের মধ্যে বহিঃস্থান দ্বারা বিরাজ ক রহেছেন। বঙ্গদর্শনের যে সকল জাতীয় মহারথ এখনও ইহলোকে আছেন, তাহারা এই নামের পতাকা উজ্জীন দেখিলে, ইহার তলে সমবেত না হইয়া থাকিতে পারিবেন না। এবং যে সকল আধুনিক যৌবক বঙ্গদর্শনের গৌরবকালের ইতিহাস লৈলব হইতে শুনিয়া আনিতছেন, বঙ্গদর্শনের নামে তাহারা নিজের রচনার অদর্শকে বলাসাব্য চেষ্টার উন্নত রাখিবার প্রয়াস পাইবেন।

পাঠকের দাবী বহু কঠিন হয়, সম্পাদকের চেষ্টাও তত একান্ত হইয়া থাকে। বঙ্গদর্শনের নামে পাঠকের প্রত্যাশা বাড়িয়া উঠিবে সন্দেহ নাই, এবং সেই প্রত্যাশার বেগে সম্পাদককে ও সঙ্গীত মতে মতে থাকিতে

৩৫৭। সম্পাদক এ কথা ভূমিতে পারিবে না যে, বঙ্গবর্ধনের নামের মধ্যে বহিন পদ উপস্থিত থাকিয়া তাঁহার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া আছেন—সেই বহিনের কঠিন আদর্শ ও কঠোর বিচার উৎসাহে সর্বপ্রকার শৈথিল্য হইতে রক্ষা করিবে।

অনুনা বঙ্গদেশে যে কে—গণক আছেন, বঙ্গবর্ধন তাঁহাকে আকর্ষণ করিয়া ঐতিহাসিক হস্তে বহিনের কাণের সহিত গ্রথিত করিয়া লইবে; তাহা বঙ্গসাহিত্য ও বাঙ্গালী লেখকদিগের পক্ষে প্রাথমিক বলিয়া আমরা মনে করি। কাণের সহিত কানান্তরের যোগস্থর যতই দৃঢ় হইবে, তাবের পথ ততটী চতুর্বিম্বিত এবং সাহিত্যের অঙ্গ ততটী প্রশস্ত হইতে থাকিবে। বহিনের বঙ্গবর্ধন যদি কেবল বহিনের কাণের মধ্যেই অস্তর হইয়া থাকে, জীবিতকালের মধ্যে তাহার প্রত্যক্ষ বন্ধন ছিল হইয়া যায়, তবে তাবের নিয়মে তাহা কালক্রমে ধ্বংসলাভের চিহ্ন-হাদের বিপর্যয়ে অদৃষ্টপ্রায় হইয়া আনাদের নিত্যাবস্থারের অর্থাৎ হইয়া থাকে। বঙ্গপ্রকৃতিবিশেষ কীর্তি এক কালকে অল্প কালের সহিত বিধিগত বহু যোগস্থরের কাণ করে। বাহ্যিক প্রতিগত সাহিত্যের প্রাণী, তাঁহারা সেইরূপ কোন যোগস্থরকেই নষ্ট হইতে দিতে চাহেন না। তাঁহারা অপ্রত্যক্ষ ভবিষ্যতের সহিত আবদ্ধ করিয়া আত্মীয় জীবনের লীলাভূমিকে হুবিজ্ঞাপন করিবার জন্য সকলপ্রকার উপায়ই অবলম্বন করেন। বঙ্গবর্ধনকে বন্ধন করিয়া চলা-ও, বঙ্গসাহিত্যকে অপরিচ্ছিন্ন ও প্রশস্ত রাখিবার একটী উপায়। এই বঙ্গদেশে বঙ্গসাহিত্যের যদি একটী মাত্র

পাখা যায়, তবে তাহা ভিন্ন হইয়া ইতস্ততঃ বিকীর্ণ হইবে না, বঙ্গপক্ষীর কণ্ঠে ভিন্নভূষণ হইয়া বিরাজ করিতে থাকিবে।

অবশ্য এ কথা মনে রাখিতে হইবে, এক কাণের সহিত অল্পকালের প্রভেদ অনিবার্য্য। যদিও দীর্ঘকালের ব্যবধান নহে, তথাপি প্রথম বঙ্গবর্ধনের কালের সহিত বর্তমান কালের অনেক প্রভেদ হইয়াছে। সে প্রভেদ উন্নতির দিকে কি অবনতির দিকে, তাহা নিশ্চয় করিয়া বলা কঠিন; কিন্তু সে প্রভেদ যে ব্যাপকতার দিকে, তাহা অসন্দেহে বলিতে পারি। এখন ইংরাজিভাষার প্রাকাক্ষর শিকিত বাঙ্গালীর মধ্যে প্রবণ ছিল। শিকিত সম্প্রদায়ের মধ্যে বাঙ্গালী যোগ্যত এবং পাঠক অল্পই ছিল। সেই সীমিত পাত্রের বহিন আপন প্রবণ-প্রতিভা প্রদর্শিত করিয়া সাহিত্যের প্রোৎসাহকে গভীর ও ক্রমশঃ প্রশস্ত করিয়া ভূমিরাহিলেন। এখনকার সেই নিকর-মারাটী বহিনের ব্যক্তিগত প্রবাহের দ্বারা পরিপূর্ণ ছিল; তিনিই তাহাকে গতি দিয়াছিলেন এবং তিনিই তাহার দিক নির্দেশ করিয়াছিলেন। সেই ধারাভীর মধ্যে সর্বত্রই যেন তিনি দৃষ্টমান ও বহমান ছিলেন।

সর্বপ্রকারের মধ্যে ব্যক্তিগত প্রভাবের বেগ ও সৌন্দর্য্য সম্প্রদেয়ে প্রত্যক্ষ হইতে আধুনিক সাহিত্যে আনন্দের প্রতিভার সেই ব্যক্তিগত প্রভাবের প্রবণ দ্বারা উপকোণ করিবার প্রত্যাশা আর করিতে পারিব না। এখন লেখক ও পাঠকের সংখ্যা বহিরা উঠা কঠিন। এখন রচনা বিভীষণ, কট বিভীষণ। এখন লেখক পাঠকের

শ্রেণীর বিভাগ খুঁটিয়াছে। এখন মূলতঃ সংবাদপত্র একাধি জাল নিষেধ করিয়া দুর্বৃত্তান্তর হইতে অগণ্য পাঠক সংগ্রহ করিয়া আনিতেছে, এবং নব নব রচনাগো নানা উপায়ে সর্বকালের মনোরঞ্জন করিয়া সাহিত্যপাথকে নানাবিধের চিত্তাকর্ষক করিবার চেষ্টা করিতেছে।

অতএব এখনকার বঙ্গদর্শন কোন উপায়েই তখনকার বঙ্গদর্শনের স্থান লইতে পারিবে না। এমন কি, এই বঙ্গদর্শন সমস্ত শিক্ষিত সম্প্রদায়ের একমাত্র মুখপত্র হইবার আশাও করিতে পারে না। এই বঙ্গদর্শনের সম্পাদক, বঙ্গদর্শনের আদি সম্পাদকের জ্ঞান সমস্ত পত্রটিকে নিজের অপ্রতিদ্বন্দ্বিত প্রভাবের দ্বারা বাস্তব করিয়া, লেখকদিগকে নিজের প্রতিভাবলমে বাঁধিবার স্পষ্টতা রাখেন না। এখন বঙ্গসাহিত্য অতি দুর্লভ। এখনকার সম্পাদকের একমাত্র চেষ্টা হইবে, বর্তমান বঙ্গভিত্তিক শ্রেষ্ঠ আদর্শকে উপবৃত্তভাবে এই পত্রে প্রতিকলিত করা। কাজটা কঠিন। কারণ কেবল বিশদীর্ণ হওয়াতে, চিরদায়ী সত্যের সহিত বিচিত্র-মৃগাত্মিকতার প্রভেদ নির্ণয় করা দুহুই হইয়াছে। এখন শিক্ষিত ব্যক্তিগণও সভ্যবতই নানাশক্তির দ্বারা নানাপথে আকৃষ্ট হইতেছেন। কাগজের বিরাট কঠোর নানা ক্ষুদ্র কোলাহলের দ্বারা

বিস্কম্ব। কিন্তু আমরা একান্ত মনে আশা করি, বঙ্গদর্শন এই সকল সাময়িক কলকোলাহল হইতে নিজেকে ভ্রূরে তক্ষা করিয়া সাহিত্যের আদর্শকে 'মিতাকালের অঙ্গল শিখরের উপরে প্রতিষ্ঠিত করিবে।

এ প্রতিজ্ঞা আমরা বিনয়ের সহিত এবং আশঙ্কায় সহিত করিতেছি। সাময়িক অনিত্য আকর্ষণগুলি অত্যন্ত প্রবল; এবং অধিকাংশের কৃতি হুঁদ কনহটীংকারের সহিত ঘাটা চাহে, তাহা পূর্ণ না করা অত্যন্ত সাহল্য ও বলের কাজ। অতএব এই মহা জনতার সম্বন্ধে সম্পাদকের ব্রতও নব্বৈ মাথের অন্তিত হইয়া পড়িবে না, এ কথা কে বঙ্গপূর্বক বলিতে পারে? কিন্তু সেজন্য ব্রতভঙ্গের ভয়ও আমরা ক্ষমা চাহি না। আমরা এখন বঙ্গদর্শনকে আশ্রয় করিয়া সাহিত্যক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়াছি, তখন আমরা কঠিন বিচার প্রার্থনা করি ভীকতা, কচিৎসং, সত্যের অপলাপ এবং সর্বপ্রকার সাহিত্যানীতির শৈথিল্য, আমাদের পক্ষে অস্বাক্ষরীয়। আশা করি, সত্যক পাঠকগণ আমাদেরকে সেই প্রবলত্ব দ্বিরা রাখিবেন এবং সত্যক গণকগণ সেই দুর্গবপথে আমাদেরকে চালনা করিবেন।

লোকমনোমোহিনী বহুবুঝী প্রতিভার বলে বঙ্গদর্শন প্রতিষ্ঠিত, মঙ্গলময়ের বঙ্গদর্শনকে সে প্রতিষ্ঠা রক্ষিত হউক!

প্রার্থনা।

১

মৃত্যুকীর স্বপ্ন। আজি রক্তমেঘমাঝে
অস্ত্র গেল—হিংসার উৎসবে আজি বাজে
অস্ত্রে অস্ত্রে মরণের উদ্‌ঘাট-রাগিণী
ভরস্রী ; ধরাধীন-সত্যতা বাগিনী
তুলেছে কুটিল-কণা চক্কর নিমিষে
গুপ্ত বিঘনস্ত 'তার তরি' তীর বিবে।
স্বার্থে স্বার্থে খেবেছে সত্যত, গোড়ে গোড়ে
ঘটেছে সংগ্রাম, প্রগড়-নগুন-কোড়ে
তরুণ-বর্ষরতা উঠিয়াছে আজি
পঙ্কনবা হতে ! লজ্জা-দগম তেয়াগি
জাতি-প্রেম নাম ধরি' এতত অনাথ
ধর্মেরে ভাসাতে চাহে বলের বনার।
কবিদল চাঁৎকারিছে, জাগাইয়া ভীতি,
অগনি-কুহুরের কাড়া-কাড়ি-গীতি।

২

পতিত ভারতে তুমি কোন্ আগরণে
জাগাইবে, হে মহেশ, কোন্ মহাক্ষণে,
শে মোর করনাভীত ! কি তাহার কাজ,
কি তাহার শক্তি, দেব, কি তাহার সাজ,
কোন্ পথ তার পথ, কোন্ মহিমার
ধাঁড়াবে সে সম্পদের পিথরদীয়ার
তোমার মহিমাজ্যোতি করিতে প্রকাশ
বরীদ এভাতে !—আজি নিশার আকাশ
বে আঘর্ষে রচিয়াছে আলোকের মালা,
সাঁজায়েছে আপনার অঙ্ককার থালা,
ধরিয়াছে ধরিত্রীর মাথার উপর,—
সে আঘর্ষ এভাতের নহে, মহেশ্বর !
জাগিয়া উঠিবে প্রাচী বে অকণালোকে
সে কিরণ নাই আজি নির্দোষে চোখে।

৩

এই পশ্চিমের কোণে রক্ত-রাগ-রেখা
নহে কত সৌম্যরশ্মি অকণের লেখা
তব নব শ্রভাতের ! এ শুধু দারুণ
সঙ্ঘার প্রণব-দোষি ! চিতার আন্তর
পশ্চিমসমুদ্রতটে কতিচে উপহার
বিশ্ব-লীল, স্বার্থদীপ লুক-সত্যতার
মশাল হইতে লগে শেব অরিকণা !
এই স্বপ্নানের মাঝে শক্তির সাধনা
তব আরাধনা নহে, হে বিঘণালক !
তোমার নিবিগলারী আনন্দ-আলোক
হরত লুকার আছে পূর্ণ-সিদ্ধীতরে
বহু ধৈর্যে নম্র ভক্ত ভংগের তিমিরে
স্পর্শিত অস্পর্শিত দৈত্যের দীক্ষার
দীর্ঘকাল,—ভ্রাস্ত্র বৃহৎ প্রতীকার।

৪

সে উদার প্রভাতের প্রথম অঙ্গণ
বধনি মেলিবে নেত্র—প্রশান্ত করুণ—
ভক্তির অত্রভেনী উদয়-শিখরে,
হে ভগ্নী আগ্রত দেশ, তব কর্তব্যের
প্রথম সঙ্গীত তার বেন উঠে বাজি'
প্রথম ঘোষণাধ্বনি ! তুমি পেকো সাজি'
চন্দন-চর্চিত স্নাত নিখল ব্রাহ্মণ
উজ্জ্বল উজ্জ্বল তুগি করিয়ে বন্দন,—
“এস শান্তি, বিধাতার কস্তা-লমাটিকা,
নিশাচর পিশাচের রক্তদীপশিখা
করিয়া লজ্জিত ! তব বিনাশ সন্তোষ
বিশ্ব-লোক-ঈশ্বরের রত রাজকোষ,
জব দৈর্ঘ্য দৈব বীণা, নম্রতা তোমার
সমুদ্র মৃত্যু-শব্দ, টাঙ্গি পুনঃবার

৫

৭

ওরে মৌন নৃক, কেন আত্মি নীগ্রবে
 অশ্রু করিয়া করু ? এ মুখর তবে
 তোরে কোন কথা নাই, যে আনন্দহীন ?
 কোন সভা পড়ে নাই চোখে ? ওরে দীন,
 কঠে নাই কোন সন্নীতের নব তান ?
 তোরে গৃহপ্রাণ চুবি' সন্ত হহান্
 পাতিছে অনন্ত-পাথা পন্ডিনে পূরবে,
 কত নদী নিরংগি ধার কলসবে
 তরল-সঙ্গীতপায়া হবে মূর্ছনহী !
 তধু তুমি লেখ নাই সে পতাক জোড়তি
 ঘাণ সতো, বাহা গীতে, আনন্দে, আশায়,
 কুটে উঠে নব নব বিচিত্র-ভাবায় !
 তব সভা তব থান রুদ্ধ হবে যবে
 যাত্রিদিন জীবনপরে শুকপয়নায়ে !

৬

৮

শক্তি-নন্দ স্বার্থলোভ মারীর মতন
 দেখিতে দেখিতে আজি বিসিঁড়ে ছুবন !
 বেশ গতে সেশাস্তরে স্পর্শনিব তার
 শক্তিময়-পদী বত করে ছারখার !
 শুচি শাশ, সুরলতা-জ্ঞানে সমুদ্রল,
 বিদ্ধ বেহে রসসিক্ত, সন্তোষে শীতল,
 ছিল এট তারতের তপোমনতনে
 বস্ত্রভারহীন মন ; সর্ব্ব জলেতলে
 পরিব্যাপ্ত ক'ত্র' দিত উদার কল্যাণ,
 ভড়ে ভীবে সর্ব্বভূতে অব্যাহিত ধ্যান
 পণিত আত্মীয়রূপে ! আজি তাহা নানি,
 চিত্ত বেধা ছিল,—দেখা এল প্রকারশি,
 তৃপ্তি বেধা ছিল,—দেখা এল আড়ম্বর,
 দাস্তি বেধা ছিল,—দেখা স্বার্থের সমর ।

কোয়ো না কোয়ো না শক্ত, হে ভারতবাগি,
 শক্তিময়মত এই বগিকুন্দিনাদা
 ধনদুগ্ধ পন্ডিনের কটাক্ষদুগ্ধে
 শুভ্র উত্তরীর পরি' শাস্ত্র মোনানুগে
 সুরল জীবনখানি করিতে বনে !
 শুনো না কি বলে তাহা, তব স্রষ্ট দল
 থাকুক চলয়ে তব, থাক' তাহা যবে,
 থাক' তাহা হুপ্রের দলটির শরে
 অদৃষ্ট মুকুট তব ! দেখিতে বা' নড়,
 চক্ষে বাহা স্থপাকার হইয়াছে ভড়,
 তারি কাছে অস্বীকৃত হয়ে যাবে যাবে
 দুটারো না আপনার ! পানো অ'ত্মারে
 দারিদ্র্যের সিংহাসনে কর প্রতিষ্ঠিত,
 রিক্ততার অবকাশে পূর্ণ করি' চিত্র !

হে ভারত, নৃপতিতে শিখায়েছ তুমি
 তাম্রিতে মুকুট, দণ্ড, সিংহাসন, তুমি,
 ধরিতে দরিদ্রবেশ ; শিখায়েছ বীরে
 ধর্ম্মযুদ্ধে পদে পদে কহিতে অরিরে
 তুলি জয় পরাজয় পর সংগ্রহিতে ।
 কন্দীরে শিখালে তুমি যোগযুদ্ধ চিতে
 সর্ব্বকলস্পৃহা ব্রহ্মে দিতে উপহার !
 গৃহীরে শিখালে গৃহ করিতে বিস্তার
 প্রতিবেশী আশ্রয়স্থ অতিথি অনাগে !
 ভোগেয়ে বেধেছ তুমি সংসারের নাগে,
 নির্দল বৈরাগ্যে দৈন্ত করেছ উচ্ছল,
 সম্পদেরে পুণ্যকর্মে করেছ মঙ্গল,
 শিখায়েছ স্বার্থ তাম্রি' সর্ব্ব হুগে-জুগে
 সন্মান রাখিতে নিতা ব্রহ্মের মনুগে !

২

হে ভারত, তব শিক্ষা নিগেছে যে ধন,
বাহিরে তাহার অতি স্বল্প আয়োজন,
বেশিতে দানের মত, অন্তরে বিস্তার
তাহার ঐশ্বর্য্য বহু ! আজি সভ্যতার
অন্তহীন আড়ম্বরে, উচ্চ আক্ষিপনে,
দয়িত্ব-কথিত-পুষ্ট বিশাদ লাগনে,
অগণ্য চক্রের গর্ভে নৃপের ধর্ম্মর
পৌহবাহ দানের ভীষণ বর্ষণ
কুপ্ররক্ত-অধিনীপ পরম স্পর্ধার
নিঃসঙ্কেতে শাস্ত্রচিত্তে কে পরিবে, হায়,
নীলব-গোবর দেই দোষ বীনবেশ
সুবিরণ—নাহি যাছে চিত্তাচেটোপেশ !
কে রাখিবে ভরি' নিজ অশ্রু-আগার,
আত্মার সম্পদরাশি মরণ উদার ।

১০

অন্তরের সে সম্পদ কেদেছি হারিয়ে ।
তাই মোরা লক্ষ্যমান ; তাই সঙ্গ গায়ে
সুধার্ত্ত হৃর্ডের নৈন্য করিছে দংশন ;
তাই আজি ব্রাহ্মণের বিরণ বশন
সম্মান বহে না আর ; না'হি ধানবল
শুধু জপমাত্র আছে ; ওচিৎ কেবল,
চিত্তহীন অর্থহীন অভ্যস্ত আচার ;
সন্তোষের অন্তরেতে বীর্ণ্য নাহি আর ;
কেবল অড়ম্পৃহ,—ধর্ম্ম প্রাপহীন
ভারসম চেপে আছে আড়ষ্ট কঠিন !
তাই আজি দলে দলে চাই ছুটিবারে
পশ্চিমের পরিত্যক্ত বস্ত্র লুটিবারে
লুকাতে প্রাচীন বৈজ্ঞান্য ! বৃণা চেটো, তাই,
সব সজ্জা লক্ষ্যভরা, চিত্ত যেনা নাই !

১১

চিত্ত যেনা ভয়শূন্য, উচ্চ যেনা শির,
জ্ঞান যেনা মুক্ত, যেনা গৃহের প্রাচীর
আগুন প্রাকলভলে দিবসপর্করী
বহুধারে রাখে নাই শব্দ ক্ষুদ্র করি ;
যেনা বাক্য ধন্যদের উৎসমুখ হ'তে
উজ্জ্বলিয়া উঠে, যেনা নির্দোষিত ব্রোভে
সেপে পেশে দিশে দিশে কর্ম্মধারা ধার
অজস্র সহস্রবিধ-চরিতার্থতার ;
যেনা কুচ্ছ আচারের মরুবালাশি
বিচারের স্রোতঃপথ কেলে নাই গ্রাসি',
শৌক্যবরে করেনি শতধা ; নিত্য যেনা
তুমি সঙ্গ করি চিত্তা আনন্দের নেতা,
নিজ হস্তে নির্দয় আঘাত করি, পিতঃ,
ভরিতেরে দেই স্বর্ণে কর জাগরিত !

১২

তোমার ভাৱের দণ্ড প্রত্যেকের করে
অর্পণ করেছ নিজে ! প্রত্যেকের পরে
দিগেছে শাসনভার, ভগ্নো রাজস্বাক !
সে শুদ্ধ সম্মান তব, সে হুহুহ কাঙ্ক্ষ,
এগনি' তোমাতে যেন নিয়োধ্যা করি
সহিনয়ে ! তব কাণ্যে কাণে নাহি ভরি
কোন দিন ! কস্য যেনা কৌণ-স্বর্জলতা,
হে ক্রতু, নিষ্ঠুর যেন হতে পারি তথা
তোমার আদেশে । যেন রসনার মম
সত্য বাক্য বসি' উঠে ধরখড়্গসদ
তোমার ইজিতে ! যেন রাখি তব মান
তোমার বিচারাসনে লয়ে নিম্নস্থান !
অজায় যে করে, আর, অজায় যে লয়ে,
তব বৃণা যেন তারে ভূষণ নহে !

হিন্দুজাতির একনিষ্ঠতা ।

“হে সকল ঈশ্বরের পুত্র-ঈশ্বর,
তপোবনতরুজ্বারে দেবমন্ত্র শ্রব
যোষণা করিয়াছিল সবার উপরে
অগ্নিতে, জলেতে, এট বিধ চরাচরে,
বনস্পতি গুহাধিতে এক দেবতার
অপঙ অঙ্কর ঐক্য! দে বাক্য উদার
এই ভারতেত্রি! ধীর! সৰল স্বাধীন
নিষ্ঠর সরলপ্রাণ বন্ধনবিহীন,
সদর্পে কিংবদন্তে বীৰ্য্যজ্যোতিঃপ্রদান
লজিয়া অরণ্য নদী পঙ্কজ পাবণ
ভীরা এক মহান্ বিপুল সত্যপথে
তোনারে লভিগোছেন নিখিল জগতে,
কোনখানে না মানিয়া আত্মার নিবেদ
সবলে সমস্ত বিশ্ব করেছেন ভেদ!”

করতল চট্টোপাধিন্ স্পর্শিত সভাগৃহে
হিন্দুজাতির মহিমা সময়ে অসমবে, পরি-
কীৰ্ত্তিত হইয়া থাকে। চাট্টোপাধিন্ স্পর্শিত বাগ্দি-
গণ “আমরা হিন্দু”, “আমরা আৰ্য্য”, “আমরা
শ্রোত্র” এবং জাতীয়ক গৌরববচনমধু শ্রোত্র
বর্ণের কর্ণকুহরে ঢালিয়া দেন। কিন্তু যদি
প্রিজ্ঞাসা করা যায়, হিন্দুর হিন্দু, আৰ্য্যদিগের
গৌরব কোন ভিত্তির উপরে প্রতিষ্ঠিত,
কোন মতে পরিরক্ষিত, তাহা হইলে কেবল
একটা বাস্তব-নিষ্ঠাবিহীন মন্তককক্কুদনশূচনা
দৃষ্ট হয় মাত্র।

কোন বিষয় বলিতে গেলে, দুই প্রকারে
বলা যায়। “নেতি” “নেতি”, ইহা নয়, উহা
নয়, তাহা নয়, ইহাকে বলে বস্তুর নঞ-

সংজ্ঞক পরিচয়। আবার বস্তুটি এইরূপ,
ওইরূপ, ইহাকে বলে স্বরূপপরিচয়।

হিন্দুর হিন্দু কোন ভিত্তির উপর
প্রতিষ্ঠিত নয়, তাহাই অগ্রে বলা যাউক।
হিন্দুর হিন্দু কোন ধর্মমতের অপেক্ষা করে
না। সাংখ্যদর্শন বেদান্তের দ্বারা প্রতি-
বিকৃত বলিয়া প্রতিপন্ন হইয়াছে। তত্রাচ
সাংখ্য-প্রণেতা একজন পূজনীয় হিন্দু ঋষি।
বৈষ্ণব-চূড়ামণি রাধাকৃষ্ণ বেদান্তের অষ্টম-
বাদী আচার্য্যদিগকে মাধববাদী ও প্রাজ্ঞ-
বোধ বা নাস্তিক বলিয়া নির্দেশ করিয়া-
ছেন। এখনও দাক্ষিণাত্যে কোন বৈষ্ণব
নিবাসস্থিরের ছায়াস্পর্শ এবং শৈবদিগের
সহিত আচার্য্যাদি করেন না। মাধবচার্য্য

আবার অবৈতব্যব খণ্ডন করিয়া দৈবতাবাদ স্থাপন করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। পঞ্চ-মকারসাধক ছাগমহিগননকাগী শাক্তের লিখিত নিয়ামিমাণী মন্ত্রের এত প্রভেদ যে বর্ণনার ক্লাইরা উঠে না। কিন্তু শৈবও হিন্দু, শাক্তও হিন্দু, বৈষ্ণবও হিন্দু এবং ঠাকুরকেও কেলিমা দেওয়া যায় না। যদি মতামত লইয়া হিন্দু বণ্ঠিত হইত তাহা হইলে হিন্দুসংজ্ঞা অনেকদিন লুপ্ত হইয়া যাইত।

হিন্দুর হিন্দু আহারপান বিচারের উপরেও নির্ভর করে না। এক মহাশয় তক্ষণ ব্যতীত খাড়াখাণ্ডের কোন নিষিদ্ধি নিয়ম নাই। শিখেরা শূকর মাংস তক্ষণ করে। মহারাষ্ট্রিয়ার ও পাঞ্জাবের অধিবাসীরা কুকুটমাংস ভোজন করে। শিখেরা তাসবুট সেধন করে না কিন্তু নহিরা পান করে। দাক্ষিণাত্যে ব্রাহ্মণেরা মৎস্যশী বন্দী ব্রাহ্মণকে পণ্ডিত ও ব্রহ্ম মনে করে। এমন কি পুরাতন সংহিতাকারগণ মহাশয় ভোজনেরও বিধি দিয়াছিলেন। এখন কাহাকে হিন্দু বলিব এবং কাহাকে হিন্দুই হইতে অপসারিত করিব? মহারাষ্ট্রি-বিগকে বা শিখবিগকে ছাড়িয়া দিলে হিন্দু-জাতি যে অন্তঃসারশূন্য হইয়া পড়ে সে বিষয়ে কোন সংশয় নাই। যদি হিন্দু ধর্ম্মভেদ উপর প্রভাবিত নহে এবং ভক্ত্যভ্যাবিধি-সাধ্যের উপর নির্ভর না করে তবে হিন্দুদের প্রতিষ্ঠা কোথায়? কোন আগবে হিন্দুর জাতীয়তা আলবিত আছে।

হিন্দুদের ভিত্তি, হিন্দুদের সত্য, বর্ণাশ্রম-ধর্ম্ম এবং তৎপ্রণোদিত একনিষ্ঠতা। এই

প্রবন্ধে হিন্দুর একনিষ্ঠতা সংক্ষেপে ব্যাখ্যাত হইবে। কিন্তু ক্ষিপ্রে সেই একনিষ্ঠতার আধিক্য বর্ণাশ্রমবিভাগে প্রকটিত হইয়া হিন্দুজাতিকে ঘোরবিপ্লবসমূহ হইতে বার বার রক্ষা করিয়াছে ও এখনও করিতেছে তাহা বর্ণাসময়ে পর্য্যালোচিত হইবে।

দর্শনশাস্ত্রে বর্ণে নাহয় নির্দিষ্ট বিধি অনুসারে চিত্রা করে। সেই সকল অগ্নি-বর্ত্তনীয় বিধি অতিক্রম করিলেই ব্রহ্ম প্রাণ অবলম্ব্য। প্রাচ্য হটক আর প্রতীচ্য হটক দর্শনচিত্রাবিধি একই। এই নির্ধারণ একান্ত নিরোদ্ধা। তথাপি হিন্দুচিত্র-প্রণালীর বিশেষত্ব আছে। এই বিশেষত্বের উপরে হিন্দু প্রতিষ্ঠিত। প্রাচ্য ও প্রতীচ্য দর্শনে বিবিধ পার্থক্য নাই বটে কিন্তু প্রণালীগত ভেদ পরিমিত ও হয়।

হুইট পক্ষী এক নাচে গদ্য করিত। একট পক্ষপট বিস্তার করিয়া উড়ে অনন্তের দিকে উঠিল। মেঘাকাশ চাড়াইয়া গ্রহতারক-মণ্ডিত নভোমণ্ডল ভেদ করিয়া চাড়াপথে পহুছিল। এই নির্দিষ্টান শূন্য আনন্দের গভীরতার ভূমি বালি, অনন্তপন্নম্যোনে চুমানন্দ, অসপানন্দ প্রতিষ্ঠিত। আর একটি পক্ষী উত্তর দক্ষিণ পূর্ব পশ্চিম দিগ-বিধিক্ত পরিভ্রম করিল, অনন্তের আবাস অনুসন্ধান। কত সৌন্দর্য্য, কত সযজ্জ, কত কাব্যকারণবটিক স্রবসা ঘেঁষিল। প্রকৃতির মাধুরী দর্শনে বিনোদিত হইয়া হির করিল—অনন্তের অখণ্ড সমন্বয়ে, সংস্রবে, সঙ্গমে নিহিত আছে। প্রথমটি আধ্যাত্মিক, দ্বিতীয়টি দুনিয়া বা প্রাক দৃষ্ট।

হুইট মন্তব্য বলিবার পরূপনির্বোধক্ষেণ

ভীষণভাবে করিল। একটি ছবি, গভীরতা হইতে গভীরতার প্রবেশ করিল। শেষে অতল-তলদেশে আগত এবং তৃষ্ণীকৃত। অগ্নিটি শারদ্বজ্ঞানগত বাসনাধ ক্রম-বদ্ধন করিল। প্রথমোক্তপ্রতিযোগী বশের সহিত উভালতরঙ্গাধাতকে তুচ্ছ করিয়া সন্মরণ করিতে করিতে অকুল পাথারে হারাইয়া গেল। হতবুদ্ধি হইয়া অনন্তের বিস্তারহীন এই দিকারে উপনীত হইল। প্রথমটি প্রাচ্য হিন্দু, দ্বিতীয়টি প্রাচ্য ধর্ম্ম।

কোন একটি বস্তুর অবলম্বনে বস্তুর অন্তরে প্রবেশ করা হিন্দুর বিশেষত্ব। আর একের সহিত অপরের সংলগ্ন জানা এবং সংস্করণ ভিতর দিয়া একতা ধর্মন করা যুরোপীয় ধর্ম্মের বিশেষত্ব। প্রথমের লক্ষণ একনিষ্ঠতা বা অত্যাধীন, দ্বিত্যের বহুনিষ্ঠতা বা সমাধান। হিন্দু, যুরোপীয় ধর্ম্ম-কথাট উল্কাটন করিয়া যুরোপীয় সারভূত নিকল বিয়ল হিরণ্য পুরুষকে দেখেন। আর যুরোপীয়েরা যুরোপ সহিত গ্রহের উপগ্রহের সংলগ্ন ধর্মন করিয়া বহুনিষ্ঠিত প্রবণা অবলোকন করেন।

অনেকে হিন্দুত্বাতির সহিত হিন্দুধর্ম্মমত সংলগ্ন মিশাইয়া ফেলেন। তদ্রূপ যুরোপীয় চিন্তা বসিতে যুরোপে প্রেরিত ধর্ম্মমত বোঝেন। এইরূপ অজ্ঞাতধর্ম্মাধোপ যোর প্রবাব ভিন্ন আর কিছুই নহে। যুরোপীয় চিন্তাশ্রমণালীর প্রভাবান পুরাতন গ্রীকদেশ। কিন্তু বর্তমান যুরোপীয় ও প্রাচ্য গ্রীক ধর্ম্মে আকাশ পাতাল প্রভেদ। ইহাতেই প্রমাণিত হইতেছে যে, চিন্তাশ্রমণালী ধর্ম্মমত হইতে

পৃথক্। হিন্দুধর্মে ভিন্ন ভিন্ন মত প্রচলিত হইয়াছে; ভিন্ন ভিন্ন সম্ভাষণ, ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্মের আবির্ভাব হইয়াছে;—বেদা বিভিন্নতা; স্বতন্ত্রে বিভিন্নতা নানো সুনির্দিষ্ট মত ন ভিন্ন—কিন্তু সমাহিত হইয়া দেখিলে সমাধিক্রমে বৃদ্ধিতে পায়। আর যে একই চিন্তাশ্রমণ, লক্ষণ বিভিন্নতার নিম্নদেশে ধারাবাহিকক্রমে চলিয়া আসিতেছে। সেই একনিষ্ঠত্বের পত্তি নির্ধারণ করা যাউক।

বৈদিক কালে যখন যজ্ঞশালায় কানী-করানীমোক্ষপ্রভৃতি সপ্ততিস্তা বিস্তার করিয়া প্রচ্ছদিত হত। তখন আহুত ভোজন করিত তখন সেই ভোজ্যতির্য্য প্রকাশের মধ্যস্থিত জাতবেদা পুরোধা অধিদেবকে “অধিদেব পুরোহিত” ইত্যাদি মহের ধারা ধরিয়া পূজা করিতেন। যখন মধ্যবিক্রম-শালী প্রভবন ধর্ম্মত্রীকে আলোড়িত করিত তখন লবনদেবকে “লবনো বায়ু” বায়ু আমাশয়ের মধ্য করুন—এবং প্রকারে স্ততি করিতেন। গভীরনির্বোধী ওলদান্ নিম্ননদের বীচি-বিক্ষোভে বক্ষণদেবের ক্রোড়া দেখিতেন। প্রাচ্য পত্তিতেরা হির করিয়াছেন বালক বেত্রণ চলনশীল ভূতবস্ত্রে ভোজন আরোপ করে সেইরূপ ধর্ম্মা অত্যাধীন ও চৈতন্যের ভেদ বৃদ্ধিতে না পারিয়া পদ্ধতকে দেবতা বলিয়া পূজা করিতেন। এই সত্যত সমীচান নহে। আদ্য ধর্ম্মের আধ্যাত্মিক ধর্ম্মে একনিষ্ঠতার সমাধি পরিচয় পাওয়া যায়। ঐহিকো কাব্যকারণগণসম্মার জীবীর্ষ দ্বা-ধর্ম্মা আধিকারণে উপনীত হইতেন না। কোন সক্তিশালী বা ভোজ্যতির্য্য প্রকাশ দেখিলে সেই প্রকাশের অন্তরে প্রকাশ

কর্তাকে দেখিতে পাইতেন। যোরকৃষ্ণজল-
জালের আবির্ভাবের কারণ অহুসন্ধান
করিলে যদি বলা যায় যে তখন তপ্ত-জলকণার
সম্বাধে এই গরোবাদের অন্য হইয়াছে তাহা-
হইলে মীমাংসার কোন ব্যবস্থা হয় না।
এবংর ভাবপণ্য এই বাহ্য ছিল না তাহা
কি রূপে হইল। মেঘ ছিলনা মেঘ হইয়াছে,
মেঘের উৎপাদক পূর্ববর্তী অজ্ঞপ্রক্রিয়া
ছিল না হইয়াছিল; এইরূপে বটেই আমরা
পঞ্চাঙ্গের উর্দ্ধবালে দোড়াইয়া বাই না
কেন অশ্বত্থের হাত হইতে এড়াইতে
পারিবনা। যদি কোটি গোজন ভ্রমণ করি
বা কোটি যুগকে অতিক্রম করি তথাপি
মাত্রের রাণা অহুসন্ধানীয়। বাহ্যকে নিষ্কাল্য
করি সেই বলে আমি ছিলাম না হইয়াছি,
আমি আদিত অসং অশ্বত্থে অসং কেবল
মধ্যেতে সজ্ঞে প্রতিভাত। কার্যকারণ-
মূল্য অবলম্বন করিয়া চলিলে এক মহতী
অব্যবস্থার মধ্যে ধরাইয়া বাইতে হয়। অত্বে
চলিতে দেখিলে চক্ষুস্থান্ চাকের অহুসন্ধান
করিতে স্বভাবতঃ প্রবৃত্তি হয়। কিন্তু অন্ধের
সমষ্টিতে চক্ষুস্থতার উৎপত্তি হয় না।
অসং, জন্ম, অস্থাবর, নামরূপ-সম্বিত
এককের অস্তিত্বেই সং, স্থির, স্থাবর, অনাম,
অরূপ সারত্ব বাস করে। যদিও জিয়া
ও জিয়াকলের অংশকা না করিয়া সূত্র
বস্তুর গর্ভে একবারেই অদৃষ্ট হিরণ্যগর্ভকে
দেখিতেন। এই দৃষ্টিকে একনিষ্ঠতা বলে।
আর্য্য একনিষ্ঠতার আর একটি গভীরতর
লক্ষণ আছে।

অগ্নির সেবতা অগ্নিনামে কেন অভিহিত
হইল? বায়ু বক্ষণ তপনাদিবেবতা কর্তা

হইয়াও কার্যের নামে সংজ্ঞিত কেন হইল?
কার্যেরও যে নাম কর্তারও সেই নাম।
এই সমনামতা দেখিয়া অনেক মনে করেন
আর্য্যাবিরা প্রকৃতির উপাসক ছিলেন।
কিন্তু তাহার প্রকৃতিপূজক ছিলেন না,
প্রকৃতি ও পুরুষের অভিন্নতার দ্রষ্টা ছিলেন।
তদন্তই তাহাদিগকে ঋষি (দৃশি) বলা
হইত। কর্তা কোন অপূর্ণ মাত্রাশক্তি বলে
কার্যরূপে প্রতিভাত হয়, কার্যকারণে
ব্যবহারতঃ ভেদ থাকিলেও পরমার্থতঃ
তাহারা অভিন্ন—এই অভেদত্ব সমগ্র বেদ
মাধার গীত হইয়াছে। কর্তা এবং কার্যের
অভেদতাব, বিধকৃপী স্রষ্টার প্রতিবিম্বরূপী
সৃষ্টিতে প্রতিভাতি, অস্তিত্বের মাত্মিক বহুত্ব,
বৈদিক ঋষিদিগের একমুখী অতদৃষ্টিকে
পরিপুষ্ট করিয়াছিল। এই একনিষ্ঠ দর্শন
ক্রমে ক্রমে স্মৃতি লাভ করিয়া বেদান্তের
গুহ্যবৈতবাবে পরাকর্ষ লাভ করিয়াছে।
সাংখ্য দর্শনে দেখা যায় যে সমস্ত ভূতত্ব
এক দিগ্ভাবাচ্ছিকা প্রকৃতিতে পর্যাবসিত
হইয়াছে। হিন্দু চিন্তা অগ্নির হইতে
হইতে এই প্রকৃতিবাদের একের উপস্থিত
হইয়াছিল। কিন্তু ঋষিরা যে অভেদ
দেখিয়াছিলেন তাহা সাংখ্যে পূর্ণতা লাভ
করে নাই। সাংখ্যের একত্ব বৈতাককারা-
বৃত্ত। প্রকৃতি এক পুরুষাত্মিক বস্তু,
আপনতে আপনি অবস্থিত, অস্তিত্বের অস্ত
সদৃশী পুরুষের অংশকা করে না। সমগ্র-
ভূতপ্রাণকে সত্ত্বরগুণমোদরী প্রকৃতিতে
একীভূত করা একনিষ্ঠার ফল বটে, কিন্তু
বৈতাপত্তি ইহাতে যেতে না। পুরুষ ভিন্ন,
প্রকৃতি ভিন্ন, এই বহুত্ব হিন্দুধর্মকে সমুদ্রে

করিতে পারে নাই। আজ হিন্দুধর্মে সাংখ্য-দর্শনের স্থান আছে বটে কিন্তু সাংখ্যমতের পৌণ্ডিক একবারেই নাই বণিগে হয়।

প্রকৃতিবাদের একমুখ অপেক্ষা বিশিষ্ট-বৈষম্যবাদের একমুখ গভীরতর। ব্রহ্ম একমাত্র জগতের কারণ। ব্রহ্মাতিরিক্ত কোন বস্তু নাই। ব্রহ্মের একতার মধ্যেই অনেকতা নিহিত। যেমন বৃক্ষ এক, কিন্তু শূণ ও শাখা প্রত্যেকে বহু, সমুদ্র এক, কিন্তু লহরীগোলাবহুতর, মৃত্তিকা এক, কিন্তু ঘট শরাবদুগ্ধে বহু, সেইরূপ ব্রহ্ম এক, অখণ্ড বহু। রানাপ্রদেয় এই সিদ্ধান্ত সাংখ্যের একমুখ হইতে উচ্চতর সন্দেহ নাই, তথাপি অর্থাৎ একনিষ্ঠতার উচ্চতর বিকাশ নহে। ব্রহ্মের বস্তুত্ব যদি বহুত্ব অপ্রতিহত থাকে তাহা হইলে একত্বের কেবলতা বা শুদ্ধতা থাকে না। ব্রহ্মের সহায় যদি বহুতার অপেক্ষা থাকে, অনেকতার আকাঙ্ক্ষা থাকে, স্বয়ংক্রিয় প্রয়োজন থাকে; যদি ভূমানে কামিনা থাকে, তবে সেই অপেক্ষার দিচ্ছি, আকাঙ্ক্ষার পূর্ণতা, কামনার পরিচূর্ণিত কে করিবে? আবার যদি বহুত্বের বীজ পূর্ণত্বের পারমার্থিকভাবে নিহিত থাকে তাহা হইলে সেই বীজের ক্রমবিকাশ হইলে সমস্তের পরিণাম স্বীকার করিতে হয়। পরিণামী ব্রহ্ম ইহা এক অসম্ভব কথা। ব্রহ্ম যদি পরিণামী হন, তাহা হইলে সেই পরিণামের কারণ কোথায়? ব্রহ্মের বাহিরে ত কোন বস্তু নাই। ব্রহ্মই আপনার পরিণামের আপনি কারণ। কিন্তু কারণের বোধনা হইলে ক্রিয়া অবশ্যপ্রাণী। তাহা হইলে ব্রহ্মপরিণাম বস্তুত্ব হইবার সম্ভাবনা শুভদ্রবী হওয়া প্রায়। ক্রমবহের স্থান থাকিতে পারে না।

অধিকন্তু পরিণামের চূড়ান্ততাই পূর্ণতা বা অপরিণামিতা। তবেই সিদ্ধান্ত হইল যে ব্রহ্ম যদি নিজের স্থিতির নিম্নে কারণ হন তাহা হইলে তাহার মধ্যে বহুত্বপরিণামের সংস্পর্শ থাকিতে পারে না। বিশিষ্টবৈষম্যে একনিষ্ঠতা আছে কিন্তু স্ববিপ্রোদিত হিন্দুত্ব একমুখীয় বুদ্ধিকে তৃপ্ত করিতে পারে নাই। হিন্দুধর্মে শতকরা দশজন ও বিশিষ্টবৈষম্য-বাদী হুজাফা।

শতরের শুদ্ধবৈষম্যবাদের হিন্দুত্ব একনিষ্ঠতার চরমচূর্ণিত হইয়াছে। বস্তু এক মিল পরমার্থতঃ দুই হইতে পারে না। এবং সেই বস্তুর মধ্যে বহুত্বের বীজ অসম্ভব। ব্রহ্ম একমেবাদ্বিতীয়ত্ব, অখণ্ড, অপরিণামী, আন্তঃকাম, স্বতন্ত্র নিরূপেক আত্মরত, অনন্ত, শুদ্ধ, কৈবল্যময়। তিনি জগতের কারণ বটে কিন্তু সেই কারণবীর্য তাহার সম্মুখে পাওয়া যায় না। তাহার অগত্যাগত বা প্রতীক স্বতন্ত্রগত নহে। তাহার স্বতন্ত্র কেবল সচ্ছিদানন্দময়। তিনি চিহ্নহীন হইলে অতিবিশীল হইয়া যান, কারণ চিহ্ন এবং অতিবিশীল কোন ভেদ নাই। কিন্তু তাহার প্রতীক বা কারণত্ব একটা বাহ্য বা ঐশ্বর্য শব্দ, তাহার স্বতন্ত্রকে স্পর্শ করিতে পারে না। প্রতীককে অপসারিত করিলে তাহার সম্মুখ উপচর বা অপচর হয় না। বাস্তবিকই বেদান্ত একত্বের উচ্চতম আকাশে আটোহণ করিয়াছে। বেদান্তের সিদ্ধান্ত এই যে, বস্তু-ধীন ব্রহ্মের প্রতীক জ্ঞানদৃষ্টিতে অপগত না হয়, ততদিন সৃষ্টির সম্ভাবনা নাই। এই অগত্যাগত, অনন্ত, অদীক, সম্মুখে প্রতিবিশিত মাত্র। ইহার অতিবিশীল ভিত্তি

কোথাও দেখা যায় না । বিবর্তনশীল ভূতগ্রাম
নির্ভেদে ত অবস্থিত নহেই আর ব্রহ্মস্বা
মধ্যেও ইহার অবস্থিতির প্রয়োজনীয়তা
সেখা যায় না । ইহা পুরুষর্নগরের দ্বার এক
অমটবটনপটীগণী মাগাশক্তি দ্বারা উদ্ভূত
হইয়াছে । সেই মাগাশক্তি ব্রহ্মেতে অব-
স্থিত কিন্তু স্বরূপতঃ নহে । বাহ্যগতাবে
ব্রহ্মকে আবরণ করিয়া আছে । একই বহু
হইয়াছে কিন্তু কেবল ব্যবহারতঃ । একের
পরিবর্তন হয় না, পরিণাম হয় না, অথচ
বহুরূপে প্রতিভাতি হয় । কবিরা যে অদ্ভি-
দেবতাকে অগ্নি বণিতেন, কার্ণোর নামে
কারণকে অভিহিত করিতেন, সেই এককের
পরাকাষ্ঠা বৈদান্তিক নাস্তাবাসেই দৃষ্ট হয় ।

একনিষ্ঠচিত্তাপ্রবণতা । বস্তুর বস্তুর
দর্শন, কর্তা এবং কার্যের পারস্পরিক অন্বে-
দাহুতি, বস্তুবের মাত্রিকতা জানাই হিন্দুর
হিন্দুত্ব । বেদে ইহার আরম্ভ এবং বেদান্তে
পরিণতি । এই আধ্যাত্মিক দর্শন বর্ণাপ্রম
ধর্ম্মে প্রকটিত হইয়াছিল । তির্যকে অভিন্ন
করা, অনেককে একীভূত করা বর্ণবিভাগের
উদ্দেশ্য । যে দিন হইতে এই একনিষ্ঠ-
চিত্তাশীলতার হ্রাস হইতে লাগিল, যে দিন
হইতে বর্ণাপ্রমধর্ম্মের ব্যতিক্রম আরম্ভ হইল,
সেই দিন হইতে ভারতের অধঃপতন । আজ
কোথায় সেই একনিষ্ঠতা ! পাশ্চাত্য বিদ্যা
আত করিয়া আধাসত্যানেরা বহুনিষ্ঠ ও বর্ণা-

প্রমথিতোধী হইয়া উঠিয়াছে । যতদিন স্বদি-
গিরের অস্তিত্বদৃষ্টি এবং বর্ণধর্ম্ম পুনরা-
বিভূত না হয় ততদিন ভারতের উদ্বা-
সস্তব । অত্মকরণে বস্তুর উৎকর্ষ হইতে
পারে, হইবে, কিন্তু অহিমজাগত উন্নতি
হইবে না ।

একনিষ্ঠার অত্যাধর-চেই করিতে দিয়া
আমরা যেন দুরোণীর বহুনিষ্ঠার বিরোধী
না হই । এই বহুনিষ্ঠা আমাদের জাতীয়তাকে
পোষণ করিবে । যেমন আমাদের দেশে
বৃক্ষ সকল দুরোণীর বিজ্ঞানপ্রভাবে পরম-
জীলম্পর হয়, দেউকণ আমাদের চিত্তা-
প্রণালী প্রভৃতি চিত্তার সংস্পর্শে বলীয়সী
হইবে । কিন্তু ভূমি ছাড়িলে জীবন ও তেজ
শূন্য হইয়া যাইবে । অবশ্যক ইংলণ্ডে রোপণ
করিলে বিজ্ঞানের সাহায্যতা তাহার কোন
ফল আসে না । হিন্দুর যদি হিন্দুত্ব ত্যাগ
করে এবং দুরোণীর হয় তাহা হইলে অচিরে
মরিয়া যাইবে । কিন্তু যদি হিন্দুত্বের উপর,
জাতীয়তার উপর, একনিষ্ঠতার উপর, বর্ণাপ্রম
ধর্ম্মের উপর বতঃসন্ধান হইয়া দুরোণীর অসু-
শীলন গ্রহণ করে তাহা হইলেই ভারতের
ইহুপকালে মঙ্গল হইবে । নিজেই বর
ছাড়িও না, অপ্রতিষ্ঠ হইও না । গৃহস্থ হইয়া
অভ্যাগতবিগকে সমান করিও । তবেই
হিন্দুর হিন্দুত্ব পরিরক্ষিত হইবে, সংবর্তিত
হইবে, এবং জলসম্পদ হইবে ।

ব্রহ্মবাক্য উপাধ্যায় ।

চোখের বালি ।

১

বিনোদিনীর মাতা হরিমতি মহেন্দ্রর মাতা রাজলক্ষীর কাছে আসিয়া ধরা দিয়া পড়িল। হুই জনেই এক প্রাণের মেয়ে, বাল্যকালে একত্রে খেলা করিয়াছেন।

রাজলক্ষী মহেন্দ্রকে ধরিয়া পড়িলেন— বাবা মহীন, গরীবের মেয়েটিকে উদ্ধার করিতে হইবে। তুমিরাছি মেয়েটি বড় লক্ষ্মী, আবার মেয়ের কাছে পড়াশুনাও করিয়াছে—তোমের আজ্ঞাশ্রমকার পছন্দর সঙ্গে নিগিবে।

মহেন্দ্র কহিলেন, না, আরকালকার ছেলেত আমি ছাড়াও আরো চের আছে।

রাজলক্ষী। মহীন, ঐ তোর দোষ, তোর কাছে বিয়ের কথাটি পাড়িবার ঘো নাই।

মহেন্দ্র। না ও কথাটা বাদ দিয়াও সংসারে কথার অভাব হয় না! অতএব ওটা মারামারি দোষ নয়।

মহেন্দ্র শৈশবেই পিতৃহীন। মা সবদে তাহার ব্যবহার সাধারণ লোকের মত ছিল না। বরন প্রায় বাইশ হইল, এন্. এ, পাস করিয়া ডাক্তারি পড়িতে আরম্ভ করিয়াছে, তবু মাকে লইয়া তাহার প্রতিদিন যান অভাবান আদর আশ্বাসের অন্ত ছিল না। কাঠাক-শাকের মত মাতৃ গর্ভ হইতে ভূমিষ্ট হইয়াও মাতার বহির্গতের খণিটির মধ্যে আবৃত থাকাই তাহার অভিপ্সা হইয়া গিয়াছিল। মায় সাহায্য ব্যতীত তাহার

আহার বিহার আচান বিগ্রাম কিছুই সম্পন্ন হইবার ঘো ছিল না।

এবারে মা যখন বিনোদিনীর লজ তাহাকে অত্যন্ত ধরিয়া পড়িলেন তখন মহেন্দ্র বসিলেন, আচ্ছা, কত! একবার দেখিয়া আনি।

দেখিতে যাইবার দিন বলিল, দেখিয়া আন কি হইবে? তোমাকে খুসি করিবার লজ বিবাহ করিতেছি, ভালনন্দ বিচার করা মিথ্যা।

কথাটার মধ্যে একটু রাগের উত্তাপ ছিল কিন্তু মা ভাবিলেন তত দৃষ্টির সময় তাহার পছন্দর সহিত যখন পুত্রের! পছন্দর নিশ্চয় মিল হইবে, তখন মহেন্দ্রের কড়ি মর কোমল হইয়া আসিবে।

রাজলক্ষী নিশ্চিতচিত্তে বিবাহের দিন স্থির করিলেন। দিন যত নিকটে আসিতে লাগিল মহেন্দ্রের মন ততই উৎকণ্ঠিত হইয়া উঠিল—অবশেষে হুই চার দিন আগে সে সে বলিয়া বসিল, না, না, আমি কিছুতেই পারিব না।

বাল্যকাল হইতে মহেন্দ্র, মেঘতা ও মানবের কাছে সর্বপ্রকারে প্রেমের পাইয়াছে, এই লজ তাহার ইচ্ছার বেগ উজ্জ্বল। পরের ইচ্ছার চাপ সে সহিতে পারে না। তাহাকে নিজের প্রতিজ্ঞা এবং পরের অহ-রোধ একান্ত বাধ্য করিয়া তুলিয়াছে বলিয়াই বিবাহ প্রস্তাবের প্রতি তাহার অকারণ

বিশ্বনা অত্যন্ত বাড়িয়া উঠিল এবং আসন্ন-
কালে সে একেবারেই নিমুখ হইয়া বলিল।

মহেন্দ্রের পরম বন্ধু ছিল বিহারী; সে
মহেন্দ্রকে দানী এবং মহেন্দ্রের মাকে মা
বলিত। মা তাহাকে, ঠাঁহবোটের পশ্চাতে
আবদ্ধ পাধাবোটের মত মহেন্দ্রের একটি
আবদ্ধক ভাববহ আসবাবের স্বরূপ দেখি-
তেম ও সেই হিসাবে মমতাও করিতেন।
রাজলক্ষ্মী তাহাকে বলিলেন, বাবা, একজা
ত তোমাকেই করিতে হয়, নহিলে গরীবের
মেরে—

বিহারী ঘোড়হাত করিয়া কহিল—মা
এটে পারিব না। যে মেঠাই তোমার মহেন্দ্র
ভাল লাগিল না বলিয়া রাখিয়া দেয় সে
মেঠাই তোমার অহুরোধে পড়িয়া আমি
অনেক খাইয়াছি কিন্তু কভার বেলায় সেটা
সহিবে না।

রাজলক্ষ্মী ভাবিলেন, বিহারী আবার বিয়ে
করিবে! ও কেবল মন্থনকে লইয়াই আছে,
বৌ আনিবার কথা মনেও স্থান দেয় না।—
এই ভাবিয়া বিহারীর প্রতি তাহার কপা-
মিশ্রিত মমতা আর একটুখানি বাড়িল।

বিনোদিনীর বাপ বিশেষ ধনী ছিল না
কিন্তু তাহার একমাত্র কন্যাকে সে যিশনারী
মেঘ রাখিয়া বহু যত্নে পড়া শুনা ও কাক-
কাব্য শিক্ষায়াছিল। কভার বিবাহ বয়স
ক্রমেই বহিয়া যাইতেছিল তবু তাহার হাঁস
ছিল না। অবশেষে তাহার সুতার পরে
বিধবা মাতা পাত্র বৃদ্ধিরা অস্থির হইয়া
পড়িয়াছে। টাকা কড়িও নাই, কভার
বয়সও অধিক।

তখন রাজলক্ষ্মী তাহার অন্তর্ভূমি বারা-

নতের গ্রামসম্পর্কীয় এক ভ্রাতৃপুত্রের সহিত
উক্ত কন্যা বিনোদিনীর বিবাহ দেওয়াইলেন।

অনতিকাল পরে কন্যা বিধবা হইল।
মহেন্দ্র হাসিয়া কহিল—ভাগ্যে বিবাহ করি
নাই, স্ত্রী বিধবা হইলে ত এক দণ্ড টিকিতে
পারিতাম না!

বহু দিনের পরে আর একদিন মাতা-
পুত্রের কথা হইতেছিল।

“বাবা, লোকে যে আমাকেই নিম্বা
করে!”

“কেন মা লোকের ভূমি কি সর্বনাশ
করিয়াছে?”

“পাছে বৌ আসিলে ছেলে পর হইয়া
যায় এই ভয়ে তোর বিবাহ দিতেছি না,
লোকে এইরূপ বলাবলি করে।”

মহেন্দ্র কহিল,—ভয় ত হওয়াই উচিত।
আমি মা হইলে প্রাণ ধরিয়া ছেলের বিবাহ
দিতে পারিতাম না। লোকের নিম্বা মাথা
পাতিয়া লইতাম!

মা হাসিয়া কহিলেন,—শোন, একবার
ছেলের কথা শোন!

মহেন্দ্র কহিল,—বৌ আসিয়া ত ছেলেকে
জুড়িয়া বসেই। ‘তখন এত কষ্টের এত
মেহের মা কোথায় গরিয়া’ যার এ যদিবা
তোমার ভাল লাগে আমার লাগে না।

রাজলক্ষ্মী মনে মনে পুলকিত হইয়া
তাঁহার সমাগতা বিধবা বাঁকে সন্মোদন
করিয়া বলিলেন,—শোন তাই বোঝ বৌ,
মহীন কি বলে শোন! বৌ পাছে মাকে
ছাড়াইয়া উঠে এই ভয়ে ও বিয়ে করিতে
চায় না। এমন স্ত্রী ছাড়া কথা কখনো
করিয়াছে?

কাকী কহিলেন,—এ তোমার বাছা বাড়াবাড়ি! যখনকার যা, তখন তাই শোভা পায়। এখন আর আঁচল ছাড়িয়া বৌ লইয়া ঘর করিবার সময় আনিয়াছে, এখন ছোট ছেলোটর মত ব্যবহার দেখিলে লজ্জা বোধ হয়!

এ কথা শ্রবণশ্রীর ঠিক মন্থর লাগিল না এবং তিনি যে ক'টি কথা বলিলেন, তাহা স্মরণ হইতে পারে, কিন্তু মধুমাখা নহে। কহিলেন—আমার ছেলে যদি অন্তের ছেলের চেয়ে মাকে বেশী ভালবাসে, তোমার তাতে লজ্জা করে কেন বেশ বৌ? ছেলে থাকিলে ছেলের মর্ম্ম হুক্তিত!

শ্রবণশ্রী মনে করিলেন, পুত্র-সৌভাগ্য-বতীকে পুরহীনা দ্রব্যা করিতেছে।

মের বৌ কহিলেন,—তুমিই বৌ আনিবার কথা পাড়িলে বলিয়া কথটা উঠিল,—নহিলে আনার অবিকার কি?

শ্রবণশ্রী কহিলেন—আমার ছেলে যদি বৌ না আসে তোমার বৃকে তাহাতে শেল বেধে কেন? বেশত এতদিন যদি ছেলেকে বাছিব করিয়া আসিতে পারি এখনো উহাকে দেখিতে শুনিতে পারিব আর কাহারো দরকার হইবে না।

মের বৌ অশ্রুপাত করিয়া নীরবে চলিয়া গেলেন। মহেন্দ্র মনে মনে আঘাত পাইলেন এবং কালোৎসাহ হইতে সফল সফল কিরিরাই তাঁহার-কাকীর ঘরে উপস্থিত হইলেন।

কাকী তাহাকে বাহা বলিয়াছিলেন তাহার মধ্যে সেহ ছাড়া আর কিছুই ছিল না ইহা সে নিশ্চয় জানিত। এবং ইহাও তাহার জানা ছিল, কাকীর একটি পিতৃমাতৃহীনা

বোন্মি আছে—এবং মহেন্দ্রের সহিত তাহার বিবাহ দিরা সম্ভবনহীনা বিধবা কোন দ্বন্দ্রে আপনায় ভগিনীর মেরেটিকে কাছে আনিয়া স্থানী দেখিতে চান। যদিও বিবাহে সে নারাজ, তবু কাকীর এই মনোগত ইচ্ছাটি তাহার কাছে স্বাভাবিক এবং অত্যন্ত কল্পনাবহ বলিয়া মনে হইত।

মহেন্দ্র তাঁহার ঘরে যখন গেল তখন বেলা আর বড় বাকী নাই। কাকী অল্পপূর্ণা তাঁহার ঘরের কাটা জানালার গরাদের উপর মাথা রাখিয়া শুক বিমর্ষভাবে বসিয়াছিলেন। পাশের ঘরে ভাত ঢাকা পড়িয়া আছে এখনো স্পর্শ করেন নাই।

অল্প কারণেই মহেন্দ্রের চোখে জল আসিত। কাকীকে দেখিয়া তাহার চোখ ছলছল করিয়া উঠিল। কাছে আসিয়া নিউ-ঘরে ডাকিল,—কাকীনা!

অল্পপূর্ণা হাসিবার চেষ্টা করিয়া কহিলেন, আর মইনু, বোস!

মহেন্দ্র কহিল—তারি ক্ষুধা পাইয়াছে প্রসাদ খাইতে চাই!

অল্পপূর্ণা মহেন্দ্রের কোণল বৃত্তিয়া উজ্জ্বলিত অশ্রু কষ্টে সঞ্চরণ করিলেন এবং নিজে খাইয়া মহেন্দ্রকে খাওয়াইলেন।

মহেন্দ্রের ক্ষদ্র তখন কল্পনার আর্দ্র ছিল। কাকীকে দায়না দিবার জন্য আহ্বারান্তে হঠাৎ মনের কোঁকে বলিয়া বলিল—কাকী, তোমার সেই যে বোন্মির কথা বলিয়াছিলে তাহাকে একবার দেখাইবে না?

কথটা উচ্চারণ করিয়াই সে তীত হইয়া পড়িল।

অন্নপূর্ণা হাসিয়া কহিলেন—তোমার আবার বিবাহে মন গেল না কি, মহীন ?

মহেন্দ্র তাড়াহাড়ি কহিল,—না, আমার লজ্জা নহে কাকী, আমি বিহারীকে রাজি করিয়াছি। তুমি দেখিবার দিন ঠিক করিয়া দাও !

অন্নপূর্ণা কহিলেন, মাগা, তাহার কি এমন ভাগা হইবে ? বিহারীর মত ছেলে কি তাহার কপালে আছে ?

কাকীর ঘর হঠাৎ বাহির হইয়া মহেন্দ্র ঘরের কাছে আনিতেই মার সঙ্গে দেখা হইল। রাজলক্ষ্মী ভিজ্ঞান করিলেন, কি মহেন্দ্র, এতক্ষণ চৌথের কি পরামর্শ হইতেছিল ?

মহেন্দ্র কহিল—পরামর্শ কিছুই না, পান লইতে আনিয়াছি।

মা কহিলেন—তোমার পান ত আমার ঘরে সাজা আছে।

মহেন্দ্র উত্তর না করিয়া চলিয়া গেল।

রাজলক্ষ্মী ঘরে ঢুকিয়া অন্নপূর্ণার হোদন-

করিতে চক্ষু দেখিবারাত্র অনেক কথা কল্পনা করিয়া লইলেন। ফোঁস করিয়া বলিয়া উঠিলেন—কি গো বেঙ্গ ঠাকরুণ, ছেলের কাছে লাগালাগি করিতেছিলে বুঝি ?

বলিয়া উত্তরমাত্র না শুনিয়া ক্রতবেগে চলিয়া গেলেন।

(২)

যেহে দেখিবার কথা মহেন্দ্র প্রায় ভুলিয়া-ছিল অন্নপূর্ণা ভোলেন নাই। তিনি ভ্রাম-বাঝারে যেহে অভিত্যাক কাঠার বাড়ীতে পত্র লিখিয়া দেখিতে যাইবার দিনস্থির করিয়া পাঠাইলেন।

দিনস্থির হইরাছে শুনিয়াই মহেন্দ্র কহিল—এত তাড়াহাড়ি কানটা করিলে কেন কাকী ? এখনো বিহারীকে বগাই হয় নাই।

অন্নপূর্ণা কহিলেন—সে কি হয় মহীন ? এখন না দেখিতে গেলে তাহার কি মনে করিবে ?

মহেন্দ্র বিহারীকে ডাকিয়া সকল কথা বলিল। কহিল—চল ত, পছন্দ না হইলে ত তোমার উপর জোর চলিবে না !

বিহারী কহিল, সে কথা বলিতে পারি না। কাকীর বোম্বুকিকে দেখিতে গিয়া পছন্দ হইল না বলা আবার মুখ দিয়া আসিবে না।

মহেন্দ্র কহিল—সে ত উত্তম কথা !

বিহারী কহিল—কিন্তু তোমার পক্ষে অন্তর কার হইরাছে মহীন বা ! নিম্নেকে হাল্কা রাখিয়া পরের দ্বন্দ্ব এক্ষণ তার চাপান তোমার উচিত নয় নাই। এখন কাকীর মনে আঘাত দেওয়া আমার পক্ষে বড়ই কঠিন হইবে।

মহেন্দ্র একটু লজ্জিত ও কষ্ট হইয়া কহিল, তবে কি করিতে চাও ?

বিহারী কহিল, যখন তুমি আমার নাম করিয়া তাঁহাকে আসা দিয়াছ তখন আমি বিবাহ করিব—দেখিতে যাইবার ভক্ত-কর্ম-বার দরকার নাই।

অন্নপূর্ণাকে বিহারী দেবীর মত ভক্তি করিত।

অবশেষে অন্নপূর্ণা বিহারীকে নিজে ডাকিয়া কহিলেন, সে কি হয় বাছা ! না দেখিয়া বিবাহ করিবে সে কিছুতেই হইবে না। যদি পছন্দ না হয় তবে বিবাহে যদ্যত

দিতে পারিবে না। এই আমার শপথ
রহিল।

নির্ভরিত দিনে মহেন্দ্র কলেজ হইতে
কিরিয়া আসিয়া মাকে কহিল—আমার সেই
রেশমের জামা এবং ঢাকাই সাড়িটা বাহির
করিয়া দাও।

মা কহিলেন, কেন, কোথায় যাবি?

মহেন্দ্র কহিল, দরকার আছে মা, তুমি
দাওনা, আমি পরে বলিব।

মহেন্দ্র একটু সাধ না করিয়া থাকিতে
পারিল না। পরের ভক্ত হইলেও কত
বেশিবার এমক নাহেই দৌরদর্শী আপনি
চুলটা একটু কিরাইরা লম্বা, চাওয়ে কিছু গন্ধ
চালে।

হুই বন্ধ কত্যা বেশিতে বাহির হইল।

কত্য়ার জ্যাঠা স্থানস্বামীরের অমুতুল
বাবু। নিজের উপার্জিত ধনের দ্বারার
উহার বাগানসমেত দিনতলা বাড়ীটাকে
পাড়ার মাথার উপর তুলিয়াছেন।

দরিদ্র ভ্রাতার স্ত্রীর পর পিতৃমাতৃহীনা
ভ্রাতৃশ্রমীকে তিনি নিজের বাড়ীতে আনিয়া
রাখিয়াছিলেন। মামী অধপূর্ণা বলিয়া-
ছিলেন, আনার কাছে থাক।—তাহাতে
ব্যয়লাষবের দুবিধা ছিল বটে কিন্তু পৌত্রব-
লাষবের ভয়ে অমুতুল রাণি হইলেন না।
এমন কি, দেখাসাক্ষ্য করিবার জন্যও
কতাকে কখনো মামীর বাড়ী পাঠাইতেন
না, নিজেদের বর্ধ্যাসামন্তে তিনি এতই
কড়া ছিলেন।

কত্যাটির বিবাহভাষনার সময় আসিল।
কিন্তু আশুপালকর দিনে কত্য়ার বিবাহ
সম্বন্ধে “গাঙ্গী ভাবনা দত্ত সিদ্ধির্ভবতি তাপসী”

কথাটা খাটে না। ভাবনার সঙ্গে ধরচও
চাই। কিন্তু শপথের কথা উঠিলেই কবিনাশ
বলেন, আমার ত নিজের ঘরে আছে, আমি
একা আর কত পারিয়া উঠিব। এমন
কিরিয়া দিন বহিয়া যাঁতেছিল। এমন
সময় সামিয়া ভবিষ্য গন্ধ মাখিয়া রক্তভূমিকে
বন্ধকে লইয়া মনোস্ত্র প্রবেশ করিলেন।

তখন চৈত্র মাসের দিবদান্তে সূর্য্য অস্তো-
মুখ। নোতলার দক্ষিণ বাতাসার চিত্রিত
ভিজন চীনের টালি গাথা; তাহারি প্রান্তে
হুই অভ্যাগতের লজ্জা রূপার রেকাবি কলমুল
নিষ্টারে শোভমান এবং বরকলমপূর্ণ রূপার
মাল শীতল শিশিরবিশ্মুদানে মণ্ডিত।
মহেন্দ্র বিহারীকে লইয়া আগন্তিক ভাবে
খাইতে বসিয়াছেন। নীচে বাগানে মালী
তখন কাঠীতে করিয়া গাছে গাছে লগ দিতে
ছিল; সেই শিল্প স্তম্ভিকার হিড় গন্ধ বহন
করিয়া চৈত্র দক্ষিণবাতাস মহেন্দ্রের শুভ্র
কুক্কিত সুবাসিত চাদরের প্রান্তকে দুর্দাম
করিয়া তুলিতেছিল। আশপাশের দার
জানালার ছিট্রাস্তরাল হইতে একটু আধটু
চাপা হাসি, কিস্ কিস্ কথা, দুটা একটা
বহনার হুং টং শব্দ শুনা যায়।

আহারের পর অমুতুল বাবু ভিতরের
দিকে চাহিয়া কহিলেন—চুনি, পান নিয়ে
আর ত রে?

কিছুকণ পরে সন্ধ্যাতের ভাবে পল্লভের
একটা দরজা খুলিয়া গেল এবং একটি বালিকা
কোথা হইতে সর্ব্বাঙ্গে রাস্মের লজ্জা লড়াইয়া
আনিয়া পানের বাটা হাতে অমুতুলবাবুর
কাছে আসিয়া দাড়াইল। তিনি কহিলেন,
লজ্জাকি মা! বাটা ঐ ওঁদের দায়নে রাখ।

বালিকা নত হইয়া কপিত হইতে পানের
বাটা অভিব্যবহার আগুনপাৰ্শ্বে তুলিতে রাখিয়া
ছিল। বায়ান্নার পশ্চিমপ্রান্ত হইতে সূর্য্যাস্ত
আত্ম তাহার লজ্জিত মুখকে মণ্ডিত করিয়া
গেল। সেই অবকাশে মহেন্দ্র সেই কল্যা-
দিতা বালিকার করুণ মুখজ্বলি দেখিয়া
লইল।

বালিকা তখন চলিয়া যাইতে উদ্যত হইলে
অহুত্বল বায়ু কহিলেন একটু দাঁড়া তুমি।
বিহারী বায়ু, এইটি আমার ছোট ভাই অপূ-
ৰ্ণ কর্তা। সে ত চলিয়া গেছে, এখন আমি
ছাড়া ইহার আর কেহ নাই! বলিয়া তিনি
দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিলেন।

মহেন্দ্রের স্বপ্নের সময় আঘাত লাগিল।
অনাথার বিকে আর একবার চাহিয়া দেখি-
লেন।

কেহ তাহার বরষ স্পষ্ট করিয়া বলিত
না। আত্মীয়েরা বলিত এই বারো তেরো
হইবে—অর্থাৎ চোদ পোনেরো হওয়ার সম্ভা-
বনাই অধিক। কিন্তু অচুগ্রহপালিত বলিয়া
একটি কুণ্ঠিত ভীষভাবে তাহার নবযৌবনা-
র সম্বন্ধে সংশয় সঞ্চিত করিয়া রাখিয়াছে।

অর্জচিত মহেন্দ্র জিজ্ঞাসা করিলেন—
তোমার নাম কি? অহুত্বল বায়ু উত্তর
দিয়া কহিলেন—বল মা, তোমার নাম বল!
বালিকা তাহার অত্যন্ত আবেশ পালনের
ভাবে নতদৃশ্যে বলিল, আমার নাম আশা-
লতা।

“আশা! মহেন্দ্রের মনে হইল, নামটি বড়
করুণ, এবং কষ্টটি বড় কোমল! অনাথা
আশা!

হই বহু পথে বাহির হইয়া আসিয়া গাড়ি

ছাড়িয়া দিল। মহেন্দ্র কহিল, বিহারী, এ
ঘেরেটিকে তুমি ছাড়িয়া না।

বিহারী তাহার স্পষ্ট উত্তর না করিয়া
কহিল, ঘেরেটিকে সেখিরা উহার মানিমা-
কেনে পড়ে; বোধ হয় অমনি লম্বী হইবে!

মহেন্দ্র কহিল—তোমার সঙ্গে যে বোকা
চোপাইলাম এখন বোধ হয় তাহার তার শুভ
শুভর বোধ হইতেছে না।

বিহারী কহিল—না, বোধ হয় সফল
করিতে পারিব।

মহেন্দ্র কহিল—কাজ কি এত কষ্ট
করিয়া! তোমার বোকা না হয় আমিই স্বল্পে
তুলিয়া লই! কি বল?

বিহারী গম্ভীর ভাবে মহেন্দ্রের মুখের
দিকে চাহিল। কহিল, মহিন্ না, সত্য বলি-
তেছ? এখনো ঠিক করিয়া বল! তুমি
বিবাহ করিলে কানী তের বেশি গুনি হই-
বে—তাহা হইলে তিনি ঘেরেটিকে সর্বদাই
কাছে রাখিতে পারিবেন।

মহেন্দ্র কহিল—তুমি পাগল হইয়াছ?
সে হইলে অনেককাল আগে হইয়া যাইত!

বিহারী অধিক আপত্তি না করিয়া চলিয়া
গেল, মহেন্দ্রও যোয়া পথ ছাড়িয়া দীর্ঘনিশ্বাস
খরিয়া বহনিলখে দীরে দীর্ঘ বাতী দিয়া
পৌছিল।

না তখন সূচিতায়া বাপারে ব্যস্ত ছিলেন
কাকী তখনো তাহার বোনবির নিকট
হইতে ফেরেন নাই।

মহেন্দ্র একা নির্জন ছানের উপর থিয়া
মাছুর পাতিয়া শুইল। কলিকাতার হৃদয়-
নিধরপুত্রের উপর তরুসপুত্রীর অর্জুণ
নিঃশব্দে আপন অপকল্প মায়াবর বিকর্ণ

মরে,—অবশেষে প্রতি-তার বিকাশে যখন সে নিজের হৃদয়টিকে দিক দিতে পারে তখনই সে অমর হয়। তখনই সে অকীর কাণ-সম্পর্কে তার নিজেরও লাভ অস্ত্র সকলেরও লাভ। আমরা হতদিন ইংরাজের নকলে সব কাজ করিতে যাঁইব ততদিন এমন কিছু হইবে না যাঁহাতে আমাদের সুখ আছে বা ইংরাজের লাভ আছে যখন নিজের মত হইব, স্বাভাবিক হইব তখন ইংরাজের কাছ হইতে যাঁহা লইব তাঁহা নূতন করিয়া ইংরাজকে ফিরাইয়া দিতে পারিব।

সে দিন নিঃশঙ্কেই আসিবে। আসিবে যে তাঁহার গুণ লক্ষণ এই দেখিতেছি আমাদের পোশাটিকাল আকোণনের বেশা অনেকটা ছুটিয়া গেছে—এখন আমরা স্বাধীন চোঁরা স্বাধীন সত্তানে আমাদের ইতিহাস বিজ্ঞান দর্শন আলোচনা করিতে হইতেছি। আমাদের ধর্ম আমাদের সমাজের প্রতিও দৃষ্টি পড়িয়াছে।

রিবেকী মহাশয় বলিষাছেন, অস্বাভাবিকতাই আমাদের বাধ। অর্থাৎ ইংরাজি-শিক্ষাকে আমরা প্রকৃতিগত করিতে পারি নাই সেই শিক্ষাই আমাদের প্রকৃতিকে আচ্ছন্ন করিতেছে—সেই জন্যই বিলাতী সভ্যতার বাহ্যভাগ লইয়া আছি তাঁহার মূল বস্তুকে আরক্ত করিতে পারি নাই।

কিন্তু তিনি আর একটা কথা বলেন নাই। কেবল ইংরাজি সভ্যতা নহে, আমাদের দেশীয় সভ্যতা সম্বন্ধেও আমরা অস্বাভাবিক। আমরা তাঁহার বাহ্যিক অঙ্গিক অংশ লইয়া যে আড়ম্বর করিতেছি তাঁহা আমাদের পক্ষে

প্রতিবন্ধক নহে, স্বাভাবিক হইতেই পারে না। কারণ মস্তক সময়ে যাঁহা সাময়িক আমাদের সময়ে তাঁহা অসাময়িক, মস্তক সময়ে যাঁহা চিরন্তন আমাদের সময়েও তাঁহা চিরন্তন।

এই যে নিয়মানিতা কালকাল বিবেক ইহাই আমাদের হয় নাই। কেবল সেই অন্তর্গত ইংরাজের কাছ হইতে আমরা ভালরূপ আদর্শ করিতে পারিতেছি না, ভারতবর্ষের কাছ হইতেও পারিতেছি না।

কিন্তু আমার এ কথা মধ্যে অন্ত্যাক্তি আছে। কালের সমস্ত ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া চক্রে পড়ে না। যে শক্তি কাজ করিতেছে তাঁহা অলক্ষ্যে সমাজ গড়িয়া তোলে বলিয়া তাঁহাকে প্রতিদিন দেখিতে পাওয়া যায় না। বিশ লক্ষণ বৎসরে ভাগ করিয়া দেখিলে তবেই তাঁহার কালের পরিচয় পাবনা যায়। আমরা যখন হতশেষের আক্ষেপ গাহিতেছি তখনো সে বিনা জবাবদিহীতে কাজ করিয়া যাঁহা হইতেছে। আমরা পরিশ্রমবশতই পরিশ্রম পান হইতে নিজেই ক্রমশঃ দীরে দীরে এক এক শাক করিয়া মুক্ত করিতেছি তাঁহা পক্ষণ বৎসর পরবর্তী বসুধার্মনের সম্প্রদায় অনেকটা পরিষ্কার করিয়া দেখিতে পাইবেন।

তখনো যে সমস্তটা সম্প্রদায়ের সম্পূর্ণ বনোন্মত হইবে তাঁহা নহে—কারণ, সঙ্গরে হতশেষের আক্ষেপ অমর—কিন্তু জিবেকী মহাশয়ের পুস্তিকাও সহিত মিলাইয়া হৃদয়ের আলোচনা করিলে তিনি অনেকটা পরিমাণে সত্যতা পাইবেন এ কথা তাঁহার পূর্ববর্তী সম্প্রদায়ের দ্বারা বলিতে পারেন।

বাঙ্গালী প্রাচীন গদ্য-সাহিত্য ।

পদকল্পতরুতে বৈষ্ণবদাস, চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতির বন্দনানুষ্ঠান একটি পদে লিখিয়াছেন :—

“যাকর রচিত মধুর রস

নিরমল গদ্য পরামর্য কীত

এক মোর গৌরচন্দ্র

আনাদিগ রাহ স্বরূপ সহিত ৫”

এই “গদ্যরস রিত” কি ভাষিতে কোকুহলী হইয়া আমি করেক বঙ্গের পূর্বে, বৈষ্ণব সাহিত্যজ্ঞ, প্রজ্ঞাম্পদ চন্দ্রাবদন দত্ত ভক্তিনিধি মহাপুরুষের প্রায় করিয়া পত্র লিখিয়াছিলেন; তিনি উত্তরে লিখিয়াছিলেন, এই ছত্রোক্ত গদ্যরস রিত একরূপ মিথ্যাকল্পেরই ভেদ, উহা পত্র-সাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত।

এ উত্তর আমার নিকট সমীচীন বোধ হয় নাই। আমার বিশ্বাস, যথাক্রমের উক্তি প্রকৃতিক কোন কোন লেখক গদ্য-ভাষার রচনা করিয়াছিলেন; অন্ততলক্ষে “সহজিয়া” মতের অনেক কথা গদ্যভাষার বিরচিত হইয়াছিল, তৎপরেই সন্দেহ নাই। আবদা যদিও চণ্ডীদাসের রচিত ভক্তগদ্যের নমুনা না পাইয়া থাকি, তথাপি পরবর্তী বহুলখ্যাত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গদ্যপুস্তিকা পাইয়াছি, তাহার অনেকগুলিতেই “সহজিয়া” মতের যথার্থ পাওয়া যায়। এই গদ্য কঠোর সমাসবদ্ধ, জটিল ভাবসমাজের পণ্ডিত মহাপুরুষের গদ্যের মত নহে। কৃষ্ণদাস কবিরাজ

রচিত “রাজনরী কথা” নামক পুস্তক হইতে একটি অংশ উদ্ধৃত করিতেছি ;—

“রূপ তিন, কি কি রূপ ৩ ভাব ১
বেত ২ গৌর ৩ ধ্যান স্বরূপ। কৃষ্ণ জিউর
পদ নাম। গুণ তিন মত ধরে। কি কি
গুণ। ভ্রমণীলা ১। বারকণীলা ২। দৌর-
নীলা ৩।” বৈষ্ণব সাহিত্যে সুপরিচিত
“সেহকড়” পুস্তিকা ধানি ১৩০৪ সালের
১ম সংখ্যা পরিবর্ত-পত্রিকায় মুদ্রিত হইয়াছে,
—ইহার রচনাও অতি সংক্ষিপ্ত, কিন্তু সম্পূর্ণ-
রূপে ভাবপ্রকাশক, যথা,—“তুমি কে।
আমি জীব। আমি উটহ জীব। থাকেন
কোথা। তাও। তাও কিরূপে হইল।
তত্ত বস্তু হইতে। তত্ত বস্তু কি কি। পদ
আত্ম। একাদেশক। ছয় রিপু ইচ্ছা।
এই সকল বেক যোগে ভাও হইল। পদ
আত্ম কে কে। পুণিবা। আপ। ভেদ।
বউ। আকাশ। একাদেশক কে কে।
কর্ম-ইচ্ছা পাচ। জ্ঞানীক পাচ। আচরণ
এক।” রূপ গোবিন্দীর কারিকার ভাষাও
ঠিক এইরূপ, যথা,—“পূর্বদাগের মূল ছই।
হঠাৎ দর্শন ও অকস্মাৎ প্রবণ। আসে তার
সেবা। তার ইংগিতে তৎপর হইয়া কার্য
করিবে। আপনাকে সাধক অভিমান ভাগ
করিবে।” একরূপ গদ্যের নমুনা অনেক
দেওয়া যাইতে পারে। কিন্তু নিশ্চয়াক্ষরী।
‘সহজিয়া’ সম্প্রদায়ের গদ্যের বিরুদ্ধে অল্প যে

অপভ্রমকে লক্ষ্য, উহা যে নিত্য সঙ্গ
তথ্যের সঙ্গেই যাব নাই।

বাংলা প্রাচীন বঙ্গীয় পুথির অল্পসংখ্যক
করিয়াছেন, তাহার অল্পতম আছেন, বহু-
সংখ্যক কবিতা-গ্রন্থের মধ্যে হু একখানি
পুর্নোক্তরূপ গদ্য পুথিকা অনেক সময়েই
হস্তগত হয়। বাহারি শিতবোধকে খানী
ত্রীর পত্র শিখবার ধারায় “ঐচ্ছিক মনসী
দিবানিশি সাধনপ্রণালী” কিংবা “শ্রম
প্রণালীর গভীর মীর তাঁর নিবাসিত,
কলেশ্বরায় সঞ্চিত” প্রভৃতি উৎকট গদ্যের
আদর্শ শ্রবণ করিয়া অস্থান করেন, বাংলা
প্রাচীন গদ্য সর্বত্রই এতরূপ সূপাঠা ছিল,
তাঁহাধিগের প্রাচীর অপনোদনের জন্য আমরা
অনেকগুলি ‘সংগ্রহ’ পুথির গদ্যের নমুনা
দেখাইতে পারি। আমরা পুরাতন কাগজ
পুথিতে পুথিতে বহুসংখ্যক চিঠি পাইয়াছি,
তাঁহাতে গদ্যের যে নমুনা পাওয়া যায়,
তাঁহাতে প্রাচীন গদ্য রচনা হওয়ার কীর্ত্তির
আমাদের যথেষ্ট কারণ নাই। ঐপুথি-
রাখার অনেকগুলি বাংলা ভাষার রচিত
ধানপত্র (তান্ত্র ফলক) পাঠায়াছিলাম, তাঁহাতে
তৎপ্রবেশ প্রচলিত প্রাচীন কথাবার্ত্তার
ভাষার নমুনা বিদ্যমান রহিয়াছে। ঐপুথির
গোবিন্দবাণিকা দেব প্রথম একখানি তন্ত্র-
শাসনের ভাষা এইরূপ;— “৭ বাঁধ
ঐচ্ছিক গোবিন্দবাণিকা দেব বিশ্বন স্বর
বিজয় মহা মহোদয়ি রজন্যবশেনোদয়ঃ ঐ-
কাক্যকোনবর্ণে বিরাটতে হনতে। রাজধানী
হস্তিনাপুর সরকার উদয়পুর পরগণা মেহের-
কুল যৌগে বোলনল অঙ্গ হামিলা অম্বা ১৮
আটার কাণি কুমি ঈনরসিংহ শর্দারো ব্রহ্ম

উত্তর দিলাম। এহাব পাঠা পক্ষ ভেট
বেগার ইত্যাদি মানা সুখে ভোগ করোক।
ইতি মন ১০৭৭ তে ১২ কার্ত্তিক।” মৎ-
সংগৃহীত এইরূপ একখানি প্রাচীন তন্ত্রকলক
স্বতন্ত্র ঐচ্ছিক কৈলাসস্ত্রে সিংহ মহাশয়
লইয়া গিয়াছেন; দেখানি এখনও ফিরিয়া
পাই নাই।

পুথাতন বাংলা পুথির শেষে কখনও
কখনও লেখকগণের বাংলা গদ্যরচনা
পাওয়া যায়। সত্বররচিত মহাত্মারতের
একখানি প্রাচীন পুথির শেষভাগে এই-
রূপ লেখা আছে—“এই অষ্টাদশ ভারত
পুথক ঐগোবিন্দরাম রাঘবের এ-বোন পত্র
অঙ্ক সাত পত উননকই সমাপ্ত হইয়াছে।
য অক্ষরবিদ্যঃ ঐঅনন্তরাম শর্দার ইহার
দক্ষিণা জয়াবধি সাম্যভাঃক্রমে অত্র পত্র
প্রতিপাল্য হইয়া সূত্রচাহ হইয়া পুথক
লিখিয়া দিলাম। মগধ দক্ষিণাহ পাইলম।
তাঁর পত্র সোমস্বরহ বঙ্গের ব্যাপিয়া পাই-
বারহ আজ্ঞা হইল। শুভমন্ত শকাব্দা ১৬০৬
সন ১১২৪ তারিখ ২৫শে কার্ত্তিক রোজ
বৃহস্পতি বার দিবা বিতীয় প্রহর গতে
সমাপ্ত। যোকায ঐলগ্ন্যম, লেখকের
নিজ হ্রাম।”

কিন্তু ছুই তিন পত বঙ্গের অপেক্ষা প্রাচীন
গদ্যের নমুনা আমরা পাই নাই। এদিকটিক
মোসাইটির ভ্রমণকারী পণ্ডিত ঐচ্ছিক
বিনোদবিহারী কাব্যার্থ “দেবভানুরত্ন”
নামক একখানি তন্ত্রের মধ্যে বিকট শব্দ-
সম্বলিত একরূপ গদ্যের কিছু নিদর্শন
আমাকে পাঠাইয়া দিয়াছিলেন। সেগুলি
মহতত্ত্বের ভাষা বলিয়াই হউক, কিংবা নিত্য

প্রাচীন বলিগাট চট্টক, তাহান অর্থ পরিগহ
করিতে আমরা নিত্যম্ অকম । ভাষা
ভাবকে লুকাটবার লজ্ঞা অধিকতর চইয়াছিল,
এই প্রবন্ধটি উক্ত ৩৫ ১ সার্বক করিয়াছে ।

‘মহাভাগ’ মহেন্দ্র পুণ্ড্রিণ চাড়া আবেগ
করেকখানি সহজ বাজালা গদ্যে রচিত পুঁনি
সম্প্রতি প্রাপ্ত চণ্ডা গিয়াছে । পাকুড়ের
রাঢ়া পুঁনিচন্দ্র বিরচিত ‘গৌরীমঙ্গল’ নামক
একখানি পুঁনির প্রারম্ভে লিখিত আছে,
“মুহুর্তিবা মৈল রাধাবরুড লখন ” এই
মুহুর্তি প্রথমখানি অতি সহজ গদ্যে রচিত ।
অরুণিম হইল ‘বৃন্দাবনলীলা’ নামক একখানি
১৫০ বৎসরের প্রাচীন গদ্য পুস্তক (খণ্ডিত)
আমার হস্তগত হইয়াছে আমি নিম্নে এই
পুস্তকখানি হইতে কতকংশ উদ্ধৃত করি-
তেছি :—“তাহান উত্তরে এক গোরা পল
চারণ পাহাড়ি পর্বতের উপরে রুকচন্দ্রের
চরণচিহ্ন দেখবৎসের এবং উঠেব এবং ছেলির
এবং মহিষের এবং আর জ’ব অনেকের
পদচিহ্ন আছেন যে দিবস দেও লইয়া সেই
পর্বতে গিয়াছিলেন সে দিবস মুরলির গানে
ফুল্লা উজান বহিরাছিলেন এবং পাসান
গলিরাছিলেন সেই দিবস এই মঙ্গল পদ-
চিহ্ন হইয়াছিলেন । গগাতে গোবর্ধনে এবং
কীমাবনে এবং চরণ পাচাড়তে এই চাণ্ডি
হানে চিহ্ন এক সবতুল টহাতে কিছু ভরতম
(ভারতবা ?) নাকী চরণ পাহাড়ির উপরে
বড় বেশ লাহি তাহান উত্তরে ছোট বেশ
লাহি তাহাতে এক লক্ষীনারায়ণের এক
সেবা আছেন, তাহান পূর্বে দক্ষিণে দেবগড় ।
• • • গোপিনাথজীর বেরান দক্ষিণ পন্ডিম
নিধুন চতুর্দিক পাকা প্রাচীর পূর্বপন্ডিম

দন পশ্চিমদিকের দেবগড় : কুন্ডের দ্বিতর
জাটতে বানসিগে এক জটানিকা অতি
গোপনিহ হান অতি কোমল নানান পুশ
বিকশিত কোকীলাদি নানান পক্ষী নানান
মত ধ্বনি করিতেছেন, ননের শৌখণ্য কে
বর্ণন করিবেক দীপ্তকাশনের মধ্যে মহেশ্বর
ও মহাবলেশ ও রাণাদিগের বহু কুঞ্জ
আছেন । নিধুবনের পশ্চিমে কিছু দূর হয়
নিরুত নিকুর যে হানে ঠাকুরাণী ও মণি
লক্ষণ লইয়া বেশদিত্য করিতেন, ঠাকু-
রাণীজীউর পদচিহ্ন অদ্যাবধি আছেন নিতা
পূজা করেন ।” অতঃপর পর্যবেগ প্রাপ্ত পন্ডীর
সম্মানসূচক ত্রিবার ব্যবহার এবং “নাকী”
প্রতীকপ অদ্ভুত বর্ণবিজ্ঞানদ্বারা বিম্বিত না
হইলে, অবশ্য স্বীকার করিতে চইবে,
এ চরনা অনাড়ম্বর ও সহজ গদ্যের নমুনা ।
পৰমতরক বৈক্যবলপেক যে ইন্দ্রিয় বৃন্দাবনের
অসিগিরি প্রাপ্ত সম্মানসূচক পদ প্রয়োগ
করিবেন, তাহাতে আগ্রহের আপত্তি কসি-
বার বা আশ্চর্যাঘিত হইবার যথেষ্ট কারণ
নাই ।

১৮২২ খৃঃ অঙ্গের সেপ্টেম্বর মাসের
ফ্রান্সনাগ মাগাজিন পত্রিকার মিঃ বেভার্লিজ
সাহেব মহারাজ নন্দকুমারের ‘সে’ করেক-
খানি বাঙ্গলা পর উদ্ধৃত করিয়াছিলেন,
শেষলির ভাষা অতি সহজ কিন্তু উহা দল-
বারের ভাষা, সমধিক পরিমাণে উদ্ধৃ পক্ষ
বিস্ত্রিত ।

একদিকে অধ্যাপক মহাপ্রবণ বাঙ্গলা-
ভাষা সমান বিড়ম্বিত করিয়া এক হাজাশব্দ
প্রয়োগিকার কষ্ট করিতেছিলেন, যথা —
“যে পাণ্ড৩ বও এই প্রাচীর বক্ষণ পণ্ড

দেখিবার কাণ্ডজন পুত্র হইয়া বকাও
 একাধার ভাৱ লওতও হইয়া তও সগালী-
 ভাৱ ভক্তিও তজন করিতেছে এবং গবা-
 পতের ভাৱ গও স্মিতি গওকীও গও-
 শিলাও গও না বুধিয়া গওগোল করিতেছে,
 এই অসুগাল ভাৱ কঠে অলসার হয়
 নাই, গলগও স্বভাব হইয়াছে। অপরদিকে
 বৈকল্যগ গদ্যকে অতি সহজ এবং সংক্ষিপ্ত
 করিয়া সাহিত্যে প্রচলিত করিতেছিলেন,
 আমরা তাহা দেখাইয়াছি। কিন্তু সনাতনের
 উর্দ্ধভাগে যেখানে হিন্দু বহুলোক মূলমান
 সন্ন্যাসের অসুগ্রহপ্রাপ্ত, যেখানে ব্রাহ্মণের
 মন্তকের চীকিট গর্বাস মূলমানী পাগড়ীর
 মধ্যে বিলীন হইয়াছিল, সেখানে যে
 বাঙ্গলা গদ্যে উর্দ্ধভাগ অগণ্যাপ্ত পরিমাণে
 প্রবেশলাভ করিলে, তাগাতে আশ্চর্যের
 বিষয় কিছুই নাই। মহাত্মা নন্দকুমারের
 লিখিত পত্রের ভাষার নমুনা এইরূপ,—
 “অত যে এ সময়ে তুমি কময় বাঁদিয়া, আমার
 উদ্ধার করিতে পার, তবেই যে হউক, নচেৎ
 আমার নাম লোণ হউল, ইহা মকরর জানিবা।
 মাগিবি ওয়া ভাৱ তথাকার গোরদার সমেত,
 মজুমদারের লিখন লক্ষিত মাহুৰ কাসেম
 এখা পৌছে তাহা করিবা এ বিষয়ে এক
 পত্র লক্ষাধিক জানিবা।” এই পত্র ১৭৫৯ খৃঃ
 অব্দের আগষ্ট মাসে লিখিত হইয়াছিল।

ভাষার এই মিশ্ররূপ বাঙ্গলাখতের ধারার
 যে ভাবে দৃষ্ট হয়, তদনেকা হাতাস্পদ ও
 উদ্ভট ঘটনা কোন দেশের সাহিত্যে প্রাপ্ত
 হওয়া সম্ভবপর নহে। বাস্তবিক নামটী লুপ্ত
 হইয়াছে কিন্তু তৎপশ্চাত্তরী স্বার্থ “ক”টি
 “কত কর্ণপহনিং” প্রকৃতি অংশে শুধু

পুস্কসংস্কারের খাতরে বড়ার রহিয়াছে।
 এ যেন হিন্দু-আমলের একটি সংস্কৃতির ডেউ
 নবাবী মন্তগারের উর্দ্ধুর লগে সন্নিহিত হই-
 য়াছে। এখানে ব্যাকরণ নিত্যই অসমর্থ;
 সংস্কৃতির অস্থবর ও বিশদ, টালমটালে
 প্রকৃতি উর্দ্ধু লগের সতিত একাধানে বসি-
 য়াছে, ব্রাহ্মণ যেন উপবীত হিঁড়িয়া স্বয়ং
 করমর্দন করিতেছেন।

সাম বহুর এতাদৃশিতা চরিত, পুস্তক-
 পরীক্ষার অসুবাদ এবং মুদ্রাক্ষর তর্কালভায়
 প্রস্তুত “প্রবোধচঞ্জিকা” প্রকৃতি কথেকথানি
 পুস্তকের তাহা অনেকটা শিওবোধকের স্বামী-
 জীর পত্র লিখিতর আদর্শের মত। ১৮০০ খৃঃ
 অব্দে কোর্ট-উটলিয়াম কলেজ স্থাপিত হয়,
 এই কলেজের সংস্কৃতশাস্ত্রের অধ্যাপকগণ বঙ্গ-
 ভাষাকে সাধারণ পাঠ্যের অন্তর্ভুক্ত্য করিতে
 বিশেষ প্রয়াস পুঁকায় করেন, তাহা না
 করিলে তাহাদের পাণ্ডিত্যভিমান বুঝা যায়।
 কিন্তু অধ্যাপক হতাপরগণ পীর ঐশ্বরীশঙ্করে
 বাঙ্গালার উপর এটী যে একটু কপাকটাক-
 পাত করেন, চুঃখিনী বঙ্গভাষা কি তাহা
 চিরদিন মনে রাখিবে? ইতিমধ্যেই
 তাহাদের সাধুকীর্তি লুপ্ত হইবার মতো
 গাঁড়াইয়াছে।

১৮১১ খৃষ্টাব্দে লণ্ডন নগরে মুদ্রিত
 স্বামীবলোচন কৃত মহারাণা কৃষ্ণচন্দ্র চারের
 জীবনচরিত সরল কথাবার্তার ভাষায় লিখিত
 একখানি অতি মূল্যবান গদ্যপুস্তক। এই
 পুস্তকের ঐতিহাসিক বিবরণের সত্যতা
 সন্দেহ হইবে এক স্থলে আমাদের সম্মুখে অগ্নিতে
 পড়ে, কিন্তু ইহা যে একজন সরল ও স্মৃতি-
 তাপী, অসুশিক্ষিত শ্রমিক ব্যক্তির লেখা তাহা

আমরা অনায়াসে গভীর করিতে পারি। এই পুত্রকথানি ঠিক বাগানীর নিজ ধরণে রচিত হইয়াছে, ইহার উপাখ্যানবস্ত্র এত সরল ও কোমলবস্ত্র যে ইহা আরম্ভ করিলে শেষ পর্য্যন্ত না পড়িয়া থাকা যায় না। ইহাতে উৎকর্ষশক্তি অস্বাভাবিক সম্বন্ধে অনেকগুলি সুসংবাদ ও গুণগণ প্রদর্শিত হইয়াছে। কক্কর মহারাজার পূর্ণপুষ্ক-গণের কীর্তি, দিয়ারউল্লার যৌবনকালের উজ্জ্বলচরিত্র, উৎকর্ষদিগের সঙ্গে নানাবিধ লইয়া বিবাদের স্থাপন, পলাশীর যুদ্ধ, দিয়ারউল্লার শোচনীয় মৃত্যু প্রভৃতি বহু বিবরণ অতি সুন্দর সরল ভাষায় বর্ণিত হইয়াছে। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে লেখক মহাশয় ইংরেজদিগের প্রতি অপের ভাবে অস্বাভাবিক লক্ষণ প্রকাশ করিয়াও অস্বাভাবিকতার বিবরণটি বাদ দিয়াছেন।

এই প্রাচীন গদ্য পুত্রকথানি হইতে আমরা নিম্নে একটা অংশ উদ্ধৃত করিলাম;—“পরে ইংরাজের বাবদীর সৈন্য পলাশীর বাগানে উপনীত হইয়া সমস্ত আরম্ভ করিল। নবাব সৈন্য সকল দেখিল যে প্রধান ২ সৈন্তগণ মনোযোগ করিয়া যুদ্ধ করে না এবং ইংরাজের অগ্নি বৃষ্টিতে মত ২ গোল আগ্রভাগ করিতেছে কি করিব ইহাতে কেহ উদ্যাক্রমে যুদ্ধ করিয়া আগ্রভাগ করিতেছে। যুদ্ধ ভাল হইতেছে না ইহা দেখিয়া নবাবের চাকর মোহনদাস নামে একজন সে নবাব সাহেবকে কহিলেনক আপনি কি করেন আপনাব চাকরেরা পরাধীন করিয়া মহা-শয়কে নষ্ট করিতে বসিয়াছে। নবাব

কহিলেন সে কেমন। মোহনদাস কহিল সেনাপতি মিরজাফরালি খান ইংরাজের সঙ্গে অন্যর করিয়া রণ করিতেছে না অতএব নিবেদন আমাকে কিছু সৈন্য দিয়া পলাশীর বাগানে পাঠান আমি বাইরা যুদ্ধ করি আপনি বাকি সৈন্য লইয়া সাবধানে থাকিবেন পুরের দ্বারে যথেষ্ট গোল রাখিবেন এবং এইক্ষণে কোন ব্যক্তিকে বিশ্বাস করিবেন না। নবাব মোহনদাসের বাক্য শ্রবণ করিয়া ভয়যুক্ত হইয়া সাবধানে থাকিয়া মোহনদাসকে পঠিল হাজার সৈন্য দিয়া অনেক আশ্বাস করিয়া পলাশীতে প্রেরিত করিলেন। মোহনদাস উপস্থিত হইয়া অত্যন্ত যুদ্ধ করিতে প্রবর্ত্ত হইল। মোহনদাসের যুদ্ধেই ইংরাজ সৈন্য পরাধীন হইল। মীরজাফরালি খান দেখিলেন একটা ভাগ হইল না যতগুলি মোহনদাস ইংরাজকে পরাভব করে আর এ নবাব থাকে তবে আশাবিধের লক্ষণেরি আগ্র বাইবেক অতএব মোহনদাসকে নিবারণ করিতে হইয়াছে। ইহা বিবেচনা করিয়া নবাবের দূত করিয়া একজন লোককে পাঠাইলেন সে মোহনদাসকে কহিল আপনাকে নবাবসাহেব ডাকিতেছেন শীঘ্র চলুন। মোহনদাস কহিল আমি রণ ভাগ করিয়া কি প্রকারে বাইব নবাবের দূত কহিল আপনি রাজাআ মনেন না। মোহনদাস বিবেচনা করিল এসকল চাতুরী এ সময় নবাব সাহেব আমাকে কেন ডাকিবেন ইহা অন্তঃকরণে করিয়া দূতের শিরশ্ছেদন করিয়া পুনরায় সমস্ত করিতে লাগিল। মীরজাফরালি খান বিবেচনা করিল বৃদ্ধি প্রদান ঘটিল পরে আশ্চর্য্য একজনকে ডাক্তার করিল তুমি ইচ্ছা

সাহেবর দৈত্য হওয়া মোহনমাসের নিকট গমন করিয়া মোহনমাসকে নষ্ট করহ। আজ্ঞা পাওয়া একজন মহাশয় মোহনমাসের নিকট গমন করিয়া অবিবাহিত মোহনমাসকে মারিল সেই বাণে মোহনমাস পতন হইল। পরে নবাবি বাণদৌর দৈত্য রূপে ভয় দিয়া পলায়ন করিয়া ইকরাভের জয় হইল।

পরে নবাব জাহেঙ্গিরদৌলা সকল বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া মনে মনে বিবেচনা করিলেন কোনমতে বন্ধা নাই আপন সৈন্ত বৈরি হইল অত্র প্রাণি এখান হইতে পলায়ন করি। ইহাই স্থির করিয়া নৌকাপরি আরোহণ করিয়া পলায়ন করিলেন। পথে ইকরাভ সাহেবের নিকটে সকল সমাচার নিবেদন করিয়া মীরজাফরখান মুরসিদাবাদের গড়েতে গমন করিয়া ইকরাভী পতাবা উঠা উঠা দিগে সকলে কুঁচি ইকরাভ মহাপরোক্ত দিগের জয় হইল। তখন সমস্ত শৌক জয় শ্রমি করিতে প্রবর্ত হইল এবং নানা ব্যস্ত ব্যস্তিতে লাগিল। বাবদৌর প্রধান ২ মহাশয় ভেটের তথা দিয়া সাহেবের নিকট সাক্ষাৎ করিলেন। সাহেব সকলকে আশ্বাস করিয়া যিনি যে কৰ্মে নিযুক্ত ছিলেন সেইই বর্ষে তাহাকে নিযুক্ত করিয়া রাজ-প্রশাসন দিলেন। মীরজাফরখানকে নবাব করিয়া সকলকে আজ্ঞা করিলেন তোমরা সকলে সাবধানপূৰ্বক রাজকৰ্ম করিবা রাজ্যের অশ্রুৎ হই এবং প্রাণালোক রূপে না পায়। সকলে আত্মহুসারে কাৰ্য্য করিতে লাগিলেন।

পরে নবাব জাহেঙ্গিরদৌলা পলায়ন করিয়া যখন চিন দিয়া অত্র প্রত্যন্ত স্থিত নবাব

ভেটের নিকট এক ফকিরের আলয় দেখিয়া নবাব কণ্ঠধ্বনি করিলেন এই ফকিরের স্থান তুমি ফকিরকে বণ কিক্ত থায়া সমগ্রী দেও একজন মহাশয় বড় পৌড়িত কিক্ত আহাৰ্য করিতে। ফকির এই বাক্য শ্রবণ করিয়া নৌকার নিকট আসিয়া 'যেবিল' অত্যন্ত নবাব জাহেঙ্গিরদৌলা বিদগ্ধবদন। ফকির সকল বৃত্তান্ত জ্ঞাত হইয়াছে বিবেচনা করিল নবাব পলায়ন করিয়া যাহ ইহাকে আমি খরিদা দিব আমাকে পুণে যথেষ্ট নিগ্রহ করিয়াছিল তাহার শোধ লব ইহাই মনে-হওয়া করিয়া কল্পিতে বলি। আহা রে তথা আমি প্রবৃত্ত করি আপনারা সকলে চৌকন করিয়া গ্রহান করন। ফকিরের প্রায় বাক্য নবাব অত্যন্ত ভুট হইল। ফকিরের ব্যক্তিগত গমন করিলেন। ফকির খাত সামগ্রীর আয়োজন করিতে লাগিল এবং নিকটে নবাব মীরজাফরখান পানের চাকর ছিল তাহাকে লবায় দিল যে নবাব জাহেঙ্গিরদৌলা পলায়ন করিয়া যাহ তোমরা নবাবকে বর। নবাব জাহেঙ্গিরদৌলা পানের শৌক এ লবায় পাশায়া অনেক মহাশয় একত্র হইয়া নবাব জাহেঙ্গিরদৌলাকে খরিদা মুরসিদাবাদে আনি-লেক।

এইরূপ সন্ধ্যা সহ্য ও ভাবপ্রকাশো-পযোগী গদ্য রচনা বাবমোহনমাসের পূর্বের এতদ্বশে প্রচলিত ছিল। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে রচিত 'কামিনীকুমার' নামক পুস্তক্রে একটি প্রস্তাব আছে, তাহার অর্থ একটুকু অংশ উদ্ধৃত করিতেছি;—“কামিনী কহিলেক তহে চোর তুমি আমার আর কি কৰ্ম করিবে তবন হুঁকার কৰ্মে সৰ্বদা

নিম্নত্ব লোকের আর এক কথা হোমনাক
 চোখ চোখ বলিয়া গজনা বা কাহাতক ডাকি
 আলি দৈত আমি তোমার নাম রামবল্লভ
 রাখিলাম। সদাগর কহিলেক যে আজ্ঞা
 মহাশয় এইরূপ কথোপকথনান্তে কলেক
 বিগেহ কামিনী কহিলেক ওহে রামবল্লভ
 এম্বার তামাক লাগ দেখি রামবল্লভ যে
 আজ্ঞা বলিয়া তামাক লাগিয়া আগবোলা
 আনিয়া ধরিয়া দিলেক এই প্রকার রাম-
 বল্লভ তামাক সংজ্ঞা কর্তে নিম্নত্ব হইলেন
 পরে ক্রমে ক্রমে তামাক লাগিতে লাগিতে
 রামবল্লভের তামাক সাগরি এমন অভ্যাগ
 হইল যে রামবল্লভ যদ্যপি ভোজনেন কিবা
 শরেন আছেন ও সেই সময়ে যদি কামিনী
 বলে ওহে রামবল্লভ কোথার গেলেনহে রাম-
 বল্লভের উত্তর আজ্ঞা তামাক লাগিতেছি।”

এইরূপ নির্দেশন প্রাচীন বঙ্গসাহিত্যে
 দৃশ্যত নহে। টংরেন প্রভাণে বঙ্গোৎপত্তির
 ঘটনা হইয়াছে—এধারণা নিম্নোক্ত ভূণ।

আটান কালে রচনা পদ্ধতিটা অনেক পরিমাণে গোবাকী গোছের ছিল, চণ্ডি কণ্ঠাবর্ত্তার ভাষা লিখিবার উপযুক্ত, একথা যেন ভাষার স্বাক্ষর করিতেন না। এইরকম কবিতাই তাহাদের মূলতঃ অবলম্বনীয় ছিল। ছেলেদের শিক্ষার জন্য আবশ্যক বিষয়গুলি বাহাতে সহজে বুঝ হইবে,—সেদিকেও তাহাদের লক্ষ্য ছিল, এই নিমিত্তেও তাহারা কবিতার পদ্ধতি হইয়াছিলেন “কুড়বা কুড়বা কুড়বা নিমো। কাঠার কুড়বা কাঠার নিমো।” প্রভৃতি পদ উৎকট হউক না কেন, বুঝ করিবার পক্ষে তত্পর কঠিন নহে।

ਵਿਭੀਸ਼ਣ: ਬਾਜਾਜ਼ ਦਾਇਕਾ 9 ਸਤਵਾਜ਼

এবার উল্লেখ যথা দেবার বিস্তৃত প্রচেষ্টা
 আরোহণের হয়। এই বৃহৎ বিনয়েই হিন্দুগণ
 কতকটা উদ্যোগী ছিলেন, অন্ততঃ এই
 জীবন সংগ্রামে পরম্পরের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বি-
 তার সুবিধার মত বাস্তবিক শরণাগত হইতে
 হ-বে, এই কাপড়কটা তাঁহারা জবজব
 করিতে পারেন নাই। তাহারা রাজনৈতিক
 ক্ষমতা বিচ্যুত হইয়াছিলেন অতরাং রাজ-
 গর্ভজ্ঞাপক টিহাস রচনা অথবা এরবারের
 আদেশ প্রচার করা অসম্ভব। অথবা নিম্ন
 দেশে দেশে প্রচেষ্টার কাপড়ক ছড় নাই।
 ভগবানের প্রতি মগন ভক্তি প্রদোষিত, অমু-
 রাপে, দোষিত গান, ধর্ম-কথা পূর্ণ পুরানো-
 ষান, বেশী হইলে দেবদেবীর মৌরব
 প্রচারের মত খীর গার্হব জীবনের অর্থ হ্রা-
 প্রেমময় কাহিনী—ইহা তাহারা শেখনী
 দ্বারা সাধন করিতেন। গদ্যমাতিতা যে হতা-
 প্ত ছিল তববিষয়ে সন্দেহ নাই। কিন্তু তাই
 বলিয়া গদ্যমাতিতার প্রচুর নিদর্শন প্রাচীন
 বঙ্গমাতিতো নাই ইহা প্রবেশ্য কথা ভুল।
 ইংরেজী ভাষায় লেখকগণের রচনা অনেক
 স্থলে সহজ ও সুন্দর ছিল। রাজা রামমোহন
 রায়ের সমকালিক এক ব্যক্তি ১৮৬৩ খৃঃ
 ভূমিকায় লিখিয়াছিলেন :—

“সর্বদেবগণ ভাবতে এক এক বাকরণ
 এসিদ্ধ আছে যদ্বারা তত্ত্বাণী লিখনে ও তত্ত্বা-
 তত্ত্ব বিবেচনা পূরক রূপে উত্তম পুথ্যসমাবে-
 শায়ণ হইল।” এই রচনার সঙ্গে তুলনা
 করিলে প্রাচীন-গদ্য রচকগণের যশের
 কোন হানি হইবার আশঙ্কা নাই।

প্রাচীন গদ্যের কয়েকটি বিশেষ প্রণালী
 ছিল তাহা উল্লেখযোগ্য। অনেক স্থলে গদ্য

রচনার পূর্বে “গদ্যছন্দঃ” এই কথাটি লিখিত দেখা যায়। পরা রচনার বৈকল্পিক ভণিতা বৈকল্পিক প্রথা প্রচলিত ছিল, গদ্য পুস্তকেও মধ্যো মধ্যো দৈর্ঘ্য ভণিতা দৃষ্ট হয়, যথা কালীকৃষ্ণাঙ্গ রচিত কামিনী কুমায়ে—“কালীকৃষ্ণ দাদ বগে পশ্চাৎ রামবল্লভের এমনি কথ হইল যে কামিনীকে আর পঠে রামবল্লভ বলিতে হয় না রাম বলিবা নাহেই রামবল্লভ তামাক সাধাইয়া মজুত।”

রাজীবলোচন সুখোপাধ্যায়ের কৃষ্ণচন্দ্র চরিতে দৃষ্ট হয় এক একটি প্যারাগ্রাফের শেষে দুইটি দাঁড়ি (।।) প্রদত্ত হইয়াছে এবং অধ্যায়ান্তের মধ্যবর্তী রচনার যে সকল স্থানে সম্পূর্ণ বিরাম চিহ্ন দেওয়া আবশ্যিক হইয়াছে সেই সকল স্থানে এক একটি দাঁড়ি (।) প্রদত্ত হইতে দেখা যায়। প্রাচীন গদ্যরচনা ভণিতে ব্যবহৃত অনেক শব্দ যে এখন অপ্রচলিত কিবা ভিন্নার্থ বোঝা হইবে তাহা আভাসিক; গদ্য পুস্তকে আমরা “সমাদান”—শুদ্ধান, “প্রকরণ”—কার্য্য, ঘটনা,—“খোদিত” বিমর্ষ, “সমতিবাদ্য”—সমযুক্ত, “অন্তকরণে করা”—মনে করা, প্রভৃতি ভাবের অর্থে ব্যবহৃত শব্দের প্রয়োগ দেখিয়াছি। “নিবেশ” এই বিভক্তিটির পূর্বে প্রায়শই একটি “র” প্রযুক্ত হইত, যথা “লোকের--দিগের” “ভূতের দিগের” “পণ্ডিতের দিগের” এইরূপ প্রয়োগ রাজা রাম মোহন রায়ের গ্রন্থবলীতে এবং প্রাচীন ভাষাবোধিনী পত্রিকা সমূহেও অনেক পাওয়া বাইবে। প্রাচীন—পুঁথির বর্ণ বিভাসকলির

অদৃষ্ট পূর্বরূপে এখন অমাব্যয় আর বিষয় হয় না মনোনীত শব্দের পূর্বে “মনোদিত” থাকিবে না—‘খাণ্ডিবে না’, কুটুম—“কুতুম”, বটে—“ভটে”, এক—“ৎক”, প্রভৃতি অনেক স্থলে দেখিতে দেখিতে আবারের চক্রে সহিয়া গিয়াছে। কৃষ্ণচন্দ্র চরিতে কোন বিশিষ্ট পণ্ডিতের কথা উল্লেখ করিবার সময় প্রায়ই “মহামোহনব্যায়” শব্দ ব্যবহৃত দৃষ্ট হয়। সূত্রভাঃ সত্তর্ঘ্যে কৃষ্ণ এই উপাধি দৃষ্ট হইবার পূর্বেও সাধারণ বাদ্যগায় ইহার যথেষ্ট প্রচলন ছিল স্বীকার করিতে হইবে।

প্রাচীনকালের পত্র লিখিবার প্রণালী দেখাইবার জন্য আমরা এইস্থলে দুইখানি পত্রের কতকংশ উদ্ধৃত করিয়া এই প্রবন্ধের উপসংহার করিব; প্রথম পত্রাংশ ৮৬৪খ্রিঃ-প্রাদ্য দিগের দেখা ১৮২৪ খ্রিঃ কালের ১৩ই ফেব্রুয়ারী এই পত্র লিখিত হয়—“দ্বিতীয় পত্রখানি ড্রেক সাহেবের মিস্ট্র দিগাজ উদ্দল লিখিয়াছিলেন, উহা রাজীবলোচন যে তাহা অগ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহাই প্রদত্ত হইল।

প্রথম পত্রাংশ —

সেবক প্রণাম নিবেদনাকাগে মহাপ্রভের
ত্রিচরণশীর্ষাঙ্গে সেবকের মঙ্গল পত্ৰ । -

সম্মতি একজন রেশম দোকানদার
জাদিলাম যে মহাপ্রভ পুনর্বার লংসার করি-
বেন এমন অভিলাষ করিয়াছেন এবং ত্রিযুক্ত
ভামগোপাল চক্রবর্তী পাত্রা অবৈধন করিয়া
ইতস্ততঃ শ্রমন করিতেছেন। এ বিবরণ শ্রবণ
করিয়া অত্যন্ত মনস্তাপ পাইয়া যে প্রকার

অন্তঃকরণে উদয় হরণ তাহা নিম্নপটে মিবে-
দন করিতেছি। ইহাতে যদি কিছু অপরাধ
হয়, তাহা ক্ষমা করিতে আজ্ঞা হইবেক।

২য় পত্র ।

“ভাট সাহেবের পত্র পাইয়া সকল সবাচার
জ্ঞাত হইলাম আপনি অনেক অনেক
শাস্ত্রমত লিখিয়াছেন এবং পূর্বে যেমন
যেমন হইয়াছে তাহাও লিখিয়াছেন এ সকলি
প্রমাণ বটে কিন্তু সর্বদেটে রাজারহিণের এট
পণ যে পরণাগত ভাগ করেন না তাহার
কারণ এই রাজা যদি পরণাগত ভাগ করেন
তবে তার রাজ্যের বাহুলা হয় না এবং
পরাক্রমেরও কুট হয়। আপনি রাজা
নহেন মহাশয় কেবল বাণীর বানিজ্য

করিবেন ইহাতে রাজার ভায় ব্যবহার কেন
অন্তএব যদি রাজ্যমত ও কক্ষবাসকে শ্রয়
এখানে পাঠান তবে ভালই নহুবা আপনকার
সহিত যুদ্ধ করিব। আপনি যুদ্ধসজ্জা করি-
বেন, কিন্তু যদি যুদ্ধ না করেন তবে পূর্বের
যে নিয়মিত রাজকর আছে এইকণ তাহাই
দিবেন আমি আপন চাকরের দিগকে আজ্ঞা
করিয়া দিলাম এবং গ্রীষ্মক কোম্পানির নামে
যে ক্রয় বিক্রয় হইবেক তাহারি নিয়ম থাকি-
বেক কিন্তু আর আর পত শাহেব লোকেরা
বানিজ্য করিতেছেন ইহারহিণের স্থানে
অধিক রাজকর লটব অন্তএব আ-নি
বিবেচক সংশয়মণ করিয়া পরের উত্তর
লিখিবেন।”

ভীমদীনেশচন্দ্র পেন ।

যুধিষ্ঠিরের দ্যুতাসক্তি ।

সমগ্র মহাভারতে বর্ণিত। যুধিষ্ঠিরের
নিকট বহুজরিতে এক যাত্র কলঙ্কের
উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। কুরুক
প্রয়োচনার প্রোণচারণের বধসৌকর্য্য
যুধিষ্ঠির আচার্য্যকে মিথ্যা করিয়া বলিয়া-
ছিলেন যে অবখামা নিহত হইয়াছেন।
পুনশ্চে বরিলো নিত্য সৌখ্যবামা নিপা-
তিতঃ ০ শেতে বিনিহতঃ ক্রমো বনে সিংহ-

শিঙগথা। ‘আপনার সেই প্রিয়তম পুত্র
অবখামা নিহত হইয়া অরণ্যপারী সিংহ
শিঙর ডার কুমিলবার শয়ান করিয়াছেন।’
অষ্টাকরে এই মিথ্যা কথা বলিয়া যুধিষ্ঠির
ক্ষান্ত হইতে পারিলেন না। অবখামা
নামাক হস্তী সেই সময় নিহত হইয়াছিল।
অব্যাক্ষত্রবীভ্রামা হতঃ কুরুক ইত্যুত। ‘রাজা
অষ্টাকরে কুরুক পথ উচ্চারণ করিলেন।’

বিশ্ব সৃষ্টিবৈশিষ্ট্য দেখানোর জন্যই বাক্য
আচরণের ক্ষতিগোচর হয় না। ভীম
ধ্বনি বসিবারস্থে যে অবস্থায় হত হইয়া-
ছেন তখন হ্রোণ চণা সংশ্লিষ্ট হইয়া
ধ্বনিকার সৃষ্টিবৈশিষ্ট্য সংশ্লিষ্টত্বের নিমিত্ত
লিখ্যাকরেন। সত্যসত্য সত্যপ্রাণ, চির-
সত্যবাদী সৃষ্টিবৈশিষ্ট্যের কথা সংশ্লিষ্ট হইয়া
আচার্য্য ধর্ম্মের ভাগ্য করিলেন।

কিন্তু এই ঘটনা যৌনিক অথবা প্রকৃতি,
তাহাতে বিশেষ সম্বন্ধ আছে। সৃষ্টিবৈশিষ্ট্য
বিষয় ভাষণে প্রকৃতি দ্বিগুণ কক্ষের চরিত্রে
বে কলক আচরণিত হইয়াছে তাহা মহা-
ভারতের আদি মহাকবির অভিপ্রেত মনে
হয় না, কারণ মহাভারতের কলকচরিত্রের
সহিত একত্র আচরণের কোন মতে সম্বন্ধ
হয় না। শিলাগুহ্র আচার্য্য ব্রাহ্মণকে
নিধন করিবার ভয় যে সৃষ্টিবৈশিষ্ট্য বিধায় বসি-
বেন, ইহাও বিচারযোগ্য নহে। সৃষ্টিবৈশিষ্ট্যের
চরিত্র আচরণের কারণে তাহার পক্ষে
একত্র আচরণ কোন মতে সম্ভব হইবে
হয় না। বিন দ্বিগুণকারণ বা কোনরূপ
স্বার্থের ভয় ভয়ের দরুন। হয় পথ হইতে
কোন কালে কেশমার বিচলিত হইবেন নাই,
তিনি যে একদিনের পুত্র ভয়ের ভয়, কৃষ্ণ-
পাণ্ডবপুত্রের অসত্যপ্রাণ হ্রোণকে বিধায়
কথা বসিয়া তাহার সৃষ্টি সাধন করিবেন
ইহা অত্যন্ত অপ্রাকৃত ও অসম্ভব। যে
কালে লোকের বিকৃত কলনার কলকচরিত্রে
কলক প্রবেশ করে, ও ভ্রাতার অপেক্ষা
কৌণসের অধিক মর্ষণীয় হয় সেই সময়
হ্রোণবৈশিষ্ট্য এই ভ্রাতার মহাভারতে প্রকৃতি
হইয়া থাকিবে।

সৃষ্টিবৈশিষ্ট্যের আদর্শ চরিত্রে দুই জন
অভিযোগ প্রকাশ ও একমাত্র উপলব্ধি। এ
বিষয়ে সংশয়ের স্থান নাই। কারণ কলকপুত্র
বিধায় ও কলকচরিত্রের মহাভারতের ভিত্তি এই
দুই জনকীড়ার। সৃষ্টিবৈশিষ্ট্যের দ্বিতীয় প্রমাণ
হইলে মহাভারতের মূল ঘটনাই প্রমাণপূর্ণ
হইয়া পড়ে। সৃষ্টিবৈশিষ্ট্যের চরিত্রে আর কোন
দোষ ছিলনা কেবল দ্বিতীয়কটি একটি
মহৎ দোষ ছিল। এই দোষট রাক্ষস
প্রকৃতি সকল অনর্থের মূল এবং যেরূপে
প্রবল রক্তপাতে এই আসক্তির প্রারম্ভিক
হয়। মহাভারতে অন্য অপর প্রাচীন ও
রাক্ষসবৈশিষ্ট্যের চরিত্রের বাসনের উল্লেখ আছে
— প্রথম দুগ্ধা, দ্বিতীয় অরাক্ষস, তৃতীয়
চরিত্রের অর্থাৎ দ্বিতীয়কটি, চতুর্থ অরাক্ষস
বিষয়ে অসত্যপ্রমাণ। সৃষ্টিবৈশিষ্ট্যের এই তৃতীয়
বাসন বাস্তব আর কোন দোষ ছিল না।
কিন্তু এট বাসন এট প্রবল ছিল যে দুই
জনকীড়ার একবার মত হইলে তিনি সত্যপুত্র
হইয়া পড়িতেন। তাহার এট আসক্তিই
মহাভারতের ঘটনাবলীর কেন্দ্রবিন্দু।

সত্যপ্রাণের দ্বিতীয় প্রমাণ হইতে প্রকৃত
পক্ষে মহাভারতের ঘটনাক্রমের আবর্তন
আরম্ভ হইল। সত্যপ্রাণ ও সৃষ্টিবৈশিষ্ট্যের দ্বিতীয়-
কীড়ার কারণে সমাপ্ত হয় সেই সময়ে কিছু
সম্বন্ধান হইতে হয়। মহাভারতের প্রথম
রচনাকালে অসত্যপ্রমাণ প্রমাণ ছিল কি না,
অথবা ঐ অংশ প্রকৃতি, এই প্রশ্ন বিচার
ও মীমাংসা যোগ্য। একবার দ্বিতীয় পর্যালোচনা
হইয়া, দ্বিতীয় দ্বিতীয় অংশের অসত্যপ্রমাণ
রাক্ষস পুনঃপ্রমাণ হইয়া, সৃষ্টিবৈশিষ্ট্যের রাক্ষসবৈশিষ্ট্য

অগ্রাগমন করিলেন । পুনর্বার ভ্রমোদন ও শকুনির নিমন্ত্রণে ইচ্ছাশত হইতে ফিরিয়া আসিয়া দ্ব্যর্থকীড়াই প্রবৃত্ত হইলেন, উহা সহসা সম্ভবপর মনে হয় না । দ্ব্যর্থ অত্যন্ত আসক্তি থাকিলেও বুধষ্টির শকুনি ও দ্ব্যর্থোদনের চরিত্রসম্বন্ধ জানিতে না পারিয়াই কীড়ায় মত্ত হইয়াছিলেন । বিজয়-ভাষ্য কিছু তাঁহার শে অজ্ঞতা ছিল না । এবং জ্যোশী ও অপর পাণ্ডবগণ যে বিজয়-ভাষ্য বুধষ্টিরকে নিবেদন করিবার চেষ্টা করেন নাট, ইহাও অসম্ভব শোধ হয় । অন্ধ দ্ব্যর্থ-রাষ্ট্রের স্বভাব প্রেক্ষণ জ্ঞান তাহাতে তিনিও বুধষ্টিরকে রাগা প্রত্যাশন করিবার পাত্র ছিলেন না । সম্ভবতঃ পূর্ষ গণের পরিবর্তে বনবাস ও অজ্ঞাতবাসের পণ হয় ও তাহাতে বুধষ্টির পুনর্বার পরাজিত হন । দ্ব্যর্থ পরীক্ষাধায়েও ভুলনার অল্পদ্ব্যর্থ পরীক্ষার বৈচিত্র্যশূন্য ও রসহীন, এবং প্রধান ঘটনাগুলি পূর্ষ পরীক্ষাধারের পুনরাবৃত্তি মাত্র ।

এই দ্ব্যর্থ পরীক্ষাধার যদি মহাভারতের ভিত্তিবস্তুর বিবেচনা করা যায় তাহা হইলে স্বীকার করিতে হয় যে যেমন আকাশভেদী

‘‘অটল অটালিকা তাহার উপযুক্ত ভিত্তি হইয়াছে । অল্প পরিসরের মধ্যে, এই কয়েক পুষ্ঠায়, বহু নানা রঙ্গের সমাবেশ, যাত প্রতিযাত, মানবচরিত্রের ক্ষুদ্রলক্ষণসমূহ সংঘর্ষ, কীড়ায় জলনা হইতে সর্বনাশের পরিণতি, রমণীয় নিগ্রহ, পণবদ্ধ বীরের ভবিষ্যৎ প্রতিশোধের ভীষণ শপথ, এবং অলৌকিক শক্তির বিকাশ রহিয়াছে, কাব্য ও সাহিত্যে তাহা অতীব বিরল । এই এক অধ্যায়ে মহাকাব্যের বহুবিধ উপাদান বর্তমান রহিয়াছে ।

বালাকণ হইতে ভ্রমোদন পাণ্ডবদ্ব্যর্থ-কাণ্ড । বুধষ্টিরের রাজধোরব তাহার জগরে শেখের ছায়া বিস্ত হইতেছিল । দ্ব্যর্থ-শ্রেষ্ঠ মাতুল শকুনির সহিত অন্ধ পিতার নিকট উপস্থিত হইয়া কহিল, পাণ্ডবগণের রাজ্যলুপ্তি আমি কার নশন করিতে পারি না, হুয় তাহাদিগের রাজ্যলুপ্তি লাভ করিব, মা পারি যুদ্ধে শরীরপাত করিব । দ্ব্যর্থোদন ঈর্ষাপূর্ণ হইলেও যুদ্ধ ব-তীত রাজ্যলুপ্তির আশি কোন উপায় তাহার মনে উদ্ভিত হয় নাট । ক্ষত্রিয়ধর্ম শকুনি জানিতেন যে, বুধষ্টির অক্ষকীড়া বাগজ্ঞ, সেই কীড়ায় তাঁহার রাজ্যহরণ করা সহজ হইবে । অক্ষ-বিজয়, শতভাগ শকুনি অবিজয় । ক্ষত্রিয়ধর্ম ত্যাগ করিয়া দ্ব্যর্থদর্শ অবলম্বন করিয়া ছিলেন । নির্লক্ষ্যের মত বলিলেন, ‘পণ আমার ধর্ম, অক্ষ ধর্ম ।’

দ্ব্যর্থরাষ্ট্রে প্রথম ক্রিকেট আশপত্তি করিলেন, কিন্তু পুস্তের রাজ্যলুপ্তি আশার অধাও লুপ্ত হইয়াছিলেন । পাণ্ডে শকুনিগ্রহ উপস্থিত হয় এই তাঁহার ভয়, ধর্মভয় বড় ছিল না । তাঁহার আদেশেই চেষ্টা-দ্ব্যর্থশক্তি, সহস্র-সুশিক্ষিত সত্তা নিশ্চিত হইল । বিজয় অন্ধ রাজ্যকে এই সংকর হইতে বিরত হইতে অহরোধ করিলেন, দ্ব্যর্থরাষ্ট্রে তাগাতে কর্ণপাত করিলেন না ।

দ্ব্যর্থ যে অনর্থের মূল, কলহের মূল, বুধষ্টির তাহা অবগত ছিলেন । দ্ব্যর্থরাষ্ট্রে-‘
‘‘প্রেরিত বিদ্বরকে এই কথা বলিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনি কি অক্ষদেবল উচিত কাণা বলিয়া স্বীকার করেন ? বিদ্বর স্পষ্ট বলিলেন, তিনি অক্ষকীড়া অহুমোদন করেন

না, হুতরাষ্ট্রকেও নিবৃত্ত করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন।

শ্রেষ্ঠ পুরুষানুগের গণকে আশ্বস্তাশ্বা ও আশ্বস্তিনীষা তুণা নিশ্চিনীয়া। যুধিষ্ঠির সে উপদেশ বিবৃত হইয়া, অক্ষজীড়ার স্বীয় নিপুণতা প্রদর্শন করিয়া সহসা আশ্বস্তাশ্বার প্রবৃত্ত হইলেন। বিদূরকে জিজ্ঞাসা করিলেন, ‘হুতরাষ্ট্রপুত্র বাতীত কোন্ কোন্ অক্ষব্রতী তথাহি বিদ্যমান আছে? বসুন, আমি তাহাদিগকে শতবার পরামর্শ করিব।’ অবশেষে বলিলেন, পুত্রশকপাঠী হুতরাষ্ট্রের কথায় তিনি দ্যুতক্রীড়ার স্বীকৃত হইতেছেন না, কেবল বিদূরের কথায় সম্মত হইতেছেন! বিদূর আনন্দে তাঁহাকে সে পরামর্শ দেন নাই, হুতরাষ্ট্রের নিরোপে তাঁহাকে আশ্বাস করিতে আসিয়াছিলেন। অবশেষে দ্যুতক্রীড়া সম্বন্ধে যুধিষ্ঠির আপনাতঃ সঙ্কল্প ব্যক্ত করিলেন। ‘যদি আমাকে সত্যমতঃ আশ্বাস না করিত, তাহা হইলে শকুনির সহিত ক্রীড়া করিতাম না; যখন আহুত হইয়াছি তখন নিবৃত্ত হইব না; ইহাই আমার সনাতন ব্রত।’ এই ক্রীড়ার যে অনর্থ ঘটিবে, তাহা দুর্বশী, বোনান্ যুধিষ্ঠির বুঝিতে পারিয়াছিলেন, কারণ ইন্দ্রপ্রভ হইতে হস্তিনানগরে সমনকালে বলিলেন, ‘তবে যেমন চক্ষুকে বিনষ্ট করে, তেঁব সেইরূপ প্রজাকে হরণ করে, নবত বহুতই পাপবৃদ্ধের দ্বারা বিধাতার বশবর্তী হইয়া থাকে।’

হস্তিনাপুরে উপনীত হইয়া যুধিষ্ঠির প্রথমে শকুনির দ্যুতক্রীড়া হইতে নিবৃত্ত করিবার চেষ্টা করেন। পাশক্রীড়া রাজনীতি নহে, শ্রেষ্ঠ সহিত কলট দ্যুতক্রীড়া পাপ-

জনক, যুদ্ধে অসমর্থ প্রেরণের, চ্যাপকার করেকটা কথা বলিলেন। কিন্তু এগুলি যুধির কথামাত্র, জনয়ের নহে। যেহেতু মন্যপাতী পানের পূর্বে সুরার নিন্দা করে, ও তৎপরেই সুরাপানেই উন্নত হয়, সেইরূপ। যদি চরোদর অতিক্রমিত না থাকিবে তাহা হইলে রাজা যুধিষ্ঠির স্রোণশী ও ত্র্যম্বকসহকারে স্বীয় রাজধানী হইতে হস্তিনাপুরে আগমন করিলেন কেন? শকুনি যুধিষ্ঠিরকে বাস ও প্রেমপূর্ণক বলিলেন ‘যদি আমাকে নিত্যই দুর্ভাগ্যবিশিষ্ট করিয়া, যদি দ্যুতক্রীড়ার একাত্মই জীত হইয়া থাকে, তাহা হইলে দ্যুত হইতে বিরত হও।’

যুধিষ্ঠিরের মৌখিক অনিচ্ছা তৎক্ষণাৎ বিলুপ্ত হইল। কহিলেন, ‘দ্যুতে আহুত হইলে নিবৃত্ত হইব না, এত আশার নিত্যব্রত।’ অতঃপর ক্রীড়ার আরোজন আরম্ভ হইল। দুর্যোধন কহিলেন, আমি সমুদ্র ঘন ও রত্ন প্রধান করিব, আমার মাতুল শকুনি আমারে প্রতিদিনই হইয়া ক্রীড়া করিবেন। যুধিষ্ঠির কহিলেন, ‘একজনের প্রতি-নিধি হইয়া অন্তর ক্রীড়া আশার মতে নিত্য অসমর্থ; বাহা হউক, ক্রীড়া আরম্ভ করা বাউক।’ অসমর্থ বলিয়া তিনি ক্ষান্ত হইলেন না, অথবা দুর্যোধনের দৃষ্টান্ত অনুসারে প্রতিদিনই নিরোপ করিলেন না। যে ব্রতের তিনি বার বার উল্লেখ করিতে ছিলেন, সেই সনাতন ব্রতের অনুসারে তিনি দুর্যোধনের সহিত ক্রীড়া করিতে বাধা, দুর্যোধনের প্রতিদিনের সহিত নহে। দুর্যোধন পনের সামগ্রী দিবেন, অথচ দুর্যোধনের দুর্ভাগ্য মাতুল ক্রীড়া করিবেন এ কিম্বদ

দ্যুত হইল? একমুহুর্তে যদি দৃষ্টিগত
কাজ হইতেন অথবা প্রতিনিধি নিয়োগ
করিতেন, তাহা হইলে তাঁহাকে কোন দোষ
লক্ষ্য করিত না। কিন্তু বাসনকে কে
জ্ঞাপন করিতে পারে? একবার দ্যুত প্রবৃত্ত
হইলে দৃষ্টিরই হিতাহিত জ্ঞান থাকিত না।
পুত্র, শকুনি, গন্ধ বাগ্র সে কেহ সমুদ্রে
আহুক, তিনি তাহারই সহিত দ্যুতে মগ্ন
হইতেন। কপটচারী শকুনি ও জন্দকণ্ঠী
দুর্গোপন ও বৃত্তান্ত অবগত ছিলেন।

দুর্গোপন ও দৃষ্টিগত অন্ধক্রীড়া হইলে
দুর্গোপন নিশ্চিত পরাসিত হইতেন। শকুনি
কেবল ক্রীড়ার পারদর্শী নহেন, কপটতা ও
জলদায় শিল্পীও। এই ক্রীড়া যে প্রায়শ্চেষ্ট
হয় নাই, তাহা স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়। যেমন
নদীর পতীরে কলি প্রবেশ করিয়াছিলেন,
সেইরূপ অক্ষয়নার চরিত্র অবিচলিত হইলেন।
শকুনি যে অন্ধবলেও কিছু দোষণ করিয়া
থাকিবেন একমুহুর্তে হয়, কারণ দ্যুতক্রীড়ার
বেস্ত্র অনিশ্চিততা থাকে ও ক্রীড়ার তাহার
কিছুই দেখিতে পাওয়া যায় না। বৃত্তান্ত
অন্ধ বিক্ষিপ্ত হইলে, তত্ত্বাবধ শকুনির ভয়
হইবে উহাই হয়। এমন কি পণ্ডিত ও প্রতি-
পন্ন বাতীত অন্ধক্রীড়া হয় না, কিন্তু এ
ক্রীড়ার তাহারও কোন উদ্বেগ নাই। প্রথম
বার অন্ধবিক্ষেপের পূর্বে দৃষ্টির দুর্গো-
পনকে বিজ্ঞানসাধন করিয়াছিলেন, 'তুমি যাহা
হাস্য ক্রীড়া করিবে, সে প্রতিপক্ষের বস্ত্র
কৈ?' দুর্গোপন করিলেন, 'আমার বস্ত্রের
মণি ও অজ্ঞাত ধন আছে, কিন্তু তুমি
অধিকার করি না।' অথচ প্রতিপক্ষ করিলেন
না। অতঃপর প্রতিপক্ষের ন্যায়োন্মেষও

হইল না। দৃষ্টির একবারও অন্ধ বিক্ষেপ
করিবার অবসর পাইলেন না। তিনি কেবল
পণ করিতে লাগিলেন ও শকুনি অন্ধবিক্ষেপে
অগ্নি করিতে লাগিলেন। দৃষ্টির কর্তৃক
অন্ধবিক্ষেপ বা দুর্গোপন কর্তৃক প্রতিপক্ষ-
জয়ও একবারও ঘটে নাই।

এই প্রথম বার অন্ধদেবতার, অর্থাৎ
ধন ও অজ্ঞাতবাস পণ রাখিয়া ক্রীড়া করি-
বার পূর্বে, শিশুভাবের অন্ধ বিক্ষিপ্ত হইয়া-
ছিল। এই বিক্ষিপ্ত বিক্ষেপ আবার দুই
অংশে বিভক্ত। প্রথম দশ বার অন্ধ বিক্ষেপ
হইলে বিহ্বল, দুর্গোপন ও শকুনির অনেক
দুর্ভাগ্য বলিগা, দৃষ্টিরই ক্রীড়া হইতে
বিরত হইতে বলিলেন। এ পর্যন্ত কোন
প্রকার বিরোধের আশঙ্কা হয় নাই।
দৃষ্টির স্বাভাবিকতার নানাবিধ ধনরহ পণ
রাখিতেছিলেন এবং শকুনি একে একে
বিনিময় লইতেছিলেন। সভায়ে চারিজন
পাতক মীরবে উপবিষ্ট ছিলেন; দ্রৌপদী
পূরমধ্যে কৃষ্ণধূম্রের সহিত প্রীতিপূর্ণ
আলাপ করিতেছিলেন। ক্রীড়ার এই সন্ধি
ও বিচ্ছেদহলে, এবং এই সভার শান্তি মধ্যে
বিচর দুর্ভাগ্য দেখিতে পাঠিতেছিলেন।
অটকীয় পূর্বে যেমন অকাল পাতক হয়
সেইরূপ প্রথম দশবার অন্ধবিক্ষেপের সময়
কাহারও মনে কোন শঙ্কা হয় নাই। ক্রমশঃ
দৃষ্টিরই পণ ভিত্তি আকার ধারণ করিতে
লাগিল। ধান্য বারে তিনি পতঙ্গদ্বয় পণ
রাখিলেন। উত্তোষ পণে ব্রাহ্মণ বাতীত
সমস্ত প্রথা পণ, চতুর্দশে সভাস্থিত চারি
পাতকের অন্ধবৃত্ত ও অগভীর গেল। পক্ষ-
দশ বারে শকুনির পণ রাখিলেন। এতদ্বয়

শকুনি কেবল আমি ভিত্তিগাম এই কথা বলিয়া অকবিকোপ করিতেছিলেন, কিন্তু এখন সুখিতিরকে ছয়সপত্ন খেঁচিয়া ও ভ্রাতৃ বিচ্ছেদ উৎপাদন করিবার মানসে কহিলেন, 'এই তোমার প্রিয়, রাজপুত্র নকুল আমাদের বন্ধিত হইল, এক্ষণে আর ক'পন রাখিয়া জীড়া করিবে?'

এ পর্বাঙ্ক সুখিতির মনে কোনরূপ আশ্রয়ানি বা নির্দোষ উপস্থিতি হয় নাই। গো, অম্ব, ধেম, ছাগ প্রভৃতি যে সকল পণ রাখিয়াছিলেন, নকুলকেও সেইরূপ পণ করিলেন। কিন্তু সহদেবকে পণ রাখিবার সময় বিচলিত হইলেন, শকুনিক বলিলেন, 'সহদেব আমার নিত্য প্রিয় ও পণের অবগোহা হইলেও ইহাকে পণ রাখিয়া তোমার সন্ত জীড়া করিবে।' অবগোহা পণ বলিয়া সুখিতির কণ্ঠস্থ হইতে হইলেন না। মন্ত্রীপুত্রদ্বয়কে ছয় করিয়া শকুনি পুনরায় জাহ্নবীক্ষেপের চেষ্টা করিলেন বলিলেন, 'ভাম ও ধনতর মন্ত্রীসকলকে অপেক্ষাও প্রিয়তর। উহারদিগকে কখনই পণ রাখিতে পারিবে না।' প্রবলমননের উদ্বেগ বৃদ্ধিতে পারিষদ সুখিতির কহিলেন, 'ত্রে নরান'ভজ হু! আমরা সাতিনয় সয়ল স্বভাবসম্পন্ন; তুমি আমাখিণের পরস্পর তেজ করিয়া বিহার অভিলষ করিয়া নিত্য অধর্মান্বিত করিতেছ।' শকুনি সুখিতিরকে বিজ্ঞপ্ত করিলেন। অনন্তর সমস্তর ও ভীমলেন পণে গৃহীত হইলে শকুনি বলিলেন, 'হে কোত্তর! তুমি বহুবিধ ধন, হস্তী ও অশ্বসমূহর এবং অস্ত্রসমূহকে ছরোদয়সুখে সমর্পণ করিয়াছ, এক্ষণে যদি অস্ত্র কিছু ধন পাও ত বল।'

সুখিতির তৎকণ্য অগ্নিনাকে পণ রাখিয়া বহু বিস্ত হইলেন। ভীম, অর্জুন, নকুল ও সহদেব ক্রীড়ারন্ত হাতে শেখ পণ্য হকের ভাণ ছিলেন। সুখিতির যে হাতে মত্ত ইহা জানপুত্র হইয়া পড়িয়াছিলেন তাহা বুঝিতে পারিষদ ও তাঁহারা কোন কথা কহেন নাই। ভীমার্জুন গো মেঘের ভাণ দুইয়ের পণস্বরূপ বিস্ত হইলেন। কিন্তু অগ্নিরের প্রতি তাঁহাদের এমন অচ্যুতভক্তি যে তাঁহারা কোনরূপ অগতি করা দূরে থাকুক কথা পণ্যও কহিলেন না। পুরুষাত্মকমে যে শিক্ষার স্বভবকনের প্রতি একপ ভক্তি প্রদর্শিত ছিল এক্ষণে তাহা অপ্রত্যাশিত বিবেচনা হয়। কিন্তু পাণ্ডবদিগের বৈধা ও সহিত্যর পত্নীকা এ পর্বাঙ্ক সমাপ্ত হয় নাই।

সুখিতিরকে অর করিয়া শকুনি ক্ষান্ত হইলেও হইতে পারিতেন, কিন্তু চর্যোপদন ও ভূতির মনস্তত্ত্ব সাধন এবং পাণ্ডবদিগের মর্ধ্যাত্মক অপমান করিবার নিমিত্ত তিনি সে অবস্থাতেও ক্ষান্ত হইলেন না। সুখিতিরকে কহিলেন, 'হে রাজন! তোমার প্রিয়তমী জৌগদী ত এখনও পরাভিৎ হইলেন নাই, অতএব তুমি তাঁহাকে পণ দাখা আপনাকে মুক্ত কর।'

দ্বাভাসম্পত্তা সুখিতিরকে সম্পূর্ণ অবিবাহ করিয়াছিল। জৌগদীকে পণ রাখা কতদূর গর্হিত কর্ম তাহা বিবেচনা করিবার তাঁহার ক্ষমতা ছিল না। শকুনির বাক্য শ্রবণ মাত্র জৌগদীকে পণ রাখিলেন। অগ্নান জ্ঞান দূরে থাকুক, পাকালীকে সগর্বে সভ্যমধ্যে বর্ণনা করিলেন। ক্রপদনন্দিনীর অলোক-সামান্য রূপ ও প সাহসেরে ঘোষিত করিলেন।

কিন্তু তিনি যে পণের অযোগ্য সে কথা
একবারও উল্লেখ করিলেন না। 'স্বাধার
স্বপ্ন লক্ষীর জ্ঞান; পাণ্ডে পশুপদ; যিনি
অনুসংগত, হস্তগত, হস্তগত, অহস্তগত,
স্বাধারস্বপ্ন ও স্বাধারস্বপ্নের তেজস্বী
প্রকৃতি তত্ত্বের অভিলষিত গুণসমূহের বিজু-
বিতা; স্বাধারস্বপ্নের সুখপদ স্বপ্নিকার জ্ঞান;
সেই সর্বজনস্বপ্নী প্রোপদীকে পণ রাখিলাম।'
অক বিবেচনায় শকুনির জয় হইল।

অকগর্ভে সে অনর্থের উপলব্ধি হইতেছিল
তাহা বলের জ্ঞান সহস্র পতিত হইল। সেই
শকুনির মহতী সত্য সহসা সংকল্প সমুদ্রের জ্ঞান
ভরসিত, চকল, কোণাঙ্গলপূর্ণ হইয়া উঠিল।
বুদ্ধবিশেষের দিকার, কুপতিগণের শোকোচ্ছ্বাস,
দুঃখতাই ও কৌরবগণের আনন্দ, একতালে
বহুবিধ শব্দ সভা হইতে উথিত হইল। কেবল
পাণ্ডবগণ মনঃস্থিরে গাঢ় স্থির রহিলেন।

দুর্গোপনের আদেশক্রমে হস্তপ্রতিকার
বধন প্রোপদীকে সভার আত্মন করিতে
গমন করিল, কহিল দ্বাতকীড়ার দুর্গোপন
ঐহাকে যুগ্মতিরের নিকট ভয় করিয়াছেন,
ও দুর্গোপনের গৃহে তাহাকে কিস্তরীক্সে
ধাকিতে হইবে তখন প্রোপদী সে কথা
সহসা বিশ্বাস করিতে পারিলেন না, মনে
করিলেন প্রতিকারী প্রোপদী বাক্য কহি-
তেছে। 'কোন রানপুত্র পদী পণ করিয়া
জাড়া করে? নিশ্চয়ই বোধ হইতেছে,
তাহা দ্বাতমদে মত হইয়াছেন; তাহার কি
অজ্ঞ কোন পণ রাখিবার জ্ঞান ছিল না?'
প্রতিকারী বধন বুঝাইয়া বলিল যে যুগ্মতির
সর্বস্বত্ব হইয়া পদীপণ রাখিয়াছিলেন, তখন
প্রোপদী ধর্মেরাজের হৃদয়ের গতি জানিতে

চাহিলেন। 'তুমি সভার পদন করিয়া যুগ-
তিরকে বিজ্ঞান কর তিনি অগ্রে আমাকে
কি আপনাকে দ্বাতমদে বিপদ করিয়াছেন?

যুগ্মতিরের নিকট কোন উত্তর না পাইয়া
প্রোপদী সভাগণের নিকট গীর্ষ কর্তব্য
জানিতে চাহিলেন। এই স্থলে পাণ্ডবগণের
প্রথম উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। 'মহাত্মা
পাণ্ডবগণ বৎসরোদ্যতি হৃৎখিত হইয়া ইতি-
কর্তব্যতা বিমূঢ় হইলেন। প্রতিকারী
প্রোপদীর প্রতি বল প্রকাশ করিতে পারিলে
না জানিয়া দুর্গোপন দুঃশাসনকে আদেশ
করিলেন, 'তুমি স্বয়ং গিয়া যাজ্ঞশেনীকে
আনয়ন কর, অবশ শকুনির তোমার কি
করিতে পারিবে?' পাণ্ডবগণ যদি অবশ
না হইবে তাহা হইলে কি দুঃশাসন বা
দুর্গোপন প্রোপদীর অপমান করিয়া জীবিত
ধাকিত? দুঃশাসন একদমনা, দ্বাভব-
সম্পন্ন পাকালীকে কে-একজন পুঙ্গব সভায়
আনয়ন করিল। দুঃশাসন আনাত হইয়া,
যুগ্মত লজ্জা ও ক্রোধে অভিভূত হইয়া
প্রোপদী সভার সকলকে দিকার দিতে
লাগিলেন, কেবল যুগ্মতিরের নিন্দা করিলেন
না। দুঃশাসন, কণ প্রকৃতি তাহাকে দানী
দানী বলিয়া পরিহাস করতে লাগিল।
সভার মুষ্টি ভিন্নরূপ হইয়া গেল।

শকুনি ও দুর্গোপনের মরণা, যুগ্মতিরকে
স্বপ্নের জ্ঞান দ্বাতকীড়ার আয়ত্ত ও এই
ভীষণ পরিণাম মহাত্মার মহাকাব্যের প্রাণ-
স্বরূপ। যেহেতু শকুনির শোণিত-মোহে
নির্দোষিত হইল তাহার প্রথম শিখা এই
সভাগৃহে দ্বাতকীড়ার আলিত হইছিল।

যে অশ্রুদ্রব হৃদয়দণ্ড বধ পরে গোপু

বুকে সমবেশ কুলদৈত্য ও মহারথীদিগকে একাকী নির্জিত করিয়াছিলেন তিনি পত্নী ভ্রোগদীর এই অসমান মেথিবা োন হইয়া ছিলেন। কিন্তু পাণ্ডবেরা সকলে তুল্যভাবে বৈধা ও কমাগপদম্পন্ন ছিলেন না। এতও কোশলমতাৎ তীম পণে পরাক্রিত বলিয়া দুর্যোধন ও ছাণ্ডাসনকে কিছু বলিতে পারিলেন না। কিন্তু তদ্রাজ্যদানবৃত্ত অস্তিত্ত্বার তীহার ক্রোধ অকস্মাৎ প্রজ্জ্বলিত হইয়া উত্তীরা সুধষ্ঠিরকে বধ করিবার নিমিত্ত বাবিত হইল। সুধষ্ঠিরকে তৎসনা করিয়া কহিলেন, পুত্রবিত্ত স্যামাজ্ঞা নারীকেও, দ্যুতপ্রিয় যাক্তি পণ স্বাধিরা ক্রীড়া করে না। আমাধের সন্মুখায় সন্মতি এবং 'তোমাকে ও আমা-দিগকে সক্রমণ দ্যুতে পরাজয় করিয়াছে। কিন্তু তুমি আমাধের সক্রমণে কনীষর বলিয়া আমি তাহাতেও ক্রোধ করি নাই।' কিন্তু পাণ্ডবব্রতদ্বিগী বালা ভ্রোগদীর ক্রোধ তিনি আবহ সহ্য করিতে পারিলেন না। সহসেবকে কহিলেন, বহাধ অস্তি অনিয়ন কর. সুধষ্ঠিরের বাহ্যর তহস্যং করিব। সুধষ্ঠিরের বাহ্যর প্রতি ক্রোধ কারণ হস্ত দ্বারা অকবিক্ষেপ করিতে হয়। চুই বাহ তহস্যং হইলে সুধষ্ঠির আর কখন দ্যুতক্রীড়া করিতে পারিবেন না।

অর্জুন বুকেবরকে কহিলেন, তোমার অকবিক্ষেপিত হুইতেছে, সক্রমণের দ্বারা তোমার বর্ধদৌরব-বিনষ্ট হইবে। 'সক্রমণে নোবাঙ্কা পূর্ণ করিও না, ধার্ষিক ষোষ্ঠ জাঠাকে অসমান করিও না।' তীবের ক্রোধ শান্ত হইল। ইহাও বীরধের পরাক্রাণ। সক্রমণের ইচ্ছা ত্রাত্বিচ্ছেদ হয়, কিন্তু পাণ্ডবেরা কিছুতে বিচ্ছিন্ন হইবেন

না। সক্রমণে, পানীনতা ঘুলি, সভা-যথো পতীর অসমান হুপল কিং ত্রাত্বপ্রণয় ধেন না পাণ্ডবের ত্রাত্বমেধ, ভক্তি ও প্রণয় অগতে আদর্শবরূপ হইয়া রহিল।

দৈত্যাকুলে যেমন প্রজ্জ্বলন জগদ্রথন করিয়াছিলেন সেইরূপ দ্যুতদাত্তের পুত্রপণের মধ্যে বিকর্ণ ছিলেন। তিনি বয়ঃ কনিষ্ঠ, একজ বয়োষোষ্ঠদিগকে ভ্রোগদীর অবস্থা বিচার করিতে অল্পরোধ করিলেন। তীহারে তেহ কিছু বলেন না দেখিয়া তিনি বলিলেন, বাগজ্ঞ ব্যাক্ত বধ হইতে দূরীভূত হইল। একপ ব্যক্তির কাগা অপ্রামাণিক। তৎপরে বিকর্ণ অত্যন্ত হস্ত ও কুটভাতের কয়েকটি কলা বলিলেন। 'এই অনিন্দিত রমণী পাণ্ডবপণের সাধারণী তাগা অধিকত সুধষ্ঠির ভ্রোগদীরে পণ স্বাধিবার পূর্বে স্বয়ঃ পরাক্রিত হইয়া উহাতে অস্বপ্নজত হইয়াছেন; এরিকে শকুনি পণাবী হইয়া ত্ত্বকার ন্যমোদ্রেক করিতেছেন; এই সকল বিচার করিয়া দেখিলে ভ্রোগদীকে ভয়পঙ্ক বলিয়া স্বাকার করিতে পারি না।' বর্তমান কালের বর্ধাধিকরণে একপ যুক্তি উপস্থিত হইলে তাহা অবলম্বন করিয়া সুদ্রাহুস্থন নানা তর্ক উপস্থিত হইত সে বিবরে সন্দেহ নাই

বিকর্ণের এই কণার দৃষ্টা মধ্যে অত্যন্ত কোণাহল সমুচিত হইল। 'তীহারে স্বয়ঃ কেননরূপ সভামত একাশ করিতে সারল করেন নাই তীহারও শকুনির নিন্দা করিতে লাগিলেন। সভার মতভেদ উপস্থিত হইয়া শকুনির দ্যুতক্রীড়ার সল বার্থ হয় এই আপদার কর্তৃক বিকর্ণের যুক্তি খণ্ডন কহিলেন। স্বর্ণকে এই কর্ণে নিদ্রুক করিয়া মহাকবি

আজি যুদ্ধ কোণের পতনই নিশ্চয়।
 হ্রোণদী কর্ণে প্রকৃতি প্রাণবৎ কিং
 আশ্রয়স্থল অবগত না থাকিতে রাধের
 প্রাণবৎক অত্যন্ত কষ্টকি করিয়া রহিত
 করিতে লাগিলেন। অজ্ঞাতকৃত অপরাধ
 বাক্যনাথ, কিং কাম্যংগে এই ঘটনা
 অতুলনীয়। এতঃশরীর্য সেই সাক্ষীকে
 কর্ণ বাক্যী বলিয়া সখোদন করিলেন,
 তাঁহাকে বিবসনা করা আশ্রয়্যের বিবর
 নহে। হ্রোণদনকে পাণ্ডব ও হ্রোণদীর
 সমুদায় বস্ত্র গ্রহণ করিতে বলিলেন।
 পাণ্ডবেরা এই কথা শুনিয়া মাত্র উত্তরীয় বস্ত্র
 প্রদান করিয়া, একমাত্র বহির্কাল ধারণ
 করিয়া সভা মধ্যে অবনত মস্তকে উপবিষ্ট
 হইলেন। তখন হ্রোণদন হ্রোণদীর এক
 মাত্র পরিধেয় বস্ত্র বনপুংক আকর্ষণ করিতে
 উদ্যত হইল।

মহাকবির ভূমিকা চিত্রিত সেই সর্বলোক-
 বিশ্বকর অপূর্ণ চিত্র যুগে যুগে জগতের
 চক্রে মোড়ান বর্ণে জাগিয়া রহিবে। প্রোণ-
 বদী পরিকীর্ণিত সেই দৃষ্ট দেখিবার ক্ষম-
 তেন কল্পনার প্রয়োজন হয় না। সং-
 জ্ঞানোত্তীর্ণ, হেইবহুধা-বচিত, শতবার-
 বিনষ্ট তোষণকটিকা নারী মহতী সভার
 ভূপতিপন এবং ভারতবর্ষের কুরুপাণ্ডব
 উপবিষ্ট রহিয়াছেন। বিকল্প অকালের
 সমুখে কুটিল চক্, হাতমুখ নহুনি
 তাঁহার সমুখে লক্ষ্যবনত যুগে বুদ্ধির।
 দ্যুতীশক্ততা পূর্ণ হইয়াছে। হ্রোণদ যুগে
 সর্বশ পিয়াছে, পতীর লক্ষ্যবনত বস্ত্র
 পতিধর্ম ও ধার, আর কি শূন্য রাখিয়া জীড়া
 করিবেন? এক পরলোক মাত্র অবশিষ্ট

আছে। এখন যদি হ্রোণদন তাঁহাকে বাক
 করিয়া বিভ্রাণ করেন নূতন দ্যুতীকীর
 তিনি কি প্রতিপন্ন রাখিবেন তহ্য হইলে
 তিনি কি উত্তর দিবে? উত্তরীকৃত
 পাণ্ডবগণ এক পার্শ্বে আসীন, হারার ভায়
 নিশ্চেষ্ট ও নিশ্চল হইয়া রহিয়াছেন, কেবল
 তাঁমসেনের ওষ্ঠাধর বিক্ষুব্ধিত ও বুদ্ধি-
 হইতেছে এবং স্বর্গমাত চক্ হ্রোণদন ও
 হ্রোণদীর আত্মযুগে করিতেছে। সভাস্থ
 লোক কুন্তিত, বিফারিত লক্ষ্যবন লোচনে
 চাহিয়া রহিয়াছেন। সভা মধ্য যুগে হ্রোণদন
 বস্ত্র প্রদারিত পূর্ণক হ্রোণদীর পরিধিত এক
 মাত্র বস্ত্র আকর্ষণ করিয়া উপক্ৰম করি-
 তেছে। কীরবগণ, নহুনি। রাধের প্রকৃতি
 হাত করিতেছে, কেবল এক মাত্র বিকর্ণ যুগ
 বিবর্তন করিয়াছেন। হারের দ্যুত প্রোণ-
 কাম্যগণ জন্তলোচনে চাহিয়া রহিয়াছে।
 হ্রোণদন দ্যুতরাষ্ট্র উৎকর্ণ হইয়া রহিয়াছেন।
 সেই ক্ষুদ্র সভার মধ্যমণিবস্ত্র পাকালনক্ষিত।
 বেষমান শরীরবষ্টি, প্রাণ তরে নহে, লক্ষ্য
 ভয়ে। বহু সংশয় বর্ষ পরে লক্ষ্যবনে
 রমণীগণ লক্ষ্য বাক্য হাতমুখে অনল কুণ্ডে
 আশ্রয়লবণ করিতেন তাঁহারও কত্রিববৎ,
 কিং হ্রোণদীর হ্রোণের নিকট তাঁহাদিগের
 তেজ কোণার? প্রোণভাগ ও কুন্ড কথা,
 লক্ষ্যভাগের তরে হ্রোণদী ভীতা হইতেছেন।
 তাঁহার এক মাত্র লক্ষ্যবন হ্রোণদী হ্রোণদন
 বনপূর্ণক প্র-ণ করিবার উযোগ করিতেছে।
 একবস্ত্র, অধোনিবী, আল্পগাহিত, আকর্ষণ-
 ক্ষুদ্রকুন্তলা, অবশুষ্ঠিতাননা, রোহদ্যমান
 পাণ্ডববহিতা সেই মধ্য বিপদের সময় কি
 করিতেছেন? ত্রয়োদশ বর্ষ পরে কীচক

যখন তাঁহার অপমান করে তখন তিনি নিশা-
কালে ভীষ্মদেবকে ক'চক বিনাশের ভার দিখা
আনিলেন। এক্ষণে পরিগণনের সাফল্যে শ্রোণীর
অপরগা, পাণ্ডবদলের প্রতি তাঁহার দৃষ্টি
নাই। ঘোর বিপদের সময় বাহ্যকে ডাকিতে
হয়, তিনি অপরদের শব্দ শুনেও শ্রোণীর
ডাকিতেছেন। 'হে মহাযোগিন্! বিখ্যাত্!
জনাধিন, গোবিন্দ, হৃৎনাশন, লজ্জা-নিবারণ,
আমার লজ্জা রক্ষা কর! আমি কোরব
সাগরে নিমগ্ন হইগছি, আমাকে উদ্ধার কর!
হৃৎনাশন শ্রোণীর বস্ত্র ধারণ করিয়া আক-
র্ষণ করিগ। কোরবঃ পাণ্ডাও সভাপ্রসঙ্গে
শ্রোণীকে আশ্রয়দাতা আশ্রয় করিয়া চক্ষু
মুগ্ধ করিলেন। সহসা এক হইল।
হৃৎনাশনের হস্তে বস্ত্র আশ্রয় এটি কিন্তু
শ্রোণী ত বিবস্ত্র। হইলেন না। হৃৎনাশন
আবার টানিল, আরও বস্ত্র আশ্রয়, কিন্তু
শ্রোণীর কোন অঙ্গ ত বস্ত্রপূত্ব হইল
না! বিশ্বরে বাকপূত্ব হইয়া হৃৎনাশন
আবার টানিল, দুই হস্তে ক্রমাগত বস্ত্র
আকর্ষণ করিতে লাগিল, তথাপি তরুণ।
একবসনা শ্রোণী অক্ষরবসনা হইলেন।
আকর্ষণ করিয়া হৃৎনাশন নানা বর্ণের নানা-
বিধ বস্ত্র প্রণীত করিগ, কিন্তু শ্রোণীর
লজ্জাবস্ত্র ধারণ করিতে সক্ষম হইল না।
সভাসভ লোক চমকিত হইয়া, নির্বিশেষ
ন্যূনে মাধবের এই মায়া নিরীক্ষণ করিতে
লাগিলেন। অবশেষে ক্রান্ত হইয়া, লজ্জিত
হইয়া, হৃৎনাশন নিমগ্ন হইল।

এই অলৌকিক কার্য্যে, সেই উৎকট
আমন্ত্রের সময়েও, কোরবের অদৃষ্টাকান
মেঘাচ্ছন্ন, অন্ধকার হইল। মেঘ গর্জনের তুল্য

ভীষ্মদেব করিলেন, 'দেব! আমি যুদ্ধে বল-
পূর্ণক এই ভারতীয় পাণ্ডা হৃৎনাশনের বক্ষ
বিশীর্ণ করিগ! রক্ষিত পান না করি, তাহা হইলে
আমি যেন পূর্ণপুরুষগণের গতিপ্রাপ্ত না হই।'
এই ভীষণ শব্দ শ্রবণ করিয়া ভীষ্মকে মন-
যোগিতপারী রাক্ষস মনে হয় না, পক্ষত ভীষণ
অপমানের ভীষণ শ্রুতিশোষণ হই বীর মনে
হয়। আবার যখন হৃৎনাশন শ্রোণীকে উচ্চ
প্রদর্শন করিলেন তখন ভীষ্ম সেই উচ্চ
গলাধাতে তর করিবেন প্রতিজ্ঞা করিলেন।
কত্রিষের অভিপাত কত্রিষ বহুতে পূর্ণ করি-
তেন। কি দৃষ্টক্রীড়ার, কি গৃহকার্য্যে, কি
রণক্ষেত্রে, কথা কখন টলিত না। যেরূপ
বস্ত্র বার্থ হইত, পুরুষের বাক্য কখন বার্থ
হইত না।

কোরবের অদৃষ্টাকান এই দৃষ্ট সভাপ্র-
সঙ্গিত মস্ত্রীকৃত মেঘে আবৃত হইল; উত্তর
গোপূহ যুদ্ধে তাহাদের মস্তকে অগ্নিনিপাত
হইল; কুরুক্ষেত্রে তাহারা দগ্ধতম হইয়া
গেল।

শ্রোণীর অপমান দৃগ করিবার নিমিত্ত
যখন দৃষ্টক্রীড় শ্রোণীকে বর দিতে চাহিলেন
তখন ক্রমবর্ধমান আত্মমুক্তি প্রার্থনা করিলেন
না, সুধিষ্টির দানব হইতে মুক্ত হউন এই বর
চাহিলেন। উনার চারিওর এতদপেক্ষা
উচ্চতর আশা বরণকালে কেন, মানবকুলে
দুর্গত।

বলবাস পূর্ণ হইলে পাণ্ডবগণ শ্রোণী
সমতিবাহারে বিরাট রাজতবনে অজ্ঞাত
বাসের নিমিত্ত উপনীত হইলেন। সুধিষ্টির
আগমনকে সুধিষ্টির রাজ সভাস্থ কক
নামক অক্ষবেদী বলিয়া পরিচয় দিলেন।

সে পূর্ণাঙ্গ ঐহ্যের দ্বাত্মিক বিবর্তিতে পরিণত হয় নাই, অথবা সেই বাসনের প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ তিনি এই কর্ম স্বীকার করিলেন, তাহা নির্ণয় করা কঠিন । কিন্তু তিনি যে দ্বাশ্রেণে পারদর্শী এ জ্ঞান অগম্য হইয়াছে নাই ।

দ্বন্দ্ববোধ বুদ্ধিতির এট চরিত্রদুর্লভতা

মহাভারতকার মহাকবির অন্তিমশ্রেণত নহে । কিন্তু ইহা কলহস্বরূপ নহে । ইহাতে বুদ্ধি-তির মানবধ আনাগিত হইতেছে । কিছু মাত্র জটী না থাকিলে বুদ্ধিতির চরিত্র মানব চরিত্র অতিক্রম করিত । এই দুর্লভতা ছিল বলিয়াই আমরা বলিতে গাহস পাই যে বুদ্ধি-তির মনুষ্য দেবতা নহেন ।

শ্রীমদেন্দ্রনাথ গুপ্ত ।

সাহিত্য-প্রসঙ্গ ।

(ক)

আলোচনা ।

(রচনাসম্বন্ধে জুব্বারের বচন ।)

সেজ মাথু আর্গল্‌ ফরানী ভাবুক জুব্বারের সহিত ইংরাজ পাঠকদের প্রথম পরিচয় করাইয়া দেন ।

বচন বাহা মনে দাগিত জুব্বার তাহা লিখিতেন কিন্তু প্রকাশ করিতেন না । ঐহ্যের রচনা প্রবন্ধরচনা নহে, এক একটি ভাবকে স্বতন্ত্ররূপে লিপিবদ্ধ করিয়া রাখা । পদ্যে যেমন সনেট, যেমন সোক, পদ্যে এই লেখাগুলি ভেদনি ।

জুব্বারের বাক্যে ঘেরায়ে এই বেধা কঙ্গল সকল তুলাকার হইয়াছিল ; তাহার সুতার চোদ বৎসর পরে এ গুলি ছাপা হয় ; তাহাও পাঠকস্বার্থের জন্ত নহে, কেবল বাহা বাহা অল্প গুলিকয়েক সমজদারের জন্ত ।

জুব্বার নিম্নের রচনার সম্বন্ধে লিখিয়াছেন আমি কেবল ধপন করি, নির্মাণ বা পত্তন করি না । অর্থাৎ তিনি ভাবগতিক পরম্পর গাঁবিয়া কিছু একটা বানাইয়া তোলে না, সচীব ভাবে বীজকে এক একটি করিয়া রোপন করেন ।

স-সার সর্গদাই চারিদিকে মুঠা মুঠা করিয়া ভাবের বীজ ছড়াইয়া দিতেছে—কিন্তু সকল ক্ষেত্র উর্বর নহে, সকল ক্ষেত্র চষা হয় নাই, সকল ক্ষেত্র খোলা পড়িয়া মাই । সেই জন্য সুহুর্থে সুহুর্থে শত শত বীজ মাটি হইয়া বার ।

জুব্বার ঐহ্যের চিত্রক্ষেত্রটি খোলা হাওয়া এবং খোলা আলোকে এমন করিয়া চবিয়া রাখিয়াছিলেন যে, সমস্ত অহরহ সে বীজ বৃদ্ধি করিতেছে ঐহ্যের মনে তাহা ভাবে

অমুরিত হওয়া উচিত, এবং ছোট ছোট দেখা শুনি এক একটা সোনার শিখের মত সম্পূর্ণ হইয়া কলিয়া থাকিত।

কোন কোন মনবী অপনার মনটিকে কলের বাগান করিয়া রাখেন, তাহারা বিশেষ বিশেষ চিত্রা ও চর্চায় ব্যস্ত। চিত্রকে আবৃত করেন; চতুর্দিকের নিতাদীর্ঘবর্ণ তীক্ষ্ণবর্ণ মনের মধ্যে অনাহুত ও অব্যাহিত ভাবে স্থান পায় না।

জুবেরার মন সে শ্রেণীর ছিল না, তাহার চিত্র কলের বাগান নহে, কসলের ক্ষেত্র।

সে কসল নানাবিধ। ধর্ম, কর্ম, কলারস, সাহিত্য কত কি তাহার ঠিক নাই।

অদ্য আমি সাহিত্য ও রচনাকলা সম্বন্ধে এক অল্পলি সংগ্রহ করিয়া পাঠকগণকে উপহার দিতে ইচ্ছা করি।

জুবেরার নিজের সম্বন্ধে বলেন, “হাছা জানিবার ইচ্ছা ছিল তাহা শিক্ষা করিতে বৃদ্ধবয়সের প্রচোদন হইল, কিন্তু তাহা জানি-
য়াছি তাহা ভাগ্যকণে প্রকাশ করিতে বৌবনের প্রয়োজন অসম্ভব করি।”

অর্থীন্ড জ্ঞানের কত চোঁটোত অভিজ্ঞতা চাই কিন্তু প্রকাশকের অস্ত্র নবীনতা আব-
শ্যক। লেখার বিষয়টির মধ্যে চিত্তাশ্র পরিত্য-
ক্ত থাকে ততই তাহার গোরব বাড়ি কিন্তু
রচনার মধ্যে চোঁটার লক্ষণ বহু অল্প থাকিবে
‘তাঁহার প্রকাশসক্তি ততই অধিক হইবে।

জুবেরার নিজে যে রচনাকলা অবলম্বন
করিয়াছিলেন সে সম্বন্ধে বলিতেছেন :—
তোমরা কথার ধারনির দ্বারা যে ফল পাইতে
চাও আমি কথার অর্থদ্বারা সেই ফল ইচ্ছা
করি, তোমরা কথার প্রাচুর্যের দ্বারা দ্বারা

চাও আমি কথার নিকটাত্মের দ্বারা তাহা
চাই, তোমরা কথার সঙ্গতির দ্বারা দ্বারা চাও
আমি কথার পুণ্যকরণের দ্বারা তাহা লাভ
করিতে প্রয়াসী। অথচ সঙ্গতিও (harmony)
ইচ্ছা করি কিন্তু তাহা স্বাভাবিক বর্ণবর্ণের
সঙ্গতি; ছোড়া বাগার নৈপুণ্যমাজের দ্বারা
যে সঙ্গতি রচিত তাহা চাই না।

বস্তুতঃ প্রতিভাশালী লেখক ও লিপি-
কূর্ণ লেখকের প্রভেদ এই যে এক জনের
রচনার সঙ্গতি এমন স্বাভাবিক এবং অখণ্ড
যে, তাহা বিশ্লেষণ করাই শক্ত, অপর
রচনার সঙ্গতি ইটের উপর ইটের দ্বারা গাঁথা
ও সাধ্যনো। প্রথমটি অজ্ঞাতমারে মুগ্ধ করে,
দ্বিতীয়টি বিভ্রাস্টনৈপুণ্যে বাহবা বণায়।

তর্কবুদ্ধ সম্বন্ধে জুবেরার বলেন—তর্ক
বিতর্কের প্রয়োজনীয়তা বহুটুকু তাহার
খড়াট তদুপেক্ষা অনেক বেশি। বিরোধ
মাত্রই চিত্রকে বর্ধিত করিয়া ফেলে। দেখানে
অন্ত সূত্রে বর্ধিত আমি দেখানে মুক।

জুবেরার বলেন, কোন কোন চিত্র
নিদের ভিত্তিতে ফল অসম্ভবিত পাবে না
কিন্তু জনার উপরিভাগে যে সারি ঢালা থাকে
সেইখান হইতেই তাহার শক্ত উঠে।

আমাদের কথা মনে পড়ে। আজকাল
আমাদের দ্বারা দ্বারা উৎসর্গ হইতেছে সে কি
বর্ধার্থ আমাদের মনের ভিতর হইতে—না,
ইয়োনি বুনিসিটি গাড়ি বোঝাই করিয়া
আমাদের প্রকৃতির উপরিভাগে যে সারি
বিছাইয়া দিয়াছে সেইখান হইতে? এ
সম্বন্ধে তর্ক তুলিলে বিরোধের স্থিতি হইতে
পারে অতএব মুক থাকাই ভাল।

সমালোচনা সম্বন্ধে জুবেরারের কতক-

গুলি মত নিয়ে অহুঁসি করিয়া বিতর্কে ।

“পূর্বে যাহা হুণ শের নাই তাহাকে অধিক করিয়া তোলা এক প্রকার নূতন স্বজন ।” এই স্বজনশক্তি সমালোচকের ।

“লেখকের মনের সহিত পরিচয় করাইয়া দেওয়াই সমালোচনার দৌলঙ্গ । দেখায় যেতুমু নিরম রক্ষা হইয়াছে কিনা তাহারই অবস্থারী করা তাহার ব্যবসায়িত কাল যটে িন্ত সেইটেই সব চেয়ে কম নয়নারী ।”

“অকল্প সমালোচনার কটিকে পীড়িত করে এবং সকল প্রকারে বাবে দিব মিথাইয়া দেয় ।”

“যেখানে দৌলঙ্গ এবং শাস্তি নাই সেখানে গুরুত সাহিত্যই নাই । সমালোচনার মধ্যেও দক্ষিণা পাকা উচিত - না থাকিলে তাহা বসার্থ সাহিত্য শ্রেণিতে গণ্য হইতে পারে না ।”

“ব্যবহার সমালোচকরা আকাটা হাঁরা বা খনি হইতে তোলা সোনার ঠিক বর যাচাই করিতে পারে না । তাহারো বণিক কিনা সেইজন্য সাহিত্য ট্যাংকশানের চলিত টাকা পরগা লইয়াই তাহাদের কারবার । তাহাদের সমালোচনার ধাঁড়িগালা আছে কিন্তু নিকষপাথর অথবা সোনা গণাইয়া দেখিবার সুচি নাই ।”

“সাহিত্যের বিচারশক্তি অতি দীর্ঘকালে জন্মে এবং তাহার সম্পূর্ণ বিকাশ অত্যন্ত বিলম্বে ঘটে ।”

“কচি লইয়া সমালোচকের উন্নত উৎসাহ, তাহাদের আকোশ, উত্তেজনা, উত্তাপ হাজির । বাক্যশব্দে তাহারো এমন ভাবে লেগে, কেবল খর্দনান্তি যথেষ্টই বাহা শোভা

পায় ! সাহিত্য মনোবাহ্যের দ্বিবি, তাহার সহিত মনোবাহ্যের আচার অল্পসংখ্যই চলা উচিত, বোধের উদ্বোধনা পিত্তের দাহ সেখানে অনুভব ।”

রচনাবিধার শব্দকে জুবেদারের উপ-বেশগুলি নিরূপিত হইল :—

“অধিক কথো দিয়া বর্ণনার চেষ্টাতেই নবীন লেখকের লেখা নষ্ট হয়, যেমন অধিক চড়া করিয়া গাহিতে গেলে গলা ধারণ হইয়া যায় । বেগ, কঠ, কমতা এবং বুদ্ধির মিতপ্রয়োগ করিতে শেখাই রচনাবিদ্যা—এবং উৎকর্ষগানের সেই একমাত্র রাস্তা ।”

“সাহিত্যে মিথ্যারপেই বড় লেখককে চেনা যায় । শৃঙ্খলা এবং অগম্যতা ব্যতীত প্রোজ্ঞতা হইতে পারে না এবং প্রোজ্ঞতা ব্যতীত মহৎ সম্ভবপর নহে ।”

“ভাল করিয়া নিখিতে গেলে স্বাভাবিক অনগ্রসত্তা এবং অত্যন্ত আশ্রয়ের প্রয়োজন ।”

পূর্নোক্ত কথাটির তাৎপর্য়া এই যে, ভাল লেখকের লিখন শক্তিতে স্বাভাবিক, কিন্তু সেই শক্তিটাকে বিচারের দ্বারা পদে পদে নিরূপিত করাটা অভ্যাসমধ্য । সেই স্বাভাবিক শক্তির সঙ্গে যখন এই অভ্যাস শক্তির সম্মিলন হয়, তখনই বসার্থ ভাল লেখা বাহির হয় । ভাল লেখক অনায়েসেই নিখিতে পারে, কিন্তু লিখিবার ক্ষমতা পদে পদে আয়াস স্বীকার করিয়া থাকে ।

“প্রাচুর্যের কমতাটা লেখকের থাকা চাই, অথচ তাহা ব্যবহার করিয়া যেন সে অপরাধী না হয় ! কারও কাগজ বৈশাঙ্গীল, পাঠকর বৈশাঙ্গীল নহে ; পাঠকের সুখা

অপেক্ষা পাঠকের মূৰ মরিয়া যাওয়াকেই বেশি ভয় করা উচিত।

“প্রতিভা মহৎকর্মাচার হুত্ৰপাত করে
কিন্তু পরিশ্রম তাহা সফল করিয়া দেয়।”

“একটা ভাল বই রচনা করিতে তিনটি
কিম্বদন্তি দরকার :— কল্পনা, বিদ্যা এবং
নৈপুণ্য। অর্থাৎ স্বভাব, পরিশ্রম এবং অভ্যাস।

“লিখিবার সময় কল্পনা করিতে হইবে
যেন বাহ্য বাহ্য কথেকতন হৃদয়স্থিত
লোকের সম্মুখে উপস্থিত আছি অথচ তাঁহা-
দিগকে লক্ষ্য করিয়া নিখিতেছি না।”

অর্থাৎ লেখা কেবল বাহ্য বাহ্য লোকের
পরিবার নোংরা হইলে হইবে না; তাহা
অনুশাসনবোধ উপযুক্ত হইবে অথচ বিশিষ্ট
মস্তকীয় পছন্দ সহিষ্ণুতা চাই।

“ভাবকে তখন সম্পূর্ণ বলা যায় যখন
তাঁহা হাতের কাছে প্রস্তুত হইয়া আসে—
অর্থাৎ যখন তাহাকে যেনম ইচ্ছা পূর্ণ
করিয়া লওয়া এবং যেখানে ইচ্ছা রাখন করা
যায়।”

অধিকাংশ লোকেরই মনে অধিকাংশ
ভাবে জড়িতমিশ্রিত অবস্থার থাকে, তাহা-
দিগকে আকারবদ্ধ ও পুঙ্খ করিয়া লইতে
না পারিলে বিনেব কাখে লাগানো যায় না।
জুহুয়ার নিজে সঙ্গীতই তাঁহার ভাবগুলিকে
আকার ও স্বাভাব্য দান করিয়া তাহাদের
প্রত্যেকটিকে যেন বাবহার যোগ্য করিয়া
রাখিয়াছেন। এইরূপে তাঁহার মনের
প্রত্যেক ভাবের সহিত স্পষ্ট পরিচয় স্থাপন
করাই তাঁহার কাজ ছিল।

“রচনা কালে, আশংকা যে কি বলিতে
চাই তাহা ঠিকই জানি না, বস্তুতঃ না বলিয়া

ফেলি। বস্তুতঃ কখনই ভাবকে সম্পূর্ণতা
এবং অস্তিত্বদান করে।”

“ভাল সাহিত্য গ্রন্থে উদ্ভূত করে না—
বুঝ করে।”

“বাহ্য বিষয়কর তাহা একবার দান
নিশ্চিত করে, বাক্য মনোহর তাহার মনোহা-
রিতা ইত্তরোত্তর বাড়িতে থাকে।”

লেখার টাইল্ সন্ধে জুহুয়ারের অনেক-
গুলি বচন আছে কিন্তু টাইল্কে বাঙ্গলায়
কি বলিব?

চণ্ডিত শর হইলেই ভাল হয়,—আল-
ভাবিক পরিভাষা সঙ্গীত ব্যবহার যোগ্য হয়
না। বাঙ্গলা “ছাঁদ” কথা টাইলের মোটা
মুটি প্রতিশব্দ বলা যাঠিতে পারে। কিন্তু
তাঁহার দোষ এই যে তথু ছাঁদ কথাটা
ব্যবহার বাঙ্গলায় রীতি নহে। বলিবার ছাঁদ,
লিখিবার ছাঁদ ইত্যাদি না বলিলে কথাটা
সম্পূর্ণ হয় না।

সংস্কৃত ভাষার হল বিশেষে রীতিনীতি
টাইল বুঝায়। ধর্ম, মাগদী-রীতি, বৈদ্য-
রীতি ইত্যাদি। মগধে যে বিশেষ টাইল
প্রচলিত তাহাই মাগদী-রীতি, বিদগ্ধের
প্রচলিত টাইল বৈদ্য-রীতি। এইরূপ,
কাল্পনিকবোধের লেখার তাহার একটি স্বকীয়
রীতিও থাকিতে পারে যুরোপীয় অলঙ্কারে
সেই টাইলেরট বহুল আদোচনা দেখা যায়।

তথাপি অসুস্থ্য করিতে বলিলে দেখা
বাইবে—রীতি অথবা ছাঁদ সঙ্গীতই টাইলের
প্রতিশব্দরূপে প্রয়োগ করিলে তাহার গ্রন্থ-
বিস্তৃত হইয়া পড়ে। একটি উদাহরণ দিই—
জুহুয়ার বলিয়াছেন, টাইলের ঢালাকিতে
দুদিয়ে না। Beware of tricks of

Style) এখানে “স্টাইল” অর্থ “ভাষা” ঠিক এভাবে চলেনা। কিন্তু একটু ঘুরাইয়া বলিলে কাজ চালান যায়;—লেখকের হৃদয়ের মধ্যে যদি চালানী থাকে তাহা বেশিমা ফুলিগো না—অথবা, লিখনরীতির চাকুরীতে ফুলিগো না! কিন্তু যেখানে টাইল কথাটা ব্যবহার করিলে সুবিধা পাওয়া যাইবে, সেখানে আমরা প্রতিপক্ষ বসাইবার চেষ্টা করিব না।

“ভূশোল্ট বলেন, মনের অভ্যাস হইতে টাইলের উৎপত্তি। কিন্তু অস্তঃপ্রকৃতির অভ্যাস হইতে বাহ্যের টাইল গঠিত তাহারাই ধন্ত।”

অতএবে আমরা সাধন করিয়া “প্রকৃতি” শব্দটা ব্যবহার করিয়াছি। মনে যে কথা আছে তাহার ইংরাজি প্রতিপক্ষ “Soul”। এ স্থলে “আত্মা” কথা বলা যায় না তাহার দার্শনিক অর্থ অত প্রকৃত। এখানে “সোল্” শব্দের অর্থ এই যে, তাহা মনের স্তর আশ্রিত নহে। মন তাহার অধীন। মন জ্বর ও চরিত্র তাহার অঙ্গ—এই “সোল্” শব্দ দ্বারা মানসিক সমগ্রতা প্রকাশ হইতেছে। “অস্তঃপ্রকৃতি” শব্দ দ্বারা যদি এই অর্থও মানসতত্ত্বের ঐক্যটি না বুঝায় তবে পাঠকরা উৎকৃষ্ট শব্দ ভাবিয়া লইবেন। জীবেরাণের কথাটার তাৎপর্য এই যে, মন ত চিন্তার বস্তু, তাহার চলনা দ্বারা কোশল লিখা হইতে পারে, কিন্তু সর্গাঙ্গীন মনুষ্যটির দ্বারা যে টাইল গঠিত হয় তাহাই টাইল বটে। সেই লিখনরীতির মধ্যে কেবল চিন্তার প্রভাব নহে, সমস্ত মাহাত্ম্য একটি সম্পূর্ণ অভ্যাস পাওয়া যায়।

‘মনের অভ্যাস হইতে নৈপুণ্য, লক্ষ্যতির অভ্যাস হইতে উৎকর্ষ এবং সম্পূর্ণতা।’

তাল লেখকমাত্রেরই একটি স্বকীয় লিখনরীতি থাকে—কিন্তু বড় লেখকের সেই রীতিটি পরিষ্কার ধরা পড়ত। তাহার মধ্যে একটি বৃহৎ অনিচ্ছিতা থাকে। এ সম্বন্ধে জীবেরার লিখিতেছেন : “বাহ্যের ভাবনা ভাব্যকে ছাড়াইয়া যায় না, বাহ্যের দৃষ্টি ভাবনাকে অতিক্রম করে না, তাহাণেরই লিখনরীতি অত্যন্ত অনিচ্ছিত হইয়া থাকে।”

মহৎ লেখকদের ভাষা অপেক্ষা ভাবনা বড় হইয়া থাকে এবং তাহাদের মানসদৃষ্টি তাহাদের ভাবনাকেও অতিক্রম করিয়া যায় তাহার। যুক্তিচর্চ চিন্তাকে লক্ষ্যন করিয়া অনেক জিনিষ সহজে গ্রহণ করিয়া থাকেন। সেই জন্য তাহাদের রীতি বাধা ছাড়া কাটা ছাঁটা নহে, তাহার মধ্যে একটি অনির্দিষ্টতা অনির্গমনীয়তা থাকিয়া যায়।

“জরাজীর্ণ রচনার কারণ এই যে, ঠিক যেটুকু আবশ্যক তার চেয়ে সে অধিক বলে অথচ যেটি বলিবার নিত্যই সেইটাই বলে; ভাল লেখার একই কারণে প্রচুর এবং পরিমিত, ছোট এবং বড় মিশ্রিত থাকে। এক কথায় ইহার শব্দ সংক্ষিপ্ত, অর্থ অসীম।”

“অভিমান্য ঠিকঠাকের ভাবটা ভাল নয়, —কি সাহিত্যে কি আচরণে শ্রী রক্ষা করিয়া চলিতে গেলে এই নিয়ম মরণ রাখা আবশ্যক।”

“কোন কোন রচনারীতির এক প্রকার পরিষ্কার খোলাখুলি ভাব আছে, লেখকের মেজাজ হইতে তাহার জন্ম। সেটা আত্মবোধ ভাল লাগিতে পারে কিন্তু সেটা চাইই চাই এমন কথা বলা যায় না।

তটেরারের পেখার এই ভণ, কিন্তু পুরাতন লেখকের তখনঃ ইহা দেখা যায় না। অতুলনীর গ্রীক সাহিত্যের ঠাইশে সত্য, স্মরণ, এবং মোহাধা ছিল কিন্তু এই খোলা খুনি ভাবটা ছিলনা। সৌন্দর্যের কতকগুলি সুখা উপাদানের সঙ্গে এই গুণটি ঠিক মিশে না। প্রবলতার সঙ্গে ইহা খাপ খাইতে পারে কিন্তু মন্যাদার সঙ্গে নহে। এই গুণটির মধ্যে এক প্রকার সাহসিকতা ও স্পর্ধা আছে বটে কিন্তু তেমন ইহার মধ্যে কেমন একটা খাপ ছাড়া বিটখিটে ভাবও আছে।”

“বাহ্য্য অর্ধেক স্তম্ভিগট সস্তই হয় তাহার্য অর্ধেক প্রকাশ করিয়াই খুনি থাকে ; এমনি করিয়াই স্তম্ভ রচনার উৎপত্তি।”

“নবীন লেখকেরা মনটাকে টহণার বেশি কিন্তু খোয়াক অতি অল্পই দেয়।”

“কাচ ঘেমন, হয়, স্তম্ভিকে সাহায্য করে, নয়, কাণ্ডা করিয়া দেয়, কথা মিনিবটিক তেমন।”

“এক প্রকারের কেতাবী ঠাইল্ আছে বাহার মধ্যে কাগজেরই গন্ধ পাওয়া যায়, বিশ্বসংসারের গন্ধ নাই ; পদার্থের তব বাহার মধ্যে হ্রস্ব, আছে কেবল লেখকীরানা।”

বই মিনিবটী ভাব প্রকাশ ও রক্ষার একটা আধারমাত্র। কিন্তু অনেক সময় সেই নিজে সর্বস্বর্ণী হইয়া উঠে। তখন সে বই পড়িয়া মনে হয় এ কেবল বই পড়িতেছি মাত্র, এ শুধা কেবল দেখা। ভাল বই পড়িবার সময় মনে থাকে না বই পড়িতেছি, ভাব এবং তবের গহিত সুখসুখী পরিচয় হয়, মধ্যস্থ পদার্থটা চোখেই পড়ে না।

“অনেক লেখক আপনায় ঠাইগটাকে কন্ কন্ করিয়া বাহারতে থাকে, লোককে মানাইতে চায় তাহার কাছে পোনা আছে বটে।”

এ রকম লেখক আপনায় ভাব সম্পত্তি লইয়া স্থির থাকিতে পারে না। একটা ভাল কিছু হাতে আসিলে সেটাকে শাস্ত্রভাবে ধরিয়া তৃপ্তি পায় না—সেটাকে বারবার বাহারিয়া তুলিতে চায়। আনন্দের মধ্যে একরকম লেখকের মধ্যে উচ্চধর্ম্মনীতি এবং হরিভক্তি লইয়া কিছু বেশি স্বমতমানি শুনা যায়—তাৎপরে, যে হরিভক্তি ভাল মিনিব তাহার প্রমাণ হয় না কিন্তু লেখকের যে তাহা আছে ইহাই আদ্য করিবার চেষ্টা প্রকাশ পায়।

“জুলভ আপাতীত ঠাইল্ ভাল, যদি মোটে কিন্তু আমি পছন্দ করি যে ঠাইগটিকে ঠিক প্রকাশ্য করা যায়।”

এ কথাটির মধ্যে গভীরতা আছে। অভাবনীর আপাতিক্রিক সৌন্দর্যকে ভাল বলিতেই হইবে তথাপি তাহা মনের ভার-স্বরূপ, তাহাতে শ্রান্তি আসে। কিন্তু যেখানে যেটি আশা করা যায় ঠিক সেইটি পাইলেই মন শান্তি ও স্বাধীন প্রভুত্ব করে, তাহাকে বিশ্বাস বা স্মরণের ধাক্কায় বাহ্যতঃ আচ্ছন্ন করিয়া দৃষ্ট করে না। বাস্তবায় যে বচন আছে, স্মরণের চেয়ে স্বস্তি ভাল। তাহারও এই অর্থ। স্বস্তির মধ্যে যে শান্তি ও গভীরতা, ব্যাপ্তি ও ক্রমবৎ আছে, স্মরণের মধ্যে তাহা নাই। এইজন্য বলা হইতে পারে স্মরণ ভাল বটে কিন্তু স্বস্তি তাহার চেয়েও প্রার্থনীয়।

(৮)

অমুবাদ ।

“ভালবেসো চিরকাল”

(Victor Hugo হইতে)

ভালবেসো চিরকাল, ভালবাসো অক্ষয়,
চলে' গেলে ভালবাসা আশা করে পলায়ন ।
ভালবাসা সেতো সেই উষার প্রাণের তান,
ভালবাসো যামিনীর বিমল মঙ্গল গান ।

তটিনী তটের কানে যে গান গাহিয়া বহ,
প্রাচীন গিরির কাছে, যে কথা অনিল কর,
তারকা মেঘের পানে, যে কথাটি কর হাসি
—কথাত্ত কথ্য সেই 'এসো দৌড়ে ভালবাসি' ।

ভালবাসা দেয় প্রাণ—দেয় চিত্তাবল,
ভালবাসা আনে প্রাণে বিশ্বাস অটল ।
মধুর কিরণ দিয়া, তোলে ছবি উল্লেষিয়া,
যশোভাতি হতে তাহা অধিক উজ্জল
—সে শুধু আনন্দছটা—আনন্দ বিমল ।

ভালবাসো ভতিনিলা না করি' খেচাল
মহান্ জনর ভাগবাণে চিরকাল ।
প্রাণের তারুণ্য আর বুদ্ধির যৌবন
উত্তরে উত্তরসহ কর সঞ্জন ।

ভালবাসো—হুখে যাতে কাটেগো জীবন,
দেখা যায় যাতে তব ও চারু নয়নে
সিগুচ-নিহিত দত্ত বিলাস-বিস্রম
—পতীর রহস্ত যত তব হিতাননে ।

এসো ভালবাসি দৌড়ে আরো বেশি করি',
প্রতিদিন গাঢ়তর হউক মিলন ।
পল্লবেতে দিন দিন তরু যার ভরি'
—তেমনি যোনের প্রেম হউক বর্ধন ।

দেন মোরা হঠ দৌড়ে ছাড়া নয়ন
যেন হঠ দৌড়ে মোরা কুণ্ডল নৌরত ।
এক ছায়াতলমাঝে বৃগল মিলন
—হুই তির প্রাণী কিস্ত একটু অশ্রুতব ।

রূপসীর রূপ খোলে কবি চারিদিকে,
নাগী সে যে দেবী—চাহে বিতরু প্রেমিকে ।
—আপন অকলঙ্কারে করে প্রণমন
হৃবিপুল ললাটের চিত্রায় নহন ।

এসো কাছে হুকরি শো চিত্ত-পরশিনি !
তুমি নিধি, তুমি বিধি, মর ছদ্মপুরে ।
এসো কাছে নেবি ওগো ! গাহিবে বর্ষনি,
বর্ষন কাঁদিবে হুখে—পেকো নাগো দূরে ।

আনবাই বৃষ্টি তব প্রাণের উল্লাস,
কবি-প্রাণে নাহি রুচে কত উপহাস ।
কবিরাই রমণীর মঙ্গল-কলস
—বাঁহে ঢালি দেয় নারী ছবি-প্রেমরস ।

আমি যে গো এ অগতে, সব চিরসত্য শুধু
করি অবেষণ,
আর সব স্মৃতিগর্ভ, তরল তরঙ্গ জানি
করিগো বর্ধন ।

চাহিনা চাহিনা আমি উন্মাদী বিতব,
সৈনিকের দল কিবা রাজার গৌরব,
আমি চাহি শুধু তব তত্ব-বিজ্ঞান
—পুঁথি মোর চোখে যবে নোদাইয়া কান্দা ।

যশোমান উচ্চ আশা আঁধির নিবেশে
হুহু করি ওঠে অগ্নি' স্বপ্ন-প্রবেশে ।
পরে সব ভয়প্রায়, ধোঁতা হয়ে উড়ে যায়,
তখন বলিগো “হায়! কি রহিল শেষে ।”

অথ সে কুহুমসম বস্ত্রে বিকালে,
 ছুটিয়া অমনি করে নিঃর বাতালে
 —কি গোলাপ, কি পঞ্চক, কিবা নারগেণ—
 তখন বলিগো “হায়! সব হল শেষ”।

প্রতি শুধু বাকি এবে —নার! দেবী কুমি,
 মলিন কব্জ অতি এই মর্ত্যকুমি।
 যদি চাও ইষ্টদেবে করিতে রক্ষণ,
 রক্ষিতে চাহগো যদি আত্মারে আপন,
 যদি চাহ স্বাধিকারে ধরম অক্ষত,
 পবিত্র প্রেমেরে রক্ষা কোরোগো সতত ।

ছবিমাঝে রক্ষা কর নিতীক-পরগে
 —হোকনা বতই কষ্ট দপ্তর-বেদন—
 সেই হতাপন বাহা না তর নিকাপ
 —সেই সে কুহুম বাহা না জ্ঞানে মরণ ॥

—২—

গ্রন্থ-সমালোচনা ।

(গ)

লিপি সংগ্রহ । ৮ দুর্গাপ্রসাদ
 মিত্রের পত্র । ত্রিবিদ্যে বিহারী মিত্র সঙ্ক-
 লিত । মূল্য ৯০/০ আনা ।

এই পত্রগুলি সংগ্রহ করিয়া এবং পুস্তক-
 কারে প্রকাশিত করিয়া ঐশ্বর্য্য বিনোদ
 বিহারী বাবু যে বঙ্গদেশের কৃতজ্ঞতাজ্ঞান
 হইয়াছেন, এ বিষয়ে কোন সন্দেহ থাকিতে
 পারে না । প্রত্নলেখক ৮ দুর্গাপ্রসাদ মিত্র,
 স্বাক্ষা স্বাধিকারের সমসাময়িক লোক ।
 সঙ্কলনকারী বিনোদ বাবু ছদ্মিকার লিখিয়া-
 ছেন যে “এই সকল পত্র ইংরাজী ১৮২১ সাল
 হইতে ১৮২৫ সালের মধ্যে লিখিত হইয়া-
 ছিল । তখন বিদ্যাসাগর ও অক্ষয়কুমার দত্ত

মহাপ্রসঙ্গ নিত্য শ্রুতি ছিলেন ।” সেই
 সময়েও কেমন সুন্দর বাংলা লিখিত হইতে
 পারিত, তাহার পরিচয় আমরা তাহা স্বাধ-
 িকরণ স্বাদের রচনা হইতে ও সমালোচ-
 পুস্তক হইতে পাঠিতে পারি । রচনার প্রশংসা
 কারিতেছি বলিয়া কেহ বেন মনে না করেন
 যে, এই পুস্তকের রচনাগতি ও বর্তমান
 রচনাগতি ত্রিষ্ একই জিনিষ । তাহা
 হইলে ত এই পত্রগুলিকে আমরা জ্ঞান মনে
 করিতাম । কিন্তু এগুলি যে ভাল নহে, তাহার
 প্রশংসা আমরা পাইরাছি । রচনার শাণীনতাই
 এই সকল পত্রের প্রধান গুণ নহে । ইহাদের
 প্রধান গুণ—সংসার জ্ঞানের তীক্ষ্ণতা ও
 প্রগাঢ়তা এবং লেখকের ভাবের উদারতা ও
 সমীচিনতা এই “লিপি সংগ্রহে” যে সকল
 উপাদেশ ও সুন্দর কথা আছে, তাহা উদ্ধৃত
 করিয়া দেখাইবার স্থান আমাদের নাই ।
 থাকিলেও, বোধ হয় তাহা করিতাম না ।
 আমাদের অভিলাষ, আমাদের পাঠকবর্গ ও
 সাধারণে এই পুস্তক রচনা পাঠ করেন ।
 অর্থনাশ ও মনস্তাপ, ইহার কোনটাই
 বেদনা অসুতব করিতে হইবে না ।

ষট্চক্র ও ষট্চক্র গীতাবলি ।
 ত্রিরাশদাস মুখোপাধ্যায় প্রণীত । মূল্য ৯০
 দুই আনা ।

এই কুহুম পুস্তকখানি যে বোগ-শাস্ত্রের
 একটি নিগূঢ় বিবরণাত্মক, তাহা পুস্তকের
 নামেই বুঝা যায় । ইড়া, পিঙ্গলা, জ্যুয়া
 প্রভৃতি নাকীর নাম এবং প্রাণ, অপান,
 সমান, উদান, ব্যান প্রভৃতি বায়ুর নাম বোধ
 হয় অনেকেই অবগত আছেন, কিন্তু এই
 সকল নামে কি বুঝায়, তাহা কেহ জানেন

কি ? গ্রন্থকার অর্থাৎ কি এই সকল নানী ও
ব্যবস্থার অবস্থান, প্রকৃতি ও কারণ পরীক্ষা
করিয়া দেখিয়াছেন ? যদি দেখিয়া থাকেন
তু বুঝিয়া থাকেন, তাহা হইলে এই পুস্তকে
তাহা বুঝাইয়া-বলা কর্তব্য ছিল। যদি না
বুঝিয়া থাকেন, তাহা হইলে এই পুস্তক
বিধিবার কোনই প্রয়োজন ছিল না। গ্রন্থ-
কার নিজেই বলিয়াছেন -

“যোগীশ্বর জানে যোগবলে।”

আমরা যোগী নহি, যোগবলেরও কোন
লাবি রাখি না, কালেই কিছুমাত্র বুঝিতে
পারিলাম না।

ভাসাতত্ত্ব। ভাবতত্ত্ববীর অর্থাৎ ভাবের
তত্ত্বাবলীকরণ। ত্রিঐনাথ সেন প্রণীত। প্রথম
খণ্ড। মূল্য ১/- এক টাকা।

গ্রন্থকার মাতৃভাষার প্রতি বিশেষ অধু-
রাগী এবং তাহার বিতৃষ্ণতা রক্ষার চেষ্টা
বিস্তারিত। গ্রন্থ প্রণয়নে মস্তিষ্কচারণাও
যে অনেক করিয়াছেন, তাহার প্রমাণ এই
গ্রন্থের সর্বত্রই বিদ্যমান। তথাচ অনেক
স্থলে গ্রন্থকারের সহিত আমরা এক মত
হইতে পারিলাম না। এই পুস্তকের ‘অনু-
বন্ধে’ ত্রিঐনাথ বাবু বলিয়াছেন—“প্রাকৃত
বলিলে অনেক ‘লক্ষ্য’ প্রকৃতির প্রাকৃত
মানে করেন, কিন্তু তাহা নয়। ‘লক্ষ্য’
যে প্রকার বলিতেন তাহাও প্রাকৃত ছিল,
আমরা এখন বেদন বলি তাহাও প্রাকৃত।
এই পুস্তকে আমরা যখন প্রাকৃত ভাবের
উদ্দেশ্য করিব তখন যেন পাঠকগণ ‘লক্ষ্য’
ভিন্ন লক্ষ্যাদির প্রাকৃত মানে না করেন।”

এই পুস্তক যথাকে তাহা হয় নাই
করিলাম; কিন্তু প্রাকৃত বলিলে যখন একটা
অর্থ ভাবকে বুঝায়, তখন বাঙ্গালা, হিন্দি
ও কৃত্তিকে প্রাকৃত বলিবার কি যে প্রয়োজন,
তাহা বুঝা যেন না। ল্যাটিন হইতে উৎপন্ন
হইলেও ইতালীয়, ফরাসী, স্পেনীয় ভাষা
যেমন অর্থ অর্থ ভাষা, সংস্কৃত হইতে
উৎপন্ন হইলেও প্রাকৃত, বাঙ্গালা, হিন্দি,
উড়িয়া অর্থ অর্থ ভাষা। ইহাদের প্রাকৃত-
মের অর্থ অর্থ ভাষা ও ব্যাকরণ আছে এবং
ধারা আনন্দক। প্রাকৃত বলিতে লোকে
লক্ষ্যাদির ভাবাই বুঝিয়া আসিতেছে,
বুঝিয়া থাকে এবং বুঝিতে থাকিবে; পৃথিবী-
তত্ত্ব ত্রিঐনাথবাবু এবং পৃথিবীতত্ত্ব সাহিত্য-
মতা মাঝে খুঁড়িয়া মরিয়াও বাঙ্গালা, ও হিন্দি
প্রকৃতি বুঝাইতে ‘প্রাকৃত’ শব্দে ব্যবহৃত
হইবে না।

ত্রিঐনাথ বাবু বলেন যে, লক্ষ্যাদি কথিত-
কারে লিখিত সংস্কৃত ভাষা—লোকে যে
ইহাকে সংস্কৃত হইতে অর্থ একটা বিশেষ ভাষা
মানে করে তাহা ভ্রম। সংস্কৃত ভাষাই যে
বাঙ্গালা ভাষার মূল, তথ্যবয়ে কেহ কোন
কালে অর্থও সম্বন্ধ কবে নাহি; কিন্তু তথাপি
বাঙ্গালা যে বিশেষ ভাষা, তাহা অস্বীকার করি-
বার যথ্য নাই। দৃষ্টান্ত প্রদানের স্থান নাই,
বোধ হয় প্রয়োজনও নাই; কিন্তু অনেক
পাঠক, সাহিত্যিক, ইংরেজি, ফরাসী প্রকৃতি
শব্দ যে বাঙ্গালায় প্রবেশ করিয়াছে, ইহা
সকলেই অবগত আছেন। এই সকল শব্দের
উদ্দেশ্য ও একত্রে অসম্ভব। তবে কি বলিয়া

ক — “প্রাকৃত ও অর্থবিক ভাবতত্ত্ববীর আধাভাষাগুলি সাক্ষ্য ভাবে সংস্কৃত হইতে উৎপন্ন হইয়া
এতদূর পর্যন্ত গেলো” — দেখক

বাক্যটিকে নিঃশব্দে না বলিব ? পরের কাছে বাক্য করণ যেনমণার হানি আছে, তাহা নিঃশব্দে ; কিন্তু ধরে যখন করিতেই হইয়াছে, তখন তাহা লুপাইবার চেষ্টা করা কেন ?

এক আখণ্ডি মন্তব্য কিংবৎ হস্তগতকও হইয়াছে। ইন্দ্রনাথ বাবুর মতে, সংস্কৃত ‘আসীৎ’ শব্দ লিখিতে যখন দীর্ঘ ঙ্গেকার লাগে, তখন বাঙ্গলাতেও ‘আছিল’ বা ‘ছিল’ না লিখিয়া ‘আসীন’ বা ‘চীন’ লেখা কর্তব্য — “দীর্ঘ ঙ্গেকার না দিয়া আমরা ব্রহ্ম ইকার দিয়া থাকি তাহা অবৈধিত।” রহত এই যে, ইন্দ্রনাথ বাবু নিকটে এই গ্রন্থের সর্বত্রই এই ‘অবৈধিত’ কথ্য করিয়াছেন। এক প্রেমীর উপদেশটা আছেন, তাহোটা বলেন যে—আমি বাহ্য করি তাহা করিও না, আমি তাহা বলি তাহাই কর। একজন উপদেশটোর উপদেশ যে ভাগিনা বহিবে, ইহা অব্যক্তব্য। বাঙ্গলা লেখকদিগের মধ্যে এমন বৃন্দচন্দ্রী নিকটবর্তী কে আছে যে, ইন্দ্রনাথ বাবুর ব্যবস্থা অনুসারে কাৰ্য্য করিয়া অনগত হস্তাংশপন হইবে ? ইংরেজী ব্যাকরণের একটা সূত্র এই যে, খাবহারের বিক্ষেপে কোন আপিল নাই (There is no appeal against the decree of usage)। দীর্ঘিত তাহা সত্ত্বেও সর্বক্ষেপে এই সূত্র খাটে। সংস্কৃত সূত্র তাহা ; তাহাকে ব্যাকরণের নাগপানে বাধিয়া রাখা সম্ভব হইতে পারে। তথাপি তাহাতে আৰ্ঘ্য প্রয়োগ প্রকৃত, বিকল্প দিচ্ছি। সূত্র ; অর্থাৎ, সকল স্থলে ব্যাকরণ, খাটে না, চলে না, কপূর্ণ অব্যবহিত্য সন্নিহিত দাঁড়ায়। বাঙ্গলা দাবীত তাহা ; তাহাকে কি সূত্র

সংস্কৃত ভাষার ব্যাকরণের খুঁটি নাড়িতে আবদ্ধ করিয়া রাখা সম্ভব ? এই অসাধ্য সাধনের এক আভাষণ বাহারী উক্তি। পড়িয়া লাগিয়াছেন, তাহাদের বিবাহ প্রণয়না অনায়াসেই করা যায়, কিন্তু বুদ্ধির প্রণয়না করিতে উত্তমতঃ করিতে হয়।

বাঙ্গালার অনেকে “কার” কথাটা বঙ্গীয় ‘ক’ দিয়া লিখিয়া থাকেন। ইন্দ্রনাথ বাবু বলেন, এটা ভুল, কেননা, সংস্কৃত কাৰ্ণা শব্দের যটা সম্ভাব্য বা কাণা লিখিতে যে সম্ভাব্য ব লাগে, তাহা নামান্তর বহু বিশেষ্যের দ্বিতীয়া শ্রেণীর বাক্যকেও জানে। ভুলনা করি, তাহাও বলাগে ইন্দ্রনাথ বাবু জানেন যে, সংস্কৃত কথাটা বলিও ‘কার্ণা’, কিন্তু প্রাকৃত কথাটা ‘কন্ড’। বাঙ্গলা কথাটা যে সংস্কৃত সন্ধরে প্রাকৃত হইতে উৎপন্ন নহে, তাহা কে বলিল ?

তথাপি এই গ্রন্থ পাঠ করিতে সকলকেই সম্মোহিত করি। ইহাও জ্ঞাতব্য কথা অনেক আছে। ইহার গুণ আছে বলিগাই এত কথা আনয়া বলিমান। এখানে প্রথম খণ্ড। ভরণ্য করি, অনতিবিলম্বে ইহার দ্বিতীয় খণ্ড লেখিতে পাইব।

উদাহরণ। ত্রিচাকড়ি বন্দোপাধ্যায় বিরচিত। মূল্য ১/০ এক টাকা হইল।

এই, উপজ্ঞানখানি পড়িয়া আশ্চর্যের মনে বৃন্দগত হর্ষ ও বিবাদের উত্তর হইয়াছে। হর্ষ, প্রেক্ষাক্ষেপ ক্রমতা দেখিয়া। বিবাদ, প্রেক্ষাক্ষেপ ক্রমতাশালী, প্রেক্ষানি। ত্রেনন ভাল হয় নাই।

এই উপজ্ঞানের প্রধান গুণ, ইহার ভাষা ! এমন সূত্র তাহা, এমন ক্রমের চন্দ্রিকাশাল

এমন হৃদয় করিয়া বক্তব্য কথা বর্ণনায় ভরী, আত্মকাল্পার উপজ্ঞানে বড় দক্ষিতে পাই না।

কুত্র কুত্র চিত্র অঙ্কিত করিতে পাঁচকড়ি বাবু বেণ কক্ষতা আছে। প্রথম পরিচ্ছেদেই যে চিত্রখানি অঙ্কিত হইয়াছে, তাহা হৃদয় হইয়াছে—বেণ এক খানি কোটোগ্রাফ। এই রূপ হৃদয় হৃদয় কুত্র চিত্র আরও আছে।

কিন্তু কুত্র কুত্র বড় চিত্র অঙ্কিত করিতে পারা এক; কুত্র চিত্রগুলিকে অব্যর্থত করিয়া একটা বিশাল চিত্রপট আঁকা আর। পাঁচকড়ি বাবু প্রথমোক্ত রকমে স্ততকার্য্য; বিতৌলোক্ত রকমে বার্ষ-প্রগাণ। এই পুস্তকের কুত্র চিত্রগুলি বিশেষ প্রবাসনীয়; কিন্তু পুস্তকখানি মোটের উপর তেনন প্রশংসনীয় নহে।

উপজ্ঞান সেপনের ও নাটকীয় ক্ষমতা থাকি আবশ্যক, কেননা তাঁহাকে মানবচরিত্র চিত্রিত করিতে হয়। পাঁচকড়ি বাবু সে ক্ষমতা আছে; কিন্তু তাহা অজিও বিকশিত হয় নাই। এই উপজ্ঞানের মুখ্য চরিত্র উমাকেই দেখ। প্রথমে তাহাকে দেখণ ভাবে চিত্রিত করিয়াছেন, তাহাতে উমা একটি আত্ম জীবন্ত মাহুয় হয় নাই—একটি রক্ত মাংসের বেদান্ত দর্শন হইয়াছে মায়। পাঁচকড়ি বাবুর সাংসারিক মানবদৃষ্টি ছাড়িয়া দিয়া, তাঁহার বিবাহ, বৃদ্ধি ও জ্ঞান একত্র করিলে বাহ্য হয়, উমা ভাট। এক স্থলে উমা সকল অবস্থা জানিয়াও স্বামীকে বলিতেছে—“তোমার দেখা করতাই হবে। কেবল দেখা নয়, • • •” পাঁচকড়ি বাবু স্বর্ণের চিত্রই আঁকিতে গিয়াছিলেন;

আমাদের হৃদয়গা এই যে, তাহা নরকের চিত্র হইয়া পাড়িয়াছে।

পাঁচকড়ি বাবুর লেখ এই যে, তিনি চরিত্র চিত্রনে, সেই চরিত্র হইতে আপনাকে বহুত রাখিতে পারেন না। উপাধন্য বস্তু এই উপজ্ঞানের পকারিং পরিচ্ছেদের উল্লেখ করিতে পারি। এখানে অনেক বিদ্যার কথা, বুদ্ধির কথা, জ্ঞানের কথা গরিবিত্ত হইয়াছে; কিন্তু যে অবস্থার (situation) বাহাদের মুখে তাহা বাত হইয়াছে, সে অবস্থার তাহাদের মুখে তাহা বাত হইতে পারে না। এখানে চরিত্রবিকাশ হয় নাই; পাঁচকড়ি বাবুর নিজের বুদ্ধি ও জ্ঞানের বিকাশ হইয়াছে মাত্র।

সুশীতির হিসাবে এ গ্রন্থের প্রশংসা করিতে পারি না। বিনোদিনী ও বোগেশ্বর-সংগিত যে চিত্র গ্রন্থকার আত্মনিগ্ধকে দেখাইয়াছেন, তাহা অস্বাভাবিক নহে—এমন অবস্থার এমন ঘটনা পৃথিবীতে অনেক ঘটে। কিন্তু পৃথিবীতে তাহা কিছু ঘটে, তাহাই যে কাব্যে অঙ্কিত করিতে হইবে, এমন কোন কথা নাই। যে পাণচি পাঁচকড়ি বাবু আঁকাছেন, তাহার উদ্দেশ্য কি? পুস্তক পাঠ করিয়া আমরা কোন উদ্দেশ্য খুঁজিয়া পাই নাই। কেবল কি পাণচি আঁকিবার জন্তই পাণচি আঁকা। তাই আবার পাঁচকড়ি বাবুর জ্ঞান ক্ষমতাপালী লেখকে করিয়াছেন। আমাদের হৃদয়গা!

এই যে একটা মহাপাপ হইয়া সেল, ইহার কলভোগ করিবে কে? বিনোদিনী মরিগ বটে; কিন্তু বিনোদিনীই কি একা পানিষ্ঠা—বিনোদিনীই কি এখানে পানিষ্ঠা?

বিনোদিনীর সঙ্গীত শ্রবণের মিলনের
তবু ত উমা নিলে। সর্কাপেকা বাহার
অপস্রাব-অধিক দৌত মহাপাণ্ডিত ঘোষণায়
কি হইল—উনার কি হইল? তাহার ত
আপনাদের সুখের সংসার কিংবা পাটল।
ইহাই কি কবিক্সনোচিত ভাবগততা? ইহাই
কি কাব্য। বাহ্যতে বিশ্বজনীননীতি নাই,
তাহা কি কাব্য হইতে পারে?

সংবাদগল্পের সম্পর্কে পাঁচকড়ি বাবু
সুপরিচিত; কিন্তু এককারণে তিনি এই
নুতন। নুতনের ও নবোনের অনেক ভিন্ন
দার্শনিকতা করা যায়। পাঁচকড়ি বাবুকে যে

মাফিনা কংগ্রেস নাম, তাহাও কারণ পাঁচকড়ি
বাবুর কমতা। তিনি অক্ষম লেখক হইলে
উহার সম্বন্ধে এত কথা বলিবার কোনই
আবশ্যক হইত না। উহার কমতা আছে
বলিয়াই উহার মোব দেখাইয়া দেওয়া
প্রয়োজনীয়।

এই পুস্তকে যে ভগবদা বেদিকা,
তাহাতে আমরা পাঁচকড়ি বাবুর পরিণত
বুদ্ধি হইতে অনেক স্তরের আশা করিতে
পারি। আশীর্বাদ করি, তিনি দীর্ঘকালি
বঙ্গসাহিত্যের সেবা করুন, এবং সেই মাতৃ
সেবার অমূল্য, তত্ত্বমূল সংগ্রহ হউন।

(৮)

মাসিক সাহিত্য সমালোচনা।

ভারতী। বৈশাখ। উড়িষ্যা
মঠ।—ঐচ্ছিক বৃত্তি মোহন সিংহ ভার-
তীতে উড়িষ্যা যে সকল লোকচিত্র প্রকাশ
করিয়াছেন তাহা বড়ই সরল চাইতেছে।
লেখক উড়িষ্যাতে কেবল করিয়া জানিয়া-
ছেন কোন দেশে বেশি দিন বাস করিলেই
যে তাহাকে জানা যায় তাহা নহে, জানিবার
শক্তি অস্ত্রি কারণেই আছে। যখন
অন্যদেশেই বা করতল লোক জানে? সচেতন
চিত্ত এবং সর্বজনীনকরো বিশ্বাসের স্পর্শ
দান। আহার, আনিগেই আনানো যায়
না। বৃত্তি বাবুর জানিবার শক্তি এবং
জানাইবার শক্তি উভয়েরই ভালরূপ পরিচয়
পাওয়া গেছে। এখানে তিনি উড়িষ্যার
মঠের ছবি দিচ্ছিলেন—উহার মঠের কক্ষ-
জবর তল মোহনের দহিত মাঝে মাঝে
সংকোচ হইতে আসা করিয়া প্রদর্শন।

ছইপত্র ও চক্ৰচন্দ্র বেহারে প্রণীত
ছুটি মেরুলি রতের বিংশ লোকসংসারের
মধ্যে প্রণীত এই সকল পত্রও ব্রতকণ্য
ভারতের ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশ চাইতে সংগ্রহ
করা বিশেষ আবশ্যক। ইহাদের ভিতরকার
মনস্তত্ত্ব ও ইতিহাস, বৈচিত্র্য ও ঐক্য, রস
এবং রসের আলোচনা করিবার পরম বিষয়।
ঐচ্ছিক সুরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় শুটিকের
বারলা ব্রত সংগ্রহ করিয়া একটি ছোট গ্রন্থ
প্রকাশ করিয়াছেন—কিন্তু তাহা যথেষ্ট নহে।
সাহিত্য পরিষদ যদি এই সংগ্রহ কার্যকে
অযোগ্য জ্ঞান না করেন তবে বারবার ভিন্ন
ভিন্ন প্রদেশ হইতে ব্রতকণ্য সংকলন করিয়া
একটি প্রকৃত কাজের পত্তন করিতে পারেন।
বিজ্ঞান পিণ্ডাঙ্গুর সত্য হেলা হইতে শাস্ত্র
ভঙ্গি হুড়ি কুড়াইয়াও সত্য করেন, আর
সংকলনের সংগ্রহের এই যে ভিত্তি

শাখ সফল উৎকৃষ্ট হইয়াছে কেনি কি বিজ্ঞমণ্ডলীর উপেক্ষার যোগ্য? সাধিতা পরিবর্ত একবার শিত জ্বলানো ছড়া সংগ্রহ করিবার উপক্রম করিয়া অতি সত্বর তাহা ছুইতে নিবৃত্ত হইয়াছিলেন; আশীকরি, এ সফল কাণ্ড পাঞ্জীর্ণের হানিজনক বলিয়া তাহায়া লিখিত হন নাই। ঐতিহাসিক পুস্ত্রানলী গ্রীষ্মক সখারাম গণেশ দেউড়রের সচিত্র ঐংস্ফাক্ষরক গ্রন্থক। পরন্তলি মারাত্মি রাজকলানীল নগর হইতে সংগৃহীত। একশ পত্র বোধ হয় ভারতবর্ষের আর কোথাও বুলিয়া পাওয়া যাইবে না। প্রধান লক্ষ্যের বিষয় এই যে মারাত্মি রাজাকালে পত্র ব্যবহারের ভাষা মারাত্মি এবং রাজপুরুষদিগের পদবী সংকুত নীতিশাস্ত্র হইতে গৃহীত। ইহা হইতে শিবালির প্রতিভার পরিচয় পাওয়া যায়। স্বাভাবিক সর্লতোভাবে স্বাধীন কংই তাহার উদ্দেশ্য ছিল। কেবল রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা নহে, ভাবার স্বাধীনতা, আচরণের স্বাধীনতা, মনের স্বাধীনতা তাহাদের আকাঙ্ক্ষার বিষয় ছিল। বাবনিক বস্ত্রার প্রবণ প্রাণন হইতে স্বাভাবিক তাহার প্রাচীন মহাবীর ভৌর তুলিয়া নইবার চেষ্টা করিতে ছিলেন। তাহাদের ভ্রান্তর যে একটা খাপছাড়া জুইকোঁকো আকস্মিক উৎপাত, একশ ভাবনা তাহাদের পক্ষে অশাস্ত্রিক—সেই জন্ত তাহারা সর্লপ্রবর্ত প্রাচীন স্বাভাভীয় মহৎ আদর্শের সহিত আপনাদিগকে আবদ্ধ করিয়া একটি প্রব প্রতিষ্ঠার উপর আপন পৌরব স্থাপন করিতে প্ররাসী হইয়াছিলেন। প্রকৃত লাতের চেষ্টা মারাত্মি ইতিহাসের প্রধান পৌরব নহে, কিন্তু এই নববীর সম্প্রদায়ের

মণো একটি বৃহৎ তাবের অদূপান, স্বাভাভীয় আদর্শলাভের কল্প লাপ্রত জনয়ের প্রবল আবেগ—ইহাই প্রকার সহিত লক্ষ্য করিবার বিষয়। দেউড়র মহাশয় কর্তৃক অনুবানিত পত্র কয়েকটি পড়িয়া এই কণাটাই বিশেষ করিয়া মনে উঠিল। (আলুবাণিক একটা ছোট কথা বলিয়া লই। “অনুবানিত” কথাটা বাঙ্গলার চলিয়া গেছে—আলকাল পণ্ডিতেরা অনুমিত লিখিতে স্রু করিয়াছেন। তব হয় পাছে তাহারা “স্বজন” কথায় লায়পার “সর্লজন” চালাইয়া বসেন।)

নব্যভারত। চৈত্র। বেল্লল গেজেট ও সমাচারদর্পণ। এট প্রবন্ধে পণ্ডিত মহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধি বাঙ্গলার সর্লপ্রথম ছুইটি সংবাদপত্রের সমালোচনা করিয়াছেন। প্রথম পত্র বেল্লল গেজেট ১৮১৬ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়, এক বংসর কাল থাকে। তাহার সম্পাদকের নাম গঙ্গাধর ভট্টাচার্য। মাসিক মূল্য এক টাকা। দ্বিতীয় পত্র সমাচারদর্পণ ১৮১৮ খৃষ্টাব্দে ব্রীহন্নপুয়ের পাত্রিগণ প্রকাশ করিয়াছিলেন। মাসিক মূল্য এক টাকা। তৃতীয় পত্র রাজা রাম-মোহন রাহের সংবাদকৌমুদী, ১৮১৯ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। সাধারণের ধারণা প্রথম সংবাদ পত্র মিশনারীরা বাহির করে, বিদ্যা-নিধি মহাশয় সেই ত্রয় দূর করিয়াছেন। এমর্লকার ছুই টাকার সংবাদপত্রগণ্য সেই সত্য-বুখের কথা স্মরণ করিবেন তখন সংবাদপত্রের মূল্য ছিল বারো টাকা, প্রাধকদিগকে উপকার দিয়া জ্বলিতে হইত না। বিদ্যানিধি মহাশয় ছুই একটা লেখা যাঁহা উদ্ধৃত করিয়া-

চেন, তাহা পড়িলে বুঝা যায় ভাব লোকদের
কত ব্যাভাষ্য ভাবকে এখন কিরূপ গণদর্শন
চেষ্টা করিতে হইত। কিন্তু উদ্ধৃত রচনাংশের
ভাষা ভুলনা করিলে একথা সীকার করিতেই
হইবে পারির কামত সমাচার রূপনের
বাস্যতাভাষা সমাচার চিত্রিকার অপেক্ষা
স্বল্প সরল এবং বিতৃষ্ণ। যুগান্তরে প্রবন্ধে
ঐচ্ছিক কীটোবচন রায় চৌধুরী তাহার
বাগলকালে বঙ্গ সমাজের যে চোরায়া
দেখিয়াছেন তাহাই বর্ণনা করিয়াছেন।
লেখাটি সরল এবং কৌতুহলজনক হইয়াছে।
এখনকার পাঠকদের পক্ষে ইহার অনেক
ধর নূতন। প্রবন্ধটি উপাদেশ।

সাহিত্য। ফাদন। ঐচ্ছিক সুবোচন
মহানবিশ জীবনতত্ত্ব সম্বন্ধে কয়েকটি
কথা লিখিয়াছেন। মহানবিশ মহাপরের
মত বিশেষতঃ পণ্ডিত বাঙ্গালী লিপিতে প্রস্তুত
হইয়াছেন ইহা একটি ত্রুটিবান। তাহা
লিখিয়াছেন তাহা অভিন্ন প্রাচীন, তাহার
মধ্যে পারিভাষিক বিতর্কিত। নাট। বাঙ্গা-
লার অধিকাংশ বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ এমন ভাবে
লিখিত হইয়া থাকে যাহা অবোধ লোকের
পক্ষে অবোধ এবং জানী লোকের পক্ষে
অসঙ্গত। মহানবিশ মহাপরের মত
পারদর্শী লোক প্রস্তুত হইলে জানী অজানী
উভয়েরই উপবৃত্ত করিয়া লিখিতে পারেন।
ইংলেণ্ডে হুগলি প্রভৃতি বন্দী লোকে পিণ্ড-
দের অত বিজ্ঞান গোপনিকা লিখিতে কুণ্ঠিত
হয় নাই—বাঙ্গালী পাঠকদের সহিত
বিজ্ঞানের প্রথম পরিচয়সময় প্রবন্ধলেখক
মহাপরের ভাষা ভ্রমোৎপাদন ব্যক্তির পক্ষেই

সমুচিত। প্রবন্ধে যে দুই একটি পারিভাষিক
শব্দ আছে তৎসম্বন্ধে আনোচনা অপ্রাসঙ্গিক
হইবে না। বাঙ্গালার “এডোম্যান্ড গিয়ার্ড”র
অনেকগুলি প্রতিশব্দ চলিয়াছে। লেখক
মহাপর তাহার মধ্যে চটতে “ক্রমবিকাশ
তত্ত্ব” বাছিয়া লইয়াছেন। পৃষ্ঠাশাখা বিজ্ঞান
নাথ ঠাকুর মহাপর এক্ষণে স্তম্ভে অভিযুক্তি-
বাদ শব্দ ব্যবহার করেন। অভিযুক্তি শব্দটি
সংলিপ্ত; ক্রমে ব্যক্তি হইবার দিকে অভিযুক্ত
জ্ঞান অতি উপদর্শযোগ্যে স্থাপিত; এবং
শব্দটিকে “অভিযুক্ত” বর্ণিয়া বিশেষণে পরি-
ণত করা সহজ। তা ছাড়া “ব্যক্তি” হওয়া
শব্দটির মধ্যে ভাগশব্দ উল্লিখিত অবনতির
কোন বিচার নাট—নিশ্চয় শব্দের মধ্যে
একটি উৎকর্ষ অর্থের অভাব আছে। লেখক
মহাপর Natural Selectionকে বাঙ্গালার
“নৈসর্গিক মনোনিয়ম” বর্ণিয়াছেন। এই
সিলেক্শন্স শব্দের চণিত ব্যবহার “বাছাই”
করা। বাছাই কার্য সংযোগে চটতে পারে,
—বলিতে পারি, চা বাছাই করিবার ঘর কিন্তু
চা মনোনিয়ম করিবার ঘর বলিতে পারি না।
মনশব্দের সম্পর্কে মনোনিয়ম কথাটার
মধ্যে ইচ্ছা অভিযুক্তির ভাব আছে। কিন্তু
প্রাকৃতিক সিলেক্শন্স মনোনিয়ম নিয়মের কার্য—
তাহার মধ্যে ইচ্ছার অভাবনীর সীমা নাই।
অতএব বাছাই শব্দ এখানে সঙ্গত। বাঙ্গালার
বাছাই শব্দের সাধুপ্রয়োগ “নির্বাচন”।
“নৈসর্গিক নির্বাচন” শব্দে কোন আপত্তির
কারণ আছে কি না জানিতে ইচ্ছুক আছি।
Fossil শব্দকে সংক্ষেপে শিলাবিকার
বলিলে কিরূপ তথ্য? Fossilized শব্দকে
বাঙ্গালার শিলাবিকৃত অথবা শিলাতৃপ্ত বলা

বাংতে পারে। “চরিত্রানীতি” মনকচিত্ত
লেনক ঐসকল লেনকনাপ মিত। চারিত্রলেন
তিনি বিশ্ববিদ্যালয় হতে লেনক প্রদিলিত
লত করিলেন। ইংরাজি Ethics লেনক
তিনি লাকলার “চরিত্রানীতি” লয় লিলেন।
লেনক ইংক লীতি ও লীতিশাস্ত্র লেনক—
লেনক লেনক লিতিয়াক করিল। তালই
করিলেন লাকল লীতি লেনক লর লকল
লনক লর লকল লনক।

অহরিষান্ প্রিৎ কৱাং, প্রজ্ঞাপি শিনোবরম্,
অপি চাত্ত শিরন্নিহা কৱাং শোচেৎ তপাপি চ।

মানুষিতে মানুষিতে কটিলেন মিষ্ট,

मात्रिका कहिये आत्मा ।

ସାଧାଟି କାଟିଲା କିନ୍ତୁ ଉଦ୍‌ବିଗ୍ନ

ସବୁଟି ଡିଲେ ମାରି ।

ইহাও একপ্রকার নীতি কিন্তু এমিক্স
নহে। সংস্কৃত ভাষায় ধর্ম বলিতে মূল্যতঃ
এমিক্স বুঝায় কিন্তু ধর্মের মধ্যে আসে
অনেক গৌণ পদার্থ আছে। মৌলী হইয়া
ভোজন করিবে ইহা ভ্রাণের ধর্ম হইতে
পারে কিন্তু ইহা Ethics নহে। অতএব
“চরিত্রনীতি” শব্দটি উপযুক্ত হইয়াছে কিন্তু
ইহাকে আর একটু সংহত করিয়া চারিত্র
বলিলে ব্যবহারের পক্ষে সুবিধাজনক হয়।
চরিত্র নীতি শিক্ষা, চরিত্র নীতি বোধ, চরিত্র
নৈতিক উন্নতি অগেণ্ডা চারিত্রশিক্ষা, চারিত্র-
গোণ, চারিত্রোন্নতি আদ্যেবর কাছে সঙ্গত
বোধ হয়। যগেন্দ্রবাবু চারিত্র বর্ণনের মূল
সমভাবনিক সংক্ষেপে আলোচনা করিতে
শিখা বিষয়টিকে পাঠকসাধারণের পক্ষে
ভঙ্গ করিয়া ফেলিয়াছেন। এই একটি
প্রবন্ধ ভাষিয়া ইংলিশ দ্বিভাষী করিতে

তবে বক্তৃতা বিষয়টিকে বিশদ করিতে পার-
তেন। আর একটি কথা বিজ্ঞাত Metaphysics
শব্দের বাঙ্গলা কি ভাবিয়া নহে ?
ঐশ্বর্য চন্দ্রশেখর কর পণ্ডিত প্রসন্নকুমার
চট্টোপাধ্যায়ের জীবনী লিখিয়াছেন।
পণ্ডিত মহাশয় সাধু ও ভক্ত ছিলেন ইহজীবন
নিষ্ঠুর দাড়িয়ের সহিত সংগ্রামে পদে পদে
কতবিধ কষ্টেরাও উপাত্ত দেবতার প্রতি
সরল ভক্তিকে চূড় রাখিয়াছিলেন। লোক
মহাশয় তাঁহার রচিত অনেকগুলি ভাসা-
বিষয়ক গান উদ্ধৃত করিয়াছেন। সেই
গানগুলির মধ্যে অনেক গুলেই ভাবের
গভীরতা আছে মনেহ নাট কিংবা ও
ভবের অসম্পূর্ণতার ইহারা দাহিত্যের মধ্যে
উচ্ছ্বাস পাঠবেন। গান প্রদানের গান
কেবল ভাবের গোঁড়াবে নহে ভাবার গুলে
কালে কালে বুঝে বুঝে প্রবাহিত হইয়া
আসিতেছে। বহুলাং হ্রাও নৌকার দোহা
ষাট ছাড়িয়াই ছুবিয়া থাকে। সাহিত্যেও
অনেক সময় হুল্লও নাগের নৌকাও বহুদূর
চলিয়া আসে, মূল্যবান স্রাও অর্জনবে না
হর। আমাদের দেশে অনেক অশিক্ষিত
সহজ ভক্ত পাঠি ভক্তি পাঠি ভাবার বাত
করিয়া গেছে, সেই সরল সম্পূর্ণ মানসগুলি
বাঙ্গলা পত্রীর চিত্রসম্পত্তি হইয়া আছে
ভক্ত প্রসন্নকুমারের ভাবপূর্ণ গানে রচনার
বাঙ্গলা ভাবার সেই সহজ সম্পূর্ণতা
দেখিয়া মনে আক্ষেপ উপস্থিত হয়।

সাহিত্য-পরিমল-পত্রিকা । কাশ্মীর ।

রাজ্যমাটি বা কর্ন স্তবর্ণ অবস্থে ত্রিবল
নিখিলনাথ রাও হস্তে প্রমাণ করিচ্ছিলেন.

মুসলিমাবাদের অপর্যন্ত সাক্ষ্যাদি পানী প্রাচীন
কর্ণকর্ণের প্রকাশনেষু । এ সম্বন্ধে তিনি
এবং ও ইতিহাস সংগ্রহ করি। প্রকাশ
করিয়াছেন মহাচরিত্রের বীর কর্ণের
সহিত কর্ণকর্ণের কোন ইতিহাসিক সম্বন্ধ
ছিল, নাম সাক্ষ্য ছাড়া সে প্রবাসের তিনি
আছে বলিয়া পত্রিকা সম্পাদক মহাশয়
বিখ্যাত করেন না ; আমরাও একথা বিখ্যাত
করিবার কোন হেতু দেখি না । বানান
লইয়া কয়েকটি কথা বলিতে ইচ্ছা করি ।
রাতা, ভাতা, ভাতা, আত্ম প্রভৃতি শব্দ “ক”
অক্ষর যোগে লেখা নিতাইই প্রবাসিত
বিশুদ্ধ । পক্ষা শব্দের সহিত রাতা, ভাত
শব্দের সহিত ভাতা শব্দের তুলনা করিলে
একথা স্পষ্ট হইবে । মুগ শব্দটিকে
অন্ন বস্ত্রাব্যবহৃত্ত প্রবাসিত সহিত বানানের
বিশোধ ঘটানো কর্তব্য নহে । যে নিয়ম
মানিতে হইলে চাককে চাক, পাককে পাক,
কুনকে কুখার লিখিতে হয় । অনেক
মুগ শব্দের সাক্ষ্য রূপের অল্প মনাক
শোণা, কণকে কণ বানান করেন, অথচ
অল্প শব্দ শোণাকে শোণা লেখেন না ।
যে সকল সংস্কৃত শব্দ অপভ্রংশের নিয়মে পুরা
বাক্য হইয়া গেছে সেগুলির প্রবাসিত অস্বাভাবিক
বানান হওয়া উচিত । প্রাকৃত ভাষার বানান
ইহার উদাহরণ তল্য । ভোড়া, ভোরাণি,
ভাঁড়া, কাণ প্রভৃতি শব্দে আমরা প্রাক-
ৃতিক বানান গ্রহণ করিয়াছি অথচ অল্প
অনেক স্থলে করি নাই । পত্রিকা সম্পাদক
মহাশয় বাক্য বানানের নিয়ম সম্বন্ধে
আলোচনা উপাধন করিলে আমরা কৃতজ্ঞ
হইব । সঙ্গম্যথ বিজয় ও কবি মুকুন্দ,

ভাষা ও ছন্দের অপর্যন্ত আলোচনা
করিয়া ইন্দিক বাসু সঙ্গম্যথ বিজয় রচি-
তাকে অত্যন্ত প্রাচীন গ্রন্থ করিবার
চেষ্টা করিয়াছেন যে মুক্তি অবগত করিলে
মাইকেলের পরবর্তী অবিজ্ঞানের লেখক ও
বক্তার পরবর্তী উপভাস লেখকদিগকে
আহাদের পূর্ববর্তী বলিয়া মানিতে হয় ।
এ সম্বন্ধে অল্পক নংগ্রন্থাথ বসু প্র-
ক্ষেপে যে মত ব্যক্ত করিয়াছেন আমরা তাহা
সম্মত বোধ করি !

প্রবীণ । চৈত্র । অল্পক মনোমজ্ঞ
এবং প্যারিচাঁদ মিত্রের রচনা ও বীথনী
সমাধানে করিয়াছেন । প্যারিচাঁদের ভাষা
ও রচনারীতি এমনি তাহার স্বকীয় যে আর
পৰ্যন্ত কেহ তাহার নকল করিয়া উঠিতে
পারে নাই । তাহার লেখা হইতে সমালোচক
স্থানে স্থানে তুলিয়া দিয়াছেন, তাহ দেখিলেই
বুঝা যাইবে, চলিত ভাষা হইতে ঠিক কথাটি
চুনিয়া লইবার ক্ষমতা তাহার যেমন ছিল
চারিধিকের প্রাত্যহিক ব্যাপারের কথা
হইতে হবির ঠিক রেখাগুলি আদায় করিবার
শক্তিও তাহার তেমন ছিল । যে সূত্র
অতি পরিচিত তাহার প্রতি লোকের সৃষ্টি
তেমন করিয়া পড়ে না—তাহার আপা
গোড়াই যখন তুচ্ছ বোধ হয়—সেই সামাজ্য-
তার কথা হইতে একটি চেষ্টা বাহির করা
রসের অপূর্ণতা আপাইয়া তোলা অসামান্য
ক্ষমতার কাণ্ড । সৃষ্টির বিশালত্ব অল্পক
উপেক্ষিকণের স্বাভৌম্যের লেখা । ঐক-
জ্ঞানিক মানিক পক্ষে যদি বৈজ্ঞানিক
কিছু লিখিতে হয় তবে তাহার ভাষা এইরূপ

সহ্য হওয়াই উচিত। যে বিপদটা সাধারণের অনির্দিষ্ট ও স্বভাবতই চরম তাহার ভাব্যাকেও যদি বীর্য ব্রহ্মোৎসব করিয়া তোলা যায় তবে নিতাই হতাশ হইয়া পড়িতে হয়। অঐক্যমিত্তিক মাসিক পত্রে পাঠকদিগকে বৈরাগ্য ভোগ দিবার ক্রীতি তাহাতে একশ কড়া জিনিষ তাহার আশাই করে না, এমন নহে নিঃশব্দ পঠকের পাতে এত বড় উপদ্রব নিরীহ জাতিতায় প্রতি খতবাহিনীর কঠিন কোড়কের মত হইয়া পড়ে,—কিন্তু পেরুগ কোড়ক স্বপ্নরাগে যেমন সহ্য হয় অন্তর তেমন হয় না। লেখক মহাশয় সেন্ট্রিবিটাল ও সেন্ট্রিফুগাল কোর্সকে কেন্দ্রাভিমুখী ও কেন্দ্রা-গামিনী শক্তি বর্ণিতাছেন কেন্দ্রাভুগ এবং কেন্দ্রাভিমুখী আমাদের মতে সংশ্লিষ্ট ও সমস্ত। ক্রীড়ক হরিসাধন মুখোপাধ্যায়ের সাহায্যক্রমের দৈনিক জীবন প্রবন্ধটি মনোহর হইয়াছে।

সাহিত্য-সংহিতা। চৈত্র। ক্রীড়ক বীর্যের পাড়ে জাতীয় সাহিত্য প্রবন্ধে আধুনিক ভারতবর্ষীয় ভাষাগুলিকে সংস্কৃত ব্যাকরণের নিয়মমত চলিতে উত্তেজনা করিয়াছেন। তিনি বলেন, নচেৎ আদর্শের ঐক্য থাকে না। তিনি বলেন, “কেন চট্টগ্রামবাসী নব্বীপবাসীর ব্যবহৃত অসংস্কৃত শব্দ ব্যবহার করিতে বাধ্য হইবে?” আমরা বলি, হে ত জবাবদিগ করিয়া বাধ্য করিতেছে না, স্বভাবের নিয়মে চট্টগ্রামবাসী আপনি বাধ্য হইতেছে। নবীনচন্দ্র পেন মহাশয় তাঁহার কাব্যে চট্টগ্রামের প্রাদেশিক প্রয়োগ ব্যবহার না করিয়া নব্বীপের প্রাদেশিক প্রয়োগ

ব্যবহার করিয়াছেন। তাহার বিপরীত করিবার স্বাধীনতা তাহার ছিল কিন্তু নিশ্চয়ই কাব্যের ক্ষতি হানত্ব করিয়া দেই স্বাধীনতাস্বপ্ন ভোগ করিতে ইচ্ছা করেন নাই। সকল দেশেই প্রাদেশিক প্রয়োগের বৈচিত্র্য আছে, তাখানি এক একটি বিশেষ প্রদেশ ভাষাসম্বন্ধে অস্তিত্ব প্রদেশের উপর কর্তৃত্ব করিয়া থাকে। ইংরাজি ভাষা লাতিন নিয়মে আপনায় বিশুদ্ধ রাখা করে না। যদি করিত তবে এ ভাষা এত প্রবল এত বিচিত্র এত মহৎ হইত না। ভাষা সোনা রূপার মত অল্পপদার্থ নহে যে তাহাকে ছাচে ঢালিব—তাহা সম্ভব। তাহা নিজের অনির্কলনীয় জীবনীশক্তির নিয়মে গ্রহণ ও বর্জন করিতে থাকে। সমাজে শাস্ত্র অপেক্ষা লোকচারকে প্রাধান্য দেয়। লোকচারের অনুবিধা অনেক, তাহাতে এক দেশের আচারকে অল্প দেশের আচার হইতে তকাৎ করিয়া দেয়—তা হউক, তবু লোকচারকে ঠেকাইবে কে? লোককে না মারিয়া ফেলিলে লোকচারের নিতা পরিবর্তন ও বৈচিত্র্য দেখ দূর করিতে পারে না। কৃত্রিম গাছের সব শাখাই এক মণের করা যায় সম্ভব গাছের করা যায় না। ভাষায়ও লোকচার শাস্ত্রের অপেক্ষা বড়। সেই জন্যই আমরা “কাণ্ড” সেওয়া বলিতে লজ্জা পাই না। সেই জন্যই ব্যাকরণ যেখানে “আবস্তকতা” ব্যবহার করিতে বলে আমরা সেখানে “আবস্তক” ব্যবহার করি। ইহাতে সংস্কৃত ব্যাকরণ যদি চোখ রাঙাইয়া আসে, লোকচারের হুকুম সেবাইয়া আমরা তাহাকে উপেক্ষা করিতে পারি।

প্রবাসী। বৈশাখ। শ্রীযুক্ত রামানন্দ চৌধুরীস্বামী এই ব্রহ্মা সচিব পত্রের সম্পাদক পদ গ্রহণ করিয়াছেন। এলাহাবাদ হইতে ইহা প্রকাশিত হইতেছে। আনন্দের নবীন পত্রটিকে সাবরে অতর্কিত করিয়া লইতেছি। আমাদের প্রবাসী কবি শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ সেনের প্রেক্ষাগ্রহণে ইহার অভিব্যক্তি কার্য সুসম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। প্রবাসীও যত্ন, প্রবাসী বাঙ্গালীর কবিও যত্ন! স্বর্গীয় কমলাকান্ত শর্মা লোকান্তর হইতে ইংলোকে এবং যত্নের বঙ্গবর্ধন হইতে প্রবাসে পেলেন, এ ইঙ্গিতাল কে খটাইল? মাহারী তাহার নাম গোপন করিয়া কঁাকি দিতে পারিবেন না—কবির লেখনী ছাড়া এ যত্ন আর কোথায়? যে কবি অশোকমঞ্জরী হইতে তাহার তৎপত্তা এবং যত্ন তৎপত্তার হইতে তাহার রহস্য ফসটি চুরি করিয়া লইতে পারেন তিনি যে রাতারাতি বঙ্গবর্ধন হইতে তাহার কন্যাকান্তটিকে হরণ করিয়া প্রবাসে পালাইবেন ইহাতে আশ্চর্য্য হই না। কিন্তু চোরকে যদি আমাদের বঙ্গবর্ধনে বাঁধিতে পারি তবেই তাহার উপযুক্ত শাস্তি হইবে। অজ্ঞা-গুহু চিত্রাবলী মনোহর সচিত্র প্রবন্ধ। নিম্নের বসিতে পারি না কিন্তু আমাদের ধারণা, উচ্চারণ অর্হদারে অমর্ত্যের হৃদে অমর্ত্য হওয়া উচিত। বিজ্ঞানবিদ্যার শ্রীযুক্ত

গোপেশচন্দ্র দাস জীবনবিদ্যা সম্বন্ধে সাধারণ ভাবে আগোচর্য্য করিয়াছেন। দিবারের রাগা কুন্তের অপরন্ত কীর্ত্তিও কুন্ত সম্বন্ধে সচিত্র প্রবন্ধটি সুদৃশ্য। হইয়াছে। সম্পাদক লিখিয়াছেন “কোনও কাগজের প্রথম সংখ্যা মনের মত কথা বড়ই কঠিন। আসা করি কেহ আমাদের প্রথম সংখ্যা দেখিয়াই কাগজের লোভ ত্যাগ সম্বন্ধে চূড়ান্ত বীমালা করিবেন না।” বস্তুতঃ কাগজের প্রথম সংখ্যা ত্রিনিমি বড়ই অসহায়। সে নিত্যই একা; স্থান সংকল্প ও প্রথম আয়োজনের স্বল্প-টে অল্প মনুনাই সে দেখাটের পারে—পাঠকদের চক্ষু ভরিয়া দিবার মত পুঁজি তাহার থাকে না। অতএব প্রথম সংখ্যা লইয়া নানা লোকে নানা অভিযোগ উপস্থিত করিলে নিরুত্তর থাকিতে হয়—কাল তাহা আগনি খানিয়া যায় এবং পাঠকের? আপনাদের কাগজটিকে ভাল করিয়া চিনিয়া লইতে পারেন। আমাদের বিবেচনায় প্রথম সংখ্যাটিকে অত্যাশ্চর্য্য করিয়া তুলিলে পরিচয়কে ক্রমশঃ অগ্রণের করিবার পথে বাধা হইতে, সে উপায়ে, ক্রমশঃ পাঠকদের আকর্ষণ পূরণ না করিয়া ক্রমশঃই তাহা বিপ্লবে হত্যা করিয়া কঁাকি দিতে বাধ্য হইতে হয়। বাহাই হউক প্রবাসীর প্রথম সংখ্যা দেখিয়া আমরা আশাব্যস্ত হইয়াছি।

বঙ্গদর্শন।

প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সভ্যতার আদর্শ।

পূর্বসংখ্যক বঙ্গদর্শনে রক্তবাকব উপাখ্যায় মহাশয় হিন্দুজাতির একনিষ্ঠতা প্রবন্ধে হিন্দুসভ্যতার মনোস্থিতি নির্দেশ করে দেখিয়েছেন। তিনি হিন্দুসভ্যতার প্রধান লক্ষণ একনিষ্ঠতা ও যুরোপীয় সভ্যতার প্রধান লক্ষণ বহুনিষ্ঠতা বলিয়েছেন। উপাখ্যায় মহাশয় এই যে ভাবের অবতারণা করিয়েছেন, অল্প প্রবন্ধে ক্রমশ তাহাকে বিস্তৃত ও পরিণত করিয়া তুলিবেন, আশা করিয়া রাখিলাম। ইতিমধ্যে ফরাসী মনোবী শিকো যুরোপীয় সভ্যতার প্রকৃতি-সম্বন্ধে যাঁহা বলিয়েছেন, তাহা আমাদের আলোচনার যোগ্য। প্রথমে তাহার মত নিয়ে উদ্ধৃত করি।

তিনি বলেন, আধুনিক যুরোপীয় সভ্যতার পূর্ববর্তী কালে, কি এশিয়ায় কি অন্তর্য, এমন কি, প্রাচীন গ্রীসেরোশেও, সভ্যতার মধ্যে একটি একমুখীভাব দেখিতে পাওয়া যায়। প্রত্যেক সভ্যতা যেন একটি মূল হইতে উদ্ভূত হইবে এবং একটি স্তরকে আশ্রয় করিয়া অধিষ্ঠিত রহিয়াছে। সমাজের মধ্যে তাহার প্রত্যেক অঙ্গাঙ্গানে, তাহার আচারে

বিচারে, তাহার অবস্থাবিকাশে, সেই একটি স্থায়ী ভাবেরই কর্তৃত্ব দেখা যায়।

যেমন, ইজিপ্টে এক পুরোহিতশাসন-তন্ত্রে সমস্ত সমাজকে অধিকার করিয়া বসিয়াছিল; তাহার আচার-ব্যবহারে, তাহার কীর্তিপ্রস্তাভগিতে, ইচ্ছা এই একমাত্র প্রভাব ভারতবর্ষেও রাক্ষসাত্যেই সমস্ত সমাজকে একভাবে গঠিত করিয়া তুলিয়াছিল।

সময়ে সময়ে ইহাদের মধ্যে ভিন্ন শক্তির বিরোধ উপস্থিত হয় নাই, তাহা বলা যায় না; কিন্তু তাহারা সেই কর্তৃত্বের দ্বারা পরাস্ত হইয়াছে।

এইরূপ একভাবে কর্তৃত্বের ভিন্ন বেশ ভিন্নরূপ ফলপ্রাপ্ত করিয়াছে। সমগ্র সমাজের মধ্যে এই ভাবের ঐক্যবশত গ্রীস অতি আশ্চর্য্য ক্রমে এক অপূর্ণ উন্নতি লাভ করিয়াছিল। আর কোন জাতিই এত অল্পকালের মধ্যে এমন উচ্ছলতা লাভ করিতে পারে নাই। কিন্তু গ্রীস তাহার উন্নতির চরমে উঠিতে না উঠিতেই যেন ভীণ হইয়া পড়িল। তাহার অবনতিও বড় আক-

শিক। যে মূলভাবে গ্রীকসভ্যতার প্রাণ-সঞ্চায় করিয়াছিল, তাহা যেন রিক্ত নিঃশেষিত হইয়া গেল; আর কোন নূতন শক্তি আসিয়া তাহাকে বলদান বা তাহার দান অধিকার করিল না।

অপরপক্ষে, ভারতবর্ষে ও ইম্পেরিয়ে সভ্যতার মূলভাব এক বটে, কিন্তু সমাজকে তাহা অচল করিয়া রাখিল। তাহার সরলতার সমস্ত যেন একধেয়ে হইয়া গেল। দেশ ধ্বংস হইল না, সমাজ ঠিকিরা রহিল, কিন্তু কিছুই অগ্রসর হইল না, সমস্তই এক-ভারগার আসিরা বন্ধ হইয়া গেল।

প্রাচীন সভ্যতামায়েই একটা না একটা কিছুই একাধিপত্য ছিল। সে আর কাহাকেও কাছে আসিতে দিত না, সে আপনার চারদিকে আটঘাট বানিয়া রাখিত। এট ঐক্য, এই সরলতার ভাব সাহিত্যে এবং লোকসকলের বুদ্ধিচেষ্টার মধ্যেও আপন দানন বিস্তার করিত। এট কারণেই প্রাচীন হিন্দু ধর্ম ও চারির গ্রন্থে, ঐতিহাসে কাব্যে সর্বত্রই একট চেহারা দেখিতে পাওয়া যায়। তাহাদের জ্ঞানে এবং কল্পনায়, তাহাদের জীবনযাত্রায় এবং অহুষ্ঠানে, এই একই ছাঁদ। এমন কি, গ্রীসেও জ্ঞান-বুদ্ধির বিপুলব্যাপ্তিসবেও তাহার সাহিত্যে ও শিল্পে এক আশ্রয় একপ্রবণতা; দেখা যায়।

যুরোপের আধুনিক সভ্যতা ইহার সম্পূর্ণ বিপরীত। এই সভ্যতার উপর দিয়া একবার চোখ বুলাইয়া যাও, দেখিবে, তাহা কি বিভিন্ন, জটিল এবং বিকৃত। ইহার অভ্যন্তরে সমাজতন্ত্রের সকলরকম মূলতন্ত্রই বিরাটমান; দৌরিক এবং আধাধৌরিক

শক্তি, পুরোহিতত্ব, রাজত্ব, প্রধানত্ব, এজাতত্ব, সমাজ-পদ্ধতির সকল পর্যায়, সকল অবস্থাট, বিভক্তিত হইয়া দৃষ্টমান; স্বাধীনতা, ঐশ্বর্য এবং ক্রমতার সর্বপ্রকার ক্রমাগত ইহার মধ্যে স্থান গ্রহণ করিয়াছে। এই বিভিন্নশক্তি দ্বির নাই, ইহারে আপন-আপনি মধ্যে কেবলি লড়িতেছে। অথচ ইহাদের কেহই আর সকলকেই অভিভূত করিয়া সমাজকে একা অধিকার করিতে পারে না। একই কালে সমস্ত বিরোধি-শক্তি পাশাপাশি কাজ করিতেছে; কিন্তু তাহাদের বৈচিত্র্যময়ও তাহাদের মধ্যে একটি পারিবারিক দানুস্ত্র দেখিতে পাই,— তাহারিগকে যুরোপীয় বলিঙ্গা তিনিতে পাওয়া যায়।

চারিখে, মতে এবং ভাবেও এইরূপ বৈচিত্র্য এবং বিরোধ। তাহারা অহরহ পরস্পরকে লক্ষ্য করিতেছে, আঘাত করিতেছে, সীমাবদ্ধ করিতেছে, ত্রপাত্তরিত করিতেছে এবং পরস্পরের মধ্যে অহুগ্নবিষ্ট হইতেছে। একদিকে স্বাতন্ত্র্যের দ্রুত তৃষ্ণা, অত্রদিকে একাত্ত বাধ্যতা-শক্তি; মনুষ্যে মনুষ্যে আশ্রয় বিবাসবন্ধন, অথচ সমস্ত মূল্য মৌচনপূরক বিষয়ের আর কাহারো প্রতি ভ্রক্ষেপমাত্র না করিয়া একাকী নিজের বেজায়তে চলিবার উদ্ভত বাসনা। সমাজ যেনন বিভিন্ন, যনও তেমনি বিভিন্ন।

আবার সাহিত্যেও সেই বৈচিত্র্য। এই সাহিত্যে মানবমনের চেষ্টা বহুধা বিভক্ত, বিষয় বিবিধ, এবং পত্রীততা দূরপানিনী। সেই ভ্রান্তই সাহিত্যের বাহু আকার ও আশ্রয় প্রাচীনসাহিত্যের ত্রাঘ বিভক্ত, মনল ও

সম্পূর্ণ নহে। সাহিত্যে ও শিল্পে তাবের পরিপূর্ণতা, সরলতা ও ঐক্য হইতেই রচনার সৌন্দর্য্য উদ্ভূত হইয়া থাকে। কিন্তু বর্তমান যুরোপে ভাব ও চিন্তার অপরিণীত বহুলভাৱ, রচনার এই যথং বিতৃষ্ণ সারল্য রক্ষা করা উত্তরোত্তর কঠিন হইতেছে।

আধুনিক যুরোপীয় সভ্যতার ঐতোক অংশে ঐত্যাংশেই আনন্ড এই বিচিত্র প্রকৃতি দেখিতে পাই। নিঃসন্দেহ ইহার অমুবিধাও আছে। ইহার কোন একটা অংশকে পৃথক করিয়া দেখিতে গেলে, হয় ত, প্রাচীনকালের তুলনার স্বর্গ দেখিতে পাইব—কিন্তু সমগ্র-ভাবে দেখিলে, ইহার ঐক্য আনন্দের কাছে প্রতীতমান হইবে।

যুরোপীয় সভ্যতা পঞ্চদশ-শতাব্দী-কাল চিকিয়া আছে এবং বরাবর অগ্রসর হইয়া চলিয়াছে। ইহা গীকুপভ্যতার স্তার তেনন দ্রুতবেগে চলিতে পারে নাই বটে, কিন্তু পদে পদে নব নব অভিনাভ প্রাপ্ত হইয়া এখনো ইহা সমুখে ধাবমান। অজ্ঞাত সভ্যতার এক ভাব—এক আবেগের একাধিপত্যে অধীনতাবন্ধনের সৃষ্টি করিয়াছিল, কিন্তু যুরোপে কোন এক সামাজিক শক্তি অপর শক্তি-গুলিকে সম্পূর্ণ অভিভূত করিতে না পারায়, এবং স্বাভাবিকভাবে পরস্পরকে সচেতন অথচ সংবত করিয়া রাখার, যুরোপীয় সভ্যতার স্বাধীনতার লক্ষ্য হইয়াছে। ক্রমাগত বিবাহে এই সকল বিরোধি-শক্তি আপসে একটা বোঝাপড়া করিয়া সমাজে আপন আপন অধিকার নির্দিষ্ট করিয়া লইয়াছে; এইজন্য ইহারা পরস্পরকে উচ্চের করিবার লক্ষ্য সচেতন থাকে না, এবং নানা প্রতিদ্বন্দ্ব-

পক্ষ আপন স্বাভাবিক স্বার্থে করিয়া চলিতে পারে।

ইহাই আধুনিক যুরোপীয় সভ্যতার মূলপ্রকৃতি, ইহাই ইহার প্রেরণ।

নিজে বলেন, বিশ্বজগতের মধ্যেও এই বৈচিত্র্যের সংগ্রাম। ইহা সম্পূর্ণ বৈ, কোন একটি নিয়ম, কোন এক প্রকারের পটনস্তর, কোন একটি সরল ভাব, কোন একটি বিশেষ শক্তি, সমস্ত বিশ্বকে একা অধিকার করিয়া, তাহাকে একটামাত্র কঠিন চাঁচে ফেলিয়া, সমস্ত বিরোধী প্রভাবকে দূর করিয়া, শাসন করিবার ক্ষমতা: পায় নাই। বিবে নানা শক্তি, নানা তত্ত্ব, নানা তত্ত্ব, জড়িত হইয়া লুপ্ত করে, পরস্পরকে গঠিত করে, কেহ কাহাকে সম্পূর্ণ পরাস্ত করে না, সম্পূর্ণ পরাস্ত হয় না।

অথচ এই সকল গঠন, তত্ত্ব ও তাবের বৈচিত্র্য—তাহাদের সংগ্রাম ও বেগ, একটি বিশেষ ঐক্য—একটি বিশেষ আবেগের অভি-মুখে চলিয়াছে। যুরোপীয় সভ্যতাই এইরূপ বিশ্বতত্ত্বের প্রতিনিধি। ইহা সর্বাঙ্গিকভাবে সীমাবদ্ধ, একরত ও অচল নহে। জগতে সভ্যতা এই প্রথম নিজেই বিশেষ সৃষ্টি বর্জন করিয়া দেখা দিয়াছে। এই প্রথম ইহার বিকাশ বিশ্বব্যাপারের বিকাশের স্তার বহু-বিত্তক, বিপুল এবং বহুচেষ্টাপ্রসূত। যুরোপীয় সভ্যতা এইরূপে চিরন্তন সভ্যতার পথ পাই-রাছে, তাহা অপদীপ্তের কাব্য-প্রণালীর দ্বারা গ্রহণ করিয়াছে, দীপ্তরূপে পথ নির্দেশ করিয়া-ছেন, এ সভ্যতা সেই পথে অগ্রসর হইতেছে; এ সভ্যতার প্রেরণাত্মক এই সভ্যতার উপরেই নির্ভর করে।

গিল্জোর মত আমরা উদ্ধৃত করিয়া দিলাম ।

ইরোপীয় সভ্যতা এক্ষণে বিপুলায়তন ধারণ করিয়াছে, তাহাতে সন্দেহ নাই । ইরোপ, আমেরিকা, অষ্ট্রেলিয়া—তিন মহাদেশ এই সভ্যতাকে বহন ও পোষণ করিতেছে ।

এত ভিন্ন ভিন্ন বহলংখ্যক দেশের উপরে এক মহাসভ্যতার প্রতিষ্ঠা, পৃথিবীতে এমন আশ্চর্য্য বৃদ্ধ্যাপার, ইতিপূর্বে আর ঘটে নাই । সুতরাং কিসের সঙ্গে তুলনা করিয়া ইহার বিচার করিব ? কোন্ ইতিহাসের সাক্ষ্য গ্রহণ করিয়া ইহার পরিণাম নির্ণয় করিব ? অল্প সকল সভ্যতাই একদেশের সভ্যতা, এক জাতির সভ্যতা । সেই জাতি যতদিন ইন্ধন ভোগাইয়াছে, ততদিন তাহা জ্বলিয়াছে, তাহার পরে তাহা নিবিয়া গেছে, অথবা ভস্মাক্ত হইয়াছে । ইরোপীয় সভ্যতা-হোমানদের সমিধ্কার্ত ভোগাইবার ভার লইয়াছে—নানা দেশ নানা জাতি । অতএব এই বজ্র-হত্যাশন কি নিবিবে, না, ব্যাপ্ত হইয়া সমস্ত পৃথিবীকে গ্রাস করিবে ? কিন্তু এই সভ্যতার মধ্যেও একটি কর্তৃত্ব আছে,—কেমন সভ্যতাই আকারপ্রকার-হীন হইতে পারে না । ইহার সমস্ত অবরূপকে চালনা করিতেছে, এমন একটি বিশেষ শক্তি নিষ্করই আছে । সেই শক্তির অভ্যুদয় ও পরাজয়ের উপরেই এই সভ্যতার উন্নতি ও ক্ষয় নির্ভর করে । তাহা কি ? তাহার বহুবিকল্প চেষ্টা ও স্বাতন্ত্র্যের মধ্যে ঐক্য-তত্ত্ব কোণায় ? উপাধায় মহাশয় তাহার প্রবন্ধে আজাস দিয়াছেন, বর্ণাশ্রমধর্মেই চিন্দুলমাতের ঐক্যভিত্তি । তারত্ববর্ণের ভিন্ন

ভিন্ন প্রবেশে এই বর্ণাশ্রমধর্মের নানা বৈচিত্র্য দেখা দিয়াছে বটে, কিন্তু তথাপি মোটের উপরে বর্ণাশ্রমই চিন্দুলমাতের ধারণ করিয়া রহিয়াছে—ইহাই তাহার মূল-প্রকৃতিগত ।

তেমনি ইরোপীয় সভ্যতাকেও দেশে ও দেশে খণ্ড খণ্ড করিয়া দেখিলে, অল্প সকল বিষয়েই তাহার স্বাতন্ত্র্য ও বৈচিত্র্য দেখা যায়, কেবল একটা বিষয়ে তাহার ঐক্য দেখিতে পাই । তাহা রাষ্ট্রীয় স্বার্থ ।

ইংলণ্ডে বল, ফ্রান্সে বল, আর সকল বিষয়েই জনসাধারণের মধ্যে নতবিস্বাসের প্রভেদ থাকিতে পারে, কিন্তু স্ব স্ব রাষ্ট্রীয় স্বার্থ প্রাপণের রূপ ও পোষণ করিতে হইবে, এ সম্বন্ধে মতভেদ নাই । সেই থানে তাহারা একাশ্র, তাহারা প্রবল, তাহারা নিহুঁয়, সেইখানে আঘাত লাগিলেই সমস্ত দেশ একমুষ্টি ধারণ করিয়া দণ্ডায়মান হয় । জাতিরক্ষা আমাদের যেমন একটা গভীর সংস্কারের মত হইয়া গেছে, রাষ্ট্রীয়স্বার্থরক্ষা ইরোপের সর্বসাধারণের তেমনি একটি অন্বিনিহিত সংস্কার ।

ইতিহাসের কোন্ গূঢ়নিয়মে দেশবিশেষের সভ্যতা ভাববিশেষকে অবলম্বন করে, তাহা নির্ণয় করা কঠিন ; কিন্তু ইহা সূচনিক্ত যে, যখন সেই ভাব তাহার অপেক্ষা উচ্চতর ভাবকে হনন করিয়া ধসে, তখন ধ্বংস অদ্ব্যবর্তী হয় ।

প্রত্যেক জাতির যেমন একটি জাতিধর্ম আছে, তেমনি জাতিধর্মের অতীত একটি শ্রেষ্ঠধর্ম আছে, তাহা মানবসাধারণের । আমাদের দেশে বর্ণাশ্রমধর্মে যখন সেই

উচ্চতর ধর্মকে আঘাত করিল, তখন ধর্ম তাহাকে আঘাত করিল—

ধর্ম এই হতো হৃদি ধর্মো রক্তি রক্তিতঃ ।

একসময় অসীমভাৱে আশ্বর্য্যকর জন্ত ব্রাহ্মণশূদ্র দুর্গজ্ঞা ব্যবধান রচনা করিয়াছিল। কিন্তু ক্রমে সেই ব্যবধান বর্ণাশ্রম-ধর্মের উচ্চতর ধর্মকে পীড়িত করিল। বর্ণাশ্রম আপনাকে রক্ষা করিবার জন্ত চেষ্টা করিল, কিন্তু ধর্মকে রক্ষার জন্ত চেষ্টা করিল না। সে যখন উচ্চ অঙ্গের মহুয়াচর্চা হইতে শূদ্রকে একেবারে বঞ্চিত করিল, তখন ধর্ম তাহার প্রতিশোধ লইল। তখন ব্রাহ্মণ্য আপন জ্ঞানধর্ম লইয়া পূর্বের মত আর অগ্রসর হইতে পারিল না। অজ্ঞানজড় শূদ্র-সম্প্রদায় সমাজকে গুরুভারে আকৃষ্ট করিয়া নীচের দিকে টানিয়া রাখিল। শূদ্রকে ব্রাহ্মণ উপরে উঠিতে দেয় নাই, কিন্তু শূদ্র ব্রাহ্মণকে নীচে নামাইল। আজও ভারতে ব্রাহ্মণপ্রধান বর্ণাশ্রম থাকা সত্ত্বেও শূদ্রের সংস্কারে, নিকট অধিকারীর অজ্ঞানতায়, ব্রাহ্মণসমাজ পর্যন্ত আচ্ছন্ন আবিষ্ট।

ইংরাজের আগমনে যখন জ্ঞানের বকন-মুক্তি হইল, যখন সকল মহুয়াই মহুয়াচর্চাভেদে অধিকারী হইল, তখন ব্রাহ্মণধর্মের সুজ্ঞাপণের লক্ষণ প্রকাশ পাইল। আজ ব্রাহ্মণ-শূদ্র সকলে মিলিয়া হিন্দুজাতির অন্তর্নিহিত আদর্শের বিগ্ৰহমূর্তি দেখিবার জন্ত সচেষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। শূদ্রেরা আজ - জাগিতেছে বলিয়াই, ব্রাহ্মণধর্মও জাগিবার উপক্রম করিতেছে।

যাহাই হউক, আমাদের বর্ণাশ্রমধর্মের মঙ্গীর্ণতা নিত্যাধর্মকে নানাভাবে ধর্ম করিয়া-

ছিল বলিয়াই, তাহা উন্নতির দিকে না গিয়া বিকৃতির পথেই গেল।

ইুরোপীয় সভ্যতার মূলভিত্তি রাষ্ট্রীয় স্বার্থ যদি এত অধিক ক্ষীণীভূত করে যে, ধর্মের সীমাকে অতিক্রম করিতে থাকে, তবে বিনাশের ছিন্ন দেখা দিবে এবং সেই পথে শনি প্রবেশ করিবে।

স্বার্থের প্রকৃতিই বিরোধ। ইুরোপীয় সভ্যতার সীমার সীমান সেই বিরোধ উত্তরোত্তর কণ্টকিত হইয়া উঠিতেছে। পৃথিবী লইয়া টোলাটেলি কাড়াকাড়ি পড়িবে, তাহার পূর্বদৃশ্য দেখা যাইতেছে।

ইহাও দেখিতেছি, ইুরোপের এই রাষ্ট্রীয় স্বার্থপরতা ধর্মকে প্রকাণ্ডভাবে অবজ্ঞা করিতে আরম্ভ করিয়াছে। 'ভোর যার মূলক তার' এ নীতি স্বীকার করিতে আর লজ্জা বোধ করিতেছে না।

ইহাও স্পষ্ট দেখিতেছি, যে ধর্মনীতি ব্যক্তিবিশেষের নিকট বলবৎ, তাহা রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে আবশ্যকের অহুরোধে বর্জনীয়, এ কথা একপ্রকার সর্বজনগ্রাহ্য হইয়া উঠিতেছে। রাষ্ট্রতন্ত্রে নিষাচরণ, সভ্যত্ব, প্রবন্ধনা, এখন আর লক্ষ্যজনক বলিয়া গণ্য হয় না। যে সকল জাতি মনুষ্যে মনুষ্যে ব্যবহারে সভ্যতার মর্যাদা রাখে, জাতিচর্য্যকে স্বেয়োজ্ঞান করে, রাষ্ট্রতন্ত্রে তাহাদের ধর্ম-বোধ অসাড় হইয়া থাকে। সেই জন্ত করাসী, ইংরাজ, জর্মান, রুশ, ইহারা পরস্পরকে কণট, ভণ্ড, প্রবন্ধক বলিয়া উচ্চ-স্বরে গালি দিতেছে।

ইহা হইতে এই প্রমাণ হয় যে, রাষ্ট্রীয় স্বার্থকে ইুরোপীয় সভ্যতা এতট অত্যন্তিক

এখান দিতেছে যে, সে ক্রমশই স্পষ্টিত হইয়া ক্রমশের উপর হস্তক্ষেপ করিতে উদ্যত হইয়াছে। এখন গত শতাব্দীর সাব্য-সোভারের মত যুরোপের যুখে পরি-হাস্যবাক্য হইয়া উঠিয়াছে। এখন যুটান্ মিশনারীদের যুখেও 'ভাই' কথার মতো ভ্রাতৃ-তাবের স্বর লাগে না।

অগমিখ্যাত পরিহাসরসিক মার্কটোয়েন গত কেক্রমারি মাসের মর্থ আমেরিকান্ রিভিযু পত্রে "তিনিবরানী ব্যক্তিটির প্রতি" (To the person sitting in darkness) নামক যে প্রবন্ধ লিখিয়াছেন, তাহা পাঠ করিলে আধুনিক সভ্যতার ব্যাধিলক্ষণ কিছু কিছু চোখে পড়িবে। তাঁর পরিহাসের দ্বারা প্রথরক্ষণিত সেই প্রবন্ধটি বাস্তবায়ন অসম্ভব কল্পনা করিয়া দেখা যায়। লেখাটি সভ্যমণ্ডলীর কঠোর হ্রস্ব নহি; কিন্তু প্রচুর লেখক স্বার্থপর সভ্যতার বন্দরভার যে সকল

উদাহরণ উদ্ধৃত করিয়া দিয়াছেন, তাহা প্রামাণিক। হর্গলের প্রতি সবলের অত্যাচার এবং হানাহানিকাতাকাত্তির যে চিত্র তিনি উল্লেখ করিয়াছেন, তাহার বিতীর্ণতা ও তাহার উচ্চল পরিহাসের আদ্যোকে ভীষণরূপে পরিষ্কৃত হইয়াছে।

রাষ্ট্রীয় স্বার্থপরতা যে যুরোপের সাহিত্য ও বন্ধকে ক্রমশ অধিকার করিতেছে, তাহা কাহারও অগোচর নাই। কিসি: একপে ইংরাজি সাহিত্যের স্বর্ধস্থানে, এবং চেবর্গেন ইংরাজ রাষ্ট্রযাপারের এক জন প্রধান কাতারী। ধর্মকে ভুল ছেটি যুগটির পশ্চাতে তাহার ভীষণ স্বার্থের মত পুচ্ছটি বিপত্ত ক'টাইয়া আসে—তেমনি মিশনারির করণ্ডত যুটান্ বন্দালোকের পশ্চাতে কি ব্যাপণ উৎপাত অগন্তকে দগুত করে, তাহা একপে অগমিখ্যাত হইয়া গেছে। এ সবকে মার্কটোয়েনের মতব্য পাদটাকার উদ্ধৃত হইল।*

*The following is from the "New York Tribune" of Christmas Eve. It comes from that Journal's Tokio Correspondent. It has a strange and impudent sound, but the Japanese are but partially civilized as yet. When they become wholly civilized they will not talk so.

"The missionary question, of course, occupies a foremost place in the discussion. It is now felt as essential that the Western Powers take cognizance of the sentiment here, that religious invasions of Oriental countries by powerful Western organizations are tantamount to filibustering expeditions, and should not only be discountenanced but that stern measures should be adopted for their suppression. The feeling here is that the missionary organizations constitute a constant menace to peaceful international relations."

Shall we? That is, shall we go on conferring our Civilization upon the peoples that sit in darkness, or shall we give those poor things a rest? Shall we bang right ahead in our old-time, loud, pious way, and commit the new century to the game; or shall we sober up and sit down and think it over first? Would it not be prudent to get our Civilization-tools together, and see how much stock is left on hand in the way of Glass Beads and Theology, and Maxim Guns and Hymn Books, and Trade-Gin and Torches of Progress and Enlightenment (patent adjustable ones, good to fire villages

প্রাচীন গ্রীক ও রোমক সভ্যতারও মূলে এই রাষ্ট্রীয় স্বার্থ ছিল। সেই স্বতন্ত্র রাষ্ট্র-বহু-বিশেষের সঙ্গে সঙ্গেই গ্রীক ও রোমক সভ্যতার অধঃপতন হইয়াছে। হিন্দুসভ্যতা রাষ্ট্রীয় একোত্র উপরে প্রতিষ্ঠিত নহে। সেই স্বতন্ত্র আমরা স্বাধীন হই বা পরাধীন থাকি, হিন্দুসভ্যতাকে সমাজের তিতর হইতে পুন-রায় সজীবিত করিয়া তুলিতে পারি, এ আশা জাগ করিবার নহে।

‘নেশন’ শব্দ আমাদের ভাষায় নাই, আমা-
দের দেশে ছিল না। সম্প্রতি ইউরোপীয় শিক্ষাগুণে জ্ঞানমূল্য মহত্বকে আমরা অত্যধিক আদর দিতে দেখিয়াছি। অথচ তাহার আদর্শ আমাদের অন্তঃকরণের মধ্যে নাই। আমাদের ইতিহাস, আমাদের ধর্ম, আমাদের সমাজ, আমাদের গৃহ, কিছুই নেশনগঠনের প্রাধান্ত স্বীকার করে না। ইউরোপে স্বাধীনতাকে যে গান দেয়, আমরা মুক্তিকে সেই গান দিই। আদ্যের স্বাধীনতা ছাড়া অন্য স্বাধীনতার মায়ায়া আনবা মানি না। ত্রিপুর বন্ধনই প্রধান বন্ধন—তাঁহা ভেদন করিতে পারিলে রাজমহারাজের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করি। আমাদের গৃহস্থের

কর্তব্যের মধ্যে সমস্ত জগতের প্রতি কর্তব্য অন্তর্ভুক্ত রহিয়াছে। আমরা গৃহস্থের মধ্যেই সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড ও ব্রহ্মাণ্ডপতির প্রতিষ্ঠা করিয়াছি। আমাদের সর্বপ্রধান কর্তব্যের আদর্শ এই একটি মন্ত্রেই রহিয়াছে—

ব্রহ্মসিদ্ধৌ বৃহৎ: ত্বং চতুর্ভূতপরিবৃত্ত:।

বহুং কথং অসুখীত তদ্ব্যজ্ঞি সর্বশ্রেয়:।

এই আদর্শ ব্যর্থভাবে ব্রহ্ম করা জ্ঞানমূল্য কর্তব্য অপেক্ষা চক্ৰহ এবং মহত্তর। এক্ষণে এই আদর্শ আমাদের সমাজের মধ্যে সজীব নাই বলিয়াই, আমরা ইউরোপকে দীর্ঘা ক্রি-তেছি। ইহাকে যদি ঘরে ঘরে সজীবিত করিতে পারি, তবে মউজ্ব বশুক ও দমদম বুনোদের সাহায্যে বড় হইতে হইবে না; তবে আমরা যথার্থ স্বাধীন হইব, যত্ন হইব, আমাদের বিজেতাদের অপেক্ষা নুন হইব না। কিন্তু তাহাদের নিকট হইতে ধনধান্তের দ্বারা যাহা পাইব, তাহার দ্বারা আমরা কিছুই বড় হইব না।

পনেছো যোলা শতাব্দী খুব দীর্ঘকাল নহে। নেশনই যে সভ্যতার অতিবাস্তি, তাহার চরম পরীক্ষা হয় নাই। কিন্তু ইহা দেখিতেছি, তাহার চারিই আদর্শ উচ্চতম

with, upon occasion), and balance the books, and arrive at the profit and loss, so that we may intelligently decide whether to continue the business or sell out the property and start a new Civilization Scheme proceeds ?

Extending the Blessings of Civilization to our Brother who Sits in Darkness has been a good trade and has paid well, on the whole ; and there is money in it yet, if carefully worked—but not enough, in my judgment, to make any considerable risk advisable. The people that Sit in Darkness are getting to be too scarce—too scarce and too shy. And such darkness as is now left is really of but an indifferent quality, and not dark enough for the game. The most of those People that Sit in Darkness have been furnished with more light than was good for them or profitable for us. We have been injudicious.

নহে। তাহা অস্ত্রের অধিষ্ঠার ও মিথ্যার দ্বারা আকর্ষণ এবং তাহার সজ্জার মধ্যে একটি ভীষণ নিদ্রারূপ আছে।

এই ভ্রাশনাল্য আদর্শকেই আমাদের আদর্শরূপে বরণ করিতে আমাদের মধ্যে ও কি মিথ্যার প্রভাব স্থান পায় নাই? আমাদের রাষ্ট্রীয় সভ্যগুলির মধ্যে কি নানা-প্রকার মিথ্যা, চাতুরী ও আত্মগোপনের আচ্ছন্নতা নাই? আমরা কি স্বার্থ কথা শ্রুতি করিয়া বলিতে শিখিতেছি? আমরা কি পরস্পর বলাবলি করি না। দে, নিজের স্বার্থের জন্য যাহা স্বপ্নীয়, রাষ্ট্রীয় স্বার্থের জন্য তাহা গৃহীত নহে। কিন্তু আমাদের দ্বায়েই কি বলে না?—

বন্দ এষ হতোঃ হস্তি বন্দোঃ একতি বন্ধিতঃ ।

তস্মাৎ বন্দোঃ ন তত্ত্বংবা না নোঃ বন্দোঃ ততোঃ বন্দীতঃ ।

বস্তুত প্রত্যেক সভ্যতারই একটি মূল আশ্রয় আছে। সেই আশ্রয়টি ধর্মের উপর প্রতিষ্ঠিত কি না, তাহাই বিচার্য। যদি তাহা উপায় বাপক না হয়, যদি তাহা ধর্মকে পীড়িত করিয়া বর্জিত হয়, তবে তাহার আগাত উন্নতি দেখিয়া আমরা তাহাকে বেন দীর্ঘা এবং তাহাকেই একমাত্র ঈশ্বর বলিয়া বরণ না করি।

আমাদের হিন্দু সভ্যতার মূল সমাজ, ইউরোপীয় সভ্যতার মূল রাষ্ট্রনীতি। সামাজিক মহত্বের বাহুব মাহাত্ম্য লাভ করিতে পারে। রাষ্ট্রনীতিক মহত্বেরও পারে। কিন্তু আমরা যদি মনে করি, ইউরোপীয় ছাঁদে বেশন্ গড়িয়া তোলাই সভ্যতার একমাত্র প্রকৃতি এবং মহত্বের একমাত্র লক্ষ্য, তবে আমরা ভুল স্থিতি।

বুশ্‌রোজ্‌ ।

মোগল বাদশাহদিগের আনোব-শ্রমোদের মধ্যে 'বুশ্‌রোজ্‌ ও নওরোজ্‌' পর্ক একটি প্রধান। পূর্ক পূর্ক বাদশাহদিগের সময় বিভিন্ন আকারে ইহা প্রচলিত থাকিলেও, সম্রাট ফুলশাহের স্বর্ণোপাসক আব্দুরশাহ ইহাতে আনোদের সঙ্গে ধর্মের একটুখানি সম্বন্ধ স্থাপন করিয়াছিলেন ও তাঁহার রাজ্য-

কালেই ইহা অত্যন্ত আড়ম্বরের সহিত সমাধা হইত। নববর্ষের আরম্ভে আমীর-ওমরাহ-দিগকে নিমন্ত্রিত করিয়া তোলা সেওয়া একটি প্রাচীন প্রথা বটে, কিন্তু সম্রাট আব্দুর এই প্রথার সহিত পারসীকদের স্বর্ণোপাসনার যোগ করিয়া দিয়াছিলেন। প্রতিবৎসর বৈশাখের প্রথমদিনে সূর্য্য দ্বন্দ্ব

বেশবাসিতে প্রবেশ করেন, তখন এই নও-রোজা পূর্ণ আরম্ভ হইত। প্রথম দিবস হইতে আরম্ভ করিয়া ঐ মাসের উনবিংশ দিন পর্যন্ত এই উৎসব থাকিত। এই উনবিংশতি দিবস রাজ্যময়, বিশেষত রাজধানী আগ্রা, আনন্দের স্রোত বহিয়া বাহিত। পুষ্পমালায়, বিবিধবর্ণের কেতনে, বিবিধ বেশ হইতে সমাগত বণিকৃন্দিগের নয়নরঞ্জন পণ্যবীথিকার, শোভন আলোক-মালায়, বিভিন্ন তোষণসম্ভার, রাজধানী অভিনববেশে সজ্জিত হইয়া নববৈশাখের বিকসিত বাসন্তী ঐকে আরও মনোরম করিয়া তুলিত। ইহার সহিত হরিণনেত্রের কটাক, স্বর্ণচূষণের শিল্পিতক্ষনি, কলকণ্ঠের তালপরপরিতক্ত সঙ্গীতমধুরী মিশিয়া রাজ-প্রাসাদে যে উৎসব উজ্জ্বলিত করিয়া তুলিত, তাহা আজ তিনশত বৎসরের পর অসুমান কল্পাও দুঃসাধ্য।

খুশরোজ্জ অর্থাৎ আনন্দের দিন, নও-রোজা বা নববর্ষের প্রথমদিবস। আকবরের চরিতাখ্যায়ক বদোনি শেষোক্ত পর্বেকে আর একটি বিশেষণে অভিহিত করিয়াছেন, “নওরোজা জলালি।” “জলালি”-শব্দের শব্দগত অর্থ—গৌরবময়, উজ্জল, বিখ্যাত, শক্তিপূর্ণ ইত্যাদি। আমাদের কৃত্রিম বোধে এ অর্থ না করিয়া আকবরের জলালউদ্দীন নাম হইতে ইহার অর্থ করা আরও সঙ্গত। এ অর্থ করিলে ‘আকবরের সাময়িক বা আকবর-কর্তৃক প্রচলিত’ বুঝায়। ‘জলালির’

উৎপত্তি বাহা হইতে হউক, বৎসরের প্রথম উৎসবের দিন বলিয়া ইহাকে ‘নওরোজা’ নাম দেওয়া হইয়াছিল। বসন্তের সময় পৃথিবীর সর্বত্রই একটা না একটা পূর্ণ প্রচলিত দেখা যায়। এ সময় বায়ুপ্রকৃতি যখন নবীন ত্র্যমলিনার অপূর্ণ ঐ ধারণ করে, যখন ধূলে ধূলে অস্তরীকে সর্বত্রই সৌন্দর্যের সঙ্গীত ধনিত হয়, তখন মানব-মনও স্বতই উল্লাসাবেগে ঢেঁকল হইয়া উঠে। প্রাচীন রোমানেরা এমত এ সময় ‘লুপার্কেলিয়া’ উৎসবে মত্ত হইতেন। ইংরাজদের ‘মে ফেটিভাল্’ ও আমাদের দেশের হোলি-কোৎসবও প্রকৃতির বসন্তলীলার সহিত যোগ-দান। আকবর এ দেশের এই বসন্তোৎসবের সহিত পার্শ্ব সম্প্রদায়ের সূর্য্যোপাসনা মিশাইয়া এই অভিনব নওরোজা পর্বের সৃষ্টি করেন।

নববর্ষের প্রথম দিনে সম্রাট্ একটি বৃহৎ ভোজ দিতেন। পূর্বে বলিয়াছি যে, প্রথম দিন হইতে উনবিংশ দিবস পর্যন্ত এই পূর্ণ প্রচলিত থাকিত। তাহার মধ্যে প্রথম, তৃতীয় ও উনবিংশ দিবসে বিশেষ উৎসব হইত। প্রথম ও উনবিংশ দুইদিকে সম্রাট্ রাজ্যের প্রধান প্রধান আমীন-ওমরাহ-দিগকে নিমন্ত্রিত করিয়া একটি বৃহৎ ভোজ দিতেন। এতদ্ব্যতীত ঐ দুই দিবসে নীন-দরিত্রদিগকে অনেক অর্থ বিতরণ করা হইত। মাসের তৃতীয় দিনের ব্যাপার-বর্ণনাই আমাদের প্রবন্ধের বক্তব্য বিষয়।

* আকবরের পুত্র নাম—হুমায়ুন মহম্মদ জলালুদ্দীন পাদিশাহ-গাজী।

আইন-ই-আকবরীর প্রকয়ান-কৃত অঙ্গুলের কিত্র এট পুত্র নাম একটু পুণক্ আকারে দেখা যায়, সেখানে—আবুল্ ফজল জলালুদ্দীন মহম্মদ আকবর পাদিশাহ-গাজী।

বাঙালার ঐতিহাসিকেরা খৃস্টোত্তর ও নও-
রোজ্যের মধ্যে প্রভেদ করেন না, কিন্তু এক-
পক্ষসংক্রান্ত হইলেও উইটি সম্পূর্ণ বিভিন্ন দিব-
সের ঘটনা। ইহার প্রথম দিবসের নাম 'নও-
রোজ্' অর্থাৎ নববর্ষের প্রথম দিন ও তৃতীয়
দিবসের নাম 'খৃস্টোজ্' আনন্দের দিন।
আবার 'নওরোজ' বা নববর্ষের ভোজ বৎ-
সরে একদিন হইত, কিন্তু 'খৃস্টোজ্' প্রত্যেক
মাসেই হইত। আবুলকজল বলেন, এই
দিনে দূরদেশী রাজনীতিজ্ঞ সম্রাট আব্বাস
রাজ্যের গুপ্ত রহস্ত, বিভিন্ন প্রদেশের প্রজা-
দের চরিত্র ও অভাব এবং নানাবিধের
বিবিধ তথ্য অবগত হইবার জন্য এক বৃহতী
মেলা আহ্বান করিতেন। এই মেলা
পাশ্চাত্য Fancy-Bazar ধরণের হইত।
(ব্রহ্মানু সাহেব এ কথার এই অনুবাদই
দিয়াছেন।) এই বৃহতী মেলায় অসংখ্য
অধিক মূল্যে বিক্রীত হইবার আশায়
বহুদূর দেশ হইতে বহুদেশের বচনুলা
পণ্যদ্রব্য লইয়া সওদাগরেরা সমাগত হইত।
এই খৃস্টোজ্ উৎসবের বর্ণনা করিতে সিদ্দা
বহিও আবুলকজল এই সমস্ত দ্রব্যের কোনও
বিশেষ বর্ণনা করেন নাই, তথাপি তাঁহার
ও বন্দোনির ইতিহাসের অন্যান্য স্থানের
বর্ণনায়, ও বর্ণির, টাভারনিরে প্রভৃতি
বৈদেশিক ভ্রমণকারীদের ভ্রমণের বর্ণনায়,
সে সমস্ত পণ্যদ্রব্যের কতক উল্লেখ পাওয়া
যায়। সে সমস্ত দ্রব্যের সংক্ষিপ্ত তালিকা,
বোধ হয়, আধুনিক পাঠকদের নিকট
অপ্রীতিকর হইবে না। পারস্ত, সিরিয়া, বেলুট

হইতে উৎকৃষ্ট গালিচা ও রেশমী দ্রব্য,
সিরাঙ্ক হইতে উৎকৃষ্ট 'সিরাঙ্কী' নামক
যদিয়া, কান্দীর হইতে মহাধর্ম বিবিধ বর্ণের
শাল, হীরাট, শুজুর্গ, হুগোপ প্রভৃতি স্থান
হইতে পরিখচিত স্থানর মণ্ডল, পারস্ত ও
কাবুল হইতে উৎকৃষ্ট কিংখাব, বঙ্গদেশ
হইতে উৎকৃষ্ট রেশমী বস্ত্র, গঙ্গোতুল-
নামক জড়র পাত্রেঃপত্র গরুদ্রব্য, লাফা,
মরীচ, মোষ, অহিফেন, নানাপ্রকারের
ওষধি, বিবিধ প্রকারের পক্ষী, মিল্লী ও
মুহুশিখাবাদের হস্তিযন্ত্রনির্মিত খেলনা,
সুদূর মলয়াচল হইতে আনীত খেত, রক্ত
পীত, তিন প্রকারের চন্দন, * অগুয় ও
রাজধানী আগ্রার নির্মিত খেতপ্রস্তরের
(সঙ্ক্ মন্দির) খেলনা, সমুদ্রতল হইতে সংগৃ-
হীত অম্বরনামক সুগন্ধি গরুদ্রব্য, সাইপ্রাস
হইতে আনীত গাদন, চীন ও হিন্দুস্থানের
বিভিন্ন প্রদেশ হইতে সংগৃহীত কপূর,
আটীন ও মধ্যভারত হইতে আনীত অগুরু,
গুগুগু, গোরা, মীন্, চুয়া, শিগারদ, সুবান,
কলাষক প্রভৃতি বাসমাহী গরুদ্রব্য লইয়া
কত দেশ হইতে কত সওদাগর আসিয়া এই
উৎসবে যোগদান করিত। ইহা ছাড়া, স্বর্ণ,
রৌপ্য, হীরক ও নানাবিধ মণিমুক্তার
বোঝান সজ্জিত হইত। বোম্বল বাঙ্গালাহোয়া,
মিশেবত সম্রাট আব্বাস, পুন্সের বড় ভক্ত
ছিলেন ও বহুবল্যে তিনি বিবিধ পুশ সংগ্রহ
করাইতেন। ভারতবর্ষের ভার এত বিভিন্ন
উৎকৃষ্ট সুগন্ধি পুশ পৃথিবীর অন্য কোন
দেশে আছে কি না, সন্দেহ। আবুলকজল

* আবুলকজল চন্দনের উৎপত্তির চীনদেশ বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন; কিন্তু অন্যান্য বর্ণনাও জানা যায়,
মলয়াভারত ইত্যাদি প্রদেশ উৎপত্তির।

তাহার ইতিহাসএবং নিখিরাছেন যে, এই পুষ্পবহুল বেশেও পুষ্পের উৎপাদনে কোন ব্যয় করা হইত না, কিন্তু সম্রাট বাবরের সময় এখানকার পুষ্পোৎসাহান বহুযত্নে তৈয়ারি করা হইত। একদা প্রাণাদসংলগ্ন নরনাতিশয় উদ্যানমালা বৈদেশিক পর্যটকের তুরঙ্গী প্রাণসার বিষয়ীভূত হইয়াছে। এই উৎসবে যে সব পুষ্পের বিপণি বসিত, সে বিচিত্র বর্ণের বিবিধ পুষ্পরাগির নাম পর্যন্তও আজ-কাল শুনিতে পাই না। তাহারা যোগল-রাজবের অস্ত্রাভ্র ঐরগাগোরবের সহিতই যেন ভারত হইতে বিলুপ্ত হইয়াছে। সেইউতি, চম্পা, কেতকী, কেওড়া, - চান্দা, তন্দ্রী-গুলাল, চাবেলি, রায়বেল, কপূরবেল, সিঙার-হর (হরিশঙ্কর বা শেকালিকা), পাদল, সুঙুয়া, সুই (মুখিকা), নিওয়ারী, জাফ্রাণ, আফ্রাবী ও কয়াল (বিভিন্ন প্রকারের সূর্যমুখী), গফরী, রহমজলী, রহমালা, কেত, কনের, কদম্ব, নাংকেশর, হুরপন, শ্রীখণ্ডী, হেনা, হুপহরিয়া, হুচম্পা (হুমি-চম্পক), হুরপন, সেনবেল, হুন্দার্দ, মালতী, ধনন্তর, শিরীষ ইত্যাদি পুষ্পের ছাতি বসিয়া দাঁড়িত। আবুলফজল আরও কত পুষ্পের উৎকট পারঙ্গী নাম দিয়াছেন, তাহার তালিকা দিয়া পাঠককে বিরক্ত করিতে চাহি না।

ফলের বাজারে—ইরাণ, তুরাণ, সমর্থল, কাবুল ও কান্দাহার হইতে ফলবিজ্ঞেতা আসিত—অনেক সুস্বাদু মহার্ঘ ফল আনিত।

অরুণ ও কাবুলের তরঙ্গ, আবুলোস, সমর্থলের আপেল, কান্দাহার ও কান্দীরের সুমিষ্ট রসপূর্ণ প্রাকাকল, শিঙ্গি, খোবানি, নাস-পাকি, মনকা, চিলগুয়া, তোলুশিরি, পনিরালা, গুস্তী, তারী, পিয়ার, আত্র, শালক, পিওলু, শিরাশি, অমলবেং, কর্ণা প্রভৃতি বিচিত্র সুস্বাদু ফলসমূহের অনেকগুলির নাম কেবল ইতিহাসগত হইয়া আছে—এতকাল পশ্চিমা-ফলে থাকিবার ইহাদের মধ্যে অনেকগুলি ফল কখনও আমাদের দৃষ্টিগোচর হয় নাই, অথচ আবুলফজল পেণ্ডণিকে অতি সুস্বাদু বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন।

বাজার বোধ হয় প্রাণাদের নিকটেই বসিত। আবুলফজল ও বদৌনি প্রমুখ ইতিহাসিকেরা কোন্ স্থানে যে এ মেলা বসিত, তাহা স্পষ্ট করিয়া লেখেন নাই। তবে যখন বেগম ও অস্ত্রাভ্র হারেমের লোকেরা এই উৎসবে যোগ দিতেন, তখন বোধ হয় যে, প্রাণাদের সমীপস্থ কোন স্থানে অথবা প্রাণাদের ভিতরের বৃহৎ প্রাঙ্গণে এই বৃহৎ বাজার বসিত। রমণীদের মেলায় দিন বেগমেরা ও অস্ত্রাভ্র সম্রাট আদীর-ওমরাহ-দের পরিবারেরা এই উৎসবে, নিমন্ত্রিত হইতেন। সে দিন বাদশাহ বাতীত অস্ত্র পুরুষের সম্পর্কমাত্র থাকিত না—শাহ-জাদারাও এই দিনে মেলায় আসিতে অর্হুমতি পাইতেন না। রমণীতে কিনিত, রমণীতেই বেচিত। বহিঃক্ষেত্র এই পর্য্য বর্ণনা করিতে করিতে বলিয়াছেন—

* কেতকী ও তাহার অন্তর্গত কেওড়া আমরা একবিধ পুষ্প বলিয়া জানি। কিন্তু আবুলফজল ইহাদের মধ্যে এই অস্ত্রের সেনাইয়াছেন যে, কেতকী ফল ও কেওড়া আকারে ইরাণ, হিউগ, অফেক ও বৃহৎ ও কেওড়ার পাতার নীচী খণ্ডে - রস আন আন দিবার উদ্দেশ্যে সমস্তা সেনা দায়

রমণিতে বেচে রমণিতে কেনে

লোকেতে রমণিপের হাট !

বসন্ত সে এক বিচিত্র দৃশ্য ! সেই অনরা-
বতীলাহিত রানধানীর বিচিত্র প্রাসাদে,
সেই নন্দননিখি-উদ্যানমালায়, সেই উর্ধ্বশী-
রস্তা-বেনকার গর্জধরুকারিণী স্নানরীধিগের
সমাপনে, সেই বিবিধ বর্ণের বিচিত্রকাক-
কার্ধ্যখচিত-ফাটিকাধারবস্তি-সুগন্ধীপাবনীর
আলোকচ্ছটাগ, সৌন্দর্যের যে তরঙ্গ
উঠিত, তাহা বর্ণনা করা দুঃসাধ্য ! উৎসবের
এ দিনে সম্রাটের অগণিত অর্ববাহ হইত ।
অনেক সম্রাট আদীর-ওবরাহের পত্নীরা
সমাপ্ত হইতেন—তাঁহাদের অনেক দোকান
বসিত । বেগমেরা ও যথঃ সম্রাট যখন ক্রেতা,
তখন পণ্যতবা অত্যধিক অসম্ভব মূল্যে
বিক্রীত হইবে, তাহাতে বিচিত্র কি ?
সম্রাটের অনেক অন্তঃপুরিকা আবার নানা-
কার্ধ্যনিপুণ । তাঁহাদের হস্তনির্মিত
অনেক দ্রব্য আবার তাঁহাদের পরিচারি-
কাদের দ্বারা বিক্রীত হইত । যথঃ বাৎশাহ
এই সব দ্রব্য ক্রয় করিয়া বেগমদের শিল্প-
বিদ্যার উৎসাহ দিতেন । ইহা ছাড়া, বদৌনি
বলেন, এ দিনে হারেমের (রাজাস্তঃপুরের)
অন্যান্য গুরুতর কার্যের মীমাংসা ও অবরোধ-
বাগিনীষের পুত্রকন্যার পরিণয়সম্বন্ধের কথা
হির হইত । কথিত আছে যে, জাহাঙ্গীর-মাতা
হরিরম্ উল্-বানাকে (হিন্দু নাম হুশ-পা)
এই যুগ্মরোজ উৎসবে দেখিয়া, তাঁহার

রূপলাবণ্যে মুগ্ধ হইয়া, আক্বের তাঁহাকে
বিবাহ করিতে কৃতকল্প হন । *

এই উৎসবে সম্রাট আদীর-ওবরাহ ও
অধীন রাজাদের পরিবারস্থ মহিলাদের যে
উপস্থিত থাকিতে হইত, ইহাতে শুভকল উৎ-
পন্ন হয় নাই । ইহাতে যে অনেক রাজ-
সভাসম্মান আত্মরিক বিরক্ত হইতেন, এরূপ
ঐতিহাসিক প্রমাণ আছে । আইন-উল-জাক-
বতী-লেখক আবুলফজল, এ উৎসবে সম্রাট
জাহাঙ্গীর শুভ বৃত্তান্ত প্রভৃতি অবগত হইতেন,
এই বলিয়া তাঁহার বুদ্ধি-বিক্ষেপতার প্রশংসা
করিয়াছেন ; তথাপি বিরক্তমত আলোচনা
করিলে বোধ হয় যে, উৎসবে এরূপ জীলোক
আনয়ন করিয়া দিল্লীর রাজ্যে অনেক অন্তঃ-
সলিল বিষেবস্রোত প্রবাহিত করিয়াছিলেন ।
পূর্বে বলিয়াছি, অনেক হিন্দু যুগ্মনান্ ওমরাহ
ইহাতে আত্মরিক বিরক্ত ছিলেন । আবুল-
ফজল এই বিরক্তির—এই অসন্তোষের
আভাসমাত্রও দেন নাই । তবে তিনি বৈষ্ণব
সম্রাটের অনুরক্ত ভক্ত, (এল্‌ফিন্‌ষ্টোন
বলিবেন—নীচ চাটুকর) তাহাতে তাঁহার
সকল কথা বিশ্বাস করা অসম্ভব । অন্তত
সভা বিচার করিতে হইলে হুগফের কথা
ওনা উচিত । বিপক্ষপক্ষের মধ্যে ঐতি-
হাসিক বদৌনি একজন প্রধান । তিনি
বলেন যে, অন্তঃপুরিকাদের এরূপ বেলার
আদিতে দিয়া আক্বের ইসলামধর্মের মূলে
আর এক কুঠাধাঘাত করিয়াছিলেন । বসন্ত

* আমাদের দেশের ও দিবেশের অনেক ঐতিহাসিক আক্বেরের এই মহিলাকে 'যোৎবাই' নাম দিয়াছেন ।
অধ্যাপক ব্রহ্মানু যোৎবাইয়েছেন যে, যোৎবাই জাহাঙ্গীরের মাতা নহেন, পত্নী । তিনি যোৎবপুরের রাজা উদয়-
সিংহের দুহিতা ও সাচাভাভানের জননী । জাহাঙ্গীরের জননী রাজা বিহারী মলের দুহিতা ও রাজা ভগদানবাসের
কন্যা । (Vide the translation of Ayn-e-Akbari p. 619).

নিজের ঘরের অপর্যাপ্তা কুলললনার। যে অপর পুরুষের নেত্রপথবিন্দিনী হইবেন, ইহা অনেকেরই অলঙ্কার হইয়াছিল। কথিত আছে, রাজপুতকুলতিলক প্রতাপসিংহের নিকট যখন আকবর সন্ধিপ্রস্তাব করিয়া পাঠান, তাহাতে পুণ্ড্রোজ্ উৎসবে নিজের অন্তঃপুরবাসিনীকে উৎসবে যোগ দিতে দিবেন, এ সর্ত্ত থাকায়, সেই বীরকেশরী অধিকতর জোড়াখিত হইয়া সন্ধিপত্র ছিঁড়িয়া ফেলেন ।

শ্রীলোকদের এই বাজারের পর, পুরুষদের এই ‘ক্যান্সি বাজার’ বসিত। উহার বিশেষ কিছু বর্ণনা করিবার নাই। ইহাতে যে সব দ্রব্য বিক্রীত হইত, তাহার তালিকা পূর্বে দিয়াছি। যে সমস্ত লোকেরা দরবারে

আসিতে অধুনতি পাইত, তাহারাই এ বেলায় দ্রব্যাদি ক্রয় করিত। সম্রাট্ স্বয়ং বেলায় উপস্থিত থাকিয়া সকল বিষয়ের তত্ত্বাবধান করিতেন বলিয়া, সামান্য বিক্রো-তাও, সম্রাটের অঙ্গদারী অহুচরদের দ্বারা প্রতিকল্প না হইয়া, নিজের বিক্রয় দ্রব্যাদি দেখাইতে,—বীর হৃৎকণ্ঠ জ্ঞাপন করিতে পারিত। বাদশাহ অবস্থা বিবেচনা করিয়া সাধু বিক্রোতাদিগকে পুরস্কার ও প্রত্যাহারক অঙ্গ বিক্রোতাদিগকে শাস্তি দিতেন। এ দ্বলেও সৎদাগেরেরা জিনিষ বেচিয়া পুছুর লাভ করিত। সম্রাট্ বিক্রীত দ্রব্যের মূল্যাদি সম্বন্ধে তদারক ও মূল্যাদির হিসাব রাখিতে স্বস্তর কোষাধ্যক্ষ প্রভৃতি কর্মচারী রাখিয়াছিলেন।

শ্রীবীরেশ্বর গোস্বামী ।

চোথের বালি ।

(৫)

কিছুকাল অনাবৃষ্টিতে যে শস্যবল শুষ্ক পীতবর্ণ হইয়া আসে, বৃষ্টি পাইবামাত্র সে আর বিলম্ব করে না; হঠাৎ বাড়িয়া উঠিয়া দীর্ঘকালের উপবাসদৈন্য দূর করিয়া দেয়, দুর্জলনতভাবে তাগ করিয়া শস্যক্ষেত্রের মধ্যে অসংকোচে অসংশয়ে আপনার অধিকার উন্নত ও উজ্জল করিয়া তোলে, আশার সেইরূপ হইল। যেখানে তাহার রক্তের সঞ্চয় ছিল, সেখানে সে কখনো আত্মীয়তার দাবী

করিতে পায় নাই; আজি পরের ঘরে আসিয়া সে যখন বিনা প্রার্থনার এক নিকটতম সম্বন্ধ এবং নিঃসন্দেহ অধিকার প্রাপ্ত হইল, যখন সেই অবতলালিতা অনা-ধার মন্তকে স্বামী সহজে লক্ষীর মুকুট পরাইয়া দিলেন, তখন সে আপন গৌরব-পদ গ্রহণ করিতে লেশমাত্র বিলম্ব করিল না,—নববধূযোগ্য লক্ষ্যতার দূর করিয়া দিয়া মোড়াগাবতী গৌর মহিমায় মুহূর্তের মধ্যে

হানীর পদপ্রান্তে এসেচে আপন সিংহাসন
অধিকার করিল।

রাজলক্ষী সেদিন মধ্যাহ্নে সেই সিংহাসনে
এই নূতন আশ্রয় পরের মেথেকে এমন
চিত্তাকান্তবৎ স্পর্শের সহিত বসিয়া থাকিতে
বেথিয়া চুপসহ বিশ্বের নীচে নামিয়া নামি-
লেন। নিঃশব্দ চিত্তবাহে অরপূর্ণাকে বড়
করিতে গেলেন। কহিলেন—“ওগো, মেথগে,
তোমার নবাবের পুত্রী, নবাবের ঘর হইতে
কি শিক্ষা লইয়া আসিয়াছেন। কঠোর
থাকিলে আজ—”

অরপূর্ণা কাতর হইয়া কহিলেন—“দাদি,
তোমার বোকে তুমি শিক্ষা দিবে, শাসন
করিবে—আমাকে কেন বলিতেছ?”

রাজলক্ষী ধুটেভালের নত বাজিয়া উঠি-
লেন,—“আমার বো! তুমি মরী থাকিতে সে
আমাকে গ্রাহ্য করিবে!”

তখন অরপূর্ণা সশর পদক্ষেপে দল্লতীকে
সচকিত সচেতন করিয়া মহেন্দ্রের শয়নগৃহে
উপস্থিত হইলেন। আশাকে কহিলেন—
“তুই এমনি করিয়া আমার মাথা হেঁট করিবি
পোড়ারুখী? লজ্জা নাই সন্মম নাই, সমর
নাই অসমর নাই, বৃদ্ধা শাওড়ির উপর সমর
ঘরকরা চাপাইয়া তুমি এখানে আত্মন করি-
তেছ? আমার পোড়া কপাল, আমি
তোমাকে এ ঘরে আনিয়াছিলাম!”

বসিতে বসিতে তাঁহার চোখ দিয়া জল
ঝরিয়া পড়িল—আশাও নতবুখে বস্ত্রাকল
খুঁটিতে খুঁটিতে নিঃশব্দে গাড়াইয়া কাটিতে
লাগিল!

মহেন্দ্র কহিল—“কাকী, তুমি বউকে

কেন অনায়াস ভৎসনা করিতেছ? আমিই ত
উহাকে ধরিয়া রাখিয়াছি!”

অরপূর্ণা কহিলেন—“সে কি ভাল কাজ
করিয়াছে? ও বালিকা, অনায়া, মার কাছ
হইতে কোন দিন কোন শিক্ষা পায় নাই,
ও ভালমন্দ কি জানে! তুমি উহাকে কি
শিক্ষা দিতেছ?”

মহেন্দ্র কহিল—“এই বেথ, উহার জন্যে
প্রেম খাটা বই কিনিয়া আনিয়াছি। আমি
বোকে লেখাপড়া শিখাইব, তা লোকে
নিন্দাই করুক, আর তোমরা রাগই কর!”

অরপূর্ণা কহিলেন—“তাঁই কি, সমস্ত
দিনই শিখাইতে হইবে? সন্ধ্যার পর এক
আধ ঘণ্টা পড়ালেই ত তের হয়।”

মহেন্দ্র। অস্ত সহজ নয় কাকী—পড়া-
তনার একটু সময়ের দরকার হয়।

অরপূর্ণা বিরক্ত হইয়া ঘর হইতে বাহির
হইয়া গেলেন। আশাও দীর্ঘে দীর্ঘে তাঁহার
অনুসরণের উপক্রম করিল—মহেন্দ্র দ্বার রোধ
করিয়া গাড়াইল—আশার করুণ সঙ্গল মেত্রে
কাতর অনুর মালিল না। কহিল—“রোস,
দুখাইয়া সময় নষ্ট করিয়াছি, দেটা পোখাইয়া
লইতে হইবে!”

এমন পতীর প্রকৃতি প্রদেয় নৃপ থাকি-
তেও পারেন, যিনি মনে করিবেন, মহেন্দ্র
নিদ্রাবেশে গাড়াইবার সময় নষ্ট করিয়াছেন
—বিশেষরূপে তাঁহাদের অবগতির জন্য বদা
আবশ্যক যে, মহেন্দ্রের তত্ত্বাবধানে অধ্যাপক-
কার্য্য বেক্ষেপে নির্বাহ হয়, কোন দুলের
ইন্সপেক্টর তাহার অনুমোদন করিবেন না!

আশা তাহার বানীকে বিশ্বাস করি-
রাছিল; সে বস্ত্রতই মনে করিয়াছিল, লেগা-

পড়া দেখা তাহার পক্ষে নানা কারণে সহজ নহে বটে, কিন্তু স্বামীর আদেশবশত নিতান্তই কর্তব্য। এইজন্য সে প্রাণপণে অশান্ত বিকিণ্ড মনকে সংযত করিয়া আনিত, শয়নগৃহের মেঝের উপর ঢালা বিছানার এক পার্শ্বে অত্যন্ত গভীর হইয়া বসিত এবং পুঁথিপত্রের দিকে একেবারে কুঁকিয়া পড়িয়া মাথা দুলাইয়া মুখস্থ করিতে আরম্ভ করিত। শয়নগৃহের অপর প্রান্তে ছোট টেবিলের উপর ডাক্তারী বই খুলিয়া মাষ্টার মশায় চৌকিতে বসিয়া আছে, মাঝে মাঝে কটাক্ষপাতে ছাত্রীর মনোযোগ লক্ষ্য করিয়া দেখিতেছে। দেখিতে দেখিতে, হঠাৎ ডাক্তারি বই বন্ধ করিয়া মহেন্দ্র আশার ডাকনাম ধরিয়া ডাকিল—“হুমি!” সচকিত আশা মুখ তুলিয়া চাহিল। মহেন্দ্র কহিল—“বইটা আন দেখি—দেখি কোন্‌পান্টা পড়িতেছে?”

আশার ভয় উপস্থিত হইল, পাছে মহেন্দ্র পরীক্ষা করে। পরীক্ষার উত্তীর্ণ হইবার আশা অল্পই ছিল। কারণ, চাকুপাঠের চাকু-প্রলোভনে তাহার অবাধ্য মন কিছুতেই বশ মানেন না; বন্দীকসম্বন্ধে সে বতই জ্ঞান-লাভের চেষ্টা করে, অক্ষরগুলি ততই তাহার দৃষ্টিপথের উপর দিয়া কালো পিঁপালিকার মত সার বাঁধিয়া চলিয়া যায়।

পরীক্ষকের ডাক শুনিয়া অপরাধী মত আত্মা ভয়ে ভয়ে বইখানি লইয়া মহেন্দ্রের চৌকীর পাশে আসিয়া উপস্থিত হয়। মহেন্দ্র এক হাতে কটিদেশে যেটন পূর্বক তাহাকে দৃঢ়রূপে বন্দী করিয়া অপর হাতে বই ধরিয়া কহে—“আজ কতটা পড়িলে দেখি!”

আশা বতভুলা লাইনে চোখ দুলাইয়াছিল, দেখাইয়া দেয়। মহেন্দ্র ক্ষুণ্ণরূপে বলে—“উঃ! একটা পড়িতে পারিয়াছে? আমি কতটা পড়িয়াছি দেখিবে?” বলিয়া তাহার ডাক্তারী বইয়ের কোন একটা অধ্যায়ের শিরোনামটি মুখ মাত্র দেখাইয়া দেয়!—আশা বিস্ময়ে চোখ দুটা ডাগর করিয়া বলে, “তবে এতক্ষণ কি করিতেছিলে?” মহেন্দ্র তাহার চিবুক ধরিয়া বলে, “আমি একজনদের কথা ভাবিতেছিলাম, কিন্তু বাহার কথা ভাবিতেছিলাম, সেই নিষ্ঠুর তখন চাকুপাঠে উইপোকাকর অত্যন্ত মনোহর বিবরণ লইয়া তুলিয়া ছিল।” আশা এই অনুলক্ষ অভিযোগের বিরুদ্ধে উপস্থিত জবাব বিতে পারিত—কিন্তু হায়, কেবল-মাত্র লজ্জার খাতিরে, প্রেমের প্রতিযোগিতার, অজ্ঞার পরাভব নীরবে মানিয়া গইতে হয়।

ইহা হইতেই স্পষ্ট প্রমাণ হইবে, মহেন্দ্রের এই পাঠশালাটি সরকারী বা বেসরকারী কোন বিভাগের কোন নিয়ম মানিয়া চলে না।

হয় ত একদিন মহেন্দ্র উপস্থিত নাই—সেই সুযোগে আশা পাঠে মন দিবার চেষ্টা করিতেছে, এমন সময় কোথা হইতে মহেন্দ্র আসিয়া তাহার চোখ তিপিয়া ধরিল, পরে তাহার বই কাড়িয়া লইল, কহিল, “নিষ্ঠুর, আমি না থাকিলে তুমি আমার কথা ভাব’ না, পড়া লইয়া পাক?”

আশা কহিল, “তুমি আমাকে মূৰ্খ করিয়া রাখিবে?”

মহেন্দ্র কহিল, “তোমার কল্যাণে আমারই বা বিদ্যা! এমন কি অগাধর হইতেছে?”

কথাটা আশাকে হঠাৎ বাজিল ;—তৎ-
কপাৎ চলিয়া বাইবার উপক্রম করিয়া কহিল,
“আমি তোমার পড়ার কি বাধা দিচ্ছি ?”

মহেন্দ্র তাহার হাত ধরিয়া কহিল, “তুমি
তাহার কি বুঝবে ? আমাকে ছাড়িয়া
তুমি বস সহজে পড়া করিতে পার, তোমাকে
ছাড়িয়া তত সহজে আমি আমার পড়া
করিতে পারি না !”

শুভ্রতর দোবারোপ ! ইহার পরে বস্তা-
বতই শরতের একপদ্যার মত একদফা
কান্নার স্রষ্টি হয় এবং অনতিকালমধ্যেই
কেবল একটু সম্মল উজ্জলতা রাখিয়া দোহা-
পের সূর্যালোকে তাহা বিলীন হইয়া যায় ।

শিক্ষক যদি শিক্ষার সর্বপ্রধান অন্তরায়
হয়, তবে অবলা ছাত্রীর সাধ্য কি, বিদ্যা-
রণ্যের মধ্যে পপ করিয়া চলে ? নাহে নাহে
মাসীমার তীর্থ তৎসনামনে পড়িয়া চিত্ত বিচ-
লিত হয়—বুঝিতে পারে, যেথাপড়া একটা
ছুতা-মাত্র ; শাত্তিক দেখিলে লজ্জায়
মরিয়া যায় । কিন্তু শাত্তি তাহাকে কোন
কাজ করিতে বলেন না, কোন উপদেশ
দেন না ; অন্যদিকে হইয়া আশা শাত্তির
গৃহকার্য্যে সাহায্য করিতে গেলে, তিনি
ব্যক্তসমস্ত হইয়া বলেন—“কর কি, কর কি,
শোঁবার ঘরে বাও. তোমার পড়া কামাই
হইতেছে !”

অবশেষে অসম্পূর্ণ আশাকে কহিলেন,
“তোমার বা শিক্ষা হইতেছে. সেত বেখিতেছি,
এখন মহিন্কেও কি ডাক্তারি দিতে দিবি
না ?”

তিনিয়া আশা মনকে পুৰ শক্ত করিল—
মহেন্দ্রকে বলিল, “তোমার এগ্জামিনের

পড়া হইতেছে না—আজ হইতে আমি
নীচে মাসীমার ঘরে পিছা থাকিব !”

এ বরসে এত বড় কঠিন সমস্যাসত্ত্বে !
শরনাগর হইতে একেবারে মাসীমার ঘরে
আত্মনির্ভাসন ! এই কঠোর প্রতিজ্ঞা উচ্চা-
রণ করিতে তাহার চোখের আশ্রয়ে জল
আসিয়া পড়িল, তাহার অবস্থা ক্ষুদ্র অথর
কাপিয়া উঠিল এবং কঠবর কণ্ঠস্বর হইয়া
আসিল ।

মহেন্দ্র কহিল, “তবে তাই চল, কাতীর
ঘরেই বাওরা থাক—কিন্তু তাহা হইলে
তাঁহাকে উপরে আনাসের ঘরে আসিতে
হইবে ।”

আশা এত বড় উদার গভীর প্রস্তাবে
পরিহাস প্রাপ্ত হইয়া রাগ করিল । মহেন্দ্র
কহিল—“তার চেয়ে তুমি বধঃ দিনরাত্তি
আমাকে চোখে চোখে রাখিয়া পাহারা দাও,
দেখ আমি এগ্জামিনের পড়া মুখস্ত করি
কি না !”

অতি সহজেই সেই কথা দ্বির হইল ।
চোখে চোখে পাহারার কার্য্য কিন্তু তাহা
নির্ভীহ হইত, তাহার বিস্তারিত বিবরণ
দেওয়া অন্যবস্তক—কেবল এইটুকু বলি-
লেই যথেষ্ট হইবে যে, সে বৎসর মহেন্দ্র
পরীক্ষার কেল্ করিল এবং চারপাঠের
বিস্তারিত বর্ণনা-সবেও পুরুষলবধে আশার
অনভিজ্ঞতা দূর হইল না !

এইরূপ অস্পূর্ণ পঠন-পাঠন-ব্যাপার যে
সম্পূর্ণ নির্বিঘ্নে সম্পন্ন হইয়াছিল, তাহা
বলিতে পারি না । বিহারী মাঝে মাঝে
আসিয়া অত্যন্ত গোপন বাধাইয়া দিত ।
“মহিন্ দা, মহিন্ দা” করিয়া সেপাড়া মাথায়

করিয়া তুলিত। মহেশ্বকে তাহার শরন-
গৃহের দ্বিধা হইতে টানিয়া না বাহির
করিয়া সে কোনমতেই ছাড়িত না। পড়ার
শৈথিল্য করিতেছে বলিয়া, সে মহেশ্বকে
শ্রমের সৎসনা করিত। আশাকে বলিত,
“বোটা’ন, গিলিয়া খাইলে হজম হয় না,
চিবাইয়া খাইতে হয়—এখন সমস্ত অন্ন এক-
প্রাণে গিলিতেছ, টাহার পরে হজমিগুলি
খুঁজিয়া পাইবে না।”

মহেশ্ব বলিত, “চুনি, ও কথা শুনিয়া
না—বিহারী আমাদের স্থখে হিংসা
করিতেছে।”

বিহারী বলিত—“স্থখ যখন তোমার
হাতেই আছে, তখন এমন করিয়া ভোগ
কর, বাহাতে পরের হিংসা না হয়।”

মহেশ্ব উত্তর করিত, “পরের হিংসা
পাইতে যে স্থখ আছে! চুনি, আর একটু
হইলেই আমি পর্দভের মত তোমাকে বিহা-
রীর হাতে সমর্পণ করিতেছিলাম।”

বিহারী রক্তবর্ণ হইয়া বলিয়া উঠিত—
“হুণ!”

এই সকল ব্যাপারে আশা মনে মনে
বিহারীর উপরে ভাবি বিরক্ত হইত। এক সময়
তাহার সহিত বিহারীর বিবাহপ্রস্তাব হইয়া-
ছিল বলিয়াই বিহারীর প্রতি তাহার এক-
প্রকার বিব্রত ভাব ছিল, বিহারী তাহা
বৃথিত এবং মহেশ্ব তাহা লইয়া আঘোষ
করিত।

রাজলক্ষী বিহারীকে ডাকিয়া ভ্রূংখ
করিতেন। বিহারী কহিত, “মা, পোকা
যখন গুটি বাঁধে, তখন তত বেশি ভয় নয়—
কিন্তু যখন কাটিয়া উড়িয়া যায়, তখন

কেমনো শক্ত। কে মনে করিয়াছিল, ও
তোমার বন্ধন এমন করিয়া কাটিবে?”

মহেশ্বের ফেল্‌কল্লা-সংবাদে রাজলক্ষী
গ্রীষ্মকালের আকস্মিক অগ্নিকাণ্ডের মত
দাউদাউ করিয়া জ্বলিয়া উঠিলেন, কিন্তু
তাহার গর্জন এবং দাহনটা সম্পূর্ণ ভোগ
করিলেন অন্তর্গত। তাহার আহা-নিজ্ঞা
দূর হইল।

(৬)

একদিন নববর্ষার বর্ণনুগরিষ্ঠ মেঘাজ্জর
সম্বাহে গারে একখানি স্থবাসিত কুহক্রে
চাপর এবং গলায় একগাছি জুইকুলের
গোড়ে মাণ্য পরিয়া মহেশ্ব আনন্দমনে
শরনগৃহে প্রবেশ করিল। ইহাৎ আশাকে
বিশ্বাস চকিত করিবে বলিয়া জুতার শব্দ
করিল না। ঘরে উঁকি দিয়া দেখিল,
পূর্বদিকের খোলা জানালা দিয়া প্রবল
বাতাস সৃষ্টি হইয়া লইয়া ঘরের মধ্যে
প্রবেশ করিতেছে;—বাতাসে দীপ নিবিয়া
গেছে এবং আশা নীচের বিধানায় উপরে
পড়িয়া অবাককণ্ঠে কানিতেছে।

মহেশ্ব ত্রুতপনে কাছে আসিয়া নিজ্ঞাসা
করিল, “কি হইয়াছে?”

বালিকা দ্বিগুণ আবরণে কানিয়া উঠিল।
অনেকক্ষণ পরে মহেশ্ব ক্রমশ উত্তর পাইল যে,
বাসীমা আর সহ্য করিতে না পারিয়া তাহার
পিসুত ভাইয়ের বাসায় চলিয়া গেছেন।

মহেশ্ব রাগিয়া মনে করিল—“পেলেন
যদি, এমন বাদলার সন্ধ্যাটা মাটি করিয়া
পেলেন।”

শেষফলে সমস্ত রাগ মাতার উপরে
পড়িল। তিনিই ৩ সকল অশান্তির মূল

মহেন্দ্র কহিল—“কাকী যেখানে গেছেন, আমরাও সেখানে যাইব, দেখি, মা কাহাকে লইয়া কগড়া করেন!”

বলিয়া অনাবশ্যক সোয়গোল করিয়া জিনিষপত্র-বাধাবাধি দুটে-ডাকডাকি হুক করিয়া দিল।

রাজলক্ষ্মী সমস্ত ব্যাপারটা বুঝিলেন। ধীরে ধীরে মহেন্দ্রের কাছে আসিয়া শান্তবরে জিজ্ঞাসা করিলেন, “কোথার যাইতে হু?”

মহেন্দ্র প্রথমে কোন উত্তর করিল না। দুইতিন বার প্রশ্নের পর উত্তর করিল, “কাকীর কাছে যাইব।”

রাজলক্ষ্মী কহিলেন, “তোদের কোথাও যাইতে হইবে না, আমিই তোরা কাকীকে আনিয়া দিতেছি।”

বলিয়া তৎক্ষণাৎ পাঠী চড়িয়া অরুপূর্ণার বাসায় গেলেন। গলায় কাপড় দিয়া ঘোড়হাত করিয়া কহিলেন—“প্রসন্ন হও বেঙ্গবো, মাগ কর!”

অরুপূর্ণা শব্দবাত্ত হইয়া রাজলক্ষ্মীর পায়ের ধূলা লইয়া কাতরবরে কহিলেন, “দাদি, কেন আমাকে অপরাধী করিতেছ? তুমি বেবন আচ্ছা করিবে, তাই করিব!”

রাজলক্ষ্মী কহিলেন, “তুমি চলিয়া আসিয়াছ বলিয়া আমার ছেলে-বোঁর ঘর ছাড়িয়া আসিতেছে।” বলিতে বলিতে অভিযানে ক্রোধে থিকারে তিনি কাঁদিয়া কেলিলেন।

হুই জা বাড়ী কিরিয়া আসিলেন। তখনো বৃষ্টি পড়িতেছে। অরুপূর্ণা মহেন্দ্রের বরে বধন গেলেন, তখন আগার রোদন শান্ত হইয়াছে এবং মহেন্দ্র নবন কপার ছলে

তাহাকে হাসাইবার চেষ্টা করিতেছে। লক্ষণ দেখিয়া বোধ হয়, বাধার লক্ষ্যটা সম্পূর্ণ বার্থ না যাইতেও পারে।

অরুপূর্ণা কহিলেন—“তুমি, তুমি আমাকে ধরেও থাকিতে দিবি না, অন্য কোথাও গেলেও সঙ্গে লাদিবি? আমার কি কোথাও শান্তি নাই?”

আশা অকস্মাৎ বিহ্বলগীর মত চকিত হইয়া উঠিল।

মহেন্দ্র একান্ত বিব্রত হইয়া কহিল, “কেন কাকী, তুমি তোমার কি করিয়াছে?”

অরুপূর্ণা কহিলেন, “বোঁ-মাহুদের এত বেহায়াপনা দেখিতে পারি না বলিয়াই চলিয়া গিয়াছিলাম, আবার শত্রুতিকে কাঁদাইয়া কেন আমাকে ধরিয়া আনিয়া পোড়ানুখী?”

জীবনের কবিত্ব-অধ্যায়ে মা-বুড়ী যে এমন বিষ, তাহা মহেন্দ্র জানিত না!

পরদিন রাজলক্ষ্মী বিহারীকে ডাকাইয়া কহিলেন, “বাছা, তুমি একবার মহীন্দ্রকে বল, অনেকদিন বেশে যাই নাই, আমি বাস্তাসতে যাইতে চাই।”

বিহারী কহিল—“অনেকদিনই যখন দান নাই, তখন আর নাই গেলেন। আচ্ছা, আমি মহীন্দ্রকে বলিয়া দেখি, কিন্তু সে যে কিছুতেই রাজি হইবে, তা বোধ হয় না!”

মহেন্দ্র কহিল, “তা, ভগ্নহান দেখিতে ইচ্ছা হয় বটে! কিন্তু বেশিদিন মার সেখানে না থাকাই ভাল—বর্ষার সময় আরপাটা ভাল নয়।”

মহেন্দ্র সহজেই সম্মতি দিল দেখিয়া বিহারী বিব্রত হইল। কহিল—“মা একলা যাইবেন, কে তাহাকে দেখেন? যেখানে-

কেও সঙ্গে পাঠাইয়া দাও না !” বলিয়া একটু হাসিল ।

বিহারীর গুঢ় ভৎসনার মধ্যে কৃত্তিত হইয়া কহিল—“তা বুঝি আর পারি না !” কিন্তু কথাটা ইহার অধিক আর-অগ্রসর হইল না ।

এমনি করিয়াই বিহারী আশার চিত্র বিরূপ করিয়া দেয়, এবং আশা তাহার উপরে বিরক্ত হইতেছে মনে করিয়া, সে যেন এক-প্রকারের শুক আমোদ অগ্রস্তর করে ।

বলা বাহুল্য, রাজলক্ষী জগদ্বান দেখিবার জন্য অত্যন্ত উৎসুক ছিলেন না । গ্রীষ্মে নদী বখন কমিয়া আসে, তখন মাকি যেমন পথে পথে লগি ফেলিয়া দেখে, কোপায় কত জন,— রাজলক্ষীও তেমনি ভাবাগ্রের সহস্র মাতা-পুত্রের সম্পর্কের মধ্যে লগি ফেলিয়া দেখিতে-ছিলেন । তাহার বাসনতে যাওয়ার প্রস্তাব যে এত শীঘ্র এত সহজেই তল পাইবে, তাহা তিনি আশা করেন নাই । মনে মনে কহিলেন, “অন্নপূর্ণার গৃহত্যাগে এবং আমার গৃহত্যাগে প্রভেদ আছে,—সে হইল মনু-জানা ডাইনি, আর আমি হইলাম শুভমাত্র মা, আমার যাওয়াই ভাল !”

অন্নপূর্ণা ভিতরকার কথাটা বুঝিলেন, তিনি মহেন্দ্রকে বলিলেন, “দ্বিদি গেলে আমিও থাকিতে পারিব না !”

মহেন্দ্র রাজলক্ষীকে কহিল, “ওনিতেছ যা ? তুমি গেলে কার্কাও যাইবেন, তাহা হইলে আমাদের ঘরের কাজ চলিবে কি করিয়া ?”

রাজলক্ষী বিধেববিধে অশ্রুপ্লবিত হইয়া কহিলেন, “তুমি যাটবে বেড় বো ?

এও কি কখন হয় ? তুমি গেলে চলিবে কি করিয়া ? তোমার পাকা চাইই !”

রাজলক্ষীর আর বিলম্ব সহিল না । পর-দিন মধ্যাহ্নেই তিনি বেশে যাইবার জন্য প্রস্তুত । মহেন্দ্রই যে তাঁহাকে বেশে রাখিয়া আদিবে, এ বিষয়ে বিহারীর বা আর কাহারো সন্দেহ ছিল না । কিন্তু সময়কালে দেখা গেল, মহেন্দ্র মার সঙ্গে একজন সন্ন্যাস ও ঘরোয়ান পাঠাইবার ব্যবস্থা করিয়াছে ।

বিহারী কহিল, “বহিন্দ্ৰা, তুমি যে এখনো তৈরি হও নাই ?”

মহেন্দ্র লজ্জিত হইয়া কহিল, “আমার আবার কালেকের—”

বিহারী কহিল—“আচ্ছা তুমি থাক, মাকে আমি পৌছাইয়া দিয়া আসিব ।”

মহেন্দ্র মনে মনে হাসিল । বিরলে আশাকে কহিল, “ব্যস্তবিক বিহারী বাড়ী-বাড়ি আরম্ভ করিয়াছে ! ও দেখাইতে চায়, গেল ও আমার চেয়ে মার কথা বেশী তাবে !”

অন্নপূর্ণাকে থাকিতে হইল, কিন্তু তিনি লজ্জার কোতে ও বিরক্তিতে সজ্জিত হইয়া রহিলেন । পুড়ীর এইরূপ দুরতাব দেখিয়া মহেন্দ্র রাগ করিল এবং আশাও অস্তিমান করিয়া রহিল !

(৭)

রাজলক্ষী জগদ্বমিতে পৌছিলেন । বিহারী তাঁহাকে পৌছাইয়া চলিয়া আসিবে, এরূপ কথা ছিল, কিন্তু সেগানকার অবস্থা দেখিয়া সে ফিরিল না ।

রাজলক্ষীর পৈতৃক বাসিতে চুট একটু

অভিবৃদ্ধা বিধবা বাঁচিয়া ছিলেন মাত্র ।
চারিদিকে ঘন জঙ্গল ও বাশবন, পুতরিণীর
জল স্বেদবর্ণ, মিনে চপুতে শেফালের ডাকে
রাজলক্ষীর চিত্ত উদ্ভূত হইয়া উঠে ।

বিহারী কহিল, “মা, জন্মভূমি বটে, কিন্তু
‘স্বর্গাদপি পরীক্ষণী’ কোনমতেই বলিতে
পারি না । কলিকাতার চল ! এখানে
তোমাকে পরিত্যাগ করিয়া গেলে আমার
অর্থ হইবে ।”

রাজলক্ষীরও প্রাণ ঠাপাইয়া উঠিয়াছিল,
এমন সময় বিনোদিনী আসিয়া তাহাকে
আশ্রয় দিল এবং আশ্রয় করিল ।

বিনোদিনীর পরিচয় প্রথমেই বেওয়া
হইয়াছে । এক সময়ে মহেন্দ্র এবং ভদ্রভাবে
বিহারীর সহিত তাহার বিবাহের প্রস্তাব
হইয়াছিল । বিধিনির্বন্ধে তাহার সহিত
তাহার গুপ্তবিবাহ হয়, সে লোকটির সমস্ত
অস্ত্রবস্ত্রিষের মধ্যে প্রীচাইট ছিল সর্বাংশে
প্রবল । সেট প্রীচাইট অতিভারেই সে
দীর্ঘকাল জীবন ধারণ করিতে পারিল না ।

তাহার বৃত্তার পর হইতে বিনোদিনী,
জঙ্গলের মধ্যে একটিনাশ উদ্যানলতার মত,
নিদানন্দ পরীর মধ্যে মুচ্যমানভাবে জীবন-
যাপন করিতেছিল । অদ্য সেই অনাথা
আসিয়া তাহার রাজলক্ষী পিসু-পাশ ঠাক-
রূপকে ভক্তিমতে প্রণাম করিল এবং তাহার
সেবার আত্মসমর্পণ করিয়া দিল ।

সেবা ইহাকেই বলে ! বৃহত্তর জনা
আলস্য নাই ! কেমন পরিপাটি কাজ,
কেমন সুন্দর রান্না, কেমন সুমিষ্ট কথাবার্তা !

রাজলক্ষী বলেন—“বেলা চটল না, তুমি
ছুটি খাওগে না ?”

সে কি শোনে ! পাখা করিয়া পিসিকে
ঘুম না পাড়াইয়া সে উঠে না ।

রাজলক্ষী বলেন, “এমন করিলে যে
তোমার অস্থব করিবে না !”

বিনোদিনী নিজের ঐতি নিরন্তর
তাড়িয়া প্রকাশ করিয়া বলে—“আমাদের
হঃখের পরীয়ে অগ্রুধ করে না পিসিমা ।
আহা, কতদিন পরে জন্মভূমিতে আগিয়াছ,
এখানে কি আছে, কি দিয়া তোমাকে
আদর করিব !”

বিহারী দুইদিনে পাড়ার কর্তা হইয়া
উঠিল । কেহ তাহার কাছে রোগের ঔষধ,
কেহ বা মকদ্দমার পরামর্শ লইতে আসে,
কেহ বা নিজের ছেলেকে বড় আপিসে কাজ
জুটাইয়া দিবার জন্য তাহাকে খেতে, কেহ বা
তাহার কাছে ধরখাত লিখাইয়া লয় । বৃদ্ধদের
তান-পাশার বৈঠক হইতে বাগদিদের তাড়ি-
পানসভা পথান্ত সর্বত্র সে তাহার সাক্ষাৎক
কোড়হল এবং সাতাবিক হদ্যাতা লইয়া
যাতায়াত করিত—কেহ তাহাকে দূর মনে
করিত না, অথচ সকলেই তাহাকে সম্মান
করিত ।

বিনোদিনী অস্তঃপুরের অন্তরাল হইতে,
এই অস্থানে পতিত কলিকাতার ছেলেকির
নির্কাসনমত্ত বখাখা গুণু করিবার ছেটা
করিত । বিহারী এতোকবার পাড়া পড়াটন
করিয়া আসিয়া দেখিত, কে তাহার ঘরটিকে
এতোকবার পরিপাটি-পরিচ্ছন্ন করিয়া রাখি-
য়াছে, একটি কাপার মাসে দুচারটি ফুল এবং
পাতার তোড়া লাগাইয়াছে এবং তাহার
গদির একধারে বকিম ও শীনবন্ধর এখাবলী
গুড়াইয়া রাখিয়াছে । এতের ভিতরের

মলাটে মেরেলি অণ্ড পাক। অকরে বিনো-
দিনীর নাম লেখা ।

পল্লীগঙ্গার প্রচলিত আতিথ্যের সহিত
ইহার একটু প্রভেদ ছিল। বিহারী তাহারি
উল্লেখ করিয়া প্রশংসাবাদ করিলে রাজলক্ষ্মী
কহিলেন—“এই মেরেকে কি না তোরা
অগ্রাহ্য করিলি !”

বিহারী হাসিয়া কহিত—“ভাল করি
নাই মা, ঠকিয়াছি। কিন্তু বিবাহ না করিয়া
ঠকা ভাল—বিবাহ করিয়া ঠকিলেই মুকিল ।”

রাজলক্ষ্মী কেবলি মনে করিতে লাগি-
লেন, “আহা, এই মেরেই ত আমার বধু
হইতে পারিত ! কেন হইল না !”

রাজলক্ষ্মী কলিকাতার কিরিবার এলফ-
মাত্র উপাশন করিলে বিনোদিনীর চোখ
ছলছল করিয়া উঠিত। সে বলিত, “পিসিমা,
তুমি দুদিনের জন্যে কেন এলে? যখন
তোমাকে জানিতাম না, দিন ত একরকম
করিয়া কাটিত ! এখন তোমাকে ছাড়িয়া
কেনন করিয়া থাকিব ?”

রাজলক্ষ্মী মনের আবেগে বলিয়া ফেলি-
লেন, “মা, তুমি আমার ঘরের বউ হলিনে
কেন? তা হইলে তোকে বুকের মধ্যে
করিয়া রাখিতাম !”

সে কথা শুনিয়া বিনোদিনী কোন
দুতার লজ্জার দেখান হইতে উঠিয়া বাইত।

রাজলক্ষ্মী কলিকাতা হইতে একটা
কাতর অহনরপত্রের অপেক্ষা ছিলেন।
তাঁহার মহীন্ প্রস্রাবধি কখনো এতদিন মাকে
ছাড়িয়া থাকে নাই—নিশ্চয় এতদিনে মার
বিচ্ছেদ তাহাকে অধীর করিয়া তুলিতেছে।
রাজলক্ষ্মী তাঁহার ভেলের অভিমান এবং

আবদারের সেই চিঠিখানির জন্য তৃপ্তিত
হইয়া ছিলেন।

বিহারী মহেন্দ্রের চিঠি পাইল। মহেন্দ্র
লিখিয়াছে, “মা যোধ হর অনেক দিন পরে
জন্মভূমিতে গিয়া বেগ সুখে আছেন !”

রাজলক্ষ্মী ভাবিলেন, “আহা, মহেন্দ্র
অভিমান করিয়া লিখিয়াছে ! সুখে আছেন !
হতভাগিনী মা না কি মহেন্দ্রকে ছাড়িয়া
কোথাও সুখে থাকিতে পারে !”

“ওঁ বিহারী, তার পরে মহীন্ কি লিখি-
য়াছে, পড়িয়া শোনো না বাছা !”

বিহারী কহিল, “তার পরে কিছুই না
মা !—” বলিয়া চিঠিখানা দুঠার মধ্যে বলিত
করিয়া একটা বহির মধ্যে পুত্রিয়া ঘরের এক
কোণে ধপু করিয়া ফেলিয়া দিল।

রাজলক্ষ্মী কি আর হির থাকিতে
পারেন ! নিশ্চয় মহীন্ মার উপর এমন
রাগ করিয়া লিখিয়াছে যে, বিহারী তাহাকে
পড়িয়া শোনাইল না।

বাছুর যেমন গাতীর স্তনে আঘাত করিয়া
দুগ্ধ এবং বাৎসল্যের সঞ্চার করে—মহেন্দ্রের
রাগ ভেদনি রাজলক্ষ্মীকে আঘাত করিয়া
তাঁহার অরুণ বাৎসল্যকে উৎপারিত করিয়া
দিল ! তিনি মহেন্দ্রকে কমা করিলেন।
কহিলেন, “আহা, বো লইয়া মহীন্ সুখে
আছে, সুখে থাক—যেমন করিয়া হোক, সে
সুখী হোক ! বোকে লইয়া আমি তাহাকে
আর কোন কষ্ট দিব না ! আহা, বে মা
কখনো তাহাকে একদণ্ড ছাড়িয়া থাকিতে
পারে না, সেই মা চলিয়া আসিয়াছে বলিয়া
মহীন্ মার পরে রাগ করিয়াছে।—”

বারবার তাঁর চোখ দিয়া তল উল্লিয়া উঠিতে লাগিল।

সেদিন রাজলক্ষী বিহারীকে বারবার আসিয়া বলিলেন, “বাও বাবা, তুমি হান করগে বাও! এখানে তোমার বড় অনিয়ম হইতেছে!”

বিহারীও সেদিন হানাহারে বেশ প্রস্তুতি ছিল না—সে কহিল—“মা, আমার মত লক্ষীছাড়া কান্না অনিয়মেই ভাল থাকে!”

রাজলক্ষী পীড়াপীড়ি করিয়া কহিলেন—“না বাচ্চা, তুমি হান করিতে বাও!”

বিহারী সহস্রবার অহুত চট্টা নাহিতে গেল। সে ঘরের বাহির হইবারাই রাজলক্ষী বাহির ভিতর চট্টিতে তাড়াতাড়ি সেই কুক্কিত বলিত চিঠিখানি বাহির করিয়া লইলেন।

বিনোদিনীর হাতে চিঠি দিয়া কহিলেন, “বেশ ত না, মহীন্ বিহারীকে কি লিখিয়াছে!”

বিনোদিনী পড়িয়া শুনাইতে লাগিল। মহেন্দ্র প্রথমটা মার কথা লিখিয়াছে, কিন্তু সে অতি অল্পই—বিহারী বতটুকু শুনাইয়াছিল, তাহার অধিক নহে।

তার পরেই আশার কথা! মহেন্দ্র যত্নে রহস্যে আনন্দে যেন মাতাল হইয়া লিখিয়াছে।

বিনোদিনী একটুখানি পড়িয়া শুনাইয়াই লজ্জিত হইয়া থাখিয়া কহিল, “শিসিয়া, ও আর কি শুনিবে!”

রাজলক্ষীর রেহবাগ্র মুখের ভাব এক মুহূর্তের মধ্যেই পাথরের মত শক্ত হইয়া যেন কনিয়া গেল। রাজলক্ষী একটুখানি

চুপ করিয়া রহিলেন, তার পরে বলিলেন, “থাক!” বলিয়া চিঠি ফিরৎ না লইয়াই চলিয়া গেলেন।

বিনোদিনী সেই চিঠিখানা লইয়া ঘরে ঢুকিল। ভিতর হইতে মার বন্ধ করিয়া বিছানার উপর বসিয়া পড়িতে লাগিল।

চিঠির মধ্যে বিনোদিনী কি রস পাইল, তাহা বিনোদিনীই জানে। কিন্তু তাহা কোতুকর নহে। বারবার করিয়া পড়িতে পড়িতে তাহার ছই চক্ষু মধ্যাহ্নের বালুকার মত জলিতে লাগিল, তাহার নিশ্বাস মক-তুমির বাতাসের মত উত্তপ্ত হইয়া উঠিল।

মহেন্দ্র কেমন, আশা কেমন, মহেন্দ্র-আশার প্রণয় কেমন, ইত্যাদি তাহার মনের মধ্যে কেবলি পাক খাইতে লাগিল। চিঠিখানা কোলের উপর চাপিয়া ধরিয়া পা ছড়াইয়া দেয়ালের উপর ছেলান্ দিয়া অনেকক্ষণ লম্বুখে চাহিয়া বসিয়া রহিল।

মহেন্দ্রের সে চিঠি বিহারী মার খুঁজিয়া পাইল না!

সেইদিন মধ্যাহ্নে হঠাৎ অরপূর্ণা আসিয়া উপস্থিত। দুঃসংবাদের আশঙ্কা করিয়া রাজলক্ষীর বুকটা হঠাৎ কাঁপিয়া উঠিল—কোন প্রসন্ন করিতে তিনি সাহস করিলেন না, অরপূর্ণার দিকে পাণ্ডুবর্ণমুখে চাহিয়া রহিলেন।

অরপূর্ণা কহিলেন, “দাদি, কলিকাতার খবর সব ভাল।”

রাজলক্ষী কহিলেন—“তবে তুমি এখানে যে!”

অরপূর্ণা কহিলেন—“দাদি, তোমার ঘর-কমার তার তুমি লওসে। আমার আর

সংসারে মন নাই! আমি কাশা যাইব বলিয়া যাত্রা করিয়া বাহির হইরাছি। তাই তোমাকে প্রণাম করিতে আসিলাম। জানে অজ্ঞানে অনেক অপরাধ করিয়াছি, মাফ করিয়ো। আর তোমার বৌ (বলিতে বলিতে চোখ তরিয়া উঠিয়া বল পড়িতে লাগিল)—মে ছেলেমানুষ, তাহার মা নাই, সে দোষী হোক্ নির্দোষী হোক্, মে তোমার। ”—আর বলিতে পারিলেন না।

রাজলক্ষ্মী ব্যস্ত হইয়া তাঁহার দানাহারের ব্যবস্থা করিতে গেলেন। বিহারী খবর পাইয়া পনাই ঘোষের চতুর্থগণ হইতে ছুটিয়া আসিলেন। অন্নপূর্ণাকে প্রণাম করিয়া কহিলেন, “কাকীমা, সে কি হয়? আমাদের ভূমি নির্ধম হইয়া কেলিয়া যাইবে!”

অন্নপূর্ণা অগ্রদমন করিয়া কহিলেন, “আমাকে আর ফিরাইবার চেষ্টা করিল নে বেহারী—তোরা সব সুখে থাক্, আমার ক্ষত্রে কিছুই আটকাইবে না।”

বিহারী কিছুক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। তার পরে কহিল—“মহেন্দ্রের ভাগা মন্ড, তোমাকে সে বিদায় করিয়া দিল।”

অন্নপূর্ণা সচকিত হইয়া কহিলেন, “অমন কথা বলিদ্ নে। আমি মহিনের উপর কিছুই রাগ করি নাই। আমি না গেলে সংসারের মঙ্গল হইবে না।”

বিহারী দুই মিকে চাহিয়া নীরবে বসিয়া রহিল। অন্নপূর্ণা অকল হইতে এক-ঘোড়া মোটা সোনার বাগা গুলিয়া কহিলেন, “বাবা এই বাগাঘোড়া ভূমি রাখ—বোমা বধন আসিবেন, আমার আশীর্বাদ দিয়া তাঁহাকে পরাইয়া দিও।”

বিহারী বাগাঘোড়া মাগার ঠেকাইয়া অন্নপূর্ণার করিতে পারেন যত চলিয়া যেন।

বিদায়কালে অন্নপূর্ণা কহিলেন, “বেহারী, আমার মহীনকে আর আমার আশাকে দেখিস!” রাজলক্ষ্মীর হস্তে একখানি কাগজ দিয়া বলিলেন—“যত্নের সম্পত্তিতে আমার যে অংশ আছে, তাহা এই দানপত্রে মহেন্দ্রকে লিখিয়া দিলাম। আমাকে কেবল মাসে মাসে পনেরোট করিয়া টাকা পাঠাইয়া দিহো।”

বলিয়া ভূতলে পড়িয়া রাজলক্ষ্মীর পদ-ধূলি মাথায় তুলিয়া লইলেন এবং বিদায় হইয়া তীর্থোদ্দেশে যাত্রা করিলেন।

(৮)

আশা কেমন ভয় পাইয়া গেল। একি হইল! যা চলিয়া যান, নারীমা চলিয়া যান! তাহাদের স্বখ যেন সকলকেই তাড়াইতেছে, এবার যেন তাহাকেই তাড়াইবার পালা! পরিত্যক্ত নৃত্ত গৃহস্থালীর মাঝখানে দাম্পত্যের নূতন প্রেমলীলা; তাহার কাছে কেমন অগস্ত তেজিতে লাগিল!

সংসারের কঠিন কস্তব্য হইল প্রেমকে স্থলের যত ছিঁড়িয়া যতর করিয়া গইলে, তাহা কেবল আপনাতর রসে আপনাকে সঙ্গীত রাখিতে পারে না, তাহা ক্রমেই বিষম ও বিকৃত হইয়া আসে। আশাও মনে মনে দেখিতে লাগিল, তাহাদের অবিভ্রাম মিলনের মধ্যে একটা প্রান্তি ও দুর্ভাগ্য আছে। সে মিলন যেন থাকিয়া থাকিয়া কেবল দুঃখের পড়ে—সংসারের দূত ও প্রলয় আগের অতঃপর তাহাকে

টানিয়া খাড়া রাখাই কঠিন হয়। কাজের মধ্যেই প্রেমের মূল না থাকিলে, ভোগের বিকাশ পরিপূর্ণ এবং স্থায়ী হয় না।

মহেন্দ্রও আপনায় বিমুখ সংসারের বিকছে বিস্ত্রোহ করিয়া আপন প্রেমোৎসবের সকল বাতিগুলোই একদলে জ্বালাইয়া পুঁর সমারোহের সহিত পুত্রগৃহের অকলাপের মধ্যে মিলনের আনন্দ সমাধা করিতে চেষ্টা করিল। আশার মনে সে একটুখানি খোঁচা দিয়াই কহিল, “চুনি, তোমার আগকাল কি হইয়াছে বল দেখি? নাসী গেছেন, তা লইয়া অমন মন ভার করিয়া আছ কেন? আনন্দের হৃৎকনার ভাল-বাসাতেই কি সকল ভালবাসার অবলান নয়?”

আশা উত্তর দিয়া ভাবিত, “তবে ত আমার ভালবাসার একটা কি অসম্পূর্ণতা আছে! আমি ত নাসীর তপা প্রাইই তাবি; শান্তি চলিয়া গেছেন বলিয়া ত আমার তর হয়!” তখন সে প্রাণপণে এই সকল প্রেমের অপস্রাধ কালন করিতে চেষ্টা করে।

এখন গৃহকথা ভাল করিয়া চলে না—চাকর-বাকররা ফাঁকি দিতে আরম্ভ করিয়াছে! একদিন কি অশ্রু করিয়াছে বলিয়া আসিল না, বাবুনচাঁকুর মদ খাইয়া নিরুদ্ধ হইয়া রহিল। মহেন্দ্র আশাকে কহিল—“বেশ মজা হইয়াছে, আজ আনন্দের নিম্নের রক্তনের কাজ সাহিয়া লইব।”

মহেন্দ্র পাড়ি করিয়া নিউমার্কেটে বাজার করিতে গেলেন। কোন্ জিনিষটা কি পরিমাণে দরকার, তাহা তাঁহার কিছু নাঞ জানা ছিল না—কতকগুলো বোঝা

লইয়া আনন্দে ঘরে ফিরিয়া আসিলেন। সেগুলো লইয়া যে কি করিতে হইবে, আশাও তাহা ভালরূপ জানেন না। পরীক্ষার বেলা ছটা তিনটা হইয়া গেল এবং নানাবিধ অভূতপূর্ন অখাদ্য উদ্ভাবন করিয়া মহেন্দ্র অত্যন্ত আনন্দে বোধ করিলেন। আশা মহেন্দ্রের আনন্দে লগ্ন দিতে পারিল না, আপন অজ্ঞতা ও অক্ষমতার মনে মনে অত্যন্ত লজ্জা ও ক্ষোভ পাইল।

ঘরে ঘরে জিনিষপত্রের এমনি বিশৃঙ্খলা ঘটিয়াছে যে, আবস্তকের সময় কোন জিনিষ খুঁজিয়া পাওয়াই কঠিন। মহেন্দ্রের চিকিৎসার অত্র একদিন তরকারী কুড়িবার কার্যে নিযুক্ত হইয়া আবক্ষনার মধ্যে অজ্ঞাতবাস গ্রহণ করিল এবং তাঁহার নোটের খাতা হাতপাখার একটিনি করিয়া রাত্রিভয়ের ভয়-শব্দে বিপ্রাস করিতে লাগিল।

এই সকল অভাবনীয় ব্যবস্থাবিপর্ন্যয়ে মহেন্দ্রের কৌতুকের সীমা রহিল না, কিন্তু আশা ব্যথিত হইতে থাকিল। উজ্জ্বল বর্ণের চোখের স্রোতে সমস্ত দরকারী ভাসাইয়া হালাসুখে তাগিয়া চলা বালিকার কাছে বিতীবিকাননক বলিয়া বোধ হইতে লাগিল।

একদিন সন্ধ্যার সময় জইমনে ঢাকা-বারান্দার বিছানা করিয়া বসিয়াছেন। সমুখে খোলা ছাঁচ। বৃষ্টির পরে কলিকাতার দিগন্ত-ব্যাপি-সৌখিনধরপ্রণী খোয়াংখার প্রাণিত। বাগান হইতে স্নানীকৃত ভিজা বকুল সংগ্রহ করিয়া আশা নতশিরে মালা গাঁথিতেছে। মহেন্দ্র তাহা লইয়া টানটানি করিয়া বাধা ঘটাইয়া ত্রিভুজ সমালোচনা করিয়া অনর্থক একটা কলহ গুটি করিবার

উদ্বেগ করিতেছিলেন। আশা এই সকল অকারণ উৎপীড়ন লইয়া তাহাকে ভৎসনা করিবার উপক্রম করিবারাত্র মহেন্দ্র কোন একটি কৃত্রিম উপায়ে আশার মুখ বন্ধ করিয়া শাসনবাচ্য অত্মরেই বিনাশ করিতেছিলেন।

এমন সময় প্রতিবেশীর বাড়ীর পিছরের মধ্য হইতে পোতা কোকিল কুহকুহ করিয়া ডাকিয়া উঠিল। তখন মহেন্দ্র এবং আশা তাহাদের মাথার উপরে দোহলামান খাঁচার দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন। তাহাদের কোকিল, প্রতিবেশী কোকিলের কুহশ্রুনি কখনো নীরবে সহ্য করে নাই, আজ সে জবাব দেয় না কেন ?

আশা উৎকণ্ঠিত হইয়া কহিল, “পাখীর আজ কি হইল ?”

মহেন্দ্র কহিল, “তোমার কণ্ঠ শুনিয়া লক্ষ্য বোধ করিতেছে।”

আশা সাহসের সহরে কহিল, “না, ঠাট্টা নয়, দেখনা উহার কি হইয়াছে !”

মহেন্দ্র তখন খাচা পাড়িয়া নামাইলেন। খাঁচার উপরের আবরণ খুলিয়া দেখিলেন, পাখী মরিয়া গেছে। অরপূর্ণা বাওয়ার পর বেহারা ছুটি লইয়া গিয়াছিল, পাখীকে কেহ দেখে নাই।

দেখিতে দেখিতে আশার মুখ স্নান হইয়া গেল। তাহার আঁচুল চলিল না—ফুল পড়িয়া রহিল! মহেন্দ্রের মনে আঘাত লাগিলেও, অকালে রসভঙ্গের আশঙ্কার ব্যাপারটা সে হাসিয়া উড়াইবার চেষ্টা করিল। কহিল—“ভালই হইয়াছে; আমি ডাক্তারী করিতে যাইতাম, আর ওটা কৃত্তরের তোমাকে অলাচিয়া মার্বত

এই বলিয়া মহেন্দ্র আশাকে ব্যতপাণে বেঠেন করিয়া কাছে টানিয়া লইবার চেষ্টা করিল।

আশা আগে আগে আপনাকে ছাড়াইয়া লইয়া অঁচল শূন্য করিয়া বহুলগুণা ফেলিয়া দিল। কহিল—“আর কেন! হিহি! তুমি ঈশ্বর বাও, মাকে ফিরাইয়া আন দে।”

(২)

এমন সময় দোতলা হইতে “মহিন্দ্রা মহিন্দ্রা” রব উঠিল। “আরে কে হে, এস এস!” বলিয়া মহেন্দ্র জবাব দিল। বিহারীর সাদা পাইরা মহেন্দ্রের চিত্ত উৎফুল্ল হইয়া উঠিল। বিবাহের পর বিহারী মাঝে মাঝে তাহাদের স্নেহের বাধাবন্ধন আনিয়াছে—আজ সেই বাধাই স্নেহের পক্ষে একান্ত প্রয়োজনীয় বলিয়া বোধ হইল।

আশাও বিহারীর আগমনে আশ্রয় বোধ করিল। মাথার কাপড় দিয়া সে তাড়াতাড়ি উঠিয়া পড়িল দেখিয়া মহেন্দ্র কহিল, “বাও কোথায়? আর ত কেহ নয়, বিহারী আসিতেছে।”

আশা কহিল, “ঠাকুরপোর গলখাবারের বন্দোবস্ত করিয়া গিই দে।”

একটা কিছু কন্ড করিবার উপলক্ষ্য আশার উপস্থিত হওয়াতে আশার অবলাদ কতকটা লঘু হইয়া গেল।

আশা শাড়ির সংবাদ জানিবার জন্য মাথার কাপড় দিয়া ঠাড়াইয়া রহিল। বিহারীর সহিত এখনো সে কথা কয় না।

বিহারী প্রবেশ করিয়াই কহিল—“আ দরুনান! কি কবিরের মাঝখানেই পা ফেলিলাম! ভয় নাই বোঠা’ণ, তুমি বোস, আমি পালাই

আশা মহেন্দ্রের মুখে চাহিল মহেন্দ্র
জিজ্ঞাসা করিল—“বিহারী, যার কি খবর?”

বিহারী কহিল—“মা-বুড়ির কথা আজ
কেন ভাই? সে চের সময় আছে! Such
a night was not made for sleep,
nor for mothers and aunts!”

বলিয়া বিহারী কিরিতে উঠাত হইলে,
মহেন্দ্র তাহাকে ধোর করিয়া টানিয়া
আনিয়া বসাইল। বিহারী কহিল—“বোঠা’ণ,
দেখ আমার অপরাধ নাই—আমাকে ধোর
করিয়া আনিল—পাপ করিল মহিন্ণ, তাহার
অভিশাপটা আমার উপরে যেন না পড়ে।”

কোন জবাব দিতে পারে না বলিয়াই
এই সব কথার আশা অত্যন্ত বিরক্ত হয়।
বিহারী ইচ্ছা করিয়া তাহাকে আলাতন
করে।

বিহারী কহিল—“বাড়ীর স্ত্রী ত দেখি-
তেছি—মাকে এখনো আনা’ইবার কি সময়
হয় নাই?”

মহেন্দ্র কহিল—“বিলক্ষণ! আনরা ত
তার জন্যই অপেক্ষা করিয়া আছি।”

বিহারী কহিল—“সেই কথাটি তাহাকে
জানাইয়া পর্ত্ত লিখিত তোমার অন্নই সময়
লাগিবে, কিন্তু তাহার স্বপ্নের সীমা থাকিবে
না। বোঠা’ণ, মহিন্ণাকে সেই খুঁনিটি
ছুটি দিতে হইবে, তোমার কাছে আমার
এই আবেদন!”

আশা রাগিয়া চলিয়া গেল—তাহার
চোখ দিয়া জল পড়িতে লাগিল।

মহেন্দ্র কহিল—“কি শুভকণ্ঠেই যে
তোনাদের সেবা হইয়াছিল! কিছুতেই সন্নি-
হতল না—কেন বলি কৃষ্ণচাঁক চণ্ডিগড়?”

বিহারী কহিল—“তোমাকে তোমার মা
ত নষ্ট করিয়াছেন, আবার স্ত্রীও নষ্ট করিতে
বসিয়াছে! সেইটে দেখিতে পারি না বলিয়াই
সময় পাইলে ছই এক কথা বলি।”

মহেন্দ্র। তাহাতে ফল কি হয়?

বিহারী। ফল তোমার সবক্ষে বিশেষ
কিছুই হয় না, আমার সবক্ষে কিঞ্চিৎ হয়।

(১০)

বিহারী নিজে বসিয়া মহেন্দ্রকে বিয়া
চিঠি লিখাইয়া গেল, এবং সে চিঠি
লইয়া পরদিনেই রাজলক্ষীকে আনিতে
গেল। রাজলক্ষী হুঙ্কিলেন, এ চিঠি বিহারীই
লিখাইয়াছে—কিন্তু তবু আর থাকিতে
পারিলেন না। সঙ্গে বিনোদিনী আসিল।

গৃহিণী কিরিয়া আসিয়া গৃহের যেকপ
ছয়বস্থা দেখিলেন—সমস্ত অস্বাচ্ছন্দ, মলিন,
বিপর্য্যস্ত—তাড়াতে বধূর প্রতি তাহার মন
আরো যেন বজ্র হইয়া উঠিল।

কিন্তু বধূর এ কি পরিবর্তন! সে যে
ছায়ার মত তাহার অহুসরণ করে। আবেশ
না পাইলেও, তাহার কণ্ঠে সহায়তা করিতে
অগ্রসর হয়। তিনি শব্দব্যত হইয়া বলিয়া
উঠেন—“রাখ, রাখ, ও ভুনি নষ্ট করিয়া
ফেলিবে! জান না যে কাজ, সে কাজে
কেন হাত দেওয়া!”

রাজলক্ষী দ্বির করিলেন, অরুণা চলিয়া
বাওরাভেই বধূর এত উদ্ভ্রান্ত হইয়াছে!
কিন্তু তিনি ভাবিলেন—“মহেন্দ্র মনে করিবে,
খুড়ী মখন ছিল, তখন বধূকে লইয়া আমি
বেশ নিকটকে স্বপ্নে ছিলাম—আর মা
আসিতেই আমার বিরহদুঃখ আরম্ভ হইল।
তাহাতে অরুণা যে তাড়ার হাঁটবী এবং

যা যে তাহার সুখের অন্তরায়, ইহাই প্রমাণ হইবে । কাজ কি !”

আজকাল দিনের বেলা মহেন্দ্র ডাকিয়া পাঠাইলে, বধু বাইতে ইতস্তত করিত—কিন্তু রাজলক্ষ্মী ভৎসনা করিয়া বলিতেন, “মহীন্ ডাকিতেছে, সে বুকি আর কানে তুলিতে নাই ? বেনী আমার পাইলে দেব-কালে এমনি ঘটয়া থাকে ! নাও, তোমার আর তরকারীতে হাত দিতে হইবে না !”

আবার সেই নেট্ পেঙ্গিস্ চাকুপাঠ লইয়া মিথ্যা খেলা ! ভালবাসার অমূলক অভিযোগ লইয়া পরস্পরকে অপরাধী করা ! উভয়ের মধ্যে কাহার প্রেমের ওজন বেনী, তাহা লইয়া বিনা যুক্তিযুক্ত তুলন তর্কবিতর্ক ! বর্ষার দিনকে রাত্রি করা এবং জ্যোৎস্না-রাত্রিকে দিন করিয়া তোলা ! শ্রান্তি এবং অবলাদকে গায়ের ভোরে দূর করিয়া দেওয়া ! পরস্পরকে এমনি করিয়া অভিমান করা যে, সজ বখন অসাড়চিত্তে আনন্দ দিতেছে না, তখনো ক্ষণকালের দ্রুত মিলনপাশ হইতে মুক্তি ভরাবহ মনে হয়—সন্তোষহুত ভ্রমাজ্জর, অথচ কর্ণাভয়ে বাইতেও পা ওঠে না । ভোগসুখের এই তরকারি অভিপাণ যে, সুখ অধিকদিন থাকে না, কিন্তু বন্ধন চুস্বেদ্য হইয়া উঠে ।

এমন সময় বিনোদিনী একদিন আদিয়া আশার গলা জড়াইয়া ধরিয়া কহিল—“ভাই, তোমার সোভাগ্য চিরকাল অক্ষয় হোক, কিন্তু আমি ছঃখিনী বলিয়া কি আমার দিকে একবার তাকাইতে নাই !”

আত্মীয়গৃহে বালাকাল হইতে পরের মত লালিত ভইয়াছিল বলিয়া, লোকসাদা-

রণের নিকট আশার একপ্রকার আন্তরিক কৃষ্টিভাব ছিল । তর হইত, পাছে কেহ প্রত্যাখ্যান করে । বিনোদিনী যখন তাহার বোকা-ভূক ও তীক্ষ্ণবৃত্তি, তাহার নিখুঁত সুখ ও নিটোল যৌবন লইয়া উপস্থিত হইল, তখন আশা অগ্রসর হইয়া তাহার পরিচর লইতে সাহস করিল না !

আশা দেখিল, শাত্তি রাজলক্ষ্মীর নিকট বিনোদিনীর কোনপ্রকার সঙ্কোচ নাই । রাজলক্ষ্মীও যেন আশাকে বিশেষ করিয়া দেখাইয়া দেখাইয়া বিনোদিনীকে বহমান দিতেছেন,—মনের অনবরত আশাকে বিশেষ করিয়া ত্রুনাটয়া ত্রুনাটয়া বিনোদিনীর প্রশংসাবাক্যে উজ্জ্বলিত হইয়া উঠিতেছেন । আশা দেখিল, বিনোদিনী সর্বপ্রকার গৃহ-কণ্ঠে স্থনিপুণ,—প্রভু যেন তাহার পক্ষে নিত্য সঙ্গ স্বভাববিন্দু,—দাসদাসীদিগকে কর্ণে নিয়োগ করিতে, ভৎসনা করিতে ও আদেশ করিতে সে লেশমাত্র কৃষ্টিত নহে । এই সমস্ত দেখিয়া আশা বিনোদিনীর কাছে নিজেও নিত্য ক্ষুদ্র মনে করিল ।

সেই সর্বজনপালিনী বিনোদিনী যখন অগ্রসর হইয়া আশার প্রণয় প্রার্থনা করিল, তখন সঙ্কোচের বাধার তেঁকিয়াই বালিকার আনন্দ আরো চারগুণ উছলিয়া পড়িল । বাহুকরের মায়াতরঙ্গ-মত তাহাদের প্রণয়-বীজ একবিনেই অহরিত, পরবিত ও পুষ্পিত হইয়া উঠিল ।

আশা কহিল, “এদ ভাই, তোমার সঙ্গে একটা কিছু পাতাই !”

বিনোদিনী হাসিয়া কহিল—“কি পাতাইবে ?”

আশা, গঙ্গাজল বৎসর প্রভৃতি অনেক-
গুলি ভাল ভাল দিনিবার নাম করিল ।

বিনোদিনী কহিল—“ও সব পুরাণে
হইয়া গেছে ; আদরের নামের আর আদর
নাই !”

আশা কহিল—“তোমার কোনটা
পছন্দ ?”

বিনোদিনী হাসিয়া কহিল—“চোখের
বাণি ।”

কতিমধু নামের দিকেই আশার কৌক
ছিল, কিন্তু বিনোদিনীর পরামর্শে আদরের
খালিটাই গ্রহণ করিল । বিনোদিনীর গলা
ধরিয়া বলিল—“চোখের বাণি !” বলিয়া
হাসিয়া লুটাইয়া পড়িল ।

ক্রমশ ।

জীব-কোষ ।

জীবশরীর কেমন করিয়া ক্রমে ছোট হইতে
বড়, ক্রম হইতে ক্রম হইয়া উঠে, পকাশ বৎসর
পূর্বে পণ্ডিতদের কাছে সে একটা সমস্যা
ছিল । জীবকোষ ও তাহার অদৃঢ় কার্য
যখন আবিষ্কৃত হইল, তখন সেট সমস্যার
সীমাংশ হইল এবং সেট সঙ্গে জীবতত্ত্বের
আরো অনেক জটিল ও বৃহৎ বাপারের
কারণ বাহির হইয়া পড়িল ।

প্ৰথমতঃ বৎসর অল্পকালে পরিভ্রমণ করিয়া
প্রাচীনরা জীবতত্ত্বের যে সকল তথ্য
তৃপ্তিকার করিয়া গেছেন, আধুনিকেরা
জীবকোষবিজ্ঞানের সাহায্যে সেইগুলিকে
সাহায্যে ওয়াইয়া জীবতত্ত্বকে একটা সম্পূর্ণ
শাস্ত্ররূপে গড়িয়া তুলিবার পূর্ব একটা অধ্যায়
পাইয়াছেন ।

কোষবিজ্ঞানের মোটামুট জ্ঞাতব্য বিষয়টা
খুব কঠিন নয় । বিষয়টা এইরূপ,—আমরা

প্রাণি বা উদ্ভিদ শরীর পরীক্ষা করিলে মনে
করি, প্রাণিশরীর বৃদ্ধি কেবল রক্তমাংস ও
অস্থি এবং উদ্ভিদশরীর বৃদ্ধি কেবল কাঠদ্বারা
গঠিত ; জীবতত্ত্ববিদগণ অণুবীক্ষণাদি যন্ত্র-
সাহায্যে পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন, আমরা
সহজবুদ্ধিতে ও খালিচোখে পরীক্ষা করিয়া
যাহা মনে করি, জীবশরীরের গঠন বাস্তবিক
তাহা নয়,—প্রাণি ও উদ্ভিদ শরীরমাজেই
কতকগুলি অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কোষের সমষ্টি-
মাত্র । পণ্ডিতগণ এই সকল কোষের একটা
বিশেষ ধর্ম আবিষ্কার করিয়াছেন । ইহারা
পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন, জীবশরীরস্থ
প্রত্যেক কোষই স্বতন্ত্রভাবে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়
এবং যেমন একটি প্রাণীজীব হইতে কালক্রমে
বহু জীবের উৎপত্তি দেখা যায়, সেইপ্রকার
এক একটি কোষ হইতে কালক্রমে সহস্র
সহস্র কোষের উৎপত্তি ঘটে ।

পণ্ডিতগণের মতে ইহাই জীবশরীরের সৃষ্টির প্রধান কারণ ।

পূৰ্ণোক্ত বিষয়টা এখন খুব সহজ বলিয়া বোধ হয় বটে, কিন্তু যাইট বৎসর পূৰ্বে কোন পণ্ডিতই এই সহজ তথ্যটির সহিত পরিচিত ছিলেন না এবং এমন একটা সহজ উপায়ে যে বিশাল জীবস্রাজ্যের সৃষ্টি ও পরিপত্তি সাধন হইতে পারে, তাহাও তৎকালে পণ্ডিতগণের মনে স্থান পায় নাই । অধ্যাপক স্বান্ন (Schwann) গত ১৮৩২ খৃষ্টাব্দে, এই মতবাদটির কথা প্রথমে প্রচার করেন ।

একটা লোকের ক্ষুঃ জীবনের কয়েকটা-বৎসরব্যাপি চেষ্টায় কোন এক মহদাবিকার সাধনের কথা আত্মকাল অসম্ভব না হইলেও, অগতে তাহার উপহারও খুব স্থলত নয় । গত উনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে উন্নত অণু-বীক্ষণাদি যন্ত্রের সাহায্যে উদ্ভিদ ও জীব শরীর পরীক্ষা করিয়া, পূৰ্ণবর্তী পণ্ডিতগণ স্বানের আবিষ্কারপন অনেকটা স্বগম করিয়া রাখিয়াছিলেন । এই প্রকার অস্বল্প অবস্থার না পড়িলে, একক স্বান্ন-সাহেব জীবতত্ত্বের এত বড় একটা আবিষ্কার সহজে সাধন করিতে পারিতেন কি না, সন্দেহ । পূৰ্ণবর্তী পণ্ডিতগণ উদ্ভিদশরীরে কোষের অস্তিত্ব দেখিয়াছিলেন, এবং কোন কোন পণ্ডিত প্রাণিশরীরেও কোষের অস্তিত্ব আছে বলিয়া প্রকাশ করিয়া রাখিয়াছিলেন,—কিন্তু সেই কোষই যে জীবের একমাত্র গঠনোপাদান এবং সেই জীবকোষের গঠন-সামগ্রী প্রাণি ও উদ্ভিদ নির্কিংশে যে যুলে এক, এবং জীবস্রাজ্যেরই গঠনোপাদান এক হওয়ার প্রাণী ও উদ্ভিদের মধ্যে যে একটা

অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধ সর্বদাই বর্তমান রহিয়াছে,—এ সকল কথা প্রাচীনোত্তরা কিছুই জানিতেন না ।

স্বান্ন ও তাহার শিষ্যবর্গ জীবকোষের কার্য ও তাহার অস্তিত্বাদির বিশেষ বিবরণ প্রচার করিয়া, প্রথমেই একটু পোলযোগে পড়িয়াছিলেন । জীবস্রাজ্যই যে কোষ-সমষ্টি, তাহার পরীক্ষাসিক প্রত্যক্ষ প্রমাণ দেখাইয়া, তাহার সাধারণকে বেশ বুঝাইয়া রাখিয়াছিলেন ; কিন্তু এক কোষ হইতে বহু কোষের উৎপত্তির প্রমাণ চাহিলে, তাহার নীরব থাকিতেন । অতি প্রাচীন জীবতত্ত্ববিদগণের বিশ্বাস ছিল,—যেমন চিনির রস হইতে মিহিরির রাসা উৎপন্ন হয়, সেইপ্রকার জীবশরীরের একটা অবয়ব-হীন মৌলিক উপাদান হইতে কোষের উৎপত্তি হইয়া থাকে; এই বিশ্বাসের অসত্যতা প্রমাণ করিবার জন্য স্বান্নশিষ্যগণ বহু তর্ক-বিতর্ক করিয়াছিলেন, কিন্তু তাহাতে বিশেষ ফল হয় নাই । পরে কয়েকটি অণুবীক্ষণবিদ পণ্ডিত একই কোষ হইতে বহুকোষের উৎপত্তি-সম্ভাবনার কঠক ভুলি প্রত্যক্ষ প্রমাণ উপস্থিত করিলে, অনেকের মনে পুরাতন সিদ্ধান্তের প্রতি কিকিং অনাস্থা হইয়া পড়িয়াছিল, এবং শেষে স্বান্নশিষ্য ডাক্তার ব্যারি ডিভ হইতে শাবকোৎপত্তির ক্রিয়া প্রত্যক্ষ দেখাইলে, কোষসিদ্ধান্তের একটু ঠাড়াইবার স্থান হইয়াছিল । ইহার পর হইতেই নূতন সিদ্ধান্তের উন্নতিবৃদ্ধি আরম্ভ,—আত্মকাল নানাদেশীয় জীবতত্ত্ববিদগণের আবিষ্কৃত নূতন নূতন তথ্য ক্রমেই ইহাকে পরিপুষ্ট করিয়া তুলিতেছে ।

এই ত পেন কোষসিদ্ধান্তের প্রাথমিক ইতিহাসের কথা। এখন এই সিদ্ধান্তটির মূল ব্যাপার কি দেখা যাক। যানের আবিষ্কারের প্রথম কথা এই যে, যখন জরায়ু বা ডিবে প্রথম জীবোৎপত্তি আরম্ভ হয়, তখন প্রাণিশরীর একটিমাত্র কোষে পণ্ডিত থাকে; তার পর কালক্রমে সেই কোষ পূর্ণভাষাত করিলে, মূল কোষটি দ্বিধা বিভক্ত হইয়া দুইটি গুণক কোষের উৎপত্তি করে এবং পরে এই দুইটি কোষ হইতে চারিটি এবং চারিটি হইতে আটটি ইত্যাদিক্রমে অসংখ্য কোষের উৎপত্তি হয়। সেট এক-মূল-কোষজাত অসংখ্য কোষই জীবের একমাত্র গঠনোপাদান :—পূর্ণোক্ত প্রাথম কোষসংখ্যাবৃদ্ধির সহিত গঠনোপাদানের পরিমাণবৃদ্ধি হইলে এবং বহিস্থ পদার্থ হইতে আহার্য সাংগ্রহ করিয়া কোষগুলি পরিপুষ্ট হইয়া পড়িলে, জীবের আর-তনও বৃদ্ধি পাইয়া থাকে।

অধ্যাপক যানের জীবকণার পূর্ণোক্ত তব ব্যতীত আর বিশেষ কিছুই অবিকৃত হয় নাই নত, কিন্তু অবিকারচেষ্টা এখানেই শেষ হয় নাই।—উৎকৃষ্ট অণুবীক্ষণদ্বারা নির্ণিত হওয়ার, পরবর্তী পণ্ডিতগণ খুব উৎসাহের সহিত জীবতত্ত্বের আরো নানা-তথ্যসম্বন্ধে নিম্নতর হইয়াছিলেন, এবং অল্প-কালমধ্যে ইহারা জীবকোষসত্ত্ব আর একটা নূতন ব্যাপার আবিষ্কার করিয়া কেলিয়া-ছিলেন। অধ্যাপক যান জীবকোষকেই জীবনী শক্তির মূল বলিয়া অহুমান করিয়া-ছিলেন, কিন্তু পরবর্তী পণ্ডিতগণ অভিন্ন প্রকার জীবশরীর ও কোষ পণ্যবেক্ষণ করিবার সুযোগ পাইয়া, কোষের মধ্যস্থিত পদার্থ

বিশেষকৈ জীবনী শক্তির কারণ বলিয়া প্রচার করিয়াছিলেন। অণুবীক্ষণদ্বারা পটীকা করিলে কোষের মধ্যে যে তরঙ্গ পদার্থ দৃষ্ট হয়, তাহাই সেই জীবনী শক্তির উৎপাদক পদার্থ। আধুনিক জীবতত্ত্ববিদগণ জীব-কোষকে দুগুণ দুইভাগে বিভক্ত করিয়া থাকেন,—প্রথমোক্ত কোষের বহিরাবরণ এবং দ্বিতীয় অংশটা তন্মধ্যস্থ তরঙ্গ সাবগ্রী। বিজ্ঞানবিদগণের সহস্র অগ্নিপটীকা উত্তীর্ণ হইয়া উক্ত কোষসামগ্রীটাই উদ্ভিদ ও প্রাণি শরীরের সম্ভাবতার কারণ বলিয়া দ্বিতীকৃত হইয়াছে,—কোন কারণে কোষ হইতে ঐ সামগ্রী নিকাশিত হইয়া পড়িলে বা তাহা বিকৃত হইয়া গেলে, জীবের জীবনের লক্ষণ থাকে না। কোষাবরণটা কিন্তু সম্পূর্ণ নির্জীব পদার্থ;—তর কাঁচ বা শুক চৰ্ম কেবল কতকগুলি কোষাবরণের সমষ্টিমাত্র, ইহা হইতে সেই কোষসামগ্রী নিকাশিত হইয়া গেছে, তাহেই ইহারা নির্জীব। অধ্যাপক যানের সমসাময়িক পণ্ডিতগণের এবং আধুনিক জীবতত্ত্ববিদগণের মতবাদের মধ্যে পার্থক্য এই যে, পূর্ববর্তী পণ্ডিতগণ কোষাবরণকে জীবনী শক্তি রক্ষার প্রধান সহায় মনে করিতেন, কিন্তু আধুনিকেরা কোষসামগ্রী দ্বারা সেই কার্য সাধিত হইতে দেখিয়া, ইহাতেই জীবনী শক্তি বর্তমান বলিয়া মনে করেন। বস্তুতঃপাশি যেমন নিম্নতর আমাদের শরীরসংলগ্ন থাকিয়াও জীবনী শক্তি রক্ষার সহায়তা করে না,—কোষাবরণও তদ্রূপ কোষসামগ্রীর আভরণ-স্বরূপ হইয়া থাকে মাত্র। মধ্যে মধ্যে কোষসামগ্রী হইতে যে এক প্রকার পদার্থ

নিঃসৃত হয়, তদ্বারা পুষ্টিলাভ করিয়া জীব-
শরীরের আয়তন বৃদ্ধি করা এবং শরীরের
দৃঢ়তা বৃদ্ধি করা বাতীত কোষাবয়বের অপর
কোন কার্য দেখা যায় না ।

কোষসামগ্রী-সম্বন্ধীয় আর একটা নূতন
তত্ত্ব আবিষ্কৃত হইয়াছে । অধ্যাপক স্কুল্‌জ্‌টে-
(Schulzke) প্রমুখ কয়েকজন আধুনিক
পণ্ডিত বহু পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন,
জীবমাত্রেরই কোষসামগ্রী একই উপায়ে
গঠিত;—উদ্ভিদের কোষে যে সামগ্রী বর্তমান,
পোষকবাহিনীরা জীবমাত্রেরই কোষেও সেই
একই পদার্থ আছে । কৃষ্ণকার যেমন একই
রূপ হইতে কর্দম লইয়া ঘট কলস ও পাক-
পাত্র নির্মাণ করে, প্রকৃতির কারখানায়
কোষসামগ্রীর যে অল্প ভাণ্ডার আছে,
সেই একই ভাণ্ডারই একই উপাদান লইয়া
প্রকৃতি দেবী, মাছুষ গর্দভ পণ্ডিত মূখ এবং
বৃক্ষলতা সকলেরই সৃষ্টি করিতেছেন । এই
বিশাল ভগতে সেই কোষসামগ্রীই একমাত্র
সম্মান পদার্থ, এতদ্ব্যতীত আর সকলই
নির্জীব,—বহিঃ পদার্থ হইতে পুষ্টিকর-খাদ্য-
গ্রহণ-ক্ষমতা প্রভৃতি জৈবধর্ম কেবল ইহাতেই
বর্তমান । গ্রাণি ও উদ্ভিদ দেহ, উক্ত কোষ-
সামগ্রী দ্বারা গঠিত, তাহেই ইহারাও
সম্মান ।

এই মহাবিকাশ দ্বারা জীববিজ্ঞানে
এক মহাবিশ্ব উপস্থিত হইয়াছে । প্রাচীন
পণ্ডিতগণ আশা-নিরাশা, উদ্যম-অসুদ্যমের
মধ্য দিয়া ধীরে ধীরে অগতির হইয়া, জীব-
তত্ত্বের নানাবিভাগসম্বন্ধে যে সকল কষ্ট-
করিত ‘আহুমানিক’ সিদ্ধান্ত পাড়া করিয়া-
ছিলেন,—কোষসামগ্রীর ‘আবিষ্কার’ ও

তাহার অদ্বুত ধর্মের কথা প্রচারিত হওয়ার,
আজ তাহার সকলই কুশারী হইয়া পড়িয়াছে ।
নবাবিকৃত তত্ত্ব দ্বারা আজকাল জীবতত্ত্বের
সকল জটিলতা দূরীভূত হইয়া, প্রাকৃতিক
বিজ্ঞানের অপরাপর শাখার ন্যায় এটাও
একটা সরল ও সহজবোধ্য শাস্ত্র হইয়া
পড়িতেছে ।

এখন দেখা যাউক, সর্বজীবের গঠনো-
পাদান উক্ত কোষসামগ্রী কোন্‌কোন্‌ মৌলিক
পদার্থের যোগে উৎপন্ন এবং ইহার সম্মান-
বতা-ধর্মটার উৎপত্তি কোথায় । বিত্তক কোষ-
সামগ্রী প্রচুরপরিমাণে সংগ্রহ করিতে না
পারিয়া, রাসায়নবিদগণ ইহার বিশ্লেষণকার্যে
প্রথমে বড়ই কষ্ট অধ্যব করিয়াছিলেন ;
এখন সহজে কোষসামগ্রীসংগ্রহের উপায়
আবিষ্কৃত হওয়ার, সম্ভ্রুতি টহার গঠনোপাদান
আবিষ্কৃত হইয়াছে । পাঠকপাঠিকাগণ বোধ
হয় ‘আলবুমেন’-নামক একপ্রকার জৈব-
পদার্থের নাম শুনিয়া থাকিবেন, রাসায়নিক-
গণের মতে কোষসামগ্রীটা সেই আলবুমেন-
শ্রেণীর এক অতি জটিল পদার্থ বাতীত
আর কিছুই নহা । আলবুমেনের ভায়
ইহাতেও কেবল অগ্নি, অক্সিজেন, হাইড্রো-
জেন ও নাইট্রোজেন আছে । এখন পাঠক-
পাঠিকাগণ বিজ্ঞান করিতে পারেন—বহি-
আলবুমেন ও কোষসামগ্রী একই জাতীয়
হইল, তবে একটি অধুনা এবং অপরটি
জীবধর্মসম্পন্ন দেখা যায় কেন । এতদ্ব্যতীত
কিছুদিন পূর্বে বিজ্ঞানবিদগণ বলিতেন,—
আলবুমেন পুরোক্ত মৌলিক পদার্থচতুষ্টয়ের
সহজ ও অজটিল মিশ্রণে উৎপন্ন, কিন্তু কোষ-
সামগ্রীটা ঐ পদার্থ চতুষ্টয়ের জটিল-মিশ্রণ-

জাত,—এইজাত উক্ত পদার্থবহের ধর্মের পার্থক্য দেখা যায় ।

জীবনী শক্তির এই রাসায়নিক মতবাদ প্রচারিত হইবামাত্র, নানাদেশীয় রাসায়ন-বিদগণ কৃত্রিম উপারে কোষসামগ্রী প্রস্তুতের সম্ভাবনা করনা করিয়া পোৎসায়ে নানা পরীক্ষা করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন । লপদ্বিখাত অধ্যাপক হেন্সলি ইহাদের নেতা ছিলেন । আবার এই সময়ে কৃত্রিম উপারে ইউরিয়া, ফরমিক এসিড ও নীল প্রভৃতি কয়েকটি জৈবপদার্থের প্রস্তুতপদ্ধতি আবিষ্কৃত হওয়ায়, পণ্ডিতগণের উৎসাহ বেশ আরো বৃদ্ধি পাইয়াছিল । সেই সময়ে তাহার কলিকতায়, জলের তরলতা প্রভৃতি ধর্ম যেমন তাহার আণবিক বিভ্রাণ ও রাসায়নিক অবস্থার দ্বারা প্রকাশ পায়, সেইপ্রকার কোষসামগ্রীর জীবনী শক্তিটোও রাসায়নিক অবস্থারই ফলমাত্র । ধারণা প্রভৃতি সহজ-বিশ্লেষণের (unstable) মৌলিক পদার্থ সাধারণতই যেমন উত্তেজনবদ্ধসম্পন্ন এবং যেমন সেগুলি অত্যন্ত-তাপাদি-সংযোগে গতিশীলতা প্রভৃতি বিশেষ বিশেষ শক্তিসম্পন্ন হইয়া পড়ে, কোষসামগ্রীটোও তদ্রূপ একটি সহজ-উত্তেজনশীল পদার্থ এবং ইহার সজীবতা-ধর্মটো অধিসংযুক্ত বাক্যের কার্যের অনুরূপ ।

হেন্সলি-প্রমুখ পুরোক্ত পণ্ডিতগণ উন্নি-

বিত বিষয়ে চালিত হইয়া কৃত্রিম কোষ-সামগ্রী প্রস্তুত জন্য প্রায় কৃতি বৎসর অধি-ভ্রান্ত পরিশ্রম করিয়াছিলেন । ভ্রান্ত বিশ্বাস অনেক সময়ই মানুষকে অন্ধ করিয়া রাখে, কিন্তু এখানে ভ্রান্ত-বিশ্বাস-প্রণোদিত হইয়া নানা পর্যবেক্ষণ করিতে করিতে, পণ্ডিতগণ ক্রমেই তাহাদের পূর্ববিশ্বাসে অনায়াসানু-হইতে আরম্ভ করিয়াছিলেন এবং সৌভাগ্য-ক্রমে এই সময়ে একটি উৎকৃষ্ট অণুবীক্ষণ নিকিত হওয়ায়, তদ্বারা কোষসামগ্রী পরীক্ষা করিয়া তাহার রাসায়নিকশক্তি ও জীবনী শক্তি যে এক নয়, তাহা সহজা বেশ বুঝিতে পারিয়াছিলেন । এখন জীবতত্ত্ববিদ পণ্ডিত-মাঝেই বলিয়া থাকেন, জীবদেহের নানা অংশের কাণ্ড যেমন কতকগুলি সুগঠিত বস্তু দ্বারা সম্পন্ন হইয়া থাকে, কোষসামগ্রীর সজীবতাও সেইপ্রকার তদ্রূপ অতি-সূক্ষ্ম আণুবীক্ষণিক দ্রবের সাহায্যে সাধিত হয় । জীবনী ক্রিয়া দাখিক, রাসায়নিক নহে ।

কোষসামগ্রীর পুরোক্ত অতিকৃত্ত বস্তু-সংস্থান কি প্রকারের, এবং কি পদ্ধতিক্রমে যে তাহাদের কার্য চলিতেছে, জীবতত্ত্ববিদ-গণ অন্যান্যি তাহা সম্পূর্ণ আবিষ্কার করিতে পারেন নাই, এবং শীঘ্র যে জীববিজ্ঞানের এই মূলতথ্যটি আবিষ্কৃত হইবে, তাহারও লক্ষণ বড় দেখা যাইতেছে না ।

শ্রীজগদানন্দ রায় ।

একটি কথা ।

একখানি তরি আছে, হুইজনে বাই ;
 নরা-পাত্তে তারা পাশে ছুটে চ'লে বাই ।
 পড়িলে বায়ুর বেগ হাল দিয়ে তারে ,
 ঠাফ টেনে চ'লে যাই জনহীন পারে ।
 বায়ু ঘুরে ঘুরে উড়ে ; তারা চৈতন্য ;
 ঘরে ঘরে চৈত-পূজা, আয়োজন উজ্জ্বল ।

একমাত্র গান জানি, পাই হৃৎকনার ;
 গোষ্ঠে গোষ্ঠে রাখালেরা বাশরী বাজায় ;
 আশ্রমকুলের স্রাব আনে বায়ু ব'রে ;
 ঢকা-ঢকা ব'লে থাকে মুখোমুখী হ'রে ;
 হুট বোন্ প্রতিদিন জন নিতে আসে,
 আশ্রমের চেয়ে চেয়ে টিপটিপি ছাশে ।

দু'খা ডোবে, গাঁ'র চাঁদ হেসে হেসে ওঠে,
 ছেপেরা খেপার ঝোঁকে বটতলা ছোটে ;

জ্যোৎস্না এসে উঁকি দিয়ে দোহা-পানে চায়,
 সর্ব-মেহে সজ্জকর সোহাগে বুলায় ।
 নাই সেখা বেনে বউ, মুক্কা ঠাকুরাণী,
 নাই সেখা ঠারঠারি নাই কাণাকণি !

এইমত হুইজনে বাহি এসে তরি,
 গ্রীষ্ম বার, বর্ষা আসে পানপান পরি' ।
 স্তর স্তর মেঘ ডাকে নেচে ওঠে প্রাণ ;
 ক্ষেতে ক্ষেতে ছড়া-ছড়া ফণে' আত্মধান ;
 ছেলে-মেয়ে সেজে-গুজে বেয়ে চলে রবে ;
 বুড়া-বুড়ী হাত ধ'রে হাঁটে গাঁ'র পথে ।

ছোট-তরি-পরে শুধু হৃৎকনার ঠাঁই,
 দোহার নিশাস-বাস হুইজনে পাই ।
 ভূবে পেল একদিন স্বপ্নে তরি-ধান ;
 হৃৎকন হৃৎপারে উঠে' বাঁচাইছ প্রাণ ।
 সে অবধি ছাড়াছাড়ি তাহার আমার,
 তরী নাই, নদীটুকু কিসে হই-পার !

শ্রীপ্রমথনাথ রায় চৌধুরী ।

নকলের নাকাল ।

ইংরাজিতে একট-বচন আছে, সাব্লাইম্
 বইতে হাস্যকর অধিক দূর নহে । সংস্কৃত
 অগন্ধারে অদ্বৈতবদ ইংরাজি সাবলিমিটির
 প্রতিবাদ কিং অদ্বৈত হুই একমেবই

আছে—হাস্যকর অদ্বৈত এবং বিস্ময়কর
 অদ্বৈত ।

ভট্টদিনের চনা দার্জিলিঙে ভ্রমণ করিতে
 বাসিয়া, রাত্রে অদ্বৈত এক

বেশা গেল । একদিকে দেবতায়া নগাধি-
রাজ, আর এক দিকে বিলাতী-কাপড়-পর্য
বাঙালী । সাব্লাইম্ এবং হাস্যকর একেবারে
গায়ে গারে সংগম ।

ইংরাজী কাপড়টাই যে হাস্যকর, সে কথা
আমি বলি না—বাঙালীর ইংরাজী কাপড়
পর্যটাই যে হাস্যকর, সে প্রসঙ্গও আমি
তুলিতে চাহি না । কিন্তু বাঙালীর গায়ে
বিসদৃশ-রকমের বিলাতী কাপড় যদি করণ-
রসায়ক না হয়, তবে নিঃশব্দেই হাস্যকর ।
আশা করি, এ সবকে কাহারো সহিত মনের
অনৈক্য হইবে না ।

হয় ত কাপড় এক রকমের টুপি এক
রকমের, হয় ত কণার আছে টাই নাই, হয়
ত বে রংটা ইংরাজের চক্ষে বিভীষিকা। সেই
রঙের কুষ্টি ; হয় ত বে অস্বাভাব্যকে যংর
বাহিরে ইংরাজ বিবশন বলিয়া গণ্য করে,
সেই অসঙ্গত অলঙ্কার । এমনতর অজ্ঞানভূত
সংসজ্জা কেন ?

যদি সম্মুখে কাছা ও পশ্চাতে কোচা
দিয়া কোন ইংরাজ বাঙালীটোশায় ঘুরিয়া
বেকার, তবে সে ব্যক্তি সম্মানলাভের আশা
করিতে পারে না । আমাদের যে বাঙালী
জাতারা অদ্বুত বিলাতী সাব পরিয়া সিরি-
রাজের রাবসভার ভাঁড় সাজিয়া ফিরেন,
তাঁহারা যদের কড়ি খরচ করিয়া ইংরাজ
দর্শকের কৌতুক বিধান করিয়া থাকেন ।

বেঙালী কি আর করিবে ? ইংরাজ-
দৃষ্টের সে জানিবে কি করিয়া ? যে বিলাত-
কেরং বাঙালী-দৃষ্টের জানেন, তাঁহার যদেনী-
য়ের এই বেশবিভূষে তিনিই সব চেয়ে
লজ্জাবোধ করেন । তিনিই সব চেয়ে

জীত্বধরে বলিয়া থাকেন, যদি না জানে তবে
পরে কেন ? আমাদের ভক্ত, ইংরাজের কাছে
অপমান করে !

না পরিবে কেন ? তুমি যদি পর,
এবং পরিয়া দেশপরিচ্ছদধারীর চেয়ে
নিজেকে বড় মনে কর, তবে সে গরু হইতে
সেই বা বঞ্চিত হইবে কেন ? তোমার যদি
মত হয় যে, আমাদের যদেনীর সম্ভা তাজা
এবং বিদেশী পোষাকই গ্রাহ্য, তবে বল-
পুষ্টিতে আপত্তি করিলে চলিবে না ।

তুমি বলিবে, বিলাতী সাব পরিতে চাও
পর, কিন্তু কোন্টা তর কোন্টা অদ্বুত,
কোন্টা মলত কোন্টা অদ্বুত, সে ধরটা
লও !

কিন্তু সে কখনই সম্ভব হইতে পারে না ।
যাহারা ইংরাজিসমাজে নাই, যাহাদের
আত্মীয়স্বজন বাঙালী—তাহারা ইংরাজি-
দৃষ্টের আদর্শ কোথায় পাইবে ?

যাহাদের টাকা আছে, তাহারা রাস্কিন্-
হার্শাণের হস্তে চক্ষু বুজিয়া আত্মদম্পণ করে,
এবং বড় বড় চোখে সই করিয়া দেয়—মনে
মনে লাঞ্ছনা লাভ করে, কিন্তুই আর কিছু
না হউক, আমাদের দেখিয়া অস্ত্রত তর কিরিলি
বলিয়া লোকে আশ্বাস করিবে—ইংরাজি-
কাপড় জানে না, এমন মুছাঁকর অপবাদ
কেহ দিতে পারিবে না ।

কিন্তু পনেরো-আনা বাঙালিরই অর্থাভাব
—এবং তাঁহাদেরই তাহাদের বাঙালী সম্ভার
চরম ষোদ্ধান । অতএব উণ্টা-পাণ্টা জুলাচ
হইতেই হইবে । এমন স্বলে পরের সাজ
পরিতে গেলে, অধিকাংশ লোকেরই সংস্কার
খই গতি নাই

ব্যক্তিকে কেন এমন করিয়া অপন্থ করা ? এমন কাজ কেন কর, বাহির পৃষ্ঠাতে ঘেষের লোক হাস্যকর হইয়া উঠে ? দুই চারিটা কাক অবহাবিশেষে ময়ূরের গুচ্ছ মানান-সই করিয়া পরিত্যক্ত পারে—কিন্তু বাকি কার্কেয়া তাহা কোনমতেই পারিবে না—কারণ, ময়ূরসমাজে তাহাদের গতিবিধি নাই—এমন অবস্থার সমস্ত কাকসমাজ্যকে বিজ্ঞপ্ত হইতে চক্ষা করিবার জন্য উক্ত কয়েকটি চক্ষবেশীকে ময়ূরগুচ্ছের নোভ সম্বরণ করিতেই হইবে। না যদি করেন, তবে পরগুচ্ছ বিজ্ঞতভাবে আক্ষালনের প্রহসন সর্বত্রই ব্যাপ্ত হইয়া পড়িবে।

এই লজ্জা চাইতে, ইংরাজিহানার এই বিকার হইতে, বদেশকে চক্ষা করিবার জন্য আশ্রয় কি সক্ষম নকলকারীকে সাধুনের অহুরোধ করিতে পারি না ? কারণ, তাহার সক্ষম, আর সকলে অক্ষম। এমন কি, অবহাবিশেষে তাহাদের পুরনোস্ত্রোত্র অক্ষম হইয়া পড়িবে। তাহার। যখন ফিরিঙ্গী-লীলার অধস্তন রসাতলের গলিতে গলিতে সমাজচ্যুত আত্মজ্ঞানার মত পড়িয়া থাকিবে, তখন কি স্মার্কিন্‌বিলাসীরা প্রেতাত্মা শাস্তিলাভ করিবে ?

বহিঃ কোনমতেই পরের নকল ভ্রম-রসমে করিতে পারে না। নকল করিবার কাঠখড় বেশি। বাহির হইতে তাহার আয়োজন করিতে হয়। বাহ্যকে নকল করিতে হইবে, সৰ্ব্বদা তাহার সংসর্গে থাকিতে হয়—সরিত্ত্রে পক্ষে দেহটোই সৰ্ব্বাপেক্ষা কঠিন। সুতরাং সে অবস্থার নকল করিতে হইলে, আদর্শরূপে চটয়া কি দৃষ্টকিমাকার

একটা ব্যাপার হইয়া পড়ে। বাংলাধীর শব্দে ষাটো দৃষ্টি পরা লক্ষ্যকর নহে, কিন্তু ষাটো প্যাণ্ট লুন পরা লক্ষ্যজনক। কারণ, ষাটো প্যাণ্ট লুনে কেবল অসামর্থ্য বুঝার না, তাহাতে পর সাজিবার বে চেষ্টা, বে স্পর্ধা প্রকাশ পায়। তাহা দারিত্র্যের সহিত কিছু-তেই সঙ্গত নহে।

আজকাল ইংরাজি-সাজ দিকৃপ চন্দ্রি হইয়া আসিতেছে, এবং যতই চন্দ্রি হইতেছে, ততই তাহা দিকৃপ বিকৃত হইয়া উঠিতেছে, দার্কিনিয়ের মত জারগার আসিলে অলকাণের মধ্যেই তাহা অস্থির করা যায়। বাঙালীর হুঃপৃষ্ট বাঙালিকে অনেক হুঃ দিয়াছে,—পেটে স্নীহা, হাড়ের মধ্যে ম্যাগে-রিয়া, দেহে ক্লমতা, চক্ষে কালিনা, তাণ্ডারোঁ দৈন্য ;—অবশেষে তাহাকে কি অদ্বুত সাজে সাজাইয়া বাক্য করিতে আরম্ভ করিবে ? চিত্রমৌল্যে যখন হাস্যকর করিয়া তোলে, তখন ধরনী দিগা হওয়া ছাড়া লক্ষ্যনিবারণের আর উপায় থাকে না।

আচ্য-ব্যবহার সাজ সজ্জা উদ্ভিদের মত—তাহাকে উপড়-ইয়া আনিলে শুকাইয়া পড়িয়া নষ্ট হইয়া যায়। বিলাতী বৈশ্বভূ-আব-কারদার মাটি এখানে কোথায় ? সে কোথা হইতে তাহার অভ্যন্তর রস আকর্ষণ করিয়া সর্বাধ থাকিবে ? ব্যক্তিবিশেষ ধরচপত্র করিয়া কৃত্রিম উপায়ে মাটি আদ-দানী করিতে পারেন এবং দিনরাত সমস্ত-মচেতন থাকিয়া তাহাকে কোনমতে বাড়া রাখিতে পারেন। কিন্তু সে কেবল দুই-চারিজন মৌলীনের ঘরাই সাধ।

বাহ্যকে পালন করিতে—সর্বদা রাখিতে

পারিবে না, তাহাকে ঘরের মধ্যে আনিয়া পচাইয়া হাওয়া খারাপ করিবার দরকার ? ইহাতে পরেরটাও নষ্ট হয়, নিম্নেরটাও মাটি হইয়া যায়। সমস্ত মাটি করিবার সেই আরোজন বাৎসর্যসেই দেখিতেছি।

তবে কি পরিবর্তন হইবে না ? যেখানে বাহ্য আছে, চিরকাল কি সেখানে তাহা একই ভাবে চলে ?

প্রয়োজনের নিয়মে পরিবর্তন হইবে, অহুকরণের নিয়মে নহে। কারণ, অহুকরণ অনেক সময়ই প্রয়োজনবিকল্প। তাহা স্থপাতিস্থায়ের অহুকরণ নহে। চতুর্দিকের অবস্থার সহিত তাহার সামঞ্জস্য নাই। তাহাকে চেষ্টা করিয়া আনিতে হয়, কষ্ট করিয়া রক্ষা করিতে হয়।

অন্ত-এব রেলোয়ে-ক্রমণের মত, আপিলে বাহির হইবার মত, নূতন প্রয়োজনের মত, ছাঁটা-কাটা কাপড় বানাইয়া লও। সে তুমি নিজের বেশ, নিজের পরিবেশ, নিজের পূর্বা-গয়ের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া গ্রহণ কর। সম্পূর্ণ ইতিহাসবিকল্প, ভাববিকল্প, সমস্তবিকল্প অহুকরণের প্রতি হস্তবৃদ্ধির ভ্রম প্রাবল্য হইয়া না।

পুস্তাকনের পরিবর্তন ও নূতনের নির্মাণে যৌব নাই। আবস্তকের অহুরোধে তাহা সকল জাতিতেই সর্গা করিতে হয়। কিন্তু এরূপ হলে সম্পূর্ণ অহুকরণ প্রয়োজনের যৌবাই দিয়া চলে না। সে প্রয়োজনের যৌবাই একটা ছুতামাত্র। কারণ সম্পূর্ণ অহুকরণ কখনই সম্পূর্ণ উপযোগী হইতে পারে না। তাহার হয় ত একাংশ কাজের হইতে পারে, অপরাংশ বর্জ্য। তাহার

কাটা কোর্টা হয় ত বৌদ্ধধর্মের পক্ষে প্রয়োজনীয় হইতে পারে, কিন্তু তাহার ওয়েস্ট-কোট্ট হয় ত অন্যবস্ত্র এবং উত্তাপজনক। তাহার টুপিটা হয় ত ঋণ করিয়া মাথার পরা সহজ হইতে পারে, কিন্তু তাহার টাই কলার বাদিতে অনর্থক সময় দিতে হয়।

যেখানে পরিবর্তন ও নূতন নির্মাণ অসম্ভব ও সাধ্যাতীত, সেইখানেই অহুকরণ মার্জ্জনীয় হইতে পারে। বেশভূষায় সে কথা কোনক্রমেই খাটে না।

বিশেষত বেশভূষায় কেন্দ্রমাত্র অমর্ত-বরণের প্রয়োজন সাধন করে না—তাহাতে ভদ্রভদ্র, দেশ-বিদেশী, স্বজাতি-বিজাতির পরিচয় দেওয়া হয়। ইংরাজি কাপড়ের ভদ্রতা ইংরাজ ঘানে। আমাদের ভদ্রলোক-দের অধিকাংশের তাহা আনিবার সম্ভাবনা নাই। আনিতে গেলেও সর্বদাই ভয়ে ভয়ে পরের মুখ তাকাইতে হয়।

তার পরে স্বজাতি-বিজাতির কথা। কেহ কেহ বলেন, স্বজাতির পরিচয় লুকাইবার মতই বিলাতী কাপড়ের প্রয়োজন হয়। এ কথা বলিতে বাহার লজ্জাবোধ না হয়, তাহাকে লজ্জা দেওয়া তাহারো সাধ্য নহে। পরের বাড়ীতে হস্তবেশে সযত্নী সাজিয়া গেলে আদর পাওয়া বাইতে পারে—তবু বাহার কিছুমাত্র তেজ ও ভদ্রভাজান আছে, সেই আদরকে সে উপেক্ষা করিয়া থাকে। রেলোয়ের ফিরিঙ্গি পার্ড, ফিরিঙ্গিভাজা মনে করিয়া যে আদর করে, তাহার প্রলোভন সযত্ন করাই ভাল। কোন কোন রেল-লাইনে দেশ-বিলাতীর স্বভদ্র গাড়ি আছে, কোন কোন চোটেলে দেশী লোককে সযত্ন

কহিতে দেখ না, সেজন্য রাগিয়া কষ্ট পাইবার অবসর যদি হাতে থাকে, তবে সে কষ্ট স্বীকার কর, কিন্তু অন্য ভাঁড়াইয়া সেই গাড়িতে বা সেই হোটেলের প্রবেশ করিলে সম্মানের যে কি বৃদ্ধি হয়, তাহা বুঝা কঠিন ।

পরিবর্তন কোন পর্যায় গেলো অগ্রকরণের সীমার মধ্যে আসিয়া পড়ে, তাহা নির্দিষ্ট করিয়া বলা সস্ত। তবে সাধারণ নিয়মের স্বরূপ একটা কথা বলা যাইতে পারে । যেটুকু লইলে বাকিটুকুর সহিত বেধাপু হয় না, তাহাকে বলে গ্রহণ করা, যেটুকু লইলে বাকিটুকুর সহিত অসামঞ্জস্য হয়, তাহাকে বলে অগ্রকরণ করা ।

মোজা পরিলে কোটি পয়সা অনিবার্য হয় না, ধূতির সঙ্গে মোজা বিক্রেতে চলিয়া যায় । কিন্তু কোটের সঙ্গে ধূতি, অথবা হ্যাটের সঙ্গে চাপকান চলে না । সাধু ইংরাজিতাব্যায় মধ্যেও মাঝে মাঝে ফরাসী মিশাল চলে, তাহা ইংরাজি পাঠকেরা জানেন । কিন্তু কি পর্যায় চলিতে পারে, নিশ্চয়ই তাহার একটা অলিখিত নিয়ম আছে—সে নিয়ম বৃদ্ধি-মান্ বাক্তিকে দেখানো বাহিয়া । তথাপি তাত্ত্বিক বলিতে পারে, ভূমি যদি অঠা দূরে গেলে, আমি না হয় আরো কিছুদূর গেলাম, কে আমাকে নিবারণ করিবে ? সে ত ঠিক কথা । তোমার রুচি যদি তোমাকে নিবারণ না করে, তবে কাহার পিতৃ-পুরুষের সাধ্য, তোমাকে নিবারণ করিয়া রাখে !

বেশভূয়াতেও সেই তর্ক চলে । যিনি আগাগোড়া বিলাতী ধরিয়াছেন, তিনি সমালোচককে বলেন, ভূমি কেন চাপকানের

সঙ্গে প্যাণ্ট লুন্ পরিয়াছ ? অবশেষে তর্কটা অগভীর গিয়া পড়ায় ।

সে হলে আমার বক্তব্য এই যে, যদি অজ্ঞায় হইয়া থাকে, নিকা করা, সংশোধন করা, প্যাণ্ট লুনের পরিবর্তে অন্য কোনপ্রকার পরিয়ায়। যদি কার্যকর ও সুসঙ্গত হয়, তবে তাহার গ্রহণ করা—তাই বলিয়া ভূমি আগাগোড়া দেশবিশ্ব পরিহার করিবে কেন ? একজন এক কান কাটিয়াছে বলিয়া দ্বিতীয় ব্যক্তি খামকা হুই কান কাটিয়া বসিবে, ইহার বাহাদুরীটা কোপায়, বৃত্তিতে পারি না ।

নূতন প্রযোজনের সঙ্গে যখন প্রথম পরিবর্তনের আরম্ভ হয়, তখন একটা অনিশ্চয়তার প্রাচুর্য্য হইয়া থাকে । তখন কে কতদূরে যাইবে, তাহার সীমা নির্দিষ্ট থাকে না । কিছুদিনের তৈলাঠেলির পরে পরস্পর আপোষে সীমানা পাকা হইয়া আসে । সেই অনিবার্য অনিশ্চয়তার প্রতি দোষারোপ করিয়া যিনি পুরা নকলের দিকে যান, তিনি অত্যন্ত কুণ্ঠিত দেখান ।

কাগজ, আলস্ত সংক্রামক । পরের তৈরি জিনিষের লোভে নিজের সমস্ত চেঁচা বিসর্জন দিবার নকীর পাইলে, লোকে তাহাতে আকৃষ্ট হয় । ভূমিরা যার, পরের জিনিষ কখনই আপনায় করা যায় না । ভূমির । যার, পরের কাগজ পরিতে হইলে, চিরকালই পরের দিকে তাকাইয়া থাকিতে হইবে ।

অড়ব বাহার আরম্ভ, বিকার তাহার পরিণাম । আর যদি বলি, কে অস্ত ভাবে, তার চেয়ে বিমিত্তি দোকানে গিয়া এক হুই অর্ডর দিয়া আসি—তবে কাল বলিব.

সাপট পুন্টা খাট হইয়া গেছে, কে এত হাসান করে, ইহাতেই কাল চলিয়া যাইবে।

কাল চলিয়া যায়। কারণ, বাঙালী-সমাজে বিলাতি কাপড়ের অসঙ্গতির দিকে কেহ দৃষ্টিপাত করে না। সেইজন্য বিলাত-কেতনের মতোও বিলাতী-সাজ-সম্বন্ধে চিন্তা-ভাব বেধা যায়,—সত্যার চোঁটার বা আলতের সত্যিকে তাঁহারা অনেকে এমন ভাবে বেশ-বিভ্রান্ত করেন, যাঁহা বিধিমনত অভ্যস্ত।

কেবল তাহাই নহে। বাঙালী বন্ধুর বাকীতে বিবাহ প্রভৃতি শুভকর্মে বাঙালী-ভ্রমলোক সাজিয়া আসিতে তাঁহারা অবজ্ঞা করেন, আবার বিলাতী-ভ্রমতার নিধনে নিমগ্নসাজ পরিয়া আসিতেও আলস্য করেন। পরসজা-সম্বন্ধে কোনটা বিহিত, কোনটা অবিহিত, সেটা আমাদের মধ্যে প্রচলিত নাই বলিয়া, তাঁহারা শিষ্টসমাজের বিধিবিধানের অজ্ঞাত হইয়া যাইতেছেন। ইংরাজি-সমাজে তাঁহারা সামাজিকভাবে চলিতে কিরিত পান না, দেশী সমাজকে তাঁহারা সামাজিকভাবে উপেক্ষা করিয়া থাকেন—সুতরাং তাঁহাদের সমস্ত বিধান-নিষেধ বিধান, সুবিধার বিধান,—সে বিধানে আলস্য-ঔদাসীন্যকে বাধা দিবার কিছুই নাই। বিলাতের এই সকল ছাড়া কাপড় ইহাদের পরপুরুষের গায়ে কিরণ বীভৎস হইয়া উঠিবে, তাহা কল্পনা করিলে লোমহর্ষণ উপস্থিত হয়।

কেবল সাজসজ্জা নহে, আচার-বাহারকে এ সকল কথা আরো অধিক খাটে। বিলাত হইতে কিরিয়া আসিরা দেশী প্রথা হইতে বাঁচিয়া নিজেতে একেবারেই বিধির কবি-

রাছেন, তাঁহাদের আচার-বাহারকে সমা-চার-সদ্যাবহারের দীক্ষামধ্যে আবদ্ধ করিয়া রাখিবে কিসে? যে ইংরাজের আচার তাঁহারা অবলম্বন করিয়াছেন, তাঁহাদের সহিত বনিষ্ট সম্বন্ধ রাখিতে পারেন না, দেশী সমাজের বনিষ্টতা তাঁহারা বলপূর্ব্বক ছেদন করিয়াছেন।

একদিন কাটা গাইলেও গাড়ি থাকি-কণ চলিতে পারে—বেগ একেবারে বন্ধ হয় না। বিলাতের ধাক্কা বিলাতফেরতের উপর কিছুদিন থাকিতে পারে—তাঁহার পরে চলিবে কিসে?

সমাজের হিতার্থে সকল সমাজের মতোই কতকগুলি কঠোর শাসন আপনি অভিযুক্ত হইয়া উঠে। যাহারা বেচ্ছাক্রমে আশ-সমাজের তাম্রাপ্ত, এবং চোঁটাস্বেও পর-সমাজের গোষাপ্ত নছেন, তাঁহারা বর্তা-বর্তই দুই সমাজের শাসন পরিত্যাগ করিয়া স্বথটুকু লইবারই চেষ্টা করিবেন। তাহাতে কি মঙ্গল হইবে?

ইহাদের একত্রকম চলিয়া যাইবে, কিন্তু ইহাদের পুত্রশোভেরা কি করিবে? এবং যাহারা নকলের নকল করে, তাহাদের কি চরবন্ধা হইবে?

দেশী দরিদ্রেরও সমাজ আছে। দরিদ্র হইলেও সে ভদ্র বলিয়া গণ্য হইতে পারে। কিন্তু বিলাতী-সাজা দরিদ্রের কোথাও স্থান নাই। বাঙালী-সাহেব কেবলমাত্র ঘন-সম্পদ ও ক্ষমতার দ্বারা আপনাকে দুর্গতির উর্দ্ধে থাকি রাখিতে পারে। ঐশ্বর্য্য হইতে ভ্রষ্ট হইবারাত্র সেট সাহেবের পুত্রটি সর্গ-প্রসার আশ্রয়; ন অমনোনাট মতো দিলপু

হইয়া যায় । তখন তাহার ক্রমতাও নাই, সমাধও নাই । তাহার নৃতনলক্ষ পৈতৃক পৌরবেরও চিত্র নাই, চিত্রাগত পৈতৃক-মহিক সমাজেরও অবলম্বন নাই । তখন সে কে ?

কেবলমাত্র অহুকরণ এবং স্ববিধায় আকর্ষণে আত্মসমাজ হইতে বাহারা নিজেকে বিচ্ছিন্ন করিতেছেন, তাহাদের পুত্রপৌত্রেরা তাহাদের নিকট স্কৃতজ হইবে না, ইহা নিশ্চয় — এবং যে দুর্লভচিত্তগণ ইহাদের অহুকরণে ধাবিত হইবে, তাহারা সর্বপ্রকারে হাতজনক হইয়া উঠিবে, ইহাতেও সন্দেহ নাই ।

বেটা লক্ষ্যার বিবরণ, সেইটে লইয়াই

বিশেষরূপ ধৌরব অহুতব করিতে বসিলে, বহুত্ব কর্তব্য, তাহাকে সচেতন করিয়া দেওয়া । যিনি সাহেবের অহুকরণ করিয়াছি মনে করিয়া গর্কবোধ করেন, তিনি বহুত্ব সাহেবীর অহুকরণ করিতেছেন । সাহেবীর অহুকরণ সহজ, তাবণ তাহা বাহ্যিক অঙ্ক আংশ ; সাহেবের অহুকরণ শক্ত, কারণ তাহা আত্মরিক মনুষ্যত্ব । যদি সাহেবের অহুকরণ করিবার শক্তি তাহার থাকিত, তবে সাহেবীর অহুকরণ কখনই করিতেন না । অতএব কেহ যদি শিব গড়িতে গিয়া মাটির গুণে অজ্ঞ কিছু গড়িয়া বসেন, তবে সেটা লইয়া লক্ষ্যম্প না করাই প্রের ।

কবিত্তরিত ।

বাহির হইতে দেখো না অমন করে

দেখো না আমার বাহিরে !

আমায় পাবে না আমার মুখে ও শুখে,

আমার বেদনা খুঁজে না আমার বুকে.

আমারে দেখিতে পাবে না আমার মুখে

কবিরে বেধার খুঁজিছ সেখা সে নাহি রে !

সাপরে সাপরে কলরবে বাহা বাজে,

মেঘগর্জনে ছুটে ঝড়ার মাকে,

নীতবমস্ত্রে নিশীথ-আকাশে রাজে

আঁধার হইতে আঁধারে আসন পাতিয়া,—

আমি সেই এই মানবের গোকাপরে

বাতিয়া উঠেছি গুণে তপে নাচে ভরে,

গরবি' ছুটিয়া খাই অরে পরাক্ষরে .

বিপুল হুন্নে উদার মস্ত্রে মাতিয়া ।

বে গছ কাঁপে ফুলের বৃকের কাছে,

ভোয়ের আলোকে বে গান ঘুমায়ে আছে,

শারদধানো যে আভা আভালে নাচে

কিরণে কিরণে হসিত হিরণে-হসিতে,

সেই গছই গড়েছে আমার কায়া,

সে গান আমাতে রচিছে নৃতন মায়া,

দে আভা আমার নয়নে ফেলেছে ছায়া ;—

আমায় মাঝারে আমারে কে পাবে ধরিতে ?

নয়-অরণ্যে মধুর-তান তুলি,
বৌধনবনে উড়াই কুহুমগুলি,
চিত্তভঙ্গার হৃৎকানিগুণগুলি
শিহরিয়া উঠে আবার পরশে জানিয়া ।

নবীন উবার তরুণ অঙ্গণে থাকি'
আমি তোমাদের মরনে মেলিব আঁখি,
নীত্রব প্রদোষে করুণ কিরণ ঢাকি'
রথ তোমাদের হৃদযত্নে লাগিয়া !

অশ্রু তোমার নয়নে ঝরিবে যবে
আমি তাহাদের গাঁধিব গীতের রবে,
লাজুক হৃদয় যে কবাটি নাহি কবে
স্বপ্নের নাকারে ঢাকিয়া কহিব তাহারে ।

নাহি জানি আমি কি পাখা লইয়া উড়ি,
খেলাই তুলাই হুলাই ফুটাই কুড়ি,
কোথা হতে কোন্ গন্ধ যে করি চুরি
সন্ধান তার বলিতে পারিনে কাহারে ।

যে আমি স্বপনমুগ্ধি গোপনচরিত্রী,
যে আমি আমারে বৃত্তিতে বুঝাতে নাহি,
আপন গানের কাছেতে আপনি হারি,
সেই আমি কবি,কে পারে আমারে ধরিতে !

মাহু-আকারে বহু যে জন ধরে,
ভূমিতে দূটার প্রতি নিবেশের ভরে,
যাহারে কাপার স্ততি-নিন্দার জরে,
কাহরে পাবে না তাহার জীবনচরিতে ।

কবির বিজ্ঞান ।

‘আছি আমি বিশ্বতপে, যে অন্তর্যামী,
আছি আমি বিশ্বকেন্দ্রস্থলে ! “আছি আমি”
এ কথা শরিলে মনে মহান্ বিশ্ব
আকুল করিয়া দেয় তরু এ হৃদয়
একাগ্নি রহস্তভারে ! “আছি আর আছে”
অন্তহীন আমি প্রহেলিকা, কার কাছে
তথ্যইব অর্থ এর ? তত্ত্বনিষ্ঠ তাই
কহিতেছে, “এ নিখিলে আর কিছু নাই,—
তধু এক আছি !” করে তারা একাকার
অস্তিত্বহস্তরাপি করি’ অসীকার !
একমাত্র তুমি স্থান এ সত্য-সংসারে
যে আমি গোপনতত্ত্ব,—আমি কবি তারে
চিরকাল সধিনয়ে স্বীকার করিয়া
অপার নিত্যে চিন্তা রাখিব তরিয়া !

বঙ্গদর্শন ।

সমাজভেদ ।

গত আশুয়ারী মাসের 'কন্ট্রোল্লারি
রিভিউ' পক্ষে ডাক্তার ডিলন 'বায় চীন এবং
মেমবাবক যুরোপ' নাম দিয়া একটি প্রবন্ধ
লিখিয়াছেন । তাহাতে বৃহৎ উপলক্ষে চীন-
বাসীদের প্রতি যুরোপের অকথা অত্যাচার
বর্ণিত হইয়াছে । জর্জিস্ থা, তৈমুর লং
প্রভৃতি লোকশত্রুদিগের ইতিহাসবিখ্যাত
নিদাক্ষণ-কীর্তি সভ্য যুরোপের উন্নত বর্কর-
তার নিকট নতশির হইল ।

যুরোপ নিজের সম্বন্ধে প্রবল সভ্যতার
গৌরব করিয়া এদিকাকে সর্ব্বথাই দিকার
দিয়া থাকে । তাহার জবাব দিবার উপলক্ষ্য
পাইয়া আমাদের কোন হুখ নাই । কারণ,
অপবাদ ব্রটনা করিয়া হুর্জল সবলের কোন
ক্ষতি করিতে পারে না । কিন্তু সবল হুর্জলের
নামে যে অপবাদ ঘোষণা করে, তাহা
হুর্জলের পক্ষে কোন না কোন সময়ে
সামাজিক হইয়া উঠে ।

সাধারণতঃ এদিকারিগণের জ্বরতা,
বর্করতা, হুজেরতা, যুরোপীয় সমাজে একটা
প্রবলবিকারের মত । এদিকাকে

যুরোপের আদর্শে বিচার করা কর্তব্য নহে,
এই একটা ধুয়া আজকাল খুটানসমাঞ্চে
বেশি করিয়া উঠিয়াছে ।

আমরা যখন যুরোপের শিক্ষা গ্রন্থের
পাইলাম, তখন, মাহুবে মাহুবে অভেদ, এই
ধুয়াটাই সে শিক্ষা হইতে গ্রহণ করিয়া-
ছিলাম । সেইজন্য আমাদের নূতন শিক্ষকটির
সঙ্গে আমাদের সমস্ত প্রভেদ বাহাতে বুচিয়া
যায়, আমরা সেই ভাবেই প্রস্তুত হইয়া
উঠিতেছিলাম । এমন সময় মাঠারমণায়
তাঁহার ধর্মশাস্ত্র বক্ত করিয়া বলিলেন, পূর্ন-
পক্ষিমে এমন প্রভেদ যে, সে আর লক্ষন
করিবার জো নাই ।

আচ্ছা বেশ, প্রভেদ আছে, প্রভেদ
থাক্ । বৈচিত্র্যই সংসারের বাহ্যরক্ষা
করে । পৃথিবীতে শ্রুতাতপ সব আদর্শের
সমন্বিত নহে বলিয়াই, বায়ু চলাচল করে ।
সভ্যতার ভিন্ন ভিন্ন আদর্শ ভিন্ন ভিন্ন রূপে
সার্থক হইয়া আপন বাতরায় রক্ষা করিতে
থাক্,—তাঁহা হইলে সেই বাতরো পরম্পরের
নিকট শিক্ষার আদান প্রদান হইতে পারে ।

এখন উ দেখিতেছি, গাণাগাণি গোণা-
গণির আদান-প্রদান চলিয়াছে । নতুন
বৃত্তান শতাব্দী এমনি করিয়া আরম্ভ হইল ।

তবে আছে স্বীকার করিয়া নইয়া বুদ্ধির
সহিত, ঐতিহ্য সহিত, সমগ্র বিনয়ের সহিত,
তাহার অন্তরে যদি প্রবেশ করিবার
ক্ষমতা না থাকে, তবে বৃত্তির শিক্ষার উনিশ-
শত বৎসর কি কাজ করিল? কামানের
গোণার প্রাচ্য ভূগর্ভের দেয়াল ভাঙিয়া একা-
কার করিলে, না চাণি দিয়া তাহার সিংহদ্বার
স্থলিগা ভিতরে প্রবেশ করিলে ?

মিশনারীদের প্রতি চীনদেশীদের আক্ৰ-
মণ হইতে চীনে বর্তমান বিশবের হত্বপাত
হইয়াছে । যুরোপ এ কথা সহজেই মনে
করিতে পারে যে, ধর্মপ্রচার বা শিক্ষা-
নিষ্ঠার নইয়া মনুষ্য ও অনোদার্য চীনের
বর্জিততা সঙ্গমণ করিতেছে । মিশনারী উ
চীনরাজ্য ভয় করিতে যায় নাই ।

এইখানে পূর্বপশ্চিমে ভেদ আছে এবং
সেই ভেদ যুরোপ প্রচার সহিত, সহিষ্ণুতার
সহিত, বৃত্তিতে চেষ্টা করে না—কারণ, তাহার
পায়ে জোর আছে ।

চীনের রাজ্য চীনের রাজ্য । যদি
কেই রাজ্য আক্রমণ করে, তবে রাজ্য
রাজ্য লড়াই বাধে, তাহাতে প্রজাদের যে
ক্ষতি হয়, তাহা সামাজিক নহে । কিন্তু
যুরোপে রাজ্য রাজ্য নহে, তাহা সমস্ত
রাজ্যের । রাষ্ট্রতন্ত্রই যুরোপীয় সভ্যতার
কলেশ্বর;—এই কলেশ্বরটিকে আঘাত হইতে
রক্ষা না করিলে তাহার প্রাণ ধ্বংস না ।
জুতরাং অন্ত কোনপ্রকার আগ্রহের প্রকৃত
আজ্ঞা করা করিতে পারে না । বিবেচনা

নক্ষ বিলাতে যদি বেদান্ত প্রচার করেন
এবং ধর্মপাল যদি দেখেনে ইংরাজ বৌদ্ধ-
সম্প্রদায় স্থাপন করেন, তাহাতে যুরোপের
পায়ে বাধে না, কারণ যুরোপের গা রাষ্ট্র-
তন্ত্র । খ্রিস্টানের পাহাড়টুকু সমস্ত ইংলণ্ড
প্রাণ দিয়া রক্ষা করিলে, কিন্তু খ্রীষ্টান ধর্ম-
সম্বন্ধে সতর্ক হওয়া সে আবশ্যিক বোধ
করে না ।

পূর্বদেশে তাহার বিপরীত । প্রাচ্য-
সভ্যতার কলেশ্বর ধর্ম । ধর্ম বলিতে মিলিজন
নহে, সামাজিক কর্তব্যতন্ত্র,—তাহার মধ্যে
যথাযোগ্যভাবে মিলিজন পণিচিহ্ন সমস্তই
আছে । তাহাকে আঘাত করিলে সমস্ত
বেশ বাধিত হইয়া উঠে, কারণ সমাজেই
তাহার মর্মস্থান, তাহার জীবনী শক্তির
অন্ত কোন আশ্রয় নাই । শিথিল রাজশক্তি
বিপুল চীনের সমস্ত আপনাকে প্রবলভাবে
প্রত্যক্ষগোচর করিতে পারে না । রাজধানী
হইতে সুদূরবর্তী দেশগুলিতে রাজ্যের আজ্ঞা
পৌছে, রাজ প্রতাপ পৌছে না, কিন্তু তথাপি
সেখানে শান্তি আছে, শৃঙ্খলা আছে, সভ্যতা
আছে । ডাক্তার ডিগন ইহাতে বিশ্বয়
একাশ করিয়াছেন । অচাই বল যায়
করিয়া এত বড় রাজ্য সংঘত রাজ্য সহজ
কথা নহে ।

কিন্তু বিপুল চীনদেশ পরশাগনে সংঘত
হইয়া নাই, ধর্মশাসনেই সে নিরমিত । পিতা
পুত্র, ভ্রাতা ভগিনী, স্বামী স্ত্রী, ঐতিবেদী
পলীবাদী, রাজা প্রজা, ধাক্ক বজমানকে
নইয়া এই ধর্ম । বাহিরে যতই বিপ্লব হোক,
পাশ্চাত্যে যে কেহই অধিরোহণ করুক, এই
সমস্ত বিপুল চীনদেশের আত্মপদ থাকিবে অশ্রুত

মিথ্যে এই প্রকাণ্ড জনসমাজকে দণ্ডিত করিয়া রাখা আছে। সেই দণ্ডে আঘাত লাগিলে চীন বৃত্তাবলম্বনা পায় এবং আত্মরক্ষার জন্য নিষ্ঠুর হইয়া উঠে। তখন কে তাহাকে ঠেকাইবে? তখন রাজাই বা কে, রাজার সৈন্যই বা কে, তখন চীনসাম্রাজ্য নহে, চীনজাতি আঘাত হইয়া উঠে।

একটি ক্ষুদ্রদৃষ্টান্তে আমার কথা পরিষ্কার হইবে। ইংরাজপরিবার ব্যক্তিবিশেষের জীবিতকালের সহিত সম্বন্ধসূত্র। আমাদের পরিবার কুণের অঙ্গ। এটাই কু প্রভেদে সমস্তই তক্ষা হইয়া যায়। ইংরাজ এই প্রভেদের মধ্যে প্রবেশ করিতে না পারিলে, হিন্দুপরিবারের দরদ কিছুই বৃদ্ধিতে পারিবে না এবং অনেক বিষয়ে অসহিষ্ণু ও অবজ্ঞাপরায়ণ হইয়া উঠিবে। কুলস্বত্রে হিন্দুপরিবারে জীবিত, মৃত ও ভাবী অজাতগণ পরস্পর সংস্কৃত। অতএব হিন্দুপরিবারের মধ্য হইতে কেহ যদি কুলভাগ করিয়া বাহির হইয়া যায়, তাহা পরিবারের পক্ষে কিরূপ গুরুতর আঘাত, ইংরাজ তাহা বৃদ্ধিতে পারে না। কারণ, ইংরাজপরিবারে দাম্পত্য-বন্ধন ছাড়া অন্য কোন বন্ধন দৃঢ় নহে। এইজন্য হিন্দুসমাজে বিধবাবিবাহ বৈধ হইয়াও সমাজে প্রচলিত হইল না;— কারণ, জীবিত প্রাণী যেমন তাহার কোন সমীপ অঙ্গ পরিত্যাগ করিতে পারে না, হিন্দুপরিবারও সেইরূপ বিধবাকে ত্যাগ করিয়া নিজেকে বিচ্ছিন্ন করিতে প্রস্তুত নহে। বাল্যবিবাহও হিন্দুপরিবার এইজন্যই প্রয়োজন্য করে। কারণ প্রেমসম্বন্ধের উপযুক্ত বয়স হইলেই দীপকরে মিলন ঘটতে

পারে। কিন্তু সমস্ত পরিবারের সঙ্গে একীভূত হইবার বয়স বালাকাল।

বিধবাবিবাহের নিষেধ এবং বাল্যবিবাহের নিষিদ্ধতাকে কঠিনের হইতে পারে, কিন্তু হিন্দুর সমাজসংস্থান সে ব্যক্তি বোঝে, সে ইহাকে বর্জন্যতা বলিয়া উড়াইয়া দিতে পারে না। ভারতবর্ষ রক্ষা করিতে গিয়া ইংরাজকে যেমন বারমহলাসম্মেও জিত্তের, মাণ্ডা, স্মরণ এবং এডেন রক্ষা করিতে হয়, সেইরূপ পরিবারের দৃঢ়তা ও অখণ্ডতা রক্ষা করিতে হইলে, হিন্দুকে কঠিনীকর করিয়াও এই সকল নিয়ম পালন করিতে হয়।

এটরূপ ক্ষুদ্রভাবে পরিবার ও সমাজ পঠন ভাল কি না, সে তর্ক ইংরাজ তুলিতে পারে। আমরা বলি, রাষ্ট্রের স্বার্থকে সর্বোচ্চে রাখিয়া পোলিটিকাল দৃঢ়তাসাধন ভাল কি না, সেও তর্কের বিষয়। দেশের অঙ্গ সমস্ত প্রয়োজনকে উত্তরোত্তর বর্ধ করিয়া সৈনিকগঠনে যুগোপ প্রতিদিন পীড়িত হইয়া উঠিতেছে—সৈন্যসম্প্রদায়ের অস্তিত্বের তাহার সামাজিক সামঞ্জস্য নষ্ট হইতেছে। ইহার সমাপ্তি কোথায়? নিম্নলিখিতদের অধ্যুৎপাতে, না, পরস্পরের প্রণয়সংঘর্ষে? আমরা স্বার্থ ও স্বৈচ্ছাচারকে সহ্য বন্ধনে বদ্ধ করিয়া মরিভেছি, ইহাই যদি সত্য হয়, যুগোপ স্বার্থ ও স্বাধীনতার পথ উন্মুক্ত করিয়া চিরজীবী হইবে কি না, তাহারো পরীক্ষা বাকি আছে।

কিন্তু হইউক, পূর্ব ও পশ্চিমের এই সকল প্রভেদ চিন্তা করিয়া বৃদ্ধি দেখিবার বিষয়। যুরোপের প্রাণাংশিকে দগন বিচার করিতে হয়, তখন যুরোপের সমাজতত্ত্বের দৃষ্টি

তাহাকে মিলাইয়া বিচার না করিলে, আমাদের মনেও অনেক সময় অজ্ঞান অবজার স্ফুর্তি হয়। তাহার সাক্ষী, বিলাতী সমাজে কতটুকু অধিকবয়স পর্য্যন্ত কুমারী রাখার প্রতি আমরা কটাক্ষপাত করি—আমাদের নিকট এ প্রশ্ন অভ্যস্ত নহে বলিয়া, আমরা এ সম্বন্ধে নানা গকার আলোচনা প্রকাশ করিয়া থাকি। অথচ বালবিবাহকে চিরজীবন অবিবাহিত রাখা যে তদপেক্ষা আশঙ্কাজনক, সে কথা আমরা বিচারের মধ্যেই আনি না। কুমারীর বেলায় আমরা বলি, মদুয়াপ্রকৃতি চরমল, অথচ বিধবার বেলায় বলি, শিক্ষা-সাধনার প্রকৃতিকে বশে আনা যায়। কিন্তু আসল কথা, এ সকল নিয়ম কোন নীতিতত্ত্ব হইতে উদ্ভূত হয় নাই, এরোপনের তাড়নে গাঁড়াইয়া গেছে। অল্প-বয়সে কুমারীর বিবাহ হিন্দুসমাজের পক্ষে যেমন এরোপনীয়, চিরবিধবাও সেইরূপ। সেইজন্যই আশঙ্কাসত্ত্বেও বিধবার বিবাহ হয় না এবং অনিষ্ট-কল্পবিধা-সম্বন্ধে কুমারীর বাল্যবিবাহ হয়। আবৃত্তকের নিয়মেই দুরোপে অধিকবয়সে কুমারীর বিবাহ এবং বিধবার পুনর্বিবাহ প্রচলিত হইয়াছে। সেখানে অপ্রাপ্তবয়স্ক বালিকাকে নইয়া স্বাধীন পুংস্থাপন সম্ভবপর নহে, সেখানে বিধবা কোন পরিণামের আশ্রয় পায় না বলিয়া, তাহার পক্ষে অনেক সময়ই বিত্তীয়-ব্যয় বিবাহ নিত্যক আবশ্যক। এই নিয়ম দুরোপীয় সমাজতন্ত্রের অঙ্গহীন বলিয়াই মূল্যহীন, ইহার অস্ত্র তাল বাহা কিছু আছে, তাহা আকস্মিক, তাহা অস্থায়ী।

সমাজে আবৃত্তকের অস্ত্রহারা হইয়া

প্রচলিত হয়, ক্রমে তাহার সহিত ভাবের সৌন্দর্য্য জড়িত হইয়া পড়ে। বয়ঃপ্রাপ্ত কুমার-কুমারীর স্বাধীন প্রেমাবেশের সৌন্দর্য্য দুরোপীয় চিত্রে কিরূপ স্থান অধিকার করিয়াছে, তাহা দুরোপের সাহিত্য পড়িলেই প্রতীতি হইবে। সেই প্রেমের আদর্শকে দুরোপীয় কবিরা বিবাহভাবে উজ্জল করিয়া বর্ণনা করিয়াছেন।

আমাদের দেশে পতিব্রতা গৃহিণীর কল্যাণপরায়ণ ভাবটিই মধুর হইয়া হিন্দু-চিত্তকে অধিকার করিয়াছে। সেই ভাবের সৌন্দর্য্য আমাদের সাহিত্যে অল্প সকল সৌন্দর্য্যের উচ্চ স্থান পাইয়াছে। সে অলোচনা আমরা অল্প প্রবন্ধে করিব।

কিন্তু তাই বলিয়া যে স্বাধীন প্রেমের সৌন্দর্য্যে সমস্ত দুরোপীয় সমাজ উজ্জল হইয়া উঠিয়াছে, তাহাকে অনাদর করিলে আমাদের অজ্ঞতা ও মূঢ়তা প্রকাশ হইবে। বস্তুত, তাহা আমাদের জন্মকে স্পর্শ করে। যদি না করিত, তবে ইংরাজি কাব্য উপভাস আমাদের পক্ষে মিথ্যা হইত। সৌন্দর্য্য হিন্দু বা ইংরাজের মধ্যে জাতিভেদ বন্ধ করিয়া চলে না। ইংরাজিসমাজের আদর্শ-পত সৌন্দর্য্যকে সাহিত্য যখন পরিষ্কৃত করিয়া দেখায়, তখন তাহা আমাদের জাতীয় সত্যকে অভিতুত করিয়া দ্বন্দ্বের দীপ্যমান হয়। তেমনি আমাদের হিন্দু পারিবারিক আদর্শের মধ্যে যে একটি কল্যাণময়ী সৌন্দর্য্য-প্রীতি আছে, তাহা যদি ইংরাজ দেখিতে না পায়, তবে ইংরাজ সেই অংশে বর্জ্য।

দুরোপীয় সমাজে অনেক মহাভা-
শোকের স্থিতি কবিগণে; সেখানে সাহিত্য-

শিল্প-বিজ্ঞান প্রভৃতি উন্নতিলাভ করিয়া চলিতেছে ; এ সমাজ নিজেই মহিমা নিজে পদে পদে প্রমাণ করিয়া অগ্রসর হইতেছে ; ইহার নিজের অর্থ উন্নত হইয়া না উঠিলে, ইহার রথকে বাহির হইতে কেহ প্রতিরোধ করিবে, এমন কল্পনাই করিতে পারি না। এমনতর গৌরবান্বিত সমাজকে শ্রদ্ধার সহিত পর্যা-বেক্ষণ না করিয়া ইহাকে বাহারা ব্যঙ্গ করে, বাঃলা সেনের সেই সকল হুলত লেখক অজ্ঞাত-সারে নিজের প্রতিই বিজ্ঞপ করিয়া থাকে।

অপর পক্ষে, বহুশত বৎসরের অনবরত বিপ্লব যে সমাজকে ভূমিসাৎ করিতে পারে নাই ; সহস্র দুর্গতি সহ্য করিয়াও যে সমাজ ভারতবর্ষকে দগ্ধাধর্ম ক্রিয়াকর্তব্যের মধ্যে লগ্নত করিয়া তুলিয়া রাখিয়াছে,—রসাতলের মধ্যে নামিতে দেয় নাই ; যে সমাজ হিন্দু-জাতির বুদ্ধিবৃত্তিকে সতর্কতার সহিত এমন ভাবে রক্ষা করিয়া আসিয়াছে যে, বাহির হইতে উপকরণ পাইলেই তাহা প্রজ্বলিত হইয়া উঠিতে পারে ; যে সমাজ সূচু অশিক্ষিত জনমণ্ডলীকেও পদে পদে প্রবৃত্তি দমন করিয়া পরিবার ও সমাজের হিতার্থে নিজেকে উৎসর্গ করিতে বাধ্য করিয়াছে ; সেই সমাজকে যে মিশনরি শ্রদ্ধার সহিত না দেখেন, তিনিও শ্রদ্ধার যোগ্য নহেন। তাঁহার এইটুকু বোঝা দরকার যে, এই বিপুল সমাজ একটি বৃহৎ প্রাণীর স্তায়—আব্রতক হইলেও, ইহার কোন এক অঙ্গে আঘাত করিবার পূর্বে সমগ্র প্রাণীটির শরীরতত্ত্ব আলোচনা করার প্রয়োজন হয়।

বস্তুত সভ্যতার ভিন্নতা আছে ;—সেই বৈচিত্র্যই বিধাতার অতিশ্রেষ্ঠত। এই ভিন্নতার মধ্যে জ্ঞানোজ্জ্বল সঙ্কটময়তা লইয়া পরস্পর প্রবেশ করিতে পারিলে, তবেই এই বৈচিত্র্যের সার্থকতা। যে শিক্ষা ও অভ্যাসে সেই প্রবেশের দ্বার রুদ্ধ করিয়া দেয়, তাহা বর্ধনতার সোপান। তাহাতেই অভ্যাস অবিচার নির্ভূততার সৃষ্টি করিতে থাকে। একত সভ্যতার লক্ষণ কি ? সেই সভ্যতা বাহাকে অধিকার করিয়াছে—স সর্বজ্ঞ সর্বমেবাবিবেশ—তিনি সকলকে জ্ঞানেন ও সকলের মধ্যে প্রবেশ করেন। বাহা পাকাত্য সভ্যতাকে সর্বদাই উপহাস করে ও দিভার দেয়, তাহা হিঙ্গুমানী, কিন্তু হিন্দুসভ্যতা নহে। তেমনি বাহা প্রাচ্যসভ্যতাকে সম্পূর্ণ অস্বীকার করে, তাহা সাহেবিয়ানা, কিন্তু যুরোপীয় সভ্যতা নহে। যে আদর্শ অস্ত্র আদর্শের প্রতি বিদ্রোহপরায়ণ, তাহা আদর্শই নহে।

সম্প্রতি যুরোপে এই অন্ধবিবেশ সভ্যতার শাস্তিকে কলুষিত করিয়া তুলিয়াছে। স্বাধীন যখন স্বাধীন হইয়া অধর্মে প্রবৃত্ত হইল, তখন লক্ষী তাহাকে পরিত্যাগ করিলেন। আধুনিক যুরোপের বেবমগণ হইতে লক্ষী যেন বাহির হইয়া আসিয়াছেন। সেই অস্ত্রই বোয়াহ-পন্নীতে আগুন লাগিয়াছে, চীনে পাণবতা লজ্জাবরণ পরিত্যাগ করিয়াছে এবং ধর্ম-শ্রদ্ধার কবণের নির্ভর উক্তিতে ধর্ম উৎপীড়িত হইয়া উঠিতেছে।

সদানন্দ ।



সদানন্দবাবার বাড়ী বীরভূম জেলায়—
লোকটি গরম বৈষ্ণব। আমেরপুর টেসনের
অন্তর্গত যে গ্রামে তাঁর বাস, আমরা তাহাকে
হরিপুর নামে পরিচিত করিব। তামাল-
তালী-কনরাহিতে গ্রামের বড় বড় বীথিকা-
গুলি সমাচ্ছন্ন হইলেও, ইহার বাহিরে ছায়া
বড় নাই, প্রায় চারিদিকে বীরভূমপ্রান্ত
ডাঙাল বা প্রান্তরকরমর দৃশ্যবিস্তৃত প্রান্তর।
গ্রামবাসি বর্ধমানের রাজার জমিদারীভুক্ত,
অথচ তিন পুরুষ ধরিয়া দাসগোষ্ঠিই ইহার
অধীন মালিক। কেন না, সদানন্দের
শিতামহ-ঠাকুর, পতনি এহণ করার পর
স্বর্গারোহণ করিলেও, আজ প্রায় পঞ্চাশ
বৎসর ধর্মীল বস্তাবেকের তাহার পুত্রপৌত্রাদি-
ক্রমে তালুকের ভোগ-সম্বল করিতেছেন।

সদানন্দ নিজে ধর্ম ও কর্মের সম্বন্ধ
করিয়াছেন। ত্রিদিবস হরিনাম করেন
কষ্টে, কিন্তু সেই সঙ্গে তালুকটাকুর উন্নতি-
কর্মবলিও সর্বদা তাঁর মনে জাগিতেছে।
বসন্তবার্ষিক সংলগ্ন প্রাচীরবেষ্টিত প্রকাণ্ড
মোলাবাড়ীতে তাঁর অধিকাংশ সময় কাটিয়া
যায়। সেখানে শিতামহের সহস্ররোপিত
প্রাচীর মাধবীলতার বিপুল ছায়াডালে ইষ্টক-
রচিত বেদিতে বসিয়া বসিয়া তিনি হরিনামের
মালা ঘুরাইতেছেন, অথচ তাঁহার তীক্ষ্ণদৃষ্টি-
সমুপে গরুর বাগাল হটেন গোমস্তা পদাধ

সকলেরই নির্দিষ্ট কর্তব্য কাজ বাড়ির কাটার
মত চলিয়া যাইতেছে।

ব্রাহ্মণ এবং অতিথি-অভ্যাগতের সেবা
সদানন্দের ধর্মবনের একটি প্রধান লক্ষ্য।
ইহাতে ছোট বড় প্রভেদ নাই। কিছুদিন
পূর্বে হরিপুরের খবর আসিল, জেলায় প্রান্তে
একটা খুনী মোকদ্দমার সহজমীন তদারক
শেষ করিয়া ডেপুটি-ম্যাজিস্ট্রেট দিয়ারা গাইতে-
ছেন, সঙ্গে পুলিশ-মেক্সার উকীলে বিজ্ঞর
লোকজন। সদরদস্তার কাছে তেমন সুবিধা-
গোছের আশ্রয়স্থান না দেখিয়া হাকিম
বরাবর চলিয়া দাঁড়বার উপক্রম করিতেছেন,
এমন সময়ে স্বয়ং সদানন্দ তাঁহার সমীপবর্তী
হইলেন। সাধারণত লোকে পরপালের মত
হাকিম-পুলিসের এই অভিযানকে দূর হইতে
নমস্কার করে, কিন্তু সদানন্দ সেই চৈত্রমাসের
মধ্যাহ্নে ক্রোশবানেক হাঁটিয়া দিয়া এই
বিপদকে গৃহে ডাকিয়া আনিলেন। সর্বদা
হরিনামাচ্ছিন্ন, নিবিড়-কল্প-পরিহিত দাসভীর
নদর বেহাশানি আইন-আদালতের সংস্পর্শে
কখন আসে নাই, উকীল মোক্সারের
সকলেই একবাক্যে হাকিমকে জানাইল যে;
সত্যসত্যি সদানন্দের মাধবা-মোকদ্দম
থাকে না। অতএব সহলবলে ডেপুটিম্যাজিস্ট্রেট
ঘণ্টাকয়েকের ভক্ত দাসভীর গৃহে আতিথ্য-
গ্রহণ করিতে সম্মত হইলেন সদানন্দ

সকলকে জানাহার করাইয়া পুনরায় হাকিমের সন্নীপবত্তী হইলেন এবং করযোড়ে প্রার্থনা করিলেন যে, হাতকড়িবদ্ধ আসানীটিকে ক্ষণকালের মত মুক্ত করিয়া দিতে কনটোল-দের প্রতি হুকুম হউক, নহিলে অতুচ্চ কেহ গৃহে থাকিতে নিজে তিনি অগ্রহণ করিতে পারেন না। ডেপুটীব্যবুর আদেশে কৃষা-তৃকাতুর খুনী আসানীকে আহ্বার করাইয়া সন্ধানন্দ যে ভূপ্তিলাভ করিয়াছিলেন, সেদিন-কার সমস্ত অভ্যাগতের তৃপ্ত্যায় তেমন আনন্দ তিনি অনুভব করেন নাই।

গোসবাত্তেও সন্ধানন্দের বড় আনন্দ। তাঁর নিজের গাই-বলগ অনেকগুলি, সমস্ত-দিন বৃক্ষজায়গার আশ্রয়ে গুই দীর্ঘশ্রেষ্টিতে প্রোথিত মাটির বড় বড় “ভাবার” তাহারা “জাবনা” খাইতেছে, দিনের ভিতর চারি-পাঁচ বার বচকে না দেখিলে তিনি বির হইতে পারেন না। সন্ধ্যার প্রাক্কালে নিজে গোসাগার প্রবেশ করিয়া যেখিয়া আসেন, বখাস্থানে প্রত্যেককে বাখিয়া “ছানি” দেওয়া হইয়াছে কি না। বাটা হইতে কিছু দূরে বিস্তৃত “সারকুড়ে” সমস্ত বৎসরের সঞ্চিত গোময়, দাসজীর ইক্ষু খাত্ত ও তরকারীর ক্ষেতগুলিকে সরগ ও উরুর করে। হাসিয়া বখন-তখন সন্ধানন্দ বলেন, “ভগবান্ ত্রিকল স্বয়ং কেন পক্ষ চরাইতেন, তাঁর মর্গ এখন বুঝতে পারি। গোখন তাঁর বড় প্রিয়, তাঁর মতন হিসাবী সংসারী আর কে? কোন মিনিবটি এ গুনিয়ার অপচর তিনি হইতে পেন না।”

বিপন্নীক দাসমহাশয়ের দাম্পত্যপ্রেমের ঘটনা কেমন ভিন্ন, তখন পাঠা জানিবার

তেমন উপায় নাই, কিন্তু ইদানীং পৌত্রী ও দৌহিত্রীদের সঙ্গে গৃহিণীর সখ্য পাতাইয়া দেখুপ প্রেমভিনের তিনি করেন, তাহাতে মনে হয় বটে যে, “এবে বুড়া তবু কিছু ভাঁড়া আছে তার।” বাস্তবিক রোজ সন্ধ্যায় সমস্ত নাতিপুত্রিগুলিকে সঙ্গে লইয়া, গৃহদেবতা সাধাকান্তজীউর আরাতি দেবার পর, বড়দুই ডাবের কাছে গানগর ও রক্তক না করিলে, সন্ধানন্দের রাত্রি কাটে না। কোনদিন হয় তজের খায়া, তাতে নিজে তিনি সাজেন সন্ধ্যাসখী; কোনদিন ‘চোর চোর’ বেলা হয়, তাতে তিনি বুড়ী হয়ে বসেন। এই ছেল-খেলার পর বখানিহমে প্রতিনিশায় প্রাঘের তক্ত বৈরাগীর দল লইয়া তিনি কীর্তনানন্দে বিভোর হন—তখন আর নাতি-নাতিীদের মনে থাকে না।

প্রত্যবে মানাত্তিক শেষ করিয়া দাস-মহাশয় যখন গ্রাম প্রদক্ষিণ করেন, তখনও তাঁর করগ্রত হরিনামের ফুলিতে মালাসকালন বদ্ধ হয় না। এই প্রাতঃব্রতবোপলক্ষে গ্রামের তত্ত্ব ইতর সকলেরই গৃহ রোজ এক-বার তাঁর দেখা হয়—অতএব কোন খবর তাঁর অগোচর থাকে না। এই সময়ে সন্ধানন্দকে সঙ্গে সঙ্গে পল্লীগ্রামমূলত-বিত্তর খুঁটিনাটি ও ক্ষুদ্র কলহ-কছকচির বীজাণ্ড সরাসরি-মতে সম্পন্ন করিতে হয়।

এইরূপ আইনবিগর্হিত কোমদারী ও বেওয়ারী একিয়ারের একচেটিয়া সেকালে জমিদার-ভালুকদারদের শোভা পাইত, কিন্তু সম্প্রতি গ্রামে গুইতিন জন “শিক্ষিত” গোকেব আপভাণ তওদায়, সন্ধানন্দের সে তত্ত্ব না পাইত।

বিজ্ঞানস্বয়ং হইতে ছাত্রবৃত্তিপাল মধুসূদন
সেংকোষীপত্রীকার কৃতকার্য না হওয়ার,
শিক্তিভিটা হরিপুরে করবহু ধাবৎ আসর
অমকইয়া বসিয়াছিলেন এবং কৃতকার্য ও
টপিসিহি দ্বারা সংলাপবাতা নিকর করি-
ডেন। বিদ্যা স্রাব্ধবহু লাখেণা পাত বিদ্যার
উপর তাহার মন পড়িল। ছাত্রী বিদ্যা
দাসজীর কাছে কাদিয়া পড়িল যে, যেহেতু
তাহাকে খাইতে পড়িতে দেয় না, অধিকন্তু
লাখেণাটুকু আয়নাৎ করিব্যর চেষ্টা
করিতেছে। সদানন্দ মধুসূদন ডাকইয়া
এ অন্তরে প্রতিবাদ করিলেন এবং তাহাকে
মিষ্টভাব্য ব্রুইয়া দিলেন, তাহার হরিপুরে
কোনরূপ অত্যাচার-অনাচার প্রেরণ পাইবে
না। মধুসূদনের অসীম পদপাঠ তৃতীয়-
ভাগের কবিতা সংগ্রহ করিয়া এবং আইন-
কানুনের নজীর দেখাইয়া, যুগপৎ সদানন্দের
বিশ্ব ও ভীতি উৎপাদনের সংকল্প করিয়া-
ছিল, কিন্তু তাহাতে দাসজীউর কাছে কেবল
ধমকের উপর ধমক পাইল।

লোক সদানন্দকে অজাতশত্রু বলিয়া
জানিত, কিন্তু সেই অবধি তাহার একটি
শত্রুসংকল্প হইল। উগ্রকবির মধুসূদন সনে সনে
প্রতিজ্ঞা করিল, এ অপমান ও পরাজয়ের প্রতি-
শোধ একদিন না একদিন সে অবশ্য লইবে।

ইহার পর চারি পাঁচ বৎসর গত হইয়াছে।
মধুসূদন বয়স প্রায় বড় এসে না, যদিও কালে-
জন্মে বাকীমুখো হয়, দাসজীর দ্বারা সর্ববৎ
প্রত্যাখ্যান করে। সে তৃতীয়ভাগ পত্র-
পাঠের কবিতা তুলিয়া গিয়াছে বটে, কিন্তু
দানবদ্বি-বাহের পাচালিতে গণ্ডে অত্যা-
হইয়াছে, এবং বটভাগ্য করি-উপত্যাগিকদের

গতশত্রুর বিস্তার গল্প বলিয়া লোক হাস্য
ইহার কলে মকঃবলের নিরীহ লোক অনেক
এই কীর্ত্ত বিজ্ঞাপনটির আকর্ষণে এসুক
হইয়া, ইহার সঙ্গে জেলার সম্বন্ধে বাতায়াক
করিতে শিখিতেছে। তাহাতে আদালতের
আহবুদ্বির সঙ্গে সঙ্গে মধুসূদন টপিসিহি বেশ
ঠ'পরমা লাভবান হইতেছে।

এদিকে সদানন্দ এককাল তালুকের
উন্নতি এবং হরিনামের মাধাম্য যুগপৎ এই
পরম্পরবিরোধী শ্রোতের ভিতর হ্রি ছিলেন
বটে, কিন্তু ঠানানো মাঝে মাঝে শ্রীধাম
বৃন্দাবন যাত্রার জন্ত রাধাজীর আন্তান
সম্মুখাগে তনিত পাইতেছিলেন। আগে
গ্রামের বাহিরে বড় ঘাইতেন না, কিছুদিন
হইতে মধ্যে মধ্যে একাকী শ্রীপাট নারায়ণ
চলিয়া যান, কিরিতে কখন সন্ধ্যা উত্তীর্ণ
হইয়া যায়, কখন রাত্র হয়। ক্রমে সকলেই
জানিল, রাধাজী তাঁর ভক্তকে সত্যসত্যই
শ্রীবৃন্দাবনযাত্রার আদেশ দিয়াছেন।

শ্রীবৃন্দাবনযাত্রার আর ছই দিন বাকী।
তৃতীয়ার কীর্ণ চন্দ্রালোকে হরিপুরের অধু-
বিস্তৃত উক্তরের ডাঙ্গালত্মি অসীম-সাগর-তুল্য
প্রতিভাত হইতেছিল। প্রান্তর জনশূন্য,
শব্দমাত্রশূন্য—কেবল কমাচিৎ কোন
'ভাঙ্গালে' গীতের শব্দ তানটুকু শ্রবণপথে
প্রবেশ করিয়া, অদূরে লোকসমাগম স্রুতি
করিতেছে। সদানন্দ অপরাহ্নে সেই পথে
একাকী চতুর্দাসের শ্রীপাট দর্শনে গিয়া-
ছিলেন, একাকী প্রত্যাঘর্ষন করিতেছেন,
চন্দ্রযেখা অন্তঃগমনোদুগ, গ্রাম তখনও অর্ধ-
কোশ ব্যবধান, এমন সময় 'ভাঙ্গালে' গীতের
স্রব্দ কে পড়িল, —

“হলি তোর লেগে যখনা পায়,
তুই হলি না প—লা—র হার !”

তক্ত সদানন্দ অন্তরমনকভাবে বীরে বীরে অগ্রসর হইতেছিলেন, এই গানে নীল-ললিতা যুনীর ডটতুমি তাঁর মানসচক্ষে জাগিয়া উঠিল, আশ্চর্যবৃত্ত হইয়া ব্রজবিহারীর সেই সান্ত্বনাময় বংশীরবে ত্রিরাধিকার পূর্বরূপ তিনি প্রত্যক্ষ করিতেছিলেন। এই অবস্থায় নিজের অজ্ঞাতদারে তিনি গ্রামপ্রান্তবর্ত্তি-দীর্ঘিকায় পথে উপস্থিত হইলেন। সহসা বোধ ভাঙিয়া গেল, দাঁঘির বনবিস্তৃত বৃক্ষস্তরাল হইতে সহসা কেহ দৌড়িয়া আসিয়া তাঁহাকে আঘাতের উপর আঘাত করিল। সদানন্দ তিনিগেল মধু—হাতের লাঠি দিয়া আঘাতক্ষা করিতে করিতে দীর হ্রি কণ্ঠে বলিলেন—“মধু, কি অনিষ্ট তোর করেছে বাবা যে আমার প্রাণে মারিবি !” পুটে-শুকতর আহত হইয়া সদানন্দ ব্রক্তস্রাবে চরুণ হইতেছিলেন, মধুরকে তিনিতে পারিরাই পড়িয়া গেলেন।

মধুরের নাম ও সেই পতনশক একজন বীর্ধিকার সোপান অবতরণ করিতে করিতে ভ্রমিতে পাইল। সে দৌড়িয়া সদানন্দের নিকটবর্ত্তী হইতে না হইতে আঘাতকারী অন্তহিত হইয়া গেল। তারপর স্বধাসময়ে সদানন্দ গৃহে আনীত হইলেন—কথা কহিতে পারিতেছিলেন না, কিন্তু সকলের কথাবর্ত্তী শুনিতে যুঝিতে পারিতেছিলেন। তাঁহার পুত্রেরা সেই রাতেই মধুরবলকে আসানী

করিয়া খানার খবর দিবার পরামর্শ করিলে, অনেক চেষ্টায় তিনি ক্ষীণ হস্ত নাড়িয়া নিবেশ করিলেন।

সদানন্দ অনেকদিন কষ্ট পাইয়া আরোগ্যলাভ করিলেন, তাঁহার আত্ম-লব্ধন করিয়া আত্মীয়বন্ধুরা কেহ মধুরকে শান্তি দিতে পারিল না। ছেলেরা ক্রোধ করিলে সদানন্দ বলিতেন—“আমি সোয় বিধবাসক্ত হয়ে রাখাঞ্জীর আসেন পালন করিতে বিলম্ব করেছিলাম, তাই তিনি নিম্ম্ব নিলেন। তোমরা উদ্বোধন কর, একটু উটুতে হাঁটুতে পারিলেই যেন আমি ত্রিহুলাবনধাম দর্শন কর্তে পারি।”

ত্রিহুলাবন দর্শন করিয়া দীর্ঘকাল পরে সদানন্দ গৃহে ফিরিয়াছেন। মধুরবল কৌমদারীতে পড়িল না বটে, কিন্তু তাহার কুকীর্তির কথা সকলেই শুনিয়াছিল, মন্ডলেয়া বিখ্যাত করিয়া আর তাহাকে মোক্ষদা দেয় না। সকলের হেয় হইয়া, সদানন্দের বৃন্দাবন হইতে প্রত্যাগমনের পর, নির্লজ্জ আবার হরিপুরে আসিয়া চাক-আবাদ শুরু করিয়া দিল, নহিলে দিন যায় না। শুনিয়া অশ্রুস্রোচন করিয়া সদানন্দ বায়হোর তাহাকে ডাকিয়া পাঠাইলেন—সে কিন্তু তাঁর সঙ্গে দেখা করিতে পারিল না। দুইজনী বলিয়া পাঠাইয়াছিলেন, “মধুরকে বলো, সে কেন মনে রাখে, আমি ত তাকে তবুনি ক্ষমা করেছি।” মধু চিরদিন মর্মে মর্মে রহিল।

শ্রীশ্রীশচন্দ্র মজুমদার ।

মাগর-কথা ।

বিদ্যাসাগর মহাশয় পরোপকার-সাধনে আপ-
নার সর্বনাশ করিতে ইচ্ছুকত করিতেন
না। একবার এক ভদ্রলোক (নাটোরের
পুলিস্ সৰ্জ্জ ইন্স্পেক্টর) বিদ্যাসাগর
মহাশয়ের এক পরিচিত ব্যক্তির সহিত
ভাঁহার গৃহে উপস্থিত হইলেন। পরিচিত
ব্যক্তি বলিলেন, “গত কল্যাণ অপর্যন্ত মহা-
শয়ের সহিত সংকট করিতে আদিয়াছিলুম,
কিন্তু সাফল্য হয় নাই। এই ভদ্রলোক বড়ই
বিপন্ন হইয়াছেন। এক মকদ্দমার ইনি
নিরপরাধী হইয়াও চরমাসের জন্য কারা-
বাসের আদেশ পাইয়া অব্যাহতি লাভের
অন্ত ছাইকোর্টে মোশন করিয়াছেন। সাত-
শত টাকাও মনোমোহন ঘোষ মহাশয়কে
ইহার পক্ষসমর্থনের অল্প নিযুক্ত করা হই-
য়াছে। বাড়ী হইতে গত কল্যাণ টাকা আনিবার
কথা, কিন্তু আসে নাই। আজ এখন শুনারি
দিন। আপনি অতীত করিয়া ঘোষ-
মহাশয়কে একটু পত্র দিলে, তিনি অন্যাক্ষ
কাজটি করেন, ইত্যবসরে টাকা আসিলেই
ভাঁহাকে দেওয়া হইবে। এক সপ্তাহের
মধ্যে টাকা অবশ্যই দিব।” বিদ্যাসাগর
কহণের ব্যাপারটি অবগত হইয়া কণকাল
নীড়বে অপেক্ষা করিয়া বলিলেন, “এ কর্তব্য
আমার দ্বারা হইবে না। একজনের এক
পা মেলে, আর এক পা বাহিরে, তাহার
টাকা বাকি রাখিয়া কাৰ্য করিতে বলা কেমন
মেঘা? আর ঘেই বা কি মনে করিলে?

তাহার পর ঘোষের বিলাত যাওয়ার সময়েই
ভাঁহার সহিত আত্মীয়তা, তাহার পর আর
বড় বেশী দেখা-সাক্ষাৎ নাই, এরূপ স্থলে
সহসা এরূপ একটা অহরোধ করিয়া পাঠান
কেমন-কেমন দেখায়, এটা কি করা যায়?
তুমিই কেন ঘোষকে গিয়া ইহার কথা খল
না? তিনি ত তুমি পরোপকারী এবং
বিপন্নের বন্ধু। আমি এই দীর্ঘকালের মধ্যে
কখন কাহারও জন্য তাহার নিকট এরূপ
অহরোধ করিলে, আর অসত্যে তাহাকে
এ কথা বলিতে পারিতাম।”

বিপন্ন ভদ্রলোক এই কথা শুনিয়া সন্তো-
সনয়নে মাগরের পানে তাকাইয়া বলিলেন,
“তুমি যাঁহি কোথাও বাহার কিনারা না হয়,
সে এখানে আশ্রয় পায়, আমার তাহাও
পেল!” মাগর সন্তুষ্ট হইলেন। আশ্রয়দানে
চিঠির কাগজ লইয়া পত্র লিখিতে বসিলেন।
“My dear Ghose” পর্যন্ত লিখিয়া আর
লেখনী অগ্রসর হয় না। একমিনিট দু-
মিনিট করিয়া বহুক্ষণ কাটিয়া গেল। তখন
বসিলেন, “এ কর্তব্য আমার দ্বারা হইবে না।”
বিপন্ন ব্যক্তি পুনরায় বলিলেন, “তবে কি
আমি জেলেই বাইব?” আর্তের এই নিদাক্ষণ
হৃদয়বাক্য বিদ্যাসাগরজন্মের শেণের দ্বারা
বিদ্ধ হইল, তিনি দুই দিবস অশ্রুপাত করিয়া
কি করিলেন, পাঠক তুমিতে চাও? সে
দিনকার কণকালপূর্ণ বিদ্যাসাগর বাস্তব
হইতে ব্যাধের বই বাহির করিয়া, সাতশত

টাকার একখানি চেক চাতে দিয়া বলিলেন, “সেখ, আমার ব্যাঙ্কেও টাকা নাই, এই চেকখানি বোঝকে দিয়া বলগে যে, তিনি যেন কাল বেলা ১১ঃ টার পূর্বে এই চেক ব্যাঙ্কে না পাঠান। আমি আজ দিনের মধ্যে বেবন করিয়া হউক, এই টাকা ব্যাঙ্কে নজুত করিয়া দিব।” এখন জিজ্ঞাসা করি, বাংলা-দেশে এ সময়ের অভিনয় কি একবারে নির্দোষিত হইবে ?

স্বইন্স্পেক্টর বাবু হুজুতিবলেই হউক, আর তাঁহার অপেক্ষে প্রবল প্রমাণ ছিল বলিয়াই হউক, তিনি হাইকোর্টের বিচারে অব্যাহতি পাইয়া চতুর্থ দিবসে সাতশত টাকা লইয়া দরবার সাগরের ত্রিচরণ দর্শন করিতে আসিলেন। সঙ্গে সেই বকুটি। প্রণামান্তে টাকাগুলি সূত্রে রাখিয়া হাদিমুখে বলিলেন, “আমি হাইকোর্টের বিচারে অব্যাহতি পাইয়াছি। আর আজ প্রাতঃকালে বাড়ী হইতে এই টাকা আসিয়াছে, তাই সংবাদট আর টাকাগুলি দিতে আসিলাম।” বিদ্যাগার মহাশয় এই সংবাদ অবগত হইয়া আনন্দপ্রকাশ করিলেন প্রতাপাশয় বহুদূর দারোগাবাবু বিদ্যাগার মহাশয়ের মুখপানে তাকাইয়া আছেন, এমন সময়ে বিদ্যাগার মহাশয় বলিলেন, “তুমি গুপ্তসন্ধান হইয়া আমাকে বকনা করিলে ? আর তুমি (বকুটিকে) আমার পরিচিত হইয়া আমার সঙ্গে চাকুরী করিলে ?” দুইজনেই হস্তবৃদ্ধি ও শুভতালু হইয়া দণ্ডায়মান। অরক্ষণ পরে বিদ্যাগার মহাশয় বলিলেন, “তুমি না বলেছিলে, তুমি পুলিশে কৰ্ম কর ?”

সমস্তের উত্তর

এ কথা

কখনই সত্য হইতে পারে না, তুমি আমার নিকট মিথ্যা বলিয়াছ।” উত্তর—“আজ্ঞে না, মহাশয় অহুস্ফান করিলেই জানিতে পারিবেন যে, আমি নাটোরের পুলিশ স্বেইন্স্পেক্টর।” বকুটি তখন কথার ভবিষ্যৎ কিংবা আশংকা হইয়া বলিলেন, “আপনি কি বলিতে চান ?” তখন বিদ্যাগার মহাশয় একটু হাসিয়া বলিলেন, “মিথ্যা কথা ছাড়া আর কি মনে করিব ? এই দীর্ঘকালে অনেক লোক ‘দিব’ বলিয়া টাকা লইয়া আর দেখা দিল না, নিরুপায় লোকদের কথা না হয় নাই ধরিলাম, কিন্তু হুশ্রিচিত সম্পদ ব্যক্তিরাও তা প্রয়োজন-সাধনের ক্ষুদ্র টাকা লইয়া সকল সময়ে দিয়াইয়া দেন নাই, আর অন্তরঙ্গের তা কপাই নাই। যে দেশে নিলে আর দিতে চায় না, সে দেশে তুমি পুলিশের দারোগা হইয়া সাতদিনের কড়ারে টাকা লইয়া চতুর্থ দিবসে ফেরত দিতে আসিয়াছ, কেমন করিয়া বিখ্যাত করিব ?” দারোগাবাবু উচ্চ পুরস্কারে পুণ্ডিত হইয়া নতমস্তকে দণ্ডায়মান, তখন তাঁহাকে বসিতে বলিয়া বলিলেন, “হাইকোর্টের অধীরা অনেক সময়ে হুকুমদা না বুঝিয়া ছাড়িয়া দেয়—তোমারও লেখছি, তাই হয়েছে। তোমার তা জেল হওয়া উচিত ছিল। -সাতদিনের কড়ারে টাকা লইয়া চাকরির দিন যে ফেরত দেয়, সে পুলিশের দারোগাগিরি চাকুরি করে জেলে-বাকের না ত জেলে যাবে কে ?” রহস্যের সুযোগ পাইলে পরিচিত-অপরিচিত-বিচার ছিল না। লোককে অপ্রস্তুত করিতেও চাড়াগুন না।

উত্তর

এ কথা

অন্য

একবারে আনন্দপ্রকাশ করিয়া পরে টাকাটি তুলিবার সময়ে বলিলেন, “ওহে! আট আনা কম দিলে কেন?” দায়েগাবাবু অসন্তুষ্ট হইয়া ভাবিতেছেন, বোধ হয় টাকার মধ্যে কোনপ্রকারে একটা জুতলা থাকিয়া গিয়াছে। সন্দের বস্তুটি হৃদিতে পারিয়া একটু হাসিবামাত্র বলিলেন, “আমি আর নিকট টাকা লইয়াছিলাম, তাহাকে টাকা দিয়াছি, এখন এই টাকা ব্যাংকে রাখিতে গেলে পাড়িভাড়াটা কি আমাকে দিতে হবে?” দায়েগাবাবু হলো। “সাপের ছুঁচো

ধরা!” সাহস করিয়া বলতেও পারেন না যে, পাড়িভাড়ার আট আনা আমি দিতেছি, আবার দিবনা-ও বলতে পারেন না। বিদ্যা-সাপের মহাপুর বলিলেন, “আর আট আনা না গেলে আমি ও টাকা বাসে তুলিব না।” কখনকাল এইরূপ রহস্যে সমঝতিপাত করিয়া বলিলেন, “যখন আমার লোকসান করিলে, তখন আর কিছু লোকসান কর।” পঠিক! এখন বৃদ্ধিগা লউন, এ লোকসানে দায়েগাবাবুর রসনার কিরণ পরিতৃপ্তি হইয়াছিল।

ঐতিহাসিক বন্দোপাধায়।

আচার্য্য জগদীশের জয়বর্ত্তা।

নিজের প্রতি প্রভা মনের মাংসপেশী। তাহা মনকে উর্দ্ধে ষাড়া করিয়া রাখে এবং কর্ণের প্রতি চালনা করে। যে প্রতি নিজের প্রতি প্রভা হারাইতে বসে, সে চলৎ-শক্তিহীন হইয়া পড়ে।

শ্রদ্ধাঃ-স্বাধীনতার অভাব ভারতবাসীর পক্ষে সর্ব্বকালের অভাব নহে; কারণ, ভারত-বর্ষে-জাতীয় তেমন ব্যাপক ও প্রাণবৎ ছিল না। স্বপ্নলমানের আমলে আমরা রাজ্য-ব্যাপারে স্বাধীন ছিলাম না, কিন্তু নিজেদের ধর্ম্মকর্ম্ম, বিদ্যাবৃত্তি ও সর্ব্বপ্রকার কর্ম্মতার প্রতি অপ্রভা জন্মিবার কোন কারণ নটে নাই।

ইংরাজের আমলে আমাদের সেই আত্ম-প্রচার উপরে বা লাগিয়াছে। আমরা দুর্বে আছি, স্বচ্ছন্দে আছি, নিরাপদে আছি; কিন্তু আমরা সকল বিষয়েই অযোগ্য, এই ধারণা বাহির হইতে ও ভিতর হইতে আমাদেরকে আক্রমণ করিতেছে। এমন আত্মপ্রতি-ধারণা আমাদের পক্ষে আর কিছুই হইতে পারে না।

নিজের প্রতি এই প্রচারকার অস্ত্র আমাদের শিক্ষিত সমাজের মধ্যে একটা লড়াই চলিতেছে। ইহা আত্মরক্ষার লড়াই। আমাদের সমস্তই ভাল, ইহাই আমরা প্রাণ-পথে যোগ্য করিবার চেষ্টা করিতেছি। এই

চেটার মধ্যে যেটুকু সত্য আশ্রয় করিরাছে, তাহা আমাদের মঙ্গলকর, সেটুকু অক্ষতভাবে অক্ষতভাবে প্রেরণ দিতেছে, তাহাতে আমাদের ভাল হইবে না। স্বার্থপরকে ছিন্নহীন বলিয়া বিশ্বাস করিবার মত বতকণ চক্ষু বুজিয়া থাকিব, ততক্ষণ শেলাই করিতে বলিলে কাজে লাগে।

আমরা ভাগ, একথা ঠটনা করিবার লোক লম্বেটে ছুটিয়াছে। এখন এমন লোক চাই, যিনি প্রমাণ করিবেন, আমরা বড়। আচার্য্য জগদীশ বহু বার ঈশ্বর আমাদের সেই অভাব পূরণ করিরাছেন। আর আমাদের যথার্থ গৌরব করিবার দিন আসিরাছে,— লক্ষিত ভারতকে যিনি সেই শ্রুতিনি দিয়াছেন, তাঁকে সমস্ত অন্তঃকরণের সহিত প্রণাম করি।

আমাদের আচার্য্যের জন্মবার্ষিকী এখনো ভারতবর্ষে আদিয়া পৌছে নাই। যুরোপেও তাহার জন্মদিন সম্পূর্ণ প্রচাৰ হইতে এখনো কিকিৎ বিলম্ব আছে। যে সকল বৃহৎ আবিষ্কারে বিজ্ঞানকে নতন করিয়া আপন ভিত্তি স্থাপন করিতে বাধ্য করে, তাহা একদিনেই গ্রাহ্য হয় না। প্রথমে চারিদিক হইতে যে বিরোধ আগিয়া উঠে, তাহাকে নিরস্ত করিতে সময় লাগে; সত্যকেও স্বদীর্ঘকাল লড়াই করিয়া আপনায় সত্যতা প্রমাণ করিতে হয়।

আমাদের দেশে দর্শন যে পথে গিয়াছিল, যুরোপে বিজ্ঞান সেই পথে চলিতেছে। তাহা ঐক্যের পথ। বিজ্ঞান এ পর্য্যন্ত এই ঐক্যের পথে গুরুতর যে ফরেকট বাধা পাইরাছে, তাহান মধ্যে দুই ও জীবের প্রাণে একট।

অনেক অশ্বসকান ও পরীক্ষায় হৃৎস্পিন প্রকৃতি পণ্ডিতগণ এই প্রভেদ লক্ষন করিতে পারেন নাই। জীবতত্ত্ব এই প্রভেদের মোহাই নিরা পদার্থত্ব হইতে বহুদূরে আপন স্বাভাবিক রক্ষা করিতেছে।

আচার্য্য জগদীশ দুই ও জীবের ঐক্য-সেতু বিজ্ঞানের আলোকে আবিষ্কার করিরাছেন। আচার্য্যকে কোন কোন জীবতত্ত্ববিদ বলিয়াছিলেন, আপনি ত ধাতু-পদার্থের কথা লইয়া এতদিন পরীক্ষা করিরা আসিতেছেন, কিন্তু যদি আস্ত একখণ্ড ধাতুপদার্থকে চিমুটি কাটিয়া তাহার মধ্যে হইতে এমন কোন লক্ষণ বাহির করিতে পারেন, জীব-পরীতে চিমুটির সহিত বাহ্যর কোন সাদৃশ্য পাওয়া যায়, তবে আমরা মুগ্ধ!

জগদীশবাবু ইহার উত্তর দিবার মত এক নূতন কল বাহির করিরাছেন। জড়-বস্তুতে চিমুটি কাটিলে যে স্পন্দন উৎপন্ন হয়, এই কলের সাহায্যে তাহার পরিমাণ স্বত নিখিত হইয়া থাকে। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, আমাদের পরীতে চিমুটির কলে যে স্পন্দনরেখা পাওয়া যায়, তাহার, সহিত এই লেখার কোন প্রভেদ নাই।

জীবনের স্পন্দন বেগপ নাড়ীঘাতা বোকা যায়, সেইরূপ অভ্যন্তর জীবনী শক্তির বাড়ী-স্পন্দন এই কলে লিখিত হয়। অভ্যন্তর উপর বিবশ্রোষণ করিলে তাহার স্পন্দন কিরূপে বিদ্যুৎ হইয়া আসে, এই কলের দ্বারা তাহা চিত্রিত হইরাছে।

ষিপত ১০ই মে তারিখে আচার্য্য জগদীশ ব্রহ্মল ইন্সটিটিউশনে বক্তৃতা করিতে আসত হইরাছিলেন। তাহার বক্তৃতার বিষয় ছিল —

যান্ত্রিক ও বৈদ্যুতিক ভাঙনায় জড়পদার্থের সাক্ষাৎ (The response of inorganic matter to mechanical and electrical stimulus)। এই সত্যের ঘটনাক্রমে লর্ড রেলি উপস্থিত থাকিতে পারেন নাই, কিন্তু শ্রীলঙ্কা-রূপটকিন্স এবং বৈজ্ঞানিক সমাজের প্রতিনিধিত্ব লোকেরা অনেকেরই উপস্থিত ছিলেন।

এই সত্যের উপস্থিত কোন বিহীন ইংরাজ-মহিলা, সত্য যে বিবরণ আমাদের নিকট পাইয়াছেন, নিয়ে তাহা হইতে জানে জানে অনুবাদ করিয়া দিলাম।

সন্ধ্যা নয়টা বাজিলে দ্বার উন্মুক্ত হইল এবং বহু-সংখ্যক লইয়া সভাপতি সভায় প্রবেশ করিলেন। সমস্ত শ্রোতৃমণ্ডলী অধ্যাপকগণকে সন্দের অন্তর্ধান করিল। তিনি অবন্তরীনাভূতা এবং শাড়ী ও তাঁরতবর্ষীয় অলঙ্কারে সুশোভনা। তাঁহারের পশ্চাতে বহুদী লোকের দল, এবং সর্বশব্দে আচার্য্যাবহু নিজে। তিনি শাস্ত্রনামে একবার সমস্ত সভার প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন এবং অতি বন্দন সমাহিত ভাবে বলিতে প্রবৃত্ত হইলেন।

তাঁহার পশ্চাতে রেখাঙ্কন-চিত্রিত বড় বড় পট-টান্ডার রহিয়াছে। তাহাতে বিশ্বগ্রন্থাগার, প্রাচীর অবস্থার, ধর্ম্মভাষ্য প্রভৃতি আকর্ষণ, উদ্ভাসের তির তির-মাত্রার দ্বারা ও পেশীর এবং তাঁহার সহিত তুলনীয় ধাতুপদার্থের শব্দনরোমা অঙ্কিত রহিয়াছে। তাঁহার সম্মুখের টেবিলে দ্রোণকরণ সজ্জিত।

তুমি জান, আচার্য্যাবহু খাত্তী নহেন। থাকার জন্য তাঁহার পক্ষে সহজসাধ্য

এবং তাঁহার বলিবার ধরণও আবেগে ও সাধনসে পূর্ণ। কিন্তু সে সত্যে তাঁহার ব্যাক্যের বাধা কোণার অন্তর্ধান করিল। এত সহজে তাঁহাকে বলিতে আবি ওনি নাই। মাঝে মাঝে তাঁহার পদবিভ্রাস গাভীরো ও সৌন্দর্য্য পরিপূর্ণ হইয়া উঠিতে লাগিল,— এবং মাঝে মাঝে তিনি সহজে স্থানপূর্ণ পরিবাস সহকারে অত্যন্ত উচ্চল সরলভাবে বৈজ্ঞানিকবাহের মধ্যে অস্ত্রের পর অস্ত্র নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। তিনি রসায়ন, পদার্থতত্ত্ব ও বিজ্ঞানের অন্তর্গত শাখাপ্রশাখার ভেদ অত্যন্ত সহজ উপহাসেই যেন মিটাইয়া দিলেন।

তাঁহার পরে, বিজ্ঞানশাস্ত্রে জীব ও অজীবের মধ্যে যে সকল ভেদ-নিরূপক-সংজ্ঞা ছিল, তাহা তিনি মাকড়সার ভালের মত আঁড়িয়া ফেলিলেন। তাহার সূচনা সম্ভব, তাহাকেই ত জীবিত যেনে;—অধ্যাপক বহু একথও টিনের মূর্ত্তাপ্রাপ্যার্থে দাঁড় করাইয়া আমাদিগকে তাঁহার মরণাক্ষেপ দেখাইতে প্রবৃত্ত আছেন, এবং বিশ্বগ্রন্থাগারে যখন তাঁহার অস্ত্রঘণা উপস্থিত, তখন ঐক্য-প্রয়োগে পুনশ্চ তাহাকে হত্ব করিয়া তুলিতে পারেন।

অবশেষে অধ্যাপক যখন তাঁহার বনির্মিত কৃত্রিম চক্ষু সত্য সম্মুখে উপস্থিত করিলেন এবং দেখাইলেন, আমাদের চক্ষু অপেক্ষা তাঁহার শক্তি অধিক, তখন সকলের বিশ্বাসের অন্ত রহিল না।

ভারতবর্ষ যুগে যুগে যে মহৎ ঐক্য অ-স্তিত্বিত্তে বোধগা করিয়া আসিয়াছে, আজ যখন সেই ঐক্য-বোধ আধুনিক কালের

তাহার উচ্চারিত হইল, তখন আমাদের কিরণ পুলকস্ফূর্ত হইল, তাহা আমি বর্ণনা করিতে পারি না। মনে হইল, যেন বক্তা নিজের নিজস্ব-আবরণ পরিত্যাগ করিলেন, যেন তিনি অঙ্ককারের মধ্যে আব্ধিত হইলেন,—কেবল তাঁহার শব্দ এবং তাঁহার জ্ঞান আমাদের সম্মুখে উদ্ভিত হইল,—এবং বক্তার নিয়মিত উপসংহারভাগ যেন সেই তাহারই উক্তি :

I have shown you this evening the autographic records of the history of Stress and Strain in both the living and non-living. How similar are the two sets of writings, so similar indeed that you cannot tell them one from the other ! They show you the waxing and waning pulsations of life—the climax due to stimulants, the gradual decline of fatigue, the rapid setting in of death-rigor from the toxic effect of poison.

It was when I came on this mute witness of life and saw an all-pervading unity that binds together all things—the mote that thrills on ripples of light, the teeming life on earth and the radiant suns that shine on it—it was then that for the first time I understood the message proclaimed by my ancestors on the banks of the Ganges thirty centuries ago—

“They who behold the one, in all the changing manifoldness of this universe, unto them belongs eternal truth, unto none else, unto none else.”

বৈজ্ঞানিকদের মনে উৎসাহ ও সম্মানের অশ্রুস্রবের মনে শ্রদ্ধা পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। সম্ভব হইবে এক জন সর্বশ্রেষ্ঠ বন্যী ধীরে ধীরে আচার্য্যের নিকট উপস্থিত হইলেন এবং তাঁহার উচ্চারিত বচনের জন্ত তত্ত্ব বিবরণ স্বীকার করিলেন।

আমরা অস্বস্তব করিলাম যে, এতদিন পরে ভারতবর্ষ—শিখাভাবেও নহে, সম্বন্ধ-ভাবেও নহে, শুকভাবে পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিক-সভার উদ্ভিত হইয়া আগনার জ্বলন্তোত্তাপ সঙ্গম করিল,—পদার্থতত্ত্বদক্ষানী ও প্রকৃতি-জ্ঞানীর মধ্যে যে প্রভেদ, তাহা পরিমলুট করিয়া দিল।

লেখিকার পত্র হইতে সভার বিবরণ যাহা উদ্ধৃত করিলাম, তাহা পাঠ করিয়া আমরা অহতর্য্য বোধ করি নাই। আমরা উপনিষদেবতাকে নমস্কার করিলাম; ভারতবর্ষের যে পুরাতন ঋষিগণ বলিয়াছেন, “বসিৎ কিঞ্চিৎ অগ্নং সর্বং প্রাণ এভতি” এই বাহ্য ষিদ্ধ সমস্ত জগৎ প্রাণেই কল্পিত হইতেছে। সেই ঋষি-ওলীকে অন্তরে উপাসনা করিয়া বলিলাম, হে জগৎপুরুষ, তোমাদের বাণী এখনো নিঃশেষিত হয় নাই, তোমাদের তত্ত্বজ্ঞান হোমস্থাপন এখনো অনির্বাণ হইয়াছে, এখনো তোমরা ভারতবর্ষের অধঃকরণের মধ্যে প্রচ্ছন্ন হইয়া বাস করিতেছ! তোমরা আমাদের পক্ষ হইতে দিবে না, অধঃ-পক্ষকে কৃতার্ণভার পথে লইয়া যাইবে। তোমাদের মহৎ আমরা যেন বধার্ণভাবে বৃদ্ধিতে পারি। যে মহৎ অভিক্রম আচার-বিচারের ভূজসীমার মধ্যে বদ্ধ নহে,—আমরা অন্য দিককে “হিঃগানি” বলি,

তোমরা তাহা নইয়া। তপোবনে বসিয়া কলহ করিতে না, সে সম্বন্ধই পণ্ডিত ভারত-বর্ষের আবর্জনাশাস্ত্র;—তোমরা যে অনন্ত-বিস্তৃত শোকে আত্মাকে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলে, সেই শোকে যদি আমরা চিত্তকে জাগ্রত করিয়া তুলিতে পারি, তবে আমাদের জ্ঞানের দৃষ্টি গৃহপ্রাপ্তের মধ্যে প্রতিহত না হইয়া বিশ্বরহস্যের অন্তরনিকেতনের মধ্যে প্রবেশ করিবে। তোমাদিগকে দ্বন্দ্ব করিয়া বতকণ আমাদের বিনয় না অগ্নিহা গর্বেয় উত্তর হয়, কর্ণের চোটা জাগ্রত না হইয়া সম্ভোদের জড়ব পুঞ্জীভূত হইতে থাকে, এবং ভবিষ্যতের প্রতি আমাদের উদ্যম ধাবিত না হইয়া অতীতের মধ্যে সন্মত চিত্ত আচ্ছন্ন হইয়া গোপ পায়, ততক্ষণ আমাদের মুক্তি নাই।

“আচার্য্য জগদীশ আমাদের গৃহীত দেখাইয়াছেন। তিনি বিজ্ঞানরাজ্যে যে পথের সন্ধান পাইয়াছেন, সে পথ প্রাচীন ঋষিদিগের পথ—তাহা একের পথ। কি জানে বিজ্ঞানে, কি ধর্মে কর্ণে, সেই পথ ব্যতীত “নানা: পথ্য বিদ্যাতে অরন্য।”

কিন্তু আচার্য্য জগদীশ যে কর্ণে হাত দিয়াছেন, তাহা শেষ করিতে তাঁহার বিলম্ব আছে। বাবাও দ্বিতীয়। প্রথমত, আচার্য্যের নুতন সিদ্ধান্ত ও পরীক্ষার দ্বারা অনেকগুলি পেটেন্ট অকর্ষণ্য হইয়া গাইবে এবং একমূল বণিকসম্রাজ্য তাঁহার প্রতিষ্ঠিত হইবে। দ্বিতীয়ত, জীবনব্যবস্থাপন জীবনকে একটা পতন, স্ট্রেচ ব্যাপার বলিয়া জানেন, তাঁহাদের বিজ্ঞান যে কেবলমাত্র পদার্থতত্ত্ব, এ কথা তাঁহারা কোনমতেই স্বীকার করিতে চাহেন না।

তৃতীয়ত, কোন কোন সূচলোকে মনে করেন যে, বিজ্ঞানদ্বারা জীবনতত্ত্ব বাহির হইলে ঈশ্বরের অস্তিত্ব বিখ্যাস করিবার প্রয়োজন থাকে না, তাঁহারা পুনর্জিত হইয়াছেন। তাঁহাদের ভাবগতিক দেখিয়া খৃষ্টান বৈজ্ঞানিকেরা ভটহ, এমনকি অধ্যাপক কোন কোন বৈজ্ঞানিকের সহায়ত্ব হইতে বঞ্চিত হইবেন। সুতরাং একাকী তাঁহাকে অনেক বিপদের সহিত যুদ্ধ করিতে হইবে।

তবে, তাঁহার নিরপেক্ষ বিচারের অবিকারী, তাঁহার উন্নতিত হইয়াছেন। তাঁহার বশেন, এমন ঘটনা হইয়াছে যে, যে সিদ্ধান্তকে রয়াল সোসাইটি প্রথমে অস্বৈজ্ঞানিক বলিয়া পরিহার করিয়াছিলেন, বিশ বৎসর পরে পুনরায় তাঁহার আশ্রয়ের সহিত তাহা প্রকাশ করিয়াছেন। আচার্য্য জগদীশ যে মহৎ তত্ত্ব বৈজ্ঞানিক-সমাজে উপস্থিত করিয়াছেন, তাহার পরিণাম বচনুগামী। এক্ষণে আচার্য্যকে এই তত্ত্ব লইয়া সাহস ও নির্বিকার সহিত যুদ্ধ করিতে হইবে, ইহাকে সাধারণের নিকট প্রতিষ্ঠিত করিয়া তবে তিনি বিশ্রাম করিতে পাইবেন। এ কাজ তিনি আরম্ভ করিয়াছেন, শেষ করা তাঁহারই সাধ্যাত্ত। ইহার তার আর কেহ গ্রহণ করিতে পারিবে না। আচার্য্য জগদীশ বর্তমান অবস্থার যদি ইহাকে অসম্পূর্ণ রাখিয়া দান, তবে ইহা নষ্ট হইবে।

কিন্তু তাঁহার ছুটি দুঃখাইয়া আসিল। শ্রীমতী তাঁহাকে প্রেসিডেন্সি কলেজের অধ্যাপনাকার্য্যে যোগ দিতে আসিতে হইবে এবং তিনি তাঁহার অল্প কাজ বহু করিতে বাধ্য হইবেন।

কেবল অবসরের অত্যাধিক ভেঁষন ভয়
করি না । এখানে সর্গপ্রকার আত্মক্লেণের
অভাব । আচার্য্য অগদীশ কি করিতেছেন,
আমরা তাহা ঠিক বুঝিতেও পারি না । এবং
দুর্গতিপ্রাপ্ত জাতির দ্বাভাবিক ক্লান্ততা বশত
আমরা বড়কে বড় বলিয়া প্রজ্ঞা করিতে
পারি না, প্রজ্ঞা করিতে চাহি-ও না । আমা-
দের শিক্ষা, সামর্থ্য, অধিকার যেমনই থাক,
আমাদের স্পর্ধাও অল্প নাই । বিশ্বের সে
সকল সহায়কে এ দেশে কাজ করিতে
পাঠান, তাহারা যেন বাংলা গবর্ণমেন্টের
নোয়াখালি-রেলবার কার্য্যতায় প্রাপ্ত হন ।
সাহায্য নাই, প্রজ্ঞা নাই, ঐতি নাই,—
চিত্তের শক্তি নাই, স্বাধা নাই, জনশূন্য বহু-
ভূমিও ইহা অপেক্ষা কাজের পক্ষে অধিকূল
স্থান ;—এই ত বদেবের লোক—এদেশীয়
ইংরাজের কথা কিছু বলিতে চাহি
না । এ ছাড়া বহু-গ্রন্থ, সর্গনা বিজ্ঞানের
আগোচনা ও পরীক্ষা ভারতবর্ষে হুলস্থল নহে ।

আমরা অধ্যাপক বসুকে অহুসর করি-
তেছি, তিনি যেন তাঁহার কৰ্ম সমাধা করিয়া
দেশে কিরিয়া আসেন । আমাদের অপেক্ষা
অল্পতর অহুসর তাঁহার অন্তঃকরণের মধ্যে
নিহিত ধ্বনিত হইতেছে, তাহা আমরা জানি ।
সে অহুসর সমস্ত-কতি ও আত্মীয়বিচ্ছেদ-
দুঃখ হইতেও বড় । তিনি সমস্ত নিঃস্বার্থ
জ্ঞানপ্রচারের জন্য তাঁহার দ্বারে আগত
প্রচুর ঐশ্বর্য্যপ্রণোদনকে অবজ্ঞাসহকারে
প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন, সে সংবাদ আমরা
অবগত হইরাছি, কিন্তু সে সংবাদ প্রকাশ
করিবার অধিকার, আমাদের কাছে না
আছে, বিধা করিয়া আমরা মৌন
রহিলাম । অতএব এই প্রণোদনহীন
পতিত জ্ঞানস্রোতকেই সর্বোচ্চে রাখিয়া
জ্ঞানে, সাধনা, কণ্ঠ, এই হস্তচািরিত্ত
হস্তত্যাগ দেশের শুদ্ধ ও আদর্শহানীর
হইবেম, ইহাই আমরা একান্তমনে কামনা
করি ।

জগদীশ চন্দ্র বসু ।

ভারতের কোন বৃদ্ধ স্বরির তরুণ বৃত্তি তুমি
হে আর্ঘ্য আচার্য্য অগদীশ ? কি অদ্বিত তপোভূমি
বিরচিতলে এ পাষাণ নদীর তরুণ বুলিতলে ?
কোথা গেলে সেই শান্তি এ উজ্জ্বল জনকোণাহলে
যার তলে মর হয়ে যুহুর্ন্তে বিশ্বের কেন্দ্রমাঝে
ধাঁড়াইলে একা তুমি—এক বেধা একাকী বিরাজে
স্বর্গচন্দ্র-পূর্ণাঙ্গ-পদ্মপঙ্কি-বৃন্দার প্রান্তরে,—
এক তরুণীন প্রাণ নিত্য বেগা নিজ অক্ষপায়ে

হুগাইছে চরাচর নিঃশব্দ লকীতে ! মোরা ধবে
 যত ছিহ্ন অতীতের অতিদূর নিঃশব্দ গোরবে,
 পরবস্ত্রে, পরবাক্যে, পর-তলিহার ব্যাকরণে
 কমোল করিতেছিহ্ন কীতকণ্ঠে কুহ অঙ্কুশে—
 তুমি ছিলে কোন ধরে ? আপনার তত্ত্ব দানাদান
 কোথায় পাতিয়াছিলে ? সংঘত গম্ভীর করি' মন
 ছিলে রত তপস্যায় অস্তরণির অধিবণে
 লোক-লোকান্তের অন্তরালে,—যেথা পূর্ব কবিগণে
 বহুশব্দে সিংহদ্বার উল্কাটিয়া একের সাক্ষাতে
 পাড়াতেন বাক্যহীন স্তম্ভিত বিমিত্র জোড়হাতে !
 হে তপস্বী, ডাক তুমি সামন্তে জলধগজ্ঞানে
 "উত্তীর্ণত ! নিবোধত !" ডাক শত্রু-অভিমানী জনে
 পাণ্ডিত্যের পণ্ডিতকর্তৃ হতে ! সুবৃহৎ বিখতলে
 ডাক বৃহৎ দান্তিকেরে ! ডাক দাও তব শিষ্যদলে—
 একরে পাড়াই তরা তব হোম-হুতাশি দিগ্বিগ্না !
 আরবার এ ভাবত আপনাতে আলুই ফিগ্নিগ্না
 নিষ্ঠার, প্রচাৰ, ধ্যানে,—বহুক সে অগ্রনস্ত চিত্তে
 গেঃতহীন ধনহীন শুদ্ধ শাস্ত গুরুর বেদীতে !

কবিজীবনী ।

কবি চৈনিগনের পুত্র তাঁহার পরলোক-
 গত পিতার চিঠিপত্র ও জীবনী বৃহৎ ছই-
 খণ্ড পুস্তকে প্রকাশ করিয়াছেন ।

প্রাচীন কবিদের জীবনের বিস্তৃত বিবরণ
 বুলিয়া পাওয়া যায় না । তখন জীবনীর
 লক্ষ্য লোকের ছিল না—তাঁহা ছাড়া তখন বড়
 ছোট সকল লোকেই এখনকার চেয়ে
 অপ্রকাক্ষে বসে ক'দি। চিঠিপত্র, খবরদার

কাগজ, সভাসমিতি, সাহিত্যের বাধ-বিরোধ,
 এমন প্রবল ছিল না । সুতরাং প্রতিভা-
 শালী ব্যক্তির জীবনব্যাপারকে নানাদিক্
 হইতে প্রতিফলিত দেখিবার সুযোগ তখন
 ঘটিত না ।

অনেক ভ্রমণকারী বড় বড় নদীর উৎস
 পুঞ্জিতে ভ্রমণ স্থানে গিয়াছে । বড় কাব্য-
 নদীর উৎস পুঞ্জিতেও কোথায় হইবে ।

আধুনিক কবির জীবনচরিতে এই কৌতূহল নিবৃত্ত হইতে পারে। এমন আশা মনে করেন। মনে হয়, আধুনিক সমাজে কবির আর সুকাইবার স্থান নাই;—কাব্যজ্ঞাতের উৎ-পত্তি যে মিথ্যে, সে পর্য্যন্ত রেলগাড়ি চলিতেছে।

সেই আশা করিয়াই পরমাগ্রেহে বৃহৎ চুই-খণ্ড বই শেষ করা গেল। কিন্তু কবি কোথায়, কাব্যজ্ঞাত কোন্‌ গুহা হইতে প্রবাহিত হইতেছে, তাহা ত খুঁজিয়া পাওয়া গেল না। ইহা টেনিসনের জীবনচরিত হইতে পারে, কিন্তু কবির জীবন-চরিত নহে। আমরা বুঝিতে পারিলাম না, কবি কবে মানবজন্ম-সমুদ্রের মধ্যে ছাণ ফেলিয়া এত জ্ঞান ও ভাব আহরণ করিলেন এবং কোথায় বসিয়া বিশ্বসঙ্গীতের সুরগুলি তাহার ঝাঁপীতে অন্ত্যাস করিয়া লইলেন ?

যখন ব্রাউনিংয়ের জীবনচরিত পড়িয়াছিলাম, তখন কবির পরিচয় পাই নাই। মানবজীবনের এমন বিপুল অভিজ্ঞতা কবি কবে লাভ করিয়াছিলেন, তাহার একটিনাত্র জীবনে কি উপায়ে তিনি অসংখ্যদলের নিগূঢ়বার্তা সংগ্রহ করিতে পারিলেন ? তাহার চিঠিপত্র পড়িলাম, জীবনের ঘটনা-বলীভংগেবিশিষ্ট, কিন্তু কোন খবর পাইলাম না। এ সমস্ত জীবনচরিত অল্প কাহারও হইলেন, আশ্চর্য্য বোধ করিতাম না।

তবে এ লইয়া কি হইবে ? কাব্যে ঝাঁপাদিগকে বড় করিয়া দেখিতেছিলাম, কবি বলিয়া চিনিতেছিলাম—জীবনচরিতে তাহাদিগকে ছোট করিয়া বেগে—তাহার জন্মস্থানবন্দেব সহিত সঙ্গ করিয়া যান

সেখানে তাহার বসি নিঃসঙ্গ হইতে নাহিয়া অল্প ভাষাণের সহিত একাকার হইয়া দেখা দেন ! জীবনচরিতে তাহার চিঠিপত্র লেখেন, সেখানেস্বাক্ষর করেন, ভালমন্দ বলেন, স্ততিনিন্দার টেলেন, অবশেষে ব্যানো হইয়া বিশেষ ভাষাণে মরিয়া নিঃশেষিত হইয়া যান। আরও অনেকে এমন কাজ করিয়া থাকে—চুই খণ্ড তাহার জীবন-চরিত বাহির হইতে থাকিলে, গ্রন্থভার হইতে ধরদীকে রক্ষা করিবার জন্য একাদশ অব-তারের প্রয়োজন হয়।

বাস্তবিক পক্ষে, কবির কাব্যে এবং কবির জীবনে যদি কোন নিগূঢ় যোগ থাকে, তবে সে যোগরহস্ত উদ্ঘাটন চরিতাখ্যাতকের কর্তব্য নহে। গাছের রস ও খাত্ত এবং তাহার মূল হইতে পল্লব পর্য্যন্ত আলোচনা করিয়া দেখিয়াও, এটুকু বাহির করা গেল না যে, মাধবীলতার মাধবীমূল কেমন করিয়া ফুটিল। জীবনচরিতে তাহার কথা পড়িলাম, সে যে কেমন করিয়া কখন কাব্য লিখিল, তাহাও কিছুতে ঠাহর হইল না !

কবি কথিতা যেমন করিয়া রচনা করিয়াছেন, জীবন তেমন করিয়া রচনা করেন নাই। তাহার জীবন কাব্য নহে। ঝাঁপাতা কর্ণবীর, তাহার নিজের জীবনকে নিজে সৃজন করেন। কবি যেমন তাহার বাবার মধ্য হইতে ছন্দকে গাঁথিয়া তোলে, যেমন সামান্য ভাবকে অসামান্য সুর এবং ছোট কথাতে বড় অর্থ দিয়া থাকেন, তেমনি কর্ণবীরগণ সংসারের কঠিন বাবার মধ্যে নিজের জীবনের ছন্দ নির্মাণ করেন, এবং চারিদিকের ক্ষুদ্রতাকে অপূর্ণ ক্ষমতাবলে বড় করিয়া নেন। তাহার

হাতের কাছে যে কিছু সামগ্র্য মালমসলা পান, তাহা বিয়াই নিজেই জীবনকে মহৎ করে। এবং তাহাদিগকেও বৃহৎ করিয়া জেগেন। তাঁহাদের জীবনের কষ্টই তাঁহাদের কাব্য, সেইজন্য তাঁহাদের জীবনী মাতৃব কলিতে পারে না।

কিন্তু কবির জীবন সাহসের কি কাজে
 লাগিবে ? তাহাতে দ্বাধী পদার্থ কি আছে ?
 কবির নামের সঙ্গে বাঁধিয়া তাহাকে উচ্চ
 টান্ডাইয়া রাখিলে, কৃত্রিম মহত্তের সিংহাসনে
 বসাইয়া লজ্জিত করা হয়। জীবনোন্মিত
 মহাপুরুষের, এবং কবির মহাকবির।

দৈবক্রমে মহাকবির সহিত মহাপুরুষের
লক্ষণ মিলিতে পারে। কোন স্ফঞ্জম্মা বাক্য
কাব্যে এবং জীবনের কৰ্ণে, উভয়ই নিজের
শ্রুতিভা বিকাশ ক্রিতে পাবেন—কাব্য ও
কৰ্ম উভয়ই তাঁহার এক শ্রুতিভা কল।
তাঁহাদের কাব্যে তাঁহাদের জীবনের সহিত
একত্র করিয়া দেখিলে, তাহার অর্থ বিদ্যুতভর,
ভাব শিথিলতার হইয়া উঠে। দাত্তের কাব্যে
দাত্তের জীবন লক্ষিত হইয়া আছে, উভয়কে
একত্রে পাঠ করিলে, জীবন এবং কাব্যের
মৰ্য্যাদা বেশী করিয়া দেখা যায়।

চৈনিকদের জীবন সঙ্গ্রাম নহে। তাহা
সংস্রাবের জীবন বটে, কিন্তু তাহা কোন
অংশেই প্রশস্ত, বৃহৎ বা বিচিত্রকলাপী
নহে। তাহা তাহার কাব্যের সহিত সমান
ওজন রাখিতে পারে না। বরঞ্চ তাহার
কাব্যে যে অংশে সঙ্গীর্ষতা আছে, বিপ-
ল্যাপকতার অভাব আছে, আধুনিক বিলাতি
সৃষ্টার লোক-কল্পনামাত্র সদা গন্ধ কিছু
অভিমাত্র্যে আছে, জীবনের বহুত্বের

অপেক্ষের প্রতিবিম্ব পাওয়া যায়, কিন্তু যে ভাবে তিনি বিরাট, যে ভাবে তিনি মানুষের সহিত মানুষকে, স্বপ্নির সহিত স্বপ্নিকর্তাকে একটি উদার মনীতিকারো সমগ্র করিয়া দেখাইয়াছেন, তাঁহার সেই বৃহৎ তাবড় জীবনীর মধ্যে আত্মপ্রকাশ কবে নাই।

আমাদের আটান ভারতবর্ষের কোন কবির জীবনচরিত নাই। আমি সে ক্ষেত্রে চিত্তকোতূহলী, কিন্তু হুঃখিত নহি। বাম্বীকি-সম্বন্ধে যে গল্প প্রচলিত আছে, তাহাকে ইতি-হাস বলিয়া কেহই গণ্য করিবেন না। কিন্তু আমার মতে তাহাই কবির প্রকৃত ইতিবৃত্ত। বাম্বীকির পাঠকগণ বাম্বীকির কাব্য হইতে যে জীবনচরিত সৃষ্টি করিয়া লইয়াছেন, তাহা বাম্বীকির প্রকৃত কাব্যের অপেক্ষা অধিক সত্য। কোন্ আধাতে বাম্বীকির ছন্দ তেজ করিয়া কাব্য-উৎস উজ্জ্বলিত হইয়াছিল?—ককণার আবর্তে। রামায়ণ ককণার অঙ্গনিবর্ত। কৌকবিব্রহ্মার শোকাক্ত ক্রন্দন রামায়ণককণার মর্ম্মস্থলে ধনিত হইতেছে। রাবণও ব্যাধের মত প্রেমিকসুগলকে বিচ্ছিন্ন করিয়া দিয়াছে—লগ্নাভাঙের সুদব্যাপার উন্মত্ত বিব্রহ্মার পাখার ঝটপটি। রাবণ যে বিচ্ছেদ ঘটাইয়া দিল, সুতরাং বিচ্ছেদের অপেক্ষাও তাহা ভয়ানক। মিলনের পরেও এ বিচ্ছেদের প্রতিফলন হইল না।

স্বপ্নের আয়োজনটি কেমন প্রমত্ত হইয়া
আসিয়াছিল! পিতার বেধ, একাধের শ্রুতি,
ব্রাত্যর শ্রবণ—তাহারই মাঝখানে ছিল নব-
পরিণীত রামসেতার যুগ্মমিলন। যৌব-
ব্রাহ্মণের অধীন এই অশ্রমভোগকে সম্পূর্ণ
এক নতুন পদে পরিণত করিয়া উত্তর হইয়া

ছিল। ঠিক এমন সময়েই ব্যাধ শর লক্ষ্য করিল—সেই শর বিদ্ধ হইল সীতাহরণ-কালে। তাহার পরে শেবপর্ষাদ বিরহের আর অন্ত রহিল না। দাম্পত্যস্থলের নিবিড়-তম আভ্যন্তর সময়েই দাম্পত্যস্থলের দারুণ-তম অবদান।

জ্যোতিষ্মনের গম্ভীর রামায়ণের মূল কাব্যটির সংক্ষিপ্ত রূপক। মূল কথা এই, লোকে এই সত্যটুকু নিঃসন্দেহ আবিষ্কার করিয়াছে যে, মহাকবির নির্মল অচুর্নিত-প্রবাহ করুণার উদ্ভাসেই নিগলিত হইয়া জন্মান হইয়াছে,—অকালে দাম্পত্যশ্রমেত চিরবিচ্ছেদঘটনই পশির করুণার্তি কবিতাকে উদ্ভবিত করিয়াছে।

আবার, আর একটি গল্প আছে রত্নাকরের কাহিনী। সে আর এক ভাষার কথা; রামায়ণের কাব্যপ্রকৃতির আর এক দিকের সমালোচনা। এই গল্প রামায়ণের রামচরিত্রের প্রতি লক্ষ্য করিয়াছে। এই গল্পে বলিতেছে, রামসীতার বিচ্ছেদস্থলের অপরিণীম করুণাই যে রামায়ণের প্রবান অবলম্বন, তাহা নহে, রামচরিত্রের প্রতি ভক্তিই ইহার মূল। দম্ভকে কবি করিয়া তুলিয়াছে, রায়ের এমন চরিত্র,—ভক্তির এমন প্রবলতা! রামায়ণের রাম যে ভারতবর্ষের চক্রে কত বড় হইয়া দেখা দিয়াছেন, এই-গল্পে যেন তাহা মাণিয়া দিতেছে।

এই দুই গল্পেই বলিতেছে, প্রতিদিনের কাব্যার্তি, চিত্তিগত, দেখাদৃশ্য, কাজকর্ম, শিক্ষাদীক্ষার মধ্যে কবিত্বের মূল নাই—তাহার মূলে একটি বৃহৎ আবেগের সঞ্চার, যেন একটি আকস্মিক অনৈতিক

আবির্ভাবের মত—তাহা কবির আভ্যন্তর জ্বলিত। কবিকল্প যে কাব্য লিখিয়াছিলেন, তাহাও বশ্রে আদিত হইয়া,—দেবীর প্রভাবে।

কালিদাসের সহজে যে গল্প আছে, তাহাও এইরূপ। তিনি মূর্ণ, অরসিক, ও বিদ্বদীত্রীর পরিহাসভাজন ছিলেন। অকস্মৎ বৈবপ্রভাবে তিনি কবিত্বরসে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিলেন। বাস্তবিক নিষ্ঠুর দম্ভা ছিলেন, এবং কালিদাস অরসিক মূর্ণ ছিলেন, এই উভয়ের একই ভাষণ্য। বাস্তবিক রচনার মর্যাপূর্ণ পবিত্রতা। এবং কালিদাসের রচনার রসপূর্ণ বৈবপ্রবাহ অদ্বৈত অনৈতিকতা প্রকাশ করিবার ক্ষমতা ইহা চোখোমাত্র।

এই গল্পগুলি জনগণ কবির জীবন হৃদয়ে সংগ্রহ করে নাই, তাহার কাণ্ড হইতে সংগ্রহ করিয়াছে। কবির জীবন হইতে যে সকল তথ্য পাওয়া বাইতে পারিত, কবির কাব্যের সহিত তাহার কোন গভীর ও চিরস্থায়ী যোগ থাকিত না। বাস্তবিক প্রাত্যহিক কাব্যার্তি-কাজকর্ম কখনই তাহার রামায়ণের সহিত তুলনীয় হইতে পারিত না, কারণ সেই সকল ব্যাপার সাময়িক, অনিত্য;—বাস্তবিক তাহার অঙ্গগত নিত্যপ্রকৃতির—সমগ্র প্রকৃতির সৃষ্টি, তাহা একটি অনির্জন্যীয় আভ্যন্তরীণ সক্তির বিকাশ—তাহা অজ্ঞাত কাজকর্মের মত কনিক-বিক্ষোভ-জনিত নহে।

টেনিসনের কাব্যগত জীবনচরিত্র একটি লেখা বাইতে পারে—বাস্তবজীবনের পক্ষে তাহা অমূলক, কিন্তু কাব্যজীবনের পক্ষে তাহা সমূলক। কল্পনার সাহায্য ব্যতীত তাহাকে সত্য করা বাইতে পারে না। তাহাতে গতি জন্মিবে ও তাহা অঙ্গাঙ্গী

কালের সহিত ত্রিষ্টোবিধার কালের অন্তর্ভুক্ত-
রক্ষণ মিশ্রণ থাকিবে ; — তাহাতে আলিনের
বাহু এবং বিভ্রাণের আবিষ্কার একত্র হইবে ।
বর্তমান যুগ বিবাহের জায় তাঁহাকে বাণ্য-
কালে কল্পনারূপে নির্দীপিত করিয়া দিয়া-
ছিল—সেখানে প্রাচীনকালের গুহগুপ্তের
মধ্যে একাকী বাস করিয়া কেমন করিয়া
আগাদিনের প্রদীপটি পাইয়াছিলেন। কেমন
করিয়া রাজকল্পার সহিত তাঁহার মিলন হইল
—কেমন করিয়া প্রাচীনকালের ধনসম্পদ
বর্জন করিয়া তিনি বর্তমান কালের মধ্যে

রাজবেশে বাহির হইলেন, সেই সুদীর্ঘ
আধ্যাত্মিক লেখা হয় নাই । যদি হইত, তবে
একজনের সহিত আর একজনের লেখার
ঐক্য থাকিত না,—টেনিসনের জীৱন ভিন্ন
ভিন্ন কালে ও ভিন্ন ভিন্ন লোকের মধ্যে নুতন
নুতন রূপ ধারণ করিত ।

কবির জীবনী কালনিক ও সেই
কালনিক জীবনী তাঁহার কাব্যসমালোচনার
রূপকল্পরূপ হওয়া উচিত । কারণ, কবির
মধ্যে কাব্যই সত্য অংশ, জীবন তাহার
তুলনায় অসত্য ।

আমার কন্যার প্রতি ।

(Victor Hugo হইতে)

শোন বলি বাছা ওরে !

দেখিছ তো, নত-পিরে

সহিতছি কত অত্যাচার ।

এমনি তুমিও সহ !—

থাকো পিতৃ বহুদূরে

লোকালয় করি' পরিহার ।

হবে স্বপ্ন ?—না রে বাছা ;

—সিঁড়ি-লাত ?—তাও না, তাও না ।

বা হবার হোক বলি'

মন বাধো—তবেই সাক্ষ্য ।

দয়াকরী মধুরা হও,

ভক্তি-মিত্র তাণ উৎ

দিবা যথা নভোনাথে

অগস্ত্য রবির দীপ

করবে রক্ষণ

—ও-অঁধি-নীলিমা-ম'ঝে

আপন আশ্রয় হোয়'তি

করহ স্থাপন ।

কেহ নহে স্বাধী হেথা,

সিঁড়ি-লাত কারো নাহি হয়

সকলেরি পক্ষে কাল

অসম্পূর্ণ জানিবে নিশ্চয় ।

কাল সে তো শুধু ছাগ,

আর বাছা, মোনের জীবন

সে ও তো রে ছাত্রামর

—তানয়েই তাহার গঠন ।

নিজ নিজ ভাগ্যে লেখ	যার নামে দিক্ উদ্ভাসিত
সকলই রাত —বীতরাণ	—ফণেক, মশাল-সম
অধ-লাভ-পক্ষে হার !	অনি উঠি' অগণ্য নিখার
স্বাকারি সকলি অতাব	কিকিৎ হারার তরে
—তাও সে সামান্য কিছু	শেষে 'আমি' শ্রমানে নিলার ।
যাতে যার দাড় অহুরাগ ।	প্রকৃতি-মননী জানি'
সেই সে "সামান্য-কিছু"	আমাদের হৃৎ-কষ্ট-রাশি
যাহা সবে পোঁজে হেথা	শূন্ত এ জীবন-'পরে
যার তরে প্রাণের পিঙ্গল	অহু-কম্পা স্তমিত প্রকাশি'
—সে একটি কথা শুধু,	উবার করেন দিক
একটুকু নাম, অর্থ,	প্রতি প্রাতে মন্ত্রমলে 'তাসি' ।
একটি কটাক্ষ, বৃহৎ-হাস ।	আর, অন্তর্দামী দেব
রাজা মহারাজা যিনি	জানাইরা দেন জ্ঞানালোকে
আমোদে অতাব তাঁরে	—প্রতি পদে আমাদের—
হয় প্রেমাতাবে ।	তিনি কেবা—আমরাই বা কে ।
একবিন্দু জল বিনা	এই মর্ত্য অধোলোকে
জনস্ত সে মধু-জ্ববে	চরাত্র সকলেরি মাঝে
সদা কোত জাগে ।	—কিবা জড়, কিবা নর—
মানব বৃহৎ কৃণ	মহান্ নিরম এক রাজে ।
যত কেন দেও না ভরিয়া	সে বিধি পবিত্র অতি
ভাষার শূন্যতা নিত্য	—করে যেন সবাই পাগল,
আরস্তে' গো নূতন করিয়া ।	সকলেরি পক্ষে তাহা
চিত্তাশীল মহাচ্ছানী	অতিমাত্র ইলত স্বপ্নম ।
দেবদম বীহারী পুজিত,	সে বিধিটি এই বাছা :—
সেই সব মহাবীর	হৃৎ-ভঞ্জে বোঁধো না কাষাতে,
যার বলে আমরা শাসিত,	সবারেই ভালবেসে
সেই সব খ্যাত-নামা	কিংবা দয়া কোরো গো সবারে

শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর ।

আলোচনা ।

(ক)

হিন্দুজাতির একনিষ্ঠতা ।

গত মাসে “হিন্দুজাতির একনিষ্ঠতা”-
নামক গ্রন্থকে প্রিন্ট করা উপাধায়
মহাশয় হিন্দুদের হিন্দু কোন ভিত্তির উপর
প্রতিষ্ঠিত, তাহা অতি প্রাচীন ও বদ্যাবধি রূপে
দেখাইয়াছেন । তাহার সিদ্ধান্ত এই যে,
“হিন্দুদের সার বর্ণপ্রমথর্ষ এবং তৎপ্রণো-
দিত্বী-একনিষ্ঠতা ।” এই একনিষ্ঠতা অর্থাৎ
“কর্ত্তা ও কার্যের পারমার্থিক অতেনা-
ত্ব” তিনি স্থলরূপে ব্যাখ্যা করিয়াছেন,
কিন্তু তৎপ্রণোদিত বর্ণপ্রমথর্ষের উল্লেখ
করিয়াছেন নাই । এই হেতু একনিষ্ঠতা
হইতে কি একান্তে বর্ণপ্রমথর্ষের প্রণোদন
হয় এবং কিভাবেই বা এই “বর্ণপ্রমথর্ষের
ব্যতিক্রম ভারতের অধঃপতনের” কারণ
হইল, এ সম্বন্ধে উপাধায় মহাশয়ের নিকট
আমাদের আর এক প্রশ্নের দাবী রহিল ।

উপাধায় মহাশয়কে এ বিষয়ে বিশেষ
করিয়া অজ্ঞোভ্যে করিবার কারণ এই যে,
হিন্দু বর্ণবিভাগপদ্ধতি সম্বন্ধে তাহার মতা-
বাদের যে আভাস পাওয়া যায়, তাহাতে
অনেকগুলি সমস্যা উপস্থিত হইতেছে ।
এইগুলির মীমাংসায় উপাধায়মহাশয়ের
পাণ্ডিত্যের সাহায্য পাইলে, বিশেষ উপ-
কারের সম্ভাবনা ।

মহাশয়মহাশয়রাই জাতিভেদ অর্থাৎ
হুতি ও ব্যবহার ভেদে মানবসামাজিক
মধ্যে প্রণীতিভাগ ত স্বাভাবিক এবং ইহা
কোন না কোন আকারে সকল দেশেই
ঘটিয়া থাকে । এই প্রণীতিভাগগুলি ব্যক্ত
ও অব্যক্ত, কৃত্রিম ও স্বাভাবিক মানাবিধ
নিয়মবন্ধনে নিজ স্বাভাবিক রক্ষা করে । হিন্দুর
বর্ণবিভাগপদ্ধতির বিশেষত্ব এই যে, তিন
বর্ণগুলি পরস্পর হইতে অতি কঠিন ব্যবধানে
পৃথক্কৃত এবং বর্ণবিশেষে অগ্রগ্রহণ বাতীত
তত্ত্বগো প্রবেশের অত্র উপায় নাই । এই
প্রত্যেকই কি উপাধায়মহাশয় হিন্দুজাতির
পক্ষে এত মহামূল্য জ্ঞান করেন ? ইহার
সম্বন্ধে কি বলা যায় যে, “তিনকে অতির
করা, অনেককে একীভূত করা, বর্ণবিভাগের
উদ্দেশ্য ?” বরং অনেক সময়ে ত মনে হয়
যে, ভারতবাসীর নবানুভূতি মিলনপ্রবণতায়
পরিণতিতে এই প্রথা বিশেষ বাধা দিতেছে ।

আর্য্যব্রাহ্মণ প্রথম ভারতবর্ষে প্রবেশ
করিয়াছিলেন, তখন বর্ষের অনার্য্য প্রভাবে
জাতীয় অবনতি হইতে আশ্রয়কার্থে বিবা-
হাদি-ব্যবহার-সম্বন্ধে দৃঢ় নিয়মগতি রচনার
কারণ সম্বন্ধেই বুঝা যায় । কিন্তু ভালই
হোক আর মন্দই হোক, সে কৃত্রিম মন

অতি অল্পকালমধ্যেই বিনষ্ট হইয়া স্বাভাবিক মানবশ্রেয়স্তিই ধ্বংস করিল।

এক্ষেণে কথা এই যে, এই অনিবার্য আর্থ-অনার্থ-সম্মিলনে যে বর্তমান হিন্দুজাতি উৎপন্ন হইয়াছে, ইহার মধ্যে সেই সকল কঠিন কৃত্রিম বন্ধনের সার্থকতা বা উপকারিতা কোথায় ? এখন বর্ণে বর্ণে এমন কি চরিত্রগত পার্থক্য লক্ষিত হয়, দ্বাধার দরুণ পরস্পরের মধ্যে বিবাহাদি নিষেধ করিয়া উহাদের স্বাভাবিক অঙ্গুর রাখা এত আবশ্যিক ? বাহ্য কিছু তারতম্য দেখা যায়, তাহা অবস্থা ও সুযোগ ভেদে ঘটে, এবং তাহাও শিক্ষা ও বৃত্তির সমতা হেতু দিন দিন লোপ পাইতেছে।

তদুপ সার্থকতা নাই, তাহা নহে, বর্তমান প্রচার বিশেষ অপকারিতা দৃষ্ট হইতেছে। প্রবল পাশ্চাত্য ঐতিহাসিকতার নিষ্পেষণে আশ্রয়কার্থে তারতম্যের সকল স্থানীয় হিন্দুদের পরস্পরের সহিত বনিষ্ঠতর সম্বন্ধ স্থাপন অভ্যাবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে। এই নিমিত্ত জাতিগত পূর্ষ নিরমাবলী ক্রমেই অধিক কঠোরক ও অস্ববিধাজনক হইয়া পড়িতেছে। তাহার ফলে অনেকে প্রকাশ্যে বা অপ্রকাশ্যে পাশ্চাত্য রীতিনীতির আশ্রয় লইতে বাধ্য হইতেছে। বিবাহের ক্ষেত্রে অবধাভাবে সঙ্গীর্ণ রাধার দরুণ পণগ্রহণ প্রকৃতি নানা কুপ্রথা বহনমাঝে বহনুল হইবার উপক্রম করিতেছে। এ অবস্থার পাশ্চাত্যশিক্ষার প্রত্যাবে বর্ণবিভাগের অঙ্গুর-তার যে পরিমাণ ব্যতিক্রম দৃষ্ট হইতেছে, তাহা কি বাহ্যনীর এবং আশা প্রদ নহে ?

আর যদিই বা আমরা সকল অস্ববিধা

ও কষ্ট উপেক্ষা করিয়া কোন গতিকে বর্তমান বর্ণবিভাগপ্রণালী বজায় রাখিতে পারি, তাহাতেই বা বর্ণভ্রমধর্মরক্ষার কি সুবিধা হইবে ? এখনকার এক একটী বর্ণের মধ্যে নানা বিভিন্ন ঐক্যতির লোক অলঙ্ঘনীয় সম্মগত বন্ধনে আবদ্ধ হইয়া পড়িয়াছে। তাহার প্রকৃতপক্ষে বৃত্তি, শ্রেয়স্তি, স্বভাব ও চরিত্র বসন্ত ভিন্ন ভিন্ন বর্ণের অন্তর্গত হইবার উপযোগী। তাহারাই কি প্রকারে আত্মরিক প্রজা ও নিষ্ঠার সহিত কোন এক বর্ণের কর্তব্যসমষ্টি ধর্মবন্ধন পালন করিবে ? আধুনিক হিন্দুর সেই অসাধ্যসাধন করিতে হয় বলিয়াই, অধ্যাকার দিনে কেহই প্রকৃত হিন্দু হইতে পারে না। চতুর্দিকে কেবল কপটতা ও শৈথিল্য বিরাজমান এবং তাহারই ফলে অনেক শ্রেষ্ঠ লোকে হিন্দু পরিভাষা করিতে বাধ্য হইয়াছে।

ভাঙন যখন রীতিমত ধরিয়াছে, তখন তাহা নিবারণের কথা চোটা না করিয়া, বরং তুলিয়া এক্ষণে নূতন কোন স্থানে লইয়া বাইব, তাহা চিন্তা করাই অধিক কলপ্রদ হইবে। অবশ্য ইহাও মনে রাখা কর্তব্য যে, কোন এক নিরমাবলীর শাসন পরিভাষা করিবার পর, অপর কোন উপযুক্ত নিরমাবলী অসম্বন্ধ হইয়া উঠিতে কিছু সময় লাগে। ইতিমধ্যে বেজাজারিতা প্রবল হইয়া উঠিবার অবসর পায়। এই নিমিত্ত অতিশয় ধীর-গতিতে এবং সতর্কতার সহিত নূতনের উদ্দেশে অগ্রসর হওয়া কর্তব্য, সন্দেহ নাই। কিন্তু পথ বিপৎসঙ্কুল বলিয়া যদি পুরাতন গতির মধ্য হইতে বাহির হইতেই সাহস না হয়, তবে ত উগ্রপ্রিয় আশাঘ ছাড়া

দ্বিগ্ন বসিয়া থাকিতে হয় । শুধু তাহা নহে—
সময় থাকিতে পূর্ক হইতেই যদি আমরা
নূতন আবাস প্রস্তুত করিয়া না রাখি, তাহা
হইলে যখন কালের অনিবার্য স্রোতে পুষ্ক-
তন ঘর ভাঙিয়া আমাদিগকে ঠেলিয়া বাহির
করিবে, তখন আমরা আশ্রয় কোথায় পাইব ?

আমাদের এই নূতন আশ্রয় অন্বেষণের

কাল ঘনাইয়া আসিয়াছে—অনেক সম্ভাব্য
অকালে ঘর হইতে ঠেলা খাইয়া নিশ্চলতার
জঙ্গলে আশ্রয়হীনভাবে ভ্রমণ করিতেছেন—
বাহার্য এখনো ঘরে আছেন, তাহাদের চিন্তার
সময় উপস্থিত । আসা করি, এ বিষয়ে
তাঁহারা উপাধ্যায় মহাশয়ের উপদেশ হইতে
বঞ্চিত হইবেন না ।

শ্রীসুব্রহ্মনাথ ঠাকুর ।

(খ)

('নকলের নাকাল' সম্বন্ধে)

"নকলের নাকাল" প্রবন্ধে লেখক সাহে-
বিয়ানার নকল লইয়া কোত একটা
করিয়াছেন ।

সমস্ত জাতি ও সমাজের মধ্যে চিরকাল
অহুস্করণশক্তি কাজ করিয়া আসিতেছে ।
খ্যাতনামা ইংরাজ লেখক ব্যাল্ফট সাহেব
তাঁহার "কিম্বিক্স্ এণ্ড পলিটিক্স্" গ্রন্থে
জাতিনির্মাণকার্যে এই অহুস্করণশক্তির ক্রিয়া
বর্ণন করিয়াছেন ।

লোকের একটা জাতি কি করিয়া বিশেষ
একটা প্রকৃতি লাভ করে, তাহা নির্ণয় করা
শক্ত । কিন্তু তাহার পরে কালে কালে
তাঁহার যে পরিবর্তনের ধারা চলিয়া আসে—
প্রধানত অহুস্করণই তাহার মূল । ইংলণ্ডে
স্বাক্ষরী জ্ঞানের রাজত্বকালে ইংরাজ সমাজ
লাহিত্য আচার ব্যবহার বেরূপ ছিল, অর্ধ-
রাজগণের সময় তাহার অনেক পরিবর্তন
হইয়াছিল । অথচ স্ত্রানবিজ্ঞানের নূতন প্রসার
এমন কিছু হয় নাই, তাহাতে অবস্থা-

পরিবর্তনের গুরুতর কারণ কিছু পাওয়া
যায় ।

ব্যাল্ফট সাহেব বলেন, এই সকল পরিবর্তন
ভুল অহুস্করণের দ্বারা সাধিত হয় । একজন
কিছু একটা বদল করে, হঠাৎ কি কারণে
সেটা আর পাচজনের লাগিয়া যায়, অবশেষে
সেটা ছড়াইয়া পড়ে । হয়ত সেই বদলটা
কোন কাজের নহে, হয়ত তাহাতে সৌখ-
্যও নাই ; কিন্তু যে লোক বদল করিয়াছে,
তাঁহার প্রতিপত্তিংশত বা কি কারণবশত,
সেটা অহুস্করণবৃত্তিকে উত্তেজিত করিতে
পারে । এইরূপে পরিবর্তনের বৃহৎ কারণ না
থাকিলেও, ছোটখাট অহুস্করণের বিস্তার
কালে কালে জাতির চেহারা বদল হইয়া যায় ।

ব্যাল্ফট সাহেবের এ কথা বীকার্য ।
কিন্তু সেই সঙ্গে ইহাও বলা আবশ্যক যে,
যেমন সবল শ্রম শরীর বহিঃপ্রকৃতির সহিত
প্রভাব নিজের অহুস্করণ বরিয়া লয়,
অস্বাভাবিক দাং কিছু জাতি পর পরিত্যাগ

করিতে পারে, তেমনি সৎলোকের জাতি
সত্যতাই এমন কিছুই গ্রহণ করে না বা
দীর্ঘকাল রক্ষা করে না, বাহা তাহার জাতীয়
প্রকৃতিকে আঘাত করিতে পারে। হর্ষণ-
জাতির পক্ষে ঠিক উল্টা। ব্যাধি তাহাকে
চটু করিয়া চাপিগা ধরে এবং তাহা লে শীঘ্র
ঝড়িয়া কেলিতে পারে না। বাহিরের
প্রভাব তাহাকে অনেকসময় বিকারের দিকে
লইয়া যায়, এইজন্য তাহাকে অভিশপ্ত সাধ-
ধানে থাকিতে হয়। সবল লোকের পক্ষে
বাহা বলকারক—স্বাস্থ্যজনক, রোগা লোকের
পক্ষে তাহাও অনিষ্টকর হইতে পারে।

মোগলসাম্রাজ্যের সময়েও কি মুসলমানের
অনুগ্রহণ আমাদের দেশে ব্যাপ্ত হয় নাই ?
নিশ্চয়ই তাহাতে তালমূল দুইই ষটিগাছিল।
কিন্তু ইংরাজিয়ানার নকলের সহিত তাহার
একটি গুরুতর প্রভেদ ছিল, তাহার আলোচনা
আবশ্যক।

মুসলমানসাম্রাজ্য ভারতবর্ষেই প্রতিষ্ঠিত
ছিল। বাহিরে তাহার মূল ছিল না।
এইজন্য মুসলমান ও হিন্দু সভ্যতা পরস্পর
জড়িত হইয়াছিল। পরস্পরের মধ্যে আভা-
বিক আদান-প্রদানের সহস্র পথ ছিল। এই
জন্য মুসলমানের সংস্রবে আমাদের সমীচীন
সাহিত্য শিল্পকলা বেশকিছু আচারব্যবহার,
দুই পক্ষের মধ্যে নির্মিত হইয়া উঠিতেছিল।
উর্দুভাষার ব্যাকরণসমূহ ভিত্তি ভারতবর্ষীয়,
তাহার অভিধান বহুপরিমাণে পারসিক
ও আরবী। আধুনিক হিন্দুসমীচীনও
এইরূপ। অন্য সমস্ত শিল্পকলা হিন্দু ও
মুসলমান কারিকরের কচি ও নৈপুণ্যে
বড়িত। চাপকান ভারী মাত্রে যে মুসল

মানের অনুগ্রহণ, তাহা নহে, তাহা উর্দু-
ভাষার ভাষা হিন্দু-মুসলমানের মিশ্রিত ভাষা—
তাহা ভিন্ন ভিন্ন দেশে ভিন্ন ভিন্ন আকারে
গঠিত হইয়া উঠিয়াছিল।

লেখক লিবিয়াছেন, বিলাতীয়ানার মূল
আদর্শ বিলাতে,—ভারতবর্ষ হইতে বহুদূরে।
সুতরাং এই আদর্শ আমাদের অবলম্বন করিলে
বরাবর তাহাকে জীবিত রাখিতে পারিব না,
মূলের সহিত প্রত্যেক যোগ না থাকিতে, আজ
না হউক কাল, তাহা বিকৃত হইয়া যাইবে।

বিলাতের বাহা কিছু সম্পূর্ণ আমাদের
করিয়া লইতে পারি, অর্থাৎ বাহাতে করিয়া
আমাদের মধ্যে অভ্যাস আয়ত্ত্বের না ঘটে,
চারিদিকের সহিত সামঞ্জস্য নষ্ট না হয়, বাহা
আমাদের সহিত মিশ্রিত হইয়া আমাদের পক্ষে
পোষণ করিতে পারে, তারাক্রান্ত বা
ব্যথিক্রান্ত না করে, তাহাতেই আমাদের
বলবৃদ্ধি হয়—এবং তাহার বিপরীতে আমাদের
আয়ুষ্করমাত্র।

সাহেবিয়ানা আমাদের পক্ষে বোকা।
তাহার কাঠকড় অধিকাংশ বিলাত হইতে
আনাইতে হয়, তাহার খরচ অতিরিক্ত। তাহা
আমাদের সর্বসাধারণের পক্ষে নিতান্ত
দুঃসাধ্য। তাহাতে আমাদের নিজের আদর্শ—
নিজের আশ্রয় নষ্ট করে, অথচ তৎপরিবর্তে
যে আদর্শ—যে আশ্রয় বেশ, তাহা আমরা
সম্পূর্ণ ভাবে—বিত্ত ভাবে রক্ষা করিতে
পারি না। ভীষ ছাড়িয়া যে নৌকার পা বিই,
সে নৌকার দাব জরুর। মাঝে হইতে
বেচ্ছাচার-অনাচার প্রবল হইয়া উঠে।

সেইজন্য প্রতিদিন দেখিতেছি, আমাদের
দেশী সাহেবিয়ানার মধ্যে কেহনি কোন কোন

নাই ;—জগদনক শিষ্ট-অশিষ্টের স্থলে সুবিধা-অসুবিধা ইচ্ছা-অনিচ্ছা দেখণ করিয়া বসিয়াছে । কেহ বা নিজের সুবিধামতে একরূপ আচরণ করে, কেহ বা অন্তরূপ ; কেহ বা বেটাকে বিলাতী হিলাবে কর্তব্য বলিয়া জানে, বেশী সমাজের উত্তেজনার অভাবে আলস্তবশত তাহা পালন করে না ; কেহ বা বেটা সকল সমাজের মতেই গর্হিত বলিয়া জানে, স্বাধীন আচারের বোহাই দিয়া স্পর্ধার সহিত তাহা চালাইয়া দেয় । এক-দিকে অবিকল অনুকরণ, একদিকে উচ্ছৃঙ্খল স্বাধীনতা । একদিকে মানসিক দাসত্ব, অন্যদিকে স্পর্ধিত উচ্ছৃঙ্খল । সর্বপ্রকার আদর্শহ্রাসিই ইহার কারণ ।

এই আদর্শহ্রাসি এখনো যদি ভেদন কল্পিত হইয়া না উঠে, কালক্রমে তাহা উত্তরোত্তর কদম্বা হইতে থাকিবে, সন্দেহ নাই । বাহ্যিক ইংরাজের টাটকা সংশ্রব হইতে সকল করিতেছেন, তাহাদের মধ্যেও যদি ইংরাজী সামাজিক শিষ্টতার বিস্তার আদর্শ রক্ষিত না হয়, তবে তাহাদের উত্তরবংশীয়দের মধ্যে বিকার ক্রমণ বিষম হইয়া উঠিবে, তাহা কল্পনা করিতেও লক্ষ্যবোধ হয় ।

বাকট বলেন, অনুকরণের প্রভাবে জাতি গঠিত হইতে থাকে, কিন্তু তাহা সমস্ত অনুকরণে,—জাতীয়প্রকৃতির অমূলক অনুকরণে । যে জাতি অসমস্ত অনুকরণ করে—

প্রথাগত নৃত্যের অনুরূপ নই:মহৎ ।

(প)

['ভাবাতব' সম্বন্ধে •]

বৈশাখের বঙ্গদর্শনে বাবু চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায় মহাশয় যে 'ভাবাতব'-নামক গ্রন্থের সমালোচনা করিয়াছেন, তাহার উত্তর দেওয়া প্রয়োজন ।

সমালোচকের উক্তি ।—“প্রাকৃত বলিতে দোকে শব্দত্বাদির ভাবাই বুঝিয়া আসিতেছে, বুঝিয়া থাকে এবং বুঝিতে থাকিবে ; পৃথিবীত্ব ত্রিনাথবাবু এবং পৃথিবীত্ব সাহিত্যসভা নাথ পুড়িয়া মরিলেও, বাঙলা ও হিম্মি প্রকৃতি বুঝাইতে 'প্রাকৃত'-শব্দ ব্যবহৃত হইবে না ।”

উত্তর ।—এই বিষয়ে 'ভাবাতব' বাহা লিখিত আছে, তাহার মর্ম এই—সত্যদেশ-মাত্রই ভাষা বিবিধ ;—লিখিত এবং কথিত । তাহাদের মধ্যে প্রভেদ এই যে, লিখিতভাষা ব্যাকরণগত এবং অবিকৃত, আর কথিত-ভাষাতে ব্যাকরণ ভুল থাকে এবং লক্ষ-সকল কৃষ্ণিত হইয়া উচ্চারিত হয় । আখ্যায়িক ভাষার একটি বিশেষ নাম ছিল না । ইহাকে ভাষাই বলিত এবং ভাষা-শব্দেই আখ্যায়িকা বুঝাইত । পরে যখন ব্যাকরণের ধারা ভাষার সংস্কার করা হয়, তখন ইহার

নাম সংস্কৃতভাষা হইল এবং সাধারণ লোকে ব্যাকরণদ্বারা অঙ্গণানিত না হইয়া বৈষ্ণব বাতাবিক ভাষাতে কথা বলিত, তাহার নাম ভাষা অথবা 'প্রাকৃত'-ভাষা হইল ।

প্রাকৃত-শব্দের অর্থ বাতাবিক অর্থাৎ গ্রীলোক এবং সাধারণ লোকে শিক্ষাপ্রাপ্ত না হইয়া স্বভাবত বৈষ্ণব কথা বলে, তাহার নাম প্রাকৃত-ভাষা । আর শিক্ষিত লোকে বৈষ্ণব মার্জিতভাষাতে কথা বলে এবং দেখে, তাহার নাম সংস্কৃতভাষা । প্রাকৃত মহুবা বলিলে তাহাকে বুঝায়, বাহার শিক্ষা-দ্বারা জ্ঞানবৃদ্ধির উৎকর্ষ মধ্যে নাই । আর অপ্রাকৃত মহুবা তাহাকে বলে, বাহার শিক্ষা-দ্বারা জ্ঞানবৃদ্ধি বিশিষ্টরূপ বিকাশ প্রাপ্ত হইয়াছে । 'ভাষাতত্ত্ব' বাঙলা, হিন্দি প্রভৃতিকে সংস্কৃতের কথিতভাষা বলিতেছে । আর সংস্কৃতের কথিতভাষার নাম প্রাকৃত, অতএব বাঙলা, হিন্দি প্রভৃতিকে 'প্রাকৃত' বলিবে না কেন ?

হানে হানে কালে কালে ব্যক্তিবিশেষে বিশেষ বিশেষ কারণে কথিতভাষা কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ বিভিন্ন হয়, কিন্তু লিখিতভাষা ব্যাকরণের শাসনে হির থাকে । এইজন্য আমাদের লিখিত সংস্কৃতভাষা হির আছে, কিন্তু তাহার কথিতভাষা বিভিন্ন বেশে এবং বিভিন্ন কালে মাগধী, শৌরসেনী, পালি, বাংলা, হিন্দি, ব্রজবুলী, উৎকলী ইত্যাদি নানাক্রম ধারণ করিয়াছে । ইহারা সকলই সংস্কৃতের কথিতভাষা এবং সকলই প্রাকৃত-শব্দবাচ্য ।

সংস্কৃতগার বেশে তাহার সময়ে বৈষ্ণব কথা বলিত, তাহার প্রাকৃত আমাদের বেশে

আমাদের কালে বৈষ্ণব কথা বলে, তাহার প্রাকৃত ; এবং মগধদেশে এখন বৈষ্ণব কথা বলে, তাহা, এবং সেই বেশে পূর্বে বৈষ্ণব কথা বলিত । তাহা, উভয়ই সংস্কৃতের কথিতভাষা এবং উভয়ই প্রাকৃতশব্দবাচ্য ।

'প্রাকৃত' কোন একটি বিশেষ ভাষার নাম নহে । সমস্ত ভারতবর্ষের নানাপ্রদেশে ভিন্ন ভিন্ন সময়ে কতপ্রকার প্রাকৃত বে প্রচলিত ছিল, তাহার সংখ্যা নাই । সেই সকল প্রদেশের সকল কালের কথিতভাষার নামই প্রাকৃত । ইহা সংস্কৃতের কথিত-ভাষার সাধারণ নাম । প্রাকৃতভাষার অর্থ সংস্কৃতের কথিতভাষা, তাহা যে দেশেরই হউক বা যে কালেরই হউক । অতএব বাংলা হিন্দি প্রভৃতি সকলই প্রাকৃতশব্দ-বাচ্য ।

চন্দ্রবাবু বনিয়াছেন আনন্দের "মাগা খুঁড়িয়া মরিলেও" তিনি বাংলাকে 'প্রাকৃত' বলিবেন না । কিন্তু ৪০১৩০ বৎসর পূর্বে যে সকল বাংলা পুস্তক লিখিত হইয়াছে, তাহাতে পর্য্যন্ত বাংলাকে 'প্রাকৃত' বলা হইয়াছে । ধরা,—

শবির নাহান্না আছে কল-পুয়াগেতে,
'প্রাকৃত' বিনে কেহ না পারে বুকিতে,
অতএব পয়ারএবধে তাহা বলি,
একগোত্রে ভ্রম হবে শবির পাঁচালী ।

পূর্ববর্ষে প্রচলিত 'শবির পাঁচালী' ।
বাবু বীর্ষেনচন্দ্র সেনও তাহার 'বদভাষা ও সাহিত্য'-নামক পুস্তকে বলিতে বাধ্য হইয়াছেন, "পূর্বে ভারতের কথিতভাষাভাষাই, বোধ হয়, প্রাকৃত-সংজ্ঞার অভিহিত হইত, এবং এই বাগণা ভাষাকেও প্রাকৃত বলিত, যথা—

ভারতের পুণ্যভূমি শব্দ ব্রহ্ম নহে।

‘পরাভূত’ শব্দও ত্র্যমুখ্যে কথিত।

(২০০) হুইনত বঙ্গের প্রাচীন ইতি-
হাসিত সঙ্গত মতান্তরত।”)

‘প্রকৃতিবাদ’ প্রকৃতি অভিধানেও
বাংলা শব্দগুলিকে প্রাকৃত বলিয়াছেন।
রাজা হারমোহন রায়ের সময় পর্যন্ত এই
ভাবকে প্রাকৃত বলিয়াছে—তাহার ছুরি
ছুরি উদাহরণ সেও দায় এবং অবশ্যক
হইলে ক্রমে সেও দায় নাইবে। ‘বাঙলা-
ভাষা’ নাম নিত্য আধুনিক। এই নাম
যেওরাতাই আমাদের ভাষাকে এখন
আর অনেক উচ্চশিক্ষিত লোকেও প্রাকৃত
বলিতে চাহেন না এবং এই ভাষাকে যে
কখনও প্রাকৃত বলিত, তাহাও জানেন না।
বাঙলাভাষা প্রকৃতপক্ষে বঙ্গীয় প্রাকৃতভাষা
এবং তাহাকে তাহাই বলা উচিত।

সমালোচকের উক্তি।—“দ্বিগদ্যবান্
কলন যে, ‘পদভাষা কপিভাকারে লিখিত
সংস্কৃতভাষা। লোকে যে ইহাকে সংস্কৃত
হইতে সত্তর একটি মিশ্রভাষা মনে করে,
তাহা ভ্রম।” * * * * “কিন্তু
অনেক পারসিক, আরবীয়, ইংরেজি, করানী
প্রভৃতি শব্দ যে বাংলায় প্রবেশ করিয়াছে,
ইহা সকলেই অবগত আছেন। এই সকল
শব্দের উদ্ভূতনও এক্ষণে অসম্ভব। তবে কি
বলিয়া বাংলাকে মিশ্রভাষা না বলিব?
পরের কাছে দায় করার যে বর্ণান্যায় হানি
আছে, তাহা নিঃসন্দেহ; কিন্তু দায় বধন
করিতেই হইয়াছে, তখন তাহা মুকাইবার
চেষ্টা করা কেন?”

উত্তর।—ভিন্ন ভিন্ন প্রকারে

সংসর্গে আসিলে দীর্ঘকাল একত্র বাস হেতু
হুই চারিটি শব্দ অনতিক্রমে একের ভাষা
হইতে অন্যের ভাষাতে প্রবেশ করে।
পৃথিবীতে এমন ভাষা নাই, বাহাতে এই-
প্রকার কতক পরকীর ভাষা প্রবেশ না
করিয়াছে। ইহা আর বাগ্ম্যাদি উপলক্ষে
এবং রাশাবিতার হেতু সজ্জিত হইয়া
থাকে। তদ্বৎ রাশাবিতারকল ভয়ঙ্কর;
কারণ, বিজিতজাতি বিজিতগণের ভাষা
অল্প ব্যবহার করিতে থাকে। মুসলমানেরা
যখন আর্মেনের দেশের রাজা ছিলেন, তখন
তাহাদের ভাষা আর্মেনা শিক্ষা করিতাম এবং
তাহাদের অনেক শব্দ আর্মেনা কথোপকথনে
ইচ্ছাপূর্বক ব্যবহার করিতাম। বিচারালয়ে
তাহাদের ভাষা ব্যবহার না করিলে, তাহার
বুঝিতেন না। সেইপ্রকার এক্ষণেও আর্মেনা
ইটালি, ইন্ডোনেশিয়া বও, রেজেন্সি,
উইল ইত্যাদি বলিতেছি, আর সাধারণ
কথোপকথনে অনেক সময় অগ্রগোচনেও
ইংরেজি শব্দ প্রয়োগ করি।

পরভাষা শিখিয়াছি বলিয়া কথোপকথনে
ঐরূপ করি। তাহা বলিয়া, লিখিত সময়
নিম্নরোধনে ঐরূপ শব্দ ব্যবহার করা উচিত
নহে। কারণ ঐ সকল শব্দ শুধু আচার্যের
ভাষা নহে। এবং ঐ সকল শব্দ আমাদের
শব্দ বলিয়া অভিধানে স্থান পাইতে পারে না।
বেল, কলিঙ্গ, শুভ প্রভৃতি শব্দ আমাদের
অভিধানে থাকিলেই তাহা বাঙলা শব্দ
বলিয়া পুস্তকে ব্যবহার করিবার অধিকার
হবে; কিন্তু আজকাল বঙ্গাভিধানসকল
এইপ্রকার বাবনিক ভাষাতে পরিপূর্ণ।
যে অভিধানে শব্দগণের অধিক, তাহাই

অধিক গৌরব । অতঃপর ইংরেজী, ফারসী, আরবী ইত্যাদি শব্দসকল অল্প অল্প অভিধানে প্রবেশ করিতেছে, কে তাহা বাণ্য করে ? অভিধানের কণেবরবৃদ্ধির অল্প সকল অভিধানেই বাবনিক-শব্দের সংখ্যা, যতদূর হইতে পারে, বৃদ্ধি করা হইয়াছে এবং বাধা না পাইলে ক্রমে আরও বৃদ্ধি হইবে । কিন্তু এত বৃদ্ধি হইয়াও ঐ সকল শব্দের সংখ্যা আমাদের অভিধানের মোট শব্দসংখ্যার পঞ্চাংশের অধিক হয় নাই । একশত শব্দের মধ্যে ৬৭টি পরকীর শব্দ থাকিলে, তাহাকে মিশ্রভাষা বলা যায় না । ‘ভাষাতত্ত্বে’ যে সকল শব্দাদির আলোচনা করা হইয়াছে, যথা—সংখ্যাবাচক শব্দ, বিভক্তিক্রপ, সর্জনাম, ক্রিয়-বিভক্তি, গিগন্ত, ক্রম্য, তুন্ম প্রভৃতি, ইহাঙ্গিকে ভাষার প্রাণ বলা যায় । ‘ভাষাতত্ত্বে’ যেখান গিয়াছে যে, ঐ সকল শব্দাদির মধ্যে একটিও পরকীর-ভাষা হইতে গৃহীত নহে । যদি প্রাণিক শব্দসকল স্থির থাকে, তবে অপ্রাণিক শব্দের মধ্যে শতকে ৬৭টি কেন, তাহার দ্বিগুণ কি চতুর্গুণ পরকীর শব্দ থাকিলেও, তাহাকে মিশ্রভাষা বলা যায় না ।

১. সমালোচকের উক্তি ।—“ঐনাথবাবুর মতে সংস্কৃত ‘আদীত’-শব্দ লিখিতে যখন দীর্ঘ ঈকার লাগে, তখন বাঙলাতেও ‘আছিল’ বা ‘ছিল’ না লিখিয়া, ‘আছিল’ বা ‘ছিল’ লেখা কর্তব্য—‘দীর্ঘ ঈকার না দিয়া আমরা হ্রস্ব ঈকার দিয়া থাকি, তাহা অবিহিত ।’ রহস্য এই যে, ঐনাথবাবু নিজে এই প্রবন্ধে সর্বত্রই এই ‘অবিহিত’ কাণ্ডা করিয়াছেন । এক শ্রেণীর উপদেষ্টা আছেন, তাঁহারা বলেন যে

—আমি বাহ্য করি, তাহা করিও না, আমি বাহ্য বলি, তাহাই কর । এইরূপ উপদেষ্টার উপদেশ যে ভাসিয়া বাইবে, ইহা অবতলাবী ।”

উত্তর ।—এই রহস্যের উত্তর ‘ভাষাতত্ত্বে’ই ত আছে । উহার ১২ পৃষ্ঠার নীচে মন্তব্যে লেখা আছে যে, ‘আছিল’ ও ‘ছিল’ শব্দে হ্রস্ব ঈকার দেওয়া যদিও আমরা অবিহিত বলিতেছি, “তথাপি এই পুস্তকে আমরা হ্রস্ব ঈকারই ব্যবহার করিতে বাধ্য আছি, কারণ যতকণ পাঠকগণ ইহা অবিহিত বলিয়া স্বীকার না করিবেন, ততকণ আমাদের দীর্ঘ ঈকার ব্যবহার করিবের অধিকার নাই । এই প্রকার অনেক শব্দ আমরা এই পুস্তকে অল্পই বলিয়া দেখাইয়াছি এবং দেখাইব, অথচ সেই সকল শব্দ উল্লিখিত কারণে এই পুস্তকে আমরা সেই প্রচলিত-ব্যবহারসম্মত অল্পকণেই লিখিয়াছি এবং লিখিব ;” যথা—

ভুজ ।	অভুজ ।
ভা	ভাহা
বগার	বলিবায়
ঘরার	ঘরিবায়
হীল	ছিল
বাড়	বায়
তেড়	তের
	ইত্যাদি ।

সমালোচকের উক্তি ।—“বাঙলা-লেখক-দিগের মধ্যে এমন লোকেরা বিরল যে কে আছে যে, ঐনাথবাবুর ব্যবস্থা অনুসারে কাণ্ডা করিয়া (অর্থাৎ ‘ছিল’-শব্দে দীর্ঘ ঈকার দিয়া) অনর্থক হাস্যাস্পদ হইবে ?”

উত্তর ।—দীর্ঘ ঈকার দিতে ইচ্ছা না হয়,

না দিবেন । কিন্তু আমার বিধান এই যে, জানিয়া শুনিয়া এখন আর অতুচ্চ শব্দ ব্যবহার করিতে গোকের কখনই প্রযুক্তি হইবে না । কি প্রকার যোর অজানাকারের মধ্য হইতে বদভাষা সমুৎপন্ন হইয়াছে, তাহা ‘ভাষাতত্ত্ব’ গ্রন্থে খণ্ড আভ্যন্তরীণ প্রদিক্ত পঠ করিলেই কথকিত জানা যায় । তাহা দেখিয়াও চম্ভবাবু কি এইপ্রকার অতুচ্চ শব্দগুলিকে আর্থপ্রয়োগের সহিত তুলনা করিবেন ?

চম্ভবাবু বলেন, “ইংরেজী ব্যাকরণের একটা দ্রষ্ট এই যে, ব্যবহারের বিরুদ্ধে কোন আপিল নাই ।” কিন্তু তাহা সর্বত্র প্রযোজ্য নহে । সেই ইংরেজী ভাষার দিনদিন পরিবর্তন হইতেছে । মোখ দেখিতে পাইলে, তাহা সংশোধন না করিয়া, দ্বিত পঙ্কিলম্বে ভুবিয়া থাকা কি স্বভাবের কাৰ্য্য ? চম্ভবাবু কি জানেন না, আজকাল ইংরেজী ভাষার সংশোধনের ক্ষমতা কি ভয়ানক আন্দোলন চলিতেছে ? মতভেদ এক প্তর কথা । যদি ‘ছিল’ লিখিতে দীর্ঘ ঈকার দেওয়া অস্বচিত হয়, তবে কেন দিবেন ? কিন্তু যদি বলেন, “অবিহিত হইলেও ব্যবহার আছে বলিয়া, আমরা ত্রুণ ইকারই দিব,” তাহা ঠিক নহে ; কারণ, ব্যবহার যদি নির্দোষ হয়, তবেই তাহা মাননীয়, কিন্তু দ্বিত হইলে তাহা মাননীয় নহে ।

সমালোচকের উক্তি ।—“বাঙলা ভাষিত ভাষা ; তাহাকে কি বৃত্ত সংস্কৃতভাষার ব্যাকরণের পুঁটিনাটিতে আবদ্ধ করিয়া রাখা সম্ভব ?”

উত্তর ।—বাঙলা বখন সংস্কৃতের কথিত-ভাষা, তখন ইহাকে লিখিতে হইলে, সংস্কৃতের ‘পুঁটিনাটিতে’ আবদ্ধ না রাখিলে চলিবে কেন ? আপনারা কি এখনও ‘অবীনা’কে ‘অবীনী’, ‘আলত’-বলে ‘অলন’, ‘আত্মা’-বলে ‘চলিয়া’, ‘তৎকালে’-বলে ‘তৎকালীন’ লিখিবেন ? আমাদের অভিধানে শু ‘হুংসা’কে ‘হুঙ্গা’, ‘আচরিত’কে ‘আচরিত’, ‘আকর্ষী’কে ‘আকর্ষণ’ বলিয়া লিখিত আছে । ঐ সকল শব্দ কি ঐপ্রকারই থাকিবে ?

সমালোচকের উক্তি ।—“বাঙলার অনেক ‘কাজ’-কথাটা বঙ্গীয় ‘জ’ দিয়া লিখিয়া থাকেন । ঈনাথবাবু বলেন, এটা ভুল ; কেন না, সংস্কৃত কাৰ্য্যশব্দের ‘ব’টা অন্তর্হ ‘ব’ । ভরসা করি, ‘ভাষাতত্ত্ব’লেখক ঈনাথবাবু জানেন যে, সংস্কৃতকথাটি যদিও ‘কাৰ্য্য’, কিন্তু প্রাকৃতকথাটা ‘কজ্জ’ । বাঙলা কথাটা যে সাক্ষ্যসম্বন্ধে প্রাকৃত হইতে উৎপন্ন নহে, তাহা কে বলিল ?”

উত্তর ।—সংস্কৃত শব্দসকল একদল চলিতকথার বেস্ত্রণ উচ্চারিত হয়, সেই উচ্চারণবাক্যক্রমের নিয়মসকল ভাষা-তত্ত্বের তৃতীয় অধ্যায়ে প্রকটিত হইয়াছে । তাহার চতুর্থ নিয়ম এই যে, কতকগুলি নিত্যব্যবহৃত শব্দে অস্ত্রা বৃত্তবর্ণের আংশিক লোপ করিয়া পূর্বধরকে শুদ্ধ করিয়া উচ্চারণ করা হয়, এবং লুপ্তবর্ণ বঙ্গীয় লক্ষ্য-বর্ণ হইলে তাহার স্থানে চম্ভবিন্দু হয় ; যথা—চম্ভ = চাঁদ, মণ = মাত, -ইত্যাদি । ঐ নিয়মাহুদারে, কাৰ্য্য = কায হয় । সুতরাং ঐ শব্দে অন্তর্হ ‘ব’ই ব্যবহার করা উচিত । চম্ভবাবু প্রকৃতকালে সম্ভে

করেন যে, প্রাকৃত 'কচ্চ'-শব্দ হইতে 'কা'-'ক' শব্দটি উৎপন্ন হইয়া থাকিবে। তিনি লিখিয়াছেন, "বাঙলা কথাটা যে, সাক্ষাৎ-শব্দে প্রাকৃত হইতে উৎপন্ন নহে, তাহা কে বলিল ?" ইহার উত্তর এই যে, সমগ্র 'ভাষাতত্ত্ব'-গ্রন্থে ইহাই প্রমাণ করিবার চেষ্টা করা গিয়াছে যে, বাঙলা সংস্কৃতেরই কথিতাকার এবং ইহা অল্প কোন ভাষা হইতে সমৃদ্ধ নহে। ইহা বলি ঐ পুস্তকে প্রমাণ করিতে কৃতকাৰ্য্য হইয়া থাকি, তবে 'কা'-'ক'কে বর্ণীর 'ক' ব্যবহার করা উচিত নহে।

আর এক কথা বলি, চম্পাবানু যে প্রাকৃতের কথা বলিতেছেন, সেই প্রাকৃতে অন্তর্গত 'ব'র ব্যবহার কোনো নাই; কিন্তু বাঙলাভাষাতে অন্তর্গত 'ব'র ব্যবহার আছে। বাহার ভাষার 'ব' নাই, সে স্মৃতিরাই 'ক' ব্যবহার করিবে; বাহার ভাষার আছে, সে করিবে কেন ? এই যে 'বাহার'-শব্দ লিখিয়া, ইহাকেও সেই প্রাকৃতের সিয়ান্ন-সারে 'জাহার' লিখিতে হয়, 'কে'কে 'জে' লিখিতে হয়। আমরা আমাদের বর্ণ-মালাতে অন্তর্গত 'ব'টাকে রাখিয়া তাহার ব্যবহার কি প্রকারে ত্যাগ করিব ?

ত্রিভিনাপ সেন ।

গ্রন্থ-সমালোচনা ।

নব-কথা । ত্রিপ্রভাতকুমার মুখো-পাধ্যায়-প্রণীত । মূল্য ১।০ এক টাকা চারি আনা ।

১. ভিন্ন ভিন্ন সাময়িক পত্রে লিখিত করেকটি ক্ষুদ্র গল্প পুনর্মুদ্রিত হইয়া এই পুস্তকখানি হইয়াছে। গ্রন্থকার প্রভাতবাবুর ক্ষুদ্র গল্প লিখিবার ক্ষমতা আছে। তবে, তাঁহার সকল গল্পই যে ভাল হয় নাই, এ কথা বলিলে, ভরসা করি স্তম্ভগ্রাহীরা এমন মনে করিবেন না যে, আমরা গ্রন্থকারের নিন্দা করিতেছি। লেখক যত কেন ক্ষমতাপালী হউন না, তাঁহার রচনামাত্রই যে সমান উৎকর্ষ লাভ করিবে, ইহা কেহ প্রত্যাশা করে না, ইহা সম্ভবও নহে। 'হিসানী' গল্পটি

আমাদের বড় হৃদয় বোণ হইয়াছে। হিমালী আদর্শ-চরিত্র—এই কঠোর বাস্তবিকতার সংসারে এমন মানুষ দেখিতে পাওয়া যায় না। কিন্তু আদর্শ-চরিত্র বলিয়াই আমাদের চক্ষে ইহার গরিমা। হিমালীর প্রেম অতি উচ্চ আদ্যের প্রেম; এই প্রেম-চিরের জন্য প্রভাতবাবুর নিকট আমরা কৃতজ্ঞ। তবে, প্রভাতবাবু তাঁহার সকল গল্পে কৃতকাৰ্য্য হইতে পারেন নাই। 'পত্নীহারা' গল্পটি নিতান্ত হান্তজনক হইয়াছে—সে হাসি পতির জন্তও নহে, পত্নীর জন্তও নহে; গ্রন্থকারের জন্ত। 'ভূত না চোর' গল্পটি কিছুই হয় নাই। 'একটি রোপাশুয়ার জীবনচরিত্র' একটি ইংরেজি গল্পের মাঝ সম্বন্ধে।

‘বিবৃদ্ধের কণ’—নিত্য অধ্যাত্মিক গম ।
তথানি পুত্রকথানির অল্প প্রভাতবাবু
প্রশংসা করিতে পারি । পরিহাস-স্রিরের
কেমন একটু তীব্র অথচ মিষ্ট হাত এই সকল
গল্পে আছে, বাহা বাঙলা ক্ষুদ্র গল্পে আর
বেধিতে পাই না । সম্ভবত লোক পুত্রক-
থানি কিনিয়া পড়িবে ।

পত্রাবলী । শ্রীঅধিনাশচন্দ্র চট্টো
পাধ্যায়-প্রণীত । মূল্য ১ এক টাকা ।

এই পুত্রকথানির প্রশংসা করিতে
পারিলাম না । অধিনাশবাবু রচনা করিতে
নিবিয়াছেন বটে, কিন্তু কাব্য কাহাকে বলে,
কাব্য কিসে হয়, তা’র আলিও বুঝেন নাই ।
তাই এই চেষ্টা করিয়াছেন । একপ ভাব-
পুত্র, আবেগপুত্র, প্রাণপুত্র কবিতা লোকের
ঘাড়ে চাপান কেন ? বঙ্গীর পাঠক অতি
নিরীহ প্রেমীর জীব । নিরীহের উপর কি
অত্যাচার করিতে হয় ! বলাশ্রম সীতাসেবাকে
পত্র লিখিতেছেন ; ইহাতে হাত সপরণ করা
নিতান্তই অসম্ভব । অধিনাশবাবু অল্পগ্রহ
করিয়া মনে রাখিবেন যে, অস্ত্রের চিত্তরঞ্জন
করিতে হইলে, নিজেও চিত্তে সৌন্দর্য্যপ্রাধিক
শক্তির বিকাশ প্রয়োজনীয় ।

স্মৃতি-মন্দির । শ্রীকেশবচন্দ্র সেন
বি, এ, প্রণীত । মূল্য ১ এক টাকা ।

এই উপজ্ঞানখানি ছত্রিশ বটে, কিন্তু
অলিখিত নহে । উপজ্ঞানখানি পড়িয়া মোটের
উপর প্রীত হইয়াছি, এ কথা বলিতে পারি ;
কিন্তু সেই সঙ্গে ইহাও বলিতে হয় যে,
পড়িতে পড়িতে অনেক সময় বৈয়াক্যাসি
দটগাড়ে ।

চন্দ্রনাথ চন্দ্রনাথ প্রণীত

প্রশংসার্য ; কিন্তু চিত্র-চিত্রণে তাঁহার হাত
আলিও কাঁচা । সর্গাধী ও ধরিনাথ, দুইটিই
আদর্শমূলক চিত্র ; কিন্তু এই দুইটি চিত্র
কেশবচন্দ্রবাবু হাতে কতক সূচিয়াছে,
কতক সূচেন নাই । কিন্তু তা’র হইলেও এই
শ্রেণীর গ্রন্থের আমরা পক্ষপাতী । বাহারা
বাস্তবমূলক (realistic) চিত্র অঙ্কিত করেন,
তাঁহাদের অপেক্ষা বাহারা আদর্শমূলক
(idealistic) চিত্র চিত্রণ করেন, তাঁহা-
দিগকে আমরা উচ্চতর স্থান দিয়া থাকি ।
পৃথিবীতে এমিলি জোনার এবং তাঁহার
শিক্ষাপ্রদর্শনপত্রের বতই কেন খ্যাতি পাইক্
না, এবং তাঁহাদের রচিত উপজ্ঞান বতই
কেন বিক্রীত হউক না, আমরা কখনও
তাঁহাকে ও তাঁহাদিগকে প্রথমশ্রেণীর
প্রতিভাশালী উপজ্ঞান-লেখক বলিয়া মনে
করি না । বাস্তবমূলক উপজ্ঞানও ভাল করিয়া
লিখিতে ক্ষমতার আবশ্যক ; কিন্তু আদর্শ-
মূলক উপজ্ঞান ভাল করিয়া লিখিতে প্রতিভার
প্রয়োজন ।

এরূপ কেশবচন্দ্র বাবু উচ্চ কল্পনা
করিয়াছেন বটে, কিন্তু ভাল করিয়া
সাজাইতে পারেন নাই । তাঁহার প্রধান
দোষ এই যে, উপযোগিতা-জ্ঞান তাঁহার
আলিও পরিষ্কৃত হয় নাই, সেইজন্য
তাঁহাকে শেষকালের মিলন বোঝাতা
দিয়া বসাইতে হইয়াছে । প্রমানম-ঠাকুর,
এই উপজ্ঞানের বিকাশ ও পরিণতির অল্প
সম্পূর্ণ অনাবশ্যক চিত্র । তেলিনী বৌ ও
দহ্মাশক্তির অন্তঃসংসার উচ্ছিন্ন, বোধ করি,
উপজ্ঞানের বৈচিত্র্য সম্পাদন করা । কিন্তু

অনু ৩৩ নঙ্গদর্শন ১৪১৩ মাস,

বৈচিত্র্য সম্পাদিত হয় নাই। গ্রন্থকার যদি আন্তরিক অনুরাগের সহিত অশুশীলন করেন এবং নূতন নূতন পুস্তক প্রকাশের বোঝা আত্মোৎকর্ষবিধানে অবহেলা না করেন, তাহা হইলে তিনি সে কাণে উপভাস গিথিয়া বশবী হইতে পারিবেন, একপ আশা করা যায়।

প্রায়স। ত্রিবিধ্যপ্রসঙ্গ ভট্টাচার্য্য-প্রণীত। মূল্য ১০/- দশ আনা মাত্র।

এই পুস্তকে যে সকল প্রবন্ধ সন্নিবেশিত হইয়াছে, সেগুলি ভিন্ন ভিন্ন সময়ে ভিন্ন ভিন্ন সাময়িক পত্রের জন্ত লিখিত হইয়াছিল এবং প্রকাশিত হইয়াছিল। সাময়িক পত্রের জন্ত লিখিতে হইলে অনেক সময়েই দ্রুত-রচনা অনিবার্য্য হইয়া পড়ে; এবং দ্রুত-রচনার ভাবের গাঢ়তা, ভাবপারস্পর্শের পরিচ্ছন্নতা ও ধারাবাহিকতা এবং রচনা-লীলার সরসতা সম্পাদনের অবসর থাকে না। পুস্তকখানি পাঠ করিয়া আমাদের এইরূপ মনে হইয়াছে যে, শিবপ্রসঙ্গ বাবু দ্রুতবিদ্যা, বুদ্ধিমান ও ভাবুক। তবে, উপরি উক্ত কারণেই বোধ হয় তাঁহার ভাবুকতা পরিচ্ছন্ন হইতে পার নাই।

আর একটা কথা। সাময়িক পত্রে বাহা কিছু লিখিত হয়, তাহাই স্থায়ী সাহিত্যে স্থান পাইবার উপযুক্ত হয় না; অথচ লেখক যদি সাময়িক পত্রে প্রকাশিত তাঁহার রচিত প্রবন্ধ-মাত্রকেই স্বপ্রকাশিত পুস্তকে স্থান দেন, তাহা হইলে বৃত্তিতে হয় যে, তিনি সে সকল-গুলিকেই স্থায়ী সাহিত্যে স্থান পাইবার উপযুক্ত বলিয়া মনে করেন। অথচ এই পুস্তকে এমন শুষ্ক একটা প্রবন্ধ আছে, যাহা

পুস্তকে সন্নিবেশিত না হইলেই ভাল হইত—অর্থাৎ তাহা স্থায়ী সাহিত্যে স্থানলাভ করিবার উপযুক্ত নহে। ভূমিকালেন্দক গিরিজাবাবুও একটা দীকার করিয়াছেন, এবং অধিকতর দীকার করিয়াছেন যে, এই অপরাধের সমস্ত দোষটাই গ্রন্থকারের নহে।

তথাপি এই পুস্তকখানি আমরা লোককে পড়িতে পরামর্শ দিতে পারি। ইহাতে যে কল্পনার বিকাশ আছে, তাহাতে লোকের চিত্তবিনোদন হইবে। ইহাতে যে সাংসারিক জ্ঞানের কথা আছে, তাহাতে অনেকের শিক্ষা হইবে। অবশেষে গ্রন্থকারকে এইমাত্র বলিতে চাই যে, সংসারের পাঁচ কাজের মধ্যে ভূমিগা পাতিগা উৎকৃষ্ট সাহিত্য-স্বপ্নন করাটিকে ঘটে—একই সময়ে লক্ষী ও সরস্বতী উভয়ের সঙ্গল সেবা হইতে পারে না। এ পৃথিবীতে ঐকান্তিক দাদনা বাতীত মিচিলাত চলিত—বুঝি অসম্ভব।

ত্রিবেণী। তিনটি ক্ষুদ্র উপভাষা। ত্রিভূমিবিহারী দাস-প্রণীত। মূল্য ১০/- দুই আনা।

ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উপভাষার আশা, এবং বলিতে কি, আশ্চর্যকর বৃহৎ উপভাষার আশায়ও, আমাদেরিগকে বড় আলাতন অশুভব করিতে হয়। এই সকল পড়িয়া সমালোচনা করা যে কি ব্রহ্মণা, তাহা। প্রাচীনকালে বীহারী ভুবানল করিতেন, বোধ হয় তাঁহারাই কেবল বৃত্তিতেন। এই তিনটি উপভাষার মধ্যে ‘সংগীতা’-নামক গল্পটির কতক উল্লেখ করা যায়, কিন্তু ইহারও কল্পনাটি অতি পুরাতন, অতি মীর্ণ। গ্রন্থকার ‘বিজ্ঞাপনে’ লিখিয়াছেন—“এতদনান ‘বিবেচনী’ কেবলমাত্র

পাঠক সংগ্রহার্থে লিখিত—অল্প উদ্দেশ্য সাধনার্থে নহে।” ইহাতে পাঠকসংগ্রহ কি হইবে? যদি হয়, তাহা হইলে নিঃসন্দেহ আমরা বাহবা দিব; কিন্তু সে বলীয় পাঠক-কল্যাণমণ্ডলের বিচার-শক্তি ও গুণগ্রাহিতাকে, গ্রহণারক নহে।

দ্বৈতাবলী। প্রথম খণ্ড। ঐশ্বরচন্দ্র গুপ্ত-প্রণীত। ঐশ্বরীকৃতক গুপ্ত সম্পাদিত। কলিকাতা, ২-১১ নং কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট, মেডিকেল লাইব্রেরি হইতে শ্রীকৃষ্ণদাস চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক প্রকাশিত। মূল্য ৬/- চারি টাকা মাত্র।

মান্যকারণে এই গ্রন্থাবলীর সমালোচনা নিম্নরোজন। পরিচিত ব্রাহ্মণের উপরীত বেধাইবার প্রয়োজন হয় না। সাময়িক পত্রের সংক্ষিপ্ত সমালোচনার উদ্দেশ্য, নূতন গ্রন্থকে সাধারণের নিকট পরিচিত করিয়া দেওয়া; কিন্তু ঐশ্বরচন্দ্র গুপ্ত নিজগুণে এত সুপরিচিত যে, তাহার আবার নূতন করিয়া পরিচয় দিতে যাওয়া সম্পূর্ণ অনাবশ্যক। তদ্ব্যতীত, ৮ বহিঃমবাবুর লিখিত যে উৎকৃষ্ট সমালোচনা এই গ্রন্থে সন্নিবেশিত হইয়াছে, তাহার পর আমাদের আর বড় কিছু বলি-বারও নাই।

বহিঃমবাবুর সম্পাদকতার ইতিপূর্বে বঙ্গ ঐশ্বরচন্দ্র গুপ্তের ‘কবিতাসংগ্রহ’ প্রকাশিত হয়, তখন অনেক কবিতা অসীলতা-দোষে দূষিত বলিয়া পরিত্যক্ত হইয়াছিল। এই সংকলনের দুদিকায় সম্পাদক মণীন্দ্রকৃ-

ষাবু সিধিয়াছেন—“আমরা তাহার সম্পূর্ণ রচনা খণ্ডাকারে প্রকাশ করিতেছি।” ভালই করিতেছেন। অসীল বলিয়া ঐশ্বরগুপ্তের রচনাবলী কাটিয়া ছাঁটিয়া বাহির করা যদি আবশ্যক হয়, তাহা হইলে কালিদাস ও শেকস্পীরকেও কাটিয়া ছাঁটিয়া নামেহাল করা বাহির করিতে হয়। একপ্রকার কাছটা আমরা নিতান্তই অসম্মত মনে করি। মণীন্দ্রকৃষ্ণাবু তাহার ‘লাদামহাশয়ের’ সম্পূর্ণ রচনা প্রকাশের যে সংকল্প করিয়াছেন, তাহার আমরা সম্পূর্ণ অসম্মোদন করি। তবে বাংলা সাহিত্যে এমন কথ্য উদ্ভূত যুগিত অসীলতাও আছে, বাহা সর্বথা পরিবর্জনীয়। কিন্তু এরূপ অসীলতা ঐশ্বরগুপ্তের রচনায় বড় বেধা যায় না। তারতচন্দ্রের বিতানুসারে এবং দাম্পত্যবিহারের পাচালীতে যেরূপ প্রোতোচিত অসীলতার ছড়াছড়ি বেধা যায়, ঐশ্বরচন্দ্রে সেদূর অসীলগতা দেখিরাছি বলিয়া মনে হয় না। এইখানে ইহাও বলিয়া রাখিতে হয় যে, গোঁড়াঙ্গের তর্কবাপীশের সহিত তাহার যে কবিতাযুদ্ধ হইয়াছিল, এবং বাহার কথ্যতা দেশপ্রসিদ্ধ, তাহার কোন কবিতা আমরা পড়ি নাই।

এই সংকলনে কেবল যে কবিতাই প্রকাশিত হইবে, এরূপ নহে; কবিতা, নাটক এবং অন্যান্য সকল রচনাই প্রকাশিত হইবে, সম্পাদক মণীন্দ্রাবু এরূপ আশা দিয়াছেন। আশীর্বাদ করি, তিনি এই সাধনাক্রমে সফল হইবেন।

মাসিক-সাহিত্য-সমালোচনা ।

ভারতী । জ্যৈষ্ঠ । স্বাকার ।
 টেকদটবু কুমিট স্বাকারকে বাঙলা বর্ণমালা
 হইতে নির্দাসন বিদ্যাছেন । ঐবুত সতীশ-
 চন্দ্র বিজ্ঞানভূষণ অনেক পুরাতন নজির দেখা-
 ইয়া স্বাকারের পক্ষে ওকালতী করিয়াছেন ।
 অসংবৃত্ত ব্যঞ্জনবর্ণের সঙ্গে ক কেমন করিয়া
 প্রথমে প্রবেশ করিয়াছিল জানি না, কিন্তু সে
 সময়ে স্বাকারকে যে সতর্ক ছিল, তাহা বলিতে
 পারি না । আধুনিক ভারতবর্ষীয় আধা-
 ভাষার মূর্ত্ত্ব স্ব-এর উচ্চারণ স্ব হইয়া গিয়া-
 ছিল—সুতরাং স্বাকারে মূর্ত্ত্ব স্ব-এর বিস্তৃত
 উচ্চারণ ছিল না । না থাকিলেও উহা মূর্ত্ত্ব
 অক্ষর এবং উহার উচ্চারণ স্ব । শব্দের
 আরম্ভে অনেক মূর্ত্ত্ব অক্ষরের মূর্ত্ত্ব উচ্চারণ
 থাকে না—যেমন জ্ঞান-শব্দের জ্ঞ—কিন্তু
 অজ্ঞ-শব্দে উহার মূর্ত্ত্ব উচ্চারণ সব্বক্ষে
 সন্দেহ থাকে না । স্বাকারও সেইরূপ—
 ক্ষর এবং অক্ষর শব্দের উচ্চারণে তাহা প্রমাণ
 হইবে । অতএব অসংবৃত্ত বর্ণমালায় স্বাকার
 বলজ্যেষ্ঠ একঘরে, তাহাতে সন্দেহ নাই । সেই
 ব্যঞ্জনপঞ্জির মধ্যে উহার অস্বরূপ সত্ববর্ণ
 আর একটিও নাই । দীর্ঘকালের দখল
 প্রমাণ হইলেও, তাহাকে আরো দীর্ঘকাল
 অজ্ঞার অধিকার রক্ষা করিতে দেওয়া উচিত
 কি ? বাহা হউক, এই উপলক্ষ্যে বিভা-
 ভূষণ মহাশয় বর্ণমালাসম্বন্ধে যে আলোচনা
 উত্থাপন করিয়াছেন, তাহা বিশেষ কোতূহল-
 জনক । অসুখ্যার, বিদগ্ধ, চন্দ্রবিন্দু এবং হনু
 ২ সম্বন্ধে তিনি যে মত প্রকাশ করিয়াছেন,

আমরা তাহা স্বীকার করি । বাঙ্গলা
 শব্দের স্বিকৃতি । সাহিত্যগরিব
 পত্রিকার বঙ্গদর্শনসম্পাদক “সব্বদেব”-
 নামক এক প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন । কান্তন-
 মালের প্রদীপে তাহার একটি সমালোচনা
 বাহির হইয়াছিল । ঐবুত বিহারীদাস
 গোস্বামী সেই সমালোচনা অবলম্বন করিয়া
 উক্ত বিষয়ের আলোচনা করিয়াছেন । মূল-
 প্রবন্ধলেখকের নিকট এই আলোচনা
 অত্যন্ত চণ্ডা । এ সব্বক্ষে আমাদের বক্তব্য
 পরিষ্কৃত করিয়া বলিতে গেলে, সংক্ষিপ্ত সমা-
 লোচনার সীমা লঙ্ঘন করিবে । কেবল
 একটা উদাহরণ লইয়া আমাদের বক্তব্যের
 আভাসমাত্র দিব ।—আমরা বলিয়াছিলাম,
 “চার চার” “তিন তিন” প্রকর্ষবাচক ।
 অর্থাৎ যখন বলি “চার চার পেরাদা আসিয়া
 হাজির,” তখন একেবারে চার পেরাদা
 আসার বাহ্যল্যজনিত বিহীন প্রকাশ করি ।
 প্রদীপের সমালোচক মহাশয় বলেন, এই
 বুলের দ্বিধ বিস্তৃত-বহুলতা-জ্ঞাপক । অর্থাৎ
 যখন বলা হয়, “তাহাদিগকে ধরিবার জন্য
 চার চার জন পেরাদা আসিয়া হাজির,” তখন
 সমালোচক মহাশয়ের মতে তাহাদের প্রত্যেক-
 কের জন্য চার চার পেরাদা আসিয়া উপস্থিত,
 ইহাই বুঝায় । আমরা এ কথায় সাহায্য দিতে
 পারিলাম না । বিহারীদাস্ বৃষ্টান্তদ্বারা
 দেখাইয়াছেন, একজননের জন্যও “চার চার
 পেরাদা” বাঙলাভাষা অসুখ্যারে আসিতে
 পারে । বিহারীদাস্ বলেন, বৃষ্টান্ত অসুখ্যারে

হই অর্থাৎ সঙ্গত হয়। অর্থাৎ প্রকর্ষ এবং বিতর্কবহুলতা, হই বুঝাইতে পারে। তাহা ত্রিক নহে—একর্ষই বুঝায়, সেই একর্ষ এক-জনের সম্বন্ধেও বুঝাইতে পারে, ভিন্ন ভিন্ন লোকের সম্বন্ধেও বুঝাইতে পারে, সুতরাং উভয়বিধ প্রয়োগের মধ্যে একর্ষভাবেই সাধারণ।

সাহিত্য। চৈত। মহাপুরুষ রাণাড়ে। এই মহাশয় জীবনী প্রকাশ করিয়া সাহিত্য আন্দোলনের কুতূহলজনক হইয়াছেন। বাঙালী স্বাভাবিক-সুপ্রভাবশত সাধারণতঃ অল্পপ্রদর্শনদের প্রতি অবজ্ঞাপ্রদর্শন। হুঁতুগাবশত বর্তমানকালে যে কয়েকজন বাঙালী কর্মক্ষেত্রে কৃতিত্ব প্রদর্শন করিতেছেন, তাঁহারা সকলেই মুখ্যতঃ রাষ্ট্রতন্ত্র লইয়াই ব্যাপৃত। এই কারণে রাষ্ট্রতন্ত্রিগণকেই আমাদের নব্য-শিক্ষিত সমাজের কর্মীর আদর্শ করিয়া লইয়াছেন। সভ্যতাকেই তাঁহারা প্রধান কর্মক্ষেত্র এবং ইংরাজি ভাষার বাগ্মিতাকেই তাঁহারা জীবনের প্রধান উল্লাস বলিয়া গণ্য করিয়াছেন। বসন্তরবাসী শিক্ষিতবর্গের ইংরাজি শাক্য-প্রবাহ ও উচ্চারণের সহিত তাঁহাদের স্ব-প্রদর্শিত আদর্শের তুলনা করিয়া তাঁহারা গর্ভ অহুত্ব করেন ও মনে করেন, বাংলা-দেশ ভারতবর্ষের অল্প সকল বিভাগ অপেক্ষা সকলপ্রকারে সার্বভৌম লাভ করিয়াছে। বাঙালী নব্যবাদের এই সর্গীয় আদর্শকে আঘাত করিয়া নষ্ট করিবার সময় উপস্থিত হইয়াছে। ; আমাদের ক্ষুদ্র অভিমানে আমা-নিগকে প্রতিদিন পথভ্রষ্ট করিতেছে। নত্যা-রাষ্ট্র ভূগোপন-ব-প্রদর্শিত জীবনী যদি জানা

নিগকে সচেতন করিতে না পারে, তবে তাহাতে আমাদের ক্ষুদ্রতারই পরিচয় হইবে। এই মহাশয়ের জীবনী আলোচনা করিয়া আমাদের যদি অহুত্বের প্রভুতি না আসে, তবেই আমরা যেন নব্রতা শিক্ষা করিতে পারি,—আমরা যেন স্বীকার করি, রাণাড়ের জ্ঞান সর্বতোবাণী মহাবীর আদর্শ আমাদের বাংলা দেশে নাই। রাষ্ট্রতন্ত্রীয় ব্যাপারে রাণাড়ের উল্লাস তাঁহার বেশিহিতকর উদ্দেশ্যের একাংশমাত্র। রাষ্ট্রতন্ত্রে মহাশয় রামমোহন রায়ও হস্তক্ষেপ করিয়াছিলেন, কিন্তু তাহাই তাঁহার জীবনের একমাত্র লক্ষ্য ছিল না। পরাধীন দেশে রাষ্ট্রতন্ত্র কোন মহৎ লক্ষ্যকে কখনই সম্পূর্ণ অধিকার করিতে পারে না। সেখানে তাহার চেয়ে অন্যতম সীমাবদ্ধ এবং সকল সময় গৌরবজনক নহে। রাণাড়ের বাহায়া,—ধর্ম, সমাজ, লোকশিক্ষা, রাষ্ট্রতন্ত্র,—সর্বত্রই আপনাকে প্রচার করিয়াছিল। রামমোহন রায় যেমন সমস্ত নব্য-বস্তুকে আপন মহাবীরিত্তিতে বিকশিত করিয়াছিলেন, রাণাড়ে সেইরূপ সমস্ত নব্যমহারাষ্ট্রকে সর্বাঙ্গীনভাবে পরিপুষ্ট করিতেছিলেন। তিনি নব্যমহারাষ্ট্রকে কেবল বাগ্মিতা, কেবল আবেশনকুলগতা, শিখাইতেছিলেন না, তিনি তাহাতে মাস্তব করিতেছিলেন। সেউকর মহাশয় লিখিতেছেন, “বঙ্গদেশের উন্নতিসাধনের বাবতীর বিভিন্ন পন্থাই তাঁহার সর্বতোবাণী প্রতিভাভাণে তিনি নির্ধারণ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। তিনি ব্রিটিশাধিনেতা, ধর্ম, সমাজ, বাণিজ্য, শিল্পকলা, মাতৃভাষা ও সাহিত্য, রাজনীতির চর্চা, রাজকীয় বিধি-ব্যবস্থা, নিরসনভেদে শব্দের প্রয়োগ প্রভৃতি

সকল বিষয়ের সংস্থার ও উৎকর্ষ সাধন ভিন্ন দেশোন্নতি সম্ভবপর নহে । তৎপর্যায়ের করুণায় অগাধ বৃদ্ধির স্তায় তিনি অসাধারণ কর্মঠতাও লাভ করিয়াছিলেন । তাই তিনি রাজকর্মে নিযুক্ত থাকিয়াও, অতি অল্প সময়ের মধ্যে রাজনীতিচর্চার স্বরূপ পূর্ণার সার্বজনিক সত্য, জেনেরাল-সাইবেরি-নামক সাধারণ পাঠাগার, পকারভী আদ্যাদি, বক্তৃতাভাষা, দেশীয় কাপড়ের বোঁকান, দেশীয় শিরশ্রমণনী, মিউজিয়ম, সন্নীত-সমাজ, দেশীয় শিরসমিতি, বেদপাঠশালা, ডেকান এডুকেশন সোসাইটি, ডেকান্‌ ক্লাব, আর্থাসমাজ, এবং জ্ঞানপ্রকাশ-নামক সাপ্তাহিক পত্র ও সার্বজনিক স্তায় এক-খানি ত্রৈমাসিক পত্র প্রভৃতি বহুবিধ লোক-হিতকর অঙ্গষ্ঠানের সূত্রপাত, পরিপুষ্টি ও পৃষ্ঠপোষণ করিতে পারিয়াছিলেন ।” এই মহাপুরুষের বিপুল প্রাজ্ঞতার সহিত গভীর সম্বন্ধতা, বিভিন্ন কর্মশীলতার সহিত অটল প্রশান্তি, অগাধ বিদ্যাবৃত্তার সহিত পরিপূর্ণ বিনয় মিশ্রিত হইয়া এবং তাহার সমস্ত জ্ঞান, চিন্তা ও চেষ্টার উজ্জ্বল একটা নির্মল ও প্রবল ধর্মভাবের জ্যোতি বিকীরিত হইয়া, যে একটি উন্নত উজ্জল উদার আদর্শের সৃষ্টি হইয়াছে, সুধরগর্ভিত বাঙালিকে তাহার চরণপ্রান্তে প্রণত হইতে আহ্বান করি । এই মহাত্মার স্মৃতিতে সমস্ত ভারতের যে ক্ষতি হইয়াছে, সে ক্ষতির পূরণ কবে হইবে ?

প্রদীপ । বৈশাখ । রাজবিদ্যা ।

ভারতে ব্রহ্মবিদ্যা এখন পরা বিদ্যা বলিয়া কথিত ছিল, তখন তাঙ্গা কেবলমাত্র ব্রাহ্মণ-দের মধ্যেই বহু চিত্র না, হীরেপ্রবাহ এই

প্রবাহে তাহারই আলোচনা করিয়াছেন । তখন অনেক সময় ব্রাহ্মণেরা ব্রহ্মবিদ্যা লাভ করিতে ক্ষত্রিয় রাজার দ্বারস্থ হইতেন । দ্বিতীয় যে কর্মযোগের উপদেশ আছে, তৎসম্বন্ধে শ্রীকৃষ্ণ কহিয়াছেন :—“পরম্পরাক্রমে প্রাপ্ত এই বোধ ব্রাহ্মবিদ্যা অবগত ছিলেন ।” হীরেপ্রবাহ বলেন, “এই বিদ্যা বিবেকভাবে ব্রাহ্মবিশিষ্টদ্বারে প্রবাহিত ছিল বলিয়াই, বোধ হয়, ইহার নামকরণ হইয়াছিল ব্রাহ্ম-বিদ্যা ।” আমরা হীরেপ্রবাহ এই অদ্ভুত-মান প্রচেষ্টা বলিয়া বিবেচনা করি । ব্রহ্ম-বিদ্যা ক্ষত্রিয়দিগের মনের মধ্যে স্বভাবতই একটি বিবেক স্বাতন্ত্র্য লাভ করিয়াছিল, দ্বিতী-পাঠে তাহা উপলব্ধি করা যায় । ব্রহ্মবিদ্যা যেনকালবিবেকে কর্মে অনাসক্তি আনয়ন করিয়াছিল, তেমনি ক্রিয়ের মধ্যে তাহা কর্মযোগে অভিযুক্ত হইয়াছিল । দ্বিতী ও মহাত্মার পাঠে এইরূপ প্রতীতি হয় । ব্রহ্মবিদ্যা যে কেবল জ্ঞানে ও ধ্যানে সম্পূর্ণতা লাভ করিতে পারে না, ভক্তিতে ও কর্মে তাহার সফলতা, ব্রাহ্মণের উপনিষদে স্থানে স্থানে তাহার আভাস পাওয়া যায়—কিন্তু দ্বিতীয় তাহা পরিদ্রুত হইয়াছে । “এই সর্বো-দ্বিতীয় ব্রহ্মবিদ্যাই বোধ করি ব্রাহ্মবিদ্যা । শ্রীকৃষ্ণ অগদানন্দ দ্বার “বাহু-নৈক্যবিদ্যা”-শীর্ষক একটি প্রবন্ধ পূর্বে প্রদীপে লিখিয়া-ছিলেন, অধ্যাপক শ্রীকৃষ্ণ বোগেনচন্দ্র দ্বার কয়েকটি বিষয়ে তাহার প্রতিবাদ করেন—বর্তমান সংখ্যায় অগদানন্দবাহু তাহার উত্তর দিয়াছেন । বাঙালয় বৈজ্ঞানিক পরিভাষা দ্বিতীয় হয় নাই—অতএব পরিভাষার প্রয়োগ নহি। আলোচনা কর্তব্য, কিন্তু বিদ্যা কবা

অসম্ভবতঃ। ইংরাজি মিট্ররলজির বাঙলা প্রতিশব্দ এখনো প্রচলিত হয় নাই, সুতরাং লস্করানবাবু যদি আশ্চর্য সংকুল অস্তিত্বের দৃষ্টান্তে “বায়ুনভোবিদ্যা” ব্যবহার করিয়া তাহা চালাইয়া থাকেন, তাহাকে যেন বিতে গারি না। যোগেশবাবু ‘আবহ’-পদ কোন প্রাচীন গ্রন্থ হইতে উদ্ধার করিয়াছেন, তাহার অর্থ ভূবায়ু। কিন্তু এই ভূবায়ু বলিতে প্রাচীনরা কি বুঝিতেন, এবং তাহা আধুনিক আর্টিফিসিয়াল শব্দের প্রতিশব্দ কি না, তাহা বিশেষরূপ প্রমাণের অপেক্ষা রাখে—এক কথায় ইহার মান্যসা হইবে না। অগ্রে সেই প্রমাণ উপস্থিত না করিয়া কোর করিয়া কিছু বলা যায় না। শত্ৰুশলার সপ্তম অঙ্কে দ্ব্যন্ত যখন বর্ণগোল হইতে “মর্ত্যে অবতরণ করিতেছেন, তখন মাতলিকে জিজ্ঞাসা করিলেন—“এখন আমরা কোন্ বায়ুর অবিকারে আদিরাছি?” মাতলি উত্তর করিলেন, “গগনবর্তিনী মনাকিনী যেখানে বহমানা, চক্রবিক্রমণি জ্যোতির্লোক যেখানে বর্তমান, বামনবেশধারী হরির দ্বিতীয় চরণপাতে পবিত্র এই স্থান ধূলিসূত্র এবহ-বায়ুর সার্ব্ণ।” দেখা বাইতেছে, প্রাচীনকালে এবহ প্রকৃতি বায়ুর নাম তৎকালীন একটি কাল্পনিক বিশ্বতত্ত্বের মধ্যে প্রচলিত ছিল—সেগুলি একটি বিশেষ শাস্ত্রের পারিভাষিক প্রয়োগ। যেদ্বিপুরাণে দেখা যায়—

প্রাকাস্যে দিবহৈকব উষঃ সংবহত্বা ।

দিবহঃ প্রবহন্তেব পরিভাষতঃ ।

অন্তরীক্ষে চ বাহে তে পৃথগ্-বার্ণবিচারিণঃ ।

এই সকল বায়ুর নাম কি আধুনিক মিট্ররলজির পরিভাষার মধ্যে পান পাইতে

পারে? বিশেষ শাস্ত্রের বিশেষ মত ও সংজ্ঞার দ্বারা তাহার পরিভাষাগুলির অর্থ সীমাবদ্ধ—তাহাদিগকে নির্দিষ্টারে অস্ত্র প্রয়োগ করা যায় না। অপর পক্ষে নভঃশব্দ পারিভাষিক নহে—তাহার অর্থ আকাশ, এবং সে আকাশ বিশেষরূপে মেঘের সহিত সংকলিত,—সেই বস্তু নভঃ ও নভঃ শব্দে শ্রাবণ ও ভাস্কর্য্যময়। কিন্তু নভঃ শব্দের সহিত পুনশ্চ বায়ুশব্দ যোগ করিবার প্রয়োজন নাই, এ কথা স্বীকার করি। আশ্চর্য ও তাহার অভিধানে তাহা করেন নাই; তাহার অভিধানিক সত্ত্বত অল্পদারে নভো-বায়ু-বিদ্যা বলিতে নভোবিদ্যা বা বায়ু-বিদ্যা বুঝাইতেছে। নভোবিদ্যা মিট্ররলজির প্রতিশব্দরূপে ব্যবহৃত হইলে, সাধারণের সহজে বোধগম্য হইতে পারে।

প্রবাসী। জ্যোতির্বিদ্যার উন্নতি ও তন্নিমিত্ত দান একটি স্থলিখিত গ্রন্থ,—ইহাতে চিত্রা করিবার নিয়ম অনেক আছে। বস্তুত লেখকমহাশয় লেখাইয়াছেন, শিক্ষাকার্য্য ব্যাপারে বহুবিঘ্নিত, তাহার শাখাপ্রশাখার অন্ত নাই। যুরোপে আজ-কাল শিক্ষার অঙ্গ অত্যন্ত বাড়িয়া গেছে, তাহার তুলনায় আমাদের দেশের বিদ্যালয় ও বিদ্যালয়িকাপ্রণালী কিছুই নহে। এ কথা আমরা স্বীকার করি। কিন্তু একটি কথা বিবেচনা করিয়া দেখিতে হইবে। যুরোপীয় সভ্যতার শিক্ষা, খেলা, আবোধ, জীবনযাত্রা, সমস্তই অত্যন্ত বিচিত্র এবং ব্যয়-সাধ্য ও শ্রমসাধ্য হইয়া উঠিয়াছে। একথানা তানপুরা কাঁধের উপর ফেলিয়া আমরা গান গাই;—যুরোপের খরচোড়া একথানা

শিখানোবস্ত্রের মূণ্ডে আমাদের একটা
 জেলার লোকের দানবাজনা চলিয়া যায়।
 অথচ আমাদের সর্বোত্তম বর্জ্যবস্ত্র নহে,
 তাহা বিচিত্র নিয়মে বহু, দ্রুত রহতে
 পূর্ণ। উপকরণ জ্বলন্ত বলিয়া আসল ব্যাপারটা
 সত্য নহে। আজকাল যুরোপে নাটকলা
 এত ছুটি আয়োজন, পরিভ্রম ও অর্থব্যয়ের
 অপেক্ষা করে যে, আমরা তাহা অনুমান
 করিতে পারি না ;—কিন্তু অভিনয় যদি উত্তম
 এবং নাটকখানি উৎকৃষ্ট হয়, তবে বহুমূল্য
 পট প্রভৃতিকে উপেক্ষা করিতে দেখা
 উচিত। যুরোপ আজকাল যে পরিমাণে
 আয়োজন ও অর্থব্যয় করে, তাহার ফললাভ
 ঠিক সেই পরিমাণের নহে। আমাদের দেশে
 যুরোপের আদর্শ চলিয়াছে, কিন্তু সেই আদর্শ
 চালনার শক্তি নাই, ভিত্তি নাই। এখন,
 আমাদের চিন্তার বিষয় এই যে, কি করিলে
 আমাদের জীবনযাত্রা সরল ও তাহার উপকরণ
 জ্বলন্ত হইবে। আমাদের দেশে টোলে
 শিক্ষার বেকরণ প্রণালী ছিল, সেই সরল প্রণা-
 লীকে আদর্শ করিয়া যদি শিক্ষাবিধানের
 কোন নিয়ম উদ্ভাবিত হয়, তবে তাহাতে
 দেশের স্বার্থ হারী উপকার হইবে।
 আমাদের ধনীরা বিলাতের ধনীর ন্যায় নহে ;
 আমাদের ধন আমাদের পরিবার ও বংশের
 মধ্যে বদ্ধ ; আমাদের ধনীরা সম্ভল অবস্থার
 ধন ব্যয় করিতে পারে, কিন্তু সম্পত্তি ভাগ
 করিতে পারে না ; কারণ, আমাদের সমাজের
 প্রেক্ষিতী অনুসারে সম্পত্তির উপরে গৃহ

ধনীর ঠিক যেন স্বাধীনতা নাই। অতএব
 যুরোপে যেমন অল্প টাকা বিদ্যালয়ে
 আকৃষ্ট হয়, আমাদের দেশে তেমন হইবার
 জো নাই। আমাদের বিদ্যালয় আমাদের
 দেশীয় প্রকৃতির অনুকূল করিয়া যদি প্রতি-
 ষ্ঠিত হয়, তবে শিক্ষাকার্য্য দেশে ব্যাপ্ত হইতে
 পারে, নতুবা পবমেন্টের মুখের দিকে
 তাকাইতে হয়, অথবা বাবসাগার বিদ্যা-
 বণিকের হাতে গিয়া পড়িতে হয়—যত স্নান
 শিক্ষার বস্তু অধিক পাস করানো যায়, ইহাই
 বিদ্যালয়ের উদ্দেশ্য হইয়া উঠে। বিদ্যা-
 বিস্তারের প্রত্যক্ষ দেশের ধনীদিগের নিকট টাকা
 চাওয়া হউক, কিন্তু সেই স্রব তাবিতে
 হইবে, কি করিলে আমাদের দেশে শিক্ষা
 উন্নত অর্থাৎ অথচ তাহার উপকরণ যথাসম্ভব
 জ্বলন্ত হইতে পারে !

এসময় একটী কথার উল্লেখ করি।
 লেখকমহাশয় ইংরাজি কবিতাশব্দের বাংলা
 করিয়াছেন, ‘প্রত্নীকৃত কবাল’। কিন্তু উদ্ভিদ-
 পদার্থের কবাল-শব্দকে কবালশব্দের প্রয়োগ
 কেমন করিয়া হইবে ? ‘পাতার কবাল’
 ঠিক বাংলা হয় না। পূর্বসংখ্যার কবিতার
 প্রতিশব্দ শিলাবিকার হইতে পারে, এরূপ
 যত্নব্যয় প্রকাশ করিয়াছিলাম। কিন্তু
 মহানবিশি মহাশয়ের সহিত আলোচনা
 করিয়া দেখিয়াছি, ‘শিলাবিকার’ metamor-
 phosed rock-এর উপযুক্ত তাৎপর্য্য হয়,
 এবং ‘জীবশিলা’-শব্দ কবিতার প্রতিশব্দরূপে
 ব্যবহৃত হইতে পারে।

প্রাকৃত ও সংস্কৃত ।

ঐনাথবাবু তাঁহার ‘ভাষাতত্ত্ব’-সমালোচনার প্রতিবাদে প্রাচীন বাঙলা সাহিত্য হইতে যে সকল উদাহরণ উদ্ধৃত করিয়াছেন, তাহাতে স্পষ্টই প্রমাণ হইয়াছে, জনসাধারণের অচলিত ভাষা ‘প্রাকৃত’-নামে অভিহিত হইত। যাহাটি তাহার এখনো ‘প্রাকৃত’-শব্দের সেইরূপ ব্যবহার দেখা যায়।

কিন্তু ‘প্রাকৃত’-শব্দের এই প্রয়োগ আধুনিক বাঙলায় চলি নাই, চলি প্রাথমিক কাল, সম্ভবতঃ ।

পুরাকালে যখন গ্রন্থের ভাষা—পণ্ডিতের ভাষা, সাধারণ-কথিত ভাষা হইতে ক্রমশঃ বদল হইয়া উঠিল, তখন সংস্কৃত ও প্রাকৃত, এই দুই পৃথক নামের সৃষ্টি হইয়াছিল। তখন বাহা সংস্কৃত ছিল এবং তখন বাহা প্রাকৃত ছিল, তাহাই বিশেষরূপে সংস্কৃত ও প্রাকৃত শব্দে বাচ্য।

এখনো বাঙলায় লিখিত-ভাষা, কথিত-ভাষা হইতে ক্রমশঃ বদল ও সম্পূর্ণ আকার গ্রহণ করিতেছে। আমরা যদি বাতুলগত অর্থের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া সাধারণ-কথিত বাঙলাকে প্রাকৃত বলি, তাহা হইলে লিখিত গ্রন্থের বাঙলাকে সংস্কৃত বলিতে হয়। বস্তুতঃ

এখনকার কালের প্রাকৃত ও সংস্কৃত ইহাই। কিন্তু এরূপ হইলে বিপাকে পড়িতে হইবে।

কালিদাস প্রভৃতি কবিদের নাটকে যে প্রাকৃত ব্যবহার হইয়াছে, তাহা তাঁহাদের সময়ের চলিত ভাষা নহে। চলিত ভাষা প্রদেশভেদে ভিন্ন হয়, অথচ সাহিত্যের প্রাকৃত একই এবং সে প্রাকৃতের এক ব্যাকরণ। ইহা হইতে অসংখ্য কথ্য অন্তর্য হয় না যে, বিশেষ সময়ের ও বিশেষ দেশের চলিত ভাষা অভিধানে ‘প্রাকৃত’-শব্দে বিশেষরূপে নির্দিষ্ট হইয়া গেছে ; অন্তঃদেশ-কালের প্রাকৃতকে ‘প্রাকৃত’ বলিতে গেলে, কেঁচোকেও উদ্ভিদ বলা বাইতে পারে।

যদি প্রাকৃত ও সংস্কৃত শব্দ বাঙলা শব্দের পূর্বে বিশেষরূপে সূড়িয়া ব্যবহার করা হয়, যদি লিখিত বাঙলাকে ‘সংস্কৃত বাঙলা’ ও কথিত বাঙলাকে ‘প্রাকৃত বাঙলা’ বলা যায়, তাহা হইলে আমরা আপত্তি করিতে পারি না। কিন্তু সংস্কৃতভাষা ও প্রাকৃতভাষা অন্তরঙ্গ। প্রাকৃতভাষা বাঙলা ভাষা নহে, বরং তাহা সাক্ষ্য দিবে।

বঙ্গদর্শন।

জড় কি সজীব ?

আচার্য্য অগদীশচন্দ্র বসু গতবারে বিলাতে গিয়া বিজ্ঞানের যে নূতন তথ্য প্রচার করিয়া আসিয়াছিলেন, এতদিনে অল্পে অল্পে তাহার সংবাদ আমাদের নিকট পরিচিত হইয়া আসিতেছে। সেই আবিষ্কার ঈশ্বর-তত্ত্বকে অগ্রসর করিয়া-দিয়া তারহীন টেলি-গ্রাফবস্তুর কাণ্ডোপযোগিতা বাড়াইয়া দিয়াছে এবং বিজ্ঞানবিশ্বগণের নিকট প্রচুর সম্মান লাভ করিয়াছে, এ খবর আমাদের কাছে আসিয়া পৌঁছিয়াছে।

পুনর্বার আচার্য্যবর যুরোপের পণ্ডিত-সভায় নবতর তথ্য উপহার লইয়া প্রবেশ করিয়াছেন। ইহা শুনিয়াছি ব্যাপারটি অদ্ভুত। শুনিয়াছি জড় ও জীবের মধ্যে দৃষ্টান্ত্য বৈষম্য তিনি ভেদ করিয়া বিজ্ঞান-গণকে সচকিত করিয়া তুলিয়াছেন। আঘাত, উত্তেজনা প্রভৃতি দ্বারা ধাতুপদার্থ ও সজীব পদার্থে একই রূপ কল উৎপন্ন হয়, ইহা পরীক্ষা দ্বারা প্রত্যক্ষ দেখাইয়া তিনি জড়-জীবের সাধারণ্য প্রমাণ করিয়াছেন।

সকল কথা আমরা এখনো স্পষ্ট করিয়া বিস্তারিতরূপে জানিতে পারি নাই। সভায়

যাহারা উপস্থিত ছিলেন, তাহাদের মনে কিরূপ ধারণা হইয়াছে, তাহা হইতেই বিষয়-টার মোটে কথা আমরা কতকটা অনুমান করিতেছি।

অবৈজ্ঞানিক শ্রোতার। কি বুঝিয়াছেন, তাহা ইংরাজি 'মোব'পত্রের নিম্নলিখিত পরিহাসবাক্যে জানা যায়। মোব বলেন, ধাতুপদার্থের উপর নানাধি আত্যাচার করিবার সময় অধ্যাপকের দুই চক্ষু অক্ৰম্ভে পূর্ণ হইয়াছিল। একজন তাহাকে ধস্তা বলি। কিন্তু আগুন উত্থাইবার লৌহদণ্ড যখন চুলার গৌহবেষ্টনের উপর পড়িয়া বাইবে, তখন তাহার আঘাত লাগিয়াছে বলিয়া ডাডাডাডি তাহাকে তুলিয়া লইয়া আশ্রয় করিতে বলিবে, বৃটিশ গৃহস্থর সে অবস্থা আসিতে বিলম্ব আছে।

বৃটিশ গৃহস্থর চিত্ত জড় কি সজীব, কি পরিমাণ তাহার বেদনাবোধ, কতটা আঘাতে তাহার সাড়া পানো যায়, সে দ্রুত পরীক্ষার অধ্যাপক নিগূঢ় ছিলেন না, তিনি লোহা-পিতলকে আঘাত করিয়া সাড়া পাইয়াছেন। য়োপের উক্তিহে ইহা বুঝা

যায় যে, অধ্যাপকের মতে জড়ের জীবনধর্ম আছে, অতৈচ্ছানিক প্রোত্যাদের মনে এইরূপ সংস্কার অন্তর্ভুক্ত।

জীবনাত্মই যে সচেতন, এ কথা মনে আনিবার প্রয়োজন নাই। অন্তত এখনো তাহার প্রমাণ হয় নাই। উদ্ভিদের চেতনা আছে-কি না, কেহ বলিতে পারে না, কিন্তু তাহার জীবন আছে, এ কথা সকলেই জানে।

লৌহমণ্ড পড়িয়া গেলে তাহার বেগনা-বোধ হয়, এ কথা কেহ বলে না; কিন্তু সে যে আঘাত পায়, এ কথাও কেহ বলিত না। অর্থাৎ সঞ্জীব পরার্থ অজ্ঞাত থাকিলে তাহাতে আঘাতের বৈরূপ লক্ষণ প্রকাশ পায়, খাতু-পদার্থেও সেইরূপ লক্ষণ দেখা দেয়, ইহা জানা ছিল না। আচার্য্য জগদীশ পরীক্ষা দ্বারা তাহাই প্রকাশ করিয়াছেন।

সাধারণ প্রোত্যের কথা উপরে লিখিলাম। এক্ষণে বিজ্ঞানবিদ বিশেষত্ব কি বলেন, তাহা আলোচনা করিলে বিষয়টার আভাস পাওয়া যাইবে। তড়িৎ-তরঙ্গ-সম্বন্ধে বিখ্যাত ইংরাজী পত্র ইলেকট্রিক্যাল অধ্যাপক বহুতর বস্তুতার ধর্ম প্রকাশ করিয়াছেন, আমরা তাহারই সার সংগ্রহ করিয়া দিতেছি।

সঞ্জীব মাংসপেশিকে যদি চিম্টি কাটা যায় বা তাহাতে নোড় বা চাপ দেওয়া যায়, তবে তাহা লম্বার ছোট হইয়া চওড়ার দিকে ফুলিয়া উঠে। চাপ উঠাইয়া লইলে মাংসপেশী আবার প্রকৃতিস্থ হয়। বিশেষ যন্ত্রের দ্বারা মাংসপেশীর এই বিকৃতি ও প্রকৃতির উত্থান-পতন-রেখা আঁকিয়া লওয়া যায়। যদি মাংসপেশীতে থাকিরা থাকিরা চাপ পড়ে,

তবে তাহার তরঙ্গরেখা (curve) কতাতের মত দৃশ্য হইয়া অঙ্কিত হয়। যদি এই চাপ অত্যন্ত ঘন ঘন হইতে থাকে, তবে অবশেষে এমন একটি অবস্থা আসে, যখন মাংসপেশী নিরন্তর সঙ্কুচিত হইয়া ধ্বংসকারের আক্ষেপ উপর করে।

অতিরিক্ত ঠাণ্ডা বা গরমে মাংসপেশী আড়ষ্ট হইয়া যায়, তখন আঘাতে তাহার সাড়া পাওয়া যায় না এবং প্রকৃতিস্থ হইতেও বিলম্ব ঘটে। আবার বিশেষ মাত্রার উত্তাপে মাংসপেশীর সাড় সন্ধাপেক্ষা বাড়িয়া উঠে। এই উত্তাপের মাত্রা ভিন্ন মাংসপেশীর পক্ষে ভিন্নরূপ।

প্রযাণ্ডে মাংসপেশীর সাড় বাড়ুক কমে। উত্তেজক পদার্থে সাড় প্রবল হইয়া উঠে এবং প্রকৃতিস্থতাও শীঘ্র ফিরিয়া আসে। অথলাদক পদার্থে বিপরীত ফল হয় এবং বিবে এই সাড়-শক্তি একেবারে নষ্ট করিয়া ফেলে। ইহাও দেখা গিয়াছে, কোন কোন প্রযা মাত্রা-বিশেষে উত্তেজনা ও অন্তমাত্রার অবসাদ আনয়ন করে।

সঞ্জীব মাংসপেশীকে ছাড়িয়া যদি সঞ্জীব দ্রাব্যকে লইয়া পরীক্ষা করা যায়, তবে তাহাতেও এইরূপ পরে পরে সাড় ও প্রকৃতি-লাভ দেখা যায়। কিন্তু দ্রাব্যেতে এই সাড়ার প্রকাশ অন্তপ্রকার। যা লাগিলে দ্রাব্যের আহত বা উত্তেজিত অংশ হইতে স্নায়ু অংশ পর্যন্ত একটি বিচ্ছিন্নপ্রবাহের সৃষ্টি হয়। পুনঃ পুন আঘাত, ঐতাতপের মাত্রাবিকা, এবং উত্তেজক বা অথলাদক প্রযা দ্বারা দ্রাব্যেতে যে ক্রিয়া ও ক্রিয়াশক্তি উপস্থিত হয়, যন্ত্রবিশেষের দ্বারা তাহার রেখাচিত্র লওয়া হইয়াছে।

মাংসপেশীর চিত্রের সহিত তাহার সাদৃশ্য দেখা যায়। অধ্যাপক এইরূপ বিবিধ চিত্র সংগ্রহ করিয়াছেন। দেহবিদগুণ বলেন, দেহ-পদার্থের মধ্যে এই সাদৃশ্য জীবনের স্পষ্ট লক্ষণ, মৃতপদার্থে ইহার সম্পূর্ণ অভাব দৃষ্ট হয়।

এখন জড়পদার্থের প্রতি দৃষ্টিপাত করা যাক্। অধ্যাপক বহু দেখাইয়াছেন, একটি তারের এক প্রান্তে যদি মোচড় বা বা দেওয়া যায়, তবে সেই আহত বা উত্তেজিত প্রান্ত হইতে প্রকৃতিস্থ প্রান্ত পর্যন্ত একটি বিদ্যুৎপ্রবাহ উৎপন্ন হয়। তড়িৎমাপক-যন্ত্রের বিচলন দ্বারা এই সাদৃশ্য পরিমাণ ধরা পড়ে। যন্ত্রের সাহায্যে পরীক্ষা করিয়া অধ্যাপক বহু দেখাইয়াছেন, জড়পদার্থের এই আঘাতজনিত সাদৃশ্য ও প্রকৃতিশাস্ত্রের তরঙ্গরেখার সহিত বায়ু-মাংসপেশীর তরঙ্গ-রেখার অভ্যন্তর সাদৃশ্য আছে।

ধাতুপদার্থে ঘন ঘন ভাঙনা করিলে যে তরঙ্গরেখা পাওয়া যায়, তাহা বস্তু—সেই ভাঙনা আরো দ্রুত করিলে তরঙ্গরেখা নিরন্তর ক্ষীণ হইয়া ধূসরতারের অবস্থা প্রকাশ করে। দীর্ঘতাপের মাগী অধিক হইলে ধাতুপদার্থে আড়টতা জন্মে এবং বিশেষ উত্তাপে তাহার সাদৃশ্য সর্বাপেক্ষা বিকাশ পায়,—ধাতুতারের মধ্যে বিশেষ দ্রব্য প্রয়োগ করিলে তাহার সাদৃশ্য প্রবলতা বহুমাত্রার মত আশ্চর্য বাড়িয়া উঠে,

আবার দ্রব্যবিশেষে অবসাদের লক্ষণ আন-
য়ন করে, আবার কোন কোন দ্রব্য বিবেক
মত কাজ করে। কোন কোন দ্রব্য ধাতু-
পদার্থের পক্ষে বিশেষ মাত্রায় উত্তেজক
এবং মাত্রাসত্ত্বে অবসাদক; আবার ইহাও
দেখা গিয়াছে, সময়মত ঔষধ দিতে পারিলে
বিষপ্রয়োগের প্রতিকার করা যায়।

এইরূপ নানা আঘাত-অপঘাতে ধাতু-
দ্রব্যে যে ক্রিয়া উৎপন্ন হয়, তাহার তরঙ্গ-
চিত্র জৈবতরঙ্গের এতই মূল্য যে, দেহবিদগুণ
উক্ত চিত্রকে পৃথক্ করিয়া নির্দেশ করিতে
পারেন না।

এই গেল আঘাতজনিত সাদৃশ্য। আলোক-
জনিত সাদৃশ্যেও অধ্যাপক মহাশয়
পরীক্ষা করিয়া সমর্থন পাইয়াছেন। তিনি
একটি কৃত্রিম চক্ষু নিৰ্ম্মাণ করিয়াছেন;
যে সকল রশ্মি সবধে আমাদের চক্ষু অসাড়,
তাহার কৃত্রিম চক্ষুতে সে সকল রশ্মিও সাড়।
আপাইয়া থাকে। আলো লাগিলে সজীব
চক্ষু যেমন করিয়া মস্তিষ্কে বেগ প্রেরণ করে,
এই কৃত্রিম চক্ষুর ক্রিয়া ঠিক সেইরূপ।
সুতরাং এই আবিষ্কারের ফলে দর্শনক্রিয়া
বাপারট দেহবিদ্যার কোঠা হইতে পদার্থ
বিদ্যার কোঠায় আসিয়া পড়িতে পারে।
এই কৃত্রিম চক্ষুর আবিষ্কারে বর্তমান ভার-
তীয় টেলিগ্রাফী ও ঐণরিক বার্তাবহন-
প্রণালী উলটপালট করিয়া দিবে।

তিন শত্রু ।

কথার বলে, “তিন শত্রু দিতে নাই।” কিন্তু এমনি আমাদের গোড়াকপাল বে, ভারতের ভাগ্যদেবতা জীবজন্তুও তিন তিন জন বৈরী আমাদের স্বর্কে চাপাইয়া বিয়াছেন। তাঁহাদের একোপে আমাদের জাতীয়জীবন-লীলার শেষ পালা সমাপ্ত প্রায়। যেমন অ্যাম্পশনের তিথিগুলি একে একে ভাল, কিন্তু সংস্পর্শবশতঃ গড়ে বন্ধ হইয়া পড়ায়, তেমনি তাঁহারা দেশকালভেদে নিজে নিজে ভাল হইলেও সংশ্লগ্ন-সংঘর্ষ-হেতু মারাত্মক হইয়া পড়িয়াছেন। তাঁরা কারা ?

প্রথম।—প্ৰথাভিমাত্রী ‘হিন্দু’-‘হিন্দু’-রূপ-নির্বোধকারী গোড়ার দল। তাঁহাদের নিকটে সনাতনে ও নূতনে, আর্যে ও অনার্যে, ভগবদ্গীতার ও মন্দা-পেটের গতে কোন প্রভেদ নাই। অমুই পুঙ্খনে সংস্কৃতভাষার দেখা হইলেই, তাহাতে ঘাহাই থাকুক না কেন—আচার, অনাচার, বামাচার—তাঁহা বেধ। বেধগাথা যদিও ইহাদের কর্কসূত্রে কখনও প্রবেশ করে নাই, তথাপি ইহারা নপথ করিয়া বলিতে পারেন যে, বেধে বাস্বান ও ব্যোমধানের কথা উল্লিখিত আছে—মহিলে রেলগাড়ি চড়িয়া তাঁহারা স্বেচ্ছবিজ্ঞানকে প্রায় বিকেনে না। একজন মহাশয়ের নিন্দা করিয়া বলিয়াছিল—“কোন গুণ নাই তাঁর কপালে আগুন।” ভোগানাপ মহেশ ধৃতুরার ঘোরে এ নিন্দাবাদকে স্তুতি বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিলেন। ‘কোন গুণ নাই’ অর্থাৎ

বেধাত্তবেদ্য নিগুণ ব্রহ্ম, আর ‘কপালে আগুন’ ত দিবের বিশেষ বৈভব। গোড়া মহোদয়েরা তেমনি যুগেপগৌরবের নেপার আমার নিন্দাকে স্তুতি বলিয়া গ্রহণ করিলে, আমাকে ধস্ত মনে করিব। তাঁহারা এক কথা জানেন, আর কিছুই জানেন না, শোনেন না। ‘হিন্দু’ ‘হিন্দু’ এই তাঁহাদের বুলি। বর্শনবিজ্ঞানশিল্পবাগিরো হিন্দুজাতি উৎকর্ষের চূড়ার আরোহণ করিয়াছিল। যুরোপীয়েরা তলদেশে বসিয়া গায়ের ভোরে কেবল আচ্ছাদন করে। হিন্দুর সবই ভাল। শাস ও ভাল, খোসা ও ভাল, তরুল ও ভাল, তুহ ও ভাল। আহা! গোড়ামির এই ত প্রকৃত লক্ষণ।

“সকটক কই মাছ করয়ে ভক্ষণ।

গোড়ামির এই ভূমি জানিও লক্ষণ ॥”

এখন ইহাদের গলায় কাটা বিধিয়া কোন্ দিন না প্রাণটা যায়। এই গোড়ারাই যেশের গোড়ার শত্রু।

দ্বিতীয়।—ইংরাজি-বিশিষ্ট হিন্দু-মতধারী স্বামপক্ষিতকীয় দল। ইহাদের যে পাঠ পড়াও, সেই পাঠই পড়েন। “স্বাধিকার” বলাও, তা-ও বলেন, “কালীকল্পভঙ্গ” ভজাও, তা-ও ভজেন। ইংরাজি সভ্যতার প্রথমাংগে যেভাষা শুদ্ধবেদেবা শিখাইয়াছিলেন যে, হিন্দুরা তিরকালেই ইষ্টককান্ত পূজা করিয়া আসিতেছে—ঈশ্বর বলিয়া কোন বস্তু তাহারা জানিতও না, জানেও না। অমনি ‘উদাস’

বলিয়া ছাটুকোটুধুগ চুড়াখড়া পরিধান করিয়া কাটাচামচ বাজাইয়া সাহেবী পদ্ম তাঁহার্য গ্রহণ করিয়াছিলেন। আবার আজ সেই খেতাবসেবেরা শিখাইয়াছেন যে, হিন্দুরা অধ্যাত্মদর্শনের অত্যাশুপথেরে উঠিয়াছিলেন, কিন্তু ব্যবহারবিদ্যায় তাহার্য বড় একটা মন দিতেন না। ধর্মমতে হিন্দু হওয়া চাই, কিন্তু যেখানে রাজনীতি, সমাজনীতি, শাসা, মৈত্রী, স্বাধীনতার ব্যাপার, সেখানে যুরোপীয় হওয়াই উচিত। যুরোপীয়েরা অধ্যাত্মদর্শনের বড় একটা ধার ধারে না। কিন্তু বিজ্ঞানবাণিজ্যবিদ্যায় তাহার্য জগৎগুরু। হিন্দুরা ‘জগৎ মিথ্যা’ এই পরমার্থতত্ত্ব বুঝিয়াছিল, তাই পার্থিব ব্যাপারে তাহার্য বড় উদাসীন। ইহার প্রমাণ কি? দেখ আমরা এমনি আধ্যাত্মিক যে লড়াই করিনা এবং করিতে আমাদের প্রবৃত্তিও হয় না। আমরা কেমন শাস্ত্র ও সমাহিত, ঠিঠ, ধীর, অলস-গতি! আর যুরোপীয়েরা কিছুতেই সম্মত নয়—একমালের পথকে একদিনের করে, সমুদ্রগমন করে, অভ্যন্তরীণরিক স্তেজ করে—কেবল উদ্যমশীলতা ও বাহুতা! ভীকতা ও আলস্য কি আধ্যাত্মিকতার পরিচায়ক নহে? যেমনি প্রতীত্য বুধগণ এই কথা প্রচার করিলেন, অমনি ইংরাজি-নবিশ সংস্কারকেরা তার-বরে বলিয়া উঠিলেন, “সত্য বচন!” “সত্য বচন!!” আমরা ধর্মে হিন্দু—অর্থাৎ পরমার্থ-বিষয়ে কোন সমামত রাখিনা—কিন্তু পার্থিব-বিষয়ে আমরা যুরোপকে আদর্শ করিব। এই ইংরাজিশিক্ষিত সমাজগণি যথেষ্টা-চারী—না গলচর, না কলচর। উভচর কি?

তৃতীয়।—সমগ্রবাবীর দল। এঁরা খোড়াভাড়া দিয়া একীভূত করেন। আমরা দেহও কিছু আছে, ওদেহও কিছু আছে, সকলেরই কি কিং কি কিং আছে। এই বিকীর্ণ ‘কি কিং’ গুলা জড় করিয়া একটা তুণ বাধিলে পূর্ণাবয়ব সঙ্গীপীন সত্য লাভ করা যায়। হিন্দুরা বলে, জগৎ অলীক, ব্রহ্মই একমাত্র সত্য বস্তু। আর হারবার্ট স্পেন্সর বলেন, জগৎই একমাত্র সত্য, ব্রহ্ম বলিয়া কোন পদার্থ আছে কি না, জানা যায় না। এস, ধর্ম ও বিজ্ঞানকে মিলাইয়া নাও এবং পূর্ণসত্য গ্রহণ কর। ব্রহ্ম সংপদার্থ বটে, কিন্তু একাকী নহে। পাঁচটা ভূতও সং ও তাঁর চিরদলী। আমরা বড় ধ্যান করিতে ভালবাসি, সদাই ত্রিমিতলোচন, আর যুরোপীয়েরা কেবল দোড়কাপ করে; এস আমরাও দোড়াই, কিন্তু চক্ষু মুদ্রিয়া। হিন্দুরা ঈশ্বরপরায়ণ, আর স্নেহেরা সংসার-জরু; যদি পূর্ণতা লাভ করিতে চাই, তবে ঈশ্বর ও সংসার, দুই সমানমাত্রায় বজায় রাখ। আমরা কদলীপত্রে ভোজন করি, আর সাহেবেরা টেবিলে খায়; এস আমরা টেবিলে কলাপাতা বিছাইয়া খাই। সকলেরই মন রাখা উচিত, কাহাকেও ছোট-বড় করা ভাল নয়। দুই জমিদার সমান ঘুঘু বেওয়ারে কোন এক ন্যায়বান্ মুলেক রাখ দিয়াছিলেন—এক পকের অর্ধেক ডিক্রী অর্ধেক ডিসমিস্, অপর পকেরও অর্ধেক ডিক্রী অর্ধেক ডিসমিস্। পুরাতন সত্যতা উপহার লইয়া উপস্থিত, নূতনও ভেট পাঠাইয়াছে; এখন কাহাকে ছাড়ি, কাহাকে কেলি। হ’বনেরই কি কিং কি কিং লইয়া একটা

পূরা সভ্যতা গঠন করা চাই। তুফান হই-
তেছে। মুসলমান যাকী আল্লাহ কোহাই
ছিল, আর পৌত্তলিক হিন্দু আরোহীরা ‘হুর্গা’
‘হুর্গা’ বলিল। বড় আল্লাও মানিল না,
হুর্গাও মানিল না। ইহা বেবিয়া ইংরাজি-
সংস্কৃত-পড়া একজন বাবু “হুর্গা আল্লা”
“হুর্গা আল্লা” বলিতে আরম্ভ করিল। এই
সময়ের প্রভাবে নৌকা ভরাডুবি হইল, কি
ঘাটে পড়ছিল, তাহা জানা যায় নাই। কিন্তু
ইহা জানা সিদ্ধান্তে যে, আমাদের উদার
সমস্রবাসী ভ্রাতৃগণ ও কার-ববন্ম-হালেসুগা-
আমেন-সংমিশ্রিত একটা মহ প্রস্তুত করিতে
প্রতী হইরাছেন,—নাহার প্রভাবে বদেশ-
নৌকাটি সহজেই তবনবাঁ উত্তীর্ণ হইবে।
এই মহ প্রণেতাগাই প্রতিষ্ঠাবিহীন, সর্বনানী
সংস্কারক ।

ইতিহাসপাঠে জানা যায় যে, তিনপ্রকার
উদারতা তিনটি প্রাচীন জাতির মধ্যে প্রস্তুত
হইরাছিল। হুনানী বা গ্রীক সদৃশপ্রিয়তা,
রোমক বিন্দুশ্রোগণীয়তা ও হিন্দুসমগ্র-
প্রতিষ্ঠা।

গ্রীকেরা সকল মতের ও ভাবের অঙ্গমান,
বিন্দুশ্র অংশ ভাগ করিয়া সমান, সদৃশ
অংশ গ্রহণ করিত। তাহাদের নৈসর্গিক
গুণসকল ভিন্নজাতির সদৃশগুণের সহিত
মিশ্রিয়া ছুটিয়া উঠিয়াছিল। গ্রীকদর্শনকার-
গণ অগতে বিকশিত দেবদেব ও মনুষ্যদেব
সাধারণত্বমি অধিকার করিতে যত্ন করি-
তেন।

রোমীয়েরা বিন্দুশ্র পদার্থের একীকরণে
পটু ছিল। কোন দেশে রোমের অঙ্গপতাকা
উত্তীর্ণ হইবামাত্র বন্দীদের সতিত তৎকালিক

দেবতারারো রোমে চালান হইত। রোম-
বাসীদের বিদেশীয় দেবদেবীর প্রতি বিজা-
তীর ঘৃণা ছিল না। তাহাদের সম্মেলন
করা বড় ভাল লাগিত। মিনুক আর না
মিনুক, সংখ্যা ও আড়িবরের বৃদ্ধি হইলেই
তৃপ্তি হইত। তাহাদের দেবতাদের তালিকা
রঙবেরঙের তালি দেওয়া আউলকিয়দের
আত্তরাখার মত। এইরূপ উদারতার
বিন্দুশ্রের নিগন হয় বটে, কিন্তু প্রীসৌচ্য
হয় না।

হিন্দু উদারতা প্রতিষ্ঠাবিশিষ্ট। একটা
মূলতত্ত্ব তাহারা গ্রহণ করে এবং পরে
সেই মূলতত্ত্বকে পরিপুষ্ট করিবার নিমিত্ত
অন্যান্য মতের দ্বারা অলুপ্তকৃত করিয়া
থাকে। গীতাশাস্ত্র ঐ প্রতিষ্ঠামূলক উদা-
রতার স্মরণে প্ৰস্তুতগণ। বেদান্তের সার
তত্ত্ব—এক বই ছই বহু পরমার্থতঃ হইতে
পারে না—ইহাই গীতার মৌলিক-শিক্ষা।
কিন্তু বহুবাদি-নাংখ্যাদর্শন, দৈতবাদি-ভক্তি-
শাস্ত্র, কঠোর বোগসাধন—সমস্তই সেই সার-
তত্ত্বে প্রথিত হইরাছে। গীতা কারুকার্য-
খচিত স্বর্ণধানের ন্যায়। ছইটি মিলাইয়া
এক করা হয় নাই, কিন্তু একেরই ঐশ্বর্য্য-
বৈতব বৃদ্ধি করিয়া ভিন্ন ভিন্ন দর্শনের বিরোধে
মিটান হইরাছে। গ্রীকেরা বিভিন্ন মতের
ভিত্তর হইতে সাধারণ ভাবটি গ্রহণ করে,
রোমীয়েরা অঙ্গমানকে পার্থীপার্থী বদাইয়া
ঐক্যস্থাপন করে। কিন্তু হিন্দুরা একটি মৌলিক
বেশকালাতীত সত্যে প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া
অন্যান্য সার কথা সেই মূলের দ্বারা চালিয়া
গ্রহণ করে। আমার একটি নৈসর্গিক স্মরণ
আছে। বেহাগা বা এদ্রাজের স্মরণের

সহিত আমার মূর মিশাইয়া মিষ্টতা ও বল বৃদ্ধি করি; কিন্তু পাচটা যন্ত্রের সংযোগে আমার মূর প্রস্তুত করি না। হিন্দু গ্রহণ করে, সংযোগ করে, কিন্তু নিজের প্রতিষ্ঠা বা ভিত্তি ছাড়ে না। এই একনিষ্ঠ উদারতা হিন্দুজাতির বিশেষ গুণ। আজ হিন্দু-সম্মানেরা সেই একনিষ্ঠতা—সেই উদারতা হারাইয়া, তেজোহীন ও অপ্রতিষ্ঠ হইয়াছে।

একজন ‘হিন্দু’ শব্দের অর্থ করিয়াছে—“হীন” ও “দূষণপাতক”। বাস্তবিকই হিন্দু-হানের হীনতার অবধি নাই। হিন্দু নিঃসব হইয়াছে। এই দুর্দশার প্রতীকার আবশ্যক। পশ্চাতে হটরা যাওয়া যায় না এবং গাড়াইয়া থাকার প্রেরণার নহে। অগ্রসর হইতেই হইবে। এখন কোন্ প্রণালীতে আমাদের গতিবিধি নিয়মিত করা উচিত।

প্রথমে আত্মমর্যাদাভ্রান্ত আশঙ্ক। আমাদের কিছু আছে, আমরা অসার নহি, এইরূপ বোধ হওয়া চাই। অধ্যাত্মদর্শনের দিকে দৃষ্টিপাত করিলে বুঝা যায়, বেদান্ত-শাস্ত্র এক অপূর্ণ, অপরিবর্তনীয় তবকথা হিন্দুজাতিকে ওনাইয়াছে। কিন্তু পান্ডাত্য দর্শনগবেষণা যদি গ্রহণ না করি, তাহা হইলে সেই বেদান্ততত্ত্ব পরিপুষ্ট ও কার্য্যকারী হইবে না। যুরোপে অধ্যাত্ম-দর্শন নাই—ইহা এক ধোর প্রবাদ। প্লাটোজনের (Plato) মত আত্মদর্শী করজ্ঞান জন্মিয়াছে? কান্ট (Kant) ও হেগেলের ন্যায় অদৃষ্টদর্শী অতি বিয়ল। যদি আমরা দর্শনবিদ্যা অগ্রসর হইতে চাই, তাহা হইলে প্রতীচ্যদর্শনকে শিরোধার্য্য করিতে হইবে।

কিন্তু আদান করিতে গিয়া যেন বেদান্তভ্রষ্ট হইয়া না যাই। বেদান্ত হিন্দুর প্রতিষ্ঠাপ্রাণী তিরকালই থাকিবে। কিন্তু জন্মদর্শনের সহিত সংস্পর্শ ঘটাইয়া তাহাকে বিকশিত ও ক্ষুদ্রীকৃত করিতে হইবে। বাহ্যারা বলেন, বেদান্ত ত্রয়ের লক্ষণসম্বন্ধে আংশিক সত্য বলিয়াছে এবং জন্মদর্শনসম্বন্ধে আংশিক কথা বলিয়াছে—ভ্রষ্টা মিশাইয়া পূর্ণ করিয়া লইতে হইবে—, তাহারা সত্য যে কি বস্তু তাহার আভাস পর্য্যন্ত বোধ হয় দেখেন নাই। আর বাহ্যারা, খেদায়েই সব আছে, স্নেহদ্বিসেকে ঘরে ঢুকাইবার কোন আবশ্যক নাই, এইরূপ বিবেচনা করেন, তাহারা সংস্পর্শজনিত-ক্রমবিকাশবিধি কাহাকে বলে, তাহা জানেন না।

সমাজসংস্কারবিষয়ে এইরূপ আমাদের নিজের ভিত্তির উপর দাড়ান উচিত। বর্ণপ্রমথদ্বয় সেই ভিত্তি। বর্ণপ্রমথদ্বয় বলিলে কেহ যেন বর্তমান কণ্ঠভ্রষ্ট শতবিভাগপূর্ণ সামাজিকতা মনে না করেন। যুরোপ হইতে আমরা স্বাধীনতা, বৈতন্য, সাম্য, গ্রহণ করিব, কিন্তু বর্ণপ্রমথদ্বয়কে নষ্ট হইতে দিব না। ঐ সমস্ত যুরোপীয় প্রথা বর্ণধর্ম্মের উত্তর প্রতি-ষ্ঠিত হইলে ফলকরী হইবে, নহিলে বিষফল ফলিবে।

রাজনৈতিক সংস্কার সম্বন্ধেও ঐরূপ প্রণালী। জাতীয় মহাসভার নেতারা মনে করেন যে, আমাদের রাজনীতি কিছুই ছিল না। যুরোপ হইতে ইহার আমদানি করা আবশ্যক। ইংলণ্ডে যেমন লোকের ভোটার উপর রাজ্যশাসন নিভর করে, সেইরূপ আমরাও এ দেশে ভোট চালাইব। কিন্তু

অবহিত হইয়া দেখিলে বুঝা যায় যে, ইংরাজের রাজতন্ত্র অর্থোপস্থিতিসাপেক্ষ। ব্যবসায়ী বণিকেরা রাজাকে অর্থের লাভ বা হানি যেখানেই বুঝিগ্রহণ করিতে বাধ্য করিতে পারে। কোন বিধান বা ব্যবস্থা ধনাগ্নয়ের সহায় না হইলে একেবারে পরিত্যক্ত হয়। ইংলণ্ডের রাজশক্তি তদ্ব্যবহার ও সুপ্রাণীবি-বিসের অর্থলাভসার দ্বারা চালিত। ইহা ভাল কি মন্দ, তাহা বলিতে চাহি না; কিন্তু আমাদের দেশের রাজনীতি যদি অর্থকরী হয়, তাহা হইলে আমাদের দুর্দশার আর সীমা থাকিবে না। যাহার খন আছে, যে রাজস্ব দিতে পারে, সেই ভোক্তার অধিকারী এবং সেই অর্থগত ভোক্তার উপর হিন্দুত্বানের রাজতন্ত্র স্থাপিত হইলে, বড়ই এক গোলযোগ বাধিবে। হিন্দুর রাজ্যশাসনপ্রথা সম্পূর্ণ বিভিন্ন। অস্পৃহীত কঠোর এবং বণিক-সম্প্রদায়ের উপর রাজার শক্তি বা শাসনবিধি প্রতিষ্ঠিত ছিল না। যাহারা জানী অথচ অর্থহীন, বাহ্যিক অঙ্গসঞ্চালন করিতেন না,

ক্রয়-বিক্রয়ের অপেক্ষা রাখিতেন না, এই-রূপ সম্প্রদায়ই রাজনৈতিক-শাসনপ্রণালীর ব্যবস্থা করিতেন। তাহাদের অধিকার ভোট হইতে উদ্ধৃত হইত না বা ভোটে বিনষ্ট হইত না। জ্ঞান, বুদ্ধি ও বৈরাগ্যের উপর ঐ শাসনবিধাতৃগণের ক্ষমতা প্রতিষ্ঠিত ছিল। বলপূর্ণ নৃপতি ও অর্থলোলুপ বৈত্র ঐ সুধীত্বদের দ্বারা পরিচালিত হইত। এই পুরাতন হিন্দু শাসনপ্রণালী সুপ্রাণী প্রণালী অপেক্ষা ভাল কি মন্দ, তাহা আপাততঃ বিচার করিবার আবশ্যক নাই। তবে ইহা নিশ্চয় যে, যদি আমরা জাতীয়তাবাদ হইতে না চাহি, তাহা হইলে আর্থিক-নীতি প্রথাকেই আমাদের নতুন রাজতন্ত্রের ভিত্তি করিতে হইবে। তাহার উপর যত ইচ্ছা ভোট চড়াও, ক্ষতি হইবে না।

দ্বিতীয়, সমাজনীতি ও রাজনীতি বিষয়ে কিরূপে আত্মবিশ্বাস রাখিবার উদ্যোগে প্রতীচ্য আদর্শমূলক গ্রহণ করিতে হইবে, তাহার সুবিস্তৃত আলোচনা আবশ্যক।

শ্রীঅজিতবাবু উপাধ্যায় ।

চোথের বালি ।

(১১)

আশার পক্ষে মঙ্গিনীর বড় দরকার হইয়াছিল। তদ্ভাবাপার উৎসবও কেবলমাত্র হুঁচি লোকের দ্বারা সম্পন্ন হয় না—স্বখ-লাপের মিষ্টার বিতরণের দ্রুত বাজে লোকের দরকার হয়।

ক্ষুধিতদমরা বিনোদিনীও, নববধূর নবপ্রেমের ইতিহাস, মাতালের আলস্যর মনের মত কান পাতিয়া পান করিতে লাগিল। তাহার মস্তক মাতিয়া শরীরের রক্ত অগ্নিয়া উঠিল।

নিশ্চক্ৰ মধ্যাহ্নে না এখন ঘুমাইতেছেন, দাসদাসীরা এক কলার বিশ্রামশালায় অদৃষ্ট, যথেষ্ট বিচারাঙ্গর তড়নায় কণকালের দ্রুত কালেজে গেছে এবং ত্রৌহুতপু নীলিমার শেষ প্রান্ত হইতে চীলের তীব্রকণ্ঠ অভিক্ষীণ স্বরে কবচিৎ জনা ঘাইতেছে, তখন নির্জন শয়নগৃহে নীচের বিছানার বালিশের উপর আশা তাহার খোলা চুল ছড়াইয়া গুইত এবং বিনোদিনী বুকের নীচে বালিশ টানিয়া উপুড় হইয়া গুইয়া গুন্‌গুন্‌-গুজরিত কাহিনীর মধ্যে আবিষ্ট হইয়া রহিত,—তাহার কর্ণমূল আরক্ত হইয়া উঠিত, নিশ্বাস বেগে প্রবাহিত হইতে থাকিত।

বিনোদিনী প্রশ্ন করিয়া করিয়া তুচ্ছতম কথাটি পর্য্যন্ত বাহির করিত, এক কথা ধারবার করিয়া তনিত, ঘটনা নিঃশেষ হইয়া গেলে কল্পনার অপসারণ করিত—কহিত,

‘আচ্ছা ভাই, যদি এমন হইত ত কি হইত, যদি এমন হইত ত কি করিতে?’ সেই সকল অসম্ভাবিত কল্পনার পথে স্থখাশোচনাকে সুদীর্ঘ করিয়া টানিয়া লইয়া চলিতে আশারও ভাল লাগিত।

বিনোদিনী কহিত, “আচ্ছা ভাই চোথের বালি, তোম সঙ্গে যদি বিহারিবাবুর বিবাহ হইত!”

আশা। না ভাই, ও কথা তুমি বলিয়া না—ছি ছি, আমার বড় লজ্জা করে! কিন্তু তোমার সঙ্গে হইলে বেশ হইত, তোমার সঙ্গে ও ত কথা হইয়াছিল।

বিনোদিনী। আমার সঙ্গে ত! চেতু লোকের চের কথা হইয়াছিল। না হইয়াছে, বেশ হইয়াছে—আমি যা আছি, বেশ আছি!

আশা তাহার প্রতিবাদ করে। বিনোদিনীর অবস্থা যে তাহার অবস্থার চেয়ে ভাল, এ কথা সে কেমন করিয়া স্বীকার করিবে! —“একবার মনে করিয়া বেশ দেখি ভাই বালি, যদি আমার স্বামীর সঙ্গে তোমার বিবাহ হইয়া ঘাইত! আর একটু হলেই ত হইত!”

তা’ত হইতই! না হইল কেন? আশার এই বিছানা, এই ঘাট ত একদিন তাহারই দ্বন্দ্ব অপেক্ষা করিয়াছিল। বিনোদিনী এই সুসজ্জিত শয়নঘরের দিকে চায়, আর সে কথা কিছুতেই ভুলিতে পারে না। এ বরে

আমি সে অভিধানে—আজ বান পাইয়াছে,
কাল আবার উঠিয়া যাইতে হইবে !

অপরূপে বিনোদিনী নিজে উল্লসাগী
হইয়া অপকণ্ঠ নৈশুণ্যের সহিত আশার চুল
বাঁধিয়া সাঝাইয়া তাহাকে স্বামি-সন্নিগ্ধনে
পাঠাইয়া দিত। তাহার কল্পনা যেন অব-
তলিত হইয়া এই সঙ্কিতা বধুর পক্ষাৎ
পক্ষাৎ বৃত্ত বৃক্কের অভিসারে ঘনহীন কক্ষে
গমন করিত। আবার এক এক দিন
কিছুতেই আশাকে ছাড়িয়া দিত না।
বলিত, “আঃ, আর একটু বোসই না !
তোমার স্বামী ত পানাহেতেন না !
‘তিনি ত বনের মাঝখান, তিনি অগ্নির
পোষা হরিণ!’—এই বলিয়া নামা ছলে
ধরিয়া রাখিয়া দেবী করাইবার চেষ্টা
করিত !

মহেশ্বর অত্যন্ত রাগ করিয়া বলিত—
“তোমার স্বামী যে নড়িবার নাম করেন না—
তিনি বাড়ী কিরিবেন কবে ?”

আশা বাগ্র হইয়া বলিত—“না, তুমি
আমার চোখের বাণির উপর রাগ করিয়ো
না। তুমি ধ্যান না, সে তোমার কথা
তনিতে কত ভালবাসে—কত বহু করিয়া
সাঝাইয়া আমাকে তোমার কাছে পাঠাইয়া
সেই !”

রাজলক্ষ্মী আশাকে কাজ করিতে
বিতেন না। বিনোদিনী বধুর পক্ষ-লইয়া
তাহাকে কাছে প্রবৃত্ত করাইয়া প্রায় সমস্ত-
দিনই বিনোদিনীর কাছে আশা নাই,
সেই সঙ্গে আশাকেও সে আর ছুটি দিতে
চায় না। বিনোদিনী পরে পরে এমন
কালের সূচন বানাইতেছিল যে, তাহার

মধ্যে ফাঁক পাওয়া আশার পক্ষে তাম্রি-
কঠিন হইয়া উঠিল। আশার স্বামী ছায়ে
উপরকার শূন্যতার কোণে বসিয়া আক্ষেপে
ছট্‌ছট্‌ করিতেছে, টহা করনা করিয়া
বিনোদিনী মনে মনে তীব্র কঠিন হাসি
হাসিত। আশা উদ্বিগ্ন হইয়া বলিত, “এবার
বাই ভাই চোখের বাণি, তিনি আমার রাগ
করিবেন।”

বিনোদিনী তাড়াতাড়ি বলিত—“হোস,
এইটুই পথ করিয়া যাও ! আর বেগে দেবী
হইবে না !”

খানিক বাদে আশা আবার ছট্‌ছট্‌
করিয়া বলিয়া উঠিত—“না ভাই, এবার
তিনি সত্যসত্যই রাগ করিবেন—আমাকে
ছাড়—আমি যাও !”

বিনোদিনী বলিত—“আহা একটু রাগ
করিলই বা ! সোহাগের সঙ্গে রাগ না
মিশিলে ভালবাসার স্বাদ থাকে না—তর-
কাতীতে লঙ্কামরিচের মত !”

কিন্তু লঙ্কামরিচের স্বাদটা যে কি, তাহা
বিনোদিনীই বুঝিতেছিল—কেবল সঙ্গে
তাহার ভরকারী ছিল না। তাহার শিরায়
শিরায় যেন আকণ্ঠ ধরিয়া গেল। সে
যে দিকে চায়, তাহার চোখে যেন
ফুলিলবর্ণ হইতে থাকে ! “এমন সুখের
ধরকরা—এমন সোহাগের স্বামী ! এ
ধরকে যে আমি রাক্ষস রাক্ষস, এ
স্বামীকে যে আমি পাথের দান করিয়া
রাখিতে পারিতাম ! তখন কি এ ধর
এই বশা, এ মাহুকের এই ‘ছিরি’
থাকিত ! আমার জায়গায় কি না এট কচি-
গুড়ী, এই খেণ্ডার পুতুল !” আশার গলা

জড়াইয়া) “তাই চোপের বালি, বল না
তাই, কাল তোমাদের কি কথা হইল
তাই? আমি তোমাকে বাহা শিখাইয়া
বিস্মাহিলাম, তাহা খলিয়াছিলে? তোমাদের
তালিবাগার কথা শুনিলে আমার ক্ষুধাতৃষ্ণা
থাকে না তাই!”

(১২)

মহেন্দ্র একদিন বিরক্ত হইয়া তাহার মাকে
ডাকিয়া কহিল—“এ কি ভাল হইতেছে?
পরের পরের সুবতী বিধবাকে আনিয়া
একটা দায় ঘাড়ুে করিবার দরকার কি?
আমার ত ইহাতে মত নাই—কি জানি,
কখন কি দষ্ট ঘটতে পারে!”

রাজলক্ষী কহিলেন, “ও যে আমাদের
বিপিনের বউ, উহাকে আমি ত পর মনে
করি না!”

মহেন্দ্র কহিল—“না ম! ভাল হইতেছে
না। আগার মতে উহাকে রাখা উচিত
হয় না!”

রাজলক্ষী বেশ ভানিতেন, মহেন্দ্রের মত
অগ্রাহ্য করা সচল নহে। তিনি বিহারীকে
ডাকিয়া কহিলেন, “ও বিহারী, তুই একবার
মহীন্দ্রকে বুঝাইয়া বল! বিপিনের বৌ আছে
বলিয়াই এই বৃদ্ধ বয়সে আমি একটু বিজ্ঞান
করিতে পাই। পর হউক বা হউক, আপন
লোকের কাজ হটতে এমন সেবা ত কখনো
পাই নাই!”

বিহারী রাজলক্ষীকে কোন উত্তর না
করিয়া মহেন্দ্রের কাছে গেল—কহিল,
“মহীন্দ্র দা, বিনোদিনীর কথা কিছু ভাবি-
তেছ?”

মহেন্দ্র হাসিয়া কহিল—“ভাবিয়া রাগে

ঘুষ হয় না। তোমার বোঠা'থাকে জিজ্ঞাসা
কর না, আজকাল বিনোদিনীর ধ্যানে
আমার আর সকল ধ্যানই ভঙ্গ হইয়াছে।”

আশা ঘোমটার ভিতর হইতে মহেন্দ্রকে
নীরবে তর্জন করিল!

বিহারী কহিল—“বল কি! বিতীর বিধ-
বৃক!”

মহেন্দ্র। ঠিক তাই! এখন উহাকে
বিদায় করিবার জন্য চুনী হটকটু করি-
তেছে।

ঘোমটার ভিতর হটতে আশার ছই চকু
আবার ভৎসনা বর্ষণ করিল।

বিহারী কহিল—“বিদায় করিলেও
কিরিতে কতকণ? বিধবার বিবাহ দিয়া
দাও—বিবাহিত একেবারে ভাঙিবে।”

মহেন্দ্র। কুলরও ত বিবাহ দেওয়া
হইয়াছিল!

বিহারী কহিল—“পাক, ও উপমাটা
এখন রাখ! বিনোদিনীর কথা আমি মাঝে
মাঝে ভাবি। তোমার এখানে উনি ত
চিরদিন থাকিতে পারেন না। তাহার পরে
যে বন দেখিয়া অসিয়াছি, সেখানে
উহাকে বাবস্তীবন বনবাসে পাঠানো, সেও
বড় কঠিন দণ্ড।”

মহেন্দ্রের সম্মুখে এ পর্যন্ত বিনোদিনী
বাহির হয় নাই, কিন্তু বিহারী তাহাকে
দেখিয়াছে। বিহারী এটুকু বুঝিয়াছে, এ
নারী জুড়লে ফেলিয়া রাখিবার নহে। কিন্তু
নিশা এক ভাবে বরের প্রদীপরূপে জলে,
আর এক ভাবে বরে আগুন ধরাইয়া ধের—
সে আশঙ্কাও বিহারীর মনে ছিল।

মহেন্দ্র বিহারীকে এই কথা লইয়া

অনেক পরিহাস করিল। বিহারীও তাহার জবাব দিল। কিন্তু তাহার মন স্থির নাছিল, এ নারী খেলা করিবার নহে, "ইহাকে উপেক্ষা করাও যার না।

রাজলক্ষ্মী বিনোদিনীকে সাবধান করিয়া মিলেন। কহিলেন, "বেশ বাছা, বোকে লইয়া তুমি অত টানাটানি করিয়ে না! তুমি পাড়াগাঁয়ের গৃহস্থঘরে ছিলে—আজ-কালকার চালচলন জান না। তুমি বুদ্ধিমতী, ভাল করিয়া স্থিরা চণিয়ে।"

ইহার পর বিনোদিনী অত্যন্ত আড়ম্বর-পূর্ব্বক আশাকে দূরে দূরে রাখিল। কহিল— "আমি তাই কে! আমার মত অবস্থার লোক আপন মান বাচাইয়া চণিতে না জানিলে, কোন্ দিন কি বটে, বলা যায় কি!"

আশা মাধমাসি কথাকাটি করিয়া মরে—বিনোদিনী চুপ্‌প্রতিভ। মনের কথার আশা আকণ্ঠ পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল, কিন্তু বিনোদিনী আবণ দিল না।

এদিকে মহেন্দ্রের বাড়িপাশ দিখিল এবং তাহার মৃতদেহ যেন ক্রান্তিতে আবৃত হইয়া আসিতেছে। পূর্বে সে সকল অনি-রম উজ্জ্বলা তাহার কাছে কৌতুকজনক বোধ হইত, এখন তাহা অরে অরে তাহাকে স্তম্ভিত করিতে আরম্ভ করিয়াছে। আশার সাংসারিক অগটুতার সে কণে কণে বিরক্ত হয়, কিন্তু প্রকাশ করিয়া বলে না। প্রকাশ না করিলেও আশা অথরে অস্তরে অহুত্ব করিয়াছে, নিরবচ্ছিন্ন মিলনে প্রেমের মর্ঘ্যমা গ্লান হইয়া গাইতেছে। মহেন্দ্রের সোহাগের মধ্যে বেহুতা লাগিতেছিল,

কতকটা নিপা বাড়াবাড়ি, কতকটা আশ-প্রস্তাষণ।

এ সময়ে পলায়ন ছাড়া পরিণাম নাই, বিচ্ছেদ ছাড়া ভেদ নাই। স্ত্রীলোকের স্বভাবসিদ্ধ সংস্কারবশে আশা আজকাল মহেন্দ্রকে ফেলিয়া গাইবার চেষ্টা করিত। কিন্তু বিনোদিনী ছাড়া তাহার গাইবার স্থান কোথায়?

মহেন্দ্র প্রণয়ের উত্তম বাসরশালায় মধ্যে চক্ষু উন্মীলন করিয়া ধীরে ধীরে সংসারের কাব্যকল্প পড়াশনার প্রতি একটু সমাগ হইয়া পাশ ফিরিল। ডাক্তারি বই-গুলিকে বান। অসম্ভব স্থান হইতে উদ্ধার করিয়া ধূলা ঝাড়িতে লাগিল এবং চাপকান প্যাণ্টলুন করটা রোপে দিবার উপক্রম করিল।

(১৩)

বিনোদিনী যখন নিতান্তই দয়া দিল না, তখন আশার মাথা একটা ফলী আসিল। সে বিনোদিনীকে কহিল, "ভাই বালি, তুমি আমার স্বামীর সমুখে বাহির হও না কেন? পালাইয়া বেড়াও কি মন্ত?"

বিনোদিনী অতি সংক্ষেপে এবং সন্তোষে উত্তর করিল, "ছি ছি!"

আশা কহিল—"কেন? মার কাছে গুলিয়াছি, তুমিও আমাদের পর নও!"

বিনোদিনী গভীরমুখে কহিল—"সংসারে আপন-পর কেহই নাই। যে আপন মনে করে, সেই আপন—যে পর বলিয়া জানে, সে আপন হইলেও পর।

আশা মনে মনে ভাবিল, এ কথা আর উত্তর নাট। বাওঁবকই তাহার স্বামী

বিনোদিনীর প্রতি অত্যাচার করেন, বাস্তবিকই তাহাকে পর ভাবেন এবং তাহার প্রতি অকারণে বিরক্ত হন ।”

সেদিন সন্ধ্যাবেলায় আশা দাবীকে অত্যন্ত আবদার করিয়া ধরিল—“আমার চোখের বালির সঙ্গে তোমাকে আলাপ করিতে হইবে ।”

মহেন্দ্র হাসিয়া কহিল, “তোমার সাহস ত কম নয় !”

আশা বিজ্ঞাসা করিল—“কেন, ভয় কিদের ?”

মহেন্দ্র । তোমার সমীর যে রকম রূপের বর্ণনা কর, সে ত বড় নিরাপত্তা জ্ঞাপনা নয় ।

আশা কহিল—“আচ্ছা, সে আমি সামুলাইতে পারিব। তুমি ঠাট্টা রাখিয়া দাও—তার সঙ্গে আলাপ করিবে কি না বল ।”

বিনোদিনীকে দেখিবে বলিয়া মহেন্দ্রের যে কৌতূহল ছিল না, তাহা নহে । এমন কি, আকাল তাহাকে দেখিবার জন্য মাঝে মাঝে আগ্রহও জন্মে । সেই অনাবশ্যক আগ্রহটা তাহার নিজের কাছে উচিত বলিয়া ঠেকে নাই ।

ছব্বয়ের সম্পর্কসম্বন্ধে মহেন্দ্রের উচিত-অহুতিভের আদর্শ সাধারণের অপেক্ষা কিছু কড়া ! পাছে বাতীর অধিকার লেশমাত্র ক্ষুণ্ণ হয়, এই জন্য ইতিপূর্বে সে বিবাহের ঐশ্বর্য্যমাত্র কানে আনিতে না । আকাল, আশার সহিত সখ্যত্বকে সে এমন ভাবে রক্ষা করিতে চায় যে, অন্য স্ত্রীলোকের প্রতি সামান্য কৌতূহলকেও সে মনে প্তান দিতে চায় না । প্রেমের বিষয়ে সে যে বড়

সুস্থুতে এবং অত্যন্ত গাঢ়, এই লইয়া তাহার মনে একটা দর্শ ছিল । এমন কি, বিহারীকে সে বন্ধ বলিত বলিয়া অন্য কাহাকেও বন্ধ বলিয়া স্বীকার করিতেই চাহিত না । অন্য কেহ যদি তাহার নিকট আকৃষ্ট হইয়া আসিত, তবে মহেন্দ্র যেন তাহাকে গারে পড়িয়া উপেক্ষা দেখাইত, এবং বিহারীর নিকটে সেই হস্তগতাসম্বন্ধে উপহাসভর অবজ্ঞা প্রকাশ করিয়া ইতর-সাধারণের প্রতি নিজেদের একান্ত উদাসীন ঘোষণা করিত । বিহারী ইচ্ছাতে আপত্তি করিলে মহেন্দ্র বলিত—“তুমি পরে বিহারী, দেখানে ঘাও তোমার বঙ্গ অত্যাচার হয় না ; আমি কিন্তু যাকে তাকে বন্ধ বলিয়া টানা-টানি করিহে পারি না ।”

সেই মহেন্দ্রের মন আকাল যখন মাঝে মাঝে অনিবার্য্য বাস্তবতা ও কৌতূহলের সহিত এই অপরিচিতার প্রতি আপনি ধাবিত হইতে থাকিত, তখন সে নিজের আদর্শের কাছে যেন বাট হইয়া পড়িত । অবশেষে বিরক্ত হইয়া বিনোদিনীকে বাটী হইতে বিদায় করিয়া দিবার জন্য সে তাহার মাঝে পীড়াপীড়ি করিতে আরম্ভ করিল ।

মহেন্দ্র কহিল—“পাক্ চুনি ! তোমার চোখের বালির সঙ্গে আলাপ করিবার সময় কই ? পড়িবার সময় ডাক্তারি বই পড়িব, অবকাশের সময় তুমি আছ, ইহার মধ্যে সমীকে কোথায় আনিবে ?”

আশা কহিল—“আচ্ছা তোমার ডাক্তারিতে ভাগ বদাইব না, আমারি অংশ আমি বালিকে দিব ।”

মহেন্দ্র ক'হিল—“তুমি ত দিবে, আমি দিতে দিব কেন ?”

আশা যে বিনোদিনীকে ভালবাসিতে পারে, মহেন্দ্র বলে, ইহাতে তাহার স্বামীর প্রতি প্রেমের স্বর্ষতা প্রতিপন্ন হয়। মহেন্দ্র অকথায় করিষা বলিত, “আমার মত অনন্তনিষ্ঠ প্রেম তোমার নহে।” আশা তাহা কিছুতেই মানিত না,—ইহা লইয়া কলঙ্ক করিত, কাদিত, কিন্তু তর্কে জিতিতে পারিত না।

মহেন্দ্র তাহাদের চাক্ষুশের মাকথানে বিনোদিনীকে সত্যায় পান ছাড়িয়া দিতে চায় না, টহাই তাড়ান গর্পের বিষয় হইয়া উঠিল। মহেন্দ্রের এই গর্প আশার সহ্য হইত না, কিন্তু আশা সে পরভব স্বীকার করিয়া কহিল—“আজ্ঞা বেগ, আমার থাকিয়েই তুমি আমার বাণির সঙ্গে আলাপ কর।”

“আশার নিকটে মহেন্দ্র নিজের ভাল-বাসার চূড়ান্ত ও প্রকট প্রমাণ করিয়া অবশেষে বিনোদিনীর সঙ্গে আলাপ করিবার জন্য অগ্রসরপূর্ণক বাক্সি হইল।—বলিয়া রাখিল, “কিন্তু তাই বলিষা যখন-তখন উৎপাত করিলে বাঁচিব না।”

পরদিন প্রত্যবে বিনোদিনীকে আশা তাহার বিছানায় গিয়া জড়াইয়া বসিল। বিনোদিনী কহিল—“এ কি আশ্চর্য্য! চকোরা যে আজ চাককে ছাড়িয়া যেখের দরবারে ?”

আশা কহিল—“তোমাদের ও সব কবিতার কথা আমার আসে না তাই, কেন বোঝাবেন বুঝা চড়েনো ? যে তোমার

কথার জবাব দিতে পারিবে, একবার তাহার কাছে কথা শোনাও'মে !”

বিনোদিনী কহিল, “সে রমিক লোকটি কে ?”

আশা কহিল—“তোমার দেবর, আমার স্বামী ! না তাই ঠাট্টা নয়—তিনি তোমার সঙ্গে আলাপ করিবার জন্য পীড়াপীড়ি করিতেছেন !”

বিনোদিনী মনে মনে কহিল, “জীৱ হকুমে আমার প্রতি ভালব পড়িয়াছে, আমি অমনি ছুটিয়া যাইব, আমাকে তেমন পাও নাই !”

বিনোদিনী কোনমতেই রাজি হইল না। আশা তখন স্বামীর কাছে বড় অপ্রতিভ হইল।

মহেন্দ্র মনে মনে বড় রাগ করিল। তাহার কাছে বাহির হইতে আপত্তি ! তাহাকে অল্প সাধারণ পুরুষের মত জ্ঞান করা ! আর কেহ হইলে ত এতদিনে অগ্নির হইয়া নানা কোণে বিনোদিনীর সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ আলাপ-পরিচয় করিত। মহেন্দ্র যে তাহার চেষ্টামাত্রও করে নাই, ইহাতেই কি বিনোদিনী তাহার পরিচয় পায় নাই ? বিনোদিনী যদি একবার ভাল করিয়া জানে, তবে অন্য পুরুষ এবং মহেন্দ্রের প্রতিবেদন বুঝিতে পারে !

বিনোদিনীও দু'দিন পূর্বে আক্রোশের সহিত মনে মনে বলিয়াছিল—“এতকাল বাড়ীতে আছি, মহেন্দ্র সে একবার আমাকে দেখিবার চেষ্টাও করে না ! যখন পিসিমার ঘরে থাকি, তখন কোন ছুতা করিয়াও সে মার ঘরে আসে না ! ঐত ওদাদীনা কিসের ?

“আমি কি লড়াইপন্থা? আমি কি মানুষ না? আমি কি স্ত্রীলোক নই? একবার যদি আমার পরিচয় পাইত, তবে আমারে চুনের সঙ্গে বিনোদিনীর প্রেতের বৃত্তিতে পারিত!”

আশা স্বামীর কাছে প্রস্তাব করিল—
“তুমি কালেক্শনে গেল বসিয়া চোখের বাঁলকে আমারে ঘরে আনিব, তাহার পরে বাহির হইতে তুমি হঠাৎ আসিয়া পড়িবে—তা হইলেই সে ভয় হইবে!”

মহেন্দ্র কহিল, “কি অপরাধে তাহাকে এত বড় কঠিন শাসনের আয়োজন?”

আশা কহিল—“না, সত্যই আমার ভারি রোগ হইয়াছে! তোমার সঙ্গে দেখা করিতে ও তার আপত্তি! প্রতিজ্ঞা ভাঙিব, তবে ছাড়িব!”

মহেন্দ্র কহিল, “তোমার প্রিয়বস্ত্র দখল-নাজাবে আমি মরিয়া যাইতেছি না। আমি অমন চুরি করিয়া দেখা করিতে চাই না!”

আশা সাহুনয়ে মহেন্দ্রের হাত ধরিয়া কহিল—“বাতা খাও, একটীবার তোনাকে এক কাজ করিতেই হইবে! একবার বে করিয়া হোক, তাহার গুমর ভাঙিতে চাই, তার পর তোমাদের খেদন ইচ্ছা, তাই করিয়া!”

মহেন্দ্র নিকটর হইয়া রহিল। আশা কহিল, “লক্ষ্মীটি আমার অহরোধে রাখ!”

মহেন্দ্রের আগ্রহ প্রবল হইয়া উঠিতেছিল—সেই জন্য অতিরিক্ত মাত্রায় ঔদাসীনা প্রকাশ করিয়া সম্মতি দিল।

পরৎকালের স্বচ্ছ নিস্তর মধ্যাহ্নে বিনোদিনী মহেন্দ্রের নির্জন শয়নগৃহে বসিয়া আশাকে কার্পেটের ছুতা বসিতে দেখিতেছিল। আশা অনানন্দ হইয়া ঘনঘন দ্বারের দিকে চাহিয়া পশ্চাৎ তন করিয়া বিনো

দিনীর নিকট নিঃশব্দে আসিয়া অপটু প্রকাশ করিতেছিল।

অবশেষে বিনোদিনী বিরক্ত হইয়া তাহার হাত হইতে কার্পেট টান মারিয়া ফেলিয়া দিয়া কহিল—“ও তোমার হইবে না, আমার কাজ আছে, আমি যাই!”

আশা কহিল, “আর একটু বোধ, এবার বেশ, আমি তুল করিব না!” বলিয়া আবার শোলাই লইয়া পড়িল।

ইতিমধ্যে নিঃশব্দপথে বিনোদিনীর পশ্চাতে দ্বারের নিচুই মহেন্দ্র আসিয়া পাড়াইল। আশা সেনাই হইতে মূল না তুলিয়া আন্তে আন্তে হাসিতে গাশিল।

বিনোদিনী কহিল, “হঠাৎ হাসির কথা কি মনে পড়িল?” আশা আর পারিতে পারিল না। উচ্চকণ্ঠে হাসিয়া উঠিয়া কার্পেট বিনোদিনীর গায়ের উপর ফেলিয়া দিয়া কহিল—
“না তাই, ঠিক বাংলায়, ও আমার হইবে না!”—বলিয়া বিনোদিনীর গলা লড়াইয়া দিগুণ হাসিতে গাশিল।

প্রথম হইতেই বিনোদিনী সব বুঝিয়াছিল। আশার চাকলো এবং ভাবতলীতে তাহার নিকট কিছুই গোপন ছিল না। কখন মহেন্দ্র পশ্চাতে আসিয়া পাড়াইয়াছে, তাহাও সে বেশ জানিতে পারিয়াছিল! নিজস্ব সরল নিরীহের মত সে আশার এই অত্যন্ত কৌণ ফাঁদের মধ্যে ধরা দিল।

মহেন্দ্র ঘবে ঢুকিয়া কহিল—“হাসির কারণ হইতে আমি হতাশা কেন বঞ্চিত হই?”

বিনোদিনী চমকিয়া মাথায় কাপড় টানিয়া উঠিবার উপক্রম করিল। আশা তাহার হাত চাপিয়া ধরিল।

মহেন্দ্র হাসিয়া কহিল—“হয় আপনি বহুদূর আমি ঘাই, নয় আপনিও বহুদূর আমিও বসি!”

বিনোদিনী সাধারণ মেয়ের মত আশার সহিত হাত কাড়াকাড়ি করিয়া মহাকোলা-হলে লজ্জার ধূম বাধাইয়া দিল না। সহজহৃদেই বলিল—“কেবল আপনার অগুরুত্বই বসিলাম, কিন্তু মনে মনে অভিলাপ দিবেন না!”

মহেন্দ্র কহিল—“এই বলিয়া অভিলাপ দিব, আপনার ঘেন অনেককণ চলংস্কৃতি না থাকে!”

বিনোদিনী কহিল—“সে অভিলাপকে আমি তথ্য ক’র না; কেন না, আপনার অনেককণ খুব বেশিকণ হইবে না। বোধ হয়, সমস্ত উভাৎ হইয়া আসিল!”

বলিয়া আবার সে উত্তীর্ণ হইয়া চলিল।
আশা তাহার হাত চাপিয়া ধরিয়া বলিল,
“মাঝা ব্যত, আর একটু বোস!”

(১৫)

আশা বিজ্ঞাসা করিল, “সত্য করিয়া বল, আমার চোখের বাগিকে কেমন লাগিল?”

মহেন্দ্র কহিল, “নন্দ নয়!”

আশা অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হইয়া কহিল,
“তোনার কাটিকে আর পছন্দই হয় না!”

মহেন্দ্র। কেবল একটু লোক ছাড়া!

আশা কহিল—“মাছা ওর সঙ্গে আর একটু ভাল করিয়া আলাপ হউক, তার পরে বুঝিব, পছন্দ হয় কি না!”

মহেন্দ্র কহিল—“আবার আলাপ? এখন বুঝি দরবারটী এখন চলিবে?”

আশা কহিল—“তরতার বাড়িরেও ও

মাহুদের সঙ্গে আলাপ করিতে হয়! একদিন পরিচয়ের পরেই যদি দেখাওনা বন্ধ কর, তবে চোখের বাগি কি মনে করিবে বল দেখি? তোমার কিন্তু সকলি আকর্ষণ! আর কেউ হইলে এমন মেয়ের সঙ্গে আলাপ করিবার সম্ভাবনা বেড়াইত—তোমার যেন একটা মত বিপদ উপস্থিত হইল!”

অন্য লোকের সঙ্গে তাহার এই প্রভেদের কথা শুনিয়া মহেন্দ্র ভারি খুশি হইল। কহিল, “আচ্ছা, বেশ ত! ব্যত হইবার দরকার কি। আমার ত পালাইবার স্থান নাই, তোমার সম্বন্ধে পালাইবার তাড়া বেশি না—সুতরাং দেখা মাঝে মাঝে হইবেই, এবং দেখা হইলে তরতা রক্ষা করিবে, তোমার বামীর পেটুই শিক্ষা আছে।”

মহেন্দ্র মনে স্থির করিয়া রাখিয়াছিল, বিনোদিনী এখন হইতে কোন না কোন ছুতার দেখা দিবেই। দুই বুঝিছিল। বিনোদিনী কাছ দিয়াও যায় না—দৈবাৎ গাভারাতের পথেও দেখা হয় না।

পাছে কিছুমাত্র ব্যগ্রতা প্রকাশ হয় বলিয়া মহেন্দ্র বিনোদিনীর প্রসঙ্গ স্ত্রীর কাছে উত্থাপন করিতে পারে না। মাঝে মাঝে বিনোদিনীর সম্ভাষাতার স্বভাবিক সামান্য ইচ্ছাকেও গোপন ও দমন করিতে গিয়া, মহেন্দ্রের ব্যগ্রতা আরো যেন বাড়িয়া উঠিতে থাকে। তাহার পরে বিনোদিনীর ঐদান্তে তাহাকে আরো উত্তেজিত করিতে থাকিল।

বিনোদিনীর সঙ্গে দেখা হইবার পরদিনে মহেন্দ্র নিতান্তই যেন প্রসঙ্গক্রমে

হাতছলে আশাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল,
—“আজ্ঞা তোমার অযোগ্য এই স্বামীটিকে
চোখের বালির কেমন লাগিল ?”

‘এম্’ করিবার পূর্বেই আশার কাছ
হইতে এ সম্বন্ধে উজ্জ্বলপূর্ণ বিতারিত
রিপোর্ট পাইবে, বহেন্দ্রের একগু পূর্ণ
প্রত্যক্ষা ছিল। কিন্তু সে ক্ষণ স্মরণ করিয়া
যখন ফল পাইল না, তখন লীলাজ্জলে
প্রব্রুতা উত্থাপন করিল।

আশা মুকিলে পড়িল। চোখের বালি
কোন কথায় বলে নাই। তাহাতে আশা
স্বর্গের উপর অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হইয়াছিল।

স্বামীকে বলিল—“রোগ, হুঁচকি দিন
আগে আলাপ হোক, তার পরে ত বলিবে।
কাল কতকণেরই বা দেখা, ক’টা কথাই
বা হইয়াছিল ?”

ইহাতেও মহেন্দ্র কিছু নিরাশ হইল
এবং বিনোদিনীসম্বন্ধে নিশ্চেষ্টতা দেখান
তাহার পক্ষে আরো দুঃস্থ হইল।

এই সকল আলোচনার মধ্যে বিহারী
আশিষা জিজ্ঞাসা করিল—“কি মহীন্ দা,
আজ তোমাদের তর্কটা কি লইয়া ?”

মহেন্দ্র কহিল—“যে ত ভাই, কুবুদিনী
না প্রেমোদিনী না কার সঙ্গে তোমার
বোটা’গ চুলের হাড়ি না মাছের কাঁটা না কি
একটা পাতাইয়াছেন, কিন্তু আমাকেও
ভাই বলিয়া তাঁর সঙ্গে চুরোটের ছাই কিংবা
বেশালাইয়ের কাঠি পাতাইতে হইবে, এ
হইলে ত বাঁচা যায় না।”

আশার ঘোমটার মধ্যে নীরবে তুমুল
কলহ ঘনাইয়া উঠিল। বিহারী অগত্যা
নিরুত্তরে মহেন্দ্রের মুখের দিকে চাহিয়া

হাসিল—কহিল, “বোটা’গ, লক্ষণ ভাল নয়।
এ সব ভোগাইবার কথা! তোমার চোখের
বালিকে আমি দেখিরাছি; আরো যদি ঘন-
ঘন বেঝিতে পাই, তবে সেটাকে ছুঁটিনা
বলিয়া মনে করিব না, সে আমি শপথ
করিয়া বলিতে পারি। কিন্তু মহীন্ দা যখন
এত করিয়া বেকবুল নাহিতেছেন, তখন
বড় মন্দেহের কথা!”

মহেন্দ্রের সঙ্গে বিহারীর যে অনেক
প্রভেদ, আশা তাহার আর একটি প্রমাণ
পাইল।

হঠাৎ মহেন্দ্রের কোটোগ্রাফ অভ্যাসের
সম্প্রদায়। পূর্বে সে একবার কোটোগ্রাফিক
শিল্পিতে আরম্ভ করিয়া ছাড়িয়া দিয়াছিল।
এখন আবার ক্যামেরা বেরানত করিয়া
আরক কিম্বা ছবি তুলিতে শুরু
করিল। বাড়ীর চাকর-বেহারাদের পর্যন্ত
ছবি তুলিতে লাগিল।

আশা ধরিয়া পড়িল, চোখের বালির
একটা ছবি লইতেই হইবে।

মহেন্দ্র অত্যন্ত সংক্ষেপে বলিল—
“আজ্ঞা!”

চোখের বালি তদপেক্ষা সংক্ষেপে
বলিল—“না!”

আশাকে আবার একটা কোণল
করিতে হইল। এবং সে কোণল গোড়া
হইতেই বিনোদিনীর অগোচর রহিল না।

মংলব এই হইল, মধ্যাহ্নে আশা তাহাকে
নিজের শোবার ঘরে আনিয়া কোনমতে
খুব পাড়াইবে এবং মহেন্দ্র সেই অবসর
ছবি তুলিয়া অবাধা স্বামীকে উপস্থাপন
করিতে।

আশ্চর্য্য এই, বিনোদিনী কোনদিন দিনের বেলায় ঘুমায় না। কিন্তু আশায় ঘরে আসিয়া সে দিন তাহার চোখচুলিয়া পড়িল। পায়ে একখানি লাল শাল দিয়া খোলা জানলার দিকে মুখ করিয়া চোখে মাখা রাখিয়া এমনি স্বন্দরভঙ্গীতে ঘুমাইয়া পড়িল যে, মহেন্দ্র কহিল, “ঠিক মনে হইতেছে যেন ছবি লইবার জন্য ইচ্ছা করিয়াই প্রস্তুত হইয়াছে!”

মহেন্দ্র পা টিপিয়া টিপিয়া ক্যামেরা আনিল। কোন্ দিক্ হইতে ছবি লইলে ভাল হইবে, তাহা স্থির করিবার জন্য বিনোদিনীকে অনেকক্ষণ ধরিয়া নানা দিক্ হইতে বেশ করিয়া দেখিয়া লইতে হইল। এমন কি, আটের খাতিরে অতি সতর্পণে শিরের কাছে তাহার খোঁপা চুল এক আরপায় একটু সরাইয়া দিতে হইল—পছন্দ না হওয়ার পুনরাব তাহা সংশোধন করিয়া লইতে হইল! মাশাকে কানে কানে কহিল, “পায়ের কাছে শালটা একটুখানি বা দিকে সরাইয়া দাও!”

অপটু আশা কানে কানে কহিল, “আনি ঠিক পারিব না, ঘুম ভাঙাইয়া দিব—তুমি সরাইয়া দাও!”

মহেন্দ্র সরাইয়া দিল।

অবশেষে সেই ছবি লইবার জন্য ক্যামে-

রার মধ্যে কাচ পুরিয়া দিল, এমনি বেত্ন-কিসের লগ্নে বিনোদিনী নড়িয়া দীর্ঘনিশ্বাস কেলিয়া থড়থড় করিয়া উঠিয়া বসিল! আশা উজ্জ্বল হয়ে হাদিয়া উঠিল। বিনোদিনী বড়ই রাগ করিল—তাহার জ্যোতির্পর চক্ষু দুটি হইতে মহেন্দ্রের প্রতি অস্বাভাব্য বর্ষণ করিয়া কহিল—“ভাবি অস্তায়!”

মহেন্দ্র কহিল—“অস্তায়, তাহার আর সম্বন্ধ নাই! কিন্তু চুরিও করিলাম, অথচ চোরাই মাগ ঘরে আসিল না, ইহাতে যে আমার ইহকাল-পরকাল দুই গেল। অস্তায়টাকে শেখ করিতে দিয়া তাহার পরে লগ্ন দিবেন।”

আশাও বিনোদিনীকে অভ্যন্তর ধরিয়া পড়িল। ছবি লইতে হইল। কিন্তু প্রথম ছবিটা খারাপ হইয়া গেল। দ্বিতীয় পরের দিন আর একটা ছবি না লইয়া চিত্রকর ছাড়িল না। তার পরে আবার দুই সখীকে একত্র করিয়া বজ্রবের চিত্রনির্মণনয়ন একখানি ছবি ভোলায় প্রস্তাবে বিনোদিনী না বলিতে পারিল না। কহিল—“কিন্তু এইটেই শেষ ছবি।”

তুলিয়া মহেন্দ্র সে ছবিটাকে নষ্ট করিয়া কেলিল। এমনি করিয়া ছবি তুলিতে তুলিতে আলাপ-পরিচয় বহুদূর অগ্রসর হইয়া গেল।

অশোকের কালনিরূপণ ।

অশোকের আবির্ভাবকাল লইয়া যথেষ্ট মতভেদ আছে। অশোকাবদান ও দ্বিবাং-বদানের মতে, বুদ্ধনির্ধাণের ১০০ শত বর্ষ পরে অশোক রাজ্যলাভ করেন। মহাবংশ-মতে, এই অশোকের নাম কালাশোক। কালাশোকের পর প্রথমে তাঁহার দশ ও পরে নয় পুত্র একত্র ২২ বর্ষ করিয়া ৪৪ বর্ষ রাজত্ব করেন। ঐ নয় জনের শেষ নৃপতির নাম ধনন্য। চাগকা তাঁহাকে হত্যা করিয়া চন্দ্রগুপ্তকে সিংহাসন প্রদান করেন। তৎপরে তৎপুত্র বিম্বসার ২৮ বর্ষ রাজা ছিলেন। অশোক তাঁহারই পুত্র। বুদ্ধনির্ধাণের পর ও এই অশোকের অস্তিত্বের পর্য্যন্ত ২১৮ বর্ষ গত হইয়াছিল।*

মহাবংশ-মতে ৪৪৩ খৃঃ পূর্বাব্দে বুদ্ধদেব নির্ধাণলাভ করেন; স্তত্রায় মহাবংশানুসারে ৩২৫ খৃঃ পূর্বাব্দে অশোকের রাজ্যাভিষেক ঘটে।† এতদ্ব্যতীত ৩৫৩ খৃঃ পূর্বাব্দে বিম্বসারের ও ৩৮৭ খৃঃ পূর্বাব্দে চন্দ্রগুপ্তের রাজ্যাভিষেককাল ধরিয়া লইতে পারি, কিন্তু পান্ডিত্য পুরাবিদগণ কেহই মহাবংশের উপর আস্থা বান্ধেননি। তাহার প্রধান কারণ, বুদ্ধনির্ধাণ হইতে মহাবংশে যে অঙ্গ পণিত

হইয়াছে, তাহা সম্পূর্ণ বিশ্বাসজনক নহে। কারণ বুদ্ধনির্ধাণকাল লইয়া নানাদেশীয় বৌদ্ধগণের মধ্যে বিস্তর মতপার্থক্য আছে। এখনা তাঁহারা বুদ্ধনির্ধাণাব্দের উপর নির্ভর না করিয়া চন্দ্রগুপ্তকে লক্ষ্য করিয়াছেন। অট্টাধার প্রকৃতি কোন কোন পান্ডিত্য ঐতিহাসিক মহাবীর আলেক্সান্দারের সমসাময়িক যে Sandrocottus-এর উল্লেখ করিয়াছেন, পান্ডিত্যপুরাবিদগণের বিশ্বাস, 'তিনিই মৌর্যরাজ চন্দ্রগুপ্ত'। ৩২৫ খৃঃ পূর্বাব্দে আলেক্সান্দার পঞ্চদশে উপস্থিত হইয়াছিলেন। পান্ডিত্যগণের বিশ্বাস, সে সময়ে চন্দ্রগুপ্ত আসিয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন। আলেক্সান্দার রুট হইয়া তাঁহার প্রাণদণ্ডের আদেশ করেন। শেষে তিনি পলাইয়া রক্ষা পান।‡ এইরূপে ভারতের আধুনিক ইংরাজ ঐতিহাসিকগণ আলেক্সান্দার ও চন্দ্রগুপ্তের উপর ভিত্তি স্থাপন করিয়া ভারতের কাণক্রমিক ইতিহাসের পত্তন করিয়াছেন।

অশোক যখন চন্দ্রগুপ্তের পৌত্র, তখন তিনি যে আলেক্সান্দার বা চন্দ্রগুপ্তের বহু পরে সিংহাসন লাভ করিবেন, এ সম্বন্ধে কেহ

* "জিনবিস্মানতো পজ্জাপুরে তন্নতিসেকতো অট্টাধারঃ বদন্তসতঃ স্বয়মেব বিজানিতঃ।"

[মহাবংশ ৫ম পরি.]

† পূর্বতন বৌদ্ধদিগের মধ্যে অশোকের অস্তিত্বের সম্বন্ধে মতভেদ আছে। দারিসাত্ত্র ও তাঁহার ঐতিহাসিকতা সম্বন্ধে সম্পূর্ণরূপেই দ্ব্যর্থক তৎপ্রকাশে বিরত হওয়া গেল।

বিবরণে 'চন্দ্রগুপ্ত'-নামে বিস্তৃত বিবরণ প্রদেয়া।

কখন সম্ভব করেন নাই । বিশেষত প্রিয়-
মর্শীর অত্যাচারে অন্টিওক (Antiochus),
তুর্কমার (Ptolemaeus), অন্টিকিনি (Anti-
gonus), মগ (Magas) ও আলেক্সান্দ্র
(Alexander) প্রভৃতি করেকজন দূরদেশ-
বাসী যবন- (Greek) রাজের নাম পাওয়া
যায় । ঐ পাটলনের কালসম্বন্ধে অধ্যাপক
ল্যাসেন লিখিয়াছেন :-

Antiochus of Syria... (রাজ্যকাল)

২৬০—২৪৭ খৃঃ পূঃ ।

Ptolemy Philadelphus... ঐ

২৮৫—২৪৭ খৃঃ পূঃ ।

Antigonus Gonatus

of Macedonia ঐ

২৭৮—২৪২ খৃঃ পূঃ ।

Magas of Cyrene

২৫৮ খৃঃ পূর্বাংশে মৃত্যু ।

Alexander of Epirus ঐ

২৬২—২৫৮ খৃঃ পূঃ ।

উক্ত পাটলন রাজ্য সকলেই ২৬০ হইতে
২৫৮ খৃঃ পূর্বাংশের মধ্যে জীবিত ছিলেন ।
একজন সেনাট বলেন, “প্রিয়মর্শীর রাজত্বের
১০৭ বর্ষে যে দিপি উৎকীর্ণ হয়, তাহাতে
যখন ঐ পাট জনের নাম পাওয়া বাইতেছে,
তখন সম্ভবত ঐ দিপিখানিও ২৬০—২৫৮
খৃঃ পূর্বাংশের মধ্যে প্রচারিত হইয়াছিল ।
এরূপ হলে ২৬২ খৃঃ পূর্বাংশে তাঁহার
অভিষেক এবং তাঁহার চারি বর্ষ পূর্বে
২৭০ খৃঃ পূঃ অর্থে রাজ্যলাভ ঘটে ।”

রিস্‌ডেভিড্‌, বুল্লার, কার্ণ প্রভৃতি সকলেই
ঐ মত স্বীকার করিয়াছেন । কিন্তু আমরা
কি ঐ মত গ্রহণ করিতে পারি? মৌর্য-
রাজ চন্দ্রগুপ্ত প্রকৃতই কি আলেক্সান্দ্রারের
সমসাময়িক, প্রকৃতই কি তিনি যাকিমনবীরের
নিকট অপমৃত্যু হইয়াছিলেন?

আমরা বিগদোরস্‌ প্রভৃতি পূর্বতন
পাশ্চাত্য ঐতিহাসিকের বর্ণনা হইতে
জানিয়াছি যে, আলেক্সান্দ্রারের পকনবে
অবস্থিতিকালে চন্দ্রমা বা চন্দ্রমস
(Xandrames) নামধের জনৈক নৃপতি
প্রবল প্রভাবে পূর্বভারত শাসন করিতে-
ছিলেন ।*

উক্ত প্রমাণ দ্বারা কিরূপে নিঃসন্দেহে
বলা যায় যে, চন্দ্রগুপ্ত মহাবীর আলেক্সান্দ্রা-
রের পর মগধের সিংহাসনে অধিরোহণ
করিয়াছিলেন । প্রাচীন বৌদ্ধগ্রন্থে যেমন
বুদ্ধ ও অশোকের কালনির্ণয়ে বিভিন্ন মত,
চন্দ্রমা (Xandrames) বা চন্দ্রগুপ্তের
(Sandrocottus) পরিচয়কালেও প্রাচীন
গ্রীক ঐতিহাসিকগণ সকলেই তদ্রূপ এক-
মত নহেন । এরূপ স্থলে উভয় মতই
নিঃসন্দেহে গ্রহণ করা বাইতে পারে না ।
এখন উভয় মত ছাড়িয়া অন্য উপায়ে
চন্দ্রগুপ্ত ও অশোকের কোন সময় পাওয়া
যায় কি না, তাহাই দেখা যাউক ।

জৈনদিগের মতে মহাবীরের নির্কাণের
পর, ১৫৫ বর্ষ গত হইলে চন্দ্রগুপ্ত রাজা
হন ।† যেভাবে জৈনদিগের মতে, বিক্র-

* তাহাজ্জি: লক্ষ পবিত্র, ২০ হাজার অশ্বারোহী, ২ হাজার রথ ও ৪ হাজার হস্তী ছিল ।

[বিয়কোর—‘চন্দ্রগুপ্ত’-লক্ষ, ১০৫ পৃ. ১]

† একক জীবহাবী অনুসরণে পড়ে । পঞ্চকালপঞ্চিকে চন্দ্রগুপ্তোত্তমপুত্র :-

৫৫৪ খৃঃ পূর্বাব্দে ত্রিংশৎ সত্যকামপুত্রগণিতে পরিশিষ্ট পদ্য ১০১২]

সের ৪৭০ বর্ষ পূর্বে এবং দ্বিগুণবিশেষের মতে শকরাজের ৬০৫ বর্ষ পূর্বে মহাবীর নির্মাণ-লাভ করেন।* বুদ্ধনির্মাণসম্বন্ধে বেরুগ নান্ন মত, বীরনির্মাণসম্বন্ধে সেরুগ মতান্তর নাই। দ্বিগুণ ও ত্রৈলোক্য উত্তর সম্ভাব্যের মতেই মিল দেখা যাইতেছে, অর্থাৎ উত্তর-মতেই ৫২৭ খৃঃ পূর্বাব্দে বীরনির্মাণ ঘটে। এরূপ হলে, তাঁহার ১৫৫ বৎসর পরে অর্থাৎ খৃষ্ট-পূর্ব ৩৭২ অব্দে চন্দ্রগুপ্তের রাজ্যাভিষেক-কাল হইতেছে। আবণবেলগোলা হইতে আবিষ্কৃত প্রাচীনতম নিলালিপিতে প্রকাশ যে, চন্দ্রগুপ্ত প্রভকবলী ভদ্রবাহুর সহিত উজ্জয়িনীধামে আগমন করেন। হেমচন্দ্র লিখিয়াছেন যে, বীরমোক্ষ হইতে ১৭০ বর্ষ পরে অর্থাৎ ৩৭৭ খৃষ্টপূর্বাব্দে ভদ্রবাহু স্বর্ণলাভ করেন।† এ সময়ে চন্দ্রগুপ্তের বিদ্যমান থাকাই সম্ভব।‡ চন্দ্রগুপ্ত ও চাণক্যের প্রভাব ভারতেতিহাসে প্রসিদ্ধ। চাণক্যের কৌশলে চন্দ্রগুপ্ত যে নিত্যত অন্নদিন রাজত্ব করিয়াছিলেন, তাহা বোধ হয় না। মহাবংশে তাঁহার ৩৪ বর্ষ ও তৎপুত্র বিম্বসারের ২৮ বর্ষ রাজ্যকাল লিখিত হইয়াছে। এদিকে ব্রহ্মাওপুরাণমতে চন্দ্রগুপ্ত ২৪ বর্ষ ও বিম্বসার ২৫ বর্ষ রাজত্ব করেন। এরূপ হলে উভয় রাজার রাজ্য-কাল মোটামুটি ৫৫ বৎসর ধরিয়া লইতে

পারি। তাহা হইল চন্দ্রগুপ্তের অভিষেকের প্রায় ৫৫ বর্ষ পরে অর্থাৎ ৩১৭ খৃষ্টপূর্বাব্দে নিকটবর্তী কোন সময়ে অশোকের রাজ্যা-রম্ভ ধরিয়া লওয়া যায়। এখন জৈনমত হইতে দেখিতেছি, যে সময়ে আলেক্সান্দার পঞ্চদশে উপস্থিত, সে সময়ে মগধের সিংহাসনে বিম্বসার অধিষ্ঠিত হইয়া সমস্ত পূর্ব-ভারত শাসন করিতেছেন। সম্ভবত তিনিই গ্রীকদিগের নিকট চন্দ্রমা বা চান্দ্রমস (Xandrames) নামে পরিচিত হইয়াছিলেন। থিওডোরাস্ সিকিউলাস্ লিখিয়াছেন, “আলেক্সান্দার ফিলিপ্পাসের মৃত্যুে গুনিয়া-ছিলেন, সিদ্ধুর পরপারে ১২ দিনের পথ গেলে গঙ্গাতীরে উপস্থিত হওয়া যায়। ইহার পরপারে চন্দ্রমার (Xandrames) রাজ্য। তাঁহার লক্ষাদিক সৈন্য আছে গুনিয়া আলেক্সান্দার প্রথমে বিশ্বাস করেন নাই। পরে পুরু-রাজ (Porus) তাঁহার সন্মুখীন করেন। পুরুরাজ আরও বলেন যে, পাক্ষ্য-প্রবেশের সেই রাজ্য অতি নীচবংশোদ্ভব, নাগিতের পুত্র। নাগিত অতি সুপুরুষ ছিল। রাবী তাহার রূপে মৃদা হয়, এই অবৈধ প্রণয়ে এক পুত্র জন্মে। সেই ছুঁটা পরে রাজ্যকে মারিয়া ফেলে। তাই এখন তাহার পুত্র রাজ্য হইয়াছে।” (Diodorus Siculus) কুইন্টাস্ কাটিয়াস্ ও থিওডোরাসের মত

* বিশ্বকোষ ‘জৈন’-শব্দ ১৩২ পৃ।

† “বীরমোক্ষস্বর্ণলাভে সপ্তত্যস্ত্রে গতে সতি।

ভদ্রবাহুগণি দ্বারী দ্বয়ো বর্ষঃ সমাধিনা।” [পরিশিষ্টে পৃষ্ঠা ১-১১১২]

‡ পাটলিপুত্রেই সিন্ধুতে ভদ্রবাহু ছিলেন না; অধিক সম্ভা, সে সময়ে তাঁহার মৃত্যু হইয়াছিল। কিন্তু পরবর্তী জৈনচাণক্য তাহাতে স্থগী নহেন, তাঁহার অশোকের সময়ে ভদ্রবাহুকে ডানিয়া আনিতে ইচ্ছুক।

উক্ত রাজার বিপুল সমৃদ্ধির পরিচয় দিয়া
শেবে লিখিয়াছেন যে, প্রজাপণ সকলেই ঐ
রাজাকে ভূক্তভাজীলা করিয়া থাকে ।

মাকিদন-বীরের সমকালিক শাস্ত্রগ্রন্থ-
শের বে রাজার পরিচয় উপরে লিখিত হইল,
হিন্দু, জৈন বা বৌদ্ধ কোন গ্রন্থে চন্দ্রগুপ্ত
বা অশোক সম্বন্ধে ঐরূপ কোন পরিচয়
পাওয়া যায় না ।

উক্ত চান্দ্রমস-রাজ সম্ভবত চন্দ্রগুপ্তের
সিংহাসনাবিকারী বিন্দুসার । বিন্দুসারের
স্থখ্যতির কথা কোথাও নাট, এমন
কি অবদানগ্রন্থে বিন্দুসার চন্দ্রগুপ্তের
সন্তান বলিয়াও গৃহীত হয় নাই ।
এজনাও বোধ হয়, কেহ কেহ
তাঁহাকে অবৈধরূপে উৎপন্ন ননে করিয়া
থাকিবেন । অশোকাবদান হইতে জানা
যায় যে, অশোকের মাতাকে একসময়ে
ব্রহ্মাস্ত্র-পুংর অনেকেই নাপিতানী বলিয়া
জানিত ।* অধিক সম্ভব, ঐট নাপিতানী-
অপবাদ থাকতেই বিন্দুসার সকলের
অবজ্ঞার পাত্র হইয়াছিলেন । পুরুষাভ্যের
নিকট আলেক্সান্দারও সেই কথা তুলিয়া
থাকিবেন । তবে গ্রীক ঐতিহাসিকের
নিকট ঐ ঘটনা কথকিং রূপান্তরিত হই-
রাছে । বাস্তবিক কৌরকর্ষকারিণী বিন্দুসার-
মহিবার পর্বেই অশোকের জন্ম, তাহা
আমরা অশোকাবদানেই পাইরাছি ।

এসিদ্ধ বৌদ্ধশাস্ত্রবিদ্ রিদু ভেতিভের
মতে চন্দ্রগুপ্ত, অমিত্রবাত, বিন্দুসার বা

প্রিয়দর্শী, একুণি ব্যক্তিবিশেষের নাম নহে,
উপাধিমাাত্র ।† যদি ইহাই প্রকৃত হয়, তাহা
হইলে বিন্দুসারের চন্দ্রমা বা চান্দ্রমস উপাধি
থাকা বিচিত্র নহে । অবদানগ্রন্থে লিখিত
আছে, তক্ষশিলার বিদ্রোহকালে বিন্দুসার-
কর্তৃক তথায় (যুবক) অশোক বিসর্জিত
হইরাছিলেন । আলেক্সান্দারের নিকট
তক্ষশিলার যুদ্ধ পরাজয় স্বীকার করিয়া-
ছিলেন, তাহা অনেকেই জানেন । তক্ষশি-
লার পরাজয়ে তক্ষশিলা-প্রদেশে বিশৃঙ্খ-
লতা বা বিদ্রোহ উপস্থিত হইবে, তাহা
অসম্ভব নহে । এই সময় অশোক তক্ষশিলা
স্থানসনে আনিবার জন্য চেষ্টা করিয়াছিলেন
ও তৎপ্রস্ত হইত তাঁহাকে আলেক্সান্দারের
বিপক্ষতাচরণ করিতে হইরাছিল । জাষ্টিনস্
লিখিয়াছেন, ‘দাম্রোকোস্তাস্ আদেল্-
সান্দারের সহিত দেখা করিয়াছিলেন ।
আলেক্সান্দার তাঁহার প্রাণদণ্ডের আদেশ
করেন । শেবে তিনি পলাইয়া আশ্রয়কার
সমর্থ হন । নানাস্থান দূরিত্য অতিশয় ক্লান্তি-
বোধে তিনি একদানে বসিয়া পড়েন, সেই
সময় একটা বৃহৎকার সিংহ লোলমুখী
বিতারমূর্ষক তাঁহার সম্মুখে আসিয়া
উপস্থিত হয়, কিন্তু তাঁহাকে সম্মুখে পাইয়াও
পত্তরাজ তাঁহার কোন অনিষ্ট না করিয়া
চলিয়া যায় । তদুপরনে উক্ত বীরের দ্বয়
একটি অশ্রুট আশার সঞ্চায় হইল । তিনি
সাম্রাজ্যস্থাপনের জন্য অনেক মহাদান সংগ্রহ
করিলেন । তাহাদের সাহায্যে (সেই যুবক)

* বিস্কোরে ‘প্রিয়দর্শী’ শব্দ ঘটনা ।

† Rhys David's Buddhism, p. 221.

- গ্রীক্ সৈন্যদলকে পরাস্ত করিয়া সিদ্ধনদ-প্রবাহিত প্রদেশ অধিকারের চেষ্টা করেন।* আলেক্সান্দার, ইউভিমন্ ও তক্ষশিলকে পঞ্জাবশাসনের ভার দিয়া বান। ৩২০ খৃষ্ট-পূর্বাব্দে আলেক্সান্দারের মৃত্যুর পর ইউভিমন্ নিজে স্বাধীন রাজ্য হইবার চেষ্টায়, তাঁহার সেনাপতি ইউমেনিসের দ্বারা পুত্রস্বাক্ষকে হত্যা করেন।† কাহাও মতে সাস্ত্রোকোভাসও এই হত্যাকাণ্ডে লিপ্ত ছিলেন। ৩১৭ খৃঃ পূর্বাব্দে ইউভিমন্ সেনাপতি ইউমেনিসের সাহায্যার্থ ৩ হাজার পদাতি, ৪ হাজার অশারোহী ও প্রায় ১২০ টি হস্তী লইয়া গবিনি-রূপক্ষেত্রে আসিয়া উপস্থিত হন। এই অবকাশে ‘সাস্ত্রোকোভাস’ জাতীয় স্বাধীনতা উদ্ধারের জন্য দেশীয় সামন্তবর্গকে উত্তেজিত করিয়া গ্রীকদিগকে ভারত হইতে বিতাড়িত ও পঞ্জাব অধিকার করেন। আলেক্সান্দার ভারতদীক্ষাত্রপ্রবেশস্থিত যে জনপদসমূহ প্রিয় সেনানী সিলিউকসের হস্তে অর্পণ করিয়াছিলেন, সাস্ত্রোকোভাস সে সমস্তও জয় করিয়া লইলেন।‡ ট্রাবো লিখিয়াছেন, ‘অরমিন পরেই সিলিউকস নিকেনর পুত্রায় গ্রীকরাজ্য-স্থাপনাশায় সাস্ত্রোকোভাসের সহিত যুদ্ধ করিতে প্রস্তুত হন। পরে সমরক্ষেত্রে যুদ্ধের সুবিধা চাইবে না ভাবিয়া, তাঁহার সহিত মিত্রতাপানে আবদ্ধ হইলেন।’ বেগেদিনি লিখিয়াছেন, ‘সিলিউকস সাস্ত্রোকোভাসকে আপন কল্পা সম্ভ্রমণ করিয়াছিলেন।’ তিনি পাটলিপুত্রে

অধিষ্ঠিত হইলে সিলিউকসের আদেশে গ্রীক-দূত মেগেস্থিনিন্স পাটলিপুত্রে রাজসভায় উপস্থিত ছিলেন।

পাশ্চাত্য গ্রীক ঐতিহাসিকগণের উক্ত বিবরণ পাঠ করিলে, অশোককেই উক্ত ঘটনাবলীর নেতা বলিয়া মনে হয়। অশোকের প্রথম বয়সের নির্ধরপ্রকৃতি, কূটনীতি, দলবলসংগ্রহ, তক্ষশিলার গমন, তথায় প্রতিপত্তিস্থাপন, ষোড়শভাতকে ফাঁকি দিয়া রাজ্যগ্রহণ ইত্যাদি বিষয় আলোচনা করিলে, গ্রীকবর্ণিত মহাপতি সাস্ত্রোকোভাসের ছবিই মনে হয়।

হিন্দু, বৌদ্ধ ও জৈন, এই ত্রিবিধ সম্প্রদায়ের মধ্যে চাণক্যই চন্দ্রগুপ্তের রাজ্য-প্রাপ্তির মূল বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। তাঁহার প্রভাব পঞ্জাব হইতে বঙ্গ পর্যন্ত সর্বত্র প্রসিদ্ধ ছিল। সর্বজনপরিচিত চাণক্যের নাম পর্যন্তও কোন গ্রীক ঐতিহাসিক উল্লেখ করেন নাই। বিশেষত এই চন্দ্রগুপ্তের সহিত যদি গ্রীকরমণীর বিবাহ হইত এবং ইহার সত্য্য যদি গ্রীকদূত অবহান করিতেন, তাহা হইলে কি সেই গ্রীকদূত কখন চাণক্যের নাম ছাড়িয়া যাইতেন? এতদ্বারা স্পষ্ট অস্বীকৃত হয় যে, গ্রীকবর্ণিত, ‘সাস্ত্রোকোভাস’ ও চাণক্যপালিত ‘চন্দ্রগুপ্ত’ উভয়ে বিভিন্ন ব্যক্তি। আরও বিবেচনাসের পূর্বোক্ত বাক্যাবলী হইতে ইহাও সমর্থিত হইতেছে যে, আলেক্সান্দারের সময় চান্দ্রমস (Xandrames) নামে এক রাজা পূর্ব-ভারতে আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিলেন।

* Justinus. XV. 4. † Diodorus. XIX. 5.

‡ Justinus. XV. C 4.

তৎকালে সান্ত্রোকোভাস্-নামক এক যুবক
পকম্ব্রদেশে দয়্যামলাহাবো আশ্রমের
ভবিষ্য উন্নতির পথ খুঁজিতেছিলেন, সেই
যুবককেই বিপুলারপুত্র অশোক বলিয়া
মনে হয়।

জাতিবন্দু লিখিয়াছেন, দৈববশে এই বুক
 রাখে। হইয়াছিলেন। বাণ্ডবিক অপোকেত্র
 রাখে। পাইবার কথা নথ, কারণ তথ্য
 পিতার মৃত্যুকালে জোড়ভাত। হুসীম বিনা-
 নান ছিলেন। দশগুণ যেমন নান্দম ও কঠোর
 ভাবে পরত্যাগের কারণ থাকে, অপোকেত্র
 সেইরূপ নিম্ন ব্যবহারে ত্রাহুতা। করিয়া
 সিংহাসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। অপোকেত্র
 অপর নাম প্রবন্ধী, কিন্তু এই নামও যেমন
 আধকাশে বোঝে, কোন বা হিন্দুগ্রে না
 থাকলেও, অপোকেত্র নামের বর্ণনা গণ্য
 করিতে আপাত নাহ; উক্ত গ্রন্থবর্ণিত
 "সাম্রাজ্যোক্তান্ত" বা "চান্দগুপ্ত" বা "শ্রেণগুপ্ত"
 নামের তাহার একটি নামের বর্ণনা গ্রহণ
 করিতেই বা আপাত। ক? তারতোতাসে
 বহুসংখ্যক শ্রেণগুপ্ত বাহিত হইয়াছে, গ্রীসের
 ইতিহাসেও অনেকগুলি আলেক্সান্দারের
 নাম পাওয়া গিয়াছে। পিতামহের নাম
 শ্রেণগুপ্ত এবং পৌত্রের নামও শ্রেণগুপ্ত, গুপ্ত-
 বংশের ইতিহাস পাঠ করিলে এ বিষয়ের প্রকৃষ্ট
 পরিচয় পাওয়া যায়। তখন দেখা যাইতেছে,
 ভারতের বহুসংখ্যক রাজ-পিতামহ ও তৎ-
 পৌত্র একই নামে অভিহিত ছিলেন; তখন

ঐক ঐতিহাসিকের বিকট প্রায়শনী 'চন্দ্র-
শুভ' বা 'চন্দ্রশুভ' নামে আখ্যাত হইবেন,
তাহাতে আর বিচিত্র কি !

পূর্বেরই বলিরাছি, মৌর্যরাজ চন্দ্রগুপ্তের
সহিত কোন যবন- (গ্রীক) সম্বন্ধ হইয়াছিল
কি না, হিন্দু, বৌদ্ধ বা জৈন, কোন গ্রন্থ
হইতে তাহার প্রমাণ পাওয়া যায় নাই।
গ্রীক বা যবনদিগের সহিত অশোকরাজ যে
বিশেষরূপে সংশ্লিষ্ট ছিলেন—গির্গার হইতে
আবিষ্কৃত কল্পদ্বারার শিলালিপি-পাঠে তাহার
যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়,—“মৌর্য্য
রাজ্যেরেণ বৈশোন পুষ্যগুপ্তেন কারিতম্, অশো-
কসা মৌর্য্যসা তে (তৎ) যবনরাজেন
তুষাম্পেনাধিষ্ঠায় প্রণালীভিরগচ্ছতম্ ।”
অর্থাৎ মৌর্য্যরাজ চন্দ্রগুপ্তের শালক বৈষ্ণ-
বাতীর পুষ্যগুপ্ত (এই হ্রস্ব) প্রবৃত্ত করাইয়া
ছিলেন। মৌর্য্যরাজ অশোকের প্রসিদ্ধ
যবনরাজ তুষাম্প প্রণালী দ্বারা (উক্ত হ্রস্ব
পরে) অলঙ্কৃত করাইয়াছিলেন।

এখানে মৌখিকভাবে চক্রগণের শ্যালক
বৈশা, কিন্তু অশোকের সহিত যবনরাজ
কুষাণের কি সম্বন্ধ, তাহার স্পষ্ট উল্লেখ
না থাকিলেও, পূর্বসম্বন্ধ দৃষ্টে যবনরাজকেও
অশোকের শ্যালক বলিয়া গ্রহণ করিতে
আপত্তি কি? অশোক যবন-(গ্রীক)
বিশ্বের সহিত মিলিত হইয়া বীর উত্তির্ভিয়ার্ণ
প্রশস্ত করিয়াছিলেন, তাহা বিচিত্র নহে।

তিনি হুদুর গ্রীস, মিসর প্রভৃতি দেশের

২. চন্দ্রশেখর বসু এবং বা ভবনেশ্বরী বসি। যদি 'চন্দ্রশেখর' নাম হইত। থাকে, তাহাতেই বা আপত্তি কি ?
৩. চন্দ্রশেখর-বসু'র উল্লেখও অসঙ্গত নহে। যথা—“চন্দ্রশেখর বসু এবং বা ভবনেশ্বরী বসু” (পরিণতি পৃষ্ঠা ১০২২)
৪. বিবাহোৎসব ‘ও প্রভাতভঙ্গ’ দেখ।

রাজাদিগের সংবাদ রাখিতেন এবং ধর্ম-
 • প্রচারার্থ তাঁহাদের রাজ্যে লোক পাঠাইয়া-
 ছিলেন। তাঁহার অস্থাপনলিপি হইতে
 ইহা আশ্রয় লানিতে পারি। পূর্বে লিখি-
 রাছি যে, তিনি রাজত্বের ১৩শ বর্ষে যে
 অস্থাপন প্রচার করেন, তাহাতে অন্তিওক,
 তুরমর, অন্তিকিনি, মক ও অলিকনুদর, এই
 পাঁচজন যোনু- (গ্রীক) রাজের উল্লেখ
 আছে। এই পাঁচজন যবনসৃপতিই সম্রাট
 অশোকের সমসাময়িক। এই পাঁচজনের
 প্রকৃত আবির্ভাবকাল স্থির হইলে, অশো-
 কের প্রকৃত কালনির্ণয়ে আর কোন গোল
 থাকিবে না। গ্রীসের প্রাচীন ইতিহাসে
 উক্ত পঞ্চ যবনরাজের পরিচয় ও কাল এই-
 রূপ প্রদত্ত হইয়াছে :—

অন্তিওক (Antiochus 1.)—ইনি
 সিলিউকদের পুত্র, সিরীয়রাজ ও এসিয়ায়াজ
 বলিয়া গণ্য। ২৯১ খৃঃ পূঃ অব্দে মৃত্যু।
 রাজ্যকাল ৩১০—২৯১ খৃষ্টপূর্বাব্দ।

তুরমর (Ptolemæus Lagus)—
 টলেমী-কিনাডেলুসাসের পিতা, ইজিপ্তের
 রাজা, ২৮৫ খৃঃ পূঃ মৃত্যু। রাজ্যকাল ৩২৩
 —২৮৫ খৃঃ পূঃ।

অন্তিকিনি (Antigonus)—আলেক্-
 সান্দারের প্রসিদ্ধ সেনাপতি, প্রকৃত মৃত্যুর
 বরষা পরে পাম্কাইলিয়া, লাইসিয়া
 প্রভৃতি স্থানের রাজা হন। ৩০১ খৃঃ
 পূর্বাব্দে তাঁহার মৃত্যু হয়।

মক (Magus)—কাইরিনের (Cyrene)
 একজন প্রসিদ্ধ রাজা। ২৫৭ খৃঃ পূঃ তাঁহার
 মৃত্যু হয়। রাজ্যকাল ৩০৭—২৫৭ খৃঃ পূঃ।

অলিকনুদর (Alexander)—এশিয়াসের
 প্রসিদ্ধ রাজা। মহাবীর আলেক্সান্দারের
 মাতুল ও এলিম্পিয়ার সাহোদর। আলেক্-
 সান্দারের মৃত্যুর কিছুকাল পরে রাজা হন।

এখন দেখিতে হইবে, উক্ত পাঁচজন
 রাজা একত্র কোন্ সময়ে জীবিত ছিলেন।
 দেখা যাইতেছে যে, উক্ত পাঁচজনের মধ্যে
 অন্তিকিনি (Antigonus) ৩০১ খৃঃ পূর্বাব্দে
 গত হইয়াছিলেন এবং মক (Magus)
 ৩০৭ খৃষ্টপূর্বাব্দে রাজ্যারোহণ করেন;
 সুতরাং ৩০৭ হইতে ৩০১ খৃষ্টপূর্বাব্দের
 মধ্যে আনন্স উক্ত পাঁচজন যবনরাজকেই
 জীবিত দেখিতে পাই। তাহা হইলে ঐ সময়ে
 অশোক প্রিয়দর্শীও রাজত্ব করিতেছিলেন,
 সন্দেহ নাই। পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি যে,
 ৩১৭ খৃঃ পূর্বাব্দে ইউডিনস্ ও সিলিউকসের
 অধীন পত্নাব ও সীমান্তবর্তী সমুদায় ভূভাগ
 গ্রীকদিগের হস্ত হইতে বিচ্যুত হইয়াছিল,
 ইহারই কিছুকাল পরে অশোক পটলিপুত্রে
 পিতৃসিংহাসন অধিকার করেন। সম্ভবত
 প্রায় ৩১৬—৩১৫ খৃঃ পূর্বাব্দে তাঁহার সিংহাসন-
 লাভ, ৩১২—৩১১ খৃঃ পূঃ তাঁহার অভিষেক
 এবং ৩০৩—৩০২ খৃঃ পূঃ পঞ্চযবন যুগান্তির
 নামসংবলিত তাঁহার অস্থাপনলিপি উৎখা
 হইয়াছিল।*

ত্রীনগেন্দ্রনাথ বসু ।

মেঘদূত ।

অধিক ব্যবহারের অতিপরিচয়ে নূতন
কিনিব পুরাতন হইয়া যায়। ভোগের
বাহুবলি তরুণ, কিন্তু সে বাহাতে হাত দেয়,
তাহা জীর্ণ হইতে থাকে। সে আগুনের
মত ; যতক্ষণ স্পর্শ না করে ততক্ষণ নিজের
দীপ্তিতে উজ্জল করিয়া তোলে, স্পর্শ করিলে
কালো করিয়া দেয়,—ছাই করিয়া ফেলে।

তোমনি আবার ব্যবহারের পরিচয়ে
বথার্থ পুরাতনের পুরাতন মূর্ত্তি ঢাকা পড়িয়া
যায়। বাহাকে প্রত্যহ ভোগ করিতেছি
সে যে বহুবলের, সে যে আমার ভোগের
অতীত, ভোক্তারূপে আমি তাহার চেয়ে
বে বড় নহি, সে যে আমাকে ছাড়াইয়া
চর্গম অতীতকালের দিকে অত্যা হইয়া
গেছে, একথা আমাদের মনে নয় না।

ইহার কারণ এই, পুরাতনের যে দিক্টা
আমার নধে, সে দিক্টা আমি পাই নাই,
যে দিক্টা বস্তুর পুরাতন, সে দিক্টাকে
সগাই করি না ; বাহা আমার ভোগে আসি-
রাছে, তাহাই আমাকে আটক করিয়াছে।

যে অংশ পাইয়াছি, আমাদের পক্ষে
তাহাই নিশ্চয়, তাহাই অত্যন্ত বর্ত্তমান ; লাভ
করিয়া যে তৃপ্তি ও শান্তি। তাহাতেই আন-
ন্দিগকে একটা সীমার মধ্যে নিরস্ত করিয়া
রাখে ; বাহা পাইলাম, তাহা অপেক্ষা আরো
কিছু আছে, ইহা মনে করিতে মনের আর
উদ্যম থাকে না। ভোগের দ্রব্য শেষ হইতে
না হইতে আমাদের ভোগ শেষ হইয়া যায়।

এই জন্য ভক্তৃহরি বলিয়াছেন, “ভোগা
ন কুতলা বয়মেব কুতলাঃ।” ভোগের দ্রব্য-
সকল যে কুলা হইতেছে, তাহা নধে, আমরাই
কুলা হইতেছি।

আম এই কথা বিশেষ কুরিয়া মনে উদয়
হইল, আকাশে আবৃত্তির ঘন মেঘ দেখিয়া।
ভাবিতেছিলাম, প্রোড়ের চক্ষে পৃথিবী
পুরাতন হইয়া আসিয়াছে। ঘোবনে মনের
মধ্যে যখন ভাবের আবেশ ছিল, তখন
পৃথিবী নববধূর মত সান্নিধ্য থাকিত ;
তখন তাহার ও আমার মধ্যে দ্বন্দ্বের
স্পর্শ, অথচ একটি আকর্ষণ অবগুণনের
অস্তরাল ছিল। এখন ভোগের অবসানে,
কাঙ্ক্ষার সম্পর্কে, প্রগল্ভা গৃহিণীর মত
পৃথিবী তাহার ঘোমটা খুটাইয়া ফেলিয়াছে ;
মনে হইতেছে তাহাকে আমি বেশ করিয়া
জানি, সে আমার ব্রহ্ম-ভব নাভ-কতির
জীর্ণ তিত্তির দ্বারা বেষ্টিত পৃথিবী।
সে আমার অন্তঃপুরের চিরপুরাতন
পরিচিতা।

আবার আর এক রকম করিয়া বলা
যায়, পৃথিবী যে চিরপুরাতন, সে কথা আর
মনে হয় না। পৃথিবী যেন আমারই দ্বারা
বদ্ধ। ঘোবনে নিজের অন্ত পাই নাই,
সংসারেরও অন্ত ছিল না। তখন, আমি কি
বে হইব, না হইব, কি করিতে পারি, দাঁ-
পারি, কাজে, ভাবে, অন্ততাবে আমার
প্রকৃতির দোড় কতদূর, তাহা নির্দিষ্ট হয়

সংসারের সম্বন্ধ; যেহেতু সংসারের এই সকল প্রয়োজনীয় সম্বন্ধগুলোকে ভুলাইয়া দেহ, তখনি ভ্রমর বাধ ভাঙিয়া আপনায় পথ বাহির করিতে চেষ্টা করে।

যেহেতু আপনায় নিত্যনতুন চিত্রবিন্যাসে, অঙ্ককারে, সজ্জনে, বর্ণণে, চেনা পৃথিবীর উপর একটা প্রকাণ্ড অচেনার আভাস নিক্ষেপ করে,—একটা বহুদূর কালের এবং বহুদূর দেশের নিবিড় ছায়া ঘনাইয়া তোলে,—তখন পরিচিত পৃথিবীর হিসাবে বাহ্য অসম্ভব ছিল, তাহা সম্ভবপর বলিয়া বোধ হয়। কল্পাপবন প্রায়তন যে আসিতে পারে না, পথিকবৎ তখন এ কথা আর মানিতে চাহে না। সংসারের কঠিন নিয়ম সে জানে, কিন্তু জানে জানে মাত্র; সে নিয়ম যে এখনো নগ্নবান্ আছে, নিবিড় বর্ষার দিনে এ কথা তাহার চমকে প্রভীতি ছুর না।

সেই কপাই ভাবিতেছিলান, ভোগের দ্বারা এই বিপুল পৃথিবী—এই চিরকালের পৃথিবী, আমার কাছে ধর্ম হইয়া গেছে। আমি তাহাকে যতটুকু পাইয়াছি, তাহাকে ততটুকু বলিয়াই জানি, আমার ভোগের বাহিরে তাহার অস্তিত্ব আমি পণ্যই করি না। জীবন শক্ত হইয়া বাঁদিয়া গেছে, সঙ্গে সঙ্গে সে নিজের আবশ্যক পৃথিবী-টুকুকে টানিয়া আঁটিয়া লইয়াছে। নিজের মধ্যে এবং নিজের পৃথিবীর মধ্যে এখন আর কোন রহস্য দেখিতে পাই না বলিয়াই শান্ত হইয়া আছি; নিজেকে সম্পূর্ণ জানি মনে করি এবং নিজের পৃথিবী-টুকুকেও সম্পূর্ণ জানিয়াছি বলিয়া স্থির

করিয়াছি। এমন সময় পূর্বদিগন্ত সিঁধ অঙ্ককারে আচ্ছন্ন করিয়া কোথা হইতে সেই শত-শতাব্দী পূর্বেরকার কালিদাসের যেহেতু আনিয়া উপস্থিত হয়! সে আমার কাছে, আমার পৃথিবীটুকুর মধ্যে; সে আমাকে কোন্ অলকাপুরীতে, কোন্ চিরবৌবনের মাঝে, চিরবিচ্ছেদের বেদনায়, চিরমিলনের আশ্বাসে, চিরমৌল্যধোর কৈলাসপুরীর পৃথিভূমী-ভীষণভীষণে আকর্ষণ করিতে থাকে! তখন, পৃথিবীর যেটুকু জানি সেটুকু তুচ্ছ হইয়া যায়, বাহ্য জানিতে পারি নাই তাহাই বড় হইয়; উঠে, বাহ্য পাইলান না তাহাকেই লজ্জা দ্বিগুণের চেয়ে বেশি মজা মনে হইতে থাকে। জানিতে পারি, আমার জীবনে, আমার শক্তিতে, অতি অল্পই অধিকার করিতে পারিয়াছি, বাহ্য বৃহৎ তাহাকে স্পর্শও করি নাই।

আমার নিজাকর্ষণকে নিজাপ্রতিষ্ঠিত সংসারকে আচ্ছন্ন করিয়া দিয়া সঙ্গলম্বেণ-নেছুর পরিপূর্ণ নববর্ষা আমাকে অজ্ঞাত ভাবলোকের মধ্যে সমস্ত বিবিধধানের বাহিরে একেবারে একাকী দাড় করাইয়া দেয়,—পৃথিবীর এই কয়টা বৎসর কাড়িয়া লইয়া আমাকে একটি প্রকাণ্ড পরমান্বয় বিশালত্বের মাঝখানে স্থাপন করে; আমাকে রামসিঁরি আগ্রহের জনশূন্য শৈলশৃঙ্গের শিখাভাগে স্তব্ধহীন ছাড়িয়া দেয়। সেই নির্জন শিখর, এবং আমার কোন্ এক চিরনিকেতন, অন্তর্যাক্ষার চিরপ্রসারান্বিত অলকাপুরীর মাঝখানে একটি বৃহৎ-সুন্দর-পৃথিবী পড়িয়া আছে মনে পড়ে;—নদী-কলপনিত, সাহসমৎপর্ষতবন্ধর, অশুক-

• জ্যোতিষ্ককার, নববারিসিকিত-মৃদী সুগন্ধি একটি বিপুল পৃথিবী। দমর সেই পৃথিবীর বনে বনে গ্রামে গ্রামে শূন্য শূন্য নদীর কূলে কূলে কিরিতে কিরিতে, অপরিচিত স্নানঘরের পরিচর লইতে লইতে, দীর্ঘবিরহের শেষ মোক্ষস্থানে ঘাইবার জন্য মানসোৎসাহসের ন্যায় উৎসুক হইয়া উঠে।

মেঘদূত ছাড়া নববর্ষার কাব্য কোন সাহিত্যে কোথাও নাই। ইহাতে বর্ষার সমস্ত অন্তর্বেশনা নিতাকালের ভাষায় লিখিত হইয়া গেছে। প্রকৃতির সাংঘর্ষিক মেঘোৎসবের অনির্লচনীয় কবিত্বগাথা মানবের ভাষায় বাধা পড়িয়াছে।

পূর্বমেঘে গৃহ-পৃথিবী আমাদের কর্ণার কাছে উদ্ঘাটিত হইয়াছে। আমরা সম্পন্ন গৃহস্থ হইয়া আরাধ্যে সন্তোষে অর্চনামূলিতলোচনে যে গৃহস্থের মধ্যে বাস করিতেছিলাম, কালিদাসের মেঘ “আবাহুনা প্রথমবিসেস” হঠাৎ আসিয়া আমাদের পক্ষাঘাত করিয়া দিল। আমাদের গোবালগর-গোলাবাড়ীর বহুদূরে যে আবর্জ্যকলা নর্শনা ভ্রুকুটি রচনা করিয়া চলিয়াছে, যে চিত্রকূটের পাথকূল প্রকুর নব নীপে বিকশিত, উদয়ন-কথাকোষি গ্রামবৃদ্ধদের দ্বারের নিকট যে চৈত্যা-বট গুহকাকলীতে সুখ, তাহাই আমাদের পরিচিত ক্ষুদ্র সংসারকে নিরন্তর করিয়া বিচিত্র সৌন্দর্যের চিত্রপটে উদ্ভাসিত হইয়া দেখা দিয়াছে।

বিরহীর ব্যাঘাততেও কবি পথসংক্ষেপ করেন নাই। আবাহনের নীলাশ্র-মেঘজ্যোত্সব নগ-নদী-নগর-অনপদের উপর দিয়া

রহিয়া রহিয়া ভাবাবিষ্ট অগসগমনে গাড়া করিয়াছেন। যে কাহার সুদ্রবধনকে অন্তর্ধান করিয়া ডাকিয়াছে, তিনি তাহাকে আর “না” বলিতে পারেন নাই। পাঠকের চিত্তকে কবি বিরহের বেগে বাহির করিয়াছেন, আবার পথের সৌন্দর্য্যে বহুর করিয়া তুলিয়াছেন। যে চরম স্থানে মন ধাবিত হইতেছে, তাহার সুদীর্ঘ পথটিও মনোহর, সে পথকে উপেক্ষা করা যায় না।

বর্ষার অভ্যন্তর পরিচিত সংসার হইতে বিকল্প হইয়া মন বাহিরের দিকে বাইতে চায়, পূর্বমেঘে কবি আমাদের সেই আকাঙ্ক্ষাকে উদ্বেলিত করিয়া তাহারই কলগান জাগাইয়াছেন— আমাদের কাছে মেঘের সঙ্গী করিয়া অপরিচিত পৃথিবীর নাক্ষত্রাঙ্গ দিয়া নৈয়া চলিয়াছে। সে পৃথিবী “অন্যাত্তং পূষ্পং”, তাহা আমাদের প্রাত্যহিক ভোগের দ্বারা কিছুমাত্র মলিন হয় নাই, সে পৃথিবীতে আমাদের পরিচয়ের প্রাচীরদ্বারা কল্পনা কোনখানে বাধা পায় না। যেমন ঐ মেঘ, তেমনি সেই পৃথিবী। আমার এই স্বপ্ন-স্বপ্ন-স্বপ্ন-অবস্থাদের জীবন তাহাকে কোথাও স্পর্শ করে নাই। প্রৌঢ়বয়সের নিশ্চরতা বেড়া দিয়া ঘের দিয়া তাহাকে নিঃশেষ বাস্তবায়নের অন্তর্ভুক্ত করিয়া লয় নাই।

অজ্ঞাত নিখিলের সহিত নবীন পরিচয়, এই হইল পূর্বমেঘ। নব মেঘের আর একটি কাজ আছে। সে আমাদের চারিদিকে একটি পরমনিবৃত্ত পরিবেষ্টন রচনা করিয়া, “জননাত্তরসৌন্দর্য্যানি” মনে করাইয়া দেয়—অপরূপ সৌন্দর্য্যলোকের মধ্যে কোন

একটি চিরজাত চিরশিখের মত মনকে উত্তলা করিয়া তোলে ।

পূর্বমেঘে বহুবিচিত্রের সহিত দৌলখোর পরিচয় এবং উত্তরমেঘে সেই একের সহিত আনন্দের সম্মিলন । পৃথিবীতে বহুর মধ্য দিয়া সেই স্নেহের গাত্রা, এবং বর্ণলোকে একের মধ্যে সেই অভিসারের পরিণাম ।

নববর্ষার দিনে এই বিধরকণ্ঠের ক্ষুদ্র সংসারকে কে না বলিবে নিঃশাসন ! গভীর অভিশাপেই এখানে আটুতা পড়িয়া আছি । বেধ আসিয়া বাহিরে ঘোঁড়া কবিবার মত আহ্বান করে, তাহাট পূর্বমেঘের গান এবং যাত্রার অবসানে চিরমিলনের জন্য আশ্বাস দেয়, তাহাই উত্তরমেঘের সংবাদ ।

সকল কবির কাব্যেই পৃথু অভ্যস্তরে এই পূর্বমেঘ ও উত্তরমেঘ আছে । সকল বড় কাব্যই আনন্দিগকে স্রোতের মধ্যে আহ্বান করিয়া আনে ও নিভৃতের দিকে নির্দেশ করে । প্রপঞ্চে বসন ছেদন করিয়া বাহির করে, পরে একটু ভ্রমার সহিত বাঁধিয়া দেয় । প্রভাতে পথে লইয়া আসে,

সন্ধ্যার ঘরে লইয়া যায় । একবার তানের মধ্যে আকাশপাতাল ঘুরাইয়া শেষের মধ্যে পূর্ণ আনন্দে গাঁড় করাইয়া দেয় ।

যে কবির তান আছে, কিন্তু কোথাও সম নাই, যাহার মধ্যে কেবল উদ্যম আছে, আশ্বাস নাই, তাহার কবিত্ব উচ্চাকাংক্ষণীতে দ্বারী হইতে পারে না । শেষের দিকে একটা কোথাও পৌঁছাইয়া দিতে হইবে, এই ভরসাতেই আমরা আমাদের চিত্তাভ্যস্ত সংসারের বাহির হইয়া কবির সহিত যাত্রা করি,—পুষ্টিত পথের মধ্য দিয়া আনিয়া হঠাৎ একটা শূন্যগহ্বরের ধারের কাছে ছাড়িয়া দিলে বিষমবাক্যকতা করা হয় । এই জন্য কোন কবির কাব্য পড়িবার সময় আমরা এই দুটি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করি, তাহার পূর্বমেঘ আমাদিগকে কোথায় বাহির করে এবং উত্তরমেঘ কোন সিংহাসনের লগ্নুখে আনিয়া উপনীত করে ।

ভ্রমারসম্বন্ধ-শকুন্তলা-সদৃশ এই দুটি প্রশ্ন করিয়া যে উত্তর পাইয়াছি, তাহা পরে লিখিবার ইচ্ছা আছে !

তুর্য যে বে জায়াগা দখল করিয়াছে, সেখানে রাজশাসন এক কিন্তু আর কোন ঐক্য নাই। সেখানে তুর্কি, গ্রীক, আর্ম্যানি, স্লাভ, হুর্দ, কেহ কাহুরো সঙ্গে না মিশিয়া, এমন কি পরস্পরের সঙ্গে বগড়া করিয়া কোনমতে একত্রে আছে। যে শক্তিতে এক করে, সেই শক্তিই সভ্যতার জননী—সেই শক্তি তুরকরাছোর রাজলক্ষীর মত হইয়া এখনো আবির্ভূত হয় নাই।

প্রাচীন যুরোপে বর্ষের জাতেরা রোমের প্রকাণ্ড সাম্রাজ্যটাকে বাটোয়ায়া করিয়া গইল। কিন্তু তাহারা আপন আপন রাজ্যের মধ্যে মিশিয়া গেল—কোথাও জোড়ের চিহ্ন রাখিল না। জেতা ও বিজিত ভাষায় ধন্য সমাজে একাগ্র হইয়া এক একটি নেশন্-কলেবর ধরিল। সেই যে মিলনশক্তির উদ্ভব হইল, সেটা নানা-প্রকার বিরোধের আঘাতে শক্ত হইয়া স্থানিষ্ঠিত আকার ধরিয়া স্বদীর্ঘকালে এক একটি নেশনকে এক একটি সভ্যতার আশ্রয় করিয়া ভুলিয়াছে।

যে কোন উপলক্ষ্যে হোক অনেক লোকের চিত্ত এক হইতে পারিলে তাহাতে বহুৎ ফল ফলে। যে জনগণসভার মধ্যে সেই এক হইবার শক্তি স্বভাবতই কাজ

করে, তাহাদের মধ্যে হইতেই কোন না কোন প্রকার মহত্ব অবধারণ করিয়া দেখা দেয়, তাহারাই সভ্যতাকে জন্ম দেয়, সভ্যতাকে পোষণ করে। বিভিন্নকে মিলিত করিবার শক্তিই সভ্যতার লক্ষণ। সভ্য যুরোপ জগতে সদ্ভাব বিস্তার করিয়া ঐক্য-সেতু বঁধিতেছে—বর্ষের যুরোপ বিচ্ছেদ, বিনাশ, বাবধান স্বপ্নন করিতেছে, সম্প্রতি চীনে তাহার প্রমাণ পাওয়া গেছে। চীনে কেন, আমরা ভারতবর্ষে যুরোপের সভ্যতা ও বর্ষেরতা উভয়েরই কাছ প্রত্যক্ষ করিতে পাই। সকল সভ্যতার মর্ম্মহুলে মিলনের উক্ত আদর্শ বিরাজ করিতেছে বলিয়াই, সেই আদর্শমূলে বিচার করিয়া বঙ্গরত্নের বিচ্ছেদ অভিযাত্তল্যা দিগুণ বেদনা ও অপমানের সহিত প্রত্যাহ অহুতব করিয়া থাকি।

এই শোকচিন্তের একতা সব দেশে একভাবে সার্থিত হয় না। এই জন্য যুরোপের ঐক্য ও হিন্দুর ঐক্য এক প্রকারের নহে। কিন্তু তাই বলিয়া হিন্দুর মধ্যে যে একটা ঐক্য নাই, সে কথা বলা যায় না। সে ঐক্যকে ন্যাশনাল ঐক্য না বলিতে পারি—কারণ নেশন ও ন্যাশনাল কণাটা আমাদের নহে, যুরোপীয় ভাবের দ্বারা তাহার অর্থ সীমাবদ্ধ হইয়াছে।

* সাহিত্যসমক্ষে “নেশন কি” তৎসম্বন্ধে রেন’র মত অনুমান করিয়া দেওয়া হইয়াছে—তাহার সহিত মিলাইয়া এই গ্রন্থ পাঠ করিতে পাঠকদিগকে অনুরোধ করি।—সম্পাদক।

প্রত্যেক জাতি নিজের বিশেষ ঐক্যকেই স্বভাবতঃ সব চেয়ে বড় মনে করে। তাহাতে তাহাকে আশ্রয় দিয়াছে ও বিরাটু করিয়া তুলিয়াছে। তাহাকে সে মর্মে মর্মে বড় বলিয়া চিনিয়াছে, আর কোন আশ্রয়কে সে আশ্রয় বলিয়া অহুভব করে না। এইজন্য যুরোপের কাছে ন্যাশনাল্ ঐক্য অর্থাৎ রাষ্ট্রতত্ত্বমূলক ঐক্যই প্রেষ্ঠ :—আমরা ও যুরোপীয় গুণের নিকট হইতে সেই কথা গ্রহণ করিয়া পূর্বপুরুষবিগের ন্যাশনাল্ ভাবের অভাবে লক্ষ্য বোধ করিতেছি।

সভ্যতার যে মহৎ গঠনকার্য—বিচিত্রকে এক করিয়া তোলা—হিন্দু ভ্রাতার কি করিয়াছে দেখিতে হইবে। এই এক করিবার শক্তি ও কার্যকে ন্যাশনাল্ নাম দাও বা যে কোন নাম দাও, তাহাতে কিছু আসে যায় না, মানুষবোঁদা গইয়াই বিষয়।

নানা বৃক্ষবিগ্রহ-রক্তপাতের পর যুরোপের সভ্যতা বাহাদিগকে এক মেশনে বাধিয়াছে, তাহার সর্বণ। ভাষা ও কাপড় এক হইয়া গেলেই, তাহাদের আর কোন এতদেব চোখে পড়িবার ছিল না। তাহাদের কে জ্ঞেতা কে জিত, সে কথা তুলিয়া যাওয়া কঠিন ছিল না। মেশন গড়িতে যেমন স্বতির দরকার, তেমনি বিপতির দরকার—মেশনকে বিচ্ছেদ-বিরোধের কথা বহু শীঘ্র সম্ভব তুলিতে হইবে। যেখানে দুইপক্ষের চেহারা এক, বর্ণ এক, সেখানে সকলপ্রকার বিচ্ছেদের কথা তোলা সহজ—সেখানে একত্রে থাকিলে মিলিয়া যাওয়াই স্বাভাবিক।

অনেক দৃষ্টি-বিরোধের পরে হিন্দু-

সভ্যতা বাহাদিগকে এক করিয়া গইয়াছিল, তাহার অসর্বণ। তাহার স্বভাবতই এক নহে। তাহাদের সঙ্গে আধ্যাত্মিকতার বিচ্ছেদ শীঘ্র তুলিবার উপায় ছিল না।

আমেরিকা অষ্ট্রেলিয়ার কি ঘটনায়ে ? যুরোপীয়গণ যখন সেখানে পদার্পণ করিল, তখন তাহারা শূন্য, শূন্য প্রতি প্রীতি করিবার মত্রে লীকিত। কিন্তু আমেরিকা অষ্ট্রেলিয়ার আদিম অধিবাসীদিগকে বেশ হইতে একেবারে উৎপলিত না করিয়া তাহারা ছাড়ে নাই—তাহাদিগকে পণ্ডর মত হত্যা করিয়াছে। আমেরিকা ও অষ্ট্রেলিয়ার যে মেশন বাধিয়াছে, তাহার মধ্যে আদিম অধিবাসীরা নিশিয়া যাইতে পারে নাই।

হিন্দুসভ্যতা যে এক অত্যাশ্চর্য্য প্রকাণ্ড সমাজ বাধিয়াছে, তাহার মধ্যে যান পায় নাই এমন জ্ঞাত নাই। প্রাচীন শক-জাতীয় জাতি ও রাজপুত ; মিশ্রজাতীয় নেপালী, আদামী, রাজবংশী ; দ্রাবিড়ী তৈলগী, নায়ার,—সকলে আপন ভাষা, বর্ণ, ধর্ম ও আচারের নানা গুণেই সম্বন্ধ স্থাপিত হিন্দুসভ্যতার একটি বৃহৎ সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া একত্রে বাস করিতেছে। হিন্দুসভ্যতা এত বিচিত্র লোককে আশ্রয় দিতে গিয়া নিজেকে নানাপ্রকারে বঞ্চিত করিয়াছে, কিন্তু তবু তাহাকেও পরিত্যাগ করে নাই—উচ্চ, নীচ, দর্ব, অসর্ব, সকলকেই ঘনিষ্ঠ করিয়া বাধিয়াছে, সকলকে ধর্মের আশ্রয় দিয়াছে, সকলকে কর্তব্যপথে সংযত করিয়া শৈলিগা ও অধঃপতন হইতে টানিয়া রাখিয়াছে।*

তেনা। বেধাইয়াছেন, নেশনের মূল লক্ষণ কি, তাহা বাহির করা শক্ত। জাতির ঐক্য, ভাষার ঐক্য, ধর্মের ঐক্য, বেশের স্তম্ভান, এ-সকলের উপরে ন্যায়নাগবের একান্ত নির্ভর নহে। তেমনি হিন্দুদের মূল কোথায়, তাহা নির্ণয় করিয়া বলা শক্ত। নানা জাতি, নানা ভাষা, নানা ধর্ম, নানা-প্রকার বিজ্ঞান আচার-বিচার হিন্দুসমাজের মধ্যে স্থান পাইয়াছে।

পরিধি বৃত্ত বৃহৎ, তাহার কেন্দ্র খুঁজিয়া পাওয়া ভড়ই শক্ত। হিন্দুসমাজের ঐক্যের কেন্দ্র নিরতিশয় বৃহৎ, সেটাজানা এত বিশাল যে ও বৈচিত্র্যের মধ্যে তাহার মূল আশ্রয়টি বাহির করা সহজ নহে।

উপাধায় মহাশয় হিন্দুদের মূল উপাদান সম্বন্ধে মত ব্যক্ত করিবেন, আশ্বাস দিয়া রাখিয়াছেন, আমরা এ সম্বন্ধে আলোচনার সেই সুযোগ প্রাপ্তীক করিয়া রহিলাম।

এ স্থলে আমাদের প্রশ্ন এই, আমরা প্রধানতঃ কোন্ দিকে মন দিব? ঐক্যের কোন্ আদর্শকে প্রাধান্য দিব?

রাষ্ট্রনৈতিক ঐকাচেটাকে উপেক্ষা করিতে পারি না। কারণ, মিলন বৃত্ত প্রকারে হয় ভড়ই ভাল। কনগ্রেসের সভার বাহারা উপস্থিত হইয়াছেন, তাঁহারাই ইহা অস্বস্ত্য করিয়াছেন যে, সমস্তই যদি বার্থ হয়, তথাপি মিলনই কনগ্রেসের চরম ফল। এই মিলনকে যদি রক্ষা করিয়া চলি, তবে মিলনের উপলক্ষ্য বিফল হইলেও, ইহা নিজেই কোন না কোন দিকে মার্গক করিবেই—দেশের সঙ্গে কোনটা মুখা ব্যাপার, ভাষা আবিষ্কার করিবেই—যাহা

রূপা এবং কথিক, তাহা আপনি পরিহার করিবে।

কিন্তু এ কথা আমাদেরকে বৃষ্টিতে হইবে, আমাদের দেশে সমাজ সকলের বড়। অন্য দেশে নেশন নানা বিপ্লবের মধ্যে আত্মরক্ষা করিয়া জয়ী হইয়াছে—আমাদের দেশে তদপেক্ষ। দীর্ঘকাল সমাজ নিজেই সকল প্রকার দলবন্ডের মধ্যে রক্ষা করিয়াছে। আমরা যে হাজার বৎসরের বিপ্লবে, উৎপীড়নে, পরাধীনতার, অসংপত্তনের শেষ সীমার তলাইয়া যাই নাই, এখনো যে আমাদের নিঃশ্রেণীর মধ্যে সাধুতা ও তত্ত্বমণ্ডলীর মধ্যে মহাধর্মের উপকরণ রহিয়াছে, আমাদের আশ্রয় সংযম এবং ব্যবহারে শীলতা প্রকাশ পাইতেছে, এখনো যে আমরা পদে পদে ত্যাগবীকার করিতেছি, বহুভাষের ধনকে সকলের সঙ্গে ভাগ করিয়া ভোগ করাই শ্রেয়ঃ বলিয়া জানিতেছি, সাহেবের বেহারী সাতটাকা বেতনের তিনটাকা পেটে খাইয়া চারটাকা বাড়ী পাঠাইতেছে, পনেরো টাকা বেতনের মুহুরি নিজে আধমরা হইয়া ছোটভাইকে কলেজে পড়াইতেছে—সে কেবল আমাদের প্রাচীন সমাজের জোরে। এ সমাজ আমাদের মিলকে অধিক বড় বলিয়া জানায় নাই—সকল কথাতেই, সকল কাজেই, সকল সম্পর্কেই, কেবল কল্যাণ, কেবল পুণ্য এবং ধর্মের মন্ত্র কাণে দিরাছে। সেট সমাজকেই আমাদের সর্বোচ্চ আশ্রয় বলিয়া তাহার প্রতিই আমাদের বিশেষ করিয়া দৃষ্টিকোণ করা আবশ্যিক।

কেহ কেহ বলিবেন, সমাজ ত আছেই,

সে ত আমাদের পূর্ণপুরুষ গড়িয়া রাখিয়াছেন, আমাদের কিছুই করিবার নাই ।

এইখানেই আমাদের অধঃপতন হইয়াছে । এইখানেই বর্তমান যুরোপীয় সভ্যতা বর্তমান হিন্দুসভ্যতাকে জিতিয়াছে ।

যুরোপের নেশন একটি সজীব সত্তা । অতীতের সহিত নেশনের বর্তমানের যে কেবল ছড় সঞ্চ, তাহা নহে—পূর্ণপুরুষ প্রাপ্যতা করিয়া কাজ করিয়াছে এবং বর্তমান পুরুষ চোখ বুজিয়া ফল ভোগ করিতেছে তাহা নহে । অতীত-বর্তমানের মধ্যে নিরন্তর চিত্তের সঞ্চ আছে—অথও কল্পপ্রবাহ চলিয়া আসিতেছে । এক অংশ প্রবাহিত, আর এক অংশ বহু, এক অংশ প্রক্ষলিত, অপরাংশ মিশ্রিত, একত্র নহে । সে হইলে ত সঞ্চবিচ্ছেদ হইয়া গেল—জীবনের সহিত সৃষ্টির কি সম্পর্ক ?

কেবলমাত্র অলসভক্তিতে যোগসাধন করে না—বরং তাহাতে দূরে লইয়া যায় । ইংরাজ বাহা পথে, বাহা খায়, বাহা বলে, বাহা করে, সবই ভাল, এই ভক্তিতে আনান্নিককে অল্প অহুঙ্করণে প্রসূত করে—তাহাতে আসল ইংরাজ হইতে আনান্নিককে দূরে লইয়া যায় । কারণ, ইংরাজ একদম নিকরান অহুঙ্করণকারী নহে । ইংরাজ স্বাধীন চিন্তা ও চেষ্টার জোরেই বড় হইয়াছে—পরের-পড়া ভিনিব অলসভাবে ভোগ করিয়া তাহার ইংরাজ হইয়া উঠে নাই । সুতরাং ইংরাজ সাজিতে গেলেই প্রকৃত ইংরাজ আনানের পক্ষে হুল্লভ হইবে ।

তেননি আনানের পিতামহেরা যে বড়

হইয়াছিলেন সে কেবল আমাদের প্রতিপত্তা-মহদের কালের উপরে নিকলভাবে শমন করিয়া নহে । তাহার ধ্যান করিয়াছেন, বিচার করিয়াছেন, পরীক্ষা করিয়াছেন, পরিবর্তন করিয়াছেন, তাহার চিত্তবৃত্তি সচেষ্ট ছিল, সেইজন্যই তাহার বড় হইতে পারিয়াছেন । আমাদের চিত্ত যদি তাহার সেই চিত্তের সহিত যোগবদ্ধ না হয়, কেবল তাহার কৃত কর্তব্যের সহিত আমাদের জড়লব্ধ থাকে, তবে আমাদের আর ঐক্য নাই । পিতামহের সহিত পুত্রের জীবনের যোগ আছে—তাহাদের মৃত্যু হইলেও জীবনক্রিয়া পুত্রের দেহে একই রকমে কাজ করে । কিন্তু আমাদের পূর্ণপুরুষের নান্দী শক্তি যে তাহা কাজ করিয়াছে, আনানের মনে যদি তাহার কোন নিদর্শন না পাই—আমরা যদি কেবল তাহার অবিচ্ছিন্ন অহুঙ্করণ করিয়া চলি, তবে যুক্তি আনানের মধ্যে আমাদের পূর্ণপুরুষ আর সজীব নাই । পনের বাড়ি-পরা বায়ার নারদ যেমন দেববি নারদ, আমরাও তেননি আর্গা । আমরা একটা বড়রক্তের বায়ার দল—গ্রাম্যভাষায় এবং কৃত্রিম সাজসজ্জায় পূর্ণপুরুষ সাজিয়া অভিনয় করিতেছি ।

পূর্ণপুরুষের সেই চিত্তকে আমাদের জড় সমাজের উপর ঝাণাটয়া তুলিলে, তবেই আমরা বড় হইব । আনানের সমস্ত সমাজ যদি প্রাচীন মহৎ-বৃত্তি ও মহৎ ভাবের দ্বারা আঘোপাত সজীব সচেষ্ট হইয়া উঠে—নিজের সমস্ত অপেক্ষাপ্রতাপে বচনতাকীর জীবনপ্রবাহ অহুঙ্করণ করিয়া আপনাকে

সবল ও সচল করিয়া। ভোগে, তবে রাষ্ট্রীয় পরাধীনতা ও অস্ত্র সকল প্রগতি তুচ্ছ হইয়া বাইবে। সমাজের সচেতন স্বাধীনতা অন্য সকল স্বাধীনতা হইতেই বড়।

জীবনের পরিবর্তন বিকাশ, বৃত্তার পরি-
বর্তন বিকাশ। আমাদের সমাজেও দ্রুত-
বেগে পরিবর্তন চলিতেছে, কিন্তু সমাজের
অভ্যন্তরে সচেতন অন্তঃকরণ নাই বলিয়া,
সে পরিবর্তন বিকাশ ও বিশেষণের
দিকে বাইতেছে—কেহ তাহা ঠেকাইতে
পারিতেছে না।

সজীব পদার্থ সচেতনভাবে বাহিরের
অবস্থাকে নিজের অনুকূল করিয়া আনে—
আর নিষ্কীব পদার্থকে বাহিরের অবস্থাই
সবলে আঘাত করিয়া নিজের আয়ত করিয়া
লয়। আমাদের সমাজে যাহা কিছু পরি-
বর্তন হইতেছে, তাহাতে চেতনার কার্য
নাই, তাহাতে বাহিরের সঙ্গে স্তিত্বের
সঙ্গে কোন সামঞ্জস্যচেষ্টা নাই—বাহির
হইতে পরিবর্তন ঘাড়ের উপর আসিয়া
পড়িতেছে এবং সমাজের সমস্ত সক্তি শিথিল
করিয়া দিতেছে।

“ নুতন অবস্থা, নুতন শিক্ষা, নুতন জাতির
সহিত সংঘর্ষ—ইহাকে অস্বীকার করা যায়
না। আমরা যদি এমন ভাবে চলিতে ইচ্ছা
করি, যেন ইহারা নাই, যেন আমরা তিন-
সহস্র বৎসর পূর্বে বসিয়া আছি, তবে সেই
তিনসহস্র বৎসর পূর্বেকার অবস্থা আমা-
দিগকে কিছুমাত্র সাহায্য করিবে না এবং
বর্তমান পরিবর্তনের, বন্যা আমাদেরিগকে
ভাসাইয়া লইয়া বাইবে। আমরা বর্তমানকে
স্বীকারনাশ না করিয়া পূর্বপুরুষের মোহাট

মানিলেও পূর্বপুরুষ সাড়া দিবেন না।
আমাদের পূর্বপুরুষ আমাদের মোহাই
পাড়িয়া বলিতেছেন, বর্তমানের সহিত
সঙ্গি করিয়া আমাদের কীর্তিকে রক্ষা কর,
তাহার প্রতি অঙ্গ হইয়া। ইহাকে সমূলে
ধ্বংস হইতে দিও না। আমাদের ভাব-
সূত্রটিকে রক্ষা করিয়া সচেতনভাবে এক
কালের সহিত আর এক কালকে মিলাইয়া
লও, নহিলে সূত্র আপনি ছিন্ন হইয়া বাইবে।

কি করিতে হইবে? নেশনের প্রত্যেকে
ন্যাসন্যাস স্বার্থ রক্ষার জন্য নিজের স্বার্থ
বিশর্জন দিয়া থাকে। যে সময় হিন্দুসমাজ
সজীব ছিল, তখন সমাজের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ
সমস্ত সমাজকলণের স্বার্থকেই নিজের
একমাত্র স্বার্থ জ্ঞান করিত। রাজা সমা-
জেরই অঙ্গ ছিলেন, সমাজ সংরক্ষণ ও
চলনার ভার ছিল তাহার উপর—ব্রাহ্মণ,
সমাজের মধ্যে সমাজধর্মের বিভিন্ন আদর্শকে
উজ্জ্বল ও চিরস্থায়ী করিয়া রাখিবার জন্য
নিযুক্ত ছিলেন—তাহাদের ধ্যানজ্ঞান শিক্ষা-
সাধনা সমস্তই সমাজের সম্পত্তি ছিল।
গৃহস্থই সমাজের গুপ্ত বলিয়া গৃহাশ্রম এমন
গৌরবের বলিয়া গণ্য হইত। সেই গৃহকে
জ্ঞানে, ধর্মে, ভাবে, কর্মে, সমুদ্রত রাখিবার
জন্ত সমাজের বিচিত্রশক্তি বিচিত্রবিক্রে
সচেতনভাবে কাজ করিত। তখনকার নিয়ম
তখনকার অসুষ্ঠান তখনকার কালের হিসাবে
নিরর্থক ছিল না।

এখন সেই নিয়ম আছে, সেই চেতনা
নাই। সমস্ত সমাজের কল্যাণের প্রতি
লক্ষ রাখিয়া তাহার অঙ্গপ্রত্যঙ্গের সচেতনতা
নাই। আমাদের পূর্বপুরুষের সেই নিয়মত-

আশ্রিত মঙ্গলের তাৎক্ষণিক সদয়ের মধ্যে
 প্রাণবৎ রূপে প্রতিষ্ঠিত করিয়া সমাজের
 সর্বত্র তাহাকে প্রয়োগ করি, তবেই বিপুল
 হিন্দুসভ্যতাকে পুনর্জীবিত প্রাপ্ত হইব।
 সমাজকে শিকাদান, স্বাস্থ্যদান, অন্নদান,
 ধন-সম্পদ-দান, ইহা আমাদের নিজের কর্তব্য;
 ইহাতেই আমাদের মঙ্গল,—ইহাকে বাণিজ্য-
 হিসাবে দেখা নহে, ইহার বিনিময়ে পুণ্য
 ও কল্যাণ ছাড়া আর কিছুই আশা না করা,
 ইহাই যজ্ঞ। ইহাই ব্রহ্মের সহিত কর্তব্যযোগ।
 এই কথা নিরন্তর গণনা করা, ইহাই হিন্দুত্ব।
 স্বার্থের আদর্শকেই মানবসমাজের কেন্দ্র-
 হলে না স্থাপন করিয়া, ব্রহ্মের মধ্যে
 মানবসমাজকে নিরীকণ করা ইহাই হিন্দুত্ব।
 ইহাতে পণ্ড হইতে বহুধা পথান্ত সকলেরই
 প্রতি কল্যাণভাব পরিব্যাপ্ত হইয়া যায়
 এবং নিরন্তর অভ্যাসে স্বার্থপরিত্যক্ত করা
 নিখাসভ্যাগের ন্যায় সহজ হইয়া আসে।
 সমাজের নীচে হইতে উপর পর্যন্ত সকলকে

একটি বৃহৎ নিঃস্বার্থ কল্যাণবন্ধনে বাঁধা,
 ইহাই আমাদের সকল চেষ্টার অপেক্ষা বড়
 চেষ্টার বিষয়। এই ঐক্যবৃদ্ধেই হিন্দু-
 সমাজের একের সহিত অন্যের এবং বর্ত-
 মানের সহিত অতীতের ধর্মযোগ সাধন
 করিতে হইবে। আমাদের সমুদায়লোকের
 এই একমাত্র উপায়। রাষ্ট্রনীতিক চেষ্টায়
 যে কোন কল নাই, তাহা নহে; কিন্তু সে
 চেষ্টা আমাদের সামাজিক ঐক্যসাধনে
 কিয়ৎকাল সাহায্য করিতে পারে, এই তাহার
 প্রধান দোষ। অসামান্য প্রতিভাশালী
 দূরদর্শী ব্রাহ্মণে কংগ্রেসমিগনকে সার্থক
 করিবার জন্যই তাহার সহিত সামাজিক
 আলোচনাসভা যোগ করিয়াছিলেন; সেজন্য
 তাঁহাকে বিরোধ ও উপহাস সহ্য করিতে
 হইয়াছিল। কিন্তু মাহাত্ম্যকে জনসাধারণের
 সম্মুখে উজ্জল করিবার নিমিত্তই ঈশ্বর মহৎ
 লোকদের জন্য পদে পদে অসিগম্যকার
 আয়োজন প্রস্তুত করিয়া দেন।

—:O:—

বাদল-গাথা ।

বিরামঝিহীন করে বারিধারা ;
 জ্বলোক তুলোক মদে মাতোয়ারা ।
 নোর চারিপাশ শুধু ছা-ছতাপ ;
 আর কাহার নাট দেখা—
 আমি একা, আমি একা !

ডমক বাজারে নাচে বেহদল,
 ঢেলা চপলা হাসে খলখল ;
 নীলিমার গায় বাদল-গাথা
 ফুটে রোমকের রেখা—
 আমি একা, আমি একা !

জমরি জমরি বেড়ার বাতাস,
এই ঢুলে' পড়ে, এই কালে হাস ;
কঙ্ক ঘরে ঘরে দিবা দিগ্রহরে
শ্রমপত্র হয় লেখা।—
আমি একা, আমি একা !
ভাহক ভাহকী লাগি' পাথে পাথে
কি মধু-ব্যপার বহু বহু ডাকে ;
মধুরীরা কাছে কি আসি রে যাচে

উতলা শিবীর কেকা ?—
আমি একা, আমি একা !
ঘন—ঘনতর নানে বাহিধারা ;
সারা বিশ্ব আজ কেঁপে হ'ল সারা।
সাবিত্রী কাদিয়া ফিরে এল হিরা,
কেহ ত দিল না বেধা।—
আমি একা, আমি একা !
শ্রীশ্রমপনাথ রায় চৌধুরী ।

নিউটনের দুইটি প্রসিদ্ধ সিদ্ধান্ত হইতে একটি নূতন সিদ্ধান্তের ব্যবকলন ।

প্রথম সিদ্ধান্ত ।

(নিউটনের)

চলমান বস্তু চলিতে চলিতে যদি পথি-
মধ্যে স্থির হইয়া পীড়ার, তবে সে বস্তু
বাহিরের শক্তিকর্তৃক প্রতিকূল হইয়াই
স্থির হইয়া পীড়ার ।

দ্বিতীয় সিদ্ধান্ত ।

(নিউটনের)

যে বস্তু যে স্থানে স্থির হইয়া পীড়ার, সে
বস্তু যদি সে স্থানে হইতে পুনরায় চলিতে
আরম্ভ করে, তবে বাহিরের শক্তিকর্তৃক
চলিত হইয়া চলিতে আরম্ভ করে ।

তৃতীয় সিদ্ধান্ত ।

(লেখকের)

চলমান বস্তু যে মুহূর্ত্তে যে স্থানে উপস্থিত
হয়, সেই মুহূর্ত্তে সেই স্থানে স্থির হইয়া
পীড়ার ।

প্রমাণ ।

এরূপ যদি হয় যে, ম-মুহূর্ত্তে ক-বস্তু
চ-স্থানে উপস্থিত হইয়াছে, তবে এ কথা
স্বীকার করিতেই হইবে যে, ম-মুহূর্ত্তে ক-বস্তু
চ-স্থানে স্থির হইয়া পীড়াইয়াছে । তাহা যদি
স্বীকার না কর; যদি বল যে, ম-মুহূর্ত্তে
ক-বস্তু চ-স্থানে উপস্থিত হইয়াছে, এ কথা

সত্য হইলেও, ম-মুহুর্তে ক-বস্ত চ-স্থানে স্থির হইয়া না দাঁড়াইতেও পারে, তবে তোমার সে কথা আপনাকে আপনি খণ্ডন করিবে; বখা —

তুমি বলিতেছ—

ম-মুহুর্তে ক-বস্ত চ-স্থানে উপস্থিত হইয়াছে,.....(স) কিন্তু স্থির হইয়া দাঁড়ায় নাই ।

ম-মুহুর্তে ক-বস্ত চ-স্থানে উপস্থিত হইয়াও বখন সে মুহুর্তে (ম-মুহুর্তে) সে স্থানে (চ-স্থানে) স্থির হইয়া দাঁড়ায় নাই, তখন তাহাতেই প্রতিপন্ন হইতেছে যে, ম-মুহুর্তে ক-বস্ত চ-স্থানে হইতে বিচালিত হইয়াছে, অর্থাৎ চ-স্থানে হইতে সরিয়া স্থানান্তরে উপস্থিত হইয়াছে, স্ততঃ।

ম-মুহুর্তে ক-বস্ত চ-স্থানে উপস্থিত নাই
.....(ক)

গোড়ায় বলিয়াছে, ম-মুহুর্তে ক-বস্ত চ-স্থানে উপস্থিত, তার সাক্ষী (স) ।

এখন বলিতেছ, ম-মুহুর্তে ক-বস্ত চ-স্থানে অস্থাপস্থিত, তার সাক্ষী (ক) ।

অতএব তোমার কথার আদি-অন্ত জোড়া থিয়া এইরূপ দাঁড়াইতেছে যে, একই অভিন্ন মুহুর্তে (ম-মুহুর্তে) ক-বস্ত চ-স্থানে উপস্থিত এবং অস্থাপস্থিত—বাহ্য একান্ত পক্ষেই অসম্ভব ।

অতএব-প্রতিপক্ষের কথা খণ্ডিত হইয়া গিয়া স্বপক্ষের এই কথাই বলবৎ রহিল যে, চলমান বস্ত যে মুহুর্তে যে স্থানে উপস্থিত হয়, সে মুহুর্তে সেই স্থানে স্থির হইয়া দাঁড়ায় ।

চতুর্থ সিদ্ধান্ত ।

চলমান বস্তমাত্রই দুই দুই মুহুর্তে পর্যায়ক্রমে প্রতিকৃৎ এবং চালিত হয়;—
দুইই হয় বাহিরের শক্তি দ্বারা ।

প্রমাণ ।

প্রথমত তৃতীয় সিদ্ধান্ত অনুসারে পাওয়া যাইতেছে যে, চলমান বস্ত যে মুহুর্তে যে স্থানে উপস্থিত হয়, সে মুহুর্তে সেই স্থানে স্থির হইয়া দাঁড়ায় ।

দ্বিতীয়ত চলমান বস্ত দুই মুহুর্ত ফোনো-একটি স্থানে স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া থাকে না—ইহা দেখিতেই পাওয়া যাইতেছে ।

অতএব এটা স্থির যে, চলমান বস্ত যে মুহুর্তে যেখানে উপস্থিত হয়, সেই মুহুর্তে সেখানে স্থির হইয়া দাঁড়ায় এবং তাহার পর-মুহুর্তে সেখানে হইতে স্থানান্তরে প্রাবৃত্ত হয় ।

অতএব এখানকার প্রথম এবং দ্বিতীয় (নিউটনের) সিদ্ধান্ত অনুসারে দাঁড়াইতেছে যে, চলমান বস্ত যে মুহুর্তে যেখানে উপস্থিত হয়, সেই মুহুর্তে সেখানে বাহিরের শক্তিদ্বারা প্রতিকৃৎ হইয়া স্থির হইয়া দাঁড়ায়, এবং তাহার পরমুহুর্তে বাহিরের শক্তি দ্বারা চালিত হইয়া স্থানান্তরে প্রাবৃত্ত হয় ।

তবেই হইতেছে যে, চলমান বস্তমাত্রই দুই দুই মুহুর্তে পর্যায়ক্রমে (অর্থাৎ পাল্যাক্রমে, alternately) প্রতিকৃৎ এবং চালিত হয় ।

মন্তব্য ।

নিউটনের একটি সুপ্রসিদ্ধ সিদ্ধান্ত এই যে, চলমান বস্তু প্রতিরুদ্ধ না হইয়া গমনিতে পারে না এবং স্থির বস্তু চালিত না হইয়া চলিতে পারে না। এই সিদ্ধান্ত হইতে এখানে একটি নূতন সিদ্ধান্ত টানিয়া বাহির করা হইতেছে এই যে, চলমান বস্তু হই দুই মুহূর্তে পর্যায়ক্রমে প্রতিরুদ্ধ এবং চালিত হয়। এরূপ হইতে পারে না যে, নিউটনের সিদ্ধান্ত সত্য-সিদ্ধান্ত—এখানকার নূতন সিদ্ধান্ত মিথ্যা-সিদ্ধান্ত; কেন না, এখানকার নূতন সিদ্ধান্তটি যে, নিউটনের সিদ্ধান্তের অবশেষাবধি ফল, তাহার অকাটা প্রমাণ উপরে বিধিনতে প্রদর্শিত হইয়াছে। অতএব যদি সত্য হয়, তবে উভয় সিদ্ধান্তই সত্য; যদি মিথ্যা হয়, তবে উভয় সিদ্ধান্তই মিথ্যা। নিউটনের আকর্ষিত আনুভূতিক এবং আতিকেন্দ্রিক (centripetal এবং centrifugal) শক্তির সহিত এখানকার প্রতিরোধক-শক্তি এবং চালক-শক্তির সৌম্যদৃশ্যের কতকটা অভ্যাস পাওয়া যায়; তাহা এই:—

মনে কর একগাছি দড়ির এক প্রান্তে একবণ্ড সীসা বাধিয়া উহার বিপরীত প্রান্ত ধরিয়া সীসাটাকে দ্রুতগতি ঘুরানো বাইতেছে। এরূপ হলে, চালক-শক্তির প্রভাবে সীসাটা ঘূর্ণায়কের হস্ত হইতে দূরে প্রধাবিত হইয়া দড়িটাকে বাহিরের দিকে টানিতেছে, এবং ঘূর্ণায়কের হস্তের রোধক-শক্তি দড়িটাকে উহার বিপরীত দিকে টানিতেছে। আমার এইরূপ মনে হয় যে, দড়িটা দুই দুই মুহূর্তে পর্যায়ক্রমে প্রসারিত এবং

প্রতিরুদ্ধ হয়। এরূপ মনে হইবার বিশেষ একটি কারণ আছে, তাহা এই:—

সীসাটাকে ঘুরাইতে ঘুরাইতে দড়িটা যদি কোনো মুহূর্তে বেনীমাত্রা প্রসারিত হইয়া হস্ত হইতে উড়িয়া পলাইবার উপক্রম করে, তবে তাহার অবাবহিত পরমুহূর্তে ঘূর্ণায়ক দড়িটার দ্রুতগতি বেনীমাত্রা বলের সহিত ঋতিয়া ধরে। দড়ি বেনীমাত্রা প্রসারিত হইলে, পরে ঘূর্ণায়ক বেনীমাত্রা বলের সহিত দ্রুতগতি ঋতিয়া ধরে। কাজেই বলিতে হইতেছে যে, এরূপ হলে চালক-শক্তি এবং রোধক-শক্তি পূর্ণাঙ্গের দুই মুহূর্তে পর্যায়ক্রমে কার্য্য করে। এখানে চালক-শক্তি আতিকেন্দ্রিক (centrifugal)—অর্থাৎ কেন্দ্রের নিকট অতিক্রম করিয়া সীসাটাকে দূরে নিক্ষেপ করিতে চেষ্টা করে, এবং রোধক-শক্তি আনুভূতিক centripetal—অর্থাৎ সীসাটাকে কেন্দ্রের দিকে টানিয়া রাখিতে চেষ্টা করে, ইহা দেখিতেই পাওয়া যাইতেছে। ফলকথা এই যে, কবিতার ছন্দে যেমন গদ্য-গুণক মাত্রা পর্যায়ক্রমে সন্নিবেশিত হয়, তেমনি বিশ্বরুদ্ধাভের সর্বত্র রোধক-চালক, আনুভূতিক-আতিকেন্দ্রিক, রাতি-দিবা, কৃষ্ণপক-ভূগলপক, উত্তরায়ণ-নক্ষত্রায়ণ প্রভৃতি যুগলগণ পর্যায়ক্রমে তরঙ্গিত হইতেছে—এই সর্বত্র সত্যটি অবাচিতভাবে আমাদের চক্ষের সম্মুখে প্রতিনিরত উপস্থিত হয় বলিয়া আমরা হেলা করিয়া তাহা দেখিবারে দেখি না। কথার বলে—“গোয়ে গোয়া ডিখ পায় না।”

শ্রীপ্রজ্ঞেননাথ ঠাকুর।

সাহিত্য-প্রসঙ্গ ।

নেশন কি ?

(রেনীর মত ।)

“নেশন্ ব্যাশারটা কি —” হু প্রসিদ্ধ ফরাসী ভাবুক রেনী এই প্রশ্নের আলোচনা করিয়াছেন। কিন্তু এ সবকে তাঁহার মত ব্যাখ্যা করিতে হইলে, প্রথমে চুই একটা লক্ষ্যে দ্রষ্ট করিয়া লইতে হইবে।

স্বীকার করিতে হইবে, বাঙালার ‘নেশন’-তথ্য প্রতিশব্দ নাই। চলিত-ভাষার সাধারণতঃ জাতি বলিতে বর্ণ বুঝায়; এবং জাতি বলিতে ইংরাজিতে যাহাকে race বলে, তাহাও বুঝাইয়া থাকে। আমরা ‘জাতি’-শব্দ ইংরাজি ‘রেস’-শব্দের প্রতিশব্দরূপেই ব্যবহার করিব,—এবং নেশনকে নেশনই বলিব। নেশন্ ও ন্যাশনাল্ শব্দ বাঙালার চলিয়া গেলে অনেক অর্থবৈধ-ভাববৈধের হাত এড়ান যায়।

‘ন্যাশনাল্ কন্‌গ্রেস’ শব্দের তর্জমা করিতে আমরা ‘জাতীয় মহাসভা’ ব্যবহার করিয়া থাকি—কিন্তু জাতীয় বলিলে বাঙালী-জাতীয়, মারাঠী-জাতীয়, শিখ-জাতীয়, যে কোন জাতীয় বুঝাইতে পারে—ভারতবর্ষের সর্বজাতীয় বুঝায় না। মারাঠী ও বখাতি, ‘ন্যাশনাল’-শব্দের অসুবিধাচেষ্টার জাতিশব্দ ব্যবহার করেন নাই। তাহারা স্থানীয় ন্যাশনাল্ সভাকে

মহাজনসভা ও পার্লামেন্টিক সভা নাম দিয়াছেন—বাঙালী কোনপ্রকার চেষ্টা না করিয়া ‘ইন্ডিয়ান অ্যাগ্লোসিয়েশন্’ নাম দিয়া নিকৃতিগাও করিয়াছে। ইহাতে মারাঠী প্রকৃতি জাতির সহিত বাঙালীর ধেন একটা প্রভেদ গণিত হয়—সেই প্রভেদে বাঙালীর আন্তরিক ন্যাশনালিষ্টের দুর্জলতাই প্রমাণ করে।

‘মহাজন’ শব্দ বাঙালার একমাত্র অর্থে ব্যবহৃত হয়, অন্য অর্থে চলিবে না। ‘পার্লামেন্টিক’ শব্দকে বিশেষণ আকারে নেশন্ শব্দের প্রতিশব্দ করা যায় না। ‘ফরাসী সর্বজন’ শব্দ ‘ফরাসী নেশন্’ শব্দের পরিবর্তে সঙ্গত ভিনিতে হয় না।

‘মহাজন’ শব্দ ত্যাগ করিয়া ‘মহাজাতি’ শব্দ গ্রহণ করা যাইতে পারে। কিন্তু ‘মহৎ’ শব্দ মহৎসূচক বিশেষণরূপে অনেকস্থলেই নেশনশব্দের পূর্বে আবশ্যক হইতে পারে। সেক্ষপ যুলে ‘গ্রেট নেশন্’ বলিতে গেলে ‘মহতী মহাজাতি’ বলিতে হয় এবং তাহার বিপরীত বুঝাইবার প্রয়োজন হইলে ‘লিটল মহাজাতি’ বলিয়া হাস্যভাজন হইবার সম্ভাবনা আছে।

কিন্তু নেশন্-শব্দটা অধিকৃত আকারে গ্রহণ করিতে আমি কিছুমাত্র সঙ্কোচ বোধ করি না। তাবটা আমরা ইংরাজের কাছে হইতে পাইয়াছি। তাহাটাও ইংরাজি

বাধিয়া গণ স্বীকার করিতে প্রস্তুত আছি। উপনিষদের ব্রহ্ম, শব্দের মাত্রা ও বৃক্ষের নির্মাণ পক্ষ ইংরাজির চেনার প্রায় অস্বাভাবিক হয় না, এবং না হওয়াই উচিত।

য়েনী বলেন, প্রাচীনকালে ‘নেশন্’ ছিল না। ইজিপ্ট, চীন, প্রাচীন কাল-ডিয়া, ‘নেশন্’ জানিত, না। আসিরিয়, পারসিক ও আলেক্সান্দ্রিয়ার সাম্রাজ্যকে কোন নেশনের সাম্রাজ্য বলা যায় না।

রোম সাম্রাজ্য নেশনের কাছাকাছি গিয়াছিল। কিন্তু সম্পূর্ণ নেশন্ বাঁধিতে না বাঁধিতে বর্ধমানের অস্তিত্ব তাহা ভাঙিয়া ছুঁয়া হইয়া গেল। এই সকল ছুঁয়া বহনতাপী ধরিত্রী নানা প্রকার সংঘাতে ক্রমে নানা বাঁধিয়া নেশন্ হইয়া পাড়াইয়াছে, এবং ফ্রান্স, ইংলণ্ড, জার্মানি ও রাশিয়া সকল নেশনের শীর্ষস্থানে রাখা তুলিয়াছে।

কিন্তু ইহারা নেশন্ কেন? হুই-জর্জ ও তাহার বিবিধ জাতি ও ভাষাকে লইয়া কেন নেশন্ হইল, অষ্ট্রিয়া কেন কেবলমাত্র রাষ্ট্র হইল, ‘নেশন্’ হইল না?

কোন কোন রাষ্ট্রতত্ত্ববিদ বলেন, নেশনের মূল রাষ্ট্র। কোন বিজয়ী বীর প্রাচীনকালে লড়াই করিয়া দেশ জয় করেন, এবং দেশের লোক কালক্রমে তাহা জুলিয়া যায়, সেই রাষ্ট্রবংশ কেন্দ্রবিন্দু হইয়া নেশন্ পাকাইয়া তোলে। ইংলণ্ড, স্কটলণ্ড, আয়ারলণ্ড পূর্বে এক ছিল না, তাহাদের এক হইবার কারণও ছিল না, রাজার প্রত্যাপে ক্রমে তাহারা

এক হইয়া আসিয়াছে। নেশন্ হইতে ইটালির এত বিলম্ব করিবার কারণ এই যে, তাহার বিস্তার ছোট ছোট রাজ্যের মধ্যে কেহ একজন মধ্যবর্তী হইয়া সবত ঘেষে ঐক্যবিত্তার করিতে পারেন নাই।

কিন্তু এ নিয়ম সকল জায়গায় খাটে নাই। যে হুইজর্জ ও আন্তেরিকার দুনাইটেড্, ষ্টেট্ ক্রমে ক্রমে সংযোগ-সাধন করিতে করিতে বড় হইয়া উঠিয়াছে, তাহারাও রাজবংশের সাহায্য পায় নাই।

রাজশক্তি নাই নেশন্ আছে, রাজশক্তি পরাস হইয়া গেছে নেশন্ টিকিয়া আছে, এ দুটোই কাহারো অগোচর নাই। রাজার অধিকার সকল অধিকারের উচ্চ, এ কথা এখন আর প্রচলিত নহে; এখন শ্রম হইয়াছে, ন্যায়ন্যায় অধিকার রাজকীর অধিকারের উপরে। এই ন্যায়ন্যায় অধিকারের ভিত্তি কি, কোন্ লক্ষণের দ্বারা তাহাকে চেনা যাইবে?

অনেকে বলেন, জাতির অর্থৎ race-এর ঐক্যই তাহার লক্ষণ। রাজা, উপরাজ ও রাষ্ট্রমুখ্য কৃত্রিম এবং অস্থায়ী—জাতি চিরদিন থাকিয়া যায়, তাহারই অধিকার খাটি।

কিন্তু জাতিমিশ্রণ হয় নাই সুযোগে এমন দেশ নাই। ইংলণ্ড, ফ্রান্স, জার্মানি, ইটালি, কোথাও বিশুদ্ধ জাতি খুঁজিয়া পাওয়া যায় না, এ কথা সকলেই জানেন। কে টিউট্, কে কেণ্ট্ এখন তাহার সীমানা করা অসম্ভব। রাষ্ট্রনীতিতত্ত্বে জাতি-বিশুদ্ধির কোন গোড় রাখে না:

রাষ্ট্রতন্ত্রের বিধানে যে ভাতি এক ছিল, তাহার ভিন্ন হইয়াছে, বাহার ভিন্ন ছিল, তাহার এক হইয়াছে।

ভাবনবন্ধেও ঐ কথা খাটে। ভাব্য ঐক্যে ন্যাশনাল ঐক্যবন্ধনের সহায়তা করে, সন্দেহ নাই; কিন্তু তাহাতে এক করিবেই, ঐক্য, কোন অবরোধ নাই। যুনাইটেড স্টেট্‌স ও ইংলণ্ডের ভাষা এক, স্পেন ও স্প্যানীয় আমেরিকার ভাষা এক, কিন্তু তাহার এক নেশন্‌ নহে। অপর পক্ষে সুইজারল্যান্ডে তিনটা চারিটা ভাষা আছে, তবু সেখানে এক নেশন্‌। ভাষা অপেক্ষা মাতৃভাষার ইচ্ছাশক্তি বড়;—ভাষাবৈচিত্র্য-সত্ত্বেও সমস্ত সুইজারল্যান্ডের ইচ্ছাশক্তি তাহাকে এক করিয়াছে।

তাহা ছাড়া, ভাষার ভাতির পরিচয় পাওয়া যায়, এ কথাও ঠিক নয়। প্রসিয়া আজ জার্মান বলে, কয়েক শতাব্দী পূর্বে স্লাভোনিক বলিত, ওয়েল্‌স ইংরাজি ব্যবহার করে, ইলিষ্ট আরবী ভাষার কথা কহিয়া থাকে।

নেশন্‌ ধর্মমতের ঐক্যও মানে না। ব্যক্তিবিশেষ ক্যাথলিক, প্রটেস্ট্যান্ট, যিহুদী অথবা নাস্তিক, তাহাই হউক না কেন, তাহার ইংরাজ, ফরাসী বা জার্মান হইবার কোন বাধা নাই।

বৈবরিক স্বার্থের বন্ধন-দৃঢ়বন্ধন, সন্দেহ নাই। কিন্তু ত্রৈনীর মতে সে বন্ধন নেশন্‌ বীথিবার পক্ষে যথেষ্ট নহে। বৈবরিক স্বার্থে মহাজনের পকারেৎ-মঙ্গলী গড়িয়া তুলিতে পারে বটে; কিন্তু ন্যাশনালিস্টের মধ্যে একটা ভাবের স্থান

আছে—তাহার যেমন বেধ আছে, তেমন অন্তঃকরণেরও অভাব নাই। মহাজন-পটিকে ঠিক মাতৃভূমি কেহ মনে করে না।

ভৌগোলিক অর্থাৎ, প্রাকৃতিক সীমা-বিভাগ নেশনের ভিন্নতাসাধনের একটা প্রধান হেতু, সে কথা স্বীকার করিতেই হইবে। নবীপ্রোতে ভাতিকে বহন করিয়া লইয়া গেছে, পরীতে তাহাকে বাধা দিয়াছে। কিন্তু তাই বলিয়া কি কেহ মাগে অাকিয়া দেখাইয়া দিতে পারে, ঠিক কোন্‌ পর্য্যন্ত কোন্‌ নেশনের অধিকার নির্দিষ্ট হওয়া উচিত। মানবের ইতিহাসে প্রাকৃতিক সীমাই চূড়ান্ত নহে। ভূখণ্ডে, ভাতিতে, ভাষায়, নেশন্‌ পঠন করে না। ভূখণ্ডের উপর যুদ্ধক্ষেত্র ও কর্মক্ষেত্রের পতন হইতে পারে, কিন্তু নেশনের অন্তঃকরণই ভূখণ্ডে পড়ে না। জনসম্মদায় বলিতে যে পরিচয় পদার্থকে বুঝি, মহাবাই তাহার শ্রেষ্ঠ উপকরণ। স্বগতীর-ঐতিহাসিক-মহনজাত 'নেশন্‌' একটি মানসিক পদার্থ, তাহা একটি মানসিক পরিবার, তাহা ভূখণ্ডের আকৃতির দ্বারা আবদ্ধ নহে।

বেশা গেল, ভাতি, ভাষা, বৈবরিক স্বার্থ, স্বার্থের ঐক্যও ভৌগোলিক সংস্থান, নেশন-নামক মানসপদার্থ স্বভাবের মূল উপাদান নহে। তবে তাহার মূল উপাদান কি?

নেশন একটি সমাজ-সত্তা, একটি মানস পদার্থ। দুইটি জিনিষ এই পদার্থের প্রকৃতি গঠিত করিয়াছে। সেই দুই জিনিষ বস্তুত একই। তাহার মধ্যে একটি অতীতে

অবস্থিত, আর একটি বর্তমানে । একটি হইতেছে—সর্বসাধারণের প্রাচীন স্মৃতি-সম্পদ; আর একটি, পরম্পর সম্মতি, একত্রে বাণ করিবার ইচ্ছা,—যে অঞ্চল উত্তরাধিকার হস্তগত হইয়াছে, তাহাকে উপযুক্তভাবে রক্ষা করিবার ইচ্ছা ।’ মানুষ উপস্থিতমত নিজেকে হাতে হাতে তৈরি করে না । নেশনও সেইরূপ স্বর্ঘীয় অতীত-কালের প্রেরণ, তাগত্বীকার এবং নিষ্ঠা হইতে অভিযুক্ত হইতে থাকে । আমরা অনেকটা পরিমাণে আমাদের পূর্বপুরুষের দ্বারা পূর্বেই গঠিত হইয়া আছি । অতীতের বীণা, মহাব, কীর্তি, ইহার উপরেই ন্যাস-ন্যাস ভাবের মূলপতন । অতীতকালে সর্বসাধারণের এক গৌরব, এবং বর্তমান-কালে সর্বসাধারণের এক ইচ্ছা ; পূর্বে, একত্রে বড় কাজ করা, এবং পুনরায় একত্রে সেইরূপ কাজ করিবার সম্ভব ; ইহাই জনসম্প্রদায়গঠনের ঐকান্তিক মূল । আমরা যে পরিমাণে তাগত্বীকার করিতে সম্মত হইয়াছি এবং যে পরিমাণে কষ্ট সহ্য করি-রাছি, আমাদের ভালবাসা সেই পরিমাণে প্রবল হইবে । আমরা যে বাড়ী নিজেরা গড়িয়া তুলিয়াছি এবং উত্তরবংশীয়দের হস্তে সমর্পণ করিব, সে বাড়ীকে আমরা ভালবাসি । প্রাচীন স্পাটার গানে আছে—“তোমরা বাহা ছিলে, আমরা তাহাই ; তোমরা বাহা, আমরা তাহাই হইব ।”—এই অতি সরল কথাটি সর্বদেশের জ্ঞানন্যাস-পাথরস্বরূপ ।

অতীতের গৌরবময়-স্মৃতি ও সেই স্মৃতির অস্বরূপ ভবিষ্যতের আদর্শ ; একত্রে হুঃখ পাওয়া, আনন্দ করা, আশা করা ;

এইগুলিই আগল জিনিষ, জাতি ও ভাষার বৈচিত্র্যসত্ত্বেও এগুলির মাহাত্ম্য বোঝা যায়—একত্রে মাণ্ডল্যানা-স্থাপন বা নীমান্ত-নির্ণয়ের অপেক্ষা ইহার মূল্য অনেক বেশি । একত্রে হুঃখ পাওয়ার কথা এইজন্য বলা হইয়াছে যে, আনন্দের চেয়ে হুঃখের বন্ধন দৃঢ়তর ।

অতীতে সকলে মিলিয়া তাগত্বঃ-বীকার এবং পুনরায় সেইজন্য সকলে মিলিয়া প্রস্তুত থাকিবার ভাব হইতে জন-সাধারণকে যে একটি একীভূত নিবিড় অভিব্যক্তি দান করে, তাহাই নেশন । ইহার পক্ষে একটু অতীত আছে যেটে, কিন্তু তাহার প্রত্যাকগম্য একগুটি বর্তমানে পাওয়া যায় । তাহা আর কিছু নহে—সাধারণ সম্মতি,—সকলে মিলিয়া একত্রে একজীবন বহন করিবার সম্প্রতিপরিব্যক্ত ইচ্ছা ।

রেনী বলিতেছেন, আমরা রাষ্ট্রতন্ত্র হইতে রাজার অধিকার ও ধর্মের আধিপত্য নির্দ্বিগলিত করিয়াছি, এখন বাকি কি রহিল ? মানুষ, মানুষের ইচ্ছা, মানুষের প্রয়োজন-সকল । অনেক বলিবেন, ইচ্ছা-জিনিষটা পরিবর্তনশীল, অনেক সময় তাহা অনির্দিষ্ট, অশিক্ষিত,—তাহার হস্তে নেশনের ন্যাসনালিটির মত প্রাচীন মহৎসম্পদ রক্ষার ভার দিলে, ক্রমে যে সমস্ত বিলিষ্ট হইয়া নষ্ট হইয়া গাইবে ।

মানুষের ইচ্ছার পরিবর্তন আছে—কিন্তু পৃথিবীতে এমন কিছু আছে, বাহার পরি-বর্তন নাই ? নেশনই অমর নহে । তাহাদের আদি ছিল, তাহাদের অন্ত ও খটবে । হয়

এই নেশনদের পরিবর্তে কাণে এক যুরো-
পীয় সম্প্রদায় সংঘটিত হইতেও পারে। কিন্তু
এখনো তাহার লক্ষণ দেখি না। এখনকার
পক্ষে এই নেশনগুলির তির্যতাই ভাল,
তাহাই আবশ্যিক। তাহারাই সকলের
স্বাধীনতা রক্ষা করিতেছে—এক আইন, এক
প্রবু হইলে, স্বাধীনতার পক্ষে সফট।

বৈচিত্র্য এবং অনেকসময় বিরোধি-
প্রবৃত্তি দ্বারা তির্য তির্য নেশন সভ্যতাবিত্তার-
কার্যে সহায়তা করিতেছে। মনুষ্যজ্ঞের
মহাপন্থীতে প্রত্যেকে এক একটি স্বয়ং যোগ
করিয়া বিতেছে, সবটা একত্রে মিলিয়া
বাস্তবলোকে যে একটি করন্যগম্য মহিমার
সৃষ্টি করিতেছে, তাহা কাহারও একক
চেষ্টার অতীত।

যাহাই হউক, রেনী য়েনেন, মাহুধ,
জাতিত্ব, ভাষার, ধর্মমতের বা নবীপুরুষের
দ্বন্দ্ব নহে। অনেকগুলি সংঘতরনা ও
ভাবোত্তপ্রবৃত্তির মনুষ্যের মহাপন্থী যে একটি
সচেতন চারিত্র্য সৃজন করে, তাহাই নেশন।
সাধারণের মনুষ্যের জন্ত ব্যক্তিবিষয়ে
ভোগস্বীকারের দ্বারা এই চারিত্র্য-চিত্রিত মনুষ্য
নিজের বল সপ্রমাণ করে, ততক্ষণ তাহাকে
সীদ্ধা বলিয়া জানা যায় এবং ততক্ষণ
তাহার টিকিয়া থাকিবার সম্পূর্ণ অধিকার
আছে।

রেনীর উক্তি শেষ করিলাম। এক্ষণে
রেনীর এই সারগর্ভ বাক্যগুলি আমাদের
দেশের প্রতি প্রয়োগ করিয়া আলোচনার
জন্ত প্রস্তুত হওয়া যাক।

আলোচনা ।

['আবহ'-শব্দ সম্বন্ধে]

গত আবার মাসের বঙ্গদর্শনে লিখিত
হইয়াছে, "বোশেশবাবু 'আবহ'-শব্দ কোন
প্রাচীন গ্রন্থ হইতে উদ্ধার করিয়াছেন,
তাহার অর্থ ভূবাসু। কিন্তু এই ভূবাসু
বলিতে প্রাচীনরা কি বুঝতেন, এবং
তাহা আধুনিক আর্টসমূহিকার শব্দের
প্রতিনিধি কি না, তাহা বিশেষরূপে প্রশ্নের
অপেক্ষা রাখে—এক কথায় ইহার নীমাংসা

হয় না। অগ্রে সেই প্রশ্ন উপস্থিত না
করিয়া জোর করিয়া কিছু বলা যায় না।"

যে সমালোচনার আমি 'আবহ'-শব্দ
ব্যবহার করি, তাহাতে ঐ শব্দের অর্থ ও
পারিভাষিকের প্রশ্ন প্রশ্ন করিবার
অবসর ছিল না। কয়েক বৎসর পূর্বে
সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকাও ঐ শব্দ দিয়াছিল।
তর্কের প্রয়োজন হইলে সেই পত্রিকাই

উপস্থিত ছিল। তদ্বিপর্যয়, গ্রহাণুতর 'আবহ' শব্দকে সবিত্তরে আলোচনা করা গিয়াছে। সেই গ্রহ পাঠকসম্মুখে সস্ত্রীত উপস্থিত করিতে পারিতেছি না। এই সকল কারণে, বিশেষতঃ বঙ্গদেশকে 'আবহ'-শব্দবিষয়ে সম্বন্ধান দেথিয়া, তৎসম্বন্ধে দুই এক কথা বলা আবশ্যিক মনে করিতেছি।

আবহের পৌরাণিকেরা সপ্তবায়ুর কথা বলিতেন। ইহাদের নাম আবহ, প্রবহ, উবহ, সংবহ, স্রবহ, পরিবহ, পরাবহ। তিএ ভিন্ন পুরাণে এই সকল নাম সবধে কিছু কিছু প্রভেদ দেখা যায়, কিন্তু সকল পুরাণে ও সিদ্ধান্তে, 'আবহ' ও 'প্রবহ' নামে প্রভেদ নাই, পৌরাণিক মতে এই সপ্ত পবন পৃথিবী হইতে উপরি উপরি গ্রহনকৃত পর্য্যন্ত বায়ু আছে। যথা, বায়ুপুরাণে—

পৃথিব্যাঃ প্রথমধ্বজে, দ্বিতীয়ৈব ভাষ্করে ।

সোমো তৃতীয়ে, বিজ্ঞেয়শ্চতুর্থো জ্যোতিষাঃ পাপ ।

এবেষু পঞ্চমৈব দধিঃ সত্ত্বমিন্দ্রোলে ।

এবেষু সপ্তমৈব বাতবজঃ পরশ্ব সঃ ।

ইত্যাদি।

পুরাণমতে পৃথিবীর পর সূর্য্য, তার পর চন্দ্র, তার পর নক্ষত্রসমূহ, তার পর বৃহ-শুক্র-কুজ-শনি, তার পর সপ্তর্ষিমণ্ডল, এবং সকলের উপরে প্রব অবস্থিত। তদনুসারে বায়ু ও কৃষ্ণ পুরাণ বলেন, তু হইতে মেঘ-মণ্ডল পর্য্যন্ত আবহবায়ু, মেঘমণ্ডল হইতে সূর্য্যমণ্ডল পর্য্যন্ত প্রবহ, তার পর চন্দ্রমণ্ডল পর্য্যন্ত উবহ, ইত্যাদি। সিদ্ধান্তিরা এই সপ্তবায়ুর মধ্যে আবহ ও প্রবহ এই দুইটি-মাত্র গ্রহণ করিয়াছিলেন। পূর্বে হইতে পশ্চিমাধিকে গ্রহনকৃতের দৈনন্দিনগতির

কারণবরূপ প্রবহবায়ুর কএনা হইরাছিল। এই কএনার আদি পুরাণে ছিল। সেখানে উহা একটা Physical theory ছিল। কিন্তু সিদ্ধান্তে উহা কিঞ্চিৎ পরিবর্তিত হইয়া একটা mathematical theory বরূপ দাঁড়াইয়াছিল। শঙ্করলায় কালিধাস ইহারই কথা উল্লেখ করিয়াছেন। বাহ্য হউক, প্রবহবিষয়ে অধিক লেখা সস্ত্রীত অনাবশ্যক।

'আবহ' যে পৃথিবীর বায়ু—তুবাযু, তৎ-সম্বন্ধে পুরাণ ও সিদ্ধান্ত একমত। যথা, বায়ুপুরাণে—

পৃথিব্যাঃ প্রথমধ্বজে, যমেঘোভ্যাং আবহঃ ।

ইত্যাদি।

সিদ্ধান্তে লয় (শক ৫০০) —

২৪৭৫৫ :

ভাষ্কর (শক ১০৭২) —

তুবাযুঃ আবহঃ ইহ

তবে, তুবাযুর নাম আবহ। কু-মল্লং, কু-বায়ু প্রকৃতি শব্দও আছে। বলা বাহুল্য, কু অর্থে পৃথিবী; যেমন, 'কুমিন'।

এই তুবাযু বা আবহের নিসর্গ কি ?
প্রীতি (শক ১৬১) বলেন,—

নির্ধাতোভ্যপনদ্রবধ্বজবিদ্যাসত্ত্বঃ কুবাকো :

সংযুক্তো ধনপদগম্যোবেষপূর্কঃ তপাত্তং ।

ভাষ্করও বলেন,—

অত্রাপুদ্বিহাণান্যদ্

তবে, 'আবহ' ঠিক আধুনিক atmosphere। আরও দেখুন। আবহের বিজ্ঞার কত ?
লয় বলেন—

সমুদ্রশৈল্যাবরুদ্ধভাঃ (১০৭৪)

পৃথিবী বিজ্ঞান-প্রবন্ধে ।

লম্বমতে পৃথিবীর ব্যাসযোজন ১০৫০ ।
সুতরাং পৃথিবীর এ দিকে ১২ যোজন,
ও দিকে ১২ যোজন আবহের বিস্তার ।

ভাব্যরও বলেন,—

কূর্মেবিশ্ববিশ্বযোজনানি কৃৎস্নঃ

এ সকল দলে যোজনসঙ্গে যোজনানু
বৃদ্ধিতে হইবে । তদনুসারে এক যোজন
৪০০ মাইল, কিংবা ৫ মাইল হয় । অতএব
আটান সিদ্ধান্তকারগণের মতে আবহের
বিস্তার ৫০০০ মাইল । ইহার সহিত আধু-
নিক বিজ্ঞানের প্রায় ঐক্য আছে ।

একটি বিষয়ে প্রাচীনেরা একটু দোলা
করিয়াছিলেন । শুষ্ক আর্গাভট্টাদি কোন

কোন জ্যোতিষী পৃথিবীর আবর্তন বীকার
করিতেন । অন্যেরা ভূত্বক বীকার করি-
তেন না । না করিবার একটি প্রধান কারণ
এই ছিল যে, শুভাহারা মৃগশ্র-পৃথিবী হইতে
আবহকে পৃথক্ ভাবিতেন । চারিদিকে
আবহ রহিয়াছে, ভিতরে পৃথিবী কাহারও
মতে ভ্রমণ করিতেছে, কাহারও মতে
স্থির রহিয়াছে । আবহও যে পৃথিবীর
একটা অঙ্গ, এবং উভয়ে একত্র ঘুরিতে
পারে, এ তর্ক তাঁহাদের মনে উদয় হয়
নাই । হইলে ভূত্বকবাদের অনেক আপত্তির
খণ্ডন হইতে পারিত । এ বিষয়ে অধিক
লেখা নিম্নপ্রয়োজন ।

শ্রীযোগেশচন্দ্র রায় ।

মাসিক-সাহিত্য-সমালোচনা ।

সাহিত্য । বৈশাখ । হিমারণ্য ।
শ্রীকৃত্ত রামানন্দ ভারতীর হিন্দুচন্দ্র ভ্রমণ-
বৃত্তান্ত ক্রমশঃ সাহিত্যে প্রকাশিত হইতেছে ।
এই প্রবন্ধটি সবিশেষ কৌতুহলজনক হই-
য়াছে । লেখক তীর্থপর্যটন উপলক্ষ্যে তিব্ব-
তের মধ্যে প্রবেশ করিয়াছিলেন—সেই বিব-

রণ পার্শ্বের জন্য আমরা উৎসুক হইয়া
আছি । প্রবন্ধটির ভাষা সরল ও বর্ণনা
আড়ম্বরবিহীন । লেখকের ভ্রমণপথটি
হিমালয়ের মানচিত্রের কোন্ অংশ অধিকার
করে, তাহার সুস্পষ্ট নির্দেশ পাইলে
আমরা আরো কল্পিত বোধ করিব ।
লেখক শরৎপ্রবর্তিত মঠপাণন ও সমাসি-

মন্তব্যগঠনের আজ্ঞামায় দিরাছেন; ব্যবসায়ের যে অবস্থা আছে, কৃষকায়ের
 ওহাং নিকট হইতে তাহার সীতিনীতি ও ব্যবসায়ের উন্নতি হইলে, তাহারও
 বিভাবিত বিবরণ আমরা প্রত্যাশা করিয়া সেই অবস্থা হইবে।”
 রহিল। মাটির বাসন—ঐচ্ছিক বোগেশ— প্রদীপ। জৈষ্ঠ। পুরাণতত্ত্ব।
 প্রায় এই প্রবন্ধে মাটির পাত্র নিঃশেষক ঐচ্ছিক ন্যেত্রনাথ বসু। বর্ষ-
 শেষে আলোচনা করিয়াছেন। পুঁ-
 বীর নানাধেলে যুৎপাদনশিল্প বৈচিত্র্য
 ও উন্নতিলাভ করিয়াছে—আমাদের
 দেশে যেমন ছিল, তেমন আছে।
 তাহার ঐশোন্দ্যা, হাতিব, কাককাঁরা,
 কিছুই অগ্রসর হয় নাই। এ বিষয়ে
 লেখক আমাদের মনে আক্ষেপ জন্মাইয়া
 দিরাছেন। আমরা নতন নতন লোহার
 কল তৈরি করিয়া লগতে বাহবা লইতে
 পারিতেছি না, তাহা দুঃখের বিষয়, সন্দেহ
 নাই—কিন্তু তদপেক্ষা দিকারের বিষয় এই
 যে, হাড়িকুঁড়ি, টেকি, গোরুর গাড়ি,
 আমাদের নতন শিকার আন্দোলনে,
 বুদ্ধিবৃত্তির নতন অঙ্গীকরণকালেও কোন
 অংশে উন্নতিলাভ করিল না। পাচরকম
 মাটি লইয়া পরীক্ষা করিয়া পূর্বাপেক্ষা
 ভাল যুৎপাদের উগাদান আবিষ্কার করা
 অপূর্ণ অদাযানাতার অপেক্ষা করে না।
 নতন শিকা আমাদিগকে তেমন করিয়া
 যদি লগাগ করিত, তবে দেশের হাড়িকুঁড়ি
 হইতে মন্থ্যসমাজ পর্গতে সকলি তাঁহার
 দাক্ষ্য বিত। লেখক এইকবদিয়া শেষ
 করিয়াছেন—“কলিকাতার রাধাকান্তের
 যাই, কেবল বিলাতী বাসনে, বিলাতী
 পুত্রে, বড় বড় দোকান পরিপূর্ণ
 দেখি।... বঙ্গদেশে বিধান আছে, কিন্তু
 ব্যবসায়-বিধান নাই। কানে অন্যান্য

মহাকবি মহাতারত গড়িয়া জুগিয়া-
 ছিলেন। কিন্তু সেই প্রাচীনতর
 বিক্ষিপ্ত-বিস্তৃত সাহিত্যের জন্য আকাজ্জ
 আমাদের মনের মধ্যে রহিয়া গেল।
 তাহার মধ্যে কত ইতিহাস, তাহার
 পরিণাম, কবিরের বিকাশ নিহিত ছিল!
 বৈদিক কালেও সেই পুরাণের উল্লেখ
 পাওয়া যায়। লেখক দেখাইয়াছেন,
 “শতপথব্রাহ্মণে লিখিত আছে, অধ্যায়
 ধ্যানকীর্তন করিতেন। আশ্বলায়ন
 গৃহ্যসূত্র ও মহাশহিত্যর আছে—শ্রাদ্ধাদি
 পিতৃকার্যে বেদ, দণ্ডশাস্ত্র, আখ্যান, ইতি-
 হাস, পুরাণসকল ও খিলসমূহ জনাইতে

হইবে। এই কয়টি প্রত্যয় হইতে বুদ্ধি, মধ্যযুগীয় কালের সাহিত্যহিমাণু বিলি-
 যাইতেছে, একসময়ে পুরাণ আর্গা ছিল, তেহে না, সেই কালের ছোটবু-
 ক্তির অবশ্যপোষ্যমধ্যে পরিগণিত, সাজে চারিদিক পুরাণ কি, কোন দিন
 ছিল, লেখক বলেন,—“খ্রীষ্টীয় ৩ ও ৪ শতাব্দীর মধ্যে সাহিত্যহিমাণু বুদ্ধিম-
 নতার প্রাচুর্যের ব্রাহ্মণ্যধর্মের আবাস-
 প্রত্যয় সঞ্চিত হই। সম্ভবতঃ এই সময়েরই
 ব্রাহ্মণ্যধর্ম প্রাচীন পুরাণলব্ধ সংগ্রহ বা
 প্রচলন করিতে “থাকেন।” ইতিমধ্যে
 বিবিধকর্তৃক হইতে নতুন পৌরাণিক
 কালের মাঝখানটাকে প্রাচীন সাহিত্যের
 যে গায়া চলিয়া আসিয়াছিল, তাহা
 কোথায়-বিনষ্ট হইয়া গেল! সে সাহিত্য
 যে-সময় ছিল, তাহা রামায়ণ-মহাভারত
 হইতে সূত্রান করিতে পারি। বিশ্ব-
 সাহিত্যের মধ্যে মহাভারতকে অসঙ্কোচে
 সর্বপ্রথম স্থান দেওয়া যায়,—সেই
 মহাভারতের প্রেততা আকস্মিক হইতে
 পারে, নান্য পুণ্যবত্তী সাহিত্যে তাহার
 উপস্থিতি ভিত্তি ছিল। যেমন মঙ্গল ও
 বুদ্ধিমত্তির মাধ্যমে কোন একটি গ্রহ
 নীতি প্রাকৃতিক ব্যাতিবিগণের হিসাবে
 প্রসিদ্ধ না, অবশেষে সেই জারগার
 সাজে হইয়া পৌর-বিশ্ব আবিষ্কৃত
 হইয়াছে—একদিন মহাভারত ও বেদে
 মধ্যযুগীয় কালের সাহিত্যহিমাণু বিলি-
 যাইতেছে না, সেই কালের ছোটবু-
 ক্তির অবশ্যপোষ্যমধ্যে পরিগণিত, সাজে চারিদিক পুরাণ কি, কোন দিন
 ছিল, লেখক বলেন,—“খ্রীষ্টীয় ৩ ও ৪ শতাব্দীর মধ্যে সাহিত্যহিমাণু বুদ্ধিম-
 নতার প্রাচুর্যের ব্রাহ্মণ্যধর্মের আবাস-
 প্রত্যয় সঞ্চিত হই। সম্ভবতঃ এই সময়েরই
 ব্রাহ্মণ্যধর্ম প্রাচীন পুরাণলব্ধ সংগ্রহ বা
 প্রচলন করিতে “থাকেন।” ইতিমধ্যে
 বিবিধকর্তৃক হইতে নতুন পৌরাণিক
 কালের মাঝখানটাকে প্রাচীন সাহিত্যের
 যে গায়া চলিয়া আসিয়াছিল, তাহা
 কোথায়-বিনষ্ট হইয়া গেল! সে সাহিত্য
 যে-সময় ছিল, তাহা রামায়ণ-মহাভারত
 হইতে সূত্রান করিতে পারি। বিশ্ব-
 সাহিত্যের মধ্যে মহাভারতকে অসঙ্কোচে
 সর্বপ্রথম স্থান দেওয়া যায়,—সেই
 মহাভারতের প্রেততা আকস্মিক হইতে
 পারে, নান্য পুণ্যবত্তী সাহিত্যে তাহার
 উপস্থিতি ভিত্তি ছিল। যেমন মঙ্গল ও
 বুদ্ধিমত্তির মাধ্যমে কোন একটি গ্রহ
 নীতি প্রাকৃতিক ব্যাতিবিগণের হিসাবে
 প্রসিদ্ধ না, অবশেষে সেই জারগার
 সাজে হইয়া পৌর-বিশ্ব আবিষ্কৃত
 হইয়াছে—একদিন মহাভারত ও বেদে
 মধ্যযুগীয় কালের সাহিত্যহিমাণু বিলি-
 যাইতেছে না, সেই কালের ছোটবু-
 ক্তির অবশ্যপোষ্যমধ্যে পরিগণিত, সাজে চারিদিক পুরাণ কি, কোন দিন
 ছিল, লেখক বলেন,—“খ্রীষ্টীয় ৩ ও ৪ শতাব্দীর মধ্যে সাহিত্যহিমাণু বুদ্ধিম-
 নতার প্রাচুর্যের ব্রাহ্মণ্যধর্মের আবাস-
 প্রত্যয় সঞ্চিত হই। সম্ভবতঃ এই সময়েরই
 ব্রাহ্মণ্যধর্ম প্রাচীন পুরাণলব্ধ সংগ্রহ বা
 প্রচলন করিতে “থাকেন।” ইতিমধ্যে
 বিবিধকর্তৃক হইতে নতুন পৌরাণিক
 কালের মাঝখানটাকে প্রাচীন সাহিত্যের
 যে গায়া চলিয়া আসিয়াছিল, তাহা
 কোথায়-বিনষ্ট হইয়া গেল! সে সাহিত্য
 যে-সময় ছিল, তাহা রামায়ণ-মহাভারত
 হইতে সূত্রান করিতে পারি। বিশ্ব-
 সাহিত্যের মধ্যে মহাভারতকে অসঙ্কোচে
 সর্বপ্রথম স্থান দেওয়া যায়,—সেই
 মহাভারতের প্রেততা আকস্মিক হইতে
 পারে, নান্য পুণ্যবত্তী সাহিত্যে তাহার
 উপস্থিতি ভিত্তি ছিল। যেমন মঙ্গল ও
 বুদ্ধিমত্তির মাধ্যমে কোন একটি গ্রহ
 নীতি প্রাকৃতিক ব্যাতিবিগণের হিসাবে
 প্রসিদ্ধ না, অবশেষে সেই জারগার
 সাজে হইয়া পৌর-বিশ্ব আবিষ্কৃত
 হইয়াছে—একদিন মহাভারত ও বেদে

বঙ্গদর্শন।

চোখের বালি ।

(১৪)

বাহির হইতে নাড়া পাঠিলে ছাই-চাশা
আঁতন আবার অগ্নিয়া উঠে। নবদম্পতির
প্রেমের উৎসাহ দেখুক প্রান হইতেছিল,
তৃতীয় পক্ষের বা খাইয়া দেখুক আবার
কাগিয়া উঠিল।

আঁশর হাতালাপ করিবার শক্তি ছিল
না, কিন্তু বিনোদিনী তাহা অল্পস্র জোগাইতে
পারিত; এইজন্য বিনোদিনীর অন্তরালে
আশা ভারি একটা আগ্রহ পাইল।
মহেন্দ্রকে সর্বদাই আনোদের উত্তেজনার
সাধিতে তাহাকে আর অসামান্য কঠোর
হইত না।

বিনোদিনীর অমকালের মধ্যেই মহেন্দ্র
এক আশা পরস্পরের কাছে নিজে
নিঃশেষ করিবার উপক্রম করিয়াছিল,—

বিনোদিনীর লুক্কায়িত একেবারেই তারত্বের
নিধাণ হইতেই বঙ্গ হইয়াছিল—বঙ্গ ভাষা
না খাইয়া তাহার একেবারে মূলধন উন্মাদ
করিবার চেষ্টায় ছিল এই কাপাতির
বন্যাকে তাহার প্রাত্যহিক সংসারের সহজ
মোটে কেমন করিয়া পাত্ত করিতে

নেপথ্য পরেই মাকথানে যে অবসাদ আসে,
সেটা দূর করিতে মাতৃব আবার যে
নেপা চায়, সেই নেপা আশা কোথা হইতে
জোগাইবে? এমন সময় বিনোদিনী মবীন
বটীনা শত্রু ভরিয়া আশার হাতে আনিয়া
ছিল। আশা স্বামীকে গল্প দেখিয়া আরাম
পাইল।

এখন আর তাহার নিজের চেষ্টা রহিল
না। মহেন্দ্র-বিনোদিনী বধন উপহাস-
পরিহাস করিত, তখন সে কেবল গ্রাণ
খুলিয়া হাসিতে বেগ দিত। তাৎপর্ষ্যের
মহেন্দ্র এখন আশাকে অত্যাধিক কান্না দিত,
তখন সে বিনোদিনীকে বিচারক মানিয়া

সকল অভিযোগের অবতারণা করিত।
মহেন্দ্র তাহাকে ঠাট্টা করিলে বা কোন্
অসম্বদ কথা বলিলে, সে প্রত্যাহা করিত
বিনোদিনী তাহার হইয়া উপবৃত্ত-
দ্বিগী দিবে। এইরূপে তিনজনের সত্য
হাসিয়া উঠিল।

কিন্তু তাই বলিয়া বিনোদিনীর কাছে
শৈথিল্য ছিল না। গ্রামবাড়া, ঘরকরা
দেখা, সাজগজার সেবা করা, সমস্ত সে

নিঃশেষপূরক সমাধা করিয়া তবে আনোদে যোগ দিত। মহেন্দ্র অতিরিক্তই বলিত—
“চাকরদাসীগুলোকে না কাজ করিতে
বিরাম ভূমি মাটি করিবে দেখিতেছি!”—
বিনোদিনী বলিত, “নিজে কাজ না করিয়া
মাটি হওয়ার চেয়ে সে ভাল! যাও ভূমি
কালেজে যাও!”

মহেন্দ্র। আজ বাদলার দিনটোতে—
বিনোদিনী। না সে হইবে না—তোমার
গাড়ি তৈরি হইয়া আছে—কালেজে যাউতে
হইবে।

মহেন্দ্র। আমি ত গাড়ি ব্যবস্থা করিয়া
দিয়াছিলাম।

বিনোদিনী। “আমি বিনোদিনী।”—
বলিয়া মহেন্দ্রের কানেতে হঠাৎ কপড়
আনিয়া সম্মুখে উপস্থিত করিল।

মহেন্দ্র। তোমার রাজপুতের ঘরে
জন্মানো উচিত ছিল, বুদ্ধকালে আত্মীয়কে
স্বর্গ পন্নাইয়া দিতে।

আনোদের গেলেভনে ছুটি লওয়া,
পড়া কীকি সেওয়া, বিনোদিনী কোন-
মতেই প্রেরণ দিত না। তাহার কঠিন
শাসনে দিনে-দুপুরে অনিয়ত আনোদ এক-
বারে উঠিয়া গেল—এবং এইরূপে সন্ধ্যাত্তের
অবকাশ মহেন্দ্রের কাছে অভ্যস্ত রমণীয়,
শোভনীয় হইয়া উঠিল। তাহার দিনটা
নিজের অবসানের অন্তর যেন প্রতীক্ষা করিয়া
ধাক্কিত।

পূর্বে মাসে মাসে ঠিক সময়মত আহার
প্রস্তুত হইত না এবং সেই ছুতা করিয়া
মহেন্দ্র আনন্দে কালেজ কানাই করিত।
এখন বিনোদিনী দয়ঃ সংস্কার করিয়া

মহেন্দ্রের কালেজের খাওয়া সকাল সকাল
ঠিক করিয়া দেয় এবং খাওয়া হইলেই
মহেন্দ্র খবর পাও—গাড়ি তৈয়ার। পূর্বে
কপড়গুলি প্রতিদিন এমন তাঁকুড়া
পরিপাট অংকায় পাওয়া দূরে থাকুক, গোবার
বাড়ী গেছে, কি আলমারীর কোন একটা
অনির্দিষ্ট স্থানে অগোচরে পড়িয়া আছে,
তাঁহা দীর্ঘকাল সন্ধান বাতীত জানা বাইত
না।

প্রথম প্রথম বিনোদিনী এই সকল
বিশৃঙ্খলা লইয়া মহেন্দ্রের সম্মুখে আশাকে
সহ্যাত তৎসনা করিত,—মহেন্দ্র ও আশার
নিরুপায় নৈশুধ্যাহীনতার সময়েই হামিত।
অবশেষে সখীবাৎসল্যবশে আশার হাত
হইতে তাহার কণ্ঠবাক্যের বিনোদিনী
নিজের হাতে কাড়িয়া লইল। ঘরের
শ্রী করিয়া গেল।

চাপকানের বোতাম ছিড়িয়া গেছে,
আশা আত তাহার কোন উপায় করিতে
পারিতেছে না—বিনোদিনী ক্রত আসিয়া
হস্তবুদ্ধি আশার হাত হইতে চাপকান
কাড়িয়া লইয়া চটপট সেগাট করিয়া
দেয়। একদিন মহেন্দ্রের প্রস্তুত করে
বিড়ালে মুখ দিল—আশা ভাবিয়া অস্থির—
বিনোদিনী তখন রান্নাঘরে গিয়া কোথা
হইতে কি সংগে করিয়া গুচ্ছাইয়া কাজ
চালাইয়া দিল, আশা আতর্জা হইয়া গেল।

মহেন্দ্র এইরূপে আহারে ও আচ্ছাদনে,
কর্মে ও বিশ্রামে, সর্বত্রই নানা আকারে
বিনোদিনীর সেবাস্ত অমুচব করিতে
লাগিল। বিনোদিনীর রচিত পশনের
ছুতা তাহার পায়ে এবং বিনোদিনীর বোনা

শশমের গলাবদ্ধ তাহার কণ্ঠদেশে একটা বেন কোমল মানসিক সংস্পর্শের মত বেঠেন করিল। আশা আত্মকাল সর্বীহস্তের এলাধানে পরিপাটি-পরিচ্ছন্ন হইয়া সুন্দর-বেশে সুসজ্জিত মাথিয়া মহেন্দ্রের নিকট উপস্থিত হয়, তাহার মধ্যে বেন কতকটা আশার নিম্নের, কতকটা আর একজনের—তাহার সাজসজ্জা-সৌন্দর্য্যে আনন্দে সে বেন গলা-বহুনার মত তাহার সর্বার সঙ্গে মিলিয়া গেছে !

বিহারীর আত্মকাল পূর্ব্বের মত আদর নাই—তাহার ডাক পড়ে না। বিহারী মহেন্দ্রকে লিখিয়া পাঠাইয়াছিল, কাল রবিনার আছে, দুপুর বেলা আসিয়া সে মহেন্দ্রের মার রান্না খাইবে। মহেন্দ্র দেখিল রবিবারটা নিতান্ত মাটি চর, তাড়াতাড়ি লিখিয়া পাঠাইল, রবিবারে বিশেষ কাজে তাহাকে বাহিরে যাইতে হইবে।

তবু বিহারী আহাঃস্তে একবার মহেন্দ্রদের বাড়ীর খোজ নইতে আসিল। বেহারার কাছে শুনিল, মহেন্দ্র বাড়ী হইতে বাহিরে যায় নাই। “মহীন্ দা” বলিয়া সিঁড়ি হইতে হাঁকিয়া বিহারী মহেন্দ্রের ঘরে গেল। মহেন্দ্র অপ্রসন্ন হইয়া কহিল, “তাকি আশা ধরিয়াছে।” বলিয়া তাকিয়ায় গ্রেস্ দিয়া পড়িল। আশা সে কথা শুনিয়া এবং মহেন্দ্রের মুখের ভাব দেখিয়া শশবাস্ত হইয়া উঠিল,—কি করা কর্তব্য, স্থির করিবার অজ্ঞ বিনোদিনীর মুখের দিকে চাহিল। বিনোদিনী বেশ লালিত, ব্যাপারটা গুরুতর নহে, তবু অত্যন্ত উদ্বিগ্নভাবে কহিল, “জমেকক্ষণ বসিয়া আত, একটুখানি শোও। আমি ওডিকলোন্ আনিয়া দিষ্ট।”

মহেন্দ্র বলিল, “থাক দরকার নাই !”

বিনোদিনী শুনিল না। দ্রুতপদে ওডিকলোন্ বহুক্ষণে নিশাইয়া উপস্থিত করিল। আশার হাতে তিলা কুমাল দিয়া কহিল, “মহেন্দ্রবাবুর মাথার বাধিয়া যাও !”

মহেন্দ্র ব্যস্ততার বলিতে লাগিল—“থাক না !” বিহারী লবঙ্গ হাতে নীরবে অন্তিমর দেখিতে লাগিল। মহেন্দ্র সগর্বে ডাবিল, “বেহারীটা বেপক আমার কত আদর !”

আশা বেহারার মধ্যে লজ্জাকম্পিত হস্তে ভাল করিয়া বাধিতে পারিল না—কোঁটাখানেক ওডিকলোন্ গড়াইয়া মহেন্দ্রের চোখে পড়িল। বিনোদিনী আশার হাত হইতে কুমাল লইয়া হুনিপূর্ণ করিয়া বাধিল এবং আর একটি বসন্তে ওডিকলোন্ তিলাইয়া অর অর করিয়া নিঃড়াইয়া দিল—আশা মাথায ঘোমটা টানিয়া পাখা করিতে লাগিল।

বিনোদিনী অগ্রগরে জিজ্ঞাসা করিল, “মহেন্দ্রবাবু, আরাম পাচ্ছেন কি ?”

এইরূপে কণ্ঠস্বরে শুধু ঢালিয়া দিয়া বিনোদিনী দ্রুতকটাকে একবার বিহারীর মুখের দিকে চাহিয়া গেল। দেখিল, বিহারীর চক্ষু কোতুকে হাসিতেছে। সমস্ত ব্যাপারটা তাহার কাছে প্রহসন। বিনোদিনী বুঝিয়া গেল, এ লোকটিকে ভোলান সহজ ব্যাপার নহে—কিছুই ইহার নম্র এড়াই না।

বিহারী হাসিয়া কহিল—“বিনোদ-বোঠান, এমনতর ভয়না পাইলে রোগ সারিবে না, বাড়িয়া যাইবে।”

বিনোদিনী। তা কেমন করিয়া জানিব, আমরা মুখ মেয়েমানুষ! আপনাদের ডাক্তারীশাস্ত্রে বুদ্ধি এইমত লেখা আছে ?

বিহারী। আছেই ত। সেবা দেখিয়া আবারো কপাল ধরিয়া উঠিতেছে। কিন্তু পোড়াকপালকে বিনা চিকিৎসাতেই চটপট সারিয়া উঠিতে হয়। মহীন্দ্রার কপালের রোগের বেশি !

বিনোদিনী ভিজা বস্ত্রখণ্ড রাখিয়া দিয়া কহিল—“কাজ নাই, বন্ধুর চিকিৎসা বন্ধুতেই করুন।”

বিহারী সমস্ত ব্যাপার দেখিয়া ভিতরে ভিতরে বিরক্ত হইয়া উঠিয়াছিল। একরসিন সে অধারনে বাস্ত ছিল, ইতিমধ্যে মহেন্দ্র, বিনোদিনী ও আশার মিলিয়া আপন-আপনি যে এতখানি তাল পাকাইয়া তুলিয়াছে, তাহা সে জানিত না। আজ সে বিনোদিনীকে বিশেষ করিয়া দেখিল, বিনোদিনীও তাহাকে দেখিয়া লইল।

বিহারী কিছু ভীত্বরে কহিল—“ঠিক কথা! বন্ধুর চিকিৎসা বন্ধুই করিবে। আমিই মাথাধরা আনিয়াছিলাম, আমিই তাহা লক্ষ্য লইয়া চলিলাম। ওডিকলোন্স আর বাজে খরচ করিবেন না।”—আশার বিকে চাহিয়া কহিল—“বোঠা'ন, চিকিৎসা করিয়া রোগ শান্তনোর চেয়ে রোগ না হইতে দেওয়াই ভাল।”

(১৬)

বিহারী মনে মনে আমাকে মুচ বলিয়া অনেক ভৎসনা করিল—হায়, এমন করিয়া নিজের শিরের কাছে নিজে আগুন লাগায়! কিন্তু এই মুঢ়তার আশার প্রতি বিহারীর

যেহ আয়োজিত। সেদিন সন্ধ্যাবেলায় একলাখের বসিয়া সরলা সতীর বিশ্বস্ত সুখখানি শ্রবণ করিয়া তাহার চাই চক্ষু মলে ভরিয়া পেল। সুগভীর বীর্ণনিশ্বাস ফেলিয়া জানালা হইতে তারকাখচিত অন্ধকারের মধ্যে দৃষ্টি নিমগ্ন করিয়া দিখা জটিল সংসারের স্রবচ্ছবের বিপুল রহস্য আলোচনা করিয়া কোথাও কুল পাইল না। মন মনে ভাবিল, “অনুভব বেন উপভোগ্যলোকের মত; যেটি যেমন ভাবে চাইলে কোন গোল হয় না, সকল পক্ষেই সুখের হয়, তাহা সে কোন-মতেই ঘটতে দেয় না; তাহার প্রকাণ্ড নিদ্রার উপভোগকে চাই কপাতেই সজ্জ শেব করিয়া দিতে চাহে না। বোঠা! আশা কোথায় সংসারের এক অসুখ কোণে উপেক্ষিত হইয়া পড়িয়াছিল। আর সকলকে তেলিয়া, আর সকলকে ফেলিয়া, কোথা হইতে মহেন্দ্র আসিয়া এই অজ্ঞাত বালিকাকে আপন অসংগত জনপদের আবর্তের মধ্যে বলপূর্ব্বক টানিয়া লইল! আর একটু হইলেই ইহা আর এক রকম হইত, আর একটু হইলেই ইহা না হইতে পারিত!”

কিন্তু এই উপভোগ্যলোকের হাত হইতে আশাকে বতটা সম্ভব রক্ষা করিতে হইবে ত! বিহারী ভাবিল, “আর দূরে থাকিলে চলিবে না, যেমন করিয়া হোক, ইহাদের মন্ত্রধানে আমাকেও একটা স্থান লইতে হইবে। ইহাদের কেহই আমাকে চাহিবে না, তবু আমাকে থাকিতে হইবে।”

বিহারী আলান-অভ্যর্থনার অপেক্ষা না রাখিয়াই মহেন্দ্রের বাহের মধ্যে প্রবেশ করিতে লাগিল। বিনোদিনীকে কহিল—

“বিনোদ-বোটা’ন, এই চোলেটিকে ইহার মা মাটি করিয়াছে, বড় মাটি করিয়াছে, স্ত্রী মাটি করিতেছে—তুমিও সেই মলে না? ভিক্ষুরা একটা নতুন পণ দেখাও—দোহাট ভোমার !”

মহেন্দ্র । অর্থাৎ—

বিহারী । অর্থাৎ আনার মত লোক দাহাকে কেহ কোনকালে পোছে না—

মহেন্দ্র । তাহাকে মাটি কর ! মাটি হইবার উদ্দেশ্যে সহজ নয় হে বিহারী, দরখাস্ত পেন করিলেই হয় না !

বিনোদিনী হাসিয়া কহিল—“মাটি হইবার ক্ষমতা পাক। চাই, বিহারিবাণু !”

বিহারী কহিল—“নিজ গুণ না থাকিলেও হাতের গুণে হইতে পারে ! একবার প্রচর দিয়া দেখাই না !”

বিনোদিনী । আগে হঠতে প্রস্তুত হইয়া আসিলে কিছু হয় না। অন্যদান থাকিতে হয় ! কি বল ভাই চোখের বাগি ? তোমার এই বেওয়ারের ভার তুমিট লও না ভাই !

আশা তাহাকে চুট অঙ্গুলি দিয়া চেলিয়া দিল । বিহারীও এ ঠাট্টার যোগ দিল না ।

আনার সবধে বিহারীর কোন ঠাট্টা সহিবে না, এটুকু বিনোদিনীর কাছে একাইতে পারে নাই । বিহারী আশাকে ব্রহ্মা করে এবং বিনোদিনীকে হালকা করিতে চাহ, ইহা বিনোদিনীকে বিধিল ।

সে পুনরায় আশাকে কহিল, “তোমার এই ভিক্ষুক দেওরট আমাকে উপলক্ষ্য করিয়া তোমারই কাছে আদরভিক্ষা করিতে আসিয়াছে—কিছু দে ভাট্টা !”

আশা অত্যন্ত বিরক্ত হটল । বিহারীর কথাকালের জন্য মুখ লাল হইল, পরক্ষণেই হাসিয়া কহিল—“আমার বেলাতেই কি পরের উপর বরাত চালাইবে, আর মহীন্দ্রার সঙ্গেই নগদ কারবার ?”

বিহারী যে সমস্ত মাটি করিতে আসিয়াছে, বিনোদিনীর ইহা বুঝিতে বাকি রহিল না । বুঝিল, বিহারীর সম্মুখে সমস্তে থাকিতে হইবে ।

মহেন্দ্রও বিরক্ত হটল । খোলসা কথার কবিত্বের মাধুর্য়্য নষ্ট হয় । সে ঈর্ষ্য তীব্র হুগ্রেট কহিল—“বিহারি, তোমার মহীন্দ্রা কোন কারবারে যান না—হাতে বা আছে, তাতেই তিন সমস্ত !”

বিহারী । তিনি না যেতে পারেন, কিন্তু ভংগে লেগা থাকিলে কারবারের টেউ বাতির হঠতে আস্থাপ লাগে !

বিনোদিনী । “আপনার উপরিভ হাতে কিছুই নাই, কিন্তু আপনার টেউটা কোন্ দিক্ চইতে আসিতেছে ?”—বলিয়া সে সফটাক চামো আশাকে চিপিল । আশা বিরক্ত হইয়া উঠিয়া গেল । বিহারী পরাভূত হইয়া ক্রোধে নীরব হইল ; উঠিবার উপক্রম করিতেই বিনোদিনী কহিল—“হতাশ হইয়া যাবেন না বিহারিবাণু ! আমি চোখের বাগিকে পাঠাইয়া দিতেছি !”

বিনোদিনী চলিয়া যাইতেই সভান্তরে মহেন্দ্র মনে মনে রাগিল । মহেন্দ্রের আগ্রসর মুখ দেখিয়া বিহারীর রক্ত আব্বগ উজ্জ্বলিত হইয়া উঠিল । কহিল—“মহিন্দ্ৰ, নিজের সঙ্গীনাশ করিতে চাও কর—বরাদ্দর তোমার সেই অভ্যাস হইয়া আসিয়াছে ! কিন্তু যে

সরলজনন্য সাক্ষী তোমাকে একান্ত বিশ্বাসে
আশ্রয় করিয়া আছে, তাহার সন্ধান
করিয়া না। এখনো বংশভাঙ, তাহার
সন্ধান করিয়া না!”—বলিতে বলিতে
বিহারীর কণ্ঠ কঁদু হইয়া আসিল।

মহেন্দ্র ক্রুদ্ধরোবে কহিল—“বিহারি,
তোমার কথা আমি কিছুই বুঝিতে পারি-
তেছি না! হেঁয়ালি ছাড়িয়া স্পষ্ট কথা
কও!”

বিহারী কহিল—“স্পষ্টই কহিব! বিনো-
দিনী তোমাকে ইচ্ছা করিয়া অশ্রুধেব মিক
টানিতেছে এবং তুমি না জানিয়া মৃতের মত
অপথে পা বাড়াইতেছ!”

মহেন্দ্র গম্ভীর করিয়া উত্তিষ্ঠা কহিল—
“নিখা কথা! তুমি যদি ভ্রমণোক্তের
যেহেতু এমন অনায়াস সন্দেহের চোখে দেখ,
তবে অন্তঃপুরে তোমার আস: উচিত নয়।”

এমন সময় একটু খেলায় মিষ্টার সাজা-
ইয়া বিনোদিনী হাস্যমুখে তাহা বিহারীর
সম্মুখে রাখিল। বিহারী কহিল, “একি
ব্যাপার! আমার ত ক্ষুধা নাই!”

বিনোদিনী কহিল, “সে কি হয়! একটু
মিষ্টমুখ করিয়া আপনাকে বাইতেই হটবে।”

বিহারী হাসিয়া কহিল—“আমার দর-
খাত মজুর হইল বুঝি? সন্ধানের আরম্ভ
হইল?”

বিনোদিনী অত্যন্ত টিপিয়া হাসিল—
কহিল—“আপনি যখন বেগর, তখন
সম্পর্কের যে ভোর আছে! যেখানে দাবী
করা চলে, সেখানে ভিক্ষা করা কেন?
আদর যে কাড়িয়া লইতে পারেন! কি
বলেন মহেন্দ্রবাবু?”

মহেন্দ্রবাবুর তখন বাক্যশূন্য হইতেছিল
না।

বিনোদিনী। বিহারিবাবু, লক্ষ্য করিয়া
বাইতেছেন না, না রাগ করিয়া? আর
কাহাকেও ডাকিয়া আনিতে হইবে?

বিহারী। কোন দরকার নাই। বাহা
পাইলাব, তাহাই প্রচুর।

বিনোদিনী। ঠাট্টা? আপনায় সঙ্গে
পারিবার যো নাই। মিষ্টার দিগেও খু
বড় হয় না?

রাতে আশা মহেন্দ্রের মিকটে বিহারি-
সম্বন্ধে রাগ প্রকাশ করিল—মহেন্দ্র অনা-
দিনের মত হাসিয়া উড়াইয়া দিল না—
সম্পূর্ণ যোগ দিল।

প্রাতঃকালে উত্তিষ্ঠা মহেন্দ্র বিহারীর
বাড়ী গেল। কহিল—“বিহারি, বিনোদিনী
হাচার হোঙ্ক ঠিক বাড়ীর দেয়ে নয়—তুমি
সাম্নে আসিলে সে যেন কিছু বিরক্ত হয়।”

বিহারী কহিল—“তাই না কি! তবে
ত কাজটা ভাল হয় না! তিনি যদি
আপত্তি করেন, তাঁর সাম্নে নাই থেলান।”

মহেন্দ্র নিশ্চিন্ত হইল। এত সহজে
এই অপ্রিয় কার্য শেষ হইবে, তাহা সে মনে
করে নাই। বিহারীকে মহেন্দ্র ভয় করিবে।

সেই দিনই বিহারী মহেন্দ্রের অন্তঃপুরে
গিয়া কহিল—“বিনোদ-বোঠা’ন, রাগ করিতে
হইবে।”

বিনোদিনী। কেন বিহারিবাবু?

বিহারী। মহেন্দ্রের কাছে গুলিলাব;
আমি অন্তঃপুরে আপনায় সাম্নে বাহির
হই বলিয়া আপনি বিরক্ত হইয়াছেন।
তাই ক্ষমা চাহিয়া বিনয় হইব।

বিনোদিনী। “সে কি হয় বিহারিয়ার ? আমি আর আছি কাল নাই, আপনি আমার জন্য কেন যাইবেন। এত গোল হইবে জানিলে আমি এখানে আসিতাম না।”—এই বলিয়া বিনোদিনী মুখ ঘান করিয়া বেন-অঙ্গসংবরণ করিতে দ্রুতপদে চলিয়া গেল।

বিহারী স্পর্শকালের জন্য মনে করিল, “নিখা সন্দেহ করিয়া আমি বিনোদিনীকে অন্যায় আঘাত করিয়াছি।”

সেদিন সন্ধ্যাবেলায় রাজলক্ষ্মী বিপর্যাসে আসিয়া কহিলেন, “মহীন্, বিপিনের বৌ যে বাড়ী যাইবে বলিয়া দরিদ্রা বসিয়াছে।”

মহেন্দ্র কহিল—“কেন মা, এখানে তাঁর কি অসুবিধা হইতেছে ?”

রাজলক্ষ্মী। অসুবিধা না। বৌ বলিতেছে, তাহার মত সমর্থ বয়সের বিধবা মেয়ে পরের বাড়ী বেশিদিন থাকিলে লোকে নিন্দা করিবে।

মহেন্দ্র ক্ষুব্ধভাবে কহিল—“এ বৃদ্ধি পরের বাড়ী হইল ?”

বিহারী বলিয়া ছিল—মহেন্দ্র তাহার প্রতি ভৎসনাদৃষ্টি নিক্ষেপ করিল।

অর্জুণ বিহারী তাবিল—“কাল আমার কথাবার্তার একটু যেন নিম্নার আভাস ছিল। বিনোদিনী বোধ হয় তাহাতেই বেদনা পাইয়াছে।”

দামিনী উভয়ে মিলিয়া বিনোদিনীর উপর অভিমান করিয়া বসিল। ইনি বলিলেন, “আমাদের পর মনে কর তাই।” উনি বলিলেন, “এতদিন পুত্র আমার পর হইল।”

বিনোদিনী কহিল—“আমাকে কি তোমরা তির্যকাল দরিদ্রা রাখিবে তাই ?”

মহেন্দ্র কহিল—“এত কি আশাের স্পর্ধা ?”

আশা কহিল—“তবে কেন এমন করিয়া আমাদের মন কাড়িয়া লইলে ?”

সেদিন কিছুই হির হইল না। বিনোদিনী কহিল, “না তাই কাজ নাই, দু’দিনের জন্য মাথা না বাড়ানই ভাল।”—বলিয়া ব্যাকুলচক্ষে একবার মহেন্দ্রের মুখের দিকে চাহিল।

পরদিন বিহারী আসিয়া কহিল—“বিনোদ-বোঠা’ণ, যাবার কথা কেন বলিতেছেন ? কিছু দোষ করিয়াছি কি—তাহারি শান্তি ?”

বিনোদিনী একটু মুখকরাইয়া কহিল—“দোষ আপনি কেন করিবেন, আমার অদৃষ্টের দোষ।”

বিহারী। আপনি যান চলিয়া যান ত আমার কেবলি মনে হইবে, আমারি উপর রাগ করিয়া গেলেন।

বিনোদিনী কক্ষগচ্চে মিনতি প্রকাশ করিয়া বিহারীর মুখের দিকে চাহিল—কহিল—“আমার কি থাকা উচিত হয়, আপনিই বলুন না।”

বিহারী মুকিলে পড়িল। থাকা উচিত, এ কথা সে কেমন করিয়া বলিবে ? কহিল, “অবশ্য আপনাকে ত যাইতেই হইবে, না হয় আর দু চার দিন থাকিয়া গেলেন, তাহাতে কতি কি ?”

বিনোদিনী দুই চক্ষু নত করিয়া কহিল, “আপনার সকলেই আমাকে থাকিবার জন্য

অগ্রগণ্য করিতেছেন—আপনাদের কথা এড়াইয়া যাওয়া আমার পক্ষে কঠিন—কিন্তু আপনারা বড় অগ্রাধ করিতেছেন ।”

বলিতে বলিতে তাহার ঘনদীর্ঘ চকু-পল্লবের কথা দিয়া মোটা মোটা অক্ষরকোঁটা ক্রতবেগে পড়াইয়া পড়িতে লাগিল ।

বিহারী এই নীরব অল্প অক্ষরে ব্যাকুল হইয়া বলিয়া উঠিল—“কয়দিনমাত্র আসিয়া আপনাদের গুণে আপনি সকলকে বশ করিয়া লইয়াছেন, সেইজন্যই আপনাকে কেহ ছাড়িতে চান না—কিন্তু মনে করিবে নাকি বিনোদ-বোঠান, এমন লজ্জাকে কে ইচ্ছা করিয়া বিদায় করিবে ?”

আশা এক কোণে ঘোঁসটা দিয়া বসিয়াছিল, সে অঁচল তুলিয়া ঘনঘন চোখ মুছিতে লাগিল ।

ইহার পরে বিনোদিনী আর ঘরবার কথা উত্থাপন করিল না ।

(১৭)

সাক্ষাৎকার এই গোপনানুষ্ঠান একেবারে মুছিয়া ফেলিবার ক্রম মহেন্দ্র প্রত্যবে করিল—“আস্বে রবিবারে দম্মমের বাগানে চড়িভাঙী করিয়া আসা যাক্ !”

আশা অত্যন্ত উৎসাহিত হইয়া উঠিল । বিনোদিনী কিছুতেই রাজি হইল না । মহেন্দ্র ও আশা বিনোদিনীর আপত্তিতে তারি মুড়িয়া গেল । তাহারা মনে করিল, আজকাল বিনোদিনী কেনন ঘেন ঘূরে সরিয়া বাইবার উপক্রম করিতেছে ।

বিকালবেলায় বিহারী আসিখামাত্র বিনোদিনী কহিল, “দেখুন ত বিহারিবাবু, মইনুবাবু দম্মমের বাগানে চড়িভাঙী

করিতে বাইবেন, আমি সঙ্গে বাইতে চাই নাই বলিয়া আজ সকাল হইতে দুই জনে মিলিয়া রাস করিয়া বসিয়াছেন ।”

বিহারী কহিল—“অম্মার ভাগ করেন নাই । আপনি না গেলে ইহাদের চড়ি-ভাঙিতে যে কাণ্ডটা হইবে, অতিবড় লজ্জার — ঘেন ভেমন না হয় !”

বিনোদিনী । চকু না বিহারিবাবু ! আপনি যদি বান, তবে আমি বাইতে রাজি আছি ।

বিহারী । উত্তম কথা । কিন্তু কর্তার ইচ্ছা কণ্ড, কর্তা কি বলেন ?

বিহারীর প্রতি বিনোদিনীর এই বিশেষ পক্ষপাতে কর্তা, গৃহিণী, উভয়েই মনে মনে ক্ষুব্ধ হইল । বিহারীকে সঙ্গে লষ্টবার প্রস্তাবে মহেন্দ্রের অর্ধেক উৎসাহ উঠিয়া গেল । বিহারীর উপস্থিতি বিনোদিনীর পক্ষে সকল সময়েই অপ্রিয়, এই কথাটাই বহুতর মনে মুদ্রিত করিয়া দিবার লজ্জা মহেন্দ্র ব্যস্ত—কিন্তু অতঃপর বিহারীকে আটক করিয়া রাখা অসাধ্য হইবে ।

মহেন্দ্র কহিল “তা বেশ ত, ভালই ত । কিন্তু বিহারি, তুমি যেখানে যাও, একটা হাঙ্গাম না করিয়া হাড় না । ঘর ত সেখানে পাড়া হইতে রাঙোর ছেলে গোটাঁইয়া বসিবে, নর ত কোন্ গোত্রার সঙ্গে হয় ত মাত্রাঘারিই বাধাইয়া দিবে—কিন্তু বলা যায় না ।”

বিহারী মহেন্দ্রের আন্তরিক অনিচ্ছা বুঝিয়া মনে মনে হাসিল, কহিল—“সেই ত সংসারের নজা, কিসে কি হয়, কোথার কি ফেসাদ বটে, আগে হইতে কিছুই বলি-

বার ধোঁ নাই ! বিনোদ-বোঝা'ন, ভোজের
বেলায় ছাড়িতে হইবে, আমি ত্রিক সময়ে
আসিয়া হাতির হইব ।”

বিবাহের ভোরে দ্বিনিষপত্র ২ চাকরদের
জন্ত একটি খাতক্লাস ও মনিবদের জন্ত
একটি সেকেন্ড ক্লাস গাড়ি ভাড়া করিয়া
আনা হইয়াছে । বিহারী মত একটা প্যাক-
বাক্স সঙ্গে করিয়া বথাসময়ে আসিয়া উপ-
স্থিত । মহেন্দ্র কহিল, “ওটা আবার কি
আনিবে ? চাকরদের গাড়িতে ত আর
ধরিবে না ।”

বিহারী কহিল, “বাংলা হটয়ে না বাবা,
সমস্ত ত্রিক করিয়া দিতেছি ।”

বিনোদিনী ও আশা গাড়িতে প্রবেশ
করিল । বিহারীকে লইয়া কি করিবে,
মহেন্দ্র তাই ভাবিয়া একটু ইতস্তত করিতে
লাগিল । বিহারী বোঝাটা গাড়ীর মাথায়
তুলিয়া দিয়া চটু করিয়া কোজ্বায়ে চড়িয়া
বসিল ।

মহেন্দ্র হাঁক চাড়িয়া বাচিল । সে
ভাবিতেছিল, “বিহারী ভিতরেই বসে, কি,
কি কঁরে, তাহার ত্রিক নাই ।” বিনোদিনী
ব্যস্ত হইয়া বলিতে লাগিল, “বিহারিবাবু
পড়িয়া ধাবেন না ত ?”

বিহারী শুনিতে পাইয়া কহিল, “ভর
করিবেন না, পতন ও মুর্ছা, ওটা আমার
পার্টের মধ্যে নাই !”

গাড়ি চলিতেই মহেন্দ্র কহিল, “আমিই
না হয় উপরে গিয়া বসি, বিহারীকে ভিতরে
পাঠাইয়া দিই !”

আশা বাস্তব হটয়া তাহার চানর চাপিয়া
কহিল, “না তুমি গাইতে পারিবে না ।”

বিনোদিনী কহিল, “আপনার অভ্যাস
নাই, কাজ কি যদি পড়িয়া যান !”

মহেন্দ্র উত্তেজিত হইয়া কহিল, “পড়িয়া
যাব ? কখন না !”—বলিয়া তখনই বাহির
হইতে উঠাত হইল ।

বিনোদিনী কহিল, “আপনি বিহারি-
বাবুকে ঘোষ দেন, কিন্তু আপনিই ত হান্সম
বাধাইতে অস্বীকার !”

মহেন্দ্র মুখতার করিয়া কহিল, “আচ্ছা
এক কাজ করা যাক ! আমি একটা আলাদা
গাড়ি ভাড়া করিয়া দাও, বিহারী ভিতরে
আসিয়া বসুক ।”

আশা কহিল, “তা যদি হয়, তবে আমিও
তোমার সঙ্গে যাইব ।”

বিনোদিনী কহিল, “আর আমি বৃষ্টি
গাড়ি হইতে লাকাইয়া পড়িব ।” এমনি
গোলমাল করিয়া কথটা খামিয়া গেল ।

মহেন্দ্র সমস্ত পথ নুখ অভ্যাস গভীর
করিয়া গহিল ।

দমদমের বাগানে গাড়ি পৌছিল । চাকর-
দের গাড়ি অনেক আগে ছাড়িয়াছিল, কিন্তু
এখনো তাহার খোজ নাই ।

শরৎকালের প্রান্তঃকাল অতি মধুর ।
রৌদ্র উঠিয়া শিশির সরিষা পেছে, কিন্তু
পাছপালা নির্ঝল আলোকে বলবৎ করি-
তেছে । প্রাচীরের গায়ে শেকলি-পাছের
সারি রহিয়াছে, তলদেশে ফুলে আচ্ছন্ন এবং
গন্ধে আঘোষিত ।

আশা কলিকাতার ইষ্টকবন্ধন হইতে
বাগানের মধ্যে ছাড়া পাঠিয়া বস্ত্রমুগীর মত
উল্লসিত হইয়া উঠিল । সে বিনোদিনীকে
লটয়া ধান্দকত ফল কুড়াইল, গাছ হইতে

পাকা আস্তা পাড়িয়া আস্তাগাছের তলায় বসিয়া খাইল, দুই সবীতে দীঘির জলে পড়িয়া দীর্ঘকাল ধরিয়া স্নান করিল। এই দুই নারীতে মিলিয়া একটি নিরর্থক আনন্দে, গাছের ছায়া এবং শাখাচাত আলোক, বীঘির জল এবং নিকুঞ্জের পুষ্পগন্ধকে পুনরুক্তি, সচেতন করিয়া তুলিল।

স্নানের পর দুই সবী আসিয়া দেখিল, চাকরদের গাড়ি তখনো আসিয়া পৌছে নাই। মহেন্দ্র বাড়ীর বারান্দায় চোঁকি লইয়া অত্যন্ত শুকনুখে একটা বিণাতী মোকানের বিজ্ঞাপন পড়িতেছে।

বিনোদিনী জিজ্ঞাসা করিল, “বিহারি-বাবু কোথায়?”

মহেন্দ্র সংক্ষেপে উত্তর করিল—
“জানি না।”

বিনোদিনী। চণ্ডু ঠাহাকে খুঁজিয়া বাহির করি গে!

• মহেন্দ্র। তাহাকে কেহ চুরি করিয়া লইবে, এমন আশঙ্কা নাই। না খুঁজিলেও পাওয়া যাইবে।

বিনোদিনী। কিন্তু তিনি হয়ত আপনার মত তাবিয়া মরিতেছেন, পাছে দূর্গতরর যোগ্য হার। তাহাকে সাহসনা দিয়া আসা থাক।

জলাশয়ের ধারে প্রকাণ্ড একটা বাঁধান বটগাছ আছে, সেইখানে বিহারী তাহার প্যাক্সান্ডা খুলিয়া একটি কেরোসিন-চুলা বাহির করিয়া জল গরম করিতেছে। সকলে আসিবারাত্র আতিথ্য করিয়া বাঁধা বেদীর উপর বসাইয়া এক এক পেয়ালা গরম চা এবং ছোট রেকাবীতে দুই একটি মিষ্টান্ন

ধরিয়া দিল। বিনোদিনী বারবার বলিতে লাগিল, “ভাগ্যে বিহারি-বাবু সমস্ত উদ্যোগ করিয়া আনিয়াছিলেন, তাই ত রক্ষা, নহিলে চা না পাইলে মহেন্দ্র-বাবু কি পশা হইত!”

চা পাইয়া মহেন্দ্র বাঁটিয়া গেল, তবু বলিল, “বিহারীর সমস্ত বাড়িবাড়ি। চড়িভাতী করিতে আসিয়াছি, এখানেও সমস্ত দক্ষর-মত আয়োজন করিয়া আনিয়াছে! ইহাতে মজা থাকে না!”

বিহারী করিল, “তবে যাও তাই তোমার চায়ের পেয়ালা, তুমি না খাইয়া মজা কর গে—বাধা দিব না।”

বেলা হয়, চাকররা আসিল না। বিহারীর বান্স হইতে আহারাদির সরঞ্জাম সরঞ্জাম বাহির হইতে লাগিল। চাল-ডাল, তরী-তরকারী এবং ছোট ছোট বোতলে বিভিন্ন পেয়া মদ্য, আশ্রিত হইল। বিনোদিনী আশ্চর্য হইয়া বলিতে লাগিল—“বিহারি-বাবু, আপনি যে আনাগেরও ছাড়াইয়াছেন। ঘরে ত গৃহিণী নাই, তবে শিখিগেন কোথা হইতে?”

বিহারী করিল—“প্রানের দ্বারে শিখিয়াছি—নিজের ঘর নিজেই করিতে হয়।”

বিহারী নিতান্ত পরিহাস করিয়া করিল, কিন্তু বিনোদিনী পক্ষীর হইয়া বিহারীর মুখে ককণচক্ষের কুপার্বণ করিল।

বিহারী ও বিনোদিনী মিলিয়া বাঁধা-বাড়ার প্রবৃত্ত হইল। আশা স্নান সমুচিত ভাবে হস্তক্ষেপ করিতে আসিলে, বিহারী তাহাতে বাধা দিল। অপটু মহেন্দ্র সাহায্য করিবার কোন চেষ্টা করিল না। সে গুঁড়ির উপরে হেলান দিয়া একটা পাখের

উপরে আর একটা পা তুলিয়া কলিত বটপত্রের উপরে প্রোত্ৰকিরণের নৃত্য দেখিতে লাগিল।

রত্নন প্রায় শেষ হইলে পর বিনোদিনী কহিল, “নহীন্‌বারু, আপনি ঐ বটের পাতা পড়িয়া শেষ করিতে পারিবেন না, এবারে শ্রান করিতে যান।”

ভূত্যের দল এতক্ষণে জিনিষপত্র লইয়া উপস্থিত হইল। তাহাদের গাড়ি পথের মধ্যে ভাঙিয়া গিয়াছিল। তখন বেলা দুপুর হইয়া গেছে।

আহারান্তে সেই বটগাছের তলার তামবেলিয়ার প্রস্তাব হইল—মস্তে কোনমতেই গা দিল না এবং দেখিতে দেখিতে ভারতলে ঘুমাইয়া পড়িল। আশা বাড়ীর মধ্যে গিয়া ঘার কড় করিয়া বিগ্রামের উপোগ করিল।

বিনোদিনী মাথার উপরে একটুখানি কাপড় তুলিয়া দিয়া কহিল, “আমি তবে ঘরে বাই।”

বিহারী কহিল, “কোথায় বাইবেন, একটু গর করুন। আপনাদের বেশের কথা বলুন।”

কণে কণে উক মধ্যাহ্নের বাতাস তরুপন্নব বহ্নরিত করিয়া চলিয়া গেল, কণে কণে দীঘির পাড়ে জামগাছের বনপত্রের মধ্য হইতে কোকিল ডাকিয়া উঠিল। বিনোদিনী তাহার ছেলেবেলাকার কথা বলিতে লাগিল, তাহার বাপমায়ের কথা, তাহার বাল্যস্মারক কথা। বলিতে বলিতে তাহার মাথা হইতে কাপড়টুকু খসিয়া পড়িল; বিনোদিনীর মুখে খরসৌবনের যে একটি দাঁপি সমুদায় বিগাছ করিত,

বাল্যস্মৃতির ছায়া আসিয়া তাহাকে দিখ করিয়া দিল। বিনোদিনীও দেখে যে কৌতুকভীর কটাক দেখিয়া তীক্ষ্ণদৃষ্টি বিহারীর মনে এ পর্য্যন্ত নানাপ্রকার সংশয় উপস্থিত হইয়াছিল, সেই উজ্জলকক-জ্যোতি বখন একটি শাখ সমল রেখার শ্রান হইয়া আসিল, তখন্নি বিহারী বেন আর একটি মানুষ দেখিতে পাইল। এই দীপ্তি-মণ্ডলের কেন্দ্রবিন্দু কোমল চন্দ্রদীপ্ত এখনো সুধাধারার সরস হইয়া আছে—অপরিচুস্ত রত্নরস-কৌতুকবিন্যাসের মনোজ্ঞাচার এখনো নারীপ্রকৃতি শুক হইয়া যায় নাই। বিনোদিনী সমস্ত মর্ত্য-দাঁতাবে একান্ত ভক্তিভরে পতিসেবা করিতেছে, কল্যাণ-পরিপূর্ণ জননীর মত সন্তানকে কোলে ধরিয়া আছে, এ ছবি ইতিপূর্বে দুঃস্থের জন্যেও বিহারীর মনে উদিত হয় নাই—আজ যেন রক্তরক্তের পটখানা কলকালের মনো উড়িয়া গিয়া ঘরের ভিতরকার একট মঙ্গলদৃশ্য তাহার চোখে পড়িল। বিহারী ভাবিল, “বিনোদিনী বাহিরে বিলাসিনী যুবতী বটে, কিন্তু তাহার অন্তরে একট পুণ্ডরীক নারী নিয়মের তপস্যা করিতেছে।” বিহারী দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া মনে মনে কহিল, “প্রকৃত আপনাকে মানুষ আপনিও জানিতে পারে না, অন্তর্ধানীই জানেন, অবস্থাবিশিষ্টকে যেটা বাহিরে পড়িয়া উঠে, সংসারের কাছে সেইটেই সত্য।” বিহারী কথাটাকে ধ্যানিতে দিল না—প্রশ্ন করিয়া করিয়া জাপাইয়া রাখিতে লাগিল; বিনোদিনী এ সকল কথা এ পর্য্যন্ত এমন করিয়া শোনাইবার লোক পায় নাই—বিশেষত কোন পুরুষের কাছে

সে এমন আত্মবিশ্বস্ত প্রাভাবিক ভাবে কথা কহে নাই—আজ অল্পস্র কলকণ্ঠে নিত্যস্র সহস্র জনের কথা বলিয়া তাহার সমস্ত প্রকৃতি যেন নববারিধাধার স্নাত, মিষ্ট এবং পরিতৃপ্ত হইয়া গেল।

ভোরে উঠিবার উপক্রমে ক্রান্ত মহেশ্বরের পাঁচটার সময় ঘুম ভাঙিল। বিরক্ত হইয়া কহিল, “এবার কিরিত্যর উদ্দেশ্যে কহা যাক্!”

বিনোদিনী কহিল, “আর একটু সন্ধ্যা করিয়া গেলে কি কতি আছে?”

মহেন্দ্র কহিল, “না, শেষকালে মাতাল পোন্নার হাতে পড়িতে হইবে?”

অনিদ্রপন্ন গুচ্ছাইয়া তুলিতে অক্ষকার হইয়া আসিল। এমন সময় চাকর আসিয়া খবর দিল, “তিকা গাড়ি কোথায় গেছে, খুঁজিয়া পাওয়া যাইতেছে না। গাড়ি বাগানের বাহিরে অপেক্ষা করিতেছিল, দুইজন পোন্ন গাড়োয়ানের প্রতি বলপ্রকাশ করিয়া ঠেপনে লইয়া গেছে।”

আর একটা গাড়ি ভাড়া করিতে চাকরকে পাঠাইয়া দেওয়া হইল। বিরক্ত মহেন্দ্র কেবলি মনে মনে কহিতে লাগিল, “আজ দিনটা বিখ্যা যাচি হইয়াছে”—অর্থাৎ সে আর কিছুতেই গোপন করিতে পারে না, এমনি হইল।

গুরুপঙ্কের চাঁদ ক্রমে শাখাখালজড়িত দিক্‌প্রান্ত হইতে নৃত্য আকাশে আরোহণ করিল। নিতম্ব নিকম্প বাগান ছারালোকে বচিত হইয়া উঠিল। আজ এই নয়ানপিত্ত

পৃথিবীর মধ্যে বিনোদিনী আপনাকে কি একটা অপূর্ণ ভাবে অনুভব করিল। আজ সে যখন তরুণীভিকার মধ্যে আনুকে অড়াইয়া ধরিল, তাহার মধ্যে প্রণয়ের কৃত্রিমতা কিছুই ছিল না। আশা যেছিল, বিনোদিনীর দুই চক্ষু দিয়া মল করিয়া পড়িতেছে। আশা ব্যর্থ হইয়া বিজ্ঞানী করিল—“কি তাই চোখের বালি, তুমি কাঁদিতেছ কেন?”

বিনোদিনী কহিল, “কিছু নয় তাই, আমি বেশ আছি! আজ দিনটা আমার বড় ভাল লাগিল!”

আশা বিজ্ঞানী করিল—“কিমে তোমার এত ভাল লাগিল তাই?”

বিনোদিনী কহিল—“আমার বনে হইতেছে, আমি বেন মরিয়া গেছি, যেন পরলোকে আসিয়াছি, এখানে বেন আমার সমস্তই মিলিতে পাবে।”

বিস্তিত আশা এ সব কথা কিছুই বুঝিতে পারিল না। সে সত্যের কথা শুনিয়া হুঃখিত হইয়া কহিল—“ছি তাই চোখের বালি, এমন কথা বলিতে নাই!”

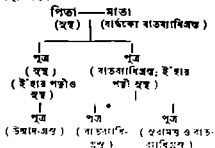
গাড়ি পাওয়া গেল। বিহারী পুনরায় কোচবান্সে চড়িয়া বসিল। বিনোদিনী কোন কথা না বলিয়া বাহিরের দিকে চাহিয়া রহিল, জ্যোৎস্নার শুভিত তরুণী ধাবমান নিবিড় ছায়াস্রোতের মত তাহার চোখের উপর দিয়া চলিয়া যাইতে লাগিল। আশা গাড়ির কোণে ঘুমাইয়া পড়িল। মহেন্দ্র স্তবীৰ্ণপন নিত্যস্র বিমর্ষ হইয়া বৃদিয়া থাকিল।

ক্রমশঃ।

পাত্রনির্বাচন ।

সন্তানে পিতামাতার গুণের রূপান্তরপরিগ্রহ এক অদ্ভুত ব্যাপার। যে রোগ সম্পত্তির শরীরে বর্তমান, সন্তানে যে অবিকল তাহাই পরিস্ফুট হইবে, এরূপ নিশ্চয়তা নাই। মাতালের পূর খাঁড়াল হইলে অপরিবর্তিত সংক্রমণ হয়। কিন্তু দেখা দিয়াছে, মাতালের বংশধরদিগের মধ্যে হয় ত কেহ মাতাল, কেহ উদ্বাসিত, কেহ উৎকট রিপুপগ্রবণ।

উপরের লিখিত বিষয় সৰ্ব্বত্র আশ্রয় নিজ অভিজ্ঞতা হইতে কয়েকটি দৃষ্টান্ত দিব। কোন একজন সম্পন্ন লোক নিত্য হুমায়ুন ছিলেন। তাঁহার দুইটোনাও সন্তান। তন্মধ্যে পুত্রটি সর্গবিধ মাৎসর্য দাস হইয়া নিত্য অধন্য প্রাপ্ত হইয়াছে; কন্যাটি পতিভা রমণদিগের সংখ্যানুচ্চিক্রিয়াছে। অন্য এক পরিবারে পিতা খুব বুদ্ধিমান, কিন্তু নিত্য বগ্ন ও মদ্যপায়ী, মাতা অপেক্ষাকৃত অর বরণে গভাস্ত্র হইয়াছেন। সন্তানদিগের মধ্যে একটি পুত্র অর-বরণসেই সূত্রানুগে পতিত হইয়াছে; আর একটি পুত্র নিত্য নির্দোষ; অন্য একটি পুত্রও আশাজনক নহে। অন্য একটি পরিবারের অবস্থা এইরূপ—



অমহীনতাও পুরুষাত্মক সংক্রমিত হয়। অক, মুক, বদ্বি প্রভৃতির সন্তান সেই সব রূপে লইয়া জন্মিতে পারে। কিন্তু এ সবকিছু একটি কথা আছে। মানবসদেহের সর্বাংশে অতিদ্রুত কোষ বা cell সমূহ বর্তমান। তাহার প্রত্যেকটি কোষে শরীরের প্রত্যেক-অংশগঠনোপযোগি-শক্তি আছে বলিয়া বৈজ্ঞানিকগণ অনুমান করেন।

(Darwin, theory of pangenesis প্রটো) যদি কোনও অঙ্গের পীড়া হয়, তাহার কতিপূরণেব ওস্ত শরীরস্থ সমস্ত কোষের তত্ত্বপযোগি-শক্তি নিয়োজিত হইবে; দেখা, বাহ্যে কৃদ্রিগোপ হইলে সমগ্র-বেহের কোষগণ হইতে বাহ্যগঠনোপযোগি-শক্তি ব্যয়িত হইতে থাকে। যদি সেই শক্তি সম্পূর্ণ ব্যয় হইয়াও মারোগা না হয়, বাহ্যে পতিয়া বাইবে। তখন আর সেই শরীরে বাহ্যগঠনোপযোগি-শক্তি নাই। পিতামাতার শরীরের যে আত্মীকণিক অংশ লইয়া সন্তানের দেহ গঠিত হয়, তাহাও ঐরূপ কোষমাত্র। বাহার বাহ পূর্বোক্ত-রূপে নষ্ট হইয়াছে, তাহার সন্তানোৎপাদক দেহাংশে বাহ্যগঠনোপযোগি-শক্তির অভাবে সন্তান বাহীন হইবে। কিন্তু কোন ব্যক্তি বুদ্ধিবিভে খণ্ডিতবাহ হইতে পারে। তাহার সন্তান কখনও অপূর্ণ হইবে না; কারণ, তাহার কোষসমূহের শক্তি পূর্ণরূপে বর্তমান।

দীর্ঘজীবিত বা অমায়ুষ্যও পুরুষাত্মক-ক্রমে সংক্রমিত হইতে পারে। বহুসন্তান-বত্তা বা বত্তাহত তদ্রূপ। সুপরিচ্ছন্ন গ্যান্টেন

সাহেব পুত্রবাহুক্রমিক সম্বন্ধে বহু গবেষণা করিয়াছেন। তাঁহার নতে দারাদ মহিলাদের (peeresses) পানিগ্রহণ ইংলণ্ডের প্রাচীন অভিজাতসম্প্রদায়ের উচ্চের এক কাঁচ। পুত্রের অভাবেই কন্যা পৈতৃক সম্পত্তির উত্তরাধিকারিণী হন। অতএব কন্যার উত্তরাধিকারিণীই প্রমাণ যে, তিনি পিতা-মাতা হইতে বহুসন্তানবত্বাপন্ন ওপের বীজ লাভ করেন নাই। ইংরেজ অভিজাতসম্প্রদায় সর্বদাই বিবাহার্থে এইরূপ মহিলাদের অন্বেষণ করেন। দীর্ঘকাল এট প্রকারে অর্থের নিকট বংশগতির উৎসর্গ চইলে, নির্বংশ আন্দর্গের বিসর্গ নহে।

এস্থলেও আমরা অভিজাত হইতে দৃষ্টান্ত দেখি। এক পরিবারে তিন ভাই ও দুই ভগিনী ছিলেন : এমন উঁহারা সকলেই মানবলীলা সংবরণ করিয়াছেন। তন্মধ্যে মহান ভ্রাতা বিবাহের অল্পপরেই অল্পবয়সে গতান্ব চন। এক ভগিনীও নিমসন্তান অবস্থার অল্পবয়সে বিধবা চন। ছোট ভ্রাতা অতি দীর্ঘজীবী, কিন্তু নিঃসন্তান। কনিষ্ঠ ভ্রাতা একটুক বেশি বয়সে বিবাহ করেন, কিন্তু পত্নীর বৌবনোদ্যমের পর প্রায় ২১২২ বৎসর জীবিত থাকিয়া ও মাত্র তিনটি সন্তান লাভ করিয়াছিলেন। ছোট ভগিনী দীর্ঘায়ু লাভ করিয়াছিলেন ; কিন্তু তাহার দুইটিমাত্র পুত্র জন্মিয়াছিল। উক্ত ভাই-ভগিনীদিগের এক পুত্রভ্রাতা, মাত্র দুই সন্তানের পিতা ; এবং তাঁহাদের জন্মের ব্যবধান ৬৭ বৎসর। এট সব বিবেচনা করিয়া এট বংশে বহুত জনগণত বলিয়াই মনে হয়।

এখন প্রশ্ন হইতে পারে যে, যদি পিতা-মাতার গুণ প্রকৃত প্রস্তাবেই সন্তানে প্রযুক্ত হইত, তবে গুণবানের পুত্র অপব্যব্রূত অপেক্ষাকৃত গুণহীনের পুত্র গুণবান হইতেন ? এই প্রশ্নের তিনটি উত্তর দেওয়া হইতে পারে।

প্রথমত, পূর্ণেই উক্ত হইয়াছে যে, অনেক সময়ে গুণবিশেষ দুই এক পুরুষ গুণ থাকিয়া পরে প্রকাশিত হয়। অবগতিশেষে অভিস্রবতী পূর্ণপুরুষদের গুণও বংশধরদিগের মধ্যে প্রকাশমান হইয়া থাকে। জার্বাইনের পুনরাবির্ভাববাদ (theory of reversion) তাহাই বলে।

দ্বিতীয়ত, পিতামাতার বাহু অবস্থা দেখিয়া সন্তানের অবস্থা নির্ণয় করা সর্বদা সম্ভব হয় না। এ বিষয়ে গ্যাটনসাহেব একটি সুন্দর দৃষ্টান্ত দিয়াছেন। কোন এক কাউন্টিতে অধিকসংখ্যক লিবারেল ও অল্পসংখ্যক র্যাডিক্যাল নির্বাচকদিগের মধ্যে সংখ্যাবহুল লিবারেলদের প্রতিনিধিই মনোনীত হইবেন। অপর এক কাউন্টিতে অধিকসংখ্যক কন্সার্বেটিব ও অল্পসংখ্যক র্যাডিক্যালদিগের মধ্যে অধিকসংখ্যক কন্সার্বেটিবদের প্রতিনিধি নির্বাচিত হইবেন। কিন্তু এই দুইটি কাউন্টি একটিতে পরিণত হইলে লিবারেল ও কন্সার্বেটিবপন পরস্পরবিরোধী হইয়া পরস্পরের প্রাধান্য-সম্ভাবনা লুপ্ত করিবেন ; আর দুই কাউন্টির র্যাডিক্যালের শক্তি মিলিত হওয়াতে তাহাদেরই জয় হুটাবে। যদি এই দুই কাউন্টিকে সম্প্রতি কর্তন করা হয়, সন্তানোৎপাদনে তাহাদের একত্বের সাদৃশ্য

হইবে। তাঁহাদের দৃশ্যমান গুণাবলী লিবারেল ও কনসার্ভেটিভ এবং অন্তঃ সমন্বয়-ক্রান্ত গুণাবলী র্যাডিক্যাল সদৃশ। একদল মেলনের কলে সময়ে সময়ে সাধারণ লোকের অসাধারণ এবং মনীষীর হীনগুণ সন্ধান দৃষ্টিগোচর হয়।

ভুক্তীয়ত, সুবিখ্যাত প্রতিভাশালী লোকদিগের সন্তানগণ পিতার অসুপস্থিত বলিয়া অনেক সময়েই আমরা অভিযোগ তুলিতে পাই। এই অভিযোগ নিতান্ত অসঙ্গত নহে, বিজ্ঞান ও কিয়ৎপরিমাণে ইহা সন্মত করিতেছে। সন্তানশালী ও প্রতিভা-শালী এই দুই শ্রেণীর বড়লোক স্মৃতি। এক শ্রেণীর লোক বাল্যকাল হইতে স্বাভা-বিক বৃদ্ধি, যত ও চেষ্টার কালে ক্রমে ক্রমে উন্নতিলাভ করেন। প্রত্যেক সমাজেই স্বেচ্ছা বহুলোক বর্তমান। ইহাবাই প্রাকৃত-প্রতিভাশালী বা talented। অন্য এক শ্রেণীর লোক যুবাবস্থায় যত তেজো-দীপ্তিতে সমাজের চক্ষু ঝলসাইয়া দেন। এখনশ্রেণীর ন্যায় ইহাদের তত বন্ধ-চেষ্টার প্রয়োজন হয় না। ইহাদের মধ্যে কি যেন একটা উদ্ভাস ভাব আছে। কোনও সমা-জেরই একদল লোক এক সময়ে অধিক মিলে না। ইহায়াই অগামান্য-প্রতিভাশালী বা genius। ব্যয়রণের প্রতিভা এই শ্রেণীর অন্তর্গত। বৈজ্ঞানিকগণ দেখাইতে প্রয়াস পাইয়াছেন যে, অগামান্য প্রতিভা বিজ্ঞানের হিসাবে একপ্রকার রোগের মধ্যে। তাই ইহাদের সুসন্ধানপাত্রে আশা অতি অল্প। অনেক সময়ে এইরূপ অগামান্য-প্রতিভাশালী লোকদিগের পরিবারে অগামান্য

ব্যক্তির উদ্ভাবাদি রোগ দৃষ্ট হয়। কলত বাহুরের সর্গবিধ অসামান্যই (বা mons-
trousness) বেগ এবং তাহা বংশবিস্তার
ব্যাপ্যতজনক। সময়ে সময়ে এই শ্রেণীর
লোক অস্বাভাবিক; কেহ নিঃসন্তান;
কাহারও সন্তান অসুখ; কেহ কেহ
সন্তানোৎপাদনবিরোধী; কাহারও বা
জীবন উচ্ছ্বল। এই কারণেই অগামান্য-
প্রতিভাশালী লোকদিগের হীনগুণ সন্তান
বেধিয়া পুরুষাত্মকদের ব্যতিক্রম বলিয়া
আমাদের ভ্রম হয়; কিন্তু প্রকৃতপক্ষে
সন্তানের হীনতাই অগামান্যবৈশিষ্ট্যের একমাত্র
অনিবার্য ফল।

এ রূপে কয়েকজন অস্বাভাবিক পুরুষের
দৃষ্টান্ত আমার প্রতিপাদ্য হইতেছে।
ইহাদের প্রতিভার সহিত অসামান্য বা তৎ-
সংশ্লিষ্ট কোন না কোন রোগের জ্ঞাতিক
ছিল কি না, চিত্তবান। বার্লস্, কান্ট্ ও
বায়রণ, তিন জনেই অস্বাভাবিক পিতৃ হন।
শকরাচার্য এবং মাণিকলাভারও তাই।
সিদ্ধার ও নেপোলিয়ন কেবলমাত্র এক এক
সন্তানের পিতা এবং উভয়েরই সন্তান অস-
বয়সে মৃত্যুপ্রাপ্ত পতিত হয়। মহানদের
একমাত্র সন্তান কতমা। নিউটন জীবনে
কখনও বংশবিস্তার চিন্তা করিয়াছিলেন বলিয়া
বোধ হয় না। পোপ চিরকল্প ছিলেন;
কান্টার উন্নতও হইয়াছিলেন। ক্লাইয়ের
বালাজীবন, যৌবনে আত্মহত্যার চেষ্টা এবং
চরমে আত্মহত্যা সুপ্রসিদ্ধ। কস্টার জীবন-
কাহিনী ঘোর বিধবে আচ্ছন্ন। এতদ্বির
প্রায় সমুদয় উন্নত প্রতিভাশালী কবির
জীবন উচ্ছ্বলতার দৃষ্টান্ত।

রূপ, ধর্ম, নিমেষ প্রভৃতির সহিত বিবাহ অর্থোক্তিক, একথা কাহাকেও বলিতে হইবে না। কিন্তু তাহাই বোধে নহে। পামশাস্ত্রীর পিতৃমাতৃকুলের পূর্বপুরুষদের সম্বন্ধে বিশেষ তথ্য না গইয়া পরিগণন্যত্রে আবৃত্ত হইলে পরিগণনে অসম্ভব সম্ভবপর। এ কথা স্বীকার্য যে, খুব তরুণ অল্পসময় প্রায় অসম্ভব; কিন্তু এদিকে যথাসাধ্য দৃষ্টি রাখা অসম্ভব নহে। বিশেষত আমাদের দেশে অভিব্যক্তকণ্য পাত্র বা পাত্রী অধেষণ করেন। এই রীতি অল্পসময়ে পূর্বপুরুষদের তথ্যনির্ণয় অতি সহজসাধ্য।

পুঙ্খানুপুঙ্খ নিরীক্ষণে চিত্তা করিলে সহজেই কয়েকটি সাধারণ সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায়। যে পরিবারে কোন একটি রোগের প্রাদুর্ভাব লক্ষিত হয়, সেই রোগ-গ্রস্ত জন পরিবারের সহিত তাহার বৈবাহিক-সম্বন্ধ-স্থাপন নিত্যস্থ বিপন্নক; কারণ স্বামী ও স্ত্রী উভয়ের পরীক্ষিত সামান্য রোগবীজ মিলিত হইয়া বিগুণিত বলে সম্ভাবনামূলক আক্রমণ করিতে পারে। কিন্তু রোগবিশেষের বীজদ্রষ্ট পুরুষ বা স্ত্রী তথ্যদানী বা স্বামী গাত করিলে, সম্ভানে সে রোগের প্রাদুর্ভাব অল্পভূত নাও হইতে পারে। পিতামাতা উভয়ের পাকতলীর চূর্ণলতা সম্ভানে গুরুতর অতীর্ণরোগ সৃষ্টি করিতে পারে; অথবা পিতামাতা উভয়ে সামান্য কাশরোগগ্রস্ত হইলে সম্ভানের কঠিন কাশরোগে আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা। পরন্তু যদি ঘটনাক্রমে উক্ত সম্প্রদায়ের পুত্র-দ্বয় পরস্পরের স্ত্রীর সহিত বিবাহিত হইতেন, তবে তরু সম্ভানে কোন

কঠিন রোগ জন্মিবার অবসর ঘটত না। পুঙ্খ যে গুণাবলীর রূপান্তরী-তাবের কথা উল্লিখিত হইয়াছে, তৎপ্রতিও মনোযোগ আবশ্যক। পরস্পরে পরিগণনীয় রোগগুলিকে, সম্ভানে সংক্রমণসম্বন্ধে, একই রোগ বলিয়া বিবেচনা করিতে হইবে। বাতবাধিগ্রস্তের সম্ভানের সহিত মধ্যপায়ীর সম্ভানের পরিগণনের ফলে উন্মাদ, মৃগী, অতি-মাদকাসক্তি, আত্মহত্যা প্রভৃতি প্রকৃতি নানা-রোগের বিকাশ হইতে পারে। যে বংশ অমায়ুক, তাহাদের দীর্ঘজীবী পরিবারের সহিত বৈবাহিক সম্পর্ক বাহ্যনীয়। দুই মৃতবৎসার সম্ভানের পরিগণন নিঃসংশয়ের নিধানভূত। দুই পরিবারের একমাত্র সম্ভান-বয়ের বিবাহ নিষ্ফল হওয়ার সম্ভব সম্ভাবনা। এই বিষয়ে প্যাটনসাহেবের পূর্ণ-লিখিত মত প্রত্যেক বর্ণগুরু পিতামাতার স্বরণ রাখা কতবা। দ্বিতীর্ঘ, অতি-চুল বা বামনের সহিত বিবাহও বৃদ্ধিসঙ্গত নহে।

এ সম্বন্ধে আমাদের পাত্রকার্যের বিধি আলোচনা করা অবশ্যকর্তব্য। সম্ভাবিতেছেন—

মহাশয় পিতৃদেব পিতৃদেব-বৎসকঃ।

স্বীয়বৎসকঃ পিতৃদেব পিতৃদেবঃ।

স্বীয়বৎসকঃ পিতৃদেব পিতৃদেবঃ।

স্বীয়বৎসকঃ পিতৃদেব পিতৃদেবঃ।

স্বীয়বৎসকঃ পিতৃদেব পিতৃদেবঃ।

স্বীয়বৎসকঃ পিতৃদেব পিতৃদেবঃ।

স্বীয়বৎসকঃ পিতৃদেব পিতৃদেবঃ।

স্বীয়বৎসকঃ পিতৃদেব পিতৃদেবঃ।

স্বীয়বৎসকঃ পিতৃদেব পিতৃদেবঃ।

স্বীয়বৎসকঃ পিতৃদেব পিতৃদেবঃ।

মুগ্ধ নোকে অতিসম্ভ্রান্তমুগ্ধ হীনক্রিয়, পুত্রসন্তানবিহীন, বেবাক্যায়নবিবাহিত (আধুনিক মতে মূৰ্খ), রোমন্থ এবং অশ্রু, ক্রন্দ, অধুমান্য, অপস্মার, শিথ ও স্তম্ভরোগ প্রভৃতির কন্যা পরিত্যাজ্য হইতেছে। 'হীনক্রিয়' শব্দের অর্থ—জাতকৰ্ম্মবিহীন বলিয়া চীকাকার বলিতেছেন; ইহার আধুনিক অর্থ—সদীচারা-বিহীন হইতে পারে। অতিরোমন্থ সাধারণত প্রাচীণ অবস্থা নহে; বিশেষত স্ত্রীলোকের পক্ষে। অতএব পুরুষাত্মকমিত্র সম্বন্ধে পূর্বে যে আলোচনা প্রবৃত্ত হইয়াছে, তাহা হইতে দেখা যাইবে যে, মহুর এই বিধির প্রত্যেক অংশ বিজ্ঞান-সম্মত। একদম নোকে ভ্রাতৃহীনা ও অজ্ঞাতপিতৃকার পানিগ্রহণ নিষিদ্ধ হইয়াছে,

ইহাও বিজ্ঞানাহুমানিত। ভ্রাতৃহীনা স্ত্রীর গর্ভে পুত্রসন্তানলাভের আশা অল্প। বাহ্যিক পাত্র বা পাত্রীর পূৰ্ব্বপুরুষের তৎকাল-সম্বন্ধে অনিশ্চয়, অজ্ঞাতপিতৃকর্ত্তে বিবাহ নিষেধ করিয়া মহুর তাহাদিগকে ভিন্নকার্য করিতেছেন বলিয়া বোধ হয়। অষ্টম দ্রোকে কন্যার নিজস্বোদাসম্বন্ধে ব্যবস্থা প্রবৃত্ত হইয়াছে। মহুর মতে কপিলকেশ্য, শিঙ্কলাকী, বৃদ্ধসুখাদি-বিশিষ্টতা প্রযুক্ত বিকলাঙ্গী, অলৌহিকা, অতিলোমা, বা পুরুষভাবিণীর পানিগ্রহণ অকর্তব্য। বিকলাঙ্গী ও পুরুষভাবিণীর সম্বন্ধে আপত্তির কারণ হ্রস্পট। এতদ্ব্যতীত অন্য সকলগুলি বিশেষণই এতদ্ব্যতীত অসামান্যাদর্শক; অতএব উদ-বস্থার বিবাহও বিজ্ঞানবিরুদ্ধ।

শ্রীপরেশনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ।

সাগর-কথা ।

বিজ্ঞানসম্মতমহাশয় অসুস্থ অবস্থায় অনেক সময়ে কয়লাডাঙার অবস্থিতি করিতেন। এইরূপ অসুস্থাবস্থার একদিন এই শরীর মহাত্মা জাহ্নবীতীরে রাজপথে পাখচারণা করিতেছেন, এমন সময়ে একটি স্ত্রীলোক একটি বাগলকে কোড়ে লইয়া সেই পথে বেড়াইতে আসিয়াছে। ছেলেটি দেখিতে মন্দ নয়, মুখখুনি দেখিলে, আবার দেখিতে ইচ্ছা হয়। বিজ্ঞানসম্মতমহাশয়

ছেলেটিকে দেখিতেছেন, দেখিতে দেখিতে জোড়হুঁ বাগলটির পাখের দিকে তৃষ্ণা পড়িল। বাগলের হুঁখানি পাখের আকার সমান নহে দেখিয়া, তিনি উহার কারণ জিজ্ঞাসা করিয়া জানিতে পারিলেন যে, বাগলের হুঁখানি পা-ই একরকম ছিল, কিন্তু বয়ো-বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে একপাশি পা শীর্ণ ও ক্রমে কমপ্রাপ্ত হইয়া ঐরূপ অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছে।

বিদ্যাসাগর জিজ্ঞাসা করিলেন, “ইহার কে আছে. এবং ইহার চিকিৎসা হইয়াছে কি না ?” প্রত্যুত্তরে স্ত্রীলোকটি জানাইল যে, ইহার বাপ-মা সম্যক অবস্থার লোক হইলেও হেলেনটির পান্থনির এই বোধ দূর করিবার জন্য সর্বস্বান্ত হইয়াছেন, ইহাদের আর কিছুই নাই।” বালকের পিতামাতা বালকের যোগশাস্ত্রের জন্য বৎসর্গব্যয় ব্যয় করিয়া নিরাশ হইয়াছেন শুনিয়া, বিদ্যাসাগরমহাশয়ের আর কোনওরকম সীমা রহিল না। তিনি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, “ইহাদের বাড়ী কত দূরে ?” বাড়ী অনেক দূরে নহে, এখানে একটু রেশ বীকার করিলে, সেই অল্প দূরত্বের দূরত এই বালকের বাড়ী গিয়া কিরিয়া আসিতে পারেন, এইরূপ দ্বিধা করিয়া বালকের পিতার সহিত সাক্ষাৎ করিতে গেলেন। বালকের পিতার সহিত সাক্ষাৎ ও কথাবার্তা করিয়া বুঝিতে পারিলেন যে, কলিকাতার থাকিয়া সেখানেকার চিকিৎসক ও হৃদয় সন্তানসম্প্রদায় দ্বারা চিকিৎসা করা হইয়া কোন ফলপ্রসূত হয় নাই, লাভের মধ্যে সর্বস্বান্ত ও বৎসর হইয়া পড়িয়াছে।

তখন বিদ্যাসাগরমহাশয় বৈবশক্তি-জাত অহুস্মার ভাবে পরিপূর্ণ বলিয়া আশ্চর্যবৃত্ত, তাই হান, সময়, অবস্থা ও লোকবিচার না করিয়া এক নিশ্বাসে বলিয়া বসিলেন, “ইহাকে কলিকাতায় লইয়া গিয়া ভাল ডাক্তার দেখাইলে ত ভাল হইত।” এই প্রস্তাব শুনিয়া বালকের পিতা এই বোটা চাপর পায়ে, উড়িয়ার আনখানি চোহারায় অপরিচিত ডাক্তারকে বাচল ভাবিলে কি না,

মনে মনে তাহারই মীমাংসা করিতেছে, এমন সময়ে ব্রাহ্মণ বালকের পান্থনি আবার একবার ভাল করিয়া পরীক্ষা করিয়া দেখিয়া বসিলেন, “আমার বোধ হয় মেডিকেল কলেজের ডাক্তারদের দেখালে কিছু না কিছু উপকার হইত।” তখন বালকের পিতা বলিল, “মহাশয়, কলিকাতায় লইয়া গিয়া ডাক্তার দেখান আশাশ্রয় সাধ্যাতীত।” তখনও বিদ্যাসাগরমহাশয় না তাবিয়া চিত্তিয়া পূর্ববৎ পরমাত্মার দ্বারা বলিলেন, “আচ্ছা যদি কেহ কলিকাতায় যাওয়া-আসা, সেখানে পাকা, আর ডাক্তার ও ঔষধের ব্যয় বহন করে, তা হ’লে তোমরা হেলেনটিকে নিয়ে কলিকাতায় যেতে পার কি না ?” বালকের পিতা ব্রাহ্মণের বাহিরের অবস্থা দেখিয়া ও প্রত্যাবর্ত্ত গুরুত্ব মনন করিয়া কি উত্তর দিবে, কিছুই স্থির কবিত্তে পারিতেছে না। এমন সময়ে গৃহস্থের দ্বারে এক একুটি করিয়া লোক দাঁড়াইতেছে দেখিয়া, বিদ্যাসাগরমহাশয় তখনই দ্বার পড়িবার ভয়ে নিঃশব্দে বাড়ীর ঠিকানা বলিয়া দিয়া, এবং সন্তব ও সুবিধা হইলে কলিকাতায় যাইতে পারিবে কি না, সেই সংবাদ অপরাহ্নে জানাইতে অহুস্মার করিয়া, দ্বার পাচাকা দিলেন এবং অচিরে অদৃত হইলেন। ব্রাহ্মণের চলিয়া যাওয়ার লগ্নে সঙ্গে গৃহস্থের দ্বারে একটু জনতা হইল। কিন্তু তখন পর্যন্ত যে সকল লোক সেখানে উপস্থিত ছিল, তাহাদের কেহই বিদ্যাসাগরমহাশয়কে চিনিত না। কিন্তু যে বাড়ীর ঠিকানা দিয়া গিয়াছিলেন, তাহাতেই গোল বাধিয়া উঠিল। কেহ বলে, “ও বাড়ীতে

এক রাজা আছে।" কেহ বলে, "কলিকাতার এক বড় লোক ঐ বাড়ীতে মাঝে মাঝে এসে থাকে।" এইরূপ নানা কল্পনার কণকাল ঘাইতে না ঘাইতে ঐ পতীর একজন সন্তান তত্ত্বলোক অপরিচিত ব্রাহ্মণের উকিসকলের পুনরায়ুত্তি প্রবণ করিয়া এবং নির্দিষ্ট বাটী কোন্ধানি, তাহা অবগত হইয়া বলিলেন, "তোমরা কেহ চিনিতে পার নাই, বিভা-সাগরমহাশয় আসিয়াছিলেন। তিনি তির এমন কথা আর কে বলিতে পারে? অপ-রাহে গিয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিবে। এবং তিনি যেরূপ বলিবেন, তাহা করিলে উপকার হইবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা আছে, জানিবে।" তখন চারিদিকে 'বিভাসাগর' 'বিভাসাগর' বলিয়া একটা '২৫ ৮' পড়িয়া গেল। এবং অতি অল্পময়মধ্যে ঐ বালকের শত্রু ও বিভাসাগরমহাশয়ের নাম নানা আকারে চারিদিকে বিস্তৃত হইয়া পড়িল।

বালকের পিতা বালকের মাতার সহিত পরামর্শ করিয়া সন্ধ্যার সময় নির্দিষ্ট বাটীতে ব্রাহ্মণের সহিত সাক্ষাৎ করিতে গেলেন। কিন্তু আগন্তুক কিছুকণ পর্যান্ত কোন কথাই বলিলে, ব্যস্তিত হইলেন না দেখিয়া বিভাসাগর-মহাশয় বুঝিতে পারিয়াছেন যে, যেটুকু গোপন করিতে চাহিয়াছিলেন, সেটুকু ধরা পড়িয়াছে; তিনি যে তিনি, তাহা ইহারা বুঝিয়াছে। তখন বিভাসাগরমহাশয় জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমরা কি ঠিক করিলে?" বালকের পিতা করকোড়ে কমা চাহিয়া বলিল, "আজ আমার দরজার আপনার পাচের ধূলা পড়িয়াছিল, এ দোভাগ্য জানিতে না পারিয়া আমি অবজ্ঞা করিয়াছি,

আগে আমার সে অপরাধ কমা করুন, তাহার পর অন্য কথা।" বিভাসাগরমহাশয় বলিলেন, "তুমি আমাকে অবজ্ঞা কর নাই,—হুতরাং তোমার অপরাধও হয় নাই। এখন বল দেখি, কি হির করিয়াছ?" বালকের পিতা বলিল, "আমরা নিরুপায়, আপনি কোন ব্যবস্থা করিলে আমরা মাথা পাতিয়া তাহা গ্রহণ করিব।" তখন হঠাৎ-ফুটনয়নে বালকের পিতার দিকে তাকাইয়া সাগর বলিলেন, "তবে তোমাদের এখনকার সব বন্দোবস্ত করিয়া কলিকাতার ঘাইবার ও সেখানে কিছুদিন থাকিবার আয়োজন কর; আর কবে যাবে, তাহা আমাকে বলিয়া ঘাইবে, তাহা হইলে আমি গিয়া সব ব্যবস্থা করিয়া দিয়া আসিব।" তখন বালকের পিতা পুনরায় বলিল, "স্বাস্থ্য সেখানে থাকিতে হবে? তা চল যে অনেক টাকা খরচ হবে, এত টাকা—" সাগর বলিলেন, "সে ভাবনা তোমার কেন?"

আমরা এই ঘটনার সমগ্রভাপ তাঁহার মুখে না শুনিলেও, ঘটনাটি সত্য কি না, জানিবার জন্য প্রকারান্তরে বিষয়টি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম। আমরা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, "করাসভাতার সেই ছোট ছেলেটির পাতানি কি সারিয়াছে?" তত্বতরে তিনি বলিয়াছিলেন, "না, একবারে সারে নাই, তবে যেমনটি ছিল, তেমনটি থাকিবে, আর বাড়িবে না। এইটুকুই লাভ।" মাহুষের স্বপ্নস্বিধাতি তিনি এতই যেথিতে শিখিয়াছিলেন যে, তাঁহার দ্বারা সেখানে যেটুকু মাহুষের লাভের সম্ভাবনা ছিল, প্রাণপণে সেটুকু করিতে চেষ্টা করিতেন।

আমরা জানি, তিনি এষ্ট বালকটির জন্য এই পরিবারটিকে কলিকাতার রাধিকা প্রায় ৭৪ মাস কাল বাড়ীভাড়া হইতে আরম্ভ করিয়া সাহেবজাকারের ১৬ টাকা করিয়া বর্ধনী ও ঔষধাদির ব্যয় সর্ব্বলম্বেত ৩৪ পত টাকা ব্যয় করিয়াছিলেন। মাহুব হুত-শরীরে হুখে জীবনযাত্রা নির্বাহ করুক, এজন্য তাঁহার অঙ্গের কিছুই ছিল না। এমন কি, বাহার উপর অত্যন্ত বিরক্ত, সংসারে বাহার যুগলদর্শন করাও অন্তায় মনে করিতেন, সে ব্যক্তিও নিরাপদে কালযাপন করুক, এটিও তাঁহার বভাবগুণে প্রিয়কার্য্যে পরিণত হইয়াছিল। এরূপ একটী ঘটনাও আমরা অবগত আছি। একটী বৃক তাঁহারই অহুরোধে কর্তৃ পাইয়া তাঁহার এক আত্মীয়ের নিকট কর্তৃ করে। সে ব্যক্তি আপনার আচরণ দ্বারা প্রভুর সমুহ অনিষ্ট-সাধন করিয়া কর্তৃত্বাত হয়। তাহার অপরা-
 • চরণের কথা বিদ্যাসাগরমহাশয়ের কর্তৃ-গেচর হইলে, তিনি অত্যন্ত ক্ষো ও বিরক্ত হইয়া একটী বন্ধুর দ্বারা বলিয়া পাঠাইলেন যে, "সে বেন আর তাঁহার সমুখে না

আসে।" আমরা পূর্বে তাঁহাকে বলিতে শুনিয়াছি, "আর আমার নিকট তাহাব নাম করিও না।" এইরূপ তীর বিরক্তির দীর্ঘ-হারিষের মধ্যে এক সময়ে এই ব্যক্তি দ্বারকণ রোগে যুক্তপ্রায় হইয়া পড়িল। এই ব্যক্তির নিদারুণ পীড়ার সংবাদ কর্ণগোচর হইবামাত্র তিনি স্বয়ং তাহার সংবাদ লইতে প্রয়াসেন। সংবাদ লইয়া তাহার চিকিৎসার ব্যবস্থা করিয়া দিয়া, ঔষধ ও পথ্যাদির জন্য অর্থ-সাহায্য করিয়াও বেন কর্তৃবা কর্তৃ সম্পন্ন হইল না, তাই আবার সর্ব্ববা তাহার পীড়ার সংবাদ লইবার জন্য বিশেষ ব্যস্ত। কর্তৃহুত্রে বাহার উপর এতদূর বিরক্ত যে, তাহার নামটি পর্যন্ত শুনিতে অনিচ্ছুক, সে রোগমুক্ত হইয়া হুখে সংসার করুক এবং দ্রুপুত্রের হুগসাধন করুক, এজন্য ব্যস্ত। কেবল তাহাটী নচে, ঘরের পরমা বরত করিয়া তাহাকে বাচাইতে চায়, এমন লোক সংসারে আর করতল মিলে, আমরা জানি না। আমরা প্রকাশ্যকারে সে মহামূল্য জীবনের ক্ষুত্র ক্ষুত্র ঘটনা সংগ্রহ করিয়া রাখিয়াছি; ক্রমে ক্রমে সেগুলি বঙ্গীয় পাঠকমণ্ডলীকে উপহার দিব।

শ্রীচণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়।

কেকাধিনি ।

—*****—

হঠাৎ গৃহপালিত ময়ূরের ডাক শুনিয়া
আমার বন্ধু বলিয়া উঠিলেন—আমি ঐ
ময়ূরের ডাক সহ্য করিতে পারি না ;
কবিতা কেকারবকে কেন যে তাঁহাদের
কাব্যে স্থান দিয়াছেন, বুঝিবার জো নাই ।

কবি যখন বসন্তের কুহসর এবং বর্ষার
কেকা—দুটাকেই সমান আদর দিয়াছেন,
তখন হঠাৎ মনে হইতে পারে, কবির বুঝি
বা কৈবলাবলাপ্রাপ্তি হইয়াছে, তাঁহার
কাছে ভাল ও মন্দ, ললিত ও কৰ্কশের
ভেদ নুগ্ন ।

কেবল কেকা কেন, বাগ্‌ডের ডাক
এবং তিমীর ককরকে তেহ মধুর বলিতে
পারেন না । অথচ কবিতা এ শব্দগুলিকেও
উপেক্ষা করেন নাই । গেরঙ্গীর কঠবরের
সহিত ইহাদের তুলনা করিতে সাহস পান
নাই, কিন্তু বড়পতুর মহাপরীতের প্রধান অঙ্গ
বলিয়া তাহার ইহাবিগকে লক্ষ্য দিয়াছেন ।

এক প্রকারের মিষ্টতা আছে, তাহা
নিঃসংশয় মিষ্ট, নিতান্তই মিষ্ট । তাহা
নিজের লালিত্য সঙ্গ্রহণ করিতে সুহৃৎমাত্র
সবয় সবয় না । ইন্দ্রিয়ের অসন্নিধ্য সাক্ষ্য
লইয়া, মন তাহার সৌন্দর্য্য স্বীকার করিতে
কিছুমাত্র তর্ক করে না । তাহা আমাদের
মনের নিজের আবিষ্কার নহে—ইন্দ্রিয়ের
নিকট হইতে পাওয়া ; এইজন্য মন
তাহাকে অবজ্ঞা করে ;—বলে, ও নিতান্তই

মিষ্ট, কেবলি মিষ্ট । অগাৎ উহার মিষ্টতা
বৃদ্ধিতে অশ্রুঃকরণের কোন প্রয়োজন হয় না,
কেবলমাত্র ইন্দ্রিয়ের দ্বারা ই বোকা যায় ।
মন পারতপক্ষে ইন্দ্রিয়ের স্বপ্ন স্বীকার
করিতে চায় না ।

বাহার্য্য গানের সমজ্ঞার, এইজন্যই
তাহার অত্যন্ত উপেক্ষা প্রকাশ করিয়া
বলে, অমুক গোক মিষ্ট পান করে । ভাবটা
এই যে, মিষ্ট গায়ক গানকে আমাদের
ইন্দ্রিয়সভার আনিয়া নিত্যন্ত হুলভ প্রশংসা
দ্বারা অপমানিত করে ;—মার্জিত রুচি ও
শিক্ষিত মনের দখলারে সে প্রবেশ করে
না । যে লোক পাটের অতিষ্ঠ বাচনবা
সে রসসিক্ত পাট চায় না ; সে বলে, আমাকে
শুকনো পাট দাও, তবেই আমি ঠিক ওজনটা
বুঝিব । গানের উপযুক্ত সমজ্ঞার বলে,
বাজে রস দিয়া গানের বাজে গৌরব
বাড়াইয়ো না,—আমাকে শুকনো মাগ দাও,
তবেই আমি ঠিক ওজনটি পাইব, আমি
খুসি হইয়া ঠিক দামটি চুকাইয়া দিব ।
বাহিরের বাজে মিষ্টতার আসল জিনিষের
মূল্য নামাইয়া দেয় ।

মন বলে, ইন্দ্রিয় যে স্বথটুকু আদার
করে, সেটুকু আমি উপেক্ষা করিতেও পারি,
সেটুকু কল্পনা করিয়া লইবার শক্তিও আমার
আছে, অতএব সেটার অনেককালি বাদ
দিলেই আমি সম্মানিত হই ।

বাহা সহজেই মিষ্ট, তাহাতে অতি শীঘ্র মনের আলস্য আছে, বেশিঞ্চ মনোযোগ থাকে না। অবিলম্বেই তাহার সীমার উত্তীর্ণ হইয়া মন বলে, আর কেন চেষ্টা হইয়াছে !

এই ক্ষুদ্র বেলাক দে বিষয়ে বিশেষ শিক্ষা লাভ করিয়াছে, সে তাহার গোড়ার দিক্-কার নিত্য সহজ ও ললিত অংশকে আর ঘাতির করে না। কারণ সেটুকুর সীমা সে জানিয়া লইয়াছে; সেটুকুর দৌড় যে বেশি দূর নহে, তাগা সে বোঝে; এইজন্য তাহার অগ্রসরগ তাহাতে জাগে না। অশিক্ষিত সেই সহজ অংশটুকুই বৃত্তিতে পারে, অথচ তখনো সে তাহার সীমা পার নাই—এইজন্যই সেই অগভীর অংশেই তাহার একমাত্র আনন্দ। মনজ্ঞানের আনন্দকে সে একটা কিছু-ব্যাপার বলিয়া মনে করে, অনেকমন্ডর তাহাকে কপটতার আড়ম্বর বলিয়াও গণ্য করিয়া থাকে।

এইজন্যই সর্বপ্রকার কলাবিদ্যাসম্বন্ধে শিক্ষিত ও অশিক্ষিতের আনন্দ ভিন্ন ভিন্ন পথে যায়। তখন এক পক্ষ বলে, তুমি কি বুঝিবে ! আর এক পক্ষ রাগ করিয়া বলে, বাহা বুঝিবার তাহা কেবল তুমিই বোঝ, জগতে আর কেহ বোঝে না !

একটি সুগভীর সাবজেক্সের আনন্দ, সংস্থান-সমাবেশের আনন্দ, দূরবর্তী সহিত বোণ-সংযোগের আনন্দ, পার্শ্ববর্তী সহিত বৈচিত্র্যসাধনের আনন্দ—এইগুলি মানসিক আনন্দ। ভিতরে প্রবেশ না করিলে, না বুঝিলে, এ অনেক ভোগ করিবার উপায়

নাই। উপর হইতেই চট করিয়া যে সুখ পাওয়া যায়, ইহা তাহা অপেক্ষা দারী ও গভীর।

এবং এক দিগাথে তাহা অপেক্ষা ব্যাপক। দেশে ব্যাপক না হইতে পারে, কালে ব্যাপক। বাহা অগভীর, লোকের শিক্ষাবিত্তারের লগে—অভ্যাসের সঙ্গে ক্রমেই তাহা ক্ষয় হইয়া তাহার সীমিততা বাহির হইয়া পড়ে। বাহা গভীর, তাহা আপাতত বহুলোকের গম্য না হইলেও বহুকাল তাহার পরমাত্ম থাকে—তাহার মধ্যে যে একটি স্রোতের আদর্শ আছে, তাহা সহজে জীর্ণ হয় না।

জন্মদেবের “ললিতলবঙ্গলতা” ভাল বটে, কিন্তু বেশিঞ্চ নহে। ইঞ্জির তাহাকে মন মহাত্ম্যের কাছে নিবেদন করে, মন তাহাকে একবার স্পর্শ করিয়াই রাখিয়া দেয়—তখন তাহা ইঞ্জিরের ভোগেই শেষ হইয়া যায়। ললিতলবঙ্গলতার পার্শ্ব কুমারগড়ের একটা দোক খরিয়া দেখা যাক :—

আবর্তিতা কিকিমি গুনাতাঃ

বানো বানান তপাক্ষরাদয়।

পর্বাণপুষ্পতবাক্যব্রহ্ম

সকামিনী পদমিনী সত্যব।

ছন্দ আবুলারিত নহে, কথাগুলি দুতাক্ষর-বহুল,—তবু ভ্রম হয়, এই দ্রোণ ললিত-লবঙ্গলতার অপেক্ষা কানেও মিষ্ট ওনাই-তেছে। কিন্তু তাহা ভ্রম। মন নিজের স্বজনশক্তির দ্বারা ইঞ্জিরসুখ পূরণ করিয়া দিতেছে। যেখানে গোপন ইঞ্জিরগণ ভিড় করিয়া না দাঁড়ায়, সেইখানেই মন

এইরূপ স্বপ্নের অবসর পায। “পূর্বাংশ-পুষ্পবকবিনম্রা”—ইহার মধ্যে গয়ের বে উত্থান-পতন আছে, কঠোর কোষে যথাযথরূপে মিশ্রিত হইয়া ছন্দকে যে দোলা দিয়াছে, তাহা অরুণেবী গয়ের মত অতিপ্রত্যক্ষ নহে—তাহা মিথুচ; মন তাহা আলস্যভরে পড়িয়া পায় না, নিজে আবিষ্কার করিয়া লইয়া খুঁসি হয়। এই প্রেক্ষের মধ্যে যে একটি ভাবের সৌন্দর্য্য, তাহাও আমাদের মনের সহিত চক্ৰাক্ত করিয়া অশ্রুতিগম্য একটি সঙ্গীত রচনা করে—সে সঙ্গীত সমস্ত শব্দসঙ্গীতকে ছাড়াইয়া চলিয়া যায়,—মনে হয়, যেন কান জুড়াইয়া গেল—কিন্তু কান জুড়াইবার কথা নহে, মানসী মায়ায় কানকে প্রভাবিত করে।

আমাদের এই মায়াবী মনটিকে স্বপ্নের অবকাশ না দিলে, সে কোন মিষ্টতাকেই বেশিকণ মিষ্ট বলিয়া গণ্য করে না। সে উপযুক্ত উপকরণ পাইলে কঠোর ছন্দকে মলিত, কঠিন শব্দকে কোমল করিয়া তুলিতে পারে। সেই শক্তি খাটাইবার জন্য সে কবিদের কাছে অগ্রদ্রোধ প্রেরণ করিতেছে।

কেকারব কানে শুনিতে মিষ্ট নহে, কিন্তু অবস্থাবিশেষে, সময়বিশেষে মন তাহাকে মিষ্ট করিয়া শুনিতে পারে, মনের সেই ক্ষমতা আছে। সেই মিষ্টতার বদল, কুহতানের মিষ্টতা হইতে বড়ই। নব-বর্ধাগমে গিরিশাদমূলে লতাগুলি প্রাচীন মহারণোর মধ্যে যে মত্ততা উপস্থিত হয়, কেকারব তাহার গান। আঘাতে শ্যামায়মান তমাল-তাণা-ধনের বিত্তপতর

বনারিত অককারে, বাহুতনাপিণাস উজ্জ্বল শতগছ শিশুর মত অগণ্য শাখাশাখার আন্দোলিত শব্দমুখর মহোন্মাদের মধ্যে রাইরা রাইরা কেকা তারবরে যে একটি কাংস্যজেকার ধ্বনি উদ্ভূত করে, তাহাতে প্রবীণ বনস্পতিমত্ততার মধ্যে আরণ্য মহোৎসবের প্রাণ জাগিয়া উঠে। কবির কেকারব সেই বর্ধার গান,—কান তাহার মাধুর্য্য জানে না, মনই জানে। সেইজন্যই মন তাহাতে অধিক মুগ্ধ হয়। মন তাহার সঙ্গে সঙ্গে আরো অনেকখানি পায়,—সমস্ত বেষ্মভূত আকাশ, হাওয়াত অরণ্য, নাগিমা-জ্বর গিরিশিখর, বিপুল মৃত প্রকৃতির অব্যক্ত অঙ্গ আনন্দরাশি।

বিরহিণীর বিরহবেদনার সঙ্গে কবির কেকারব এইজন্যই মজ্জিত। তাহা ঐতি-মধুর বলিয়া পাঁচবন্ধকে ব্যাকুল করে না—তাহা সমস্ত বর্ধার মনোদ্যতন করিয়া দেয়। নরনারীর প্রেমের মধ্যে একটি অত্যন্ত আদিম প্রাথমিক ভাব আছে—তাহা বাহ্যপ্রকৃতির অত্যন্ত নিকটবর্তী, তাহা জল-হুল-আকাশের গারে গারে লংঘ্য। বড়্‌জু আপন পুষ্পপর্বাণের সঙ্গে সঙ্গে এই প্রেমকে নানা রঙে রঙাইয়া দিয়া যায়। বাহ্যতে পল্লবকে স্পন্দিত, নদীকে তরলিত, শস্যশির্ষকে হিলোলিত করে, তাহা ইহাকেও অপূর্ণ চাক্ষুষ আন্দোলিত করিতে থাকে। পূর্ণিমার কোটাল ইহাকে স্ফীত করে এবং সন্ধ্যাত্তের রক্তিমায় ইহাকে লজ্জামণ্ডিত বদ্বেশ পরাইয়া দেয়। এক একটি ক্ষুদ্র বন আপন সোনার কাঠি লইয়া প্রেমকে স্পর্শ করে। তখন সে রোমাক-

কলেবরে না জাগিয়া থাকিতে পারে না । সে অরোগ্য পুণ্যপন্থেই মত প্রকৃতির নিপুচম্পর্শাধীন । সেই জন্য ঘোষনাবেশ-বিধুর কালিদাস ছর কতর ছর তারে নয়-নারীর প্রেম কি কি সুরে বাজিতে থাকে, তাহাি বর্ণনা করিয়াছেন—তিনি ব্রিহস্পতি, অগতে শুভ্র আবর্তনের সর্বপ্রধান কাজ প্রেম-আগান,—চুল-দুটোনা প্রকৃতি অস্ত্র সমতাই তাহার আত্মজিক । তাই যেকেরাব বর্ষাশুভ্র নিখান সুর, তাহার আঘাত বিরহবেদনার ঠিক উপরে গিয়াই পড়ে ।

বিদ্যাপতি লিখিয়াছেন—

নর বাচুই ডাকে ডাকচী

কটি বাওর চাড়িয়া ।

এই ব্যাণ্ডের ডাক নববর্ষার মন্তভাবে সঙ্গ নছে, ঘনবর্ষার নিবিড় ভাবে সঙ্গ বড় চনৎকার খাপ খায় । মেঘের মধ্যে আজ কোন বর্ষবৈচিত্র্য নাই, গুহবিন্যাস নাই,—শতীর * কোন প্রাচীন কিছুর আকাশের প্রাঙ্গণ মেঘ দিয়া সমান করিয়া লেপিয়া দিয়াছে, সমতাই কৃষ্ণধূসর বর্ণ । নান্যপাষাণিচিত্রা পৃথিবীর উপরে উজ্জ্বল আলোকের তুলিকা

পড়ে নাই বলিয়া বৈচিত্র্য হুটীয়া ওঠে নাই । ধানের কোমল মন্থন সখ্য, পাটের-গাঢ় বর্ণ এবং ইক্ষুর হরিদ্রাতা একটি বিশ্ব-বাপি-কালিদাস মিশিয়া আছে । বাতাস নাই । আগর-বুটীর আগকার পঙ্কিল পথে লোক বাহির হয় নাই । মাঠে বহুদিন পূর্বে কেতের কাজ সমস্ত শেষ হইয়া গেছে । পুকুরে পাড়ির সমান জল । "এইরূপ জ্যোতি-ধীন, গতিধীন, কর্মধীন, বৈচিত্র্যধীন, কালিমালিপ্ত একাকারের দিনে ব্যাণ্ডের ডাক ঠিক সুরটি লাগাইয়া থাকে । তাহার সুর ঐ বর্ষধীন মেঘের মত, ঐই দীপ্তিশূন্য আলোকের মত, নিস্তব্ধ নিবিড় বর্ষাকে ব্যাপ্ত করিয়া দিতেছে ; বর্ষার গড়িকে আরো ঘন করিয়া চারিদিকে টানিয়া দিতেছে । তাহা নীরবতার অপেক্ষাও একধেরে । তাহা নিবৃত্ত কোলাহল । ইহার সঙ্গ শিল্পীরব ভালরূপ মেধে ; কারণ, যেমন মেধ, যেমন ছায়া, তেমন শিল্পীরব আর একটা আচ্ছাদনবিধে ; তাহা বরন ওলে অন্ধকারের প্রতিরূপ ; তাহা বর্ষা-নির্দেশিনীকে সম্পূর্ণতা দান করে ।

সার সত্যের আলোচনা ।

সত্য-জগৎ এবং ভাব-জগৎ ।

ব্রহ্মাণ্ড আশ্রয় এবং তাহার আদি, অন্ত এবং মধ্য, সকলই আশ্রয়। ব্রহ্মাণ্ড এক বই দুই নহে; অথচ তাহাই, এক-ব্রহ্মাণ্ডই, ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তির ভিন্ন ভিন্ন ব্রহ্মাণ্ড। একই স্বর্গ, বাহা উদিতও হয় না—অন্তর্নিতও হয় না, তাহা একই সময়ে পৃথিবীর একস্থানে নবোদিত প্রাতঃস্বর্গ, আর-এক স্থানে প্রবর মধ্যাহ্ন-স্বর্গ, আর-এক স্থানে অস্তোদুহ দিনান্ত-স্বর্গ। মূলে বাহা একই অতির ব্রহ্মাণ্ড, ফলে তাহা ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তির ভিন্ন ভিন্ন ব্রহ্মাণ্ড। একই ব্রহ্মাণ্ড স্বর্গ ব্যক্তির স্বর্গের পুষ্পোদ্যান, হৃদয় ব্যক্তির হৃদয়ের কটক-বন; কর্মীর কর্ম-ক্ষেত্র, জ্ঞানীর আলোচনা-ক্ষেত্র; কবির নাট্য-শালা, উদাসীনের পাখ-শালা; শুক তর্কিকের মঞ্চভূমি, হৃদয়াক্ষের মৃগ-কুলা; সাধকের শুকগৃহ, ভক্তের পিতৃগৃহ; সাধু-সঙ্কনের পূণ্যতীর্থ, মুক্ত পুরুষের ব্রহ্মধাম। গোড়া'র সেই-যে এক অতির ব্রহ্মাণ্ড, তাহাই সত্য-জগৎ; আর, ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তির ঐ-যে ভিন্ন ভিন্ন ব্রহ্মাণ্ড, তাহা ভিন্ন ভিন্ন ভাব-জগৎ।

ভাব কি ? এক দিক্ দিয়া দেখিলে তাহা
ভাবনার বীজ ; এবং আর-এক দিক্ দিয়া

দেখিলে তাহা ভাবনার ফল । ভাবনা-
শব্দ ভূ-খাতৃ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে । ভবন-
শব্দের অর্থ হওন ; ভাবন-শব্দের অর্থ
হওয়ানো । আমি যদি আমার মনের
মধ্যে একটা আত্মরূপ হওয়াই, তবে আমার
সেই মানসিক হওয়ানো-ক্রিয়ার নাম
আত্ম-বিষয়ক-ভাবন-ক্রিয়া, সংক্ষেপে—আত্ম-
ভাবনা ; আর আত্মের যে একটা আত্ম-
লিপি বা নক্সা • আমার মনের মধ্যে পূর্ণ
হইতেই সংগ্রহ করিয়া গুছাইয়া রাখা আছে,
অর্থাৎ প্রলম্ব-গোলাকৃতি প্যাণ্ডুরজ্ববি
উক্তিঙ্গ পদার্থ এইরূপ যে-একটি নক্সা
পূর্ণ হইতেই সংগ্রহ করিয়া গুছাইয়া রাখা
আছে, তাহাই আত্ম-ভাবনার বীজ,
তাহারই নাম আত্মের ভাব । কিন্তু একটু
পূর্বে যেমন বলিয়াছি, এক দিক্ দিয়া দেখিলে
যাহা ভাবনার বীজ, আর-এক দিক্ দিয়া
দেখিলে তাহা ভাবনার ফল । মনে কর, দেব-
দত্ত-মানব এক ব্যক্তিকে অনেক-দিন পূর্বে
আমি জাত-যুগে দেখিয়াছিলাম । সেই দিন
হইতে তাহার মূর্তির একটা নক্সা আমার
মনোমধ্যে জাগিতেছে । মাঝে মাঝে সেই
নক্সা ঘূটে তাহার সেই মূর্তি আমি আমার
মনের মধ্যে উদ্ভাবনা করি অর্থাৎ ভাবনা
করি । কিছুদিন পূর্বে আমি তাহাকে

রাজ্যের ধারে একটা অট্টালিকার প্রবেশ করিতে দেখিলাম ; কিন্তু চেনো-চেনো করিয়াও চিনিতে পারিলাম না । গতকলা আমি তাহাকে একটা সত্য নকশানে দেখিতে পাইয়া কিয়ৎকাল তাহার মুখের প্রতি ঠাহর করিয়া দেখিয়া চিনিতে পারিলাম যে, ইনি দেবদত্ত । দেবদত্তের সেই পুরাতন নকশা, বাহ্য এ-যাবৎকাল ভাবনার বীজরূপে আমার অন্তঃকরণের মধ্যে লুক্কায়িত ছিল, তাহা এক্ষণে ফলরূপে আমার বৃদ্ধিতে আকৃত হইল ; সে কণের দার্শনিক নাম প্রত্যভিজ্ঞান অর্থাৎ ঘোমেটে রক্তনের জানা—ইংরাজিতে বাহাকে বলে Recognition । প্রত্যভিজ্ঞানট Re-cognitionই বীজ-জ্ঞানের Cognition-এর ফলাভিযুক্তি । এইরূপ দেখা বাইতেছে যে, ভাবনার গোড়ার দৃষ্ট বা আদর্শলিপি বা নকশা, বাহ্যের নাম দেওয়া হইয়া থাকে ভাব, তাহা বস্তু একই—কেবল অবস্থান্তরে কখনো বা বীজরূপে লুক্কায়িত থাকে, কখনো বা ফলরূপে আবির্ভূত হয় । এইরূপ দেখা বাইতেছে যে, বাহাকে আমরা বলি ভাব, তাহা বিবিক্ত (abstract) অবস্থায় ভাবনার বীজ, এবং ‘বুর্জমান্’ (concrete) অবস্থায় ভাবনার ফল ।

আমরা বাহাকে যেভাবে দেখি, সে প্রকৃত পক্ষে সে ভাবের মন্থা না হইলেও, আমরা তাহাকে আমাদের মনোমধ্যে সেই ভাবের মত করিয়া ভাবন করি অর্থাৎ হওয়াই । দেবদত্ত আমার পরম বন্ধু, তাই আমি তাহাকে সন্তাবে দেখি ; তোমার

সহিত তাহার বিষয়-বস্তুত বিবাদ চলিতেছে, তাই তুমি তাহাকে অসন্তাবে দেখ । দেবদত্তের উকিল ধনঞ্জয় দেবদত্তের সোপার কাটি রূপার কাটি । ধনঞ্জয় যখন দেবদত্তকে সাধুবাদ দিয়া স্বর্ণে তোলে, তখন দেবদত্ত আপনাকে নরোত্তম মনে করে ; যখন দিকার দিয়া পাতালে নাবায়, তখন দেবদত্ত আপনাকে নরাধম মনে করে । দেবদত্ত তোমার নিকটে দেবতাবিশেষ, আমার নিকটে দৈত্য-বিশেষ ; এবং তাহার আপনায় নিকটে কখনো বা নরোত্তম, কখনো বা নরাধম, ধনঞ্জয় যখন স্বর্ণে তোলে, তখন নরোত্তম—যখন পাতালে নাবায়, তখন নরাধম । দেবদত্ত কিন্তু তুমি তাহাকে দৈত্য বলিলেও দৈত্য হয় না, আমি তাহাকে দেবতা বলিলেও দেবতা হয় না ; আপনি আপনাকে নরোত্তম মনে করিলেও নরোত্তম হয় না—নরাধম মনে করিলেও নরাধম হয় না ; দেবদত্ত বাহ্য আছে, তাহাই আছে দেবদত্ত তোমার, আমার এবং তাহার আপনায় নিকটে হইয়া দাঁড়াইতেছে ইহা, উহা, তাহা, সত্য সত্যেরো ; আছে কিন্তু যে দেবদত্ত সেই দেবদত্ত— হওয়ার মূলে ‘আছে’ রহিয়াছে ; ভবতির মূলে ‘অস্তি’ রহিয়াছে ; ভাবের মূলে সত্য রহিয়াছে । সত্যই ভাবের ভিত্তিমূল এবং সর্বস্ব ।

সত্য কি ? না বাহ্য আমাদের কাহারো ভাবন-ক্রিয়ার অর্থাৎ হওয়ানো-ক্রিয়ার—ভাবনার—অপেক্ষা না করিয়া পূর্ণ হইতেই আছে । সত্য সন্থ ; ভাব সন্থের দৃশ্য-

মান উপভিত্ত ; ভাবনা সমূহের উন্নয়ন-
শীল। সত্য-শব্দ সংশয় ছইতে উৎপন্ন
হইয়াছে। বাহ্য আত্মও আছে, কালও
আছে, চিরকালই আছে, তাহাই সংশয়ের
বাঁটা ; আর বাহ্য সত্যের অস্ত্র-পাতী অর্থাৎ
সংস্পর্কীয়, তাহাই সত্য-শব্দের বাঁটা। বাহ্য
সত্য, তাহা আমি ভাবিলেও আছে—না
ভাবিলেও আছে ; পক্ষান্তরে, বাহ্য শুধু
কেবল আনার একটা মনের ভাব, তাহা
আমি ভাবিলেই আছে—না ভাবিলে নাই।
দ্বয়ের এইরূপ আভিধানিক পভেদের পতি
লক্ষ্য করিয়া, গোড়া'র সেই যে এক অতির
জগৎ, বাহ্য আমি ভাবিলেও আছে—না
ভাবিলেও আছে, তাহার নাম দেওয়া
হইল সত্য-জগৎ ; আর, সেই একই সত্য-
জগতের ভিন্ন ভিন্ন প্রতিকল্প, বাহ্য ভিন্ন ভিন্ন
বাক্তির মনোবর্ণনে প্রতিকল্পিত হইতেছে,
তাহার নাম দেওয়া হইল, ভিন্ন ভিন্ন ভাব-
জগৎ।

জীবাত্মা এবং পরমাত্মা ।

ভিন্ন ভিন্ন বাক্তির ভাব-জগতের অধি-
ষ্ঠাতা যে রাজা, চায়া, পণ্ডিত, বৃদ্ধ, বণিক,
কারীগর-প্রভৃতি সেই সেই জীবাত্মা, তা
তো দেখিতেই পাওয়া যাইতেছে। জিজ্ঞাস্য
এখন এই যে, ভাব-জগতেরই কি কেবল
অধিষ্ঠাতা আত্মা আছে ? সত্য-জগতের অধি-
ষ্ঠাতা কেহ কি নাই ? সত্য-জগতের অধি-
ষ্ঠাতা অবশ্যই কেহ আছেন। কেন না, এক-
অধিতীয় সত্য-জগতে, যদি এক-অধিতীয়
আত্মা না থাকেন, তবে ভিন্ন ভিন্ন প্রতি-

রূপ-জগতে ভিন্ন ভিন্ন আত্মা আশিবে কোথা
হইতে ? যদি কোনো এক রাজসভায়
চতুর্দশস্থিত গুহ, মলিন, ভিন্ন ভিন্ন দর্পণের
‘‘রথাস্ত ভিন্ন ভিন্ন প্রতিবিম্ব-সভায় স্পষ্টাঙ্গ
ভিন্ন-ভিন্ন-প্রকার রাজমূর্তি বিরাজমান
দেখিতে পাওয়া যায়, তবে তাহাতেই যেমন
অসম্মান হয় যে, একই রাজ-সভায় একই
রাজা অধিষ্ঠান করিতেছেন তেমনি এটা
যখন স্থানান্তরিত সে, ভিন্ন ভিন্ন ভাব-জগতে
বা প্রতিকল্প-জগতে ভিন্ন ভিন্ন আত্মা অধি-
ষ্ঠান করিতেছে, তখন তাহাতেই প্রমাণ
হইতেছে যে, একই অধিতীয় সত্য-জগতে
একই অধিতীয় আত্মা অধিষ্ঠান করিতেছেন।
ভাবিয়া দেখিলে সত্য-জগৎ এবং ভাব-জগৎ
দুই জগৎ নহে—প্রকৃত একই জগৎ।
একই জগৎ একদিকে সংস্করণের অধি-
ষ্ঠানে সনাতন এবং তাহার শক্তিতে সত্তাবানু,
সুতরাং সত্য অর্থাৎ সংস্পর্কীয় ; আর-
এক দিকে ভিন্ন ভিন্ন বাক্তির নিকটে ভিন্ন-
ভিন্ন ভাবে প্রকাশিত—সুতরাং ভিন্ন-ভিন্ন-
বাক্তিগত ভাব।

ভোগ, কর্ম্ম এবং জ্ঞান ।

একই সত্য-জগৎ এক বাক্তির নিকটে
স্বপ্নের সংসার সাজিয়া উপস্থিত হয়, আর-
এক বাক্তির নিকটে দুঃখের অরণ্য সাজিয়া
উপস্থিত হয়। সত্য-জগৎ বাহ্যিক নিকটে
বে-সময়ে যে-বেশে উপস্থিত হয়, সে আপনিও
আপনার নিকটে সেই সময়ে সেই বেশেরই
দেখিয়া-শেখা-সদৃশ বেশে উপস্থিত হয়।
সত্য-জগৎ বাহ্যিক নিকটে স্বপ্নের সংসার
সাজিয়া উপস্থিত হয়, সে আপনার নিকটে

আগনি হুণী সাজিয়া উপস্থিত হয় অর্থাৎ মর্মে তাবে যে, আমি হুণী । সত্য-জগৎ বাহার নিকটে হুণের অবগা সাজিয়া উপস্থিত হয়, সে আপনার নিকটে আপনি হুণী সাজিয়া উপস্থিত হয় অর্থাৎ মর্মে তাবে যে, আমি হুণী । প্রত্যহ প্রাতঃকালে নিশ্রা-ভবের সময় ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তি আপনার আপনার নিকটে ঐরূপ ভিন্ন ভিন্ন সাক্ষ্য সাজিয়া উপস্থিত হয় । তাহার পরে চিত্রা-ভ্যন্ত সংস্কারের রঙ্গশালাটিকে কলনার বিচিত্র চিত্রলঙ্কার এবং সদস্য-বিবেচনার ভাঙিত-প্রাণীয়ে সজ্জিত করিয়া আপনার আপনার নির্দিষ্ট পালা আপনার আপনার নিকটে অভিনয় করিতে আরম্ভ করে; আরম্ভ করিয়া কখনো বা আপনারকে হাসায়, কখনো বা কাঁদায়, কখনো বা আপনারকে নাচাইয়া তোলে, কখনো বা ধমাইয়া গায়, কখনো বা আপনার নিকটে হইতে বাহবা পাইয়া হুলিয়া বিগুণ হয়, কখনো বা দিকার বাইরা কুকড়িয়া অর্ধেক হয় । তাহার পরে বিভ্রা-মের বননিক-পতনের সময় হইলে, মিনের সঙ্গে যখন মিনগত পাণ ক্রমে ক্রমে অলঙ্কিত-ভাবে গরিয়া পড়ে, আর সেই সঙ্গে যখন অভিনেতৃগণের রঙ্গের বেশ-ভূষা স্ব স্ব গাঢ় হইতে শিথিল হইয়া খসিয়া পড়ে, তখন রাজা অরাজা হয়, দীন অদীন হয়, বিদ্বান্ অবিদ্বান্ হয়, দুর্ধ অদুর্ধ হয়, ইত্যাদি ; তখন ও সকলেই একই অভিন্ন বেশে—সর্বপ্রথমে ও যে-বেশে বাহুগর্ভে লুকাইত ছিল, সেই আদিম তরসাজ্বর বেশে—অগাধ হুণুপ্রিত গর্ভে নিলীন হইয়া যায় ।

প্রত্যহ প্রাতঃকালে যখন আনন্ডা হুণিন্দ্রায়

মাতৃগর্ভ হইতে পূর্ণপরিণত ধরাধামে ভূমিষ্ঠ হই, তখন আনন্ডা আপনারকে আপনারকে কর্তা এবং ভোক্তা বলিয়া স্ব স্ব জ্ঞানে উপলব্ধি করি। রাজ্যকাশের লবণা হইতে গাত্ৰোখান করিয়া বেশ আমি বৃত্তিতে পারি যে, আমি আপনিই নিখাস টানিতেছি, প্রধাস বিসর্জন করিতেছি ; ও-ইই কার্গোর আমি আপনিই কর্তা । এটাও তখন বৃত্তিতে পারি যে, আনন্ডা আপনারই ঐ চুই কার্গোর ভণে আমি আপনিই প্রাণ পাইয়া হুণী হইতেছি ; আনন্ডা আপনার দ্বারা-হুণের আমি আপনিই ভোক্তা । আশ্রয়কালে যখন আমি আপ-নাকে কর্তা এবং ভোক্তা বলিয়া জ্ঞানে উপলব্ধি করি, তখন আপনাকে আপনি ঐরূপে জ্ঞানে উপলব্ধি-করা-হুণে (কর্তা এবং ভোক্তা ভো আছি—অধিক) জ্ঞাতা হইয়া গাড়াই । আর, তখন আমি সেই কর্তা, ভোক্তা এবং জ্ঞাতা পুরুষের নাম দিই আত্মা । এটা কিন্তু হুণিলে চণিবে না যে, কি আগ্রংকালে, কি হুণু-কালে, উভয় কালেই আমি একই কর্তা—একই ভোক্তা । তার সাক্ষী—হুণু-কালের অচেতন অব-স্থাতেও আমি যথাক্রমে নিখাস-প্রধাস আ-কর্ষণ এবং বিসর্জন করি, সূতরাং তখনও আমি নিখাস-প্রধাস আকর্ষণ-বিসর্জনের কর্তা ; তা ছাড়া, আনন্ডা মন বলিতেছে যে, তখনও আমি আনন্ডা উপভোগ করি—তখনো আমি আনন্ডার ভোক্তা । কিন্তু ভূমি চাও প্রমাণ । তোমার মনস্তত্ত্বের সত্তা আমি স্বরণের জঙ্ক-ঘরে প্রবেশ করিয়া হুণুপ্রিত কোটার অধি-সক্তি হাতড়াইতে গুলিগান । প্রমাণের মধ্যে পাইলাম—পুত্রাতন তালপত্রের লিপিতে

দেবনাগর অক্ষরে লেখা একটু বেদবাক্য ।
বাক্যটি শুধু এই যে, “স্বথমহমগাপম্”—
আমি স্বথে নিভা গিয়াছিলাম । আমি
হর্বোৎসুর নরনে সেই লিপিবানি
সংগ্রহ করিয়া তাড়াতাড়ি তোমাকে বখন
তাহা দেখাইতে পেলান, তখন দেখি যে,
বেদা-স্তবন বিপ্রহর, আর, তুমি ভোক্তাভ্যে
বদ্বশেষে টাটির স্বর্গের অভ্যন্তরে দোহলমান
পাখার বাতাসের সুখি হিরোলে শিরের
বালিশে মাথা দিয়া হাত-পা ছড়াইবা নিভার
অচেতন । আর না-কিছু আমার দোষ
থাকুক বা না থাকুক—পারস্যভাষার বাহাকে
বলে “জ্ঞানম,” তাহা আমি নহি—আমার
শরীরে মাগামমতা আছে, সুখনিভা যে কি
সুদুর্লভ বহুলা সামগ্রী, সে-বিষয়েও আমি
ভুক্তভোগী ; কিন্তু তথাপি—এত কষ্টে বাহা
আমি সংগ্রহ করিলাম, তাহা কাল-বিলম্বে
বাসী হইয়া বাইতে পারে এই ভয় এবং
“ভূমিদানং পরং নাস্তি বিদ্যাবানং ততো-
হধিকম্” অর্থাৎ প্রমাণ-প্রদর্শন-জনিত পূণ্য-
কলের লোভ, এই দুই নছোড়-বল পদাতি-
কের পাল্লার পড়িয়া আমি তোমার কাণের
কাছে চীৎকার-শ্রনি করিয়া এবং তোমার
বাহুশূলে পুনঃপুন ধাক্কা প্রদান করিয়া
তোমাকে অনেক কষ্টে জাগাইয়া তুলিলাম !
স্বাধীকৃত্যের আলিঙ্গন-পাশ হইতে অর্ধভুক্ত
মুগ সিংহকর্তৃক অপহৃত হইলে সে যেমন
অগ্নিমূর্তি ধারণ করিয়া গর্জন করিতে থাকে,
তোমার আলিঙ্গন-পাশ হইতে আমি তেমনি-
একটা দাঘের দামগ্রী অপহরণ করাতে
তুমি ঠিক তেমনি-তর-অগ্নিমূর্তি ধারণ করিয়া
“অগভা ! বধর ! কোন কাণ্ডজ্ঞান নাই !”

প্রভৃতি গর্জনশ্রনি আরম্ভ করিলে । অতএব
প্রমাণ হইল যে, তোমার নিভাবস্তার ভূমি
স্বস্থতির পরমানন্দ ভোগ করিতেছিলে ।
আরেকটি কথা এই যে, নিভাকালে কক-
কাশের উপরবে নিভান-প্রবাসের পথরোধ
হইলে নিভিত বালক ক্রন্দন করিয়া জাগিয়া
ওঠে, এটা বখন সকলেরই দেখা কথা, তখন
তাহাতেই প্রমাণ হইতেছে যে, নিভাকালে
শ্বাস-প্রশ্বাস-ক্রিয়ার কোনো প্রকার ব্যতিক্রম
ঘটলে নিভিত ব্যক্তির স্বথভোগের বাধাত
হয় ; ইহারই অভিন্নার্থ পাঠ্যব্য এই যে,
নিভাকালে শ্বাস-প্রশ্বাস-ক্রিয়া বথানিয়মে
চলিতে থাকিলে, নিভিত ব্যক্তির স্বথভোগ
অব্যাহত থাকে । অতএব এটা স্থির
যে, কি ভাগ্যেৎকালে, কি সুস্থিকালে,
উত্তর কালেই আদ্য কৰ্ত্তা এবং ভোক্তা ।
নিশ্বাসের আকর্ষণ তপৈব প্রবাসের বিসর্জন,
এই দুই কাণের কৰ্ত্তা ; এবং তজ্জনিত
স্বাস্থ-স্বথের অর্থাৎ প্রাণগত আরাধের
ভোক্তা । এ যেন মানিলাম—মানিলাম যে,
স্বস্থতির অচেতন অবধাতেও আমি কৰ্ত্তা
এবং ভোক্তা দুইই ; কিন্তু এটাও তো দেখা
উচিত যে, ভাগ্যেৎকালে একধিকে আমি
যেমন কৰ্ত্তা এবং ভোক্তা, আর-এক ধিকে
তেমনি আমি জানিতে পারি যে, আমি
কৰ্ত্তা এবং ভোক্তা ; জানিতে বখন পারি,
তখন কাষেই তৎকালে আমি জ্ঞাতা ।
স্বস্থতি-কালে আমি তো জানিতে পারি না
যে, আমি কৰ্ত্তা বা ভোক্তা ; জানিতে
বখন পারি না—তখন সে সময়ে আমি যে,
সত্যসত্যই কৰ্ত্তা বা ভোক্তা, তাহার প্রমাণ
কি ? ইহার উত্তরে আমি বলি এই যে,

স্বৃষ্টিকালেও নিষ্প্রতি ব্যক্তির জ্ঞান তলে তলে কার্য্য করে—স্বৃষ্টি-কালেও আত্মা জ্ঞাতা পূর্ব্বব। যদি বল যে, তাহার প্রমাণ কি? তবে বেদান্তবর্ণন তাহার খেতন প্রমাণ দর্শাইয়াছেন, তাহা বলিতেছি;— তাহা একে আনন্দের দেশের ঘরের সামগ্রী, তাহাতে এমনি নির্ম্মত, পরিকার এবং স্থলন্ত যে, তাহার উপরে কাহারো কোনো বিকলিত হইতে পারে না।

সৌবৃপ্ত জ্ঞানের অস্তিত্ব-সন্দ্বিধে

বৈদান্তিক প্রমাণ।

(১) মূল কথা অর্থাৎ

Major premise।

যে-কোনো বিষয় চট্‌ক না কেন, তাহার উপস্থিতি-কালে তাহা সে-ব্যক্তির সাক্ষাৎ জ্ঞানে প্রতিভাত না হয়, তাহার অমুপ-স্থিতি-কালে তাহা সে-ব্যক্তির স্মরণে আবিস্কৃত হইতে পারে না। তা'র সাক্ষী;— পনিবারে বেদশ্রবক নাট্যাভিনয়-দৃষ্টে সাক্ষাৎ জ্ঞানে আনন্দ উপলব্ধি না করে, পরদিন রবিবারে বেদশ্রবকের স্মরণে “আমি গতকল্য নাট্যাভিনয় বর্ণন করিয়া আনন্দ উপভোগ করিয়াছি,” এ কথাটি আবিস্কৃত হইতে পারে না।

(২) যেথা কথা অর্থাৎ

Minor premise।

স্থখ-নিদ্রা হইতে জাগিয়া উঠিবার সময়, “আমি স্থখেনিদ্রা গিয়াছিলাম” এই বৃত্তান্তটি স্থপ্রোথিত ব্যক্তির স্মরণে আবিস্কৃত হয়।

(৩) ফল কথা অর্থাৎ

Conclusion।

অতএব প্রমাণ হইল যে, স্বৃষ্টি-স্থখের উপস্থিতি-কালে সে স্থখ স্ববৃপ্ত বস্তুটির দ্বারা জ্ঞানে প্রতিভাত হয়।

আলোচকের মন্তব্য।

ইতিপূর্বে আমরা প্রমাণ করিয়াছিলাম যে, স্বৃষ্টি-কালেও আত্মা কর্তা এবং ভোক্তা হইল; বেদান্তবর্ণনের উপরি-উক্ত বৃত্তি অনুসারে অধিকতর প্রমাণ হইল এই যে, সে সময় আত্মা ভোক্তা তো আছেই, তা ছাড়া সে আনিতেছে যে, আমি ভোক্তা— আনিতেছে যে, আমি স্থখ-ভোগে নিমগ্ন আছি। কেন না, সে-স্থখের ভোগের সময় যে ব্যক্তি না জানে যে আমি স্থখ-ভোগ করিতেছি, সে-স্থখের ভোগের পর্য্যবেক্ষণ-কালে সে ব্যক্তির স্মরণ হইতে পারে না যে, আমি স্থখ-ভোগে নিমগ্ন ছিলাম। অতএব, এটা গির যে, স্বৃষ্টি-কালে আত্মা অবনি-তেছে যে, “আমি ভোক্তা।” তবেই হইতেছে যে, স্বৃষ্টি-কালেও আত্মা শুধু কেবল কর্তা এবং ভোক্তা হইয়াই কান্ত নহে, অধিকতর আত্মা জ্ঞাতা।

এই তো দেখা গেল যে, স্বৃষ্টি-কালেও আত্মার জ্ঞান সমূলে বিদ্যুৎ হয় না—স্বৃষ্টি-কালেও আত্মা জ্ঞাতা। এই সমূলে এটাও কিন্তু দেখা উচিত যে, লাঞ্ছনাকালের জ্ঞান, স্বপ্নকালের জ্ঞান এবং স্বৃষ্টিকালের জ্ঞান, তিন কালের জ্ঞান তিন-প্রকার-লক্ষ্যাক্রান্ত। সে তিনপ্রকার জ্ঞানের মধ্যে প্রভেদ কি; সে প্রভেদের গোড়ার কথাই বা কি অর্থাৎ

সে প্রভেদ কিলের উপরে তর করিহা আগেচনার পথের সফল হইবে—সেই
গাড়াইয়া থাকে, এবং তাহার দোড় কতদূর ভাল, এক্ষণে তাহা ভাঙারে চাৰিবদ্ধ করিয়া
পর্যন্ত; এ সমস্ত বিষয় আগামী বারের রাখিবা বেওয়া হইল।

ঐতিহ্যস্রনাথ ঠাকুর ।

অনুন্নয় ।

ভাল বাসি কি না বাসি—তুমি সুধায়ো না,
তুমি সুধায়ো না !
এখনো যে সুখ ভুবন,
মূলগন্ধে ঢুলুঢুলু বন,
বর্গে মর্ত্যে স্বপনের গুপ্ত আনাগোনা !
তুমি সুধায়ো না, তুমি সুধায়ো না !

আবেগে কাঁপিতে ছিয়া—কিছু সুধায়ো না,
মোরে সুধায়ো না !
অরুণ উঠিছে কুড়ি' ধীরে
নিশান্তের নিঃশব্দ তিমিরে,
নিভন্ধ যেহের প্রান্তে কলাইছে সোনা ।
তুমি সুধায়ো না—তুমি সুধায়ো না !

ভাবা অপ্রভলে ভাসে—মোরে সুধায়ো না,
কিছু সুধায়ো না !
শিশিরবীতল অক্ষতারে
অন্তশিখরের পরপারে
তোনার ও ধীণাধেণু লছুক সাধনা !
তুমি সুধায়ো না—তুমি সুধায়ো না !

ওগো ক্ষমা নাও মনে—আহা সুধায়ো না,
 কিছু সুধায়ো না!
 অধরের দ্বার রোধ করি
 বসাবেছি করিন প্রহরী,
 সেই ভালো, রজনীর আধ জানা-শোনা।
 তুমি সুধায়ো না, তুমি সুধায়ো না!

বধু, লম্বা, হেবজা গো—আর সুধায়ো না,
 মোরে সুধায়ো না!
 ধৈর্য্যাহারা ওগো কুকুলী!
 কি বলিতে কি জানি কি বলি!
 পাক পূনা মন্দিরেতে মৌন আরাধনা!
 তুমি সুধায়ো না—তুমি সুধায়ো না!

শ্রীপ্রমথনাথ রায় চৌধুরী।

রাষ্ট্র ও নেশন ।

—স্বাধীনতা—

বিংশ শতাব্দীতে যুগধর্ম—রাষ্ট্র ও নেশন
 এই দুই ঐতিহাসিক পদার্থ অবলম্বনে
 প্রতিষ্ঠিত হইবে, ইহাই পণ্ডিতগণের বিশ্বাস।
 বঙ্গদর্শন নবজীবন লাভ করিয়াই এই
 যুগধর্মের ব্যাখ্যা প্রবৃত্ত হইয়াছেন,
 ইহা বঙ্গদর্শনের অতীত জীবনের সহিত
 অঙ্গদত্ত নহে।

দুর্ভাগ্যক্রমে আনাদের ভারতবর্ষে এই
 দুইটি পদার্থেরই কোন কালে অস্তিত্ব ছিল
 না। সাহাবুদ্দিন ঘোড়িকে যদি ভারতবর্ষ-
 বাপ্পা মহারাজের সঙ্গীত হইতে হইত,

তাহা হইলে ভারতবর্ষের পরবর্তী ইতিহাস
 অন্য আকার ধারণ করিত। এবং ভারত-
 বর্ষে নেশন থাকিলে পৃথিবীর ইতিহাস
 কিরূপে পরিবর্তিত হইতে পারিত, তাহা
 বলা যায় না।

অধ্যাপক শ্রীশ্রী বলিরাছেন যে ভারত-
 বর্ষে নেশন নাই; কিন্তু এমন বীজ হয় ত
 আছে, বাহা হইতে কালে নেশন অঙ্কুরিত
 হইয়া বর্ধিত হইতে পারে।

এই কারণে রাষ্ট্র কাছাকে বলে ও
 নেশন কাছাকে বলে, তাহা ভারতবাসীর

পক্ষে বৃদ্ধি। উঠা কঠিন। কিন্তু বৃদ্ধা
নিতান্ত আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে।

নেশনের লক্ষণসম্বন্ধে রেনার মত বঙ্গ-
বর্শনে সফলিত হইয়াছে। যিনি অবহিত-
ভাবে উহা পাঠ করিবেন, তিনিই বুঝিবেন,
এক কথায় নেশনের সংজ্ঞা দেওয়া চলে না।

রাষ্ট্র আশ্রয় করিয়া নেশন উৎপন্ন হয়;
কিন্তু রাষ্ট্রমাত্রেই নেশন গঠিত না। ইউরোপ-
খণ্ডে কৃষিরা প্রবলপ্রত্যাপ রাষ্ট্র; কিন্তু ভূদীপ-
জাতিকে নেশন বলা যায় কি না, সন্দেহ।

নেশন বলা যায় না; কেন না, কৃষিরা-
নামক মহারাষ্ট্রের একমাত্র নিরস্ত্রী সর্গতো-
ম্বনী রাজশক্তি। এই রাজশক্তি পঞ্জাশক্তির
একবারে মুখাপেক্ষা করে না। প্রজাশক্তি
খেচ্ছাপ্রবৃত্ত হইয়া রাজশক্তিকে সমর্থন
করে না।

যেখানে রাজশক্তিতে ও প্রজাশক্তিতে
একত্র বিচ্ছেদ নাই, সেইখানেই নেশন
সুর্তিময় অবস্থায় দণ্ডায়মান। ইউরোপে
ব্রিটিশ, ফরাসী ও জার্মান এবং আমেরিকার
মিলিতরাষ্ট্রের প্রভাগণ নেশনের উৎকৃষ্ট
উদাহরণ।

কিন্তু ইউরোপের ইতিহাস আলোচনা
করিলে দেখা যায় যে, বহুদিন পূর্বে সে-
খানেও নেশনের অস্তিত্ব ছিল না। তবে
ইউরোপের সমাজক্ষেত্রে বহুদিন পূর্বে এমন
বীজ উপ্ত হইয়াছিল, যাহা হইতে বিবিধ
নেশন অঙ্কুরিত ও প্রবৃত্ত হইয়াছে। ইতালীর
নেশন ও জার্মান নেশন প্রকৃতপক্ষে বিগত
ঊনবিংশ শতাব্দীর সর্গপ্রধান ঐতিহাসিক
সৃষ্টি।

সংক্ষেপে নেশনের লক্ষণবিবৃতি চলে

না; যদি নিত্যন্তই সংক্ষেপে বলিতে হয়,
তাহা হইলে নেশন অর্থে আমরা বুঝিত,
সংহত, শরীরবদ্ধ মানবসমাজ বৃদ্ধি; ঐ
সমাজশরীর সর্গদা জাগ্রত ও সচেতন
ধাক্কা আপনায় বার্থ অর্থাৎ সাধারণ বার্থ
রক্ষার জন্য সচেত্ন; শত্রু হইতে আত্মরক্ষণে
ও পতনের বিপক্ষে আত্মপ্রসারে সর্গদাই
উদ্বুধ; উহার প্রত্যেক অঙ্গ সাধারণ
বার্থ রক্ষার জন্য একযোগে কাজ করে;
এক সঙ্গে আঘাত দিলে অন্য অঙ্গ হইতে
আত্মরক্ষা উপগত হয়; এবং সমগ্র
শরীরের মঙ্গলের জন্য প্রত্যেক অঙ্গ
আপনায় সর্গদা মঙ্গল পরিহার করিতে কুণ্ঠিত
হয় না।

সমগ্র নেশনের শক্তিকে রাজশক্তি ও
প্রজাশক্তি এই দুই ভাগে বিভক্ত করিলে
দেখা যায়, নেশনের রাজশক্তির মূল প্রজা-
শক্তির ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত, ও প্রজা-
শক্তিকে অবলম্বন করিয়া দণ্ডায়মান।
প্রজাশক্তি সর্গদা ও সর্গদা রাজশক্তির
মাহাত্ম্য অক্ষুণ্ণ রাখিতে ব্যস্ত। এবং যে
প্রজাসত্ত্ব লইয়া নেশনের শরীর, সেই
প্রজাসত্ত্বের সর্গদা-বঙ্গল-সাধনাধাই রাজ-
শক্তি বর্তমান। রাজশক্তির অস্তিত্বের অন্য
কোন উদ্দেশ্য নাই।

পজনীপতি মানুষ যখন সোমনাথ-
মহাদেবের মন্দির গুঠন করেন, তখন
ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রাদেশিক হিন্দুসমাজের
সকলে সেই অত্যাচারকাহিনীর সংবাদ
রাখাও কর্তব্য বোধ করে নাই। মহানাগ্য
প্রতাপসিংহ যখন একাকী সিংহবিজয় দিল্লী-
শরের সহিত দাবল্লীধন সংগ্রাম করিয়াও

আপনার উন্নত মন্তক অবনত করিতে শীতল হন নাই, ভিন্ন প্রদেশের ভারতমন্ত্রানের শীতল শোণিত তখন উষ্ণ হয় নাই; মরাঠাসৈন্য যখন উত্তরকালে দিল্লীশরের প্রজাগণের উপর অত্যাচার করিয়া বেড়াইত, তখন সেই প্রজাগণের সহ্যাতিত ও সধর্ম্মের কথা মনেও স্থান দেয় নাই।

তাহার অর্থ ভারতবর্ষবাসী প্রজাও পুরাতন হিন্দুসমাজের অস্তিত্ব ছিল, কিন্তু হিন্দু নেশনের অস্তিত্ব ছিল না। হিন্দু সমাজের এককের বাণী অপর অঙ্গ অহুতবে সমর্থ ছিল না।

আবার চৌহানপত্রিকে আক্রান্ত ও বিপর্যে দেখিয়া রাষ্ট্রসমাজ যখন চাপা করিতেছিলেন, এবং মুসলমানচরিত্র নগধরাজ্য বিনষ্ট হইতে দেখিয়াও পার্শ্ববর্তী বঙ্গরাজ্য যখন পলায়নের ওতপ্ৰতিপত্তি-নিরুপগাধে পত্রিকা দেখিতেছিলেন, তখন ভারতবর্ষে খণ্ডপাট্ট ছিল ও খণ্ডরাষ্ট্রমধ্যে কূলের ও কুলপতিগণের মর্যাদা ছিল, কিন্তু ভারতবাসী মহারাষ্ট্র ও মহারাষ্ট্রবাসী মহানেশন ছিল না।

অতি প্রাচীন কালে এই সকল খণ্ডরাষ্ট্রে, রাজশক্তি এক বংশ হইতে বংশান্তরে সংক্রান্ত হইত, এক কুল হইতে কুলান্তরে সংক্রান্ত হইত, প্রজাসমাজ উৎসাহীনের মত চাহিয়া দেখিত। শাসনমণ্ড বৌদ্ধের হস্ত হইতে খলিত হইয়া মিথ্রের হস্তে, মিথ্রের হস্ত হইতে হুদের হস্তে, হুদের হইতে অক্কের হস্তে সঞ্চালিত হইত, বৌদ্ধ ও মিথ্র ও হুদ ও অক্কের প্রজাপুত্র তাহাতে- হুৎসাহের কোন কারণ দেখিত না। উত্তরকালে হিন্দু রাজার চর

হইতে শাসনমণ্ড মুসলমানের হস্তে, মুসলমানের শাসন হইতে খ্রীষ্টানের হস্তে গিয়াছে; কিন্তু ভারতবর্ষের প্রজাগণ এই সকল রাজবিশ্ববকে নৈসর্গিক বিস্ময়ের ন্যায় অকাতর সহিষ্ণুতা সহকারে গ্রহণ করিয়াছে; বরং এই বিশবৎসনার অঙ্কুলে বা অতিকূলে গাড়াইবার কর্তব্যতা মনে স্থান দেয় নাই। ইহার অর্থ—ভারতবর্ষে প্রজাশক্তি যখনও রাজশক্তির পশ্চাতে গাড়াইয়া উঠাকে বলবতী করে নাই; রাজশক্তি প্রজাশক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল না; ভারতবর্ষে যখনও নেশন ছিল না।

ভারতবর্ষে নেশন ছিল না বলিয়া ভারতবর্ষের ইতিহাস এইরূপ হইয়াছে, সন্দেহ নাই; কিন্তু ইউরোপেও এককালে নেশন ছিল না। ইউরোপে নেশনের উৎপত্তির ইতিবৃত্ত আলোচনা করিলে, ভারতবাসীর কতকটা আখ্যায়ন হইত, কতকটা শিক্ষালাভ ঘটতে পারে, সন্দেহ নাই।

সামাজিক একতা নেশনগঠনে সাহায্য করে; কিন্তু এই একতা কোথায়—বাহির করা হুদর।

ব্রিটিশ বীণ মনোমোহন হইতে বিচ্ছিন্ন, ব্রিটিশ বীণে সংহত নেশনের উৎপত্তি হইয়াছে বুঝা যায়। ভাষ্যগত একতা পূর্ণমাত্রায় নাই, তবে অধিকাংশ বৃট্টন প্রজা সাক্ষস্ব-বংশধর বলিয়া স্পষ্টা করেন। ভাষ্যগত একতা ছিল না, তবে ইংরাজী ভাষার এচারে অন্যান্য ভাষা শোণ পাইতে বলিয়াছে। ধর্ম্মগত একতা অনেকটা আছে; এককালে সমগ্র প্রজাপুত্রকে একই বস্ত্রনে বাঁধিবার চেষ্টা হইয়াছিল, কিন্তু তাহা বাধ

হইয়াছে। ধর্মগত ঐক্যের অপেক্ষা আচার-গত ঐক্য অধিক আছে; আর সকলের উপর আছে রাষ্ট্রীয় ঐক্য। সমস্ত প্রজা এক-রাষ্ট্রভিত্তির তুল্যরূপে অধীন। এই সমস্ত ঐক্যের ফলে ব্রিটিশ নেশন; বহু-শত বৎসর ব্যাপিয়া ইহার জীবন একটানে উন্নতির মুখে চলিয়াছে। এই ঐতিহাসিক প্রাচীনতা প্রত্যেক ব্রিটিশ প্রজার আর একটা গৌরবের কথা—আর একটা ঐক্যসাধন বন্ধন।

আইরিশ জাতির বাসভূমি ব্রিটিশ দ্বীপ হইতে বিচ্ছিন্ন; তন্ত্রি জাতিগত, ভাষাগত ও ধর্মগত অনেকা বর্তমান; সকলের উপরে আইরিশ জাতি আপনাদের পরাজয়ের ও অপমানের কাহিনী এখনও ভুলিতে পারে নাই; ইংরাজ ঐতিহাসিকেরাও তাহা ভুলিবার অবসর দেন নাট। এখানে রাষ্ট্রীয় একতা সবেও আইরিশ জাতি ব্রিটিশ নেশনের কলেবরে মিশিতে পারে নাই।

ফরাসীদেশের ভৌগোলিক সীমারেখা আর চারিদিকেই স্পষ্ট; কেবল উত্তর-পূর্ব কোণে সূচিচিত্রিত সীমা নাই। সেই দিকেই পোল। আইরিরিয় ও কেন্ট ও জর্জিয়া একত্র বিশিষ্টা ফরাসী জাতি উৎপন্ন হইয়াছে; প্রত্যেক ফরাসীর ঘেঁষে বোধ হয় তিনের রক্তই বর্তমান। ধর্মগত, আচারগত, ভাষাগত, একতা অনেকটা বর্তমান আছে। ফরাসী সাহিত্যের ও ফরাসী বিজ্ঞানের গৌরবে ফরাসীরাই অধিকারী। আর একটা একতা প্রতিবেশী জর্জিয়ার প্রতি বিষয়ে। ফরাসীর প্রাচীন ঐতিহাস জর্জিয়ার পরাজয়কাহিনী পুনঃপুনঃ ঘরণ করাইয়া

ফরাসীর ঐক্যবার্তা ঘোষণা করে। এই সকল ঐক্যের ফলে ফরাসী নেশন।

তার পর জর্জিয়া নেশন। এই জাতিতে বংশগত বিতর্কিত ঘটনা আছে, ততটা অল্প জাতিতে আছে কি না, সম্ভব। জর্জিয়ার শহীয়ে পুরাতন রোমসাম্রাজ্যের বিলাসক টিউটনের রক্ত আর বিতর্ক অবস্থার বর্তমান বলিয়া জর্জিয়া প্রাচীন করেন। তদুপরি ভাষাগত ও আচারগত ঐক্য ত আছেই। তথাপি ব্রিটিশ বংশের পূর্বে জর্জিয়া নেশন ছিল না। জর্জিয়া নেশন উনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধ্বেই স্থিতি।

জর্জিয়া নেশন জন্মটি বাঞ্ছিতে এত সময় লাগিবার কারণ কি? যে একতাবন্ধনে নেশনের উৎপত্তি, সেই একতা জর্জিয়া-জাতিমধ্যে প্রচুর পরিমাণে বর্তমান ছিল, তথাপি জর্জিয়া নেশন জন্মটি বাঞ্ছিতে নাই, ইহার অর্থ আলোচনার যোগ্য।

প্রথমেই দেখা যায়, জর্জিয়ার সুনির্দিষ্ট সীমা নাই। উত্তরে ডেনমার্কের ও হলেন্ডের সো জর্জিয়া, পশ্চিমে ফরাসী, দক্ষিণে হাঙ্গেরীয়ান ও তুর্কি, পূর্বে সুব জাতি, এই বিভিন্ন জাতি-বিভিন্ন জাতির মধ্যে জর্জিয়ার বাস। কোন উন্নত পরিস্থিতির বা কোন সাধারণতঃ বাধ্যমানরূপে হইয়া জর্জিয়ার ভৌগোলিক সীমারেখার নির্দেশ করে নাই। জর্জিয়া তিক জানে না, উত্তরে ও পশ্চিমে ও দক্ষিণে ও পূর্বে কোথায় উহার বাসভূমির শেষ; কোন্ রেখা পার হইয়া সে পরাধীন করিবে না; তাহার প্রতিবেশীরাও জানে না, কোন্ রেখা পার হইলে জর্জিয়ার স্বদেশে অনধিকার প্রবেশ ঘটবে। ফলে পার্শ্ব-

বর্ত্তি-বিত্তিহীনাতি অর্থাৎ পুনঃপুনঃ আক্রমণ করিয়া ঐ দেশকে ইউরোপের সুভক্ষিত্রে পরিণত করিয়াছে। এই অবিরাম সংগ্রামের ফলশ্রুতি ক্রোণাহলে ইউরোপের মধ্যযুগের ইতিহাস মুখরিত হইয়া রহিয়াছে। নৈসর্গিক সীমান্তরেখার অভাবে অর্থাৎ পুনঃপুনঃ পররাষ্ট্র ও পরজাতিকে আক্রমণ করিয়াছে। শান্তির অভাবে অর্থাৎ ভাতি ভ্রমটি বাধিতে অবসর পার নাই।

এই নৈসর্গিক কারণ ছাড়া আর একটা ঐতিহাসিক কারণ দেখা যায়। সেই কারণ অহুসহানে রোমসাম্রাজ্যের পতন-কালে বাইতে হয়। রোমসাম্রাজ্যের পতনের সময় অর্থাৎ ভাতি বিবিধ হুণে বিভক্ত ছিল। এক একটা কুল রোমসাম্রাজ্যের এক একটা প্রদেশ অধিকার করিয়া বসে। ফ্র্যাঙ্ক, গথ, লম্বার্ড প্রভৃতি কুলের নাম ইতিহাসে প্রসিদ্ধ। এই সকল বিভিন্ন কুলের পরস্পর সস্ত্রীতি ছিল না। উহাদের পরস্পর বিরোধ অর্থাৎ ভাতির সংহতির পক্ষে এককালে প্রধান অবরোধ ছিল। কুল-পতিগণের পরস্পর বিরোধ অর্থাৎ ভাতিতে বহুদিন সংহত হইতে দেখা নাই।

কালক্রমে এই কুলগত বিরোধ লোপ পাইয়াছিল; কিন্তু আর একটা বিরোধ আসিয়া পড়ে। রোমসাম্রাজ্য ধ্বংস করিয়া কুলপতিগণ আপনাদের অহুগত অহুচরণকে ভূমি বর্জন করিয়া দেন। এই অহুচরণের এক এক জন এক এক এক বিস্তীর্ণ প্রদেশের ত্বাবী ও সর্গর কর্তা হইয়া উঠেন। রোমসাম্রাজ্য পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হইলে সম্রাটপদবী একটা কুলবিশেষে ও বংশবিশেষে

আবদ্ধ হইয়া পড়ে। কিন্তু সম্রাট বংশ প্রাথমিক পরাক্রান্ত ত্বাবিশিষ্টের একান্ত অধীন হইয়া পড়েন। এইরূপে ইউরোপে ফিউডাল তত্ত্বের উৎপত্তি হয়। অর্থাৎ রোমক-সম্রাট-নামে সমগ্র খ্রীষ্টীয় জগতের অধিপতি ছিলেন, কিন্তু কালে এই সকল খণ্ডরাষ্ট্রের অধিপতি পরাক্রান্ত সামন্তবর্ষের অধীন ছিলেন মাত্র। খণ্ডরাষ্ট্রগুলি চিরদিন ধরিয়া পরস্পর বিবাদ করিত; সম্রাট সেই বিবাদ নিষারণে একান্ত অসমর্থ ছিলেন। কালক্রমে ধর্মগত বিবাদ এই রাষ্ট্রগত বিবাদের সহিত যুক্ত হইয়া আগুন আরও জ্বালাইয়া তুলে। প্রোটেষ্ট্যান্ট ও ক্যাথলিক অদ্বৈতরাষ্ট্রপতিগণ বিকট ধর্ম-যুদ্ধে প্রযুক্ত হন। সেই অধিকাংশে অর্থাৎ রাষ্ট্রতন্ত্র এককালে ভস্মরূপে পরিণত হইবার উপক্রম হইয়াছিল। রোমক সম্রাটের পদবী কালক্রমে হাক্‌সবর্গ বংশে আবদ্ধ হইল; হাক্‌সবর্গ-বংশধরগণ বহুদিন ধরিয়া সমগ্র যুরোপ জগতকে রোম-সম্রাটের শাসনাধীন রাখিবার যত্ন দেখিয়া-ছিলেন; কিন্তু অর্থাৎ রাষ্ট্রপতিগণের একতা-সাধনে সক্ষম হন নাই। নেপোলিয়ন বোনাপার্টের অভ্যুদয়ে রোমসাম্রাজ্যের নাম পর্যন্ত লুপ্ত হইল; কিন্তু সেই ফরাসী সংঘর্ষের ফলশ্রুতিতেও অর্থাৎ একতা-ধর্মবিশেষে সক্ষম হয় নাই। একতা সাধিত হয় নাই বটে, কিন্তু অর্থাৎ ভাতির স্বতন্ত্র-বন্ধন জন্ত এই একতাবন্ধনের আবশ্যিকতা প্রতিপন্ন হইয়াছিল। নূতন-যুগে অর্থাৎ সাহিত্য ও অর্থাৎ দর্শন ও অর্থাৎ বিজ্ঞান, এই একতাবন্ধনের জন্ত তত্ত্বাণ রাষ্ট্র-

সকলকে একত্রে আশ্রয় করিতেছিল। হাব্‌স্বর্গ-বংশধর স্রেমসম্রাটের উপাধি দ্বারা কাটাইয়া অস্ত্রিয়া-সম্রাট-রূপে জ্ঞান রাষ্ট্রপতিগণের উপর নামমাত্র প্রাধান্য তৃপ্ত রাখিলেন। কিন্তু সেই প্রাধান্য পরিচালনার উদ্যোগ নথি ছিল না। মহা উদ্ধত ঐতিহাসিক বিসমার্কের মন্ত্রণাশক্তিতে পরিচালিত হইয়া অস্ত্রিয়াপতিকে জ্ঞান রাষ্ট্রের হইতে নিকালিত করিয়া দিল; এবং তৃতীয় নেপোলিয়নের অদূরবশিতার ফলে ফরাসীবিগ্রহের সুযোগ আশ্রমে জ্ঞান রাষ্ট্রসমূহের নেতৃত্ব গ্রহণ করিয়া জ্ঞান-নেশনের সৃষ্টি করিল। এটি বিশ্বযুদ্ধ-ঘটনার পর সংহত জ্ঞান নেশন ইউরোপ-খণ্ডে উন্নত মাত্র ভূমি দখলমান হইয়াছে; এবং ধরাপৃষ্ঠে আপনাত প্রকৃত-বিস্তারের চেষ্টা করিয়া ধর্মের সহিত জ্ঞান নেশনের সাহায্য বোঝা করিতেছে। জাতিগত, ভাষাগত ও আচারগত একতর ধর্মগত অনৈক্য লোপ করিয়াছে। এবং স্বার্থের ঐক্য ও ফরাসী বিদ্বেষের সাধারণ ঐক্য, স্বরক্ষিত চর্চের স্বর্গপ্রাকার নির্মাণ করিয়া নৈসর্গিক সীমান্তরেখার অভাব বোচন করিয়াছে।

ধর্মগত, আচারগত, ভাষাগত ও জাতিগত একতা নেশনবন্ধনে সাহায্য করে, সম্বন্ধ নাই। ব্রিটিশ, ফরাসী ও জ্ঞান জাতির নেশনবন্ধনে এই একতা সাহায্য করিয়াছে। অস্ত্রিয়া-সম্রাট জ্ঞান রাষ্ট্রসমূহ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়াও মুখ্যত এই ঐক্যের অভাবেই নেশনে পরিণত হইতে পারে নাই। অস্ত্রিয়া-সম্রাট জ্ঞান ও সুখ ও

ভূগোলিক, তিন বিভিন্ন জাতির নিবাস। তাহাদের মধ্যে শোণিতের ভেদেই সবে ভাষাভেদ, ধর্মভেদ, আচারভেদ পর্য্যন্ত বর্তমান। সেই জন্য এই বিভিন্ন জাতি জমাট রাখিয়া একটা পরাক্রম নেশনে পরিণত হইতে সক্ষম হইতে না; এবং এই অনৈক্য-জাত দুর্বলতার জন্যই অস্ত্রিয়াপতি প্রাচীন ঐতিহাসিক বিখ্যাত সম্রাট জ্ঞান জাতির নেতৃত্বদণ্ড হস্তে বহুশত বৎসর পরে পরাজিত হইয়াছেন। ভাষাগত ও আচারগত ও ধর্মগত, ও কিয়ৎপরিমাণে জাতিগত, ঐক্য ছিল বর্ণিষাট, বিবিধ প্রতিবন্ধ্য। রাষ্ট্রপতির ধর্মকেও ইতালি-তুমিতেও এতদিনে নেশনের প্রতিষ্ঠা সম্ভব হইয়াছে। কিন্তু একটা একতা ছাড়িয়া বর্ণগত একতা ইংরাজজাতি স্বতন্ত্র ও ওয়েলশের ভাষাভেদ ও জাতিভেদ সম্রাট তাহাদের সহিত একত্র রাখিয়া নেশনে পরিণত হইয়াছে, তাহার কারণ পটের স্বার্থ ও ওয়েলশের স্বার্থ সম্প্রতি ইংরাজের স্বার্থের সহিত অভিন্ন। জ্ঞান রাষ্ট্রসমূহ যে এতকালে বিসংবাদ ভূমি একতরবন্ধনে বদ্ধ হইয়াছে, তাহার মূলে সেই রাষ্ট্রীয় স্বার্থ—ফরাসীর আক্রমণ হইতে আশ্রয়কার প্রবৃত্তি। ইতালির নেশনব্রতান্তির মূলেও সেই স্বার্থ হইতে আশ্রয়করণ সাধারণ স্বার্থ বিদ্যমান। এই রাষ্ট্রীয় স্বার্থের ও সাধারণ স্বার্থের একতা অজস্র অশ্রমকে পরাক্রম করিয়াছে। জ্ঞানবির নিকট পরাক্রমে সাধারণ স্বার্থে আশ্রয় পাইয়া ফরাসী জাতির নেশনব্রত আরও দৃঢ়বদ্ধ হইয়াছে। ইংরাজের সহিত বাণিজ্যপ্রতিদ্বন্দ্বিতার সংঘর্ষে জ্ঞানজাতির

সাধারণ স্বার্থে আঘাতলভ্যাবনয় জ্ঞাপন-
জ্ঞাপ্তির নেশনই জনেই সংঘত হইতেছে ।
এই সাধারণ রাষ্ট্রীয় স্বার্থের একতায় সকল
বিশেষকে তুষ্টায়া দিয়া নেশনের সৃষ্টি
করে । এই রাষ্ট্রীয় একতাই সর্ববিধ
অনৈক্যকে বিনষ্ট করিবার চেষ্টা করে
বদিয়া ব্রিটিশবাহিনীর অধিবাসিমাঝেই আজি
তুলা রাজনৈতিক ক্ষমতার অধিকারী হই-
রাছে ও সকলেই আপনাকে ব্রিটিশ নেশনের
অঙ্গীভূত জানিয়া গৌরব বোধ করিতেছে ।
এই কারণেই আমরা ভারতজাত পারসীকে
ইংরাজের প্রতিনিধিরূপে পার্লেমেন্টে দেখিতে
পাইরাছি; এই কারণেই টঙ্কদীর হস্তে ব্রিটিশ-
সাম্রাজ্যের শাসনসংক্রান্ত পর্যালোচনা দেখিয়া
আমরা বিস্মিত হই নাট । ইটলী বল, আর
পার্সী বল, আর দুমলমান বল, আর ক্রিষ্টান
বল, জাতিবর্ণনির্দিষ্টপক্ষে ব্রিটিশ রাজ্যের
ব্রিটেনবাসী প্রজাব্যবস্টি প্রকাণ্ড ব্রিটিশ
নেশনের অঙ্গীভূত; ও সেই ব্রিটিশ নেশনের
সাহায্যকারক বরখীল ।

বর্ষগত, ভাবগত, জাতিগত ঐক্য
নেশনবন্ধনে আবদ্ধ করা করে । এইখানেই
নেশনরূপ মহাবৃক্ষের অনুরোধপত্রের বীজ ।
ইহার উপর রাষ্ট্রীয় স্বার্থের ঐক্য থাকিলে
সেই মহাবৃক্ষ সতেজে পুষ্টলাভ করে ও বৃদ্ধি-
লাভ করে । স্বার্থের ঐক্য অন্যান্য বিষয়ে
সামান্য অনৈক্যকে নষ্ট করিয়া নেশনশরীর
পঙ্কিয়া তুলে । আর যেখানে রাষ্ট্রীয় স্বার্থের
আকর্ষণ বর্ষগত বা আচারগত বা ভাবগত
অনৈক্যের বিকর্ষণে পরাভূত হয়, সেখানে
নেশনের উৎপত্তি ঘটে না ।

কিন্তু কেবল স্বার্থরক্ষার সমর্থ হটনেট

নেশন হয় না । বর্তমান কালে কৃষিহীন
মত স্বার্থরক্ষণে সমর্থ মহারাষ্ট্র কোথায় ?
কিন্তু কৃষিহী মহারাষ্ট্রমাত; কৃষিহীন নেশন
নাই । নেশন নাই, কেন না, এখানে রাজ-
শক্তি প্রজাশক্তি হইতে বিচ্ছিন্ন । ঘোড়িও
রাজশক্তি প্রজাশক্তিকে সংঘত ও নিঃশব্দ
করে; কিন্তু প্রজাশক্তির উপর ইহার
প্রতিষ্ঠা নাই । রাজা ও প্রজা জনসমাজের
দুই প্রধান অঙ্গ; যেখানে দুই অঙ্গের বিচ্ছেদ,
যখন একের বাধার অন্তে কাতর হয় না,
যখন এক আঘাত পাইলে অন্তে লাড়া
দেয় না, সেখানে নেশনশরীর বর্তমান
নাই ।

ভারতবর্ষের প্রাচীন ইতিহাসে যত-
রাষ্ট্রের অস্তিত্ব দেখা যায় । কিন্তু সেই
সকল রাষ্ট্রের মধ্যে একটা সমবেদনার
আত্মীয়বন্ধন ছিল না । ভারতবাসী মহারাষ্ট্র
স্থাপনের অনেকবার চেষ্টা হইয়াছিল,
কিন্তু উহা ব্যর্থ হয় নাই । ভারত-
বর্ষে মহারাষ্ট্র ত ছিল না; আবার নেশনও
ছিল না; কেন না, রাজশক্তির সহিত
প্রজাশক্তিও কোনরূপ স্বার্থসংঘত ছিল না ।
রাজশক্তির অনুসরণে বা পরভবে প্রজাশক্তি
চিরদিনই উদাসীন ছিল । কাজেই ভারত-
বর্ষব্যাপী মহারাষ্ট্রও ছিল না, ভারতবাসী
নেশনও ছিল না ।

সম্প্রতি ভারতবাসী মহারাষ্ট্র স্থাপিত
হইয়াছে । ইংরেজ সাম্রাজ্যপতির হস্ততলে
ব্রিটিশ প্রজা ও ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের সামন্ত ভূপতি-
গণ আশ্রয় লাভ করিয়া মহারাষ্ট্রের স্বজন
করিয়াছে । কৃষিহী সাম্রাজ্য দুঃ হইতে ইহার
ঐশ্বর্যের প্রতি লুকনের চাহিয়া আছেন ;

কিন্তু তাঁহার সাহস হয় না, এই মহারাষ্ট্রকে আক্রমণ করেন। কাজেই ভারতবর্ষব্যাপী রাষ্ট্রের এখন অস্তিত্ব আছে; কিন্তু ভারতবর্ষে অধ্যাপি নেশন সৃষ্টি হয় নাই। কেন না, ভারতে রাজশক্তির সহিত প্রজাশক্তির কোন মূঢ় বন্ধন নাই। প্রজাশক্তির উপর রাজশক্তি প্রতিষ্ঠিত নহে; প্রজাশক্তি রাজশক্তির সহায় নহে; রাজশক্তিকে প্রজাশক্তি বিনীতভাবে গুরু করে ও ভক্তি করে, কিন্তু তাগ বাসে না ও আপনায় আত্মীয়রূপে জানে না। যতদিন এই উভয় শক্তির মধ্যে একাত্মতা না জন্মিবে, ততদিন ভারতবর্ষে নেশনের সৃষ্টি হইবে না। যদি কালক্রমে একাত্মতার উৎপত্তি অসম্ভব হয়, তাহা হইলে ভারতবর্ষে নেশনের উৎপত্তিও অসম্ভব।

বর্তমান কালে আমাদের রাজশক্তি বৈদেশিকের হস্তে; কাজেই রাজ্যের প্রজাধ মনস্ববন্ধনের অভাব বেশ বৃদ্ধা যায়। কিন্তু যখন রাজশক্তি দেশীয় রাজার হাতে ছিল, তখনও এই রাজ্যের প্রজাধ মনস্বের বন্ধন কেন ছিল না, বিচাখা বিষয় হইয়া পড়ে।

মুঘলমান আক্রমণকালে ভারতবর্ষে একতার অভাব, বিভিন্ন রাজ্যের মধ্যে একতার অভাব, ভারতবর্ষের পতনের কারণ বলিয়া নির্দেশিত হইয়া থাকে। বিভিন্ন রাষ্ট্রের একতার অভাব পতনের প্রধান কারণ বটে, সন্দেহ নাই; কিন্তু রাজ্যের সহিত প্রজাধ ঐক্যবন্ধনও অল্পতর প্রধান কারণ, তাহা ঐতিহাসিকেরা সর্বদা লেখেন না। ভারতবর্ষে রাষ্ট্রবন্ধনের কাজ চিবিদিনই রাজ্যের হাতেই অর্পিত আছে। রাজ্য

আপনায় সৈন্যসামন্ত লইয়া শত্রুর আক্রমণ ব্যর্থ করিবার চেষ্টা করিতেন; কিন্তু প্রজা তাঁহার সাহায্য করিত, একপ প্রমাণ অধিক পাওয়া যায় না। রাজ্য ঐহার নিকট পরায় হইয়াছেন—প্রজা বিনা বাক্যব্যয়ে তাঁহার অধীনতা স্বীকার করিয়াছে। রাজ্যের সহায়রূপে যতঃপ্রযত্ন হইয়া দাঁড়ান কর্তব্য বোধ করে নাই; অথবা রাজ্যের পরাজয়ের পর যতঃ আক্রমণকারীকে নিরোধ করা কর্তব্য বোধ করে নাই। ইহাই ভারতবর্ষের ইতিহাস। এখানে রাজ্যের রাজ্য তিরকাল বৃদ্ধ হয়। প্রজা উপাসীন হইয়া দাঁড়াইয়া দেখে; এবং যে জয়লাভ করে, তাহার নিকট অকাতরে আত্মসমর্পণ করে।

ইউরোপের ইতিহাস অন্যরূপ। বোনাপার্টি ইংলণ্ড আক্রমণ করিবে, এই আশঙ্কা উপস্থিত হইবামাত্র, ব্রিটিশ প্রজা দলে দলে ভলন্টিয়ারের খাতিয় নাম লেখাইয়াছিল। * সিডান-কেন্দ্রে তৃতীয় নেপোলিয়ান আত্মসমর্পণ করিবার পরও ফরাসী প্রজা জর্জাণের সহিত যুঝিয়াছিল। সেদিন ব্যরমুখে ইংরেজের রাজশক্তি কয়েকবার আঘাত পাইবামাত্র ব্রিটিশ প্রজা দলে দলে সন্মুখপারে দেশপাতের ভয় ছুটিয়াছিল।

সেকালে ভারতবর্ষ শত খণ্ডে শত রাষ্ট্রে বিভক্ত ছিল, ইহাতে বিভিন্ন হইবার বড় কারণ নাই। ইংরাজদের মধ্যে কেমন ঐক্য আছে, ফরাসীদের মধ্যে কেমন ঐক্য আছে, জর্জাণেরাও এককাল পরে ঐক্যবন্ধনে বদ্ধ হইয়াছে; আর ভারতবাসীরা এক হিন্দুসমাজভুক্ত হইয়াও ঐক্যবন্ধন

লাভ করে নাই; এতক ভারতবাসীকে তিরস্কার করা একটা প্রথা পাড়াইয়াছে। কিন্তু এ বিষয়ে ভারতবর্ষের সহিত ইউরোপের কোন একটা দেশের তুলনা গ্রিক সম্ভব নহে। বরং সমগ্র ইউরোপের সহিত ভারতবর্ষের তুলনা হইতে পারে। আরতনে বা লোকসংখ্যায় ভারতবর্ষের সহিত ইউরোপ-মহাদেশেরই তুলনা হয়; ইউরোপের অন্তর্গত কোন দেশের তুলনা হয় না। রোমসম্রাট সমগ্র ইউরোপকে একজ্ঞ করিতে পারেন নাই। ভূটসহস্র বৎসর চেষ্টার পর সেই চেষ্টা নিফল বলিয়া পরিত্যক্ত হইয়াছে। সমগ্র ইউরোপ খ্রীষ্টান ধর্ম অবলম্বন করিয়াছে; কিন্তু এক হয় নাই। প্রায় সমগ্র ইউরোপ রোনের সভ্যতার উত্তরাধিকারী, তথাপি সমগ্র ইউরোপ এক হয় নাই। তখন ভারতবর্ষের মত প্রকাণ্ড দেশ, যাহা আরতনে ইউরোপ অপেক্ষা অধিক ছোট নহে, যাহার লোকসংখ্যা ইউরোপের সমান, যাহার ভিতরে বর্ণভেদ, জাতিভেদ, ধর্মভেদ, ভাষাভেদ, আচারভেদ প্রভৃতি ইউরোপের তুলনায় অনেক বেশী, সেই প্রকাণ্ড দেশের সমগ্র অধিবাসী যে ঐক্যবন্ধনে আবদ্ধ হইয়া একটা বৃহৎ রাষ্ট্রের সৃষ্টি করে নাই, ইহাতে বিস্মিত হইবার কিছুই নাই। বরং ইউরোপের মধ্যে বেঙ্গল জাতিবিষেৎ ও ধর্মবিষেৎ বর্তমান, ভারতবর্ষের মধ্যে সেঙ্গল জাতিবিষেৎ বা ধর্মবিষেৎ কোনও কালে ছিল না।

ইংরাজ ও ফরাসী, ফরাসী ও জর্জান, জর্জান ও তুর্ক, ইংরাজ ও তুর্ক, ইত্যাদির মধ্যে পরস্পর প্রতিদ্বন্দ্বিতা, টর্গা, বিদ্রোহের নাতা

অত্যন্ত তীব্র। বাঙালী ও বেহারী, বেহারী ও পঞ্জাবী, মরাঠা ও রাজপুত, ইত্যাদির মধ্যে সেঙ্গল তীব্র বিবেচ বা ঈর্ষা কোনও কালেই ছিল না। আবার ইউরোপে প্রোটেষ্ট্যান্ট ও ক্যাথলিকের মধ্যে বেঙ্গল বিবেচ, মারি-মারি, রক্তপাকি ঘটয়াছে, ভারতবর্ষের হিন্দুসমাজের বিভিন্ন-সম্প্রদায়-মধ্যে, শাক্তে শৈবে বা শাক্তে বৈষ্ণবে, এমন কি হিন্দু বৌদ্ধেও, সেঙ্গল রক্তাক্তি বাপার কখনও ঘটে নাই। বোধ করি, এইরূপ ধর্মগত বিবেচ ভারতবাসীর সম্পূর্ণ স্বভাববহিত্ব।

ইউরোপের সহিত ভারতবর্ষের তুলনা করিলে, ঐক্যের অভাবে ভারতবাসীকে তিরস্কার উচিত হয় না।

সমগ্র ইউরোপ এক হয় নাই, উহার অন্তর্গত ক্ষুদ্র খণ্ডরাষ্ট্রগুলি জমাট বাঁধিয়া এক একটা মহাপ্রত্যয়ে নেশনে পরিণত হইয়াছে। এইরূপে সমগ্র ভারতবর্ষ এক মহারাষ্ট্রে পরিণত না হইয়া যদি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাষ্ট্রে পরিণত হইত, তাহা হইলেও ভারতবর্ষের পতন অনিবার্য না হইতেও পারিত।

এইজন্য আমার বোধ হয়, ভারতবর্ষে রাষ্ট্রীয় অনৈক্য, বহুসংখ্যক খণ্ডরাষ্ট্রের অস্তিত্ব, পতনের একটা প্রধান কারণ হইলেও প্রধানতম কারণ নহে। ভারতবর্ষ ইউরোপের মত বহু রাষ্ট্রে বিভক্ত হইলেও ভারতবর্ষের পরাধীনতা অনিবার্য হইত না। ভারতবর্ষের পতনের কারণ যে উহার অন্তর্গত রাষ্ট্রগুলি নেশনে পরিণত হয় নাই। রাষ্ট্রে রাষ্ট্রে, অনৈক্য তড়িগট, কিন্তু প্রত্যেক রাষ্ট্র মধ্যে প্রাধান্তিক রাজশক্তি হইতে বিচ্ছিন্ন ছিল। রাজশক্তি প্রচাণ্ডতার উপর প্রতিষ্ঠা

লাভ করে নাই। প্রজ্ঞাপ্রতি হইতে বিচ্ছিন্ন থাকার রাজশক্তি সমাক্রান্ত সামর্থ্য লাভ করিতে পারে নাই। রাজ্যের সুখচক্ষে প্রজ্ঞা কখনও সমবেদনা দেখায় নাই। রাজ্যের ভাগ্যবিপর্যয়ে প্রজ্ঞা উদাসীন ছিল। রাজ্যের পক্ষান্তে দাঁড়াইয়া প্রজ্ঞা রাষ্ট্ররক্ষার জন্য আপনায় দুর্জয়-শক্তি প্রয়োগ করিতে শিখে নাই। রাজশক্তি ও প্রজ্ঞাপ্রতি দেখানে এইরূপ বিচ্ছিন্ন, সেখানে নেশন জন্মে না। ভারতবর্ষে নেশনের অস্তিত্ব ছিল না; সেইজন্য ভারতবর্ষ পরাক্রমণ-নিরোধে সফল হয় নাই।

নেশন জন্মবার বীজ ভারতক্ষেত্রে না ছিল, এমন নহে, কিন্তু সেই বীজ হইতে অঙ্কুরোদগম ঘটে নাই।

এইখানে ইউরোপের ইতিবৃত্তের সহিত ভারতবর্ষের ইতিবৃত্তে অনেকটা পার্থক্য আছে। উভয়ই ইতিহাস ভিন্ন পন্থায় চলিয়া ভিন্ন ফল উৎপাদন করিয়াছে। উভয়ই এই প্রভেদের মূল কারণ কি, তাহা ঐতিহাসিকগণের বিচার্য্য বিষয়। প্রপঞ্চান্তরে আলোচনার চেষ্টা করা যাইবে।

শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী ।

ভারতবর্ষীয় ইসফ্‌স্‌ ফেবল্‌ ।

প্রায় অর্ধ শতাব্দী পূর্বে স্বর্গীয় ঈশ্বরচন্দ্র বিভাগাগর মহাশয় ইসফ্‌স্‌-ফেবল্‌-নামক হু-প্রসিদ্ধ ইংরেজী গ্রন্থের কতিপয় গল্প বঙ্গ-ভাষায় অনুবাদিত করিয়া কথামালা নামে প্রকাশিত করেন। শিশুগণের শিক্ষার উপযোগী যে সকল বাঙলা পুস্তক বিদ্যমান আছে, কথামালা উহাদের অন্ততম। আহরহনগর গবর্ণমেণ্ট হাইস্কুলের শিক্ষক শ্রীযুক্ত নারায়ণ বালকৃষ্ণ গঙ্গোপাধ্যায় বি, এ, মহাশয় ইংরেজী ইসফ্‌স্‌ ফেবল্‌ সংস্কৃত-ভাষায় অনুবাদিত করিয়া বিস্তর অর্থ উপার্জন করিয়াছেন। স্তম্ভকালমধ্যে সংস্কৃত ইসফ্‌স্‌ ফেবলের চারি পাঁচ সংস্করণ

নিঃশেষ হইয়া গিয়াছে। কিছুকাল পূর্বে গিলক্রাইস্ট (J. Gilchrist)-নামক ইংরেজ ইসফ্‌স্‌ ফেবলের কয়েকটি গল্প হিন্দুস্তানী, পারসীক, আরবি, বাঙলা, সংস্কৃত ইত্যাদি ভাষায় অনুবাদিত করিয়া রোমান অক্ষরে মুদ্রিত করিয়াছিলেন। অধুনা ভারতবর্ষের প্রায় সর্ব প্রদেশেই ইংরেজী ইসফ্‌স্‌ ফেবল্‌ হু-প্রচারিত হইয়াছে। ইউরোপের প্রত্যেক ভাষায় ইসফ্‌স্‌ ফেবল্‌ লিপিবদ্ধ আছে। বস্তুত পৃথিবীতে এমন কোন সভ্য জনপদ নাই, যেখানে এই গ্রন্থের প্রচার পরিলক্ষিত হয় না। বর্তমান ইসফ্‌স্‌ ফেবল্‌ ইসফের উদ্ভাবিত নহে। ইসফ্‌ নামে একজন

নীতিবিৎ পণ্ডিত খৃঃ পূঃ ৬ষ্ঠ শতাব্দীতে খ্রীসবেশে বিদ্যমান ছিলেন, তদ্বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। প্লেটো (Plato) লিখিয়াছেন, সফ্রেটিস্ (Socrates) কাগ্নি-রুদ্ধ অবস্থায় ইসকের গল্পসমূহ পড়ো অগ্রব্যাস করিয়া সমর ক্লেপণ করিতেন। আরিষ্টো-ফানিস্ (Aristophanes) ইসকের গল্পের চারিবার উল্লেখ করিয়াছেন। আরিষ্টোটল (Aristotle) ইসকের একটি গল্প এক ভাবে উদ্ধৃত করিয়াছেন, লুসিয়ান (Lucian) সেই গল্পটাই অস্তভাবে উদ্ধৃত করিয়াছেন। এই সকল প্রমাণ দেখিয়া পোথ হয়, ইসক্ কতকগুলি গল্প রচনা করিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি উহা কখনও লিপিবদ্ধ করেন নাই এবং বহুকাল পূর্বে উহার রচিত গল্প-নিচের লোকদৃষ্টির অতীত হইয়া গিয়াছে। 'ইসক্' এই নাম মাত্র অবশিষ্ট রহিয়াছে।

ইউরোপীয় ভাষায় ইসফন্স্ ফেবল্ কোথা হইতে আসিল, উহার অনুসন্ধান করিতে বাইরা ইংলণ্ডদেশের অধ্যাপক রীড্ ডেভিড্ (Rhys Davids) মহোদয় খির করিয়াছেন যে, উহা তুর্কিস্তান হইতে পরি-পুষ্ট হইয়াছিল। খ্রীষ্ট চতুর্দশ শতাব্দীর প্রারম্ভে কনষ্টান্টাইনোপল্ (Constanti-nople) নগরের প্রাহুডিঙ্ক্ (Planudes)-নামক একজন কৃতবিদ্যা ধর্মবাহক কতক-গুলি গল্প সংগ্রহ করিয়া একখানি পুস্তক প্রণয়ন করেন। প্রত্যেক ঐ পুস্তক 'ইসক্ ফেবল্' এই নামে অভিহিত করেন। প্রাহুডিঙ্ক্ তনিয়াছিলেন, খ্রীস্ট প্রাচীন কালে ইসক্ নামে একজন নীতিবিৎ পণ্ডিত প্রথমে গল্প করিয়াছিলেন। উক্ত পণ্ডিতের নাম চিত্র-

স্বরূপ করিবার অভিপ্রায়ে তিনি খীর গ্রন্থে ইসকন্স্ ফেবল্ নামে একাংশিত করেন। খ্রীষ্ট পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রথমাংশে ইটালীর অন্তর্গত মিলান্ নগরে উক্ত গ্রন্থের প্রথম মুদ্রণ পরিমিশ্র হয়। তখনত্তর ক্রমে ক্রমে ইউরোপের সমস্ত ভাষায় প্রাহুডিঙ্ক-কৃত গ্রন্থ অধ্বাবিত ও মুদ্রিত হইয়াছিল। প্রাহুডিঙ্ক্ নানাখান হইতে গল্প সংগ্ৰহ করিয়া খীর গ্রন্থের অন্তর্নিবিষ্ট করিয়াছিলেন। খৃঃ পূঃ প্রথম শতাব্দীতে বাব্রিয়াস্ (Babrius)-নামক একজন গ্রীক কবি পড়ো কতকগুলি গল্প রচনা করিয়াছিলেন। উহার কতিপয় গল্প প্রাহুডিঙ্ক-কৃত ইসকন্স্ ফেবলে পরিমূর্ত হইয়াছে। ফিড্রুস্ (Phaedrus)-নামক লাতীন কবির উদ্ভাবিত কয়েকটি গল্পও প্রাহুডিঙ্ক-রূপান্তরিত করিয়া গ্রহণ করিয়াছিলেন। অপর গল্পগুলি প্রাহুডিঙ্ক্ লাক্সামসকে ভারতবর্ষ হইতে প্রাপ্ত হন। এমন কি, পাক্ভাষা পণ্ডিতগণ বহুগবেষণা দ্বারা অব-ধারণ করিয়াছেন যে, গ্রীক কবি বাব্রিয়াস্ এবং লাতীন কবি ফিড্রুস্ উভয়েই ভারত-বর্ষীয় গল্প বথাক্রমে গ্রীক ও লাতীন পড়ো অধ্বাবিত করিয়া য য গ্রন্থ বিবচন করিয়া-
ছিলেন।

ভারতবর্ষীয় গল্পসমূহ বিভিন্ন সময়ে ইউ-রোপে সংনীত হইয়াছিল; যথা—

(১) আলেক্সাণ্ডার ভারতবর্ষ আক্রমণ করিবার পূর্বে নানাখ্যে কতিপয় ভারত-বর্ষীয় গল্প ইউরোপে প্রবেশ করে। ঐ সকল গল্প ইসকের নামে প্রচারিত হয়।

(২) যখন আলেক্সাণ্ডার ভারত আক্রমণ করেন, তখন খৃঃ পূঃ ৪র্থ শতাব্দীতে

বহু গল্প ভারত হইতে গ্রীসে সংনীত হয় ।
বাসিয়াস্, ফিডুস্ প্রভৃতি কবিগণ ঐ সকল
গল্প গ্রীক, লাতীন প্রভৃতি ভাষায় অমুবাদিত
করেন ।

(৩) মধ্যযুগে কতিপয় ভারতবর্ষীয় গল্প
পারস্তাভাষায় অমুবাদিত হয় । উক্ত পারস্ত-
গ্রন্থ আবার আরবিক ভাষায় অনূদিত হয় ।
জিউগণ ঐ আরবিক গ্রন্থ, গ্রীক, হিব্রু,
লাতীন প্রভৃতি ভাষায় প্রচারিত করেন ।

(৪) পৃষ্ঠীয় অষ্টম শতাব্দীতে সেন্ট জন্ অফ
ডামাস্কাস্ (St. John of Damascus)
নামক কোন পণ্ডিত বৌদ্ধ জাতকগ্রন্থের
অনুব্রূষণে বারলোম-জোসাফেট (Barlaam
and Josaphet) নামে একখানি আখ্যা-
য়িকা রচনা করেন । ১১শ শতাব্দীতে ঐ
গ্রন্থ লাতীনভাষায় অমুবাদিত হয় । তৎপ-
রন্থর সমগ্র ইউরোপে ঐ গ্রন্থ প্রচারিত হয় ।

(৫) যখন আরবিকগণ স্পেনদেশে আধি-
পত্য করেন, তখন বহু গল্প ইউরোপে প্রবেশ
করে । ধর্মসংগ্রামের (Crusades) যুগেও
অনেক গল্প দেশান্তরে সঞ্চারিত হয় ।

(৬) হুণজাতীয় লোকসকল অনেক ভাব-
ভীর গল্প ইউরোপের পূর্বপ্রান্তে প্রচার
করে । জেনিস পার সময়ের (১২১৯ খৃষ্টাব্দে)
অনেক হুণ ইউরোপে প্রচারিত হয় ।

যে সকল গল্প অবলম্বনে ইসক্স ফেব-
লের সৃষ্টি হইয়াছিল, তন্মধ্যে জাতকনামক
পালিগ্রন্থের গল্পসমূহই সমধিক উল্লেখ-
যোগ্য । যদিও পঞ্চতন্ত্র প্রভৃতি গ্রন্থের সহিত
ইসক্স ফেবলের অনেক সৌাদৃশ্য আছে,
কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে উহা পালিজাতক হই-
তেই জন্মলাভ করিয়াছিল । বস্তুত পঞ্চতন্ত্র

প্রভৃতি গ্রন্থও জাতকগ্রন্থ হইতে উৎপন্ন
হইয়াছিল ।

পঞ্চতন্ত্র প্রথমতঃ ত্রয়োদশ তম্বে বিভক্ত
ছিল । পৃষ্ঠীয় ৬ষ্ঠ শতাব্দীর কিঞ্চিৎ পূর্বে
পাঁচটি তন্ত্র পৃথক্ করিয়া পঞ্চতন্ত্রের সৃষ্টি
হয় । ৫৩১—৫৭৯ খৃষ্টাব্দে খোস্ক হুসি-
বনের চিকিৎসক বহুগ্রন্থে পঞ্চতন্ত্রগ্রন্থ পছন্দী
(প্রাচীন পারসীক) ভাষায় অমুবাদিত
করেন । ৭৫০ খৃষ্টাব্দে উক্ত গ্রন্থ সিরিয়াক্
(Syriac) ভাষায় অমুবাদিত হইয়া “কলি-
লগ্ ও দমনগ্” (Kalilag and Damnag)
এই নাম ধারণ করে । কর্কটক ও দমনক
নামক দুই পুণ্যলের উপাখ্যান পঞ্চতন্ত্রের
আদিভাগে বর্ণিত হইয়াছে । উহাদের নাম
অনুসারে সিরিয়াক্ ভাষায় অমুবাদিত গ্রন্থের
নাম “কলিলগ্ ও দমনগ্” হইয়াছে । উক্ত
গ্রন্থ আবার আরবিক ভাষায় অমুবাদিত
হইয়া “কলিলঃ” ও “ডিমনঃ” (Kalilah and
Dimnah) এই আখ্যা লাভ করিয়াছে ।
সিহিহন্ সেন নামক একজন জিউ ১০৮০
খৃষ্টাব্দে “কলিলঃ” ও “ডিমনঃ” গ্রন্থ গ্রীক-
ভাষায় অমুবাদিত করেন । ১২৫০ খৃষ্টাব্দে
অন্ত একজন জিউ কিছু পরিবর্তন করিয়া
উক্ত গ্রন্থ হিব্রু ভাষায় অমুবাদিত করেন ।
১২৬৩—১২৭৮ খৃঃ অব্দে জন্ অফ্ ক্যুয়া
(John of Capua) উক্ত হিব্রু গ্রন্থ
লাতীন ভাষায় অমুবাদিত করেন ।
আরবিক অমুবাদগ্রন্থ এই সময়ে
স্পেনিশ্ ও লাতীন উভয় ভাষায় রূপান্তরিত
হয় । এই দ্বিতীয়বার অমুবাদিত লাতীন
পঞ্চতন্ত্রের নাম “Esop the old.”
আরবিক পঞ্চতন্ত্রের মূখ্যকে নিপাত আছে,

আলেক্সান্ডার (Alexander the Great) ভারত অধিকার করিয়া Dabschelim-
নামক ব্যক্তিকে ভারতীয় গ্রীকসাম্রাজ্যের
অধীশ্বর করিয়া বান। বিদূপাই- (Bidpai)-
নামক কোন পণ্ডিত Dabschelimকে
নীতি শিক্ষা দিবার জন্য পঞ্চতন্ত্র গ্রন্থ বিরচন
করেন। পঞ্চতন্ত্রের প্রথম তিন তন্ত্রের গদ্য
কথাসংলিঙ্গাঙ্গর ও হিতোপদেশ উভয় গ্রন্থেই
রূপান্তরিত ভাবে বিস্তৃত হইয়াছে। পূর্বেই
উক্ত হইয়াছে, মূল পঞ্চতন্ত্র পালিভাষার
জাতকগ্রন্থ হইতে লক্কিত হইয়াছিল।

পঞ্চতন্ত্র, ইসকন্স কেবল প্রভৃতি সকল
গ্রন্থেরই মূল প্রস্তাব—জাতকগ্রন্থ। এই
গ্রন্থ পালিভাষার লিখিত। ইহা বৃহ-
স্পতিকের বুদ্ধক-নিকায়ে অঙ্গভূত। ইহাতে
বুদ্ধদেবের পূর্বজন্মসমূহের বিবরণ বর্ণিত
হইয়াছে। গৌতম বুদ্ধ নির্মাণলাভের
পূর্বে অসংখ্য জন্ম পরিগ্রহ করিয়াছিলেন।

কোন জন্মে দান, কখনও ঈশ, কোন
সময়ে প্রজ্ঞা, কখনও বীণা, কখনও ক্ষত্রি,
কোন সময়ে মৈত্রী ইত্যাদি সঙ্গুণের
পরাকাষ্ঠা প্রকাশ করেন। বুদ্ধদেব দুগাল,
কুহুর, সিংহ, কচ্ছপ, গৃধ্র, মক্কি ইত্যাদি
বোনিতে জন্মিয়াও সঙ্গুণসমূহ হইতে
বিচ্যুত হন নাই। বুদ্ধদেব নানাবোনি-
পরিভ্রমণকালে যে সকল ঘটনার স্বীয়
সঙ্গুণাবলী প্রদর্শন করিয়াছিলেন, ঐ সকল
ঘটনাই জাতকের বর্ণনীর বিষয়।

যৌদ্ধগণ বলিয়া থাকেন, জাতকগ্রন্থ
বুদ্ধদেবের জীবদ্দশার বিরচিত হইয়াছিল,
ও খৃঃ পূঃ ৪৪০ অব্দে প্রথম বোধিসংগম-
কালে উহা বর্তমান ভিণ। সিংহদেশীয়

প্রবাদ অনুসারে জানা যায়, বিহারি বোধি-
সংগমকালে খৃঃ পূঃ ৪৪০ অব্দে ঐ গ্রন্থের
প্রচাৰ ছিল। মেঘর কানিংহাম বক্ষিপ
ভারতের ভকৎ-নামক বানে একটি তুণ
আবিষ্কার করেন। উহা খৃঃ পূঃ তৃতীয়
শতাব্দীতে মহারাষ্ট্র অশোকের রাজত্বকালে
নির্মিত হয়। উহাতে বাতাগ্র-সম্বন্ধ
জাতকের গদ্য অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে। খৃষ্টীয়
৪র্থ শতাব্দীতে লিখিত দীপংগ-নামক
পালিগ্রন্থে জাতকের উল্লেখ আছে।
সুমঙ্গলবিলাসিনী, অঙ্গুত্তর-নিকায়ে, সঙ্ঘ-
পুণ্ডরীক প্রভৃতি গ্রন্থেও জাতকের উল্লেখ
দৃষ্ট হয়।

জাতকগ্রন্থে গল্প ও পদ্য উভয়ই বিস্তারিত
আছে। গদ্যগুলি গল্পে লিখিত। মধ্যে
মধ্যে প্রমাণস্বরূপ শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে।

সিংহচর্যজাতক, কচ্ছপজাতক ইত্যাদি
গদ্য ইসকন্স কেবলের অবিকল প্রতিরূপ।
কোন কোন গদ্যে কিছু রূপান্তর দৃষ্ট হয়।
ভাষার কারণ, পালিভাষার গদ্যসমূহ সংস্কৃত
ভাষার অনুবাদিত হইয়া কিঞ্চিৎ পরিবর্তিত
হইয়াছিল। বাহায়া দ্রিউ, আন্তরিক,
গ্রীক প্রভৃতি ভাষার ঐ সকল গদ্য অনুবাদ
করিয়াছিলেন, তাঁহারাও অনেক পরিবর্তন
সংঘটন করেন।

কালসহকারে পঞ্চতন্ত্র, হিতোপদেশ
প্রভৃতি সংস্কৃতগ্রন্থের সহ মূল পালি জাত-
কের অনেক বৈষম্য ঘটিয়াছে বটে, তথাপি
এখনও উভয়গ্রন্থের মৌসাদৃশ্য স্পষ্টভাবে
পরিদৃষ্ট হয়। উভয়বিধ গ্রন্থের বর্ণনীয়
বিষয়গুলি প্রায় একরূপ। অনেকস্থলে
ভাষাও পরস্পর সঙ্গম। উদাহরণস্বরূপে

ভাতকগ্রন্থের গুণভাতক নামক গল্প হটতে
নিরলিখিত ন্যাক উদ্ধৃত হইল—

যত্নে দিব্যো যোজনসত্তং কৃৎপানি অব্যবতি ।

অথ্য ভাসক পাসক আসক্যাপি ন বৃৎপনীতি ।

ভাতক ।

ইহার অনুজ্ঞাপন্যাক হিতোপদেশের জ্ঞানাব-
গুণের উপাখ্যান হইতে উদ্ধৃত হইল—

বোধিকাদ্যোজ্ঞানসত্তং পশুতীতানিঃ পরঃ ।

ন এষ প্রাপ্তকালস্ত পানবৎ ন পশতি ।

হিতোপদেশ ।

ডেয়ার্কেনের কোপেনহেগেন বিশ্ব-
বিদ্যালয়ের সংকৃত ও পালিভাষার অধ্যাপক
ডাক্তার কজ্জ্বোল পালিভাষাতক রোমান
অক্ষরে মুদ্রিত করিতেছেন । বায়বণ্ড
(volume) পূর্ণেই প্রকাশিত হইয়াছে ।
প্রথম খণ্ড অধ্যাপক রীজ্ ডেভিড্‌স্,
দ্বিতীয় খণ্ড উইলিয়াম্‌ হাউস প্রভৃতি পণ্ডিত
ইংরেজী ভাষায় অনুবাদিত করিয়াছেন ।
অধ্যাপক কাউএল্‌ ক্যাম্ব্রিজ্‌ এই অনুবাদ-
কার্যের তত্ত্বাবধানে ত্রুতী হইয়াছেন ।

শ্রীমতীশচন্দ্র আচার্য্য ।

আলোচনা ।

(ক)

সিদ্ধান্তবিচার ।

প্রাণমাসের বঙ্গদেশে প্রকাশিত শ্রীযুক্ত
দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় নিউটনের দুইটি
সিদ্ধান্ত হটতে অপর দুইটি নূতন সিদ্ধান্তে
উপনীত হইয়াছেন । দ্বিজেন্দ্রবাবু বয়োবৃদ্ধ,
সুপণ্ডিত ও সুসমাধিতোতা । তাঁহার কথা
সকলেরই মনোযোগের বিষয়, সন্দেহ নাই ।
আমার ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে নূতন-সিদ্ধান্ত-সম্বন্ধে
বাহ্য গাথরা হইয়াছে, সাধারণের অবগতির
জন্ত তাহা নিয়ে বিবৃত করিলাম ।
সত্যনির্ণয়ই আমার লক্ষ্য, প্রতিবাদ
লক্ষ্যপ্রাপ্তির উপায়মাত্র ।

শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রবাবুর সিদ্ধান্ত ।

(ক) “চলমান বস্তু যে মুহূর্ত্তে যে স্থানে

উপস্থিত হয়, সেই মুহূর্ত্তে সেট স্থানে স্থির
হইয়া পড়িয়া ।”

(খ) “চলমান বস্তুমাত্রই দুই দুই মুহূর্ত্তে
পর্যায়ক্রমে প্রতিরুদ্ধ এবং চালিত হয় ;—
দুইই হয় বাহিরের শক্তি দ্বারা ।”

আলোচকের প্রতিবাদ ।

অত্রত্য (খ)-সিদ্ধান্ত (ক)-সিদ্ধান্তের
অনুমানমাত্র । আমার মনে হয়, “চলমান
বস্তু যে মুহূর্ত্তে যে স্থানে উপস্থিত হয়, সেই
মুহূর্ত্তে সেট স্থানে স্থির হইয়া পড়িয়া,” এ
কথা আপনাকে আপনি খণ্ডন করিতেছে ।
নদি মনে করা যায় যে, চলবস্তু (ক) ও (খ)
সিদ্ধান্তের অস্বাভাবী হইয়াই চল, তাহা

হইলে উহার কতকগুলি গতিত্ব ও কতকগুলি বিরামকণ ও তৎপরে উহার কক্ষার কতকগুলি গতিস্থান ও কতকগুলি বিরামস্থান পর্যায়ক্রমে পাওয়া যাইবে। যেন কল্পন, "৫" একটি বিরামস্থান ও "৬" তাহার অব্যবহিত-পরবর্তী বিরামস্থান; তাহা হইলে ক-বস্ত্র চ-স্থান হইতে ছ-স্থান পর্যায় অবিরাম চলিয়াছে অর্থাৎ "৫" ও "৬" এই চরের মধ্যবর্তী স্থানসমূহে "উপস্থিত" হইয়াও "দ্বির হইয়া গাড়ার" নাট। অতএব (ক)-সিদ্ধান্ত ও সেই সঙ্গে (খ)-সিদ্ধান্ত খণ্ডিত হইল।

যদি বলেন, "৫" ও "৬" এই চরের মধ্যে একটমাত্র স্থান আছে, সেট গতিস্থান, তবে জিজ্ঞাসা—"৫ ও ৬-এর মধ্যে অবকাশ আছে কি না।" যদি অবকাশ না থাকে, তবে গতিস্থানটীও নাট, অতএব (খ)-সিদ্ধান্ত, ও পরম্পরা-সম্বন্ধে (ক)-সিদ্ধান্ত, খণ্ডিত হইল। আর যদি অবকাশ থাকে, তবে সেই অবকাশকে শতাংশে, সহস্রাংশে, অর্ধশতাংশে, এমন কি, অনন্তাংশে বিভক্ত কল্পনা করা যাইতে পারে। প্রত্যেক বিভাগে একটি একটি স্থানের উৎপত্তি হইতেছে, সেই সেই স্থানে চলবস্ত্র "উপস্থিত" হইয়াও "দ্বির হইয়া গাড়ার" নাই। অতএব (ক)-সিদ্ধান্ত, ও সেই সঙ্গে (খ)-সিদ্ধান্ত, খণ্ডিত হইল।

একণে যে বুদ্ধি অল্পশায়ে (ক) ও (খ) সিদ্ধান্ত ব্যবস্থাপিত হইয়াছে, তাহার আশোচনা করা বাউক। প্রযুক্ত বিশেষভাবে

বলেন—"অতএব তোমার কক্ষার আদি-অন্ত ভোড়া বিয়া এইরূপ গাড়াইতেছে যে, একই অস্তির মুহূর্তে (ম-মুহূর্তে) ক-বস্ত্র চ-স্থানে উপস্থিত এবং অল্পপস্থিত—যাহা একান্ত পক্ষেই অসম্ভব।" এখানে প্রথম বিভাগ, "মুহূর্তের মান আছে কি না।" যদি মান থাকে, তবে উপরের উক্তি "একান্ত পক্ষেই অসম্ভব" নহে; যেহেতু মুহূর্তের প্রথমার্শে "উপস্থিত", দ্বিতীয়ার্শে "অল্পপস্থিত," একরূপ কল্পনার অবকাশ রহিয়াছে। আর যদি মুহূর্তের মান না থাকে, তবে মানান্তাবে বিরামের মুহূর্ত মাত্রা যাত্র ও সেট সঙ্গে (ক) ও (খ) সিদ্ধান্ত খণ্ডিত হয়। বাস্তবিক মুহূর্ত একেবারে মানহীন হইলে, মুহূর্তসমষ্টি হইতে কোনও নিকিষ্ট কালের উৎপত্তি অসম্ভব হইয়া পড়ে। মুহূর্ত গতই কেন জ্বর হউক না, তাহার মান আছে। জিজ্ঞাসা হইতে পারে, মুহূর্তের অংশ, অংশাংশ প্রভৃতি কল্পনা করিয়া চলিলে পরিণামে যাহা হইবে, তৎপ্রতি পূর্বোক্ত-বুদ্ধি-প্ররোপ দ্বারা "অসম্ভব" কিছু পাওয়া যাইবে কি না। উত্তর, ঐ পরিণাম মানের একান্ত অভাববিশিষ্ট নহে, হইতে পারে না। যাহা একান্তই মানহীন, তাহা আমাদের ধারণার অতীত, বুদ্ধির সীমার বহির্ভূত। সীমার বাহিরে আমাদের অজ্ঞতা নাই, অগ্নি আমাদের জ্ঞানপোচর নহে। "মন্তো মহীমান্" আমাদের জ্ঞানের যেমন অবিসর, "অণোরণীমান্"ও তেমনি। সীমাবিষয়া বুদ্ধি অসীমস্পর্ধিনী হইলে ভগ্নদায়িনী হইবে, প্রত্যাশা করা যায় না।

শ্রীসারদারঞ্জন রায়।

(খ)

মূল-প্রবন্ধ-লেখকের মন্তব্য ।

প্রতিবাদকারী প্রভেদ লেখকমহাশয় “গতিক্ষণ” ও “বিয়ামক্ষণ,”—“গতিস্থান” ও “বিয়ামস্থান”—এর যে উল্লেখ করিয়াছেন, মূল প্রবন্ধে তাহার প্রসঙ্গ উত্থাপনেরই সম্ভাবনা ছিল না, কারণ মূল-প্রবন্ধলেখক স্থিতির সহিত সম্বন্ধবিহীন গতি মূলেই স্বীকার করেন না। যেমন বিন্দু-পরম্পরার সমষ্টিকে দেখা বলে, তেমনি স্থিতিপরম্পরার সংঘটনকেই আমরা গতি-নামে নির্দেশ করি। অব্যবহিত পর পর দুহুর্থে অব্যবহিত পর পর স্থানে স্থিতিরই অপর নাম গতি। এ কথা না স্বীকার করিলে, বলিতে হয়, গতিকালে কোন বস্তু কোন দেশকেই অধিকার করে না।

এইরূপ অব্যবহিত-পরবর্তী কালে অব্যবহিত দেশপরম্পরার স্থিতি কি কারণে ঘটে, তাহার তত্ত্বালোচনা মূল প্রবন্ধের উদ্দেশ্য ছিল না—প্রত্যুত গতিব্যাপারটির দেশকালঘটিত মুখ্য বৈজ্ঞানিক অবস্থাবতির প্রতিই তাহার লক্ষ্য সর্বোপায়ে নিবদ্ধ ছিল।

দুহুর্তের মান-সম্বন্ধে প্রতিবাদী মহাশয় যাহা বলিয়াছেন, তাহাতে মূল প্রবন্ধের কিছুই আসে যায় না। কেন না, কালের যে কোন ক্ষুদ্রাংশ-ক্ষুদ্র অংশ হউক না কেন, তাহাকেই দুহুর্ত বলিয়া শিরোধার্যা করিতে মূল-প্রবন্ধ-লেখকের কোন আপত্তি নাই। প্রকৃত কথা, এই যে, চলবস্তুর কোন একটি স্থিতিকাল কালামাত্রার যে

কোন অংশ বা অংশের অংশ হউক না কেন, সকল মূলেই এ কথা স্বীকার্য্য যে, চলবস্ত্র একই অতির দুহুর্থে একই অতির স্থানে দুগুণত উপস্থিত এবং অদুগুণিত হইতে পারে না।

প্রতিবাদী মহাশয় যদি নিম্নলিখিত কথাটির প্রতি একটু স্থিরচিত্তে প্রাধিকান করেন, তাহা হইলে ধোঁধ করি তিনি মূলপ্রবন্ধের প্রকৃত তাৎপর্যাটি বিবেচনার অভাবেরে স্থানদান কারণে তারবোধ করিবেন না।—কথাটি এই—

মনে কর ক-বস্তু ক-স্থানে স্থির রহিয়াছে। আমি তাহাকে আঘাত করিবার্য্য তাহা ক-স্থানে হইতে খ-স্থানে, খ-স্থানে হইতে গ-স্থানে, গ-স্থানে হইতে ঘ-স্থানে উপনীত হইল। সে বস্তু প্রথম দুহুর্থে ক-স্থানে স্থিরভাবে দাঁড়াইয়াছিল এবং তাহার অব্যবহিত পরদুহুর্থেই খ-স্থানে উপস্থিত হইল, এটা যখন সুনিশ্চিত, তখন, খ-স্থানে হইতে যে সময়ে তাহা গ-স্থানে উপনীত হইল, সে সময়েও তাহা যে দুহুর্থে খ-স্থানে উপস্থিত ছিল, তাহার অব্যবহিত পরদুহুর্থে গ-স্থানে উপস্থিত হইল, এইরূপ মনে করাই যুক্তিসিদ্ধ। তাহার পরিবর্তে যদি মনে করা যায় যে, সে বস্তু প্রথম দুহুর্থে ক-স্থানে উপস্থিত ছিল এবং দ্বিতীয় দুহুর্থে খ-স্থানে উপস্থিত হইল এ কথা সত্য, কিন্তু দ্বিতীয় দুহুর্থে খ-স্থানে

উপস্থিত ছিল এবং দ্বিতীয় মুহূর্তে গ-হানে
উপস্থিত হইল এ কথা সত্য নহে; তবে

নিতান্তই এক ব্যক্তির পৃথক্ কল হই, ইহা
দেখিতেই পাওয়া যাইতেছে ।

গ্রন্থ-সমালোচনা ।

সুভাব-সঙ্গীত । শ্রীহরদেব চট্টোপাধ্যায়
রচিত । ২য় সংস্করণ । মূল্য ১০ আট আনা ।

সাহিত্যের হিসাবে, সুভাবই যথেষ্ট
নহে; তাহা সুভাক্ত এবং সুবিন্যস্ত হওয়া
আবশ্যক । এই সংগীতগুলির ভাব দেহু,
ইহা অন্যদ্ব্যসেই বলা যায়; কিন্তু রচনার
দোষে এগুলি সাধারণের চিত্ত আকর্ষণ
করিতে পারিবে না, এইরূপ আমাদের বোধ
হয় । তথাপি দেখিতেছি, ইহার দ্বিতীয়
সংস্করণ হইয়াছে । অজ্ঞানের বিষয়। কৃমি-
কার লিখিত আছে যে, হরদেব চট্টোপাধ্যায়
মহাশয় এক্ষণে পরলোকগত ; তাহার কনিষ্ঠা
কন্যা এই সুভাব-সঙ্গীত পুনঃপ্রকাশিত
করিয়াছেন । সুতরাং পুস্তকের এই সংস্করণ,
পিতৃপদে কন্যার ভক্তি-পুষ্পাঞ্জলি । একদা
হলে সমালোচনার নিখম্ ছুরিকা ব্যবহার
আবশ্য অকর্তব্য মনে করি ।

লহরী । শ্রীঅবিনাশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
প্রণীত । মূল্য ১০ পাঁচ পিকা মাত্র ।

এই কাব্যখানির কংসজ ভাল, ছাপা
ভাল, মলাটখানি আরও ভাল । এই

ভালগুলির সমাবেশে কাব্য হইবার সম্ভাবনা
থাকিলে, এখানি নিশ্চয়ই কাব্য হইত ।
তবে ভগবানের এই মিষ্টর নিরম যে, ছাপা-
খানার চেষ্টায় কাব্য বলিয়া সামগ্রীটা তৈয়ার
হয় না । সুতরাং, এই পুস্তকখানি যে কাব্য
হয় নাই, সে অপরূপ সম্পূর্ণ ভগবানের,
অবিনাশবাবুর নহে । তাহার পরিচয় ও
ঘরের কিছুমাত্র ত্রুটি দেখা যায় না ।

‘কুরুক্ষেত্র’-নামক কাব্যখণ্ড গ্রন্থকার,
মাইকেল বধুহৃদনকে উপহার দিয়াছেন ।
সেই উপহার-কবিতায় লিখিত হই-
য়াছে যে—

“অক্ষয় তুলিতে যধু তুলিয়াছি মোম ।”
কবিরিগের মধ্যে একদা সত্যাবাসিতা হ্রমত ।

বালিবধ-কাব্য । শ্রীকুরুভার্য্য মুখো-
পাধ্যায় প্রণীত । মূল্য ১০ আট আনা মাত্র ।

ভাগ্যে মলাটের উপর ‘কাব্য’ বলিয়া
লেখা আছে, নতুবা পুস্তক পড়িয়া কিছুতেই
ইহাকে কাব্য বলিয়া মনে করিতে পারিতাম
না । গ্রন্থকার কি মনে করেন যে, ছন্দ
হইলেই কাব্য হয় ?

বঙ্গদর্শন।

বিরোধমূলক আদর্শ।

ওগুপ্ত ব্রেরান্ কন্টেম্পোরারি রিভিউ পত্রে আক্ষেপ করিয়াছেন যে, ফরাসী ইংরাজকে জানে না, ইংরাজ ফরাসীকে বোঝে না।

ফরাসীকে যদি জিজ্ঞাসা করা যায়, ইংরাজের প্রতি তোমার এত বিদ্বেষ কেন— উত্তর পাওয়া গাইবে, ইংরাজ মানুষটাকে আমার খারাপ লাগে না, কিন্তু ইংরাজ জাতিটার উপর আমার দগ।

যুরোপের বিদ্যাপথে যে ইতিহাস শিক্ষা দেওয়া হয়, তাহাতে অন্য দেশের প্রতি বিরোধ প্রকাশ করিয়া নিজেদের দেশের পৌরব বোধবা করা হয়। প্যাট্রিয়টিক্ ভাবের প্রতি লক্ষ্য করিয়া ছেলেদিগকে, অন্য দেশের সহিত স্বদেশের সাবেক কালের স্বপক্ষীয় কথা শ্রবণ করাইয়া, ভবিষ্যৎ পর্যন্ত সেই বিরোধ টানিয়া রাখা হয়। কর্ণিকাশেষের মাতৃগণ, অন্য পরিবারের সহিত স্বপরিবারের কুণক্রমাগত যে বিদ্বেষ চলিয়া আসিতেছে, এবং তাহাদের প্রতি সে প্রতিহিংসা করিবার আছে, শিশুকাল হইতে সম্বানের কানে তাহা রূপ করিতে পাকে, যুরোপীয় বিদ্যাপথে ইতিহাস পড়ানোও তিক সেইরূপ।

আজকাল ইংলেণ্ডে পূর্ব একটা লড়াইয়ের নেশা চাপিয়াছে। দৈনিকদলে ভিত্তিবার জন্য ডাক পড়িয়াছে। এই ডাক অন্য-সকল ব্যক্তিকে আচ্ছন্ন করিয়া পবনিত হইতেছে। ফ্রান্সও যে এ বিষয়ে নিরপরাধ, তাহা নহে। এখন দুই পক্ষের পালোয়ান সাহিত্যে পরস্পরকে খালাসিতেছে। ব্রিটিশ চ্যানেলের দুই পারে একদল ববরের কাগজ দৈনিকতার স্বাক্ষর দিয়া বঙ্গরতার পৌছিবার জন্য ছুঁকিয়া পাড়াইয়াছে। লেখক আক্ষেপ করিয়া বলিতেছেন—ব্যক্তিগত ধ্বন্যনীতি হইতে ন্যায়ন্যায় ধ্বন্যনীতির আদর্শের যে পার্থক্য ঘটয়াছে, শেষে তাহার কি এইরূপ সমন্বয় হইবে? যুরোপ কি ইচ্ছা করিয়া বিধিমতে বর্জরতায় ফিরিয়া বাইবে?

আজকাল দুই পরমা দিলেই স্ববরের কাগজে পড়িতে পাওয়া যায় যে, ধাতুগুণ্ড বিরোধের ভাব, অনিবার্য পার্থক্য এবং জাতিগত বিদ্বেষে পরস্পরের বংশাত্মকিক শত্রুজাতির সহিত, আজ হউক বা, কাল হউক, একটা সংঘর্ষ হইবেই! তাহাদের মতে মানুষের প্রবলতম প্রগতি এবং ন্যায়ধর্মের উচ্চতম নীতিসকল দুই জাতিক দুই

বিপরীত দিকে তেঁনিরা গইয়া গেছে। তাহার্য বলে, নেশনদের মধ্যে পার্থিহ্যাপনের আশা বাতুলের খেয়ালমাত্র। ইত্যাধি।

এই সকল বিরোধ-বিবেকের বাক্য লক্ষ-লক্ষ খণ্ড ছাপা হইয়া দেশে বিদেশে বিতরিত হইতেছে। এই প্রাত্যহিক বিবের মাত্রা নিয়ননত পান করিয়া দেশের ক্ষতি হইতেছে, সন্দেহ নাই।

প্যাট্রিষ্টিয়, ধর্মনীতি, বিজ্ঞান প্রভৃতি কতকগুলি বাধি বোণ আছে, তাহা লোকে নুখে উচ্চারণ করে, এবং সে সখকে আর চিন্তা করিবার প্রয়োজন বোধ করে না। সে বিষয়ে প্রশ্ন উত্থাপন করিতে গেলেই হাতাহাতি বাধিয়া যায়। বাধিবোল নুখে নুখে চলিয়া যায়—লোকে নিঃশব্দে জীবন-যাপন করে। প্যাট্রিষ্টিয় পুনঃপুনী অধবা যোদ্ধা, এইরূপের একটা বাধিবোল।

হুরোপীয় লেখক যে কথা বলিতেছেন, তাহার উপরে আদর্য আর কি বলিব? তাহাদের পরম্পরের মধ্যে বোঝাপড়া নাই বলিয়া লেখক অনেক হুঃখ করিয়াছেন—আর ইংরায়ে ভারতবর্ষীদের মধ্যে যে বোঝাপড়ার অভাব পাড়াইয়াছে, সে অন্য আনাদের কি দুর্গতি ঘটতেছে, তাহা প্রত্যহই প্রত্যক্ষ হইতেছে। প্রাচ্যভাষীদের প্রতি,—ভারতবর্ষীদের প্রতি অবজ্ঞা ইংরাযি সাহিত্যের হাড়ে হাড়ে এবেশ করিয়াছে। ইংরাযি বালকদিগকে ইংরাযি বীরবের দৃষ্টান্তে উৎসাহিত করিবার মত যে সকল ছেলে-ভুলানো গল্প কুঁকড়ি বাহির হইতেছে, তাহাতে দুটিনি গরের উপলক্ষ্য করিয়া ভারতবর্ষীদিগকে রক্তপিপাসু পত্ন মত

অঁকিয়া দেবচরিত ইংরাযের সহিত তাহাদের পার্থক্য প্রমাণ করিতেছে। কন্নাদীকে ইংরাযের ঠিক বৃকিবার উপায় আছে—পরম্পরের আচার, ব্যবহার, ধর্ম, বর্ণ, একই-প্রকার,—কিন্তু আনাদের মধ্যে বার্থই পার্থক্য বিদ্যমান। সেই পার্থক্য অতিক্রম করিয়া, এমন কি, সেই পার্থক্য-বশতই পরম্পরের প্রতি প্রজ্ঞা আকর্ষণ কবে যটিবে, তাহা বিধাতা জানেন। কিন্তু ইতিমধ্যে অত্যাধি ও মিথ্যার বার্য অকতা, অবিচার ও নিষ্ঠুরতা স্রষ্ট করিতেছে।

বস্তত এই অকতা নেশনত্বেরই মূলগত ব্যাধি। মিথ্যার বার্য হউক, স্রবের ঘাড়া হউক, নিজেদের কাছে নিজেকে বড় করিয়া প্রমাণ করিতেই হইবে এবং সেই উপলক্ষ্যে অন্য নেশনকে ক্ষুত্র করিতে হইবে, ইহা নেশনের ধর্ম—ইহা প্যাট্রিষ্টিয়-বের প্রধান অবলম্বন। গারের জোর, টেলাটেলি, অন্যান্য ও সঙ্গপ্রকার মিথ্যাচারের হাত হইতে নেশনত্বকে উপরে তুলিতে পারে, এমন সভ্যতার নিদর্শন ত আদর্য এখনো হুরোপে দেখিতে পাই না।

পরম্পরকে বার্থরূপে জানাত্তা কেনন করিয়া সম্বব হইবে? নেশনের মেয়দওই যে বার্থ। স্বার্থের বিরোধ অবশ্যাত্তাবী, এবং স্বার্থের সংঘাতে বাহ্যকে অন্ধ করিবেই। ইংরায যদি স্রুদ্র এদিয়ার কোনপ্রকার স্বযোগ ঘটাইতে পারে, ক্রান্ত-তখন সচকিত হইয়া তাবিতে থাকিবে, ইংরাযের বলবৃদ্ধি হইতেছে। প্রত্যক্ষ সংঘাত না হইলেও, পরম্পরের সম্বন্ধিতেও পরম্পরের চিত্তকে বিভাজ করে। এক

নেশনের প্রবলত্ব অন্য নেশনের পক্ষে সর্বদাই আশঙ্কাজনক । এ রূপে বিরোধ, বিবেচ, অজ্ঞতা, মিথ্যাপবাদ, সভাপোষন, এ সমস্ত না ঘটিল থাকিতে পারে না ।

সমাজের পক্ষে উদারতা সহজ । হিন্দুরা বলে, স্ব স্ব ধর্ম পালন করাই পুণ্য । অবস্থান্তরে আচারব্যবহারের পার্থক্য ঘটতেই পারে এবং সে পার্থক্য পরস্পরের পক্ষে মঙ্গলেরই কারণ, এ কথা শাস্ত্রটিতে নির্বলজ্ঞানে অস্বীকার করিয়া দেখা যায় এবং তির সমাজের প্রতি প্রকাশস্থান সম্পূর্ণ রক্ষা করিয়াও সমাজের কর্তব্যপালন করা কঠিন হয় না । সামাজিক উন্নতিতে মানুষের চারিদিক উন্নতি হয়—সে উন্নতিতে কাহারো সহিত স্বার্থের বিরোধ ঘটে না । সর্বপ্রকার বিবেচ, অন্তা, হিংসা, সেই উন্নতির প্রতিদ্বন্দ্বী । সত্কাব ও সত্যই সমাজের মূল আশ্রয় । নেশন্ অনেক সময় ধর্মকে উপেক্ষা ও উপহাস করা আবশ্যক বলিয়া জ্ঞান করে, বাহ্যিককে জ্ঞানধর্মের অপেক্ষা বড় বলিয়া স্পষ্টতই ঘোষণা করে—সমাজ কদাপি তাহা করিতে পারে না ; কারণ, ধর্মই তাহার একমাত্র অবলম্বন, স্বার্থকে সর্বদা সংযত করাই তাহার আত্মরক্ষার একমাত্র উপায় ।

আমরা যদি বাধি বোলে না ভুলি, যদি প্যাট্রিয়ার্টিকেই সর্বোচ্চ বলিয়া না মনে করি, যদি সভ্যকে, জ্ঞানকে, ধর্মকে, জ্ঞান-মাল্যের অপেক্ষাও বড় বলিয়া জানি, তবে আমাদের ভাবিবার বিষয় বিস্তর আছে । আমরা নিকটে আশ্রয়ের আকর্ষণে কপটতা, প্রবঞ্চনা ও অসত্যের পথে পা বাড়াইয়াছি

কি না, তাহা চিন্তা করিয়া দেখিতে হইবে । এবং ধর্মের দিকে না তাকাইলেও সুবুদ্ধির হিসাব হইতে এ কথা পর্যালোচনা করিতে হইবে যে, জ্ঞানমাল্য স্বার্থের আদর্শকে বাড়া করিলেই বিরোধের আদর্শকে বাড়া করা হয়—সেই আদর্শ লইয়া আমরা কি কোন কালে যুরোপের মহাকার স্বার্থদানবের সহিত লড়াই করিয়া উঠিতে পারিব ?

আমরা লড়াই করিতে পারি জ্ঞানে, ধর্মে । সেখানে আমাদের পৈতৃক মূলধন আছে । সেখানে কেহ আমাদের পক্ষে তেঁকাইবে না—সেখানে পিতৃলোক এবং দেবতা আমাদের সহায় হইবেন এবং বাধি বোলে যদি না ভুলি, তবে ইহা জানা উচিত যে, সেখানে যে মহত্বের উপাদান আছে, তাহা সকল মহত্বের উৎসে ।

কিন্তু একপ উপদেশ তবু যোগ্য যে, প্রকৃতির নিয়ম বিরোধ, অতএব বিরোধের অন্য প্রস্তুত থাকিতে হইবে । বাহির যদি আমার বিরুদ্ধ হয়, তবে আমিও তাহার বিরুদ্ধ না হইলে বাঁচিতে পারিব না । এইজন্য শিশুকাল হইতে ভিন্নজাতির সহিত বিরোধ-ভাবের একান্ত চর্চাই প্যাট্রিয়ার্টীর সাধনা । হিন্দুজাতি সেই পোলিটিক্যাল বিরোধ-ভাবের চর্চাকেই সকল সাধনার অপেক্ষা প্রাধান্য বের নাই বলিয়াই নষ্ট হইয়াছে ।

পূর্বোক্ত কথাটি যদি একান্তই স্বীকার করিতে হয়, তবে সেই সঙ্গে এ কথাও বলিব, আত্মরক্ষাই মানুষের অথবা লোক-সম্প্রদায়ের সর্বোচ্চ ধর্ম নহে । ধর্ম যদি নাশ করে, তবে তাহাতেই মাথা পাতিয়া দিতে হইবে ।

জ্ঞানমালধ্বজে সফল সময়ে রক্ষা করে না। ক্ষুদ্র বোঝারজাতি যে লড়িতে লড়িতে নিঃশেষ হইবার দিকে চলিয়াছে—কিসের জন্ত? তাহাদের হৃদয়ে জ্ঞানমালধ্বজের আদর্শ অত্যন্ত প্রবল হইয়া উঠিয়াছে বলিয়াই। সে বর্ষে তাহাদিগকে রক্ষা করিল কই?

তা ছাড়া বিনাশের চেহারা অনেক সময় ছয়বেশী। অনেক সময় পরিপূর্ণ সম্পদ তাহার সুখোন্মেষ নত। কণিত আছে, ক্ষয়-কালে রোগীর কপোলে রক্তিম-দাংগা কুটরা উঠে। সম্প্রতি উত্তরোত্তর ব্যাপ্যমান মিলিটারিয়ার রক্তিনার যুরোপের গওড়ল যে টকটকে হইয়া উঠিতেছে, সে কি তাহার স্বাক্ষরই লক্ষণ? তাহার জ্ঞানমালধ্বজের ব্যাধি অতিমেঘন্বীতির জ্বাৰ তাহার হৃদয়কে, তাহার মৰ্মস্থানকে, তাহার ধৰ্মনীতিকে আক্রমণ করিতেছে, ইহা কি আমরা প্রত্যাহ দেখিতে পাইতেছি না?

অবশ্যেইগত তাহা ততো ততঃ পততি।

ততঃ সপতন্যঃ সপতন্যঃ সপতন্যঃ।

অধর্মের দ্বারা আপাতত বুদ্ধিপ্রাপ্ত হয়, কুশল লাভ করে, শত্রুদিগকে জয় করিয়াও থাকে—কিন্তু সমুদ্র বিনষ্ট হইয়া যায়।

প্রকৃতির নিয়মের প্রতি প্রকৃতিতত্ত্ববিদ যুরোপের যেকোন অটল বিশ্বাস, ধর্মের প্রতি ধর্মতত্ত্ববিদ হিন্দু সেইরূপ একান্ত বিশ্বাস প্রকাশ করিয়া পুরোঁক পোক উচ্চারণ করিয়াছেন। কেবলমাত্র প্রাকৃতিক নিয়মের ব্যতিচারেই যে প্রব যুড়া, তাহা নহে, ধর্মনিয়মের ব্যতিচারেও প্রব বিনাশ। ধার্মনীতিক নিয়মের অনাবদে যুরোপ প্রজা

হারাইতেছে দেখিয়া, আমরাও যেন না হারাইয়া বসি। আমাদের রাজ্যের এক চোখ কানা বলিয়া আমাদের দৃষ্টিশক্তিগম্ভীর চোখের উপরে যেন পাগুড়ি টানিয়া না দিই।

নবী তাহার ছই তটত্বমির মধ্য দিয়া তটহীন সমুদ্রের দিকে চলিয়াছে। নবীকে যদি তাহার তটের মধ্যেই সম্পূর্ণ বদ্ধ করিবার জন্ত বাঁধ দেওয়া হয়, তবে তাহা উচ্ছ্বসিত হইয়া তটকে প্রাবিত ও বিনষ্ট করে। প্রাকৃতিক নিয়ম জড় হইতে সচেতনে ধর্মপরিণামের দিকে নিয়ত প্রাবিত। সেই পরিণামের দিকে তাহার গতিকে বাধা দিয়া যদি তাহাকে বর্তমানের আদর্শেই একেবারে বাঁধিয়া ফেলা যায়, তবে তাহা জীর্ণ হইয়া প্রলয় সাধন করে। স্বার্থের আদর্শ, বিরোধের আদর্শ, বতই দৃঢ়, বতই উচ্চ, বতই ব্রহ্মহীন হইয়া ধর্মের গতিকে বাধা দিতে থাকে, ততই তাহার বিনাশ আসন্ন হইয়া আসে। যুরোপের নেশনত্রে এই স্বার্থ, বিরোধ ও বিধেয়ের প্রাচীর প্রতিদিনই কঠিন ও উন্নত হইয়া উঠিতেছে। নেশনের মূলপ্রবাহকে অতিনেশননের দিকে—বিশ্বনেশননের দিকে ঘাইতে না দিয়া, নিম্নের মধ্যেই তাহাকে বদ্ধ করিবার চেষ্টা প্রত্যাহ প্রবল হইতেছে। আগে আমার নেশন, তার পরে বাকি আর সমস্ত কিছু, এই শব্দা সমস্ত বিশ্ববিধানের প্রতি ভ্রষ্টী-কুটিল কটাক্ষ নিক্ষেপ করিতেছে। তাহার প্রলয়পরিণাম যদি বা বিলম্বে আসে, তথাপি তাহা যে কিরূপ নিঃশব্দে, কিরূপ সুনিশ্চিত, তাহা আর্ধ্যাধিনি দৃঢ়কণ্ঠে বলিয়া গিয়াছেন—

অবশেষেই যেতে তাৎহে তেতা হুত্ৰাণি পলাতি ।

ততঃ সপত্ন্যং জগতি সমুদত্ত বিনশতি ।

এই ধর্মবাণী সকল বেশের, সকল কালের, চিরন্তন সত্য, জ্ঞানানন্দের মূলমন্ত্র ইহার নিকট ক্ষুদ্র ও ক্ষণিক । নেশন-

শব্দের অর্থ যখন লোকের হৃদয় বাইবে, তখনো এ সত্য অজ্ঞান বহিবে এবং পবি-উচ্ছিন্নিত এই বাক্য স্পর্ধানন্দমত্ত মানব-সমাজের উর্ধ্বে বরময়ে আপন অজ্ঞানসন প্রচার করিতে থাকিবে ।

পত্রীর সেকাল ও একাল ।

বাণীর কথা মনে পড়ে;—বৈশাখের প্রথম দিন, ব্রাহ্মবৃদ্ধের জাগিয়া উঠিয়াছি; নন্দারতির দুপগন্ধে এবং অষ্টগন্ধার সৌরভে বাতাস আনোনিতি । কদলীতুলে, মঙ্গল-ঘটে, সিক্ত আত্মপল্লবের মালায়, বঙ্গসার-স্তবের প্রথম অকণোদয় পূণ্যময় হইয়া বেধা দিয়াছে । আমরা গুরুভবনের মাসিক কার্যে যোগদান করিতে প্রস্তুত, -বয়স্ক-গণের উৎসাহের সীমা নাই ।

অল্প বেলা হইলে নবপত্রিকা পোনাইবার জন্ত যখন গ্রহাচাণী আসিয়া দেবমন্দিরের প্রান্তে কুণাগনে বসিলেন, তখন পাড়ার আবাণ-বৃদ্ধ সকলে দূর্গাদল এবং পুষ্প হস্তে লইয়া তাঁহাকে বিরিয়া বসিল । অন্তঃপুর হইতে তৈজসপারে আতপততুল, কাঁচা আম, ফুল-দুর্গা সাঙাইয়া, আচ্ছাদন এবং কিঞ্চিৎ কাকনমূল্য সহযোগে আনিয়া আচাৰ্য্য-বয়ের সম্মুখে স্থাপন করা হইল । নবপত্রিকা-প্রবণের ইহাই দক্ষিণা । বক্তা দক্ষিণাপ্রতি সাগ্রহে দৃষ্টিদান করিয়া কর্তার অদেশ

পাইয়াই—“নারায়ণং নমস্কৃত্য” আরম্ভ করিয়া নিলেন; জনে সত্য, তেতা, বাপর, কলির উৎপত্তির দিনকণ, তিতিকাল, গুনদোষ, ধর্মাদর্শ, অবতার এবং মহামায়ার আকার ও আয়ু প্রকৃতির বর্ণনাপাঠান্তর উপস্থিত বর্ষের ফলাফলকীর্ত্তন আরম্ভ করিলেই, প্রবীণ শ্রোতৃবর্গের মুখে কখনো হাস, কখনো বিবাদের চিহ্ন দেখা দিল । আমরা সেই ভালমন্দ ফলের চিত্তার কিছুমাত্র হর্ষবিবাদের ধার ধারিতাম না; কেবল বক্তার ভূত-ভবিষ্যৎ-জ্ঞানের ক্ষমতার আকর্ষণ বোধ করিতাম, আর অনেক অনাবস্তক অজ্ঞান-বুদ্ধ সংকৃত্ত বচনগুলিকে তাঁহার বখেটে পাতিতোর পরিচায়ক সিদ্ধান্ত করিয়া লইতাম । দ্বাদশমাণে দ্বাদশরাশির আর-বার-দ্বিতির কথা আরম্ভ করিলে, বয়স্কগণের প্রায় সকলেই নিজ নিজ রাশির, আর-বারটা ভালরূপে জানিয়া নিতেন ।

বর্ষফল বলা শেষ হইয়া গেলে শ্রোতৃ-বর্গের মধ্যে নানাজনে নানা প্রশ্ন উপস্থিত

করিতেন। আচার্য্য অন্ধানবদনে তৎ-
সমস্তের একটা সমাধান করিয়া দিতেন।
বর্ষপ্রবেশে বাহাদেব ভাগ্য প্রসন্ন হইয়া
বাইত, তাঁহার্য্য হাসি এবং আনন্দ লইয়া
গৃহে ফিরিতেন; অস্তেরা কতকটা চিন্তার
ভার লইয়া আচার্য্যোপনিষ্ট গ্রন্থাতির বখা-
সাধা উল্লেখ্যে ব্যাপৃত হইতেন। গ্রামের
বড় বড় বাড়ীতে পঞ্জী শোনাইয়া এবং
বাহাদেবের গ্রন্থবৈভাগ্য বটিকাতে, তাহাদের
গ্রন্থাতির লক্ষ স্বত্বান করিয়া আচার্য্যের
বৈশাখমাগে অনেকটা কাকুনমূল্য লাভ
করিতেন। পুরোহিতেরাও পূর্ণ বৈশাখের
বিচিত্র দৈবকর্মে উদবারসংস্থানের যথেষ্ট
অবসর পাইতেন।

বৈশাখ কুলের নাম। তখন ধনি-নিরিত্ত-
নির্জীর্ণবে প্রত্যেকেরই বাড়ীতে কিছু-না-
কিছু কুল কুটির। পর্মাশ্রুতির প্রসাধন
সম্পন্ন করিত। মনে পড়ে গুরুত্ব, মন্দির,
বেল, সঙ্ঘাটনিকা, জাতি, দুগী, টগর,
কন্দ, রত্ন, যেত-রত্ন-পিত করবার এবং
বিচিত্র চম্পককুশ্মের সম্মিলিত ব্রিদ্ধ মধুর
গন্ধে সমস্ত গ্রাম সৌরভাঘিত হইয়া উঠিত।

শাস্ত্রে বৈশাখমাগে দেবোৎসবে পুষ্প-
দানের অত্যন্ত মহিমা কীৰ্ত্তিত হইয়াছে।
বিশেষত ভগবদ্ভক্তিতে নিবেদন না করিয়া
পুষ্পের ভ্রাণ লইতে শাস্ত্রের নিষেধ। যে
কুল সুটল, কিন্তু ভগবদ্ভক্তগণাভের সৌভাগ্য-
গর্ভ করিতে পারিল না, তাহার ভগ্ন বৃথা;
নির্জীর্ণ। বাস্তবিক সেই বৃথা কুলের আশ্রয়
লইলে কর্মলার করুণা হইতেও বঞ্চিত

হইবার আশঙ্কা। থাকায় জানী গ্রামবাসিন্য
প্রত্যয়ে প্রাতঃকৃত্য-সমাপনান্তে শুদ্ধভাবে
নাড়ী লইয়া পুষ্পচরনে বাহির হইতেন।
পরে সংগৃহীত কুশুম্বাণি গ্রামের প্রতি
দেবালয়ে ভাগ করিয়া দিতেন। বাহাদেবের
আত্মিককৃত্যে পুষ্প-বিষয়গ্রন্থের প্রয়োজন
হইত, তাঁহার্য্য নিজেই অস্ত্র ও সক্ষর রাখি-
তেন। প্রতি ব্রাহ্মণেরই বাড়ীতে কিছু
প্রতিষ্ঠিত আছেন, স্ত্রুতরাং ব্রাহ্মণভবন-
মাঝেই তখন কুলের ভাগার হইয়া উঠিত।
কিন্তু সকল ব্রাহ্মণের গৃহে পুষ্টিত পুষ্প
পূজার ব্যবহৃত হয় না, তাঁহার্য্য সেই পুষ্পে
মন্দির এবং বেদি সাজাইতেন।

চৌর্য্যকর্ম সকল অবস্থাতেই দোষাবহ—
ভগাবৎ; কিন্তু দেবোৎসবে কুশুম্বাপহারণে
পাপভাগী হইতে হয় না, শাস্ত্রবিধি থাকায়
অনেক সময় নিরিত্ত গৃহবাসীর বগৃহ-
প্রতিষ্ঠিত-দেবোৎসবের বা কাম্যপূত্রার কুল
অপহরণপূর্ব্বক দেবোৎসবে দান করিয়া
পুণ্যবৃদ্ধি চরিতার্থ করিতে অনেকে বিধা
বোধ করেন না। বলা বাহুল্য, সেই
অবস্থায় অনেক সময় পরের বাগান-গুঠন
শেষ করিয়া নিজের সমস্তপালিত বাগানটিকে
নিভাত্তই কুশুম্বনির্ধন দেখিয়া পুষ্পচোরকে
মর্দ্যহত হইতে হইত।

বালক-বালিকারা এই সময়ে কুলের
খেলায় মাতিয়া উঠিত। তাহাদের কেহ
কেহ প্রবীণগণের অহুকরণে প্রাতঃস্নানাদি
করিয়া পুষ্পচরনপূর্ব্বক দেবমন্দিরে দান
করিয়া আনন্দবোধ করিত; অনেকে

• সমস্তর উক্তি—চিত্র মাত্ত ভক্ত কুশুম্বা পুষ্প প্রাণ্য ন নিরিত্ত।

দো: ন পতেৎ ব্রিহ: নগ্না: নিরিত্ত: স চ মে প্রিহ: ।

নিষেধের ক্ষুদ্র খেলাবরের খেলার মেঘতার
জন্মই তাহা সংগ্রহ করিত ।

বালক-বালিকা ও অস্তিত্বাবকবর্ণের
নিকট তরুণী এবং প্রৌঢ়া গ্রামবধূরা কুল
চাহিয়া লইত; অনেক সময় না চাহিয়াই
পাইত। সেই বিচিত্র কুসুম, তুলসীমল-
ময়রী ও বিচিত্র পত্রের দ্বারা তাহারা কত
মনোহর মালা আর বিচিত্র আভরণ রচনা
করিয়া দেবমন্দিরে দান করিতেন। পূজক
অপরূহে সেই কাকখচিত মালাভরণে বিগ্রহ
মাঝাইতেন। সন্ধ্যারতির সময় শুভ দীপ-
মালার আলোকে আবালবৃদ্ধ নরনারী
কুম্ভমাত্রাগণোভিত বিগ্রহ দর্শন করিয়া
তৃপ্তিলাভ করিতেন। আগতির পরে প্রণা-
মাস্ত্রে চরণাবৃত্ত পান করিয়া সকলেই
নির্দোষ লাভ করিতেন, আভরণচরিত্রী-
গণ অস্ত্রপুরে থাকিয়াও নির্দোষাবিতরণের
যোগ্য অংশে বঞ্চিত হইতেন না। তখন
সেই প্রদানী পূজাভরণ প্রিয়জনগণের
পরম্পর উপহারে—বিচিত্র ক্রীড়ার সাধের
ব্যবহৃত হইত।

বৈশাখমাসের প্রতি মঙ্গলবারে মঙ্গল-
চতীদেবীর পূজা প্রবন্ধবেশকেন্দ্র দেশে
প্রতি হিন্দুগৃহে অহুস্তিত হইয়া থাকে, তখন
গরিব প্রতিবেশীরা পুরোহিতগৃহে বা পাড়ার
বড়ি কু ব্যক্তিবিশেষের বাড়ীতে নিষেধের
সামান্য পূজোপকরণ ও একটি ঘট লইয়া
সিরা একসঙ্গে পূজা করিত। বলা বাহুল্য,
পরম্পরের সহযোগে তখন এই সকল উৎসব
শতভাবে উৎসাহময় হইয়া উঠিত। সেই
মঙ্গলচতীপূজার পূর্নরাশি, পূজাহরণকারী
বালকবৃন্দের আনন্দসঙ্গীতে মুখরিত হইয়া

উঠিত। মনে আছে, সেই কুলতোলা উপ-
লক্ষ্যে কত রাত্রিভাগরণ, অস্তিত্বাবকগণের
নিকট কত অসদ্ব্যবহার কারণ প্রদর্শন,
কত কাঁটাকাটা, কত বৃষ্টিতে ভিজা,
কত বহুলাভ, আর কত বহুবিক্ষেপই
না ঘটিয়াছে।

তখন বালকদিগের পূজা-বিষয়ত আহ-
রণে, বালিকাগণের দুর্গাসল আহরণ ও
কুশাকুশি প্রভৃতির মার্জনে—গৃহিণীকুলের
সাগ্রহ পূজার আরোহণে, গৃহস্থামিগণের
ব্যস্ত কর্তৃত্বে, মঙ্গলচতীপূজার যে উৎসাহের
অভিনয় হইত—আনন্দের লহরী উখলিয়া
উঠিত, বর্ষমানের তর্পণোৎসবও তাহার
তুলনায় নিতান্তই নিম্নতর। পুরোহিত
আসিয়া যখন পূজার বসিরা শঙ্খশনি
করিতেন, তখন বালক-বালিকারা দীপ্ত
উৎসাহে কাশর, বড়ি প্রভৃতির গায়ে
নির্দিষ্ট প্রহার করিয়া মঙ্গলচণ্ডিকা দেবীর
অর্কমাসংবাদ প্রতিযোগি বালক-বালিকা-
গণকে জানাইয়া দিত। পূজা শেষ হইয়া
সেলেই প্রদানের পালা। বালকবালিকারাও
অনেকে পূজাপাখাত বেজার উপবাসী থাকিয়া
কিঞ্চন পরিকৃষ্টির সহিত প্রদান ভোগ করিত,
তাহা কিরণপরিমাণে পল্লীর বালকবালিকারা
আঁকিও অহুমান করিতে পারে।

এই সকল উৎসবের প্রধান অঙ্গ শিষ্ট-
গণ; তাহারাই উৎসবের আনন্দকে তরলিত
করিয়া তোলে, এবং এই আনন্দের হিলোলে
তাহাদের জীবন সর্বদা আনন্দালিত ও
পরিপুষ্ট হইতে থাকে।

বৈশাখমাসের আর এক উৎসব কুল-
দোল বা চন্দমা দানা। পুরাণোক্ত রামশ

মাসের দ্বাদশ বাতায় ইহা অজ্ঞতম। বৈশাখী পূর্ণিমা এই ব্যতীত দিন, বৈশাখী পূর্ণিমার এই ফুলের মধ্যেই লুক্কায়িত।—বিগ্রহে, সিংহাসনে, মন্দিরে, বাহিরে, কেবল বিভিন্ন পুষ্পাশির সম্মোহন সৌন্দর্য! নাট্যমন্দিরের স্বাভাৱ্যত্ব হইতে অস্তিত্বপূর্ণ পুষ্পাশির কৃষ্ণবাস-শোভিত। মনোহারী কণ্ঠে প্রদানী মালা, হাতে ফুলের স্তবক; সমস্ত মালা, স্তবক এবং বিকিণ্ড পুষ্পসম্ভার চন্দনহলিঙ্গ। চন্দনগন্ধে কৃষ্ণবাসের অস্তিত্বপূর্ণ হইয়া বসি ইহার নাম 'চন্দনী ব্যাটা।' এই কৃষ্ণ-কুমার উৎসবে বাণেশ্বর পরীপ্রকৃতি যে এক আনন্দরসধারায় মিন্থ হইয়া যাইত, তাহা মরণ করিলে আজিও একটা উৎকর্ষা-কুল স্মরণ্য ভাবে অস্তিত্বপূর্ণ আচ্ছন্ন করিয়া ফেলে! এই উৎসব যদিও দেব-গণবিশেষেই অস্তিত্বপূর্ণ হইয়া থাকে, কিন্তু তখন তাহাতে সন্যস্ত গ্রামবাসী সমান উৎসাহ, সনান আনন্দ, সনান উৎসবাকুলতা বহন করিত; তখনকার পক্ষে ইহাও সার্বজনীন উৎসব।

ছোটখাট আরও অনেক উৎসব বৈশাখের দিনগুলিকে নন্দনীর করিত, সে সকলের উল্লেখে প্রবন্ধ একান্তই বাড়িয়া যাইবে, কাজেই সেগুলিকে বর্জন করা গেল।

কাঁচা আম কুড়ান এই সময়ের একটা পরম উল্লাস। বাতাল না হইলে আম পড়ে না, কাজেই পবনদেবকে আন্তরিক শাপাঙ্গকালনের দ্বারা কত যে অমুরোধ করা গিয়াছে, তাহার সীমা নাই। বলা বাহুল্য, বাপক-বাগিকাগণের করণ

প্রার্থনাতেই হউক, আর নায়িকালাতের উৎসাহেই হউক, চৈত্রের শেষার্ধ্বেই হইতে বৈশাখের শেষ পর্য্যন্ত পবনদেব যথেষ্টই উত্তেজিত হইয়া উঠেন। কাজেই আম-কুড়ান কর্ণটি যতদূরেই চলিয়া থাকে। সেই আমকুড়ান উপলক্ষে গুলিতে ভিলা, স্বভাবতঃ ডালপালার আঘাত লাগা, হাত-পা-কাটা প্রভৃতি অনেক উপসর্গ ছিল, কিন্তু তাহাতে তখন আমকুড়ানোর মর্য্যাদা কিছুমাত্র হ্রাস হইত না। গৃহবিগণ যদিও অনেক সময় নানা আশঙ্কা করিয়া স্বভাবতঃ উপসর্গে ছেলের বাহির হইতে বাধা দিতেন, কিন্তু কোনপ্রকারে তাহাদের হাত ছাড়াইয়া পাইতে পারিলে, যখন পাল, ডালা ও টুকরি ভরিয়া ভরিয়া আত্মসম্মতির আনিয়া তাহাদের সম্মুখে ধরা হইত, তখন তাহারা যে পূর্ব্ব অঙ্গদ্বয়, একরূপ মনে হইত না। তখন তরুণ এবং প্রৌঢ়গণ পর্য্যন্ত অনেক সময় শিশুদের মত হইতেন, এবং অন্তঃপুরের আমকুড়ান-বাগানে গৃহলক্ষ্মীগণ একমাত্র আপনাদেরই অধিকার অঙ্গুলি রাখিতেন। যখন সেই ব্যাস্তিক কুলস্বামী-গণ আত্মবস্ত্রে কটিদেশ-বন্ধন-পূর্ব্বক ডালা হাতে করিয়া অন্তঃপুরের আসোপািত আত্মকুলে সঞ্চরণ করিতেন, আর তাহাদের আঙ্গুলারিত দিক্ত কুলগলালে গভবেশ পর্য্যন্ত আচ্ছন্ন করিয়া জনবিশু করিত হইত এবং স্বভাবতঃ লতার পতিতে হেলিয়া ছলিয়া তাঁহারা পরস্পরে হাওয়াভিত্তি ধরিয়া তাড়াতাড়ি কাড়াকাড়ি করিয়া আম কুড়াইয়া ডালা ভরিতেন, তখন উন্মত্ত পবন নিশ্চয়ই নিজেই পূর্ণত জ্ঞান করিত। তখন

গৃহলক্ষ্মীগণের নিপুণ গৃহিণীপনায় ভবিষ্যতের ভক্ত কাঁচা আমের নানা প্রকার আচার, আমচূর, কামন্দী প্রভৃতি প্রস্তুত হইত। মানধর্ম আদান-প্রদান চলিত। তা ছাড়া যে যে গ্রামে এই কলের অভাব, সেই সকল পল্লীর নিয়ন্ত্রণের রমণীজনেরা আপনাদের ক্ষেত্রজাত ধনে, মোহরী, জিরা শোল্প অথবা পরিভ্রমনির্মিত সাঞ্জী, ধুচুনী, কুলা বা পরিষ্কার পাতলা চিড়ার বিনিময়ে যথেষ্ট আম লইয়া বাইত। সেই চানী গৃহিণীদের সঙ্গে যে সকল বালক-বালিকা উৎসাহে কুড়িসহ ঘুরিয়া বেড়াইত, তাগারা প্রায় সকল বাড়ীতে ঢুই চোপটা করিয়া আম প্রাপ্ত হইত।

আম পাকিতে আরম্ভ হইলেই গ্রাম-বাসী প্রত্যেক হিন্দুগৃহস্থ অবস্থানসারে আম আর জুড় প্রথমে গ্রামের প্রতি ব্রাহ্মণ-ভবনে—প্রতি দেবালয়ে পাঠাইয়া দিতেন। দেববিধে দানের পূর্বে গৃহস্থামিগণের পক্ষে পাকা আম খাওয়া একরূপ নিষিদ্ধই ছিল। কোন কোন বাড়ীতে এই সময়ে কালীপূজা প্রভৃতি অমুষ্ঠিত হয়; দেবালয়ে আম-জুড় দিয়া, বালিক-পূজা সম্পন্ন করিয়া, পিতৃ-লোকের উদ্দেশে আত্মাদি নিবেদন করিয়া, তার পরে অনেক গৃহস্থানী আম খাইঙেন।

মনে আছে, তখন গ্রামের এক বাড়ীতে যে দিন কালীপূজা, সেদিন সমস্ত গ্রামবাসী কোন-না-কোন প্রকারে তাহাতে আপনাদের আন্তরিক সহায়তা ভ্রাপন করিত। বালক-বালিকারা ত সকলেই গেন নিজেদের বাড়ীর পূজা মনে করিত, তাহাদের উৎসাহ বর্ণনার সীমার বাহিরে। কিন্তু বয়স্কদেরও

কোন প্রকার ঔবানীভ প্রকাশ পাইত না। পূজার দুই তিন দিন পূর্ণ হইতে প্রতি-বেশিনীরা পূজাবাড়ীতে মিলিত হইয়া নানা উপকরণ প্রস্তুত করিত। পূজার দিন সেই সকল স্মৃতিভা সরলা পল্লীরমণীরা পূজাবাড়ীর অন্তঃপুরে মিলিত হইয়া উলু দিয়া সমস্তের পূজাবিবরক বিভিন্ন সঙ্গীতের মধুর লহরী তুলিয়া নিত্যক নৈশ-গগন স্বধৃত করিয়া তুলিত। মন্দিরপ্রাঞ্চণে উৎসাহী পুরুষসম্প্রদায় খেল-করতালের সহিত সঙ্গীতনের আনন্দে মত্ত হইয়া উঠিতেন। ঢুলীরা আসিয়া শানাই, কানী, টাঁসার সহিত ঢোলের তুপতুপানি আরম্ভ করিয়া দিত। দূর হইতে সেই নিশীথকালে সকলগুলিই পৃথক্ ভাবে কানে পৌছিত। মধ্যে মধ্যে বাড়ি-কামরের গচ্ছন ও শব্দ-ঘণ্টার ধনিতে কর্ণ বধির হইবার উপক্রম হইত; কেন না, সেগুলির কর্তৃত্ব সম্পূর্ণরূপে বালক-মলের উপর। এইরূপে গোলেমালে আমোদে প্রমোদে সঙ্গীতে কীঠনে কাটাইয়া নিশীথ-রাত্রিতে পূজাবসান হইলে, আনন্দের সহিত প্রসাদ লাভ করিয়া সকলে গৃহে ফিরিতেন।

জৈষ্ঠমাসের ‘মাবিজীৱত’ কুলবতীগণের অনেকেই তখন করিতেন। ইহা যদিও সার্কেলবানী উৎসব নহে; তথাপি ইহার আয়োজনে উদ্যোগে সকলেই ব্যস্ত হইতেন। এক্ষণ উপবাসবহন কঠিন ব্রত বোধ হয় আর দ্বিতীয় নাই। কিন্তু বানৌর কল্যাণ-কামনার সাক্ষী রমণীগণ অকুণ্ঠিতচিত্তে এই অনশনব্রত ব্রত পালন করিয়া নিরাশ্রয়ো তিন-চারি-দিন ব্যাপী উৎসবে আনন্দে যোগদান করিতেন। তই দিন নিরপু অনশন

এবং পূর্বে ও পরে যথাবিধি সংগমন করিয়া
বহুঃ পুনঃপুনঃ জানায়ে পবিত্রভাবে পুজার
উল্লাস করিয়া দেওয়া এবং অভ্যাগতা ও
প্রতিবেশিনীগণের দায়র সম্ভাষণে তৎ-
পরতা প্রকাশ করা সাধারণের আশ্চর্য্য
কমতা ও নিষ্ঠার পরিচায়ক।

চৌঠমাসের ছোটখাট অনেকগুলি ব্রত-
উৎসবদি বাদ দিলেও ‘বলীভ্রতে’র উল্লেখ
অবত্ৰতর্ক্য। পশ্চিম বঙ্গে বলীবাটার
জানাজারই পূর্ণ অধিকার পাকার ইহা
“জানাই বলী” নামে অভিহিত হয়। প্রবন্ধ-
লেখকের বেশে এই ব্রত সম্বন্ধে বর্তীকরই
অবত্ৰতর্ক্য। সম্মানহীনঃ অনেকের
সম্মানকামনার বট্টদেবীর রূপাভিচারিণী
হইয়া থাকেন। বট্টবাটার পুরের দাবি
অগ্রগণ্য; কিন্তু কড়া, ভানাতা, ত্রাতুশুগ্ন,
ভাগিনের প্রভৃতি পুত্র এবং কড়া স্থানীয়
সকলেই সমানভাবে বাটা প্রাপ্ত হইয়া
থাকে। অপর দিকে কড়া মাতাপিতার—
এবং পুত্রবধূ স্বতন্ত্রখাতড়ীর মাতৃহৃদয়ের
লইয়া বহন বট্টদেবীর কাছে তাহাদের
দীর্ঘায়ুপ্রার্থনা জানাইয়া বস্ত্রের আশীর্বাদ-
স্বরূপ “জীব চাউল” এবং বাটা সম্মান-
সেহের উচ্চাসে স্বতন্ত্রখাতড়ী, পিতামাতা
প্রভৃতি গোণা গুণভবন হস্তে দান করিয়া
সহাস্যে তাহাদের নিবনৌ লইয়া জননী-
রূপে সম্মুখে দাঁড়ায়, সেই শান্ত করণ মধুর
ভাব বর্ণনা কহিবার ক্ষমতা প্রবন্ধলেখকের
নাই।

তখন প্রতিবেশী আর গ্রামবাসীদের
মধ্যে গ্রামসম্পর্কের মর্যাদা বহনসম্পর্কের
কুল্যদ্বন্দ্বা দ্বিগ। সুতরাং এক এক

ব্রতিনীকে যে বট্টদেবীর কাছে কত বাটা
প্রস্তুত করিতে হইত, এবং এক এক জনকে
যে কত বার বাটা খাটতে হইত, তাহার
কিছু বিব্রতা নাই।

আমের দিনে ব্রাহ্মণগণ পূর্বে প্রায় ফলা-
রের নিমন্ত্রণেই কাটাইতেন। এমনও দিন
গিয়াছে, যখন এক এক দিন দুই তিন বাদে
ফলাহারের নিমন্ত্রণ রক্ষা করিয়া পাকবস্ত্রটিকে
নিতান্তই বিপাকে ফেলিতে হইত। দক্ষিণার
অপর অংশী না থাকিলেও অবস্থাপনের
বাড়ীতে ব্রাহ্মণগণের উপলক্ষ্যে জ্ঞাতি এবং
অস্ত্রান্ত জাতিও চবাচোষাধিপিতাগ লইবার
জন্ত নিমন্ত্রিত হইয়া থাকে, কিন্তু তখন দেখা
গিয়াছে, ব্রাহ্মণগণের অনেকে ব্রহ্মভেদ্যের
প্রভাবে যে পরিমাণ ক্ষীর, ঘি, আত্র, কটকী,
চিপটিক-শর্করা-সহযোগে উত্তর করিয়া
অনার্য্যে পরিপাক করিতে সমর্থ হইতেন,
অপর লোকের নকে তাহা একরূপ অসম্ভব
বিবেচিত হইত। পাকবস্ত্রের একরূপ কঠোর
ব্যায়ামচর্চায় সুবিধা সাধারণের ভাগ্যে অল্পই
ঘটিয়া থাকে, সুতরাং তাহাদের একরূপ
পরাক্রম ভবিষ্যৎ। ভোক্তাদের পূর্বে বখেই
সমাধার হইত। কৃত্রিম সাগ্রে তাহাদের
পরিভোষপূর্বক আহার করাইয়া বড়ই
পরিচূর্ণ হইতেন।

হার এই কর্মদিনে সেই পরীপ্রকৃতির কি
আশ্চর্য্য পরিবর্তন হইয়াছে। এইবারের
বৎসরান্তের কালে যবেশে থাকিয়া কি
নীচস ভাববিপর্দার প্রত্যক্ষ করিয়া নিরাশ
হইতে হইয়াছে। এখন কোন উৎসবে
উৎসাহ নাই। পরস্পরের মধ্যে সেই ঐক্য-
বহন ছিন্নভিন্ন হইয়া গিয়াছে। নবপতী

অনেকের বাড়ীতে পঠিত হয়, কিন্তু প্রান্ত-বেশীর ভিত্তি নাই,—আবশ্যক অনাবশ্যক প্রশ্নের পদ্ধতি নাই ।

কুলের বাগান এখন আর লক্ষ্য, তামাক এবং বেগুনের ক্ষেত্রে পরিণত হইয়াছে । যে ছই চার বাড়ীতে এখনও কুলের বাগান আছে, সেখানেও এখন গুলোজু প্রবীণ এবং জীড়াসক্ত শিশু কুলের ব্যাগ্রপতি পরিগণিত হয় না । ছই এক কুলে পুষ্পাশ্রয় হয়, কিন্তু সেই কুলমন্ডলরূপানলোমুপ বধুপশ্রেণীর মত জানপদবৃন্দ ধলে ধলে তাহাতে আসিয়া আনন্দনৃত্যতা প্রকাশ করে না । কুল বৈশাখী পূর্ণিমার রজনী এখন তত্ত্ব-প্রবীর আনন্দসঙ্গীতে ধ্বনিত হইয়া উঠে না । আবালবৃদ্ধবনিতার কঠলয় সচন্দন কুলমদানের অপূর্ণ শোভা ও বধুর সৌরভ নগ্নন এবং গ্রাণেশ্বরের পরিতর্পণ করিয়া অকারণ উৎকণ্ঠার কাহাকেও ব্যগ্র করে না ।

পিতামহরোপিত আত্মতরুশ্রেণীর অনেক-গুলিই নানারূপে পঞ্চপ্রাপ্ত হইয়া জ্বালানি কাঠের কার্য করিয়াছে । তাহার স্থলে নূতন গাছ প্রায় রোপিত হয় নাই । অবশিষ্ট অস্বাভীর্ণ প্রাচীন আত্মতরু কখনই প্রচুর ফল প্রসব করিতে পারে না, দীর্ঘ-তরুর ফলও যথেষ্ট ছীনবণ—সূত্র । তরুজাই বৃদ্ধি এখনকার শিশুদলও অনেকটা শান্ত, দ্ব্যস্ত ও তিত্তিস্থ হইয়া পড়িয়াছে ।

পুন্ডার বাড়ীতে এখন কর্মকর্তা সাধা-সাধনা করিয়াও প্রতিবেশীর সহায়তা যথেষ্ট পরিমাণে প্রাপ্ত হন না । রমণীগণের মধ্যেও মান-অভিমানেরই অভিনয় অধিক

চলিয়া থাকে । শিশুদল ইচ্ছামতঃও মানী অভিতাবকগণের শাসনে সুনীহা পুন্ডার স্বপ্ন দেখে এবং স্বপ্নেই প্রসাদসুখা লাভ করিয়া সুখা নিবারণ করে । সুবন্ধের বস্ত্রকটি প্রায় ধরিয়াই আছে ; বরণ প্রসাদ-বিতরণের সময় ছই চার জন বৃদ্ধকেই উৎসাহে উপরিত হইতে দেখা যায় ।

আম-গ্রন্থ এখনও বেওয়া হইয়া থাকে, কিন্তু এখন ইহা সার্পিজনীন নহে, অথবা ইহার একান্তকর্তব্যতা কেহই মনে করে না । এখন ইহা যেন নৌকিকতায় পরিণত হইয়াছে ।

কিছুদিন পূর্বের ভুলনায় সাবিত্রীব্রত এখন ঐ অঞ্চলে কতকটা বৃদ্ধি পাইয়াছে মনে হয় ; কিন্তু ঔষধের সহিত বলিতে হইতেছে যে, অনেক রক্তিনী এই পবিত্র-প্রেমসম্প্রদায় সাবিত্রীব্রতের সংঘত অমুষ্ঠানকে একটা উদ্ভট গোত্র দেখান সভ্যনিষ্ঠার বাহ্য অভিনয়ের আধরণে আচ্ছন্ন করিয়া কেলিয়াছেন । তাহাদের ত্রুতে সেই প্রাণমত দাম্পত্যনিষ্ঠার আড়ম্বরহীন অমু-রাগের স্থলে কতকটা ঔপন্যাসিক উৎকট প্রেমবিকার স্থানলাভ করিয়াছে ।

বর্জিত্রতে আর পূর্বের ন্যায় সম্পর্ক অমু-সন্ধান করিয়া পুত্রকল্যাণানীরদের প্রতি রমণীকুলের মাত্রেয় উজ্জ্বলিত হইয়া উঠে না, এই নীচ স্বার্থপরতার দিনে আপনাদের পুত্র-কন্যা-স্বামাতা ছাড়া অল্প সম্পর্কের সহিত সম্পর্ক রাখাও অনেকে অনাবশ্যক বিবেচনা করে ।

বর্তমানে খুব অল্প স্থলেই ব্রাহ্মণগণ ফলাহারের নিমন্ত্রণে আপায়িত হন,

ইংরাজগৃহস্থান নিরক্ষর গ্রাম্যদূরক এবং অজ্ঞাত নিমিত্ত মিথ্যাভিনয়ী দূরক এবং প্রৌঢ়েরাও বাড়ীতে আহার করিয়া অনেক সময়েই অপরাহ্নে নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে গিয়া সামান্য অলপোপের দ্বারাই কৃতীকৈ বাধিত করিয়া থাকেন। সরল গ্রাম্যবাণিকেরা এখনও কতিং নিমন্ত্রণ লাভ করিলে সাগ্রহে যথাসময়ে বৃদ্ধদের সহিত নিমন্ত্রণবাড়ীতে উপস্থিত হয় এবং প্রবীণগণের মুখে অভীত নিতানৈবস্তিক নিমন্ত্রণের প্রচুর গল্প শুনিয়া উচ্চ দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাপ করে।

পূর্বে পরস্পরের মধ্যে প্রতি ঘটনার, প্রতি কর্ণে, একটি অদৃষ্ট ঐক্যধ্বনি ব্যগ্রত

হইয়া উঠিত; এখন ঈর্ষ্যাধেদের তীক্ষ্ণ ছুরিকা অলক্ষ্যে পরস্পরের প্রতি নিক্ষেপ করিয়া সংঘবন্ধনের মূলচ্ছেদপূর্বক একে অন্যের হিত্রাঘেবণ এবং মিথ্যা অপবাদ রচনা করিয়া, কর্তৃহীন অবশিষ্ট অধিকাংশ পরীয়াসী জঘন্য ক্রুরকর্মেই জীবনযাপন করিয়া থাকে। ভাগ্যবান এবং মনবিগণের দ্বারারা গ্রহবৈগুণ্যে বশেষের পরীতবনে বাগ করিতে বাধ্য হন, তাঁগরা অনেক সময়েই মৃত অথচ শিক্ষাভিনয়ী উদ্ধত ক্রুর-বৃদ্ধি গ্রাম্যবেতগণের অনিষ্ট ব্যবহারে কুহু—মর্দ্যাহত হইয়া কোনপ্রকারে জীবন-বাত্মা নির্বাহ করিয়া থাকেন।

ক্রীলিবধন বিদ্যার্ণব।

সগোত্র-বিবাহ।

বর-কস্তার অবয়ব এবং পাত্র, চক্ষু ও কেশের রং প্রভৃতির অবস্থা পর্য্যবেক্ষণ করিলে অনেক সময়ে উভয়ের শরীর সম-ধর্ম্মাক্রান্ত বলিয়া প্রতীতি জন্মে। এসব বিষয়ে পাত্র-পাত্রী পরস্পর হইতে যত তির-স্ক্রপ হয়, ততই ভাল। কারণ সমধর্ম্মাক্রান্ত-শরীর-বিশিষ্ট ব্যক্তিদ্বয়ের বিবাহ নিশ্চল হওয়ার সম্ভাবনা; অথবা সম্ভাবন হইলেও তাহাদের দীর্ঘজীবন আশা করা যায় না। (E. B. Foote, M. D., New York.)
বোধ হয়, সমধর্ম্মাক্রান্ত ব্যক্তিদ্বয়ের বিবাহ নিকট-সম্পর্কিতদের বিবাহের তুলা; কারণ

নিকট-সম্পর্কিতদের বিবাহের অন্ততকরিত্ব বামি-স্ত্রীর গুণদাম্যেরই ফলমাত্র।

এস্থলে পাত্রপাত্রী-নির্বাচন-সম্বন্ধে আর একটি অতি গুরুতর প্রের উপস্থিত হই-তেছি। প্রসঙ্গি এই—বর-কস্তার মধ্যে শোণিতসম্পর্কের কদাকল কি? বাকা-প্ররোগের সুবিধার নিমিত্ত গুরুত্ব সম্পর্কের অতিবহুলে বিবাহ সম্বোধিত ও তদভাবে বিষমশোণিত নামে অভিহিত হইবে।

প্রাচীন বিশ্ব ও পেশের রাশপরিবারে সময়ে সময়ে সহোদর-সহোদরা উদ্বাহনুত্রে আবদ্ধ হইতেন। আধুনিক সভ্যসামাজ্যেই

একরূপ বিবাহ নিষিদ্ধ । গ্রীকসে ও য়ুসলমান সমাজে এখনও নিকট আত্মীয়-আত্মীয়তার পরিণয় প্রচলিত আছে ; কিন্তু বৈজ্ঞানিকগণ তাহার বিরুদ্ধে যত্নবোধনা করিতেছেন । সমশোণিত বিবাহের প্রতি বিমুখতা বোধ হয় হিন্দুসমাজের জ্ঞান অল্প কোনও সমাজেই নাই । চীনদেশে এ বিষয়ে কিছু কড়াকড়ি আছে ; কিন্তু তাহাও আমাদের দেশের জ্ঞান বলিয়া জানিতে পারি নাই ।

যে সকল উদ্ভিদের পুষ্পে পুরুষের ও গর্ভকেশের ছুই-ই বিস্তারিত, তাহাদেরও বীজোৎপাদনের নিমিত্ত এক পুষ্পের গর্ভ-কেশের অল্প পুষ্পের পরাগের সংযোগ হওয়া আবশ্যক হয় । নিজ-পরাগ-সংযোগে কোন পুষ্পই বোধ হয় পূর্ণরূপে উৎকর্ষতা লাভ করে না । অধিকন্তু কোন বৃক্ষের নিজ-পরাগ-সংযোগে চিরকাল তাহার বংশব্রক্ষা হইতে পারে না । অন্তত বীর্ষকাল পরে পরে তজ্জাতীয় অল্প কোন বৃক্ষের পরাগ গ্রহণ-যোক্ত বৃক্ষের গর্ভকেশের সংযোগ করা আবশ্যক হয় । এতদ্বাচীত কালক্রমে বৃক্ষের উৎকর্ষতা নষ্ট হইবে বলিয়াই ডার্কউইন অনুমান করেন । এই ছুইটি সত্য সমশোণিত বিবাহের বিরুদ্ধে অতি প্রবল যুক্তি । ইতর জন্তুদিগের মধ্যে সমশোণিত-বিবাহ-জাত সন্তানগণের হীনতা পরিচক্ষিত হয় । মনুষ্যসমাজেও সমশোণিত বিবাহ গুতকর হয় না । Marriage and Heredity নামক গ্রন্থের প্রণেতা নেম্‌বিট সাহেব মনে করেন, ইংরেজ অভিজাত-সম্প্রদায়ের বহু-কলা-নির্কীর্টনকেন্দ্র অল্পপরিমিত হওয়াতে তাহাদের গুণতত্ত্ব অনিষ্ট হইতেছে । ক্রমাগত

নিম্নতরশ্রেণীর যোগাচার্য্যদের সম্ভ্রান্ত-শ্রেণীতে উন্নয়ন দ্বারা নতুন শোণিতের অঙ্গপ্রবেশ বাচীত অভিজাতদিগের বংশ-শোণেরই সম্ভাবনা । প্রাচীন অনেক অভিজাত পরিবারের লোপই তাহা প্রমাণ করিতেছে । কুরকের প্রাচীন অভিজাত পরিবারসমূহের বৈবাহিক সৎক অধীর্ষকাল স্বশ্রেণীর মধ্যে আবদ্ধ থাকায় বিবাহে সমশোণিতত্ব ঘটয়া তাহাদিগকে নিতান্ত দুর্দশাপন্ন করিয়াছে । যুরোপীয় রাজবংশ-সমূহে পুনঃপুন আদান-প্রদান দ্বারা রক্ত-সাহায্যে আতিশয়া ঘটয়াছে । রাজতন্ত্র শোণিত যুরোপীয় সিংহাসনাদিকারীদিগের শরীরে প্রায়ই প্রবেশ করে না । ফলও নিতান্ত ভীতজনক । বনি ও কবিদ্যার বর্তমান সম্রাটের পিতা ভীমশক্তি ছিলেন, তথাপি জ্ঞান বিত্তীয় নিকলাসের শরীরে নিতান্ত রোগপ্রবণ । অষ্ট্রিয়ার সম্রাট পুনশোকে অর্জুজিত । ইংলণ্ডের হানভারিগান্ রাজবংশ স্বাস্থ্যহীনতার জন্য প্রসিদ্ধ । বর্তমান রাজ-পরিবারে প্রায় কেহই কোনও কঠিন রোগের আক্রমণ হইতে আয়োগ্যলাভ করিতে পারেন নাই । স্পেন ও পর্তুগালের রাজবংশে সমশোণিত বিবাহের সর্কোপেক্ষা বিষমর ফল কমিয়াছে । এই দুই দেশের রাজগণ অনেক সময়েই স্ববংশসম্মত নিকট আত্মীয়দিগকে মহাবীররূপে গ্রহণ করিয়া থাকেন । এই সকল বিবাহ কখনও নিফল হয় ; কখনও বা ক্ষীণমস্তিক দুর্লগবেহ সন্তান-দিগকে সিংহাসনের উত্তরাধিকারী করে ।

প্রাচীন হিন্দুগণ স্ববংশে বিবাহনিষেধ দ্বারা অতি উৎকৃষ্ট প্রাতি প্রবর্তিত করিয়া

হেন। কিন্তু ভূতপাক্ষে অধুনিক সামাজিক কুপ্রথা কিয়ৎপরিমাণে তাঁহাদের তত্ত উদ্দেশ্যের ব্যাঘাত জন্মাইতেছে। একটি দৃষ্টান্ত গ্রহণ করি। স্বাভাবিক ভুলেমেলে রম্য-রাম চক্রবর্তী ও বিষ্ণুঠাকুরের বংশে আদান-প্রদান চলে। বর্তমান লেখক রম্যরাম চক্রবর্তী হইতে এবং তাঁহার ভগিনীর বিষ্ণুঠাকুর হইতে সপ্তম পুরুষ। বহুবিবাহ ও বহুসন্তানবত্তা নিবন্ধন রম্য ও বিষ্ণুর বংশ অতি বিস্তৃত। কিন্তু এ পর্যন্ত দুই চারিটি বাদে রম্যরামের বংশের প্রায় সমুদয় কন্তা বিষ্ণুর বংশে সম্প্রদত্তা হইয়াছে; বিষ্ণুর বংশেরও বহু কন্তা রম্যরামের বংশধরদিগের গৃহলক্ষ্মী হইয়াছেন। সাত পুরুষের মধ্যে প্রতিপুরুষে এইরূপে পুনঃপুন আদান-প্রদান রক্তসাম্য স্থাপন করিয়া সমশোণিত বিবাহের ঘোষ উৎপাদন করিবারই সম্ভাবনা। সগোত্র-বিবাহ নিষিদ্ধ হইলেও নিরীক্ষণক্ষেত্রে এরূপ সম্ভবীর্ণতা কালক্রমে নানাধোষের আকর হইতে পারে। এ বিষয়ে সমর থাকিতে সাবধানতা আবশ্যক।

কিন্তু অবাঞ্ছিত বিবাহ দৃষ্টান্ত হইলেও বিস্ময় এ বিষয়ে একটুকু বাড়াবাড়ি করিয়াছেন, সন্দেহ নাই। সগোত্র ভ্রাতৃগণের বিশ-পুরুষ-ব্যবধান হইলেও পরম্পরের সহিত বিবাহসম্বন্ধ স্থাপন করিতে পারেন না। অথচ সাত পুরুষের মধ্যে দুই ব্যক্তির বংশে কত আদান-প্রদান হইয়াছে, পূর্বেই দেখিয়াছি। দেবীবরের কৃপায় কুলীনদের অস্ত্র পড়া নাই। কিন্তু শাস্ত্রানুমোদিত রীতিও আপনাদের দর্শিত মানসস্ত রক্ষা করিয়া বর্তমানবর্তী সগোত্র ব্যক্তিগণের

বিবাহ প্রতিবেদ করিতে পারে না। মন্ত বলিতেছেন—

অগণিতঃ বা বাতুরসমোক্তা চ বা পিতৃঃ।

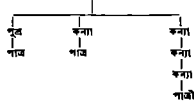
শা এনত। বিজ্ঞাতীনাং দারকর্ষণি বৈশুবৈঃ ৪৪

তৃতীয় অধ্যায়।

এতদ্বস্থলারে সগোত্র-বিবাহ নিষিদ্ধ; কিন্তু মাতামহুগোত্রে বিবাহ সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ নহে। যখন পূর্বপুরুষদের ‘জ্ঞাননামের প্রত্যক্ষজ্ঞান’ থাকে না, অর্থাৎ মোটামুটি হিসাবে যখন চৌদ্দ পুরুষের অধিক ব্যবধান ঘটে, তখন মাতামহুগোত্রে বিবাহ সিদ্ধ হইতে পারে। অগণিত কথ্যেতে এত গোলযোগ আছে যে, তাহা ব্যাখ্যা করিয়া বুঝান আমার সাধ্যাতীত; তাই সে-সকলের সারোচ্চার করিয়া পাঁচটি বংশাবলীর চিত্র দিলাম; তাহা হইতেই দৃষ্ট হইবে, বিবাহের অস্ত্র পাত্র-পাত্রীর মধ্যে অনুন কত ব্যবধান আবশ্যক।

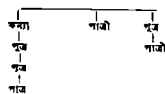
১ম চিত্র।

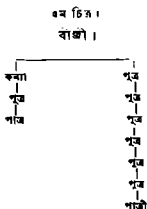
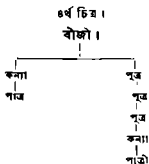
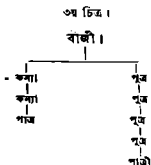
বীজী।



২য় চিত্র।

বীজী।





বয়সে কুলাইলে যে যে পুত্র ও রমণীর মধ্যে বিবাহসম্পর্ক স্থাপিত হইতে পারে, তাঁহাদিগকে যথাক্রমে পাত্র ও পাত্রী নামে অভিহিত করা হইল। বয়সে কুণান সম্বন্ধে এই পণ্যস্ত বলিতে পারি যে, চোষ্ঠ ভ্রাতার

প্রপ্রৌত্র বা প্রপৌত্রী এবং কনিষ্ঠ ভ্রাতার পুত্র বা কন্যার মধ্যে অনেক সময়ে আট দশ বৎসর মাত্র বয়সের তারতম্য দেখা যায়। তাই নিষিদ্ধ না হইলে তদ্রূপ স্থলে বিবাহ চলিতে পারিত। অতএব উপরে পাত্র-পাত্রীর মধ্যে দুই তিন পুরুষ বা তদধিক ব্যবধান দেখিয়া কাৰ্য্যত বিবাহ অসম্ভব জাবিবার বিশেষ কারণ নাই।

পুরুষজাত শরীরে পিতামাতার গুণ সমভাবে সংক্রমিত হয়। সুতরাং বোটাযুক্তি হিসাবে পুত্রশরীরে পিতার পোষিত অর্দ্ধেক মাত্র; পৌত্র ও দৌহিত্রে তদর্দ্ধেক; প্রপৌত্র ও প্রদৌহিত্রে তাহারও অর্দ্ধেক, ইত্যাদি। এস্থলে পুংসন্তানবাতক পদগুলি অপত্য-বাতক বৃত্তিতে হইবে। যাহা হউক, এই সব বিবেচনা করিলেই দেখিতে পাওয়া যাইবে যে, প্রথম চিত্রে পাত্রপাত্রীর শরীরে যথাক্রমে $\frac{3}{8}$ ও $\frac{1}{8}$, দ্বিতীয় চিত্রে $\frac{3}{16}$ ও

$\frac{1}{16}$ বা $\frac{2}{32}$, তৃতীয় চিত্রে $\frac{3}{64}$ ও $\frac{1}{64}$, চতুর্থ চিত্রে $\frac{3}{256}$ ও $\frac{1}{256}$ এবং পঞ্চম চিত্রে $\frac{3}{1024}$ ও

$\frac{1}{1024}$ অংশ সমপূর্ণপুরুষের রক্ত বর্তমান। এই ভাষাংশগুলিকে বিগণিত করিলে, পাত্রপাত্রীর রক্তসাম্যের এককত পরিমাণ পাওয়া যায়; যেহেতু সমপূর্ণপুরুষ দুইজন—স্বামী ও স্ত্রী। যদি এইরূপ বিবাহ শাস্ত্রসম্মত হয়, তবে বহুসূরবর্তী সগোত্র ব্যক্তিব্যয়ের মধ্যে বিবাহ-প্রতিষেধের বিজ্ঞানসম্মত কারণ বেশি না। স্বার্থপর সুন্দরের স্বগোত্রে বিবাহ নিষেধ করেন নাই। অধিকন্তু, কাম্যুৎসাহে যদিও স্ববংশে বিবাহ প্রচলিত নাই, তথাপি

সগোত্রবিবাহ নিষিদ্ধ নহে। কড়াকড়ি তথু ব্রাহ্মণদের বেলা। কিন্তু কোণিনোর কৃপায় সে কড়াকড়িরও প্রাণ নাই। শত্রোদ্ধগারে চৌক পুরুষের অধিক ব্যবধান ঘটিলে জাতির ঘুটিয়া যায়। বোধ হয় তদবস্থায় সগোত্র-বিবাহ-প্রথা প্রচলিত হওয়া সুক্ৰিয়বিহীন নহে। কলত অমূলকান

করিলে প্রকাশ পাইবে যে, জাতিতত্ত্বসম্পর্ক-বিস্তৃতি সগোত্র ব্যক্তিবর্গের হৃদয় ঘনিষ্ঠতা যে কোন পরগণার একপ্রেরণা যে কোন ব্রাহ্মণবর্গের মধ্যে বর্তমান। অল্পসংখ্যক ব্রাহ্মণের মধ্যে পুনঃপুন আধান-প্রদাননিবন্ধন একরূপ অবস্থানঘটন অবশ্যস্বাভাবিক।

শ্রীপরেশনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

চোখের বালি।

(১৮)

চড়িতাত্তীর চুর্দিনের পরে মহেন্দ্র বিনো-
দিনীকে আর একবার ভাগ করিয়া আরম্ভ
করিয়া লইতে উৎসুক ছিল। কিন্তু তাহার
পরদিনেই বাঙালিনী ইন্সপেক্টর-জেরে পড়ি-
লেন। রোগ গুরুতর নহে, শুধু তাহার
অস্থির ও চুর্কলতা যথেষ্ট। বিনোদিনী দিন-
রাত্রি তাঁহার সেবার নিযুক্ত হইল।

মহেন্দ্র কহিল—“দিনরাত এমন করিয়া
পাঠিলে শেষকালে তুমিই যে অস্থির পড়িবে।
মায় সেবার জন্তে আমি লোক ঠিক করিয়া
দিতছি।”

বিহারী কহিল—“মহীন দা, তুমি অত
বাস্তব হইয়ো না! উনি সেবা করিতেছেন,
করিতে হাও। এমন করিয়া কি আর কেহ
করিতে পারিবে!”

মহেন্দ্র যোগ্যের ঘরে ঘনঘন ঘাটারাত
আস্থিত করিল। একটা লোক কোন কাজ
করিতেছে না, অথচ কাজের সময় সর্বদাই
সঙ্গে লাগিয়া আছে, ইহা কষ্টটো বিনো-
দিনীর পক্ষে অসহ্য। সে বিরক্ত হইয়া দুই
তিন বার কহিল—“মহীনবাবু, আপনি
এখানে বসিয়া থাকিয়া কি সুবিধা করিতে-
ছেন! আপনি যান্ অনর্থক কলেজ
কামাই করিবেন না।”

মহেন্দ্র তাহাকে অসহন কর, ইহাতে
বিনোদিনীর গর্ভ এবং সুখ ছিল, কিন্তু তাই
কলিয়া এমনতর কাণ্ডালপনা—দুগ্ধা মাতার
শয্যাপার্শ্বেও লুপ্তদণ্ডে বসিয়া পাকা—
ইহাতে তাহার ধৈর্য্য থাকিত না, গুণাবোধ
হইত। কোন কাজ যখন বিনোদিনীর
উপর নির্ভর করে, তখন সে আর কিছুই

মনে রাখিবে না। নতুংগ খাওয়ান-দাওয়ান, যোগীর সেবা, ঘরের কাছ প্রয়োজন, ততক্ষণ বিনোদিনীকে কেহ অনবধান দেখে নাই—সে-ও প্রয়োজনের সময় কোনপ্রকার অপ্রয়োজনীয় ব্যাপার দেখিতে পারে না।

বিহারী অরক্ষণের জন্য মাঝে মাঝে রাজলক্ষীর সংবাদ লইতে আসে। ঘরে চুকিয়াই কি দরকার, তাহা সে তখনি বুঝিতে পারে—কোথায় একটা কিছু অর্থাৎ আছে, তাহা তাহার চোখে পড়ে,—মুহূর্তের মধ্যে সমস্ত ঠিক করিয়া দিয়া সে বাহির হইয়া যায়। বিনোদিনী মনে বুঝিতে পারিত, বিহারী তাহার তদ্রূপকে ^{২০} প্রকার চক্ষে দেখিতেছে, সেইজন্য বিহারীর আগমনে সে যেন বিশেষ পূরবার লাত করিত।

মহেন্দ্র নিত্যন্ত দিকারবেগে অত্যন্ত কড়া নিয়মে কলেজে বাহির হইতে লাগিল। একে তাহার মেজাজ অত্যন্ত রুক্ষ হইয়া গিয়াছিল, তাহার পরে এ কি পরিবর্তন! খাবার ঠিক সময়ে হয় না, সইস্টা নিরুদ্দেশ হয়, মোকামোড়ার ছিন্ন ক্রমেই অগ্রসর হইতে থাকে। এখন এই সমস্ত বিশৃঙ্খলার মহেন্দ্রের পূর্বের স্তার আমোদ বোধ হয় না। যখন যেটি দরকার, তখনি সেটি হাতের কাছে হুসজ্জিত পাইবার আশায় কাহাকে বলে, তাহা সে করবিন জানিতে পারিয়াছে, এক্ষণে তাহার অভাবে, আশার অশিক্ত অপটুতার মহেন্দ্রের আর কৌতুক-বোধ হয় না।

“চুনি, আমি তোমাকে কতদিন বলিয়াছি, স্নানের আগেই আমার জানার

বোতাম পরাইয়া প্রস্তুত রাখিবে, আর আমার চাপকান পাণ্টুলু ঠিক করিয়া রাখিবা। বিবে—একদিনও তাহা হয় না! স্নানের পর বোতাম পরাইতে আর কাপড় খুঁজিবা বেড়াইতে আমার হুঁপটা যায়!”

অমৃতপ্ত আশা লজ্জার স্নান হইয়া বলে, “আমি বেহারাকে বলিয়া দিয়াছিলাম।”

“বেহারাকে বলিয়া দিয়াছিলে! নিজেই হাতে করিতে দোষ কি! তোমার বাবা যদি কোন কাজ পাওয়া যায়!”

ইহা আশার পক্ষে বহুযাত। এমন উৎসর্গনা সে কখন পায় নাই। এ জবাব তাহার মুখে বা মনে আসিল না যে, ‘তুমিই ত আমার কন্দলিকার বাবাত করিয়াছ।’ এ ধারণাই তাহার ছিল না যে, গৃহকর্মান্বিতা নিয়ত অভ্যাস ও অভিজ্ঞতা লাগে। সে মনে করিত, ‘আমার স্বাভাবিক অক্ষমতা ও নির্বুদ্ধিতা বশতই কোন কাজ ঠিকমত করিয়া উঠিতে পারি না।’ মহেন্দ্র যখন, আশ্চর্যবিত্ত হইয়া বিনোদিনীর গহিত তুলনা দিয়া আশাকে দিকার দিয়াছেন, তখন সে তাহা বিনয়ে ও বিনা বিবেচ্যে গ্রহণ করিয়াছে।

আশা একএকবার তাহার কৃপণা শাওড়ির ঘরের আপোপাশে ঘুরিয়া বেড়ায়,—একএকবার লজ্জিতভাবে ঘরের ঘায়ের কাছে আসিয়া দাঁড়ায়। সে নিজেই সংসারের পক্ষে আবশ্যক করিয়া তুলিতে ইচ্ছা করে, সে কাজ দেখাইতে চায়, কিন্তু কেহ তাহার কাজ চাহে না। সে জানে না, কেমন করিয়া কাজের মধ্যে প্রবেশ করা যায়, কেমন করিয়া সংসারের মধ্যে

দান করিয়া নষ্ট হইতে হয়। সে নিজের অক্ষমতার সত্ত্বেও বাহিরে বাহিরে ফিরে। তাহার কি একটা মনোবেদনার কথা অন্তরে প্রতিদিন বাড়িতেছে, কিন্তু তাহার সেই অপরিষ্কৃত বেদনা—সেই অব্যক্ত আশঙ্কাকে সে নষ্ট করিয়া বৃষ্টিতে পারে না। সে অজ্ঞতব করে, তাহার চারিদিকের সমস্তই সে বেন নষ্ট করিতেছে—কিন্তু কেনন করিয়াই যে তাহা গড়িয়া উঠিয়াছিল, এবং কেনন করিয়াই যে তাহা নষ্ট হইতেছে, এবং কেনন করিলে সে তাহার প্রতিকার হইতে পারে, তাহা সে জানে না। থাকিয়া থাকিয়া কেবল গলা ছাড়িয়া কাঁদিয়া বলিতে ইচ্ছা করে, ‘আনি অত্যন্ত অঃখায়া, নিতান্ত অক্ষম, আনার মৃত্যুর কোথাও তুলনা নাই!’

পূর্বে ত আশা ও নবোদয় সুদীর্ঘকাল হইলেন এক গৃহকোণে বসিয়া কখনো কথা কহিয়া, কখনো কথা না কহিয়া, পরিপূর্ণ মুখে সমস্ত কাটাইয়াছে। আজকাল বিনোদিনীর অভাবে আশার সঙ্গে একলা বসিয়া মহেশ্বরের মুখে কিছুতেই যেন সহজে কথা বোঝায় না—এবং কিছু না কহিয়া চুপ করিয়া থাকিতেও তাহার বাহ্যিক ‘বাহ’ ঠেকে। পূর্বকার সেই সহজ কথা ও সহজ মৌন, হুই ভাঙিয়া গেছে। এমন হইল, রাত্রের অন্ধকার ব্যতীত একলা আশার সহিত একত্র হইতে তাহার ভাবনা হইত। আশারও ভয় করিত; সে বৃষ্টি, সে কিছুতেই মহেশ্বকে আনোব দিতে পারিতেন না। পরস্পরকে নিলনম্রের বেওয়া সহজে পিচতন হইয়া উঠিলে, সে দুখ

সেওয়া ভঃখায়া হয়। যখন পরস্পরের সঙ্গ-টুকুমাত্রই যতাবত সুখকর, তখন আনন্দের অস্বপ্ন কথাব্যর্থাৎ আপনি উজ্জ্বলিত হইয়া উঠে; তেমা মাথার তেল প্রকৃতি আপনি চালে। কিন্তু সঙ্গকে সুখকর করিবার জন্য যখন বাহ্য উপায় চাই, বাহ্য উপায় তখন সর্বাঙ্গের দ্বন্দ্ব হইয়া উঠে। অবোধ আশা মনে মনে কেবলি প্রার্থনা করিতে লাগিল, ‘বিনোদিনী পীর নিকৃতি লাভ করিয়া তাহাদের নিলনম্রের ভাঙা হাট আবার জমাইয়া তুলুক, তাহাদের উজ্জ্বল বস্ত্রের কোণটিকে আবার একবার হাস্যমুখে সঙ্গ করিয়া দিক!’

মহেশ্ব বেওয়ায়কে লিভায়া করিল, ‘ও চিঠি কাহার?’

‘বিহারিবাবু।’

‘কে দিল?’

‘বহ ঠাকুরাণী।’ (বিনোদিনী)

‘দেখি’ বলিয়া চিঠিখানা লইল। ইচ্ছা হইল ছিঁড়িয়া পড়ে। ছ’চারিবার উন্টান্টা করিয়া নাড়িয়া চাড়িয়া বেওয়ার হাতে ছুঁড়িয়া কেলিয়া দিল। যদি চিঠি খুলিত, তবে দেখিত, তাহাতে লেখা আছে, ‘পিসিমা কোনমতেই সাঙ-বাঁলি খাইতে চান না, আজ কি তাহাকে ডালের রোল খাইতে দেওয়া হইবে?’—ওঁবধ-পথা লইয়া বিনোদিনী মহেশ্বকে কখনো কোন কথা লিভায়া করিত না,—সে সহজে বিহারীর প্রতিই তাহার নির্ভর।

মহেশ্ব বাবান্দার খানিককণ পাখচাষি করিয়া ঘরে ঢুকিয়া দেখিল, দেখালে টাঙানো একখানা ছবির বঁড়ি ছিন্নপ্রায় হওয়াতে

ছবিটা বাঁকা হইয়া আছে। আশাকে অত্যন্ত ধমক দিয়া কহিল, “তোমার চোখে কিছুই পড়ে না, এমননি করিয়া সমস্ত জিনিষ নষ্ট হইয়া যায়।” ধমকনের বাগান হইতে হুল শিংগ্রহ করিয়া যে তোড়া বিনোদিনী পিতলের ফুলদানীতে সাজাইয়া রাখিয়াছিল, আজও তাহা শুক অবস্থায় তেমনি ভাবে আছে;—অন্তদিন মহেন্দ্র এ সমস্ত লক্ষ্যই করে না—আজ তাহা চোখে পড়িল। কহিল, “বিনোদিনী আসিয়া না ফেলিয়া দিলে ও আর কেলাই হইবে না!” বলিয়া ফুলগুচ্ছ ফুলদানী বাহিরে ছুঁড়িয়া ফেলিল, তাহা ঠাৎশব্দে সিঁড়ি দিয়া গড়াইয়া চলিল।—“কেন আশা আমার মনের মত হইতেছে না, কেন সে আমার মনের মত কাজ করিতেছে না, কেন তাহার স্বভাবগত শৈলিয়া ও ভূরূপতায় সে আমাকে দাম্পত্যের পথে দৃঢ়ভাবে ধরিয়া রাখিতেছে না, সঙ্গিনী! অনাকে বিকিণ্ড করিয়া বিতেছে?”—এই কথা মহেন্দ্র মনে মনে আন্দোলন করিতে করিতে হঠাৎ দেখিল, আশার মুখ পাংগুত্বর্ণ হইয়া গেছে, সে খাটের খান ধরিয়া আছে, তাহার চৌট-ছুটি কাঁপিতেছে—কাঁপিতে কাঁপিতে সে হঠাৎ বেগে পাশের ঘর দিয়া চলিয়া গেল।

মহেন্দ্র তখন ধীরে ধীরে গিয়া ফুলদানীটা ফুড়াইয়া আনিয়া রাখিল। ঘরের কোণে তাহার পড়িবার টেবিল ছিল—চৌকিতে বসিয়া সেই টেবিলটার উপর হাতের মধ্যে মাথা রাখিয়া অনেকক্ষণ পড়িয়া রহিল।

সন্ধ্যার পর ঘরে আলো দিয়া গেল, কিন্তু আশা আসিল না। মহেন্দ্র ক্রতপদে ছাদের উপর পাখচাষী করিয়া বেড়াইতে লাগিল।

হাজিরাটা বাজিল, মহেন্দ্রের শোকবিয়ল গৃহ রাত দুপরের মত নিস্তক হইয়া গেল,—তবু আশা আসিল না। মহেন্দ্র তাহাকে ডাকিয়া পাঠাইল। আশা সমুচিতপদে আসিয়া ছাদের প্রবেশদ্বারের কাছে দাঁড়াইয়া রহিল। মহেন্দ্র কাছে আসিয়া তাহাকে বুকে টানিয়া লইল—দুহস্তের মধ্যে স্বামীর বুকের উপর আশার কান্না ফাটিয়া পড়িল—সে আর থামিতে পারে না, তাহার চোখের জল আর ফুয়ার না, কান্নার শব্দ ‘গলা ছাড়িয়া বাহির হইতে চায়, সে আর চাপা থাকে না! মহেন্দ্র তাহাকে বক্ষে বদ্ধ করিয়া কেশচূষন করিল—নিঃশব্দ আকাশে তারাগুলি নিস্তক হইয়া চাহিয়া রহিল।

রাতে বিছানায় বসিয়া মহেন্দ্র কহিল—“কলেজে অনাধের ‘নাইট-ডিউট’ অধিক পড়িয়াছে, অতএব এখন কিছুকাল আমাকে কলেজের কাছেই বাস করিয়া থাকিতে হইবে।”

আশা ভাবিল, “এখনো কি রাগ আছে? আমার উপর বিরক্ত হইয়া চলিয়া থাকিতেছেন? নিজের নিঃশর্তায় আমি স্বামীকে ঘর হইতে বিদায় করিয়া দিলাম? আমার ত বরা ভাল ছিল!”

কিন্তু মহেন্দ্রের ব্যবহারে রাগের লক্ষণ কিছুই দেখা গেল না। সে অনেকক্ষণ কিছু না বলিয়া আশার মুখ বুকের উপর রাখিল এবং বারংবার অশ্রু দিয়া তাহার হুল চিরিতে চিরিতে তাহার খোঁপা শিখিল করিয়া দিল। পূর্বে আসরের দিনে মহেন্দ্র এমননি করিয়া আশার বাঁধা হুল খুলিয়া দিত—আশা তাহাতে আপত্তি করিত।

আজ আর সে তাহাতে কোন আপত্তি না করিয়া পুনরেক বিলম্ব হইয়া ছুপ করিয়া রহিল। হঠাৎ একদম্বর তাহার লগাটের উপর অশ্রুবিম্ব পড়িল, এবং মহেন্দ্র তাহার মুখ তুলিয়া ধরিয়া বেহুশভাবে ডাকিল—“তুনি।” আশা কথার তাহার কোন উত্তর না দিয়া দুই কোমল হস্তে মহেন্দ্রকে চাপিয়া ধরিল। মহেন্দ্র কহিল—“অপরাধ করিয়াছি, আমাকে মাগ কর।”

‘আশা তাহার কুহনকুনার করণময় মহেন্দ্রের মুখের উপর চাপা দিয়া কহিল—“না, না, অমন কথা বলিয়ে না! তুনি কোন অপরাধ কর নাই! সকল দোষ আমার! আমাকে তোমার দাসীর মত শাসন কর! আমাকে তোমার চরণপ্রস্রের যোগ্য করিয়া লও!”

বিনামের প্রভাতে শব্দাতাগ করিবার সময় মহেন্দ্র কহিল—“তুনি, আমার রত্ন, তোমাকে আমার ছন্দরের সকলের উপরে ধারণ করিয়া রাখিব, সেখানে কেহ তোমাকে ছাড়াইয়া যাইতে পারিবে না।”

তখন আশা দৃঢ়চিত্তে সর্বপ্রকার ত্যাগ-স্বীকারে প্রস্তুত হইয়া স্বামীর নিকট নিজের এককিষাও ক্ষুদ্র দাবী দাখিল করিল। কহিল,—“তুনি আমাকে যোষ একখানি করিয়া চিঠি দিবে?”

মহেন্দ্র কহিল—“তুনিও দিবে?”

আশা কহিল—“আমি কি লিখিতে আনি?”

মহেন্দ্র তাহার কানের কাছে অলক-গুচ্ছ টালিয়া দিয়া কহিল, “তুনি অক্ষর-

কুমার দত্তের চেয়ে ভাল লিখিতে পার—
‘চাকুপাঠ বাহাকে বণে!’”

আশা কহিল—“বাও, আমাকে আর ঠাট্টা করিবে না!”

যাইবার পূর্বে আশা যথাসাধা নিজের হাতে মহেন্দ্রের পোট্‌ন্যাটো সামান্যিভে বসিল। মহেন্দ্রের মোটা মোটা শীতের কাপড় ঠিকমত তঁাল করা কঠিন, বান্ধে ধরান শক্ত—উভরে মিলিয়া কোনমতে চাপাচাপি ঠানঠুঁসি করিয়া বাহ্য এক বান্ধে ধরিত, তাহাতে দুই বাহ্য বোঝাই করিয়া তুলিল। তবু বাহ্য ভূগুণে বাকি রহিল, তাহাতে আরও অনেকগুলি বস্ত্র পুটুলির সৃষ্টি হইল। ইহা লইয়া আশা যদিও বাহ-বার লজ্জাবোধ করিল, তবু তাহাণের কাড়াকাড়ি, কোড়ক ও পরস্পরের প্রতি সহানুদায়িত্বের পূর্ব্বেকার আনন্দের দিন ফিরিয়া আসিল। এ যে বিনামের আয়োজন হইতেছে, তাহা আশা কণকালের ক্ষণ তুলিয়া গেল। সহিন্দ্র দশবার গাড়ি তৈয়ারির কথা মহেন্দ্রকে শ্রবণ করাইয়া দিল, মহেন্দ্র কানে তুলিল না,—অবশেষে বিরক্ত হইয়া বলিল, “বোড়া খুলিয়া বাও।”

সকাল ক্রমে বিকাল হইয়া গেল, বিকাল সন্ধ্যা হইল। তখন স্বাস্থ্যাপান করিতে পরস্পরকে সতর্ক করিয়া দিয়া এবং নিয়মিত চিঠিলেখা সম্বন্ধে বারংবার প্রতিশ্রুতি করাইয়া লইয়া ভারাক্রান্ত হৃদয়ে পরস্পরের বিচ্ছেদ হইল।

ব্রাহ্মণস্বামী আজ ছইদিন হইল উঠিয়া বসিয়াছেন। সন্ধ্যাবেলায় গারে মোটা কাপড় মুড়ি দিয়া বিনোদিনীর সঙ্গে তাম খেলিতে-

ছেন। আজ তাহার শরীরে কোন স্নান নাই। মহেন্দ্র ঘরে প্রবেশ করিয়া বিনোদিনীর দিকে একেবারেই চাহিল না—মাকে কহিল, “না, কলেজে আমার রাজ্যের কাজ পড়িয়াছে, এখানে থাকিয়া সুবিধা হয় না—কলেজের কাছে বাসা লইয়াছি। সেখানে আজ হইতে থাকিব।”

রাজলক্ষ্মী মনে মনে অভিমান করিয়া কহিলেন, “তা যাও ! পড়ার ক্ষতি হইলে কেমন করিয়া থাকিবে ?”

যদিও তাহার যোগ সারিয়াছে, তবু মহেন্দ্র ঘাইবে তুমি তখন তিনি নিজেকে অত্যন্ত ক্লান্ত ও দুর্বল বলিয়া কল্পনা করিলেন ; বিনোদিনীকে বলিলেন, “যাও ত বাছা, বালিশটা এগাইয়া যাও !”—বলিয়া বালিশ অবলম্বন করিয়া শুইলেন, বিনোদিনী আঙুলে আঙুলে তাহার গায়ে হাত বুলাইয়া দিতে লাগিল।

মহেন্দ্র একবার মার কপালে হাত দিয়া দেখিল—তাহার নাড়ী পরীক্ষা করিল। রাজলক্ষ্মী হাত ছাড়াইয়া লইয়া কহিলেন—“নাড়ী বেগিয়া ত ভারি বোঝা যায়! তোর আর ভাবিতে হইবে না, আমি বেশ আছি !”—বলিয়া অত্যন্ত দুর্বলভাবে পাশ করিয়া শুইলেন।

মহেন্দ্র বিনোদিনীকে কোনপ্রকার বিদায়নস্বাক্ষর না করিয়া রাজলক্ষ্মীকে প্রণাম করিয়া চলিয়া গেল।

(১২)

বিনোদিনী মনে মনে ভাবিতে লাগিল, “ব্যাপারখানা কি ? অভিমান, না রাগ, না ভয় ? আমাকে দেখাইতে চান, আমাকে

কেয়ার করেন না ? বাসায় গিয়া থাকিবেন ? দেখি কতদিন থাকিতে পারেন ?”

কিন্তু বিনোদিনীরও মনে মনে একটা অশান্ততার উপস্থিতি হইল।

মহেন্দ্রকে প্রতিদিন সে নানা পাশে বন্ধ ও নানা বাণে বিদ্ধ করিতেছিল, সে কাজ গিয়া বিনোদিনী বেন এপাশ ওপাশ করিতে লাগিল। বাড়ী হইতে তাহার সমস্ত নেশা চলিয়া গেল। মহেন্দ্রবৃদ্ধিত আশা তাহার কাছে নিতান্তই স্বাভাবিক। আশার প্রতি মহেন্দ্রের সোহাগ-বন্ধ বিনোদিনীর প্রণয়বশিত চিত্তকে সর্বদাই আলোড়িত করিয়া তুলিত,—তাহাতে বিনোদিনীর বিরহিণী কল্পনাকে যে বেদনার জাগ্রতক করিয়া রাখিত, তাহার মধ্যে উগ্র উত্তেজনা ছিল। যে মহেন্দ্র তাহাকে তাহার সমস্ত জীবনের সার্থকতা হইতে বঞ্চিত করিয়াছে, যে মহেন্দ্র তাহার মত স্ত্রীরত্নকে উপেক্ষা করিয়া আশার মত ক্ষীণবুদ্ধি দীনপ্রকৃতি বালিকাকে বরণ করিয়াছে, তাহাকে বিনোদিনী ভাল বাসে, কি বিবেচ করে, তাহাকে কঠিন শাস্তি দিবে, না, তাহাকে হৃদয় সমর্পণ করিবে, তাহা বিনোদিনী ঠিক করিয়া বুঝিতে পারে নাই। একটা আশা মহেন্দ্র তাহার অন্তরে আগাইয়াছে, তাহা হিংসার, না প্রেমের, না দুরেরই মিশ্রণ, বিনোদিনী তাহা ভাবিয়া পার না ;—মনে মনে ভীত হাসি হাসিয়া বলে, “কোন নারীর কি আমার মত এমন দশা হইয়াছে। আমি মরিতে চাই কি মারিতে চাই, তাহা বুঝিতেই পারিলাম না !” কিন্তু যে কারণেই বল, দগ্ধ হইতেই হোক বা দগ্ধ করিতেই

হোক, মহেন্দ্রকে তাহার একান্ত প্রয়োজন। সে তাহার বিবিধ অধিবাণ ভগ্নতে কোথায় মোচন করিবে! ঘন নিশাণ কেলিতে কেলিতে বিনোদিনী কহিল—“সে বাইবে কোথায়! সে ফিরিবেই! সে আসার।”

আশা ঘর পরিষ্কার করিবার ছুতা করিয়া সন্ধ্যার সময় মহেন্দ্রের বাহিরের ঘরে, মাথার তেলে দাগ-পড়া মহেন্দ্রের বসিবার কেদারা, কাগজ-পত্র-ছড়ানো ডেস্ক, তাহার বই, তাহার ছবি প্রভৃতি জিনিষপত্র বারবার নাড়াচাড়া এবং অঙ্গুল দিয়া ঝাড়পোচ করিতেছিল। এইরূপে মহেন্দ্রের সকল জিনিষ নানারূপে স্পর্শ করিয়া, একবার রাখিয়া, একবার তুলিয়া, আশার হিরহ-সন্ধ্যা কাটিতেছিল। বিনোদিনী দীর্ঘে দীর্ঘে তাহার কাছে আসিয়া পাড়াইল; আশা শ্রবণ লব্ধিত হইয়া তাহার নাড়াচাড়ার কাজ রাখিয়া দিয়া, কি যেন খুঁজিতেছে, এমনিতর ভান করিল। বিনোদিনী গম্ভীর-মুখে জিজ্ঞাসা করিল, “কি হচ্ছে তোরা ভাই?”

আশা মুখে একটুখানি হাসি ভাগাইয়া কহিল, “কিছুই না ভাই!”

বিনোদিনী তখন আশার গলা জড়াইয়া কহিল—“কেন ভাই বাণি, ঠাকুরপো এমন করিয়া চলিয়া গেলেন কেন?”

আশা বিনোদিনীর এই প্রশ্নমাজেই সংশয়াবিত, সশঙ্কিত হইয়া উত্তর করিল—“তুমি ও জানই ভাই—কলেজে তাঁহার বিশেষ কাজ পড়িয়াছে বলিয়া গেছেন!”

বিনোদিনী ভান হাতে আশার চিবুক তুলিয়া ধরিয়া যেন করুণায় বিগলিত হইয়া

স্বল্পভাবে একবার তাহার মুখ নিরীক্ষণ করিয়া দেখিল এবং দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিল।

আশার বুক দহিয়া গেল। নিতম্বে সে নিরীকোথ এবং বিনোদিনীকে বুদ্ধিমতী বলিয়া জানিত—বিনোদিনীর ভাবধানা দেখিয়া হঠাৎ তাহার বিশ্বাসমার অন্ধকার হইয়া উঠিল। সে বিনোদিনীকে স্পষ্ট করিয়া কোন প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতে সাহস করিল না। দেয়ালের কাছে একটা সোকার উপরে বসিল। বিনোদিনীও তাহার পাশে বলিয়া দৃঢ়বাহ দিয়া আশাকে বুকের কাছে রাখিয়া ধরিল। সখীর সেই আলিঙ্গনে আশা আর অশ্রুপংবরণ করিতে পারিল না, তাহার দুই চক্ষু দিয়া জল করিয়া পড়িতে লাগিল। ঘরের কাছে অকুস্তিখারী খল্লনী বাজাইয়া গাহিতেছিল—“চরণতরণি পে মা তারিণি তামা।”

বিহারী মহেন্দ্রের সন্ধ্যানে আসিয়া ঘরের কাছে পৌছিতেই দেখিল—আশা কাঁদিতেছে এবং বিনোদিনী তাহাকে বুকে জড়াইয়া ধরিয়া দীর্ঘে দীর্ঘে তাহার চোখ মুছাইয়া দিতেছে। দেখিয়াই বিহারী সেখান হইতে সরিয়া পাড়াইল। পাশের শুল্কঘরে গিয়া অন্ধকারে বসিল। দুই করতলে মাথা ঢাপিয়া ধরিয়া ভাবিতে লাগিল, “আশা কেন কাঁদবে? যে যেহে স্বভাবতই কাঁহারো কাছে লেশমাত্র অপরাধ করিতে অক্ষম, তাহাকেও কাঁদাইতে পারে, এমন পাবও ভগ্নতে কে আছে?”—তার পরে বিনোদিনী যেন কহিয়া সাধন। করিতে-ছিল, তাহা মনে আনিয়া মনে মনে কহিল—“বিনোদিনীকে তারি দুগল বুঝিয়াছিলাম।”

সেবায় সাধনায়, নিঃস্বার্থ সপী প্রসে, সে
মর্ত্যবাসিনী দেবী ।”

বিহারী অনেকক্ষণ অন্ধকারে বসিয়া
রহিল। অন্ধের পান পানিয়া গেলে, বিহারী
সম্বন্ধে পা ফেলিয়া কাশিয়া মহেশ্বরের ঘরের
দিকে চলিল। ঘরের কাছে না বাইতেই
ঘোমটা টানিয়া আশা ক্রতপদে অন্তঃপুরের
দিকে ছুটিয়া গেল।

ঘরে ঢুকিতেই বিনোদিনী বলিয়া
উঠিল—“এ কি বিহারি বাবু? আপনায়
কি অল্প করিয়াছে?”

বিহারী। কিছু না!

বিনোদিনী। চোখ দুটা অমন লাল
কেন?

বিহারী তাহার উত্তর না দিয়া কহিল
“বিনোদ-বোঠা’ন, মহেন্দ্র তোখায় গেল!”

বিনোদিনী মুখ গভীর করিয়া কহিল—
“ভনিগান, হাঁসপাতানে তাহার কাজ
পড়িয়াছে বলিয়া কলেজের কাছে তিনি
বাসা করিয়া আছেন। বিহারি বাবু একটু
সরুন, আমি তবে আসি।”

অল্পমনঃ বিহারী ঘরের কাছে বিনো-
দিনীর পথরোধ করিয়া গাড়াইয়াছিল।
চকিত হইয়া তাড়াতাড়ি পথ ছাড়িয়া দিল।
সন্ধ্যার সময় একলা বাহিরের ঘরে বিনো-
দিনীর সঙ্গে কথাবার্তা লোকের চক্ষে স্পষ্ট
নয়, সে কথা হঠাৎ মনে পড়িল। বিনোদিনী
চলিয়া ঘাইবার সময় বিহারী তাড়াতাড়ি
বলিয়া মইল—“বিনোদ-বোঠা’ন, আশাকে
তুমি দেখিয়ে—সে সরল। কাহাকেও আঘাত
করিতেও জানে না, নিজেকে আঘাত হইতে
বাচাইতেও পারে না।”

বিহারী অন্ধকারে বিনোদিনীর মুখ
দেখিতে পাইল না, সে মুখে হিংসার বিস্তার
খেলিতে লাগিল। আজ বিহারীকে দেখিয়াই
সে হুঁকিয়াছিল যে, আশার অস্ত্র করণায়
তাহার হৃদয় ব্যথিত। বিনোদিনী নিজে
কেহই নহে! আশাকে চাকিয়া স্নানিয়ার
অস্ত্র, আশার পথের কাটা তুলিয়া দিবার
অস্ত্র, আশার সমস্ত মুখ সম্পূর্ণ করিবার
অস্ত্রই তাহার অস্ত্র! ত্রিগুণ মহেশ্বরাবু
আশাকে বিবাহ করিবেন, সেইজন্য
অনুষ্ঠের তাড়নার বিনোদিনীকে বারাগতের
বর্ষের বানরের সহিত বনবাসিনী হইতে
হইবে—ত্রিগুণ বিহারি বাবু সরল আশার
চোখের জল দেখিতে পাবেন না, সেইজন্য
বিনোদিনীকে তাহার আঁচলের প্রান্ত তুলিয়া
সরুনা প্রস্তুত হইয়া থাকিতে হইবে। একবার
এই মহেন্দ্রকে, এই বিহারীকে, বিনোদিনী
তাহার পশ্চাতের দ্বারায় সহিত ধূলার স্তুতি
করিয়া বুকাইতে চায়, আশাই বা কে আর
বিনোদিনীই বা কে,—হৃৎকনের মধ্যে কত
প্রশ্নে! প্রতিকূল-ভাগা-বশত বিনোদিনী
আপন প্রতিভাকে কোন পুরুষের চিত্তক্ষেত্রে
অব্যাহতভাবে জরী করিতে না পারিয়া অলস
শক্তিশেল উদ্ভূত করিয়া সংহারমুষ্টি বহিল।

অত্যন্ত নিঃশব্দে বিনোদিনী বিহারীকে
বলিয়া গেল—“আপনি নিশ্চিত থাকিবেন
বিহারি বাবু! আমার চোখের বালির অন্য
ভাবিয়া ভাবিয়া নিজেকে বেশি কষ্ট
দিবেন না।”

(২০)

অনতিকাল পরেই মহেন্দ্র তাহার ছাত্রাবাসে
চেনা হাতের অক্ষরে একখানি চিঠি পাইল।

দিনের বেলা গোলমালের মধ্যে খুলি না—
বুকের কাছে পকেটের মধ্যে পুরিয়া রাখিল।
কলেজে লেকচার শুনিতে শুনিতে হাঁস-
পাতাল খুঁজিতে খুঁজিতে ছাড়া এক-একবার
মনে হইতে লাগিল—‘ভালবাজার একটা
পানী তাহার বুকের নীড়ে বাসা করিয়া
চুয়াইয়া আছে। তাহাকে জাগাইয়া তুলি-
লেই তাহার সমস্ত কোমল কুঞ্জন কানে
ধনিত হইয়া উঠিবে।’

সন্ধ্যার একসময় মহেন্দ্র নির্জনঘরে
ল্যাম্পের আলোকে চৌকিতে বেশ করিয়া
হেলানু দিয়া আরাম করিয়া বসিল। পকেট
হইতে তাহার দেহতাপতপ্ত চিঠিখানি
বাহির করিয়া লইল। অনেককণ চিঠি না
খুলিয়া লেফাকার উপরকার শিরোনামা
নিরীক্ষণ করিয়া দেখিতে লাগিল। মহেন্দ্র
জানিত, চিঠির মধ্যে বেশি কিছু কথা নাই।
আশা নির্ভর মনের ভাব ঠিকমত ব্যক্ত
করিয়া লিখিতে পারিবে, এমন সম্ভাবনা
ছিল না। কেবল তাহার কাঁচা অক্ষরে
বাঁকা লাইনে তাহার মনের কোমল কথা-
গুলি কল্পনা করিয়া লইতে হইবে। আশার
কাঁচা হাতে বহুদূর লেখা নির্ভর নামটি
পড়িয়া মহেন্দ্র নির্ভর নামের সঙ্গে যেন
একটা রাসিগী শুনিতে পাইল ;—তাহা
সাকী-নারী-জন্মের অতি নিতৃত বৈকুণ্ঠ-
লোক হইতে একটি নির্মল প্রেমের সঙ্গীত।

এই ছুই-এক-দিনের বিচ্ছেদে মহেন্দ্রের
মন হইতে দীর্ঘ মিলনের সমস্ত অবসাদ দূর
হইয়া সরলা বধূর নবপ্রসে উডাসিত
স্বপ্নবৃত্তি আবার উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে।
শেখাশেখি প্রাত্যহিক বরফরার খুঁটিনাটি-

অনুবিধা তাহাকে উতাক্ত করিতে আরম্ভ
করিয়াছিল, সে সমস্ত অপসারিত হইয়া
কেবলমাত্র কণ্ঠহীন, কারণহীন একটি
বিশুদ্ধ প্রেমাম্বলের আলোকে আশার
মানসী নৃত্তি তাহার মনের মধ্যে গ্রাণ পাইয়া
উঠিয়াছে।

মহেন্দ্র অতি ধীরে ধীরে লেফাকা
ছিঁড়িয়া চিঠিখানা বাহির করিয়া নির্ভর
লগাটে কম্পোলে চুলাইয়া লইল। একদিন
মহেন্দ্র যে এসেপ্ আশাকে উপহার দিয়া-
ছিল, সেই এসেপের গন্ধ চিঠির কাগজ
হইতে উতলা দীর্ঘনিশ্বাসের মত মহেন্দ্রের
জন্মের মধ্যে প্রবেশ করিল।

ভাঁজ খুলিয়া মহেন্দ্র চিঠি পড়িল। কিন্তু
এ কি! যেমন বাঁকা-চোরা লাইন, তেমন
সাদামাধা ভাষা নয় ত! কাঁচা-কাঁচা অক্ষর,
কিন্তু কথাগুলি ত তাহার সঙ্গে মিলিল না!
লেখা আছে—

“প্রিয়তম, তাহাকে তুলিবার জন্য
চলিয়া গেছ, এ লেখার তাহাকে মরণ
করাইয়া দিব কেন? যে লতাকে ছিঁড়িয়া
মাটিতে কেলিয়া দিলে, সে আবার কোন্
লজ্জার লড়াইয়া উপরে উঠিতে চেষ্টা করে!
সে কেন মাটির সঙ্গে মাটি হইয়া মিশিয়া
গেল না!

“কিন্তু এটুকুতে তোমার কি ক্ষতি
হইবে নাথ? না হয় অণুকালের ক্ষণ মনে
পড়িলই বা! মনে তাহাতে কতটুকুই বা
বাকিবে? আর, তোমার অবহেলা যে
কাঁটার মত আমার পাঞ্জের ভিতরে
প্রবেশ করিয়া রহিল! সকল দিন, সকল
রাত, সকল কাল, সকল চিন্তার মধ্যে যে

দিকে ফিরি, সেই দিকেই যে আনাকে
বিশিতে লাগিল! তুমি যেমন করিয়া
ভুলিলে, আমাকে তেমনি করিয়া ভুলিবার
একটা উপায় বলিয়া দাও!

"নাথ, তুমি যে আমাকে ভাল বাসিয়া-
ছিলে, সে কি আমারই অপরাধ? আমি
কি স্বপ্নেও এত দোভাঙ্গা প্রত্যাশা করিয়া-
ছিলাম? আমি কোথা হইতে আসিলাম,
আমাকে কে জানিত? আমাকে যদি না
চাহিয়া দেখিতে, আমাকে যদি তোমার
ঘরে বিনা-বেতনের দাসী হইয়া থাকিতে
হইত, আমি কি তোমাকে কোন দোষ
দিতে পারিতাম? তুমি নিজেই আমার
কোন স্তম্ভে ভুলিলে প্রিয়তম, কি দেখিয়া
আমার এত আদর বাড়াইলে? আর, আজ
বিনামেবে যদি বস্ত্রপাতট হটল, তবে
সে বস্ত্র কেবল মধ্য করিল কেন?
একেবারে দেহমন কেন ভাই করিয়া
দিল না?"

"এই ছুটো দিনে অনেক সহ্য করিলাম,
অনেক ভাবিলাম, কিন্তু একটা কথা
বুঝিতে পারিলাম না,—যদি থাকিয়াও কি
তুমি আমাকে ফেলিতে পারিতে না?
আমার মন্তও কি তোমার ঘর ছাড়িয়া
বাড়ার কোন প্রয়োজন ছিল? আমি
কি তোমার এতখানি জুড়িয়া আছি?
আমাকে তোমার ঘরের কোণে—তোমার
দ্বারের বাহিরে ফেলিয়া রাখিলেও কি আমি
তোমার চোখে পড়িতাম? তাই যদি হয়,
তুমি কেন গেলে, আমার কি কোপাও
হইবার পথ ছিল না? ভাসিয়া আসিরাছি,
গা'সখা ঘাট'তাম!"

এ কি চিঠি! এ ভাষা কাহার, তাহা
মহেশ্বরের বুদ্ধিতে বাকি রহিল না। অকস্মাৎ
আহত বুদ্ধিতের মত মহেশ্ব সে চিঠিখানি
লইয়া স্তম্ভিত হইয়া রহিল। যে লাইনে
রেলপাড়ির মত তাহার মন পূর্ববেগে
ছুটিয়াছিল—সেই লাটমেই বিপরীত দিক্
হইতে একটা ধাক্কা খাইয়া লাইনের
বাহিরে তাহার মনটা। যেন উল্টাপাল্টা
সুপাকার বিকল হইয়া পড়িয়া থাকিল।

অনেকক্ষণ চিন্তা করিয়া আবার সে
প্রইবার তিনবার করিয়া পড়িল। কিছুকাল
যাহা সুদূর আভ্যন্তের মত ছিল, আজ
তাহা যেন স্টুয়া উঠিতে লাগিল। তাহার
জীবনাকাশের এক কোণে যে ধুমকেতুটা
ছারার মত দেখাটতেছিল, আজ তাহার
উদাত বিশাল পৃষ্ঠ অগ্নিরেখার দীপ্যমান
হইয়া দেখা দিল।

এ চিঠি বিনোদিনীরই। সরলা আশা
নিবের মনে করিয়া তাহা লিখিয়াছে। পূর্বে
যে কথা সে কখনো ভাবে নাই, বিনো-
দিনীর রচনামত চিঠি লিখিতে গিয়া সেই
সব কথা তাহার মনে আগিয়া উঠিতে
লাগিল। নকলকরা কথা বাহির হইতে
বহনুল হইয়া তাহার আন্তরিক হইয়া
গেল। যে নূতন বেদনার সৃষ্টি হইল,
এমন হুলস্থল করিয়া তাহা ব্যক্ত করিতে
আশা কখনই পারিত না। সে তাখিতে
লাগিল, 'সবী আমার মনের কথা এমন
ঠিকটি বুঝিল কি করিয়া? কেমন করিয়া
এমন ঠিকটি প্রকাশ করিয়া বলিল?'
অন্তরঙ্গ সর্বাঙ্গে আশা আরো যেন বেশি
আগ্রহের সঙ্গে আগ্রহ করিয়া দরিস, কারণ,

যে বাঘাটা তাহার মনের মধ্যে, তাহার তাষাটি তাহার সখীর কাছে সে এতই নিকটপার!

মহেন্দ্র চৌকি ছাড়িয়া উঠিয়া কু কুঁকিত করিয়া বিনোদিনীর উপর হাপ করিতে অনেক চেষ্টা করিল, যাকে থেকে হাসি হইল আশার উপর! “বেথ বেথি আশার একি সুচুতা, স্বামীর প্রতি এ কি অত্যাচার!” বলিয়া চৌকিতে বসিয়া পড়িয়া প্রাণশ্বস্রপ চিঠিখানা আবার পড়িল। পড়িয়া ভিতরে ভিতরে একটা হর্ষমক্কার হইতে লাগিল। চিঠিখানাকে সে আশারই চিঠি মনে করিয়া পড়বার অনেক চেষ্টা করিল। কিন্তু এ ভাষার কোনমতেই সরলা আশাকে মনে করাইয়া দেয় না। হুঁচকার লাইন পড়িবারাত্র একটা সুখোদ্ভাবক মনেই ফেলিল মনের মত মনকে চারিদিকে ছাপাইয়া উঠিতে থাকে। এই প্রজ্বর

অথচ ব্যক্তি, নিবিড় অথচ নিকটাপত্ত, বিবাক্ত অথচ নম্র, একচ কালে উপদ্রুত অথচ প্রত্যাহত প্রেমের আভাস মহেন্দ্রকে যাতাল করিয়া তুলিল। তাহার ইচ্ছা করিতে লাগিল, নিজের হাতে পায়ে কোথাও এক কাগজের ছুরি বসাইয়া বা আর কিছু করিয়া নেশা ছুটাইয়া মনটাকে আর কোন দিকে বিক্ষিপ্ত করিয়া দেয়। টেবিলে লম্বোরে মুঠি বসাইয়া চৌকি হইতে লাকাইয়া উঠিয়া কহিল, “দূর কর, চিঠিখানা পুড়াইয়া ফেলি!” বলিয়া চিঠিখানা ল্যাম্পের কাছাকাছি লইয়া গেল। পুড়াইল না, আর একবার পড়িয়া ফেলিল। পরদিন ভূতা টেবিল হইতে কাগজপোড়া ভাট অনেক ছাড়িয়া ফেলিয়াছিল। কিন্তু তাহা আশার চিঠির ছাট নহে, চিঠির উত্তর দিবার অনেকগুলি অসম্পূর্ণ চেষ্টাকে মহেন্দ্র পুড়াইয়া ছাই করিয়াছে।

ক্রমশঃ ।

সার সত্যের আলোচনা ।

জাগ্রৎ, স্বপ্ন, ত্রুবুত্তি ।

জাগ্রৎকালে আমরা বিজ্ঞান-রাজ্যে বাস করি; স্বপ্ন-কালে মনোরাজ্যে বাস করি। বিজ্ঞান-রাজ্যের প্রদীপ বুদ্ধি; মনোরাজ্যের

প্রদীপ কামনা। জ্ঞান কিন্তু এক বই হই নহে। একই জ্ঞান বিজ্ঞান-রাজ্যের বুদ্ধি-প্রদীপ হইয়া বস্ত-সকলের ব্যবহারিক সম্ভার্যক আলোক প্রদান করে, এবং মনো-

• ব্যাক্তিমাত্রিক সত্তা - Concrete সত্তা - প্রাতিজ্ঞানিক সত্তা (Phenomenal existence) - বাস্তবিক সত্তা (Real existence) । Concrete সত্তাঃ লোকের ব্যবহারে আসে।

ভাষ্যের কাম-প্রদীপ হইয়া বস্ত-সকলের প্রাতিভাসিক সত্যের আলোক প্রদান করে। মনোবাণীর কাম-প্রদীপ এক-প্রকার কাম-দেহু। মনোবাণী, তাই, যে বাহ্য অজ্ঞাতদ্বারে কামনা করে, সে সেই অবাচিত সামগ্রী চক্ষু মুদিত করিয়া করতলে আঁশ হইয়;—

“যন্ত্রের কৃপা, যন্তে অবিলাস,
ঐখাণী কানিয়া উঠে দরিত্র অভাণী।”

অপ-প্রকাশ ।

কিন্তু কামনা-কামিনীটিকে সব সময়ে চেনা ভার। একপ্রকার কামনা আছে, বাহ্য আশঙ্কার কনিষ্ঠা ভগিনী। তার সংকী;—একজন পুঁপিক যদি পক্ষতের সাহুসকের কিনারায় দাড়াইয়া গভীর নিম্নে দৃষ্টি নিক্ষেপ করে, তবে তাহার মনোমধ্যে পতনের আশঙ্কা তো জাগিয়া ওঠেই; কিন্তু আশঙ্কা যেমন জাগিয়া ওঠে, তেমনি তাহার পিছন দিক্ হইতে পতনের অস্ত্র একপ্রকার ব্যাগ্রতা একপ্রকার অধীর কামনা “ঋণ দিয়া পড়ে” বলিয়া বিভ্রান্ত পথিকটিকে বমালয়ের মোড়া রাত্তা দেখাইয়া যায়। এই প্রকার শঙ্কামুজা কামনা হইতে হ্রঃস্রের বিভীষিকা জন্ম গ্রহণ করে, তাহা দেখিতেই পাওয়া যাইতেছে।

বাস্তবিক বস্ত-সকলও জানের বিবর—এ কথা সত্য; কিন্তু তাহার গোড়ার গলদ—তাহা অবাস্তবিক। যেটিমুটি বলিলাম “অবাস্তবিক” কিন্তু যদি কোনো ন-ছোড়-বন্দ সত্য-জিজ্ঞাসু আমাকে শঙ্কা-শক্তি করিয়া ধরেন, তবে আমার মুখ দিয়া

প্রকৃত সত্য-কপাট বাহির হইয়া পড়িবে। সে কথা এই যে, যন্ত্রের বস্ত-সকল দুই হিসাবে হইরূপ;—এক হিসাবে তাহা বাস্তবিক; আর-এক হিসাবে অবাস্তবিক। বাস্তবিক বস্তর সত্য যদি সর্বাংশে অবাস্তবিক হইত, তবে তাহাকে “অবাস্তবিক” বলিলেই এক কপাট চুকিয়া যাইত। কিন্তু অস্ত্র সহজে নাম্ণা চুকিবার নহে। এ কথা কাহারো অবদিত নাই যে, অন্ধ মিউটন আলোকের জাগ্রৎস্রের পুনর্জিত হইয়া উল্লাস-তরে বলিয়া উঠিয়া-ছিলেন, “Hail holy Light offspring of heaven first-born”—অভিবাদন করি তোমার পবিত্র আলোক—ব্রহ্মের প্রথম-জাত সন্তান! মিউটন যখন নিম্নলিখিত-চক্ষে আলোকের এইরূপ সুখস্র দেখিতে-ছেন, তখন বুঝিতেই পারা যাইতেছে যে, সেই যে বাস্তবিক আলোক, বাহ্য তাহার মনঃচক্ষুতে দেখা দিতেছে, তাহার বাস্তবিক সত্য তাহার চক্ষুরিন্দ্রিয়ের দৃষ্টি-ক্ষেত্রে নাই; আছে তাহা তাহার দৃষ্টিক্ষেত্রে—বদিত অদৃশ্য-ভাবে। যে ক্ষেত্রে যে ভাবে থাকুক না কেন—আছে তো? তবেই হইতেছে যে, যন্ত্রের দৃষ্ট বস্ত সাক্ষাৎ সম্বন্ধে অবাস্তবিক হইলেও, তাহা পরোক্ষ সম্বন্ধে বাস্তবিক—যে অংশে তাহা বাস্তবিক পরার্থের স্বতি-পর্ভ, সে অংশে অবশ্যই তাহা বাস্তবিক। এইজন্য বলিতেছি যে, বাস্তবিক বস্ত-সকলের সত্যকে অবাস্তবিক না বলিয়া বলা উচিত প্রাতিভাসিক দার্শনিক পণ্ডিতেরা বলিয়া থাকেনও তাই।

স্বপ্ন-কালের মনোভাষা যেমন কাহিনী-মাতৃক, ভাষ্যকালের বিজ্ঞান-রাশ্য তেমনি বুদ্ধি-মাতৃক; আর, সেই বিজ্ঞান-রাশ্যের বস্তু-সকলের সত্তা ব্যাবহারিক সত্তা। সে সত্তা বৈতস্ক্য। ব্যাবহারিক সত্তার দুই পৃষ্ঠে অপর দুইবিধ সত্তার সংশ্লেষ রহিয়াছে ল্পষ্ট। বিজ্ঞান-রাশ্যের বস্তু-সকলের এ-পৃষ্ঠের সত্তা প্রাতিভাসিক সত্তা, ও-পৃষ্ঠের সত্তা বাস্তবিক সত্তা, এবং সমগ্র অবস্থার সত্তা ব্যাবহারিক সত্তা। সাবধানী পোকার যেমন পরীক্ষিতব্য টাকার ডই পিট উন্টিয়া পাণ্ডিত্য দেখে, এখানে তেমনি বিজ্ঞান-রাশ্যের বস্তু-সকলের ব্যাবহারিক সত্তার দুই পিট এবং তাহার পরে তাহার সমগ্র অবস্থার একে একে পর্যবেক্ষণ করিয়া দেখা বিবেচ; তাহারই এক্ষণে চেষ্টা দেখা দাই-তেছে।

(১) ব্যাবহারিক সত্তার

এ পিট।

আসি বখন আনার সমুখে ঐ খামটা দেখিতেছি, তখন দেখিতেছি আর কিছু না—ঐ খামটা'র মশা হঠতে উহার বাস্তবিক সত্তা বাহ দিলে বাহা অবশিষ্ট থাকে, তাহাই দেখিতেছি—উহার বৈতস্ক্য উন্নত মূল্যকৃতি মাত্র দেখিতেছি। মনে কর, আসি ঐ খামটার বাস্তবিক সত্তা একেবারেই অগ্রাহ করিয়া শুদ্ধ কেবল উহার বৈতস্ক্য উন্নত মূল্যকৃতির প্রতি একদৃষ্টে চাহিয়া আছি; একদৃষ্টে চাহিয়া থাকিতে থাকিতে, মনে কর, আমার চক্ষু একপ্রকার তন্ত্রার ঘোর আশিল, আর, সেই-গতিকে ঐ খামটা

স্বপ্নের ন্যায় একটা প্রাতিভাসিক পুশ্য-মাত্রে পর্যাবসিত হইল। এখন দেখিতে হইবে এই যে, ঐ খামটার সত্তা যদি সত্তা-সত্যই সেইরূপ একটা প্রাতিভাসিক সত্তা-মাত্র হইত, তাহা হইলে, উহা যে এক-মূহুর্তে হাউই-বালি হইয়া চূর্ণ করিয়া উড়িয়া বাইবে না, অথবা বাধ হইয়া গী গী করিয়া ধাইতে আসিবে না, তাহার কোনো দ্বিগতা থাকিত না। তার সাকী—স্বপ্নের প্রাতিভাসিক রাশ্যে সবই বে-আইন বে-কাহনু। সে রাশ্যে যে বাহা, সে তাহা নহে। সে রাশ্যে—এই দেখিতেছি ভাষ্য-বনত সুস্বর্ণ গর্ভত, পরক্ষণেই দেখি যে, তাহা গর্ভত নহে—তাহা তেজঃস্কীত অশ্ব; এই দেখিতেছি মাট-গাঁসা শূকর, পরক্ষণেই দেখি যে, তাহা শূকর নহে—তাহা বর্মান্বিত খজাঘুণ গভীর; এই দেখিতেছি মিউনিউ-কারী বিভাল-ছানা, পরক্ষণেই দেখি যে, তাহা বিভাল-ছানা নহে—তাহা ভীষণ ব্যাঘ্র। স্বপ্নের মূল্যে এইসকল অশ্বটন-বটন। কেমন অবলীলা-ক্রমে আনাদের ময়ন-সমক্ষে হওয়া-বাওয়া করে! তখন তাহাদের বাস্তবিকতা-সম্বন্ধে সংশয়ের বিস্ম-বিপর্গও আনাদের বুদ্ধিকে বিভ্রান্ত করে না। বুদ্ধি তখন কোথায়—বে, তাহাকে বিভ্রান্ত করি'ব? বুদ্ধি তখন অগ্রাহ নিত্মার নিমগ্ন! প্রকৃত কথা এই যে, যে সময়ে আমরা স্বপ্নের মনোভাষ্যে বাস করি, সে সময়ে বাস্তবিক-অবাস্তবিকের কথা আমাদের মনেই আসে না। তার সাকী;—আসি যদি কোনো সময়ে আনার কোনো সূত বন্ধকে স্বপ্ন

দেখি, তবে সে সময়ে আমার সে বদ্ধ বাস্তবিকই জীবিত আছেন, অথবা অনেক-দিন হইল মৃত হইয়াছেন, একথা বিজ্ঞানীর বিষয় বলিয়াই মনে হয় না । কিন্তু তথাপি, হৃদের মধ্যে বিশেষ একটি প্রভেদ আছে ; সে প্রভেদ এই যে, প্রকৃত স্বপ্নের অবস্থার— স্বপ্ন যে স্বপ্ন, তাহা জানিতে পারিবার কোনো উপায় নাই ; পক্ষান্তরে জাগ্রৎস্বপ্নের অবস্থার—স্বপ্নের স্বপ্ন বোঝার, নিকটে ধরা পড়িতে বিলম্ব হয় না । বিজ্ঞান-ব্রাহ্মণ্য ব্যবহারিক সত্যের মধ্যে যে মনোব্রাহ্মণ্য প্রাতিভাসিক সত্য তলে তলে কার্য্য করে, তাহার দিবা একট প্রত্যক্ষ প্রমাণ আছে ; সে প্রমাণ এই :-

চিত্র-বীক্ষণ যন্ত্রের ভূট চোক্তের মধ্য দিয়া তাহার অভ্যন্তরে দৃষ্টি নিক্ষেপ কর—দেখিবে যে, তাহার অন্তর্নিহিত আলো-পটে বাড়ী-ঘর, রাস্তা-ঘাট প্রভৃতি বাহা বাহা চিত্রিত আছে, সমস্তই যেন বাস্তবিক সত্য—এই ভাবের একটি প্রাতিভাসিক দৃষ্ট তোমার চক্ষের সম্মুখে সাক্ষাৎ বিরাজমান । তখন-কার সেই প্রত্যক্ষ পরিদৃশ্যমান বাড়ী-ঘর, রাস্তা-ঘাট, উদ্যান-কানন, গিরি-নদী, যেখানে যেখানে প্রতিভাসিত হইতেছে, সেখানে সেখানে উহাদের বাস্তবিক সত্য সুলেই নাই ; আছে তবে কোথায় ? উহাদের যেথানকার যত কিছু বাস্তবিক সত্য, সমস্তই ব্রহ্মাধিপ্তিত হইখানি চিত্রলিপির মধ্যে সমুদ্র রহিয়াছে । উহাতে প্রমাণ হইতেছে এই যে, জাগ্রৎ-কালের বিজ্ঞান-ব্রাহ্মণ্য মধ্যেই মনোব্রাহ্মণ্য প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে ; আর সেই যে মনোব্রাহ্মণ্য, তাহার প্রাতিভাসিক সত্য বিজ্ঞান-ব্রাহ্মণ্য

ব্যাবহারিক সত্যের দুই পৃষ্ঠের এক পৃষ্ঠ । বুদ্ধির বিষয়ীভূত বিজ্ঞানব্রাহ্মণ্য বস্ত-সকলের দুই পৃষ্ঠে দুইরূপ সত্য সংশ্লিষ্ট থাকারূপে বুদ্ধির পক্ষে দিবা একট স্ববিধা হইয়াছে এই যে, বুদ্ধি ইচ্ছা করিলেই দুইকে পরস্পরের সহিত মিলাইয়া দেখিবার বিবেচনা বস্তুর ব্যাবহারিক সত্য কোন অংশে প্রাতিভাসিক এবং কোন অংশে বাস্তবিক, তাহার যথাসম্ভব ঠিকানা পাইতে পারে ।

(২) ব্যাবহারিক সত্য
ও পিট ।

আমি বেশ বুদ্ধিতে পারিতেছি যে, ঐ খামটার ব্যাবহারিক সত্য উহার বাস্তবিক সত্যতে ভর দিবা পাড়াইয়া আমার ইন্দ্রিয়-ক্ষেত্রে প্রাতিভাসিক সত্য ছড়াইতেছে ; তার সাক্ষী, উহা আমার চক্ষুরিস্ত্রিয়ারে যেত-বর্ণ দুগ্ধাকৃতি এবং স্পন্দেস্ত্রিয়ারে সংঘাত-কারিত্ত, দুই ইন্দ্রিয়ারে এই যে দুইপ্রকার ভোগ-সামগ্রী বাঁটয়া দিতেছে, ত্বরণই সত্য ঐ খামটার প্রাতিভাসিক সত্য । এখানে খামটার বাস্তবিক সত্যের সহিত তাহার ঐ দুইপ্রকার প্রাতিভাসিক সত্যের সম্বন্ধ বাহা দেখিতে পাওয়া বাইতেছে, তাহা বস্ত-স্বপ্নের সম্বন্ধ । এই গেল একটা কথা—আর একটা কথা এই যে, কালে ঐ খামটার গাত্রে শেরালা জমিয়া উহার তত্ত্ব গাত্র মলিন হইয়া বাইতে পারে ; উহা জরা-জীর্ণ হইয়া ভাঙিয়া ধসিয়া পড়িতে পারে ; উহা জলে গলিয়া অদৃষ্ট হইয়া থাকিতে পারে ; সবই হইতে পারে—কিন্তু কিছুই হইতে পারে না বিনা কারণে । বিনা কারণে, অত বড় ঐ খামটার একট ক্ষুদ্র-কৃত্ত বালুকণাও

পার্শ্ব পরিবর্তন করিতে পারে না। অতএব এটা স্থির যে, ঐ খামটার বাস্তবিক সত্তা একদিকে যেমন উহার ভিতরে • বস্তুরূপে স্থির রহিয়াছে, আর এক দিকে তেমনি কারণ-রূপে কার্য্য করিতেছে। এই দ্বৈত বিতীর্ণ কথা, তৃতীয় আর-একটি কথা এই যে, এক-একটি কারণের অগ্রপশ্চাতে অসংখ্য কার্য্য-কারণের তরঙ্গমালা নিরন্তর বঁধে আটকানো রহিয়াছে। এতদ্বারা, এক দিক দিয়া যেমন কারণের ক্রিয়া কার্য্য-পত্র স্রাব্য ভাঁটাটরা চলিতে থাকে, আর এক দিক দিয়া তেমনি কার্য্যের প্রতিক্রিয়া কারণ-পত্রস্রাব্য ব্যতীরা উঠিতে থাকে। তার দাক্ষিণ্য; এক দিকে অনিল-হিমোল স্রোতবর-জলে তরঙ্গ-হিমোল উৎপাদন করে, তরঙ্গ-হিমোল পদ্মবন টলনগারমান করে; আর এক দিকে, পদ্মবন তরঙ্গ-হিমোলকে প্রত্যাবাহিত করে, তরঙ্গ-হিমোল অনিল-হিমোলকে প্রত্যাবাহিত করে। এক দিকে যেমন ঐ খামটার উপরে চতুর্দিক হইতে জল-বায়ু প্রভৃতির ক্রিয়ার পশ্চাতে ক্রিয়া আসিয়া পড়িতেছে, আর এক দিকে তেমনি খামটার দশজি হইতে প্রতিক্রিয়ার পশ্চাতে প্রতিক্রিয়া উদ্বৃত্ত হইয়া জল-বায়ু প্রভৃতির চেয়ের মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইয়া চলিতেছে। কল কথা এই যে, এক দিকে যেমন খামটার বাস্তবিক সত্তাকে লইয়া সমস্ত অগতের একই অখণ্ড বাস্তবিক সত্তা স্থির রহিয়াছে, আর এক দিকে তেমনি

খামটার বাস্তবিক সত্তা; এবং অপরায় সমস্ত বস্তুর বাস্তবিক সত্তা, এই দুই খণ্ড সত্তার পরস্পর বোধব্যাপকতা-বৃত্তে স্রব্ধের মধ্যোক্তমাগভই ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া চলিতেছে। কল কথা এই যে, বিশ্বভুবনের মূলীভূত একই অখণ্ড বাস্তবিক সত্তা স্থির রহিয়াছে বস্তুরূপে; ধাবমান হইতেছে কার্য্য-কারণের প্রবাহ-রূপে; রাশ টানিয়া ধরিয়া রহিয়াছে নিয়তি-রূপে। নিয়তি আর কিছু না—বিধাতা-পুরুষের নিয়ম। এমন অনেক রাজ-নিয়ম আছে, যাহা নিছক বল-শক্তি; যাহা নিয়ম-কর্তার গায়ের জোর যাহা; যাহার ভিতরে কোনো পদার্থ নাই—না আছে প্রেম, না আছে জ্ঞান, না আছে কিছু। কিন্তু বিধাতা-পুরুষের নিয়ম সে শ্রেণীর নিয়ম নহে। বিধাতা-পুরুষের অন্তঃস্থ এবং অব্যর্থ নিয়মের ভিতরে বাহিরে ঠাহার ঐকালিক জ্ঞানের অনিচ্ছা দৃষ্টি এবং বিশ্বব্যাপী প্রেমের অপরাধিত বল এক সঙ্গে কাটিতেছে; এক কণার-তিনি আপনি জাপিতেছেন। আর একটি কথা এই যে, বিধাতা-পুরুষ আপনায় সেই নিয়মের প্রবল-প্রভাপাণিত শক্তিকে আপনায় অসীম ককণার আচ্ছাদনে একগু পুস্কৃত করিয়া রাখিয়াছেন-যে, কেহই তাহা চর্চ-চক্ষে দেখিতে পার না; আর, অগতের লোক তাহা চর্চ-চক্ষে দেখিতে পার না বলিয়া তাহার নাম দিয়াছে অদৃষ্ট। এখানকার যাহা প্রকৃত মন্তব্য কথা—তাহা এই :—

• ভিতর-বাহিরের অনেক-রূপ অর্থ আছে। (১) কলসীর ভিতরে জল; (২) চলমনে বস্তুর ভিতরে গতিশক্তি; (৩) বনের ভিতরে অঁটলকি; উভয়টি নানা অর্থ। এখানেও “ভিতরে”-শব্দের অর্থ সেইরূপ রূপকালগোচরিত।

প্রথমতঃ নিম্নলিখিত জগতের কাণ্ডকারখানা-
প্রবাহ নিয়ন্ত্রিত ও বাধে আটকানো রহি-
য়াছে। দ্বিতীয়তঃ নিয়ন্ত্রিত বাধ এবং কার্য-
কারণের প্রবাহ, দুই-ই বিশ্বত্ববনের সুশীলুত
একই অশুভ বাস্তবিক সত্তার উপরে প্রতিষ্ঠিত
রহিয়াছে। এখন দেখিতে হইবে এট যে,
সেই যে একই অশুভ বাস্তবিক সত্তা, যাঁহা
বিশ্বত্ববনে পুষ্পাঙ্গুররূপে ওতপ্রোত রহি-
য়াছে, তাঁহাই তাগ্রাংকালের বুদ্ধি-বিজ্ঞানের
প্রধানতম ভরসা এবং অবলম্বন-বস্তু।
বিশ্ব-ত্ববনে যদি বাস্তবিক সত্তার গোড়া-
বাঁধুনি না-ধাকিত, তাহা হইলে তর্কচ্ছলে
যদি স্বীকারও করা যায় যে, সে অবস্থায়
জগতের একপ্রকার স্বপ্নবৎ প্রাতিভাসিক
সত্তা সম্ভাবনীয়, তথাপি এটা স্থির যে, সেজন্য
অস্বাভাবিক স্বপ্ন-রাজ্যে বুদ্ধি-বিজ্ঞান মুহূর্ত্ত-
কালের ভ্রমও নাথ। তুলিয়া দাঁড়াইতে
পারিত না। তার সাক্ষী ;—ঐ পানটা যদি
সত্যসত্যই স্বপ্নের ন্যায় শুষ্ক কেবল প্রাতি-
ভাসিক দৃশ্যমাত্র হয়, অর্থাৎ একজন যদি হয়
যে, ঐ পানটার ভিতরে বাস্তবিক সত্তা
নাই—উহার ভূতের ভিতরে বস্তু নাই
কার্যের ভিতরে কারণের হস্ত নাই—উহার
সহিত অপর কোনো বস্তুর কোনোপ্রকার
বাধ্য-বাধকতা নাই ; তাহা হইলে, এখন
যেন ভূমি উহাকে ধাম বসিতেছ—কিন্তু
পর-মুহূর্ত্তে বিনা কারণে উহা যখন হাউই-
বাধি হইয়া হুসু করিয়া উড়িয়া যাইবে,
তখন উহার পাম্ব কোথায় রহিবে ? একটু
পরেই আমরা দেখিতে পাইব যে, বুদ্ধির

কাণ্ডাই হ'লে বাস্তবিক সত্তার সহিত প্রাতি-
ভাসিক সত্তার যোগ-সংঘটন। বাস্তবিক
সত্তাই যদি নাই, তবে বুদ্ধি কাহার সহিত
কাহার যোগ-সংঘটন করিবে ? পূর্বে
বর্ণিয়াছি যে, বুদ্ধির বিশ্বশীলুত বিজ্ঞান-
রাজ্যের সত্তা বাবহারিক সত্তা, আর সেই
বাবহারিক সত্তার এ পিটে প্রাতিভাসিক
সত্তা এবং ও পিটে বাস্তবিক সত্তা, দুই
পিটে দুইরূপ সত্তা সংশ্লিষ্ট রহিয়াছে। অতঃ-
পর ভ্রষ্টবা এই যে, বুদ্ধির কাণ্ডাই হ'লে
জগতের যোগ-সংঘটন। দেখা বা'ক কিরূপ
সে যোগ-সংঘটন।

(৩) বাবহারিক সত্তার দুই পিটের

যোগ-সংঘটন।

“জাগ্রৎকাল মানবের বুদ্ধির প্রাজ্ঞতাব-
কাল” এই কথাটি জনসাধারণকে স্মরণ
করাইয়া দিবার জন্য অভিধানে জাগরিতা-
বস্তুর আর-এক নাম দেওয়া হইয়াছে প্রবুদ্ধ
অবস্থা এবং জাগ্রৎকালের আর-এক নাম
দেওয়া হইয়াছে প্রবোধ-কাল। ফল কথা
এই যে, জাগ্রৎকালের বিজ্ঞান-রাজ্যেই
বুদ্ধি নিজমুখি ধারণ করে। স্বপ্নকালের
মনোরাজ্যে বুদ্ধির খেলা বত কিছু চলিতে
দেখা যায়, সমস্তই খেলা-মাত্র, অভিনয়-মাত্র ;
একপ্রকার ছায়াবাজি ! তা বই, তাহা
প্রকৃত প্রত্যবে বুদ্ধির খেলা নহে। বুদ্ধির
মুখ্যতম কার্য হ'লে বস্তু চেনা। পণ্ডিত
ভাষায়—তাহারই নাম প্রত্যজিজ্ঞান
(recognition)। বেদান্তদশনের “সৌহৃৎ

দেবদত্তঃ” প্রত্যাজ্ঞানের একটি গোড়-
খানা উদাহরণ; তা ছাড়া, ইউরোপীয়
দর্শন-শাস্ত্রের গোড়ার কথা একটি এই যে,
All cognition is recognition অর্থাৎ
জ্ঞান-নামাই প্রত্যাজ্ঞান। এখন, বুদ্ধির
এই যে কথা কার্য প্রত্যাজ্ঞান, তাহার
মুখের প্রতি একই দ্বিরিতিতে তাহার করিয়া
দেখিলেই দেখিতে পাওয়া যাইবে যে, ঐ যে
প্রত্যাজ্ঞান, ও-ই বুদ্ধিমাত্রার এক-
প্রকার জ্ঞান-দেয়ী (Siamese) যমক-সদ্বান।
প্রত্যাজ্ঞানের সমগ্র পরীবে বাস্তবিক
এবং প্রাতিভাসিক এট দুই প্রকার সত্তা
পিতৃশিষ্ঠি-ভাবে সংলগ্ন রহিয়াছে। মনে কর,
পুস্তকখিতে একটা হংস খেলিয়া বেড়াইতেছে
দেখিয়া—আমি বলিলাম “ও-টা রাজহংস”
অর্থাৎ “ঐ হংস রাজহংস”। ‘ঐ হংস রাজ-
হংস’ একপাটি একটমাত্র কথা কিন্তু দুট
থণ্ডে বিভক্ত। সে দুট খণ্ড হচ্ছে— ১) ঐ
হংস এবং (২) রাজহংস। এখন দেখিতে
হইবে এই যে, বাহ্যকে আমি “ঐ হংস”
বলিয়া নির্দেশ করিতেছি। সেই প্রত্যাক
পরিদৃশ্যমান হংসটির সত্তা বাস্তবিক সত্তা;
আর, রাজহংসের একটা ভাব বা আদর্শ, বাহ্য
অনেকদিন হইতে আমার মনের মধ্যে
ঝিরানো রহিয়াছে এবং এক্ষণে বাহ্য আমি
এতাক পরিদৃশ্যমান বাস্তবিক হংসটির উপরে
উপাধিক্ষেপে চাপাইয়া দিতেছি, তাহা আমার
মানস-সর্বোবরের রাজহংস; অতঃপর
তাহার সত্তা প্রাতিভাসিক। এই যে আমি
হংসের একবিধ সত্তার সঙ্গে আর একবিধ
সত্তা জড়িয়া দিলাম—বাস্তবিক সত্তার সঙ্গে

প্রাতিভাসিক সত্তা; ছুঁড়খা: ‘দগদগ’—ইহারও
নাম বুদ্ধির খেলা। শুনি-ডাঙা-খেলা’তে
যেমন শুনি এবং ডাঙার সংশ্লিষ্ট-সংঘটন
অবৈজ্ঞানিক হয়, বুদ্ধির খেলা’তে তেমন
বিচার্য বস্তুর বাস্তবিক সত্তা এবং বিচার্যের
মনোগত দাব্যের প্রাতিভাসিক সত্তা, এই
দুই প্রকার সত্তার যোগ-সংঘটন আবশ্যিক
হয়। উপমাঞ্জে বলা সাহজে পারে যে,
বাস্তবিক সত্তা দক্ষিণ হস্ত; প্রাতিভাসিক
সত্তা বাম হস্ত; বুদ্ধির খেলা করতালি-
প্রদান। জাগ্রতকালের বিজ্ঞান-শাস্ত্রের দুই
হস্ত অগ্রহণ একযোগে কায়া করিতে
থাকে—কাডেই গ্রাণি বাঁধিতে থাকে
অর্থাৎ বুদ্ধির খেলা চলিতে থাকে। আমি
দদি আমার কুটুর্দী-বরের চৌকি চেলায় দিয়া
চকু নুদিত করিয়া ইংগণ ভাবি, তবে সেদ্রপ
ধোমসা ভাবনা স্বপ্নের অনেকটা কাজ-
কাছি বাহ্য, ইহা বুঝই সত্তা; কিন্তু আমি
তখন সত্যসত্যই নিশ্চিত নহি; আমি তখন
দিবা সন্ধ্যা! আমি এখন বেশ বুঝিতে
পারিতেছি যে, আমার পরীক্ষার বাস্তবিক
সত্তার সঙ্গে আমার আগ্রহ-চৌকির বাস্তবিক
সত্তার যোগ রহিয়াছে; আগ্রহ-চৌকির
বাস্তবিক সত্তার সঙ্গে কুটুর্দী-বরের বাস্তবিক
সত্তার যোগ রহিয়াছে; কুটুর্দী-বরের বাস্তবিক
সত্তার সঙ্গে বাড়ীর ভিত্তিমূলের বাস্তবিক
সত্তার যোগ রহিয়াছে; বাড়ীর ভিত্তিমূলের
বাস্তবিক সত্তার সঙ্গে কলিকাতা-পুরীর
বাস্তবিক সত্তার যোগ রহিয়াছে; কলিকাতা-
পুরীর বাস্তবিক সত্তার সঙ্গে পূর্ব-সমুদ্রের
বাস্তবিক সত্তার যোগ রহিয়াছে; পূর্ব-
সমুদ্রের বাস্তবিক সত্তার সঙ্গে মহাসমুদ্রের

বাস্তবিক সত্যের যোগ রহিয়াছে ; নহা-
সমুদ্রের বাস্তবিক সত্যের মধ্যে ইংলণ্ডের
বাস্তবিক সত্যের যোগ রহিয়াছে । কিন্তু
এই যে বাস্তবিক সত্যের অংশা শ্রেণি-
পর্যায়, ইহার গোড়ার কাহিনী একরকম
কৃত্রিম ; কি ? না, আমার আপনাকে শুধু
ধরিয়া এই কুটুরী-ঘরের বাস্তবিক সত্য ;
কেন না, তাহাই কেবল সাক্ষাৎসংগ্রে আমার
জ্ঞানে প্রকাশ পাইতেছে । তথাহীত আর
যাহা কিছু আমার চিন্তার স্রোতে ভাসিয়া
বেড়াইতেছে, সমস্তেরই সত্য প্রাতিভাসিক
সত্য । এখন কথা হ'চ্ছে এই যে, সেই
সকল চিন্তা-চর বস্তু-সকলের প্রাতিভাসিক
সত্যের সহিত আমার এই কুটুরী-ঘরের
বাস্তবিক সত্যের সাক্ষাৎসংগ্রে বিষয়
কোনোপ্রকার সম্পর্ক দৃষ্ট হইতেছে না
বটে, কিন্তু তা বলিয়া, আমার বুদ্ধি পরোক্ষ-
সংগ্রে দুয়ের মধ্যে সম্পর্ক-পাতানো-কাণ্ডের
ঘটকতা করিতে দ্বন্দ্ব থাকিতে পারে না ।
আমার বুদ্ধির নিকটে একথা অবিস্মিত নাই
যে, আমার চিন্তা-চর প্রাতিভাসিক ইংলণ্ডের
গোড়ার কথা হ'চ্ছে বাস্তবিক ইংলণ্ড ;
আর সেই বাস্তবিক ইংলণ্ড হইতে আমার
এই কৃত্রিম কুটুরী-ঘর পর্যন্ত বাস্তবিক সত্যের
যোগ-স্রোত নিরবচ্ছিন্নে চলিয়া আসিয়াছে ।
আমার বুদ্ধি এটা বেশ জ্ঞানে যে, এই
প্রত্যক্ষ পরিদৃশ্যমান কুটুরী-ঘরের বাস্তবিক
সত্য এবং সমস্ত অগতের বাস্তবিক সত্য,
মূলে একই বাস্তবিক সত্য । ইহা জানিয়া
আমার বুদ্ধি করিতেছে কি ? না, প্রথমত
আমার এই প্রত্যক্ষ পরিদৃশ্যমান কুটুরী-
ঘরের বাস্তবিক সত্যেরই সর্বজনগতের

অর্থও এবং নিরবচ্ছিন্ন বাস্তবিক সত্য উপ-
লব্ধি করিতেছে ; দ্বিতীয়ত আমার এই
কৃত্রিম কুটুরী-ঘর বাস্তবিক সত্যেরই বিক-
ল্পবনের বাস্তবিক সত্য হতে পাইয়া সেই
নিরবচ্ছিন্ন অর্থও বাস্তবিক সত্যের যোগে
আমার চিন্তাচর ইংলণ্ডের প্রাতিভাসিক
সত্যের সহিত বাস্তবিক সত্য ছুড়িয়া দিতেছে ।
অতএব জাগ্রৎকালে আমি আমার মনোরথ-
বিশ্বাসকে প্রাতিভাসিক সত্যের আশ্রয়-মার্গে
যতই উত্তেজিত করাই না কেন—
তাহার গুণি বাধা রহিয়াছে বাস্তবিক সত্যের
স্বদৃঢ় ভিত্তিমূলে যদিও সে ভিত্তিমূল
দেখিতে অতি সংসারামা কৃত্রিম । সে ভিত্তি-
মূল কি ? না, আমার আপনার এবং আমার
সন্নিধানবর্তী প্রত্যক্ষ পরিদৃশ্যমান বিষয়-
সকলের বাস্তবিক সত্য । এইটিকে কেবল
এখানে দেখা উচিত যে, বাস্তবিক সত্যের
সাক্ষাৎকার-লাভ আমি যে-কোনো স্থানেই
করি না কেন—ভিন্ন-পরিমাণ স্থানেই
তাহার সাক্ষাৎ লাভ করি, আর পরন্ত-
পরিমাণ স্থানেই তাহার সাক্ষাৎ লাভ করি,
যে-কোনো স্থানেই তাহার সাক্ষাৎকার লাভ
করি না কেন, সেই স্থান হইতেই তাহা
নিখিলবিশ্বময় নিরবচ্ছিন্নে পরিব্যাপ্ত ।

অনতিপূর্বে আমরা দেখিয়াছি যে,
জাগ্রৎকালে বাস্তবিক এবং প্রাতিভাসিক,
এই দুইরূপ সত্য একযোগে কার্য করে
বলিয়া বুদ্ধি দীর্ঘমত খেলিতে পারে । স্বপ্ন-
কালে মনেরই কেবল দ্বার খোলা থাকে—
বুদ্ধির দ্বারে কপাট পড়িয়া যায় । স্বপ্নের
মনোবাজ্যে দ্বারের দ্বারা কিছু সত্য, সমস্তই
প্রাতিভাসিক সত্য । পূর্বে এক স্থানে

উপমাচ্ছলে বলিয়াছি যে, বাস্তবিক সত্তা দক্ষিণ হস্ত, প্রাতিভাসিক সত্তা বাম চত্রে এবং বুদ্ধির খেলা কস্তাণ্ডি-প্রদান। অগ্নের অর্জুন-হীন পরীরে একাকী কেবল বাম হস্তই কার্য্য করে—প্রাতিভাসিক সত্তাই কার্য্য করে—কাজেই তালি বাজে না অর্থাৎ বুদ্ধি খেলে না। অগ্নাবহার সিংহাস্ন-মৌলার আমলের মৃত ব্যক্তি জীবিতের অভিনয় করিয়া দর্শকের চক্ষের সমুখ বিরাট অনার্য্যাসে পার পাইয়া যায়; দর্শক ভুল-ক্রমেও একবার আপনাত্মক মনকে জিজ্ঞাসা করে না যে, এ যাহা দেখিতেছি, ইহা বাস্তবিক কি অবাস্তবিক। অতএব পূর্বে যে কথা বলিয়াছি, তাহাই ঠিক; সে কথা এই যে, অগ্নি-কালে বুদ্ধির খেলা যত কিছু দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা খেলা-নাট্য, অভিনয়-নাট্য; —একপ্রকার ছায়াবাজি; তা বই, তাহা প্রকৃত প্রত্যয়ে বুদ্ধির খেলা নহে। তবেই হইতেছে যে, বুদ্ধি জাগ্রৎ-কালের বিজ্ঞান-রাগেরই অধিপতি। স্বপ্নকালের মনোরাগের অধিপতি মন। অতঃপর জিজ্ঞাস্য এই যে, স্বপ্নকালের নিত্যকতা-রাগের * অধিপতি কে? ইহার উত্তর এই যে, প্রাণ। স্বপ্নকালের নিত্যকতা-রাগে কার্য্য নিম্নার হইতে দেখা যায় দুইটি মাত্র; কি-হইটি? না, প্রাণ-ক্রিয়ার ব্যতিক্রম-সংশোধন এবং পরীরের স্বাভাষাধন।

অতঃপর স্রষ্টব্য এই যে, স্বপ্ন-কালের

নকল-বুদ্ধি-ক্রিয়াতে যেমন জাগ্রৎকালের আলপ-বুদ্ধি-ক্রিয়ার প্রতিভাস বা ছায়া বা গুহ সংস্কৃত থাকে, স্বপ্ন-কালের প্রাণ-ক্রিয়াতে তেমনি মনঃক্রিয়া এবং বুদ্ধি-ক্রিয়া, দুয়েরই ছায়া সংক্রামিত হয়। স্বপ্ন-কালের প্রাণ-ক্রিয়াতে মনের ছায়া পড়াতে অল্প ব্যক্তির নিদ্রা-স্থলের উপভোগ হয়; আর, সেই নিদ্রা-স্থলের উপরে বুদ্ধির ছায়া পড়াতে স্বপ্ন ব্যক্তির জ্ঞানে নিদ্রা-স্থলের অমৃতত্ব হয়। যাহাট হউক না কেন, স্বপ্ন-কালের জ্ঞান জাগ্রৎকালের বুদ্ধির ন্যায় জাগ্রৎ জীবন্ত জ্ঞান নহে, ইহা দেখিতেই পাওয়া যাইতেছে। সে জ্ঞান তবে কিরূপ জ্ঞান? সে জ্ঞান যে কিরূপ জ্ঞান, তাহা বলিতেছি—প্রবণ কর;—

একদম ঘটনা কিছুই বিচিত্র নহে যে, একজন কবি গড়ের নাতির তরুণ্যে বসিয়া কবিতা-রচনা-কার্য্যে একদম তন্ময়-ভাবে লিপ্ত রহিয়াছেন এবং স্বরচিত-কবিতা-রস-মাধুর্য্যে একদম অগাধ নিমগ্ন রহিয়াছেন যে, তাঁহার সমুখ দিয়া একদল সিপাহী-সৈন্য রণবাণ্য করিতে করিতে চলিয়া গেল—তাঁহা তিনি জানিতেও পারিলেন না। একদম অবসার, কবির জ্ঞান কবিতা-রচনা-কার্য্যে স্তব্ধপুর নিমগ্ন থাকিতে আর কোনো দিকেই যে তাহার ভ্রমের নাই, তাহা বুঝিতেই পারা যাইতেছে। কবিতা-রচনা-কালে কবির জ্ঞান যেমন অনন্ত-মানসে সেই কার্য্যেই নিমগ্ন থাকে—অথবা যেমন

* শুভতা-পদের দুই অর্থ তথ্য-তাব। নিঃশকতা, নিত্যকতা-পদের, যৌগ অর্থ মাত্র। নিত্যকতা-পদের দুই অর্থ হইবে অমল্য প্রাপ্তি।

দুর্নীতি-কবির শাপ-প্রদানের অব্যবহিত পূর্ব্বকণে শকুন্তলার জ্ঞান ওষাৎ রাক্ষার ধ্যানে নিমগ্ন ছিল—সুস্থপ্তি-কালে নিমিত্ত ব্যক্তির জ্ঞান তেমনি অতীব একটি সরস কার্য্যে নিমগ্ন থাকে ; এমন ভরপুর নিমগ্ন থাকে যে, আর কোনো দিকেই তাহার দৃষ্টিপাত করিবার সামর্থ্য থাকে না । সে কার্য্য কি ? না, প্রাণের কল-ম্যারামতি-কার্য্য । শকুন্তলা যেমন হুহুস্ব রাধাকে ভাল বাসিতেন, বুদ্ধি তেমনি প্রাণকে ভাল বাসে । সুস্থপ্তি-কালে তাই নিমিত্ত ব্যক্তির বুদ্ধি প্রাণের কল-ম্যারামতি-কার্য্যে একান্তঃকরণে নিমগ্ন থাকে । ঐ কার্য্যটি যতক্ষণ পর্য্যন্ত নিদ্রাপ্রববে চণিতে থাকে, ততক্ষণ পর্য্যন্ত সুস্থপ্তির আরাম অটুট থাকে । ঐ কার্য্যটি সাগর হইলেই নিদ্রাভ্রুথের ভোগ-মাত্রা পর্য্যাপ্তি লাভ করে ; ভোগ-মাত্রা পূর্ণ হইলেই নিদ্রা-ভঙ্গ হয় ।

এতক্ষণ ধরিয়া যে বিষয়ের আলোচনা করা হইল, তাহাতে জীবাত্মার জ্ঞানের তিন কালের তিন অবস্থার প্রভেদ বুঝিতে পারি-

বার পথ অনেকটা পরিষ্কৃত হইয়াছে, এক্ষণ ভরসা হয় । এখন আমরা এটা অন্তত বুঝিতে পারিতেছি যে,—

(১) সুস্থপ্তি-কালের জ্ঞান প্রাণ-ক্রিয়ার ব্যতিক্রম-সংশোধন-কার্য্যে ব্যাপৃত থাকে এবং তত্ক্ষণিত আমল-ভোগে নিমগ্ন থাকে ।

(২) স্বপ্নকালের জ্ঞান মনোরাজ্যের প্রাতিভাসিক সত্তাতে ভ্রাম্যমাণ হইতে থাকে ।

(৩) জাগ্রৎকালের জ্ঞান, বিজ্ঞান-রাজ্যের ব্যবহারিক সত্তার চুই পৃষ্ঠের অপর দুইভূপ সত্তার, ইহার সঙ্গে উহার যোগ-সংঘটন-কার্য্যে ব্যাপৃত থাকে ।

অতঃপর তিন কালের জ্ঞানের তিন অবস্থা একসঙ্গে স্মৃতি পাইবার সময় কোথায় কি ভাবে স্মৃতি পায়, এবং পৃথক্ পৃথক্ ভাবে স্মৃতি পাইবার সময় কোথায় কোথায় কি-কি-ভাবে পৃথক্ পৃথক্ হইয়া ছড়াইয়া পড়ে, ইত্যাদি কতকগুলি বিষয়ের আলোচনার প্রবৃত্ত হওয়া যাইবে । আশিকের মত এই অবধিই ভাল ।

শ্রীবিজ্ঞেন্দ্রনাথ ঠাকুর ।

আমার সম্পাদকী ।

আমিও একদিন সম্পাদক হইয়াছিলাম, সে খুঁটী আমার মাপ করিবেন। আমার ধারণা ছিল, সভাপতি এবং সম্পাদক হওয়া সহজ। পত্রিকার দণ্ডটাই খাড়া হইয়া দাঁড়াইয়া থাকে, কাগড়ের চুইয়া তাহার সর্বোচ্চে উড়িয়া গাং করিয়া তোলে— তাহার ভার নাই, মৃণ্য যৎসামান্য, কিন্তু সে-ই ত বাতাসে ফুৎকাহাত ; --বড় আশা করিয়াছিলাম, লেখকদের শিরঃস্থানে ভার করিয়া পতন-নিম্নাদে পাঠকসমাজের চূড়ার উপর উজ্জীৱনান হইব। কিন্তু তখন লেখকজাতিকে চিনি নাই। চাপকা যদি সম্পাদক হইতেন, তবে তাহার বিখ্যাত মোকের মধ্যে “রাজকুলেহু”-শব্দের পূর্বে “লেখকেহু” বসাইয়া দিতেন। এই লেখক-দের সম্বন্ধে ভাবী ও বর্তমান সম্পাদকগণকে সতর্ক করিয়া দিবার জন্য আমার এই কাহিনীর অবতারণা। এই লেখাটি প্রকাশ করিয়া সম্পাদকসমাজের স্বজাতিহিতৈষিতার পরিচয় দিবেন।

সবে-মাত্র কালেক ছাড়িয়াছি, তখন বেহুড়য়া উদ্যম, বুকতরা আশা, লুপহ-ভরা স্বদেশপ্রেম! তখন অর্ধাহুৱাগ অপেক্ষা বিদ্যাহুৱাগ প্রবল, বিদ্যাহুৱাগ অপেক্ষা যশোলিপা প্রথরতর। আমার স্বদেশপ্রেম, বিদ্যাহুৱাগ ও যশোলিপা, এই “ত্ৰাহ-ল্লশ্শে”র সংমিশ্রণে অচিরেই এক বাঙলা মাসিক পত্রিকার জন্ম হইল। তার নান

রাবিলাম—“উকীপনা।” ভবিষ্যতে আদরের পুত্রের অনশন ঘটবার সম্ভাবনা দাঁড়াইলেও, যেমন জনকবিশেষে পুত্রের অগ্রাশনে অত্যধিক ব্যার করেন, আমিও তেমনি উকীপনার অহুঠানে অকাতরে অকৃত্তিচিতে অর্ধব্যার করিলাম। আশাতীত আশা পাইলাম! বরষায় বহুৱের মন যেমন নাচিয়া উঠে, ভরষায় এ ক্ষুত্রের মনও তেমনি নাচিয়া উঠিল। আরও মাসিকপত্র যে না ছিল, তাহা নহে কিন্তু আমি বড় বড় লেখকের পৃষ্ঠপোষিত—

“আমি কি ডরাই সবি ভিখারী রাখবে?”

আমার কাগজ চলিতে আরম্ভ করিল, বিজ্ঞাপনের হুন্দুতি বাড়াইতে বাড়াইতে, প্রাশংসাপত্রের ভেরীনিম্নাদ করিতে করিতে, আমার কাগজ হহ চলিতে লাগিল। পূর্ণিমার চাঁদ যেমন দিনে দিনে বাড়়ে, আমার সোণার চাঁদ গ্রাহকও তেমনি দিনে দিনে বাড়়িতে লাগিল। কিন্তু বোলকলার মধ্যে অধিকাংশ কলাই যে লক্ষ্যের মুলোর গ্রাহক, সে কথা স্বীকার করিতে হইবে। চাঁদেও কলঙ্ক থাকে—কিন্তু এত কলঙ্ক থাকিলে চাঁদনীর অংশ অত্যন্ত কম পড়ে—আমার ভাণ্ডে তাই ঘটিল—রক্তচক্ষুটা বড় সামান্য। সম্পাদক-চকোরের পেট যে ভরে না। কিন্তু তাতে কি? আমার বে মূল উদ্দেশ্য পাঠকসংগ্রহ, তা ত সিদ্ধ হইল। বিশেষত আমার স্বদেশাহুৱাগে কোন

বার্ধের পক্ষ ছিল না। প্রতিদানের আশা রাখিলে প্রেম পাড় হয় না, তাও আমার তখন জানা ছিল। তখন জামিনতায়, ঘরের খাইয়া যদি বনের মহিষ তাড়াইতে না পারিলাম, তবে দিক্ আমার বনে প্রেমরসে। কিন্তু তখন বৃষ্টি নাই যে, শতদিক্ ওই রক্ত-চক্রবর্ত্তে ! সে পোনঃপুনিক দশমিকের মত বিচাগে বাড়ে না।

“বতাই করিবে দান তত বাবে বেড়ে”

বিদায় মত এ উদারতাও তার নাই। দুইট বৎসর অতীত হইতে না হইতে

আমার পূর্ব বাকস

শুভ করিয়া

কণি স্থনি স্থনি -

গেল সে চলিয়া।

ওগো এবি সে নিতুর

দেখে না কিরিয়া ॥

আমি—

কত তারে সাধি

দিবানিশি কাদি

চোখে বহে দায় দরিয়া।

তবু, সে তো রে আসে না কিরিয়া ॥

বিপন্ন হইয়া গ্রাহকমহাশয়দের শ্রবণ-পন্ন হইলাম। বোধ হয়, অর্থ অনর্থের মূল ভাবিরাই অনেক আর্থিক কথার কর্পণাত করিলেন না, কেহ কেহ বাহা উত্তর দিলেন, তাহার ভাবার্থ—

ধন দিয়ে মন যদি সেই সে তুমিতে হ'লো।

বাংলা মাসিক প'ড়ে তবে কিবা কল বলো ॥

আমার নামজানা লেখকগণও এই সময় আমার প্রতি একটু বেশি অহুগ্রহ আরম্ভ করিলেন। যিনি বড় দার্শনিক বলিয়া খ্যাত,

তিনি লিখিতে লাগিলেন,—কবিতা; সমালোচক ‘রহতে’ ব্রতী হইলেন; কবি ধরিলেন,—রাজনীতি; ঔপন্যাসিক প্ররক্ত-বিদের আগন লইলেন; আর ঐতিহাসিক মন দিলেন,—“কঠোপনিষদে।”

এই সকল প্রবন্ধ কাগজে বাহির হওয়ার পর লেখার প্রকৃত রূপ আবাদ করিতে না পারিয়া, সমালোচকগণ কাঁচালের আমলস্ব বলিয়া এগুলিকে বিদ্রূপ করিতে লাগিলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে আমাকেও দু দশ কথা ভনাইতে ছাড়িলেন না। এ প্রেমের প্রবন্ধের সকলগুলি আমি না ছাপিয়া চাপিয়া রাখিতাম, অবশ্য এগুলি যে প্রকাশের অযোগ্য মনে করিতেছি, তাহা লেখকদের তখন বলিতাম না,

কিন্তু,—

“এ সকল রহে না গোপনে

বন্ধুর্গে প্রবেশিলে

প্রকাশ পায় তা জনে জনে।”

বাহার প্রবন্ধ প্রকাশ করিতে বিলম্ব হয়, তিনিই চটিতে আরম্ভ করেন, প্রবন্ধ কেন্দ্র চাহেন। একদিন সহসা দেখিলাম, আমারি কাগজে একখানি মাসিক পত্রিকার বিজ্ঞাপন মহাধুমধামে বাহির হইয়াছে। আমার অধিকাংশ লেখকই সে কাগজের লেখকশ্রেণীভুক্ত হইয়াছেন, তখন আমার মনের ভাব যে কি-প্রকার হইয়াছিল, তাহা চণ্ডীদাসের রাধিকার ভাষায় বলিতে গেলে,—

“সই কেমনে ধরিব দিয়া !

আমার বঁধুয়া আন বাড়ী বার

আমার আড়িনা দিয়া !

সে বধু লেখক, না চার ফিরিয়া
এমতি করিল কে ?

আমার অন্তর যেনন করিছে,
তেমনি হউক সে !

যাহার লাগিয়া, বাছাই তামিহ
লোকে অপবন কর, -

সেই গুণনিধি, আমারে ছাড়িয়া
আর আনি কার হয় !

সম্পাদক হয়ে, লেখক ভাঙারে
এমতি করিল কে ?

আমার পরাণ, যেমতি করিছে
সেমতি হউক সে ।”

অনেক লেখক আবার এতদূর কোন
কারণ না ঘটতেই নৃতনে মন বিলেন !
হার এই সব লেখকদের নিকট আমরা
সম্পাদকগণ বৃদ্ধি হবিবোল মালদা *—
“নিতুই নব ।” ইহাদের মধ্যে অনেকেই
কাগজ বাহির করিবার সময় আমার বিশেষ
উৎসাহ দিয়াছিলেন—এখন ইহাদের সে
আশ্বাসবাণী কোথায় রহিল ?

“বে মনেতে নাচাইলে

সে মন এখন রইল কোথা ?

ভুতুরের মূল হলি কি রে

বেথা পাওয়া কঠিন কথা ।”

বৃদ্ধি—

“সে কাল গেল বৈরা বধু

সে কাল গেল বৈরা ।”

একদিন এই প্রেয়ীর একজন লেখককে
পথে ঘেঁষিতে পাইলাম। তিনি তখন আর
এক সম্পাদকের আকিসে প্রবেশ করিতে

উদাত, নব সম্পাদকমহাশয়ও তাঁহার সঙ্গে।
আমি সখিনয় নমস্কার-নিবেদন করিলাম—
“ভাল ত ?—আর বে বেথা পাই না ।” যুখে
এইটুকু বলিলাম, কিন্তু আমার কণ্ঠস্ব-
দৃষ্টিতে প্রকাশ করিতেছিল,—

“এই পথে নিতি, কর গভীরতি,

নুপুরের ধ্বনি তনি।

নব-সঙ্গে বাস, আমারে নৈরাশ,

আনি বন্ধি একাকিনী ॥

বধু আজ না ছাড়িয়া দিব ।”

লেখক-মহাশয় বাপারটা বৃদ্ধিরা একটু
অপ্রতিভ হইলেন, যেন পলাইতে পারিলে
বাচেন ! ভাবটা,—

“চন্দ্রাবলি, আজি ছাড়ি দেহ মোরে,

ঐবাম ডাকিতে, যাব তার কাছে,

এই নিবেদন তোরে ।”

“আচ্ছা দেখা হবে” বলিয়া তিনি পাশ
ফটাইলেন, আর ভাবিতে ভাবিতে চলি-
লাম,—

“লেখক চপলভাগি

কোথা নাহি থির রহ।

বে তারে অধিক তোবে

তারে সে লেখা ভোগার !”

তা যে কারণেই হোক, দিনদিন আমার
বাঁধা লেখকগণের মধ্যে অনেকেরই অগ্রহে
বঞ্চিত হইতে লাগিলাম ! আমার সময়
খারাপ পড়িয়াছিল,—আনি না, একদিন কি
চর্তু হইল—

“ভাতিঃ মল্লযথ আপনায় হাতে !”

উদীপনা-সম্পাদনে যিনি আমার প্রধান

* ইহাতে যেন এ কথা ভেত না কুন্ঠেন যে, এই সকল লেখক জননীস্বপ্না বসন্তাণাণা জাতি নিত্য করিয়া
পাঠেন।

সহায় ছিলেন, তাঁহার কোন একটা লেখার
ব্যক্তিগত আক্রমণের কিছু বাড়াবাড়ি
বেখিয়া, একটু বাবদাদ দিয়াছিলাম ।
আরে বাপু! —

“কে বিল আগুন হাত
কে ধরিল ফটী !”

সত্যি তখন আমার উদ্দীপনার—

“পঞ্চম মঙ্গলে আর রক্তপত্ন শনি !”

তখন বুদ্ধি নাট, কিন্তু এখন বুদ্ধিগাছি,—
সাহস থাকে, সহ্যও থাকে, পরমায়ু থাকে,
“ভিন্নরুলের চাক্রে” হাত দিও, কিন্তু লেখক
বলিয়া বাহাদুর খ্যাতি আছে, অন্তত
কোন নামজাদা মাসিক পত্রিকায় ঠিকিপুরে
বাহাদুর ওই একটা লেখাও বাহির
হইয়াছে, সম্পাদক হইয়া তাঁহাদের লেখায়
হাত দিও না, দিও না, দিও না ! তাহা হইলে
তাঁহাদের রোষ সাধারণ শক্তিশেলের মত
তোমার বুক বিধিবে, ইন্ডের বহুর মত
তোমার মাথা পড়িবে, বিফুর জলধনের মত
তোমার শক্তি খণ্ডবিখণ্ড করিয়া দিবে ।
কিন্তু বলিতেছিলাম, এতদিনে আমি
আপনার পারে আপনি কুঠার বসাইলাম ।
বাঁহা লেখায় আমার “উদ্দীপনা” উদ্দীপিত
হইতেছিল, তাহারি জোখে এখন বুদ্ধি
“উদ্দীপনা” নষ্ট হয় । বুদ্ধিলাম, আলো যে
দেয়, পোড়াইতেও সেই পারে, কিন্তু —

“এতদিন বুদ্ধি নাই, এখন কি হবে বুকে !”
এখন যে,—

“আপন করমদোবে

সুধার সমুদ্র, ঠৈবে শুকাইল,

তিয়াসে পরাণ শোখে !”

বলিতে বুক কাটয়া যায়, আমার সেই

লেখকচূড়ামনি অজ্ঞ কাগজে প্রবন্ধ বিতে
লাগিলেন । এতদিনে

“হা শব্দ তুমিও বাম !”

তা যাই হোক, আমি তাঁহার আশা ত্যাগ
করিলাম না, অনেক সাধাসাধি, কাঁধাকাঁধি,
হাঁটাহাঁটি করিলাম, কিন্তু আমার লেখক-
প্রবন্ধের একই কপা,—

“যাও যাও মিছে সেধ” না,

তাড়িলে সকলি মিলে

মন নিলে না ।”

না মিলুক, আমি কিন্তু একদিন “না-
ছোড়-বাঁশা” চটয়া দরিলাম ।

“আমার কি অপরাধ, তাই আর আমার
কাগজে লেখেন না !”

উঃ । মনে করিয়া দেখ !

আমি :—তাঁহার ভক্ত কতবার ক্ষমা
চাহিয়াছি, এক অপরাধের কি মার্জনা হয়
না ?

উঃ । এখন সেজন্য সন্ত অপরাধ হইবে ।

এখন তুমি প্রবীণ সম্পাদক ।

আমি :—তা নয়, এবার আমি কি স্থির
করিয়াছি, শুনুন । আপনার অভিশ্রায়
অনুগারেই এখন সমস্ত প্রবন্ধ নির্বাসিত
হইবে,—উদ্দীপনা আপনারই ।

উঃ :—এখন আর সে কথা সাজে না ।
আমার উদ্দীপনা হইলে কি এমনভর-ঘটে !
তোমার আমার কি সন্দ ! আমি তোমার
প্রবন্ধ দিব, তুমি ছাপিবে । আমার লেখা
বাদ দিয়া কাটিয়া হাঁটিয়া ছাপিবে, ইহা আমি
সহ করিব, এ সন্দ নহে ।

আমি :—উদ্দীপনা আপনার আশ্রিত—
প্রতিপালিত, আপনার প্রবন্ধের ভিখারী !

আমার কমা করুন, আমি অবোধ, না বুঝি কি করিয়াছি,—আমার কমা করুন ।

তথাপি তিনি নিরুত্তর । আমি আবার বলিলাম, “কি বলেন ?”

উঃ।—আমি তোমার সহিত সংশ্লষ ত্যাগ করিব ।

বলিয়া তিনি গমনোন্মত্ত হইলেন ।

এবার বড় কষ্ট হইল, চক্ষু ছলছল করিতেছিল, হৃদয়ে চক্ষের জল ফিরাইলাম ; সন্নিবেহ, অধিকম্পিত কণ্ঠে, বলিতে লাগিলাম, “তবে যাও, পার লিখিও না । বিনাপরোধে আমার ত্যাগ করিতে হয়, কর, কিন্তু মনে রাখিও, উপরে দেবতা আছেন । মনে রাখিও, একদিন আমার ওত তোমার অহুত্যাগ করিতে চাইবে । মনে রাখিও, একদিন তুমি পুণ্ড্রিবে, কোন্ সম্পাদক আমার মত ভাল-মন্দ-নিষিদ্ধারে তোমার সকল প্রবন্ধ চাপে ! দেবতা সাক্ষী, যদি তোমার প্রতি আমার প্রকা পক্ষে, তবে তুমি আমার লিখিবে, আমি সেট আশার কাগজ রাখিব । এখন যাও, বলিতে ইচ্ছা হয়, বল, আর লিখিব না,—কিন্তু আমি বলিতেছি, আমার আদিবে—আবার

লিখিবে । তুমি যাও, আমার হৃৎ নাই । তুমি উদ্দীপনারই, অত্র মাসিকের নও ।”

এই বলিয়া আমি ভক্তিতাবে তাঁকে নমস্কার করিয়া ফিরিলাম । গৃহের দ্বার বন্ধ করিয়া দ্রুতকরে মনে মনে উচ্চস্বরে অথচ অক্ষুটবাক্যে দেবতাদিগকে বিজ্ঞাপ্য করিতে লাগিলাম—“কেহ আমাকে বলিয়া যাও, আমার কি দোষে এই পাতাইল-বৎসর-মাত্র বয়সে, এমন অলম্ব্য হ্রস্বা ঘটিল ! আমার অর্থ বিমট হইয়াছে, আমার লেখকেরা ত্যাগ করিল, আমার পাতাইল-বৎসর-মাত্র বয়স, আমি এই বয়সে “উদ্দীপনা” ভিন্ন আর কিছু ভাল বাসি নাই, লেখকের মনো-রঞ্জনব্রত ভিন্ন ইহলোকে আর কিছু করি নাই, করিতে লিখি নাই, তবু আমি আজ নিরাশ হইলাম কেন ?”

কাহিনী কাটিয়া গিয়াছে করিলাম, দেবতা নিত্যই নিষ্ঠুর, যখন দেবতা নিষ্ঠুর, তখন লেখক বা গ্রাহক আর কি করিবে । কাহিনী চিস্তিরা শেষ কাগজ উঠাইয়া ধিলাম, সম্পাদকগণ হইতে বালাম পাইলাম !

কিন্তু—

“এখনও এখনও কেন—!”

শ্রীপ্রেমবল্লভ গুপ্ত ।

গীতনক্ষত্রী ।

প্রেম, তুমি জন্মে নিয়ে নর নিল মোর
 সঙ্গীতের বেগে !
 'অমৃতরস' তাই বাজিছে বীণার
 নিমেবে নিমেবে ।
 তুমিও ছাড়নি মোরে, আমিও ছাড়িনি,
 প্রেমেরি এ দ্বারা,
 হৃদয়ে বেড়াই মেটে চুপে অঙ্গনে
 ভাবে মাতোয়ারা !
 তরঙ্গিত ধ্বনিসিক্ত ত্রোলে তল হ'তে
 রম্য নৃত্যতি,
 বেগে ওঠে নাগরাজ্যে বেউলে দেউলে
 মঙ্গল আরাতি ।
 তুমি আর আমি করি কি যে সুধাপান
 কেহ নাহি জানে ;
 পরপারে এ সংসারে দুখ চিতা অগ্নে
 ভাবের প্রাণনে !
 বিধের প্রাণপতলে আলোকে অঁধারে
 প্রভাতের বেলা
 জাগনি কবির গান, বাঁশি নিয়ে শুধু
 ছিল ছেলেখেলা ।
 হেনকালে কুঞ্জে কুঞ্জে উঠিল ধ্বনিয়া
 শুভ্রচিত্ত স্বব ;
 কোকিলা উতলা হ'ল গুনি কোকিলের
 মত কুহরব ।
 সেই মধোংসবে মাতি স্তম্ভিত প্রাণে
 তরুণ উজ্জ্বলে
 সূক্ত মন্দিরের দ্বার ভগ্ন মুক্ত করি
 চিহ্ন কার মাথো ?

সে যে তুমি,—যে আগ্রহ প্রণয়বতী,
 এলে মোর ঘরে
 বিকাশি' এ দ্বিগুণ তব সুস্বাদ
 পারপত্রতরে !
 সাধকের সুধাযন্ত্রে রস নিলু বুঝি
 প্রীতির আধার ?
 করুণাকোমল অঁধি, ওঠে শান্ত হাসি,
 কণ্ঠে গীতধার !
 কবে জেনেছিলে মোর নিচু বেদনা
 তব লাগি' প্রিয়া ?
 তাই মধুসূক্তির পলিলে সেদিন
 পূর্ণ করি দিয়া !
 প্রথম নিশনমোহে চিত্ত বধে দৌছে
 যৌন মৃগ নৃক,
 চারিপাশে কোতুংহী প্রকৃতি কেবল
 ছিল বাগদক ।
 সে শুধু গিগিগা বনি মোদের কাহিনী
 সহস্র রূপকে
 বনে বনে, কূলে কূলে, গগনে গগনে,
 মেঘের স্তবকে ।
 রটিল নবীন ছন্দে আনন্দ-ধ্বনি
 মনে পড়ে বালা !
 সঙ্গীতের পুরস্কার দিলে মোর পলে
 তব কর্ণমালা !
 চক্ষু ভরি' এল নেশা, কণ্ঠ ভরি' তৃষা,
 বক্ষ ভরি' তাপ,
 বাঁশীর রঙ্গে, রঙ্গে, ভরিয়া উঠিল
 প্রেমের গলাপ !
 শ্রীপ্রমথনাথ রায় চৌধুরী ।

অধ্যাপক বসুর নবাবিষ্কার।

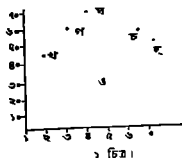


কলিকাতা-সহরের দৈনন্দিন সূতাসংখ্যা
অত্যন্ত ধবনের কাগজে বাহির হয়।
সাতদিনের সংবাদ একত্র করিয়া এইরূপ
তালিকা প্রস্তুত করা হইতে পারে :—

তারিখ।	সূতাসংখ্যা।
১লা বৈশাখ	৫০
২রা	৪৫
৩রা	৬২
৪ঠা	৭০
৫ই	৩৫
৬ই	৬০
৭ই	৫৫

এই তালিকা দেখিলে কোন্ দিন কত
লোক মরিয়াছে, জানা যায়।

তালিকার পরিবর্তে রেখাযাত্রা দৈনন্দিন
সূতাসংখ্যা-নির্দেশক চলিতে পারে।



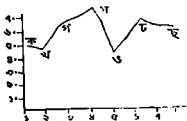
১ম চিত্রে দুইটি রেখা পরস্পর লম্বভাবে
অবস্থিত। একটি রেখা সমন্বিত-নির্দেশক,

উহাতে ১ হইতে ৭ পর্যন্ত তারিখের অঙ্ক
লেখা আছে। অত্র রেখাটি সূতাসংখ্যা-
নির্দেশক, উহাতে ১০ হইতে ৭০ পর্যন্ত
সূতাসংখ্যা অঙ্কিত আছে।

১০ অঙ্ক ও ২০ অঙ্কের মাঝের স্থানটুকু
৪৫ ভাগে বিভক্ত করিলে ১১, ১২, হইতে
১৯ পর্যন্ত অঙ্ক পাওয়া যাইতে পারে।
চিত্র কণাকার হইবার ভয়ে ঐ সকল চিত্র
দেওয়া হয় নাই। পাঠকগণ মনে মনে
ঐরূপ ভাগ করিয়া লইতে পারেন।

১ হইতে ৭ পর্যন্ত তারিখ-নির্দেশক
অঙ্কের উপরে ক, খ ইত্যাদি ক্রমে ছ পর্যন্ত
সাতটি বিন্দু বহিয়াছে। এক এক অঙ্কের
উপর এক এক বিন্দু। ৩ অঙ্কের উপর গ, ৬
অঙ্কের উপর ঙ, ইত্যাদি।

সকল বিন্দুর উচ্চতা সমন্বিত-নির্দেশক
রেখা হইতে সমান নহে। কোনটির উচ্চতা
অধিক, কোনটির কম। ঘ-বিন্দু সর্বোচ্চে
আছে, আর ঙ-বিন্দু সকলের নিম্নে আছে।
কোন্ বিন্দু কত উঁচুতে আছে, মাপিতে
হইলে পাশের সূতাসংখ্যা-নির্দেশক রেখার
তাকাইলোই চলিবে। ক-বিন্দুর উচ্চতা
৫০; খ-বিন্দুর উচ্চতা ৪৫ ও ৫০-এর
মাঝামাঝি অর্থাৎ ৪৫; গ-এর উচ্চতা
৬০-এর একটু বেশি অর্থাৎ ৬২; ঘ-বিন্দুর
উচ্চতা ৭০; ঙ-বিন্দুর উচ্চতা আবার
৩৫ মাত্র।



২ চিত্র।

২য় চিত্র বিলুপ্তির মাঝ দিয়া একটা ভাঙা-চুরা বাঁকা রেখা টানা গিয়াছে।

এই রেখার অন্তর্গত কোন্ বিলুপ্ত কত উচ্চে আচ্ছন্ন হইয়াছে, কোন্ তারিখে কত লোক মরিয়াছে, স্পষ্ট বুঝা যাইবে।

মনে কব, ভাঙিতে চাই, ভই তারিখে কত লোক মরিয়াছে। তাহাদের অবস্থাও উপরে রেখার চ-বিদ্যুৎ চ-বিদ্যুৎ উচ্চতা ৬০; তির চাইল, ভই তারিখে ৬০ জন লোক মরিয়াছে।

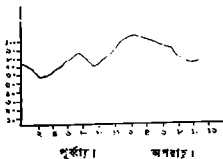
তালিকাভুক্ত কাক এইরূপ রেখা দ্বারা সম্পাদিত হইতে পারে। রেখার একটা সুবিধা আছে, তালিকার ভাঙা নাই। রেখার উচ্চা-নামা দেখিলেই সহজ হইবে উচ্চা-নামা বুঝিতে পারা যায়—রেখাট ঘন চোখে আঙুল দিয়া দেখাইয়া দেয়, সুস্থ-সংখ্যা কোন্ দিন কত বাড়িয়াছে, কোন্ দিন কত কমিয়াছে। ৪৪ তারিখে সহজ হইবে একবারে ৭০ পর্যন্ত উঠিয়াছে। তার পরদিন একবারে সহজ ৩৫৫ পতন। কলিকাতার বিনি বাসেন্দা, তাহাকে এইরূপ রেখা দেখাইলে, তিনি রেখার সহজ উচ্চ-পতি দেখিলে আতঙ্কিত হইবেন; রেখার নিম্নে পড়েন, তাহার অংখ্যনগ্ন ঘটবে।

আর একটা ইদাহরণ লওয়া যাক। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বার্ষিক কার্যবিবরণীতে কোন্ বৎসর কত ছাত্র বি,এ, পাশ করে, তাহার তালিকা বাহির হয়। সেই তালিকার বদলে এর চিত্র দেওয়া যেন। চিত্রদেখিলেই বুঝা যাইবে, কোন্ বৎসরের পাশের কল কিরূপ।



৩ চিত্র।

৮৫ হইতে ২৫ পর্যন্ত ইংরাজী বৎসরের অঙ্ক; ৮৫ অর্থে ১৮৮৫, ২৫ অর্থে ১৮২৫। অঙ্ক রেখার ১০০ হইতে ৫০০ পর্যন্ত অঙ্ক উত্তীর্ণ হইলে সংখ্যা-নির্দেশক। বক্র রেখাট দেখিয়া কোন্ বার কত ছাত্র পাশ করিয়াছে, অল্পে বুঝা যায়। ৮৫সালে পাশের সংখ্যা প্রায় ৩১০; ৮৬ ও ৮৭ সালে প্রায় সমান, সাত্বে চারিশতর কাছাকাছি; ৮৮ সালে কিঞ্চিৎ পতন, প্রায় পৌনেচারিশতে; ৮৯ ও ৯০ দুই বৎসর ক্রমিক উত্থান, ৮৯এ ৪০২; ৯০এ ৪৩৫; ৯১সালে একবারে অধঃপতন ৩০৩ সংখ্যার। আবার ৯৫ পর্যন্ত ক্রমশ উত্থান। ৯৫সালে উন্নতির সীমা প্রায় পাঁচশত পর্যন্ত।



৪ চিত্র।

কলিকাতা-সহরের মৃত্যুসংখ্যার হিসাব ২৪ ঘণ্টা পর পর পাওয়া যায়। বিশ্ববিদ্যালয়ে বঙ্গের অন্তরে ছায়েনা বি. এ. পাশ করে। কিন্তু এমন বিবিধ ঘটনা আছে, যাহা কণে কণে পরিবর্তিত হয়; কণে কণে তাহার ক্রিয়ণ পরিবর্তন হয়, তাহা জানা আবশ্যক হইয়া উঠে। যেমন বায়ুর উচ্চতা। বায়ুর উচ্চতা চক্ৰিশ ঘণ্টার সমান থাকে না, উচ্চ কণে কণে বদলায়। বড় বড় মান-মন্ডিরে পাণ্ডিত্যের দ্বারা এই অবিস্ময় পরিবর্তনের হিসাব রাখা হয়। এবং সেই অবিস্ময় পরিবর্তন রেখার উত্থান-পতন দ্বারা যেখান বাইতে পারে। ঐচ্ছিক চক্ৰিশ ঘণ্টার মধ্যে উচ্চতা কখন ক্রিয়ণ ছিল, যেখান হইতেছে। রাত্রি ১২টা হইতে বেলা ১২টা পর্যন্ত পূর্বাহ্ন; বেলা ১২টা হইতে পররাহ্ন ১২টা পর্যন্ত অপরাহ্ন। সময় নির্দেশক রেখার পূর্বাহ্নের ও অপরাহ্নের ঘটকালি এইরূপে অঙ্কিত আছে। উচ্চতা নির্দেশক অপর রেখার উচ্চতা-অংশ পার্শ্ব-নির্দেশের ডিগ্রি ১০০ পর্যন্ত অঙ্কিত আছে।

রেখার উত্থান-পতনে প্লট বৃদ্ধা বাইতেছে, কোন্ সময়ে বায়ুর উচ্চতা কত ডিগ্রি ছিল।

রাত্রি বাহুর সময় উচ্চতা প্রায় ৭০ ডিগ্রি ছিল, ক্রমশ কমিয়া রাত্রি ৪টার সময় ৬০ ডিগ্রির নীচে নামিয়াছে। আবার ক্রমশ উঠিয়া বেলা ২টার সময় ৮০ ডিগ্রি পর্যন্ত উঠিয়াছে। হয় ত সেই সময় একটু বেশ কমিয়াছিল, একটু ঠাণ্ডা হাওয়া দিয়াছিল। উচ্চতা সেইরূপ কোন একটা কারণে বেলা ১২টার সময় আবার কমিয়া যায়। আবার ৪টা বেলায় সময় উচ্চতার মতো ১০০ ডিগ্রি পর্যন্ত উঠিয়া পড়ে। এইরূপ অস্বাভাবিকভাবে উচ্চতার হাস-তৃষ্ণিত চিত্রিত বক্র রেখাটির উত্থান-পতনের দ্বারা প্লট-ভাবে নির্দেশিত হইতেছে।

যে কোন ঘটনার পরিবর্তন বা হাস-তৃষ্ণিত এইরূপ রেখা দ্বারা যেখান বাইতে পারে।

অধ্যাপক জগদীশচন্দ্র এইরূপ কতিপয় রেখা দ্বারা দ্ব্যর্থবোধের আভাস্তরিক পরি-বর্তন দেখাইবার চেষ্টা করিয়াছেন। সেই রেখাগুলির অর্থ কি, বুঝাইবার ভুল এত-খানি ভূমিকা আবশ্যক হইল। বাহ্যিক এই প্রণালীর অর্থ জানেন, তাহাদের নিকট ভূমিকার প্রয়োজন ছিল না। বাহ্যিক এই প্রণালীর অর্থ জানেন না, তাহাদের ভুল এই ভূমিকা আবশ্যক। নতুবা জগদীশচন্দ্রের প্রদর্শিত রেখাগুলি তাহাদের নিকট অর্থহীন বোধ হইবে।

মাংসপেশিতে আঘাত করিলে, উহার সঙ্কেত ঘটে। আঘাতের কণে একটু খাটো হয়। কতটুকু খাটো হয়, মাপিয়া দেখা চলে। আঘাত কতটা আঘাতে কতটুকু খাটো হয়—তাহাও মাপিয়া দেখা চলে। এই সঙ্কেত চিরতায়ী হয় না; আঘাতের

সঙ্গে সঙ্গে সঙ্কোচ ঘটে; আবার একটু পরে মাংসপেশী স্বভাবে ফিরিয়া আসে। একটা ধাক্কা, সঙ্গে সঙ্গে সঙ্কোচবৃদ্ধি, আবার কিছুকণ পরে স্বভাবপ্রাপ্তি। শরীর-বিজ্ঞান-শাস্ত্রের আলোচনা যাহাদের আবশ্যিক, তাঁহারা এই সকল ব্যাপার পর্যবেক্ষণে বিন কাটান। একটা ধাক্কায় কতকণে কতটুকু সঙ্কোচ ঘটল, আবার কতকণ পরে স্বভাব-প্রাপ্তি হইল, বৃদ্ধি ধরিয়া ও মাপকাঠি লইয়া বাণিয়া থাকেন; এবং তাহা দেখেন, তাহা রেখা টানিয়া অভ্যন্তর দেখান।

একখণ্ড মাংসপেশীতে একটা ধাক্কা দিলে, কতকণে কতটুকু সঙ্কোচ ঘটে ও কতকণে আবার স্বভাবপ্রাপ্তি ঘটে, তাহা নিম্নের ৫ ক চিত্রে দেখান গেল। এই চিত্র Brodie's Experimental Physiology বৃত্তকের ৫৫ পৃষ্ঠা হইতে গৃহীত। এই চিত্রে ও পরবর্তী চিত্রদুইতে লম্বরেখা দুইটি আর অন্যবস্তক বোধে দেওয়া যায় নাই। পাঠকগণ মনে মনে কল্পনা করিয়া লইবেন, সেই রেখাবয় বেন চিত্রে অদৃশ্য-ভাবে রহিয়াছে। একটি রেখা ভূমিস্ত—উহা কালনির্দেশক। অপরটি উহার উপর লম্বরূপে দণ্ডায়মান—উহা সঙ্কোচের মাত্রা-নির্দেশক।



৫ ক চিত্র।

এ চিত্রে স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে, ধাক্কা পাইয়া সঙ্কোচ ক্রমে বাড়িতেছে; পূর্ণমাত্রায় উঠার পর আবার সঙ্কোচ কমিয়া গিয়াছে। মাংস-

পেশী কণিকের ভিত্তি বিকৃতিলাভের পর আবার প্রকৃতিত হইয়াছে।

অগমীশচন্দ্র মেখাইয়াছেন, তাক্তিত-তরঙ্গের ধাক্কা বা তদনুতপ একটা ধাক্কা পাইলে, ধাতুপদার্থ বিকৃতিলাভ করে; উহার তাক্তিত-পরিচালন শক্তি সহসা বাড়িয়া যায়। একটা ধাক্কায় কণেকণে মস ব্যঞ্চে মাস; আবার ক্রিয়াকণ পরে উহা স্বভাবে ফিরিয়া আসে। এই পরিচালন-শক্তির বৃদ্ধি ও হ্রাসও রেখার উত্থান-পতন দ্বারা দেখান যাইতে পারে। অগমীশচন্দ্রও তাহা দেখাইয়াছেন। ৫ খ চিত্রে তাহা প্রদর্শিত হইল।



৫ খ চিত্র।

মাংসপেশীর অবস্থার উত্থান-পতন, আর ধাতুপদার্থের অবস্থার উত্থান-পতন, উভয়ের সাদৃশ্য কত অদূত, তাহা ৫ (ক) ও ৫ (খ), দুই চিত্র মিলাইয়া দেখিলেই বুঝা যাইবে।

পরবর্তী চিত্রগুলির বোধ করি বিমূঢ় ব্যাখ্যা আবস্তক হইবে না। পাঠকমহাশয় আপনি বুঝিয়া লইবেন। কয়েক ছোড়া চিত্র আঁত হইয়াছে। প্রত্যেক ছোড়ার মধ্যে প্রথম চিত্র ক-চিত্রিত ও দ্বিতীয় চিত্র খ-চিত্রিত করা গেল। ক-চিত্রিত চিত্রগুলি শরীর-বিজ্ঞান-শাস্ত্রের গ্রন্থ হইতে গৃহীত; এই সকল চিত্রের কোনটার মাংসপেশীর, কোনটার বা দ্রাব্যবস্তুর, বিকীরণপ্রাপ্তি

দেখান হইয়াছে। খ-চিত্রিত ত্রিভুজি
অধ্যাপক ভগবীশচন্দ্রের অঙ্কিত। ধাতুত্বের,
ধাতুর তাৎপ, ধাতা দিয়া, মোড়ে দিয়া,
তাড়িতভরনের আঘাত দিয়া, উৎপাতে
বিকার উৎপাদন করিলে, সেই বিকারের
কিছুমাত্রাদৃষ্টি ঘটে, কিছুমাত্র উৎপাদন-পতন
ঘটে, তাহা এই সকল চিত্রে দেখান হই-
য়াছে। প্রত্যেক ভোড়ার ক-এর সহিত
খ-এর সাদৃশ্য কত বিস্ময়কর! বাঃসপেন্দ্রী
বা বাঃসুহৃৎর মত জীবন্ত প্রবা যে নানাবিধ
বিকার লাভ করে, তাহা সকলেই জানিত;
কিন্তু নিজীব ধাতুত্ব বা ধাতুত্বীয়ত যে
এমন বিকার উৎপন্ন হয়, তাহা কেহ জানিত
না। এবং বাঃসপেন্দ্রীর বা বাঃসুহৃৎর বিকার-
লাভ ও স্বভাবপ্রাপ্তির সতি নিজীব ধাতু-
পদার্থের বিকারপাতের ও স্বভাবপ্রাপ্তির
এত সাদৃশ্য আছে, তাহাই বা কে জানিত?
সকলের অপেক্ষা আশ্চর্য্য এই, যে প্রবা
পেন্দ্রীর পক্ষে বা বাঃসুহৃৎর পক্ষে মানক বা
উত্তেজক, তাহাষ্ট আবার ধাতুপদার্থের
পক্ষেও মানক ও উত্তেজক; বাহ্য সজীব
পদার্থের পক্ষে অবদানক, নিজীবের পক্ষেও
তাহাই অবদানক।

এখন আমরা এক এক ভোড়া চিত্র
পাঠকের সম্মুখে উপস্থিত করিব এ উহার
সংক্ষিপ্ত বাণী দিব। ক চিত্রের সহিত
খ চিত্রের সাদৃশ্য দেখিয়া, সজীবের ও নিজীব-
বের সাদৃশ্য পাঠক বুঝিয়া লইবেন।



• ৬ ক চিত্র।

৬ ক।—এক খ ও বাঃসপেন্দ্রীতে পুনঃ-
পুনঃ ধাতা পড়িলে উহার সঙ্কেত কিরূপে
বাড়ে কমে, বাড়ে কমে, বাড়ে কমে,
দেখান হইতেছে।



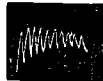
৬ খ চিত্র।

৬ খ।—ধাতুত্বের পুনঃপুনঃ ধাতা পড়িলে
উহার তাড়িত-পরিচালন-শক্তি কিরূপে বাড়ে
কমে, বাড়ে কমে, বাড়ে কমে, দেখান
হইতেছে।



৭ ক চিত্র।

৭ ক।—পুনঃপুনঃ আঘাতে বাঃসপেন্দ্রী
যেন ক্রমশঃ ক্লান্ত হইয়া আসিতেছে।
প্রথম প্রথম আঘাতে বস্তা সঙ্কেত হইত-
ছিল, পরের আঘাতে আর ততটা সঙ্কেত
ঘটে না। সঙ্কেতের মাঝা পথ পর আঘাতে
কমিয়া আসিতেছে। তেজের উৎপাদন-পতনের
মাঝা ক্রমশঃ কমিয়া আসিতেছে; তাহার
অর্থ পুনঃপুনঃ উত্তেজনার বাঃসপেন্দ্রীয়া
ক্রমশঃ যেন ভ্রান্ত ও অবগত হইতেছে।



৭ খ চিত্র।

৭ খ।—পুনঃপুন উত্তেজনা পাইয়া
ধাতুপদার্থও ক্রমশঃ প্রাণ ও অবসর হইতেছে ।



৮ ক চিত্র ।



৯ ক চিত্র ।



৮ খ চিত্র ।

৯ খ চিত্র ।

৮ ক।—পুনঃপুন উত্তেজনার পক্ষীর ক্রমশঃ
অবসাদপ্রাপ্তি—৭ ক চিত্রের সহস্ররূপ ।

৮ খ।—পুনঃপুন উত্তেজনার ধাতু-
স্রবোর ক্রমশঃ অবসাদপ্রাপ্তি—৭ খ চিত্রের
সহস্ররূপ ।

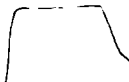
৯ ক।—প্রথমই প্রথম আঘাত পাইয়া
মাংসপেশী যেন একই আঘাতে অত্যন্ত
অবসর হইরাছে । তার পরের আঘাতে যেন
অতি ক্ষীণভাবে সাড়া দিতেছে । আর
পূর্বের মত প্রতিক্রিয়ার যেন ক্ষমতা নাই ।
তার পর আঘাত থাকিলে, ক্রমশঃ স্বভাব-
প্রাপ্তি ও অবসাদলোপ ।

৯ খ।—ধাতুস্রবোর অবস্থাও তদসহস্ররূপ—
প্রথম আঘাতে ধাতুপদার্থও যেন কাতর ও
অবসর ; পরের আঘাতগুলিতে তাহার
আর পূর্বের মত সহজে প্রতিক্রিয়া উৎ-
পাদনের ক্ষমতা নাই ।



১০ ক চিত্র ।

১০ ক।—প্রথম আঘাত এত প্রবল
যে, সেই আঘাতে মাংসপেশী একবারে সম্পূর্ণ-
ভাবে অবসর ; এবার অবসাদের মায়া
পূর্ণ ; আর আঘাতে সাড়া দেয় না ।
সঙ্কোচ-নির্দেশক রেখাটি চরম উন্নতি লাভ
করিয়া একবারে সোজা চলিয়াছে ;
আঘাতসম্বন্ধে, উত্তেজনাসম্বন্ধে, কিছুকাল
উহার অংশ উত্থান-পতন নাই । মাংসপেশীর
এই পূর্ণ অবসাদের অবস্থায় ধহুইকার ঘটে ।
ধহুইকারে মাংসপেশীর সঙ্কোচনমাত্রা চরম-
সীমার উপস্থিত হয় ; তখন উহা একপ
কঠিনতা ও জড়তা লাভ করে যে, আর
কোনরূপে কোন উত্তেজনার উত্থকে কোমল
করা যায় না ; উহার জড়তার অপনোদন
হয় না । আবার কিছুকাল বিশ্রামলাভের
পর এই প্রাণি দূর হয় ; তখন উহা স্বভাবে
কিরিয়া আসে । ইহাকে রোগমুক্তি বলা
যাইতে পারে । উত্তাপস্রোগ, ঔষধস্রোগ
প্রভৃতি রোগমুক্তির সহস্ররূপ ।



১০ খ চিত্র ।

১০ খ।—ধাতুস্রবোর পূর্ণ অবসাদ ।
প্রথম আঘাতে ধাতুস্রবোরও আর সাড়া

বিবার কনভা থাকে না: উহার পরিচালন-
শক্তি একবারে পূর্ণমাত্রায় উপস্থিত হই-
য়াছে। এখন নূতন উত্তেজনায সে শক্তির
আর হ্রাস-বৃদ্ধি নাই। তাড়িতোদ্বি-প্রব-
র্ণনের ক্ষমতা নির্দিষ্ট Coherer যন্ত্রে ধাতু-
ত্রয়ের এই অবস্থার প্রাপ্তি প্রত্যক্ষ দেখা
যায়। বিপ্রয়োগের পর, অথবা উত্তাপ-
প্রয়োগে এই অবস্থার দশা আবার দূর
হয়।



১১ ক চিত্র।

১১ ক। উত্তাপে অবস্থান নষ্ট করে,
উত্তাপ রোগমুক্তির সম্মুখ। ১১ ক চিত্রের
অন্তর্গত উত্তর রেখার ইংগিত দেখান হইয়াছে।
৩০ ডিগ্রি উষ্ণতার বাস্পেণে যেন সতেজে
সাঁড়া দিতেছে; উত্তেজনা পাইবানাত
অনিন্দিত হইতেছে; আবার কখনোই
অভাবে প্রত্যাহৃত হইতেছে। আর ৬ ডিগ্রি
মাত্র পরমে বাস্পেণে যেন হর্ষণ ও কীর্ণ;
উত্তেজনা তেমনই; কিন্তু উহার সন্ধ্যা-
মাত্রা কত কম। বীরে বীরে কিকিং সন্ধ্যা
লাভ করিয়া আবার বীরে বীরে প্রকৃতির
হইতেছে।

উত্তাপের এই অবস্থান-শক্তি
সকলই জানেন। দারুণ শীতে শরীর
অবসর হয়; উত্তাপে স্তিমিত করে।
পরিপ্রসবে বাস্পেণে প্রান্ত ও অবসর হইলে,
উষ্ণতা প্রয়োগে উহার অবস্থান দূর হয়।

বাস্পেণের স্তিমিততার ক্ষমতা তাকারের
কোম্পেকশন-প্রয়োগের ব্যবস্থা চিত্র প্রদর্শিত।



১১ খ চিত্র।

১১ খ।—এখানেও দুটি রেখা—
একটিতে ধাতুত্রয় পরম—২; ডিগ্রি—অন্য-
টিতে ধাতুত্রয় ঠাণ্ডা—২ ডিগ্রি মাত্র। উত্তর
রেখার কত তফাত। পরমে কত তেজ;
ঠাণ্ডার কত অবস্থান।



১১ গ খ চিত্র।

১১ গ খ।—এই চিত্রের তিনটি রেখা
ধাতুত্রয়ের উষ্ণতার মাত্রাভেদে ত্রিবিধ
অবস্থা দেখাইতেছে। প্রথম রেখার ০ ডিগ্রি,
দ্বিতীয়টিতে ৪০ ডিগ্রি, ও তৃতীয় রেখার ১০০
ডিগ্রি পরমে ধাতুর অবস্থা কিরূপ থাকে,
বুঝা যাইতেছে। ০ ডিগ্রির অপেক্ষা ৪০
ডিগ্রিতে উত্তেজনা যেন কিছু বাড়িয়াছে;
আবার ১০০ ডিগ্রিতে যেন একটু
অবসর হইয়াছে। অতঃপর উত্তেজনা
বাড়ে; কিন্তু উত্তাপের আত্মলগ্না আবার
উত্তেজনায় বদলে অবস্থান উৎপন্ন করে।

১২ ক।—এই চিত্র দেখা গেল না।
আমোনিয়া অতি পরিচিত উগ্রগন্ধি বাষ্পীয়
পদার্থ। আমোনিয়া-প্রয়োগে শরীরের কিরূপ
অবসাদ-নাশ ও উত্তেজনা-বৃদ্ধি হয়, তাহা
সকলেই জানেন।



১২ খ চিত্র।

১২ খ।—এই চিত্রে ধাতুস্রবোর উপর
আমোনিয়ার ক্রিয়া প্রদর্শিত হইয়াছে।
বায়ের রেখার উপান-পতনে আমোনিয়া-
প্রয়োগের পূর্বতন অবস্থা ও ডাঙ্কিমের রেখার
উপান-পতনে আমোনিয়া প্রয়োগের পরবর্তী
অবস্থা দেখান হইতেছে। নির্ভীক ধাতুপদার্থ
আমোনিয়া-প্রয়োগে যে এমন উত্তেজিত
হইয়া উঠে, তাহা কে ভাবিত!



১৩ ক চিত্র।

১৩ ক।—বিষপ্রয়োগে দ্রাব্যত্বের অব-
স্থাসংক্রান্ত এই চিত্রে দেখান হইতেছে।
বাহ্যতে অস্বাভাবিক অবসাদ উৎপাদন করে,
তাহাই বিষ। ক্লোরোফর্মের অবসাদক-
ক্রিয়া সকলেই জানেন। অতিমাত্রার প্রয়োগে
দ্রাব্যত্ব অবসর ও নিশ্চিদ্র হইয়া পড়ে।
অধিক মাত্রার জীবনহানি পর্যন্ত ঘটে।
এই চিত্রের বামাংশে ক্লোরোফর্ম-প্রয়োগের
পূর্বে দ্রাব্যত্বের স্বাভাবিক উত্তেজিত

অবস্থা ও বক্রিণের অংশে ক্লোরোফর্ম-প্রয়োগের
পরে অবসর অবস্থা প্রদর্শিত হইয়াছে।

দ্রাব্যত্বের অংঘাত করিলে উহাতে তাক্তিত-
প্রবাহ জন্মে; ক্রম প্রবাহে দ্রাব্য স্বাভাবিক
অবস্থার ও ক্ষীণ প্রবাহে উহার অবসর
অবস্থার সূচনা করে। ক্লোরোফর্ম-প্রয়োগে
দ্রাব্য ক্রমে অবসর হয়; উহার আর ক্রম-
প্রবাহ উৎপাদনের ক্ষমতা থাকে না। চিত্রে
তাহাই দেখান হইতেছে।



১৩ খ চিত্র।

১৩ খ।—ধাতুপদার্থে বিষের ক্রিয়া।
বামাংশে বিষপ্রয়োগের পূর্বের ও বক্রিণের
অংশে বিষপ্রয়োগের পরের অবস্থা
দেখান হইতেছে।



১৪ খ চিত্র।

১৪ খ।—এই চিত্রে তিনটি বেধা ধাতুর
বিবিধ অবস্থার জাপক। প্রথম রেখার
বিষপ্রয়োগের পূর্বতন অবস্থা—ধাতুপদার্থ
এখন স্বভাবত; উত্তেজনা পাইলেই সতেজে
সাঁড়া দেয়। দ্বিতীয় রেখার বিষপ্রয়োগের
পরবর্তী-দশা নির্ভীক ধাতু এখন সজীবের
অত অবসর—উত্তেজনার পতিক্রিয়া; ক্ষীণ।

তৃতীয় বেণা ঔষধ প্রয়োগের পর—ঔষধ-
প্রয়োগে অবসাদ দূর হইয়াছে; খাত্ত
আবার প্রকৃতিত হইয়া উত্তেজনার সাড়া
দিতেছে। ১৪ ক চিব দেওয়া আবশ্যক হয়
নাই।



১৪ খ চিব।

১৪ খ:—এখানেও তিনটি বেণা পঞ্চম
বেণা খাত্তবোর প্রাচীনিক অবসাদ রূপক।
অন্যত্র উত্তেজক প্রয়োগ প্রয়োগে খাত্ত
স্বা ক্রমে উত্তেজিত হয়, তাহাও দ্বিতীয়
বেণার দ্বারা বাটতেছে অধিক নাস্তার
প্রয়োগে ঔষধও ক্রমে বিনবৎ হয়, উত্তেজনা
ক্রমে অবসাদে পরিণত হয়, তাহা দেখা
যাইতেছে। আকিন, বেণাভাষা, ঠপিকা-
কুশান প্রকৃতি স্বা ক্রমে বাটতেছে
সামুদ্রের উপর, কখনও ঔষধের, কখনও
বিশেষ, কাজ করে, তাহা স্পষ্টকরিত;
যতই চিরে তাহা দেখান যেন ন:



১৫ ক চিব।

১৬ ক:—সামুদ্রের উপর আকিনের
ক্রিয়া দেখান হইয়াছে। বামাংশে প্রয়োগের
পূর্বকর্তন, ক্রিয়াংশে পরবর্তী ক্রিয়া দেখান
হইয়াছে।



১৬ খ চিব।

১৬ খ:—খাত্তবো আকিনের ক্রমরূপ
ক্রিয়া।

অতঃপরে ও জীবদেহে যে কতটা
সৌন্দর্য আছে, তাহা উপরি উক্ত চিত্র-
গুলি দেখিলেই কতটা বৃদ্ধা বাটবে।
এই সাদৃশ্যের বিষয় এতদিন কেহ জানিত
না। অধ্যাপক অগস্টিনস্কে এই সাদৃশ্যের
আবিষ্কার করিয়া বিজ্ঞানশাস্ত্রে একটা নূতন
রাশি গুলিয়া দিয়াছেন, যে বিষয়ে সংশয়-
মাত্র নাই। এই নূতন গণ অবলম্বন করিয়া
বৈজ্ঞানিকেরা কোন্ নূতন দেশে উপস্থিত
হইবেন, তাহা এখন কেহই বলিতে পারে
না। জীবদেহের মত অতঃপরে বাহিরের
উত্তেজনার সাড়া দেয়, জীবদেহের স্রাব
অতঃপরে বিধপ্রয়োগে অবসাদ হয়, আবার
ঔষধে তাহার অবসাদ নষ্ট হয়, এই সকল
নূতন তত্ত্ব অধ্যাপক অগস্টিনস্কের পূর্বে
কোন বৈজ্ঞানিকেরই কল্পনায় আসে নাই।
অতঃপরে জীবন আছে কি না, এই প্রশ্ন
এতদূর নীমাঃসা বিজ্ঞানশাস্ত্রের একটা
প্রশ্ন। *অনেক বড় বড় পণ্ডিত

মীমাংসা অসাধ্য বলিয়; একবারে নিরাশ
হইয়া বসিয়া আছেন। কোন পথে চলিলে
এই সমস্তার পূরণ হইতে পারে, তাহার
নির্দেশেও এ পদাঙ্ক কেহ সাহসী করেন
নাই। অসদীশচক্রে আবিক্রিয়াপরম্পরা
সেই সমস্তার পূরণে কান্দুর সকল হইবে,
তাহার নির্দেশে আমরা অসমর্থ। কিন্তু
তিনি যে নূতন পন্থা আবিষ্কার করিয়া

জ্ঞানের আধ্যাতিকবাস্তবতাতে অজ্ঞানের
ভ্রমোন্মত্ত-রহস্যাদৃত-প্রমোদভিবৃথে একাকী
অগ্রণী হইয়াছেন, তৎকৃত তাহার সাহস ও
অধাবসার ও কৃতিত্ব বিস্ময় উৎপাদন করিবে,
সন্দেহ নাই। তাহার মাতৃভূমির বিখ্যাত
মুখরওলে তিনি আনন্দের রেখাপাতে সমর্থ
হইয়াছেন ;—তাহার জননী আশ্বিনচন্দন
তাহার জরথাস্তার রক্ষাকবচ হউক।

শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী ।

নিবন্ধিণী ।

(Victor Hugo হইতে)

নিবন্ধিণী শৈল হুতে অরে
—বিলু বিলু ভীষণ সাগরে ।

নারিকের মহাতীতি সিদ্ধু-ধলে, "অশ্রু-মৃত্ত" !
আমা-কাছে কি চাহিলু ওরে !

আমি যে প্রলয়-সম, মহাত্মা নৃতি-সম,
'আকাশ আরন্তে' বাহা, আমি করি শেষ ।
তোরে কিবা প্রয়োজন, তুই অতি ক্ষুদ্রজন,
অসীম অনন্ত আমি অপার শেষে ॥"

নিবন্ধিণী বলে ধীরে, লবণাক্ত জলধিরে,
"তোমার যা নাহি ওগো সাগর অন্তল !
বিনা রব-আন্দোলন, করি তাহা বিস্তরণ,
পান করিবার মত একবিলু জল ॥"

শ্রীজ্যোতিষবিদ্রোহ ঠাকুর ।

গ্রন্থ-সমালোচনা ।

নির্মূল্য। সামান্য উপজ্ঞান। অস্বল্পেচ্ছ
বক্সী প্রণীত। মূল্য ১০ ছয় আনা।

সরকারি বাঙালি গল্পের বহিঃবেশন হয়—
অর্থাৎ, কিছুই হয় না—তদপেক্ষা এখানি
ভাল। কোন প্রকারে এখানি পড়া যায়।
ঘটনার বৈচিত্র্য নাই বা থাকিল, বাহুল্য
যথেষ্ট আছে। খানিকটা অনন্যসাধারণও
আছে। দেবেশচন্দ্র উচ্চ মূল্য, মাতাল,
বোম্বামু—সেই চাপে তাহার দ্বী আত্ম-
ঘাতিনী হইয়াছে। স্ত্রীয়া পুত্র দেবেশচন্দ্র
সন্ন্যাসী হইয়াছে, তাহার পত্নীও তিনি
“পুত্রের অভিনব ধর্মসমগ্র তপোপুর মতিয়া
উঠিয়াছে।” সে উপনিষদের গাথা
টোকাইয়া গান করিতে আরম্ভ করিয়াছে।
পাছে কেহ মনে করে যে, গ্রন্থকার গতা ও
উপনিষদের কিরি ওয়াগা নাহে। তাই বক্সী-
মহাশয় ফুটনোটে লিখিতে তুলেন নাই যে,
এই বোঝ “কটোপমিষং, পঞ্চমী বসী” হইতে
সম্বন্ধিত। আমরা দার-পর-নাই আপ্যায়িত
হইলাম। উপজ্ঞানখানির ঘটনাবলীর সময়,
যখন প্রিন্স্ অব্ ওয়েল্‌স—বর্তমান সম্রাট
এ দেশে আসিয়াছিলেন। সে তা আশ্চর্য
বৎসরেরও অধিক কালের কথা। এইগ্রন্থ-
নের বেগে গ্রন্থকার তুলিয়া দিয়াছেন যে,
তখনও সীতা, উপনিষৎ ও নিকাম ধর্মের প্রাচ্য
আত্মকান্দকার মতন এতদূর গড়ান নাই।

মৌখিক অঙ্ক। শিবপুর সিভিল ইঞ্জি-
নিয়ারিং কলেজের পরীক্ষোত্তীর্ণ শ্রীআবিন

আলি খাঁ কতক লিপিত ও প্রকাশিত।
মূল্য ১০ তিন আনা মাত্র।

এই ক্ষুদ্র পুস্তকখানি প্রাইমারি স্কুল-
সমূহের ছাত্রদিগের ব্যবহারার্থ লিখিত
ও প্রকাশিত। বাহাদুরের চিত্র লিখিত,
তাহাদের কাজে লাগিবে বলিয়াই বোধ
হয়। কিন্তু গ্রন্থকার আবিন-আলি-সায়েবকে
একটা কথা জিজ্ঞাস্য আছে। এই পুস্তক
তিনি কেন হরিজ্ঞাবর্ণের—ডাগোট—কাগজে
মুদ্রিত করিয়াছেন, তাহা বুঝিতে পারিলাম
না। ইহাতে কি পাঠসৌকর্য্য দাখিত হয়?
আমাদের ত তাহা বোধ হয় না।

একটা মজার কথাঃ লেভ সংবরণ করিতে
পারিতেছি না। গ্রন্থকার আবিন-আলি-সায়েব
একট প্রসন্ন দিয়াছেন। প্রমুখ এইঃ—

“একটি বৃক্ষে ১০০ পায়রা বসিয়াছিল;
একজন শিকারী গুলি দ্বারা এটি মারা পড়ে।
বিরক্ত, ঐ বৃক্ষে আর কত পায়রা অবশিষ্ট
রহিল?”

প্রশ্নটির উত্তর বাণক কেন, বাণকের
পিতামহও বোধ করি দ্বিতে পায়ের না।
তাহাও আবিন-আলি-সায়েব অগ্রগ্রহ করিয়া
উক্তরূপে বলিয়া দিয়াছেন, নতুবা আমরাও
মুখে মুখে ইহার উত্তর দিতে পারিতাম না।
উত্তরটি এই—একটিও পায়ী গাছে থাকিবে
না। কেন না, অবশিষ্ট সবগুলিই তরে উড়িয়া
পলাইবে। ইহা কি অন্ধের প্রশ্ন, না বরষাত্র
ঠকইবার প্রশ্ন?

শ্রীচন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায়।

বঙ্গদর্শন ।

১

মুক্তামালা ।

২

ক্রোধ ।

বিশালপুরের গ্রাম। প্রতাপসিংহের মহিষী চন্দ্রাবতী ক্রোধাগারে উপবেশন করিয়া রহিয়াছেন। আগারের আরতন কুত্র, গবাক নাই, হস্তাঙ্গে কোনরূপ শয্যা বা আসন নাই। গৃহের প্রাচীরে, লোহিতাক্ষরে “মানাগার” এই শব্দ খোদিত রহিয়াছে। ক্রোধ লোহিতমূর্ত্তি, এইমন্ত লোহিত অক্ষর। রাণী ভূতলে বসিয়া আছেন। কেশ অবৈষ্ণবক, চন্দ্রাবতী বেণী মুক্ত করিয়া, কেশ কক্ষ করিয়াছেন; কপালে কপাঘাতের চিহ্ন, স্নোবনে চক্ষু ফুলিয়াছে; বস্ত্র মণিন, দীর্ণ; অঙ্গের অলঙ্কার গৃহে ইতস্তত বিকিণ্ড রহিয়াছে। দাক্ষ ক্রোধে রাণী মানাগারে প্রবেশ করিয়া দ্বার বন্ধ করিয়াছেন।

ক্রোধের ইতিহাস বড় সহজ নয়। আশ্রয় হ্রগ্ধিত আকবরবাবশাহের মহিষী যোধাবাইর মহল হইতে এক হিন্দু দাসী কণ্ঠ ছাড়িয়া আসিয়া প্রতাপসিংহের অন্তঃপুরে স্থান পাইয়াছিল। চন্দ্রাবতী বধন তুলিলেন যে, মীরা যোধাবাইর মহলে দাসী ছিল, তখন তাণাকে নিগৃহ করিয়া তিনি

মনে মনে অত্যন্ত সুখগর্ষ অমৃতভব করিলেন। তাহার সহিত দিব্যারাত্র যোধাবাইর ও বানশাহী ঐশ্বর্যের গল্প করা তাহার প্রধান কণ্ঠ হইয়া উঠিল। একদিন রাণী একছড়া মুক্তার মালা বাহির করিয়া গলায় দিরাহিলেন। মীরা দেখিয়া কহিল, “রাণী-মায়েব, মুক্তার মালা যদি পরিতে হয় ত যোধাবাইর মত একছড়া জ্বর করা।”

রাণী সকোতৃকে ও সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করিলেন, “সে কিরকম মুক্তা ?

দাসী কহিল, “সে মালায় কেবল একগারি মুক্তা”—রাণীর গলায় একাদশ সারির মালা ছিল—“কিন্তু তেমন মুক্তা কেহ কখন চক্ষে দেখে নাই। যেমন বড়, তেমন উজ্জ্বল, ভিন্ন আলোকে ভিন্নরকম রং, দেখিয়া আন মেটে না। তুমি যোধাবাইর অপেক্ষা সুন্দরী, তোমাকে সেইরকম একছড়া মালা উত্তম দাখিবে।”

সেই অবধি চন্দ্রাবতী আহার-নিদ্রা ত্যাগ করিয়া মুক্তামালায় তারুনা ভাবিতে লাগিলেন। পতি প্রতাপসিংহকে ধরিলেন, যোধাবাইর ভুগা একছড়া মুক্তার মালা তাহাকে আনা হয়। ‘দেও হইবে।

প্রতাপসিংহ কহিলেন, “তুমি কি বোধ্য-
বাইর সমকক্ষ ? আগ্রা-বিরোধ বাদশাহতে
আর আনাতে ? তোমার এ অসম্ভব সাধ
কোথা হইতে হইল ?”

চন্দ্রাবতী কহিলেন, “আমি কি সকল
বিষয়ে বোধ্যবাইর তুল্য ভাগ্য কামনা
করিতেছি ? তাহার মত কি একছড়া
মুক্তার মালা পরিতে পারি না ?”

প্রতাপসিংহ একটু রাগিয়া কহিলেন,
“সে মুক্তার মালা কেমন করিয়া হইয়াছে
আমি ? বাদশাহের তোবাখানার সেরকম
শুটিকরেক মুক্তা ছিল। তাহার পর সমস্ত
ভারতবর্ষ অন্বেষণ করিয়া সে মালা হইয়াছে।
কোন বণিকের কাছে একটু, কোন
রাজার গৃহে একটু, এই রকম করিয়া
একটি একটি করিয়া মুক্তা পুঁজিয়া মালা
প্রস্তুত হইয়াছে। উহা শুধু অমূল্য নহে,
সত্রাটু ভিন্ন আর কাহারও শক্তি নাই যে,
উহা সংগ্রহ করে। আমি তেমন মালা
কোথায় পাইব ?”

চন্দ্রাবতী কহিলেন, “অত রূপায় কাজ কি,
বল না কেন, আমাকে কিনিয়া দিবে না !”

পতিপত্নী উভয়েরই নবীন যৌবন,
বেবন দুইজনে শ্রীতি, সেইরূপ সহসা রাগা-
য়াসি হইবার সম্ভাবনা। এ পর্যন্ত কিন্তু
শাসনাত্মকত্বের কখন বাড়াবাড়ি হয়
নাই। ঈশান কোণে কদাচ এক-আধ-বার
বিদ্রোহ-দুরূপ, কিন্তু তাহা নিম্নেবের মধ্যে
মিলাইয়া কইত। প্রেমাকাশ এ পর্যন্ত
প্রায় নির্মল ছিল। সহসা একেবারে সেই
আকাশ-দীর্ঘ করিয়া বিজ্ঞানের দীপ্তি,
তৎপরেই ঘোর মেঘগগন !

প্রতাপসিংহ অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া কহি-
লেন, “বাহা দেখিবে, তাহাতেই সাধ ! তাহা
হইলে ত মজী দেখিলে গম্ভীর মিতে সাধ
হইবে ! যদি বোধ্যবাইর মত মালা পরিতে
সাধ ত তাহার মত রূপাল করিলে না কেন,
তাহার মত যবনভর্তার কামনা করিলে
না কেন ?”

উভয়ের অপেক্ষা না করিয়া রাজা
রাগিয়া সধরবাটাতে চলিয়া গেলেন।

রাণীও গিয়া মানাগারে প্রবেশ করিলেন।

শান্তি ।

প্রানাহারের সময় যখন অতীত হইয়া
গেল, তখন দাসী ও পরিচরনরা আসিয়া
রাণীকে অনেক ডাকাডাকি করিল। রাণী
তাহাতে বিরক্ত হইয়া উঠিলেন, দ্বার খুলি-
লেন না। তাহারও অধিক পীড়াপীড়ি
করিল না, কারণ ক্রোধাগারের এই সনাতন-
প্রথা যে, বাহার দ্বার তাহাতে প্রবেশ,
তাহারই সাধসাধনায়, অহুনয়-বিনয়ে,
আবার সে দ্বার মুক্ত হইবে। রাজার নিকট
সংবাদ গেল, রাণী মানাগারে প্রবেশ করিয়া
অরুণল ভাগ করিয়াছেন।

এ সম্ভাবনা রাজার মনে একবারও
উঠে নাই। তিনি রাগিয়া কতকগুলি
অত্যন্ত অথবা কথা বলিয়াছিলেন ; বাহিরে
আসিয়া রাগ কতক পুঁজিয়া গিয়াছিল, মনে
করিতেছিলেন, এবার অন্দরমহলে গিয়া
রাণীকে বুঝাইয়া বলিবেন, যেন তিনি
মুক্তামালার কথা ভুলিয়া যান। রাণী যদি
বড় রাগ করেন, ত কোনমতে তাহাকে
প্রসন্ন করিতে হইবে, নিতান্তপক্ষে তাহাকে

আর কোন বহুণ্য অলঙ্কার ত্রয় করিয়া নিতে হইবে। ক্রোধানাগের কথাটা তাঁহার স্মরণই ছিল না!

ছািকিয়ার কথাও নয়। রাণী চন্দ্রাবতী বিবাহের দিন হইতে আর পর্যন্ত কখন এ ঘরে প্রবেশ করেন নাই। পূর্নকালে কবে কোন্‌ রাণী মানাগারে প্রবেশ করিয়াছিলেন, কেহ তাঁহার সন্ধান রাখিত না। পূর্ন-পুরুষেরা কতকি রাখিয়া গিয়াছিলেন, কত সামগ্রী, কত গৃহের ব্যবহার, কালে উত্তীর্ণা গিয়াছিল। তাঁহাদের কালে এনি কতিন নিয়ম ছিল যে, গৃহ-বিপর্যায় বড়িবার সাধ্য ছিল না। “শয়নাগার,” “বিশ্রামাগার,” “ভোজনাগার,” “জীড়াগার” প্রভৃতি চিহ্নিত গৃহ ছিল। “মানাগার” আর বড় একটা কাহারও মনে ছিল না। বিলাসপুর পার্বত্য-প্রদেশ, পূর্নের রাজগৃহে নরবলির প্রথা ছিল। সে কত কালের কথা, তাহা কাহারও স্মরণ নাই। প্রাসাদ হইতে কিছু দূরে “বলিগৃহ” ছিল, এখন ভাঙিয়া ভূমিসাৎ হইবার উপক্রম হইয়াছে। শয়নগৃহে শয়ন করিবার সময় ও ভোজনগৃহে ভোজন করিবার সময় রাজা প্রতাপসিংহের মনে কোনরূপ বিধা উপস্থিত হইত না; কিন্তু মানান্নারে রাণী প্রবেশ করিয়াছেন শুনিয়া ভাবিলেন, “পূর্নপুরুষেরা এ গৃহের স্মৃতি করিলেন কেন?”

পূর্নপুরুষেরা তেমন কিছু অবিবেচনার কাজ করেন নাই, কারণ শয়ন-ভোজন যেমন নিত্যপ্রয়োজন, অভিমান সেজন্য না হইলেও অবশ্যস্বাধীন। স্বতন্ত্র হানু না থাকিলে শয়ন-ভোজন-রজন-কথোপকথন প্রভৃতির চান

মানে অভিমানে ভাগিয়া যাইত। সেইজন্য পূর্নপুরুষেরা, বুদ্ধি করিয়া, আহার-নিদ্রার মত ক্রোধ-অভিমানেরও একটা স্বতন্ত্র স্থান করিয়া দিয়াছিলেন। পুরুষাভূত্রেমে সেই গৃহে রাণীপত্নীরার ক্রৌঞ্চাভিমান সঞ্চিত, পৃষ্ঠীকৃত হইতেছিল।

সাত পাঁচ ভাবিয়া অবশেষে রাজা পূর্ন-পুরুষদিগের সমান্তর-মিরমাহুদ্যারে ক্রোধানাগের অভিযুখে গমন করিলেন। তাঁহাকে দেখিয়া দ্বাদশী প্রভৃতি সকলে সন্নিহা গেল, কিন্তু অন্তরাল হইতে প্রবণলোমুখ বহুতর রমণী উৎকর্ণ হইয়া রহিল।

লক্ষ্যায়, বিরক্তিতে, রাজার মুখ রক্তবর্ণ হইয়া উঠিয়াছিল। ঘরের সম্মুখে আসিয়া ঘরে অন্ন অন্ন করাঘাত করিলেন। অক্ষুট, কল্মিত স্বরে কহিলেন, “রাণী, ঘর মুক্ত কর!”

সে ঘরের পশ্চাতে যে অভিমানের অর্গল ছিল, তাহা করাঘাতে কেন, বজ্রাঘাতেও গুলিবার নহে। কোন উত্তর না পাইয়া রাজা আর করাঘাত করিলেন না, কেবল কণ্ঠবলের উপর নির্ভর করিলেন। সে বলও কোমলতার, চীৎকারে নহে।

রাজা বলিলেন, “রাণী, বাড়ীহুত লোক কি মনে করিবে! আমার অপরাধ হইয়াছে, তুমি দুয়ার খোল, বাহা চাও, অনিয়া দিব।”

রাণী ভিতর হইতে বলিলেন, “অধিক-অপ কেহ কিছু মনে করিবে না। রাজি হইলেই সব চুকিয়া যাইবে।”

“কি চুকিয়া যাইবে?”

“লজী দেখিলে যে সাধ হুয়ু” তাহাই মিটাইব! মুক্তার নাগা গলার দিবার সাধ

না মিটেতে পারে, কিন্তু গলার দড়ী দিবার সাধ ত মিটেবে! সঙ্গে দড়ী আনিয়াছি। রাত্রি হইলেই তোমার সাধ, আমার সাধ, মিটাইব।”

হুসীরা যে প্ররোণ করে, অনেক সময় সে বাঁকা তাহার নিকট ফিরিয়া আসে। হাঝা আপনায় বাক্য অরণ করিয়া লজ্জিত হইলেন, কহিলেন, “আমি রাগের মাথাধ কি বলিয়াছি। সে দোষ লইও না। আমার শতবার অপরাধ হইয়াছে, আমার কমা কর।”

“তোমার আর অপরাধ কি? আমি একছড়া মুক্তার মালা চাহিয়াছি, আমারই অপরাধ হইয়াছে। কিন্তু অপরাধের ত প্রায়শ্চিত্ত আছে। আমি প্রায়শ্চিত্ত করিব, স্থির করিয়াছি।

রাণীর স্বর বাৎসরক, চুনিয়া রাজার অভ্যন্ত আনন্দময় উপস্থিত হইল। কাতর-স্বরে অশ্রুস্রব করিয়া কহিলেন, “আমি যেমন করিয়া পারি, তোমার মালা আনিয়া দিব। এখন আমার কথা গ্রাহ্য, দ্বার মুক্ত কর।”

রাণী অর্গল মুক্ত করিলেন, কিন্তু দ্বার খুলিলেন না। দ্বার অন্ন খুলিয়া বাহ দ্বারা দ্বারণ করিলেন, জিজ্ঞাসা করিলেন, “তুমি কি শুধু মনরাধা কথা বলিতেছ?”

হাঝা কহিলেন, “আমার কি তোমার এতই অবিধান? আমি তা বলিয়াছি, যেখান হইতে হউক, যেমন করিয়া পারি, তোমার মালা আনিয়া দিব।” ঈষৎমুক্ত দ্বারপথ দিয়া হাঝা রাণীর হস্তধারণ করিলেন, কিন্তু বলপূর্বক দ্বার খুলিবার চেষ্টা করিলেন না।

আরও দুই চারি কথার পর দ্বার মুক্ত হইল। হাঝা জোখাগারে প্রবেশ করিয়া রাণীর অলঙ্কার তীক্ষ্ণকৈ পরাইয়া দিলেন। তাহার পর রাণী কেন বাঁধিয়া সংবতরগনে বাহিরে গমন করিলেন।

আশু।

মুক্তার মালা খুঁজিতে রাজকাৰ্য্য প্রায় বন্ধ হইয়া গেল। রাজা মন্ত্রীদেব আবেশ করেন, মন্ত্রীরা মগ্ন লোককে বলেন, এই রকমে চারিদিকে কথা ছড়াইয়া পড়িল। বেশবেশান্তর হইতে জহরী আসিতে লাগিল, বেশবেশান্তরে মুক্তার সন্ধানে লোক ছুটিল। মুক্তার মালা রাণীর প্রয়োজন, কিন্তু দেশের লোক পর্য্যন্ত সেই ডাবনার অস্থির হইয়া উঠিল। পণে, ঘাটে, ধোকানে, হাটে, কেবল সেট এক কথা। অশ্রু স্থান হইতে বিখ্যাত জহরী আসিয়াছে, সে এমন মুক্তা আনিয়াছে যে, তাহার একটি সাত রাজার ধন, তথাপি না কি রাণীর মনোমীত হয় নাই। কেহ হাসিয়া বলে, “আমাদের রাণী ঘোঁষাবাই-বেগবের তুলা হইয়া উঠিলেন, দেখিতেছ কি! অনেককাল হাঝা এমন তোলপাড় হয় নাই।”

বতরকম মুক্তা বা মুক্তার মালা আসে, রাণী গোপনে মীরাতে বেধান। সে মাখা নাড়িয়া, নাসা কুঞ্চিত করিয়া বলে, “সে মুক্তা আর এ মুক্তা! রাণীনি, যদি সামান্য জহরীর কাছে তেমন মুক্তা মিলিত, তাহা হইলে ঘোঁষাবাইর, কণমালা কি চুনিয়ার অভ্যুদয় হইত?”

রাণী রাণিরা রাজাকে মুক্তা ফিরাইয়া দিতেন। রাজা আবার তাঁহাকে সাধনা করিয়া বলিতেন, “বতদিন না পাট, ততদিন মুজিব। বাদশাহের বেগমেব মালাও ত একদিনে হয় নাই। আশ্রয় ত এই খুজিতে আরম্ভ করিয়াছি।”

কিছুদিন এইরূপে অতীত হইলে, মীরা একদিন রাণীকে কহিল, “রাণীগাহেব, শুনেছ একজন বড় সাধু এসেছে?”

রাণীজির বিশেষ তেমন কোতুহলের উদ্রেক হইল না, অলসভাবে কহিলেন, “কই, না!”

“সে যে-সে সাধু নয়, বড় তারি মহাপুরুষ। একবার তিনি যমুনাতীরে বসিয়াছিলেন, আকবরবাদশাহ তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে চাহিয়াছিলেন। একজন নকীন তাঁহাকে গিয়া বলিয়াছিল যে, বাদশাহ তাঁহাকে স্মরণ করিয়াছেন। সন্ন্যাসী হাসিয়া বলিয়াছিলেন, ‘আমার সহিত বাদশাহের কি প্রয়োজন? যিনি বাদশাহের বাদশাহ, আমি তাঁহার ভজনা করি, বাদশাহের নিকট গমন করিবার আমার কিছুনা ইচ্ছা নাই।’ এই কথা শুনিয়া বাদশাহ বরং ককীরের নিকট গিয়াছিলেন। তাঁহাকে দেখিয়া ককীর গাজোখান করেন নাই। উঠিয়া আসিবার সময় বাদশাহ মুক্তকরে তাঁহার নিকট থোয়া চাহিয়াছিলেন।”

রাণীর চক্ষু বিষমবিস্ফারিত হইল। “তাই ত! এমন সাধুও কথা ত শুনি নাই।”

“ওধু কি তাই! সাধু এক এক সময় পাড়াতিয়া উঠিয়া আকাশের দিকে চাহিয়া

যাকেন, আর তাঁহার চারিদিকে আশরকি-বৃষ্টি হইতে থাকে। তিনি যদি প্রসন্ন হন ত কি না করিতে পারেন? রাজা, চাষা, তাঁহার ভেদ নাই, যে তাঁহাকে প্রসন্ন করিবে, তাহার আর কোন ভাবনা থাকে না।”

রাণী বলিলেন, “তিনি না জানি কত গরিব লোকের উপকার করিয়াছেন!”

“ওধু কি গরিব লোকের? বাহারা ধনী, তাহারাই কি নাহা চায়, তাহাই পায়? রাজা-রাজ্যার ঘরেও কি অভাব নাই? ভূমি ত রাজরাণী, তবে তোমার মনের মত একছড়া মুক্তার মালা পাওয়া যায় না কেন?”

রাণী বিমম্বা হইলেন, কহিলেন, “তা আর কই পাওয়া যায়?”

মীরা বলিল, “সাধু এত লোককে এত দিতে পারেন, আর তোমাকে একছড়া মুক্তার মালা দিতে পারিবেন না?”

রাণী সগর্বে বলিলেন, “ককীরের নিকট ভিক্ষা লইব।”

“ভিক্ষা লইতে কে তোমার বলিতেছে? সাধু-সন্ন্যাসীর নিকট যাহা পাইবে, শ্রদ্ধাভরে গ্রহণ করিতে হয়। তাঁহাদের নিকট রাজ-রাণীই বা কে, আর কুতীরবাসিনীই বা কে? তিনি যাহা দিবেন, তত্ত্বিপূর্বক লইতে হইবে।”

“এত বড় মুক্তার মালা তিনি কোথায় পাইবেন?”

মীরা হাসিয়া বলিল, “তাঁহাদের মত লোক কোথা হইতে কি পান, তাহাই যদি আমরা জানিব ত আমাদের ভাবনা কি?”

তখন রাণী বলিলেন, “কিন্তু কে তাঁহাকে বলিবে ?”

“কেন, আমি বলিব। আমি একবার তাঁহার কাছে গিয়াছিলাম।”

রাণী কৌতূহল সংবরণ করিতে পারিলেন না, অত্যন্ত আগ্রহের সহিত কহিলেন, “সত্য ? তিনি কি বলিলেন ?”

“তিনি বলিয়াছেন, তোমার বাসনা পূর্ণ হইবে। তবে সে কথা স্পষ্ট বলেন নাই। বোধ হয়, তিনি রিবেন।”

“আমাকে কি করিতে হইবে ?”

“তাঁহাকে স্মিতাঙ্গা করিব; কিন্তু রাজ্য ঘৃণাকরও এ কথা শুনিতে পাইলে বিপদ হইবে।”

“তিনি শুনিলে আমার ভৎসনা করিবেন। তাঁহাকে কোন কথা বলা হইবে না।”

“তুমি না বলিলে আর কে বলিবে ? যদি বল ত আবার কতীয়েব কাছে যাই।”

রাণী ভৎসনাং মগ্নত হইলেন। রাজ্য গ্রহণী ডাকিয়া মুক্তামালা দেখিতেছিলেন, রাণী ককীরের নিকট প্রার্থী হইলেন। প্রতাপসিংহ সে কথা কিছু জানিতে পারিলেন না।

চলন।

মীরা নিত্য সন্ধ্যাসীর নিকট যায়, নিত্য আসিয়া রাণীকে নানা কথা বলে। একদিন বলিল, “সন্ধ্যাসী বলিয়াছেন যে, সোনারূপা বসু সহজে পাওয়া যায়, মুক্তা তত সহজে পাওয়া যায় না। সেজন্য তোমাকেও একটু চেষ্টা করিতে হইবে।”

“আমি কি করিব ?”

“তিনি স্মিতাঙ্গা করিয়াছেন, তোমার অন্ত অলঙ্কারের উপর অহরূপ আছে কি না। থাকিলে মুক্তার মালা পুণ্ড্রা হইবে না। আর সকল অলঙ্কারের মালা ত্যাগ করিয়া কেবল সেই মুক্তামালার কথা ভাবিতে হইবে।”

রাণী বলিলেন, “আমি ত তাই ভাবিতেছি, অন্ত কোন অলঙ্কারের কথা আমার মনেও নাই।”

“তিনি আরও বলিয়া দিয়াছেন যে, তিনদিন এক বেলা অন্ন, আর এক বেলা ফলমূল আহাৰ করি। শুভাচারিনী হইয়া থাকিবে।”

রাণী সেইমত করিলেন। তাহার পর মীরা আসিয়া বলিল, “সন্ধ্যাসী বলিয়াছেন যে, ত্রাতিকালে তোমাকে একলা সকল অলঙ্কার একটি বাগে পুটিয়া অনন্নমহলের উদ্যানে কোন বৃক্ষমূলে পুতিয়া রাখিতে হইবে। তুমি চলিয়া আসিলে পর, আমি সন্ধ্যাসীকে গোপনে সেই স্থানে লইয়া আসিব। তিনি সেই স্থানে মন্ত্রপাঠ করিলে পর, তুমি মুক্তামালা পাইবে।”

রাণী বলিলেন, “সন্ধ্যাসী কোথাও যান না, এখানে আসিবেন কেন ? আর আমার অলঙ্কার কতকগুলি প্রোথিত থাকিবে ?”

“তোমার অন্ত তিনি আসিবেন; তোমার অলঙ্কার মাটিতে পুতিয়া তাহার উপর বসিয়া মন্ত্র না বলিলে মুক্তামালা হইবে না। পরদিবস তুমি অলঙ্কার বাহির করিবা লইও।”

তাড়াই হইল। রাত্রিকালে রাণী মীরাকে সঙ্গে করিয়া, অলঙ্কারের বাস্র সঙ্গে লইয়া, উদ্যানে গমন করিলেন। একটা বৃক্ষতলে মীরা একটা গুঁঠ খনন করিল, তাহাতে অলঙ্কারের বাস্র রাখিয়া, মাটি চাপা দিয়া, রাণী মীরার সঙ্গে চলিয়া আসিলেন। উদ্যানের বাহিরে উচ্চ বারান্দার উপর রাণী পাড়াইলেন। মীরা নিরা, অন্ধ্র-বহনের ও উদ্যানের দ্বার দিয়া ফকীরকে উদ্যানে লইয়া আসিল।

রাণী অগ্ররাল হইতে দেখিতেছিলেন। সন্ন্যাসীর মাথা বড় বড় জটা, মুখে শুষ্ক-জ্বর এত বাহুল্য যে, ভাল করিয়া মুখ দেখিতে পাওয়া যায় না। দিনমানে হইলে সেগুলি পরচুল কি না, তাহাতে অনেকের সংশয় হইত। যে গানে অলঙ্কার প্রোথিত ছিল, মীরা করিয়া তাহাকে সে স্থান দেখাইয়া দিল। সন্ন্যাসী সেট স্থানে বসিয়া মন্ত্র উচ্চারণ করিতে লাগিল ও ধূপ-ধূনা প্রভৃতি আনিয়া তদন্তর ধূম উৎপাদন করিল। সে ধূমে সন্ন্যাসী ও বৃক্ষতল, কিছুই লক্ষিত হয় না। অবশেষে ধূম অপ-সারিত হইলে, সন্ন্যাসী উঠিয়া পাড়াইয়া কহিল, “বেশগৃহে পশ্চিমদিকে অবস্থান কর। কল্যা হানাদির পর এখান হইতে অলঙ্কার তুলিয়া লইবে, তাহার পূর্বে তুলিলে বিপদ হইবে।” এই বলিয়া সন্ন্যাসী চলিয়া গেল। মীরা তাহাকে পথ দেখাইয়া করিয়া আসিয়া রাণীর সঙ্গে বেশগৃহে গমন করিল।

গৃহের পশ্চিম কোণে রাণী দেখিলেন, অলাব্র একটি কন্যাতুল্য রহিয়াছে। সেইটি তুলিয়া লইয়া দেখিলেন, তাহার ত্রিতর এক-

ছড়া মালা—বাহির করিয়া আনেন চীং-কার করিয়া উঠিলেন। মীরা ছুটিয়া তাহার নিকটে গেল। দেখিল, রাণীর হস্তে অপূর্ণ মুক্তামালা, এক একটি মুক্তা এক একটি কণোত্তভিষের তুল্য, কোথিলে উজ্জল, মন্ডল, প্রদীপালোকে কল্মশ করিতেছে। রাণী সেই একবার চীংকার করিয়া আনেন আর কণা কহিতে পারিলেন না, কেবল সেই সন্ন্যাসিগত বিচিত্র মালা দেখিতে লাগিলেন। মীরা অনেককণ পরে বলিল, “ইহার তুলনার গোদাবার মালাও কিছু নয়। এমন মুক্তা কোন বাদ্যধারের বেগমও কখন দেখেন নাই।”

হর্ষে, গর্বে, রাণীর মুখ উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। পরদিবস রাজা প্রাতঃকৃত্য সমাপন ও বেশভূষা ধারণ করিয়া বাহিরে গমন করিবার উল্লাস করিতেছেন, এমন সময় রাণী হাতমুখে তাহার সমুখে আগমন করিলেন। এমন হাসি রাজা অনেকদিন দেখেন নাই। রাণী বলিলেন, “একছড়া মুক্তার মালা তোমাকে দিয়া হইল না, এ ছড়া কেনন হইল দেখ দেখি।”

রাজা রাণীর কণ দেখিলেন—খৌর কণ্ডুগ্রীবা আগ্রহন করিয়া সেই বিশাল মুক্তামালা প্রভাতালোকে জ্বলিতেছে। রাজা বিস্মিত হইয়া কহিলেন, “কোথার পাইবে?” তাহার পর রাণীর নিকটে আসিয়া উত্তম-রূপে দেখিলেন, সহসা কহিলেন, “দেখি! দেখি!”

রাণী গর্জনারত তরীতে, কৌতুক-প্রদীপ্ত নয়নে, প্রভাতধরে পাড়াইয়াছিলেন। কহিলেন, “দেখ, ভাল করিয়া দেখ।”

রাজা ভাল করিয়া দেখিলেন, হুই একটা মুক্তা স্পর্শ করিয়া, উ-টাট্টয়া পান্টাইয়া দেখিলেন, তাহার পর উচ্চহাস্য করিয়া উঠিলেন, কহিলেন, “এ ছড়া কত বিয়া কৰ্ম করিয়াছ ?”

রানীর মুখ রক্তবর্ণ হইয়া উঠিল। লজ্জা, ক্রোধ, অক্ৰিয়তা, অপমান, কত ভাব মুখে ব্যক্ত হইবার উদ্যম করিতে লাগিল, অবশেষে ক্রোধই প্রবল হইয়া উঠিল। কহিলেন, “তোমাকে ত আর কিনিয়া দিতে হয় নাই।”

রাজা পূর্ববৎ হাসিতে লাগিলেন, বলিলেন, “এ-রকম একছড়া পাইলে কি তুমি সন্তুষ্ট হও ? এ যে তুট্টা !” রাজা রানীর কর্ণলয় একটা মুক্তা লইয়া হুই অঙ্গুলি দিয়া টিপিলেন। মুক্তা চূর্ণ হইয়া রাজার কর্ণতলে পতিত হইল।

“কি কর ! কি কর !” বলিয়া রানী রাজার হস্তধারণ করিলেন। তৎপরে কণ্ঠের মালা মোচন করিলেন। রাজা কর্ণতলগত চূর্ণ রানীকে দেখাইলেন। বৃদ্ধ কাচ, চূর্ণ প্রভৃতি কয়েকটা সামগ্রী—মুক্তাচূর্ণের মত কিছুই নাই !

রানী মাঝা মুক্তা অনেক দেখিয়াছিলেন, মুঠা কখন দেখেন নাই। রাজার কথা শুনিয়া ও সেই কাচ প্রভৃতি চূর্ণ দেখিয়া তিনি বাবুশূন্য হইলেন। রাজা হাসিতে হাসিতে বাহিরে চলিয়া গেলেন।

তখন রানীর চৈতন্য হইল। উদ্যানে বৃক্ষতলে দিয়া দেখিলেন, গর্ভ পুত্র রহিয়াছে ! ক্রিষ্টিয়া আসিয়া নীরাকে ডাকিয়া নিতুভাগারে লইয়া গেলেন। পরমাপ্রসন্ন

কণ্ঠমালা হস্তে ছিল, সেই মালা নিকেশ করিয়া নীরার মুখে আঘাত করিলেন। সে যেন কিছু জানে না, রানীর মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

রানী কহিলেন, “বাবি, তোকে শূলে দিব জানিন্ !”

বাবি বলিল, “আমার অপরাধ ?”

“একটা শুণ্ড চোরকে সাধু-সন্ন্যাসী বলিয়া হানঘাটাতে আনিয়া, তাহার সঙ্গে পরামর্শ করিয়া আমার সমস্ত অলঙ্কার চুরি করিয়াছিস্। আর এট মুক্তার মালা—যোধাবাইরের মালা’র অপেক্ষাও বহুমূল্য, না ?”—পদধাওয়া রানী মুঠা মুক্তা চূর্ণ করিয়া ফেলিলেন।

নীরা কপালে কড়াঘাত করিয়া কাঁধিতে লাগিল, “রানীজি, আমি কি জানি যে, সে সন্ন্যাসী এমনতর লোক ? আমি ত তাহার সকল কথাই বিশ্বাস করিয়া তাহাকে লইয়া আদি, সে যে এরকম লোক, কেমন করিয়া জানিব ? তোমার যে অলঙ্কার পোতা ছিল—”

“আমি দেখিয়া আসিয়াছি—মাই।”

“কি সর্বনাশ ! কোতওয়ালকে ধবস দাও, তাহাকে ধরিবে।”

“আর তুমি ?”

“আমি ত পালাই নাই, তোমার কাছেই আছি, শূলে দাও, কাঁসি দাও, বাধা ইচ্ছা হয়, কর।”

“বেশবরে এই মুক্তার মালা কে রাখিয়াছিল ?”—রানী পদধলিত চূর্ণের প্রতি কটাক্ষ করিলেন।

“আমি যদি রাখিয়া থাকি ত আমার হুই

হাত বেন গলিয়া পড়িয়া বসিয়া যায় ।”
বীরার চক্ষে শ্রাবণের ধারা বহিতে লাগিল ।

রাণী কহিলেন, “অমাবসের চান্দুক পিঠে
পড়িলে আপনি সভ্যকথা বলিবে।”

বীরার বোদন বন্ধ হইল না, কিন্তু
বোদনের সঙ্গে সঙ্গে সে বলিতে লাগিল,
“আমি ত কোন কথা গোপন করিতে
চাহিনা, তা আমাকে যে শাস্তি ইচ্ছা হয়,
দাও। তুমিই বিজ্ঞাসা কর, আর রাজাই
বিজ্ঞাসা করুন, আমি কি কিছু লুকাইতেছি ?
সন্ন্যাসীর কাছে ত আমি তোমাকে লুকাইয়া
দাই নাই। সে যাহা বলিত, সকল কথা
তোমাকে আসিয়া বলিতাম, এখন তাহাকে
উন্মানে ডাকিয়া লইয়া আসি, তাহাও
তোমার অঙ্গুষ্ঠতক্রমে। বৃক্ষতলে তুমি
স্বহস্তে অলঙ্কার রক্ষা করিয়াছিলে, সন্ন্যাসী
আসিলে তাহাকে দেখিয়াছিলে। আমি
সর্বদা তোমার নিকটেই ছিলাম, আজ এ
পর্যন্ত বাড়ীর বাহির হই নাই। রাজা
বিজ্ঞাসা করিলে, তাহাকেও বলিব।”

শুনিতে শুনিতে রাণীর অঙ্গ হইল বেঁট,
এতক্ষণ তিনি দাসীর অপরাধ দেখিতে-
ছিলেন, আত্মগোপন একবারও ভাবিয়া
দেখেন নাই। এই সকল কথা শুনিলে
রাজা তাহাকে কি বলিবেন ? রাণী বীরাকে
বলিলেন, “আচ্ছা, আমি ভাবিয়া দেখিব।
এখন রাজাকে বলিবার কোন আবশ্যক
নাই।”

বোদন ভুলিয়া, অন্ন হাসিয়া, দাসী সরিয়া
গেল।

বীরা পলায়ন করে নাই। অটোগ্রাফ
বত শীঘ্র ত্যাগ করা যায়, রাজবাটীর দাসী-

চিহ্ন তত শীঘ্র ত্যাগ করা যায় না। পলা-
ইলে বীরার বত আশঙ্কা, না পলাইলে তত
নয়। রাণী নিজে ধরা না দিয়া দাসীকে
ধরাইয়া দিতে পারিবেন না।

অন্য কোন কথা সে সম্বন্ধে প্রকাশ না
করিয়া রাণী রটাইলেন যে, তাঁহার অলঙ্কার
চুরি গিয়াছে। অধিকাংশ অলঙ্কার হীরা-
মুক্তার—আবার পাওয়া গেল। অন্ন-অন্ন
স্বর্ণ ছিল, সেইওলা গেল।

প্রাপ্তি ।

আগ্রা হইতে বীরার পরিচিত এক ব্যক্তি
বিলাসপুরে আসিয়াছিল। সে শুনিয়া
গেল যে, বিলাসপুরের রাণী, যোধাবাই-বেগ-
মের কণ্ঠমালায় মত মুক্তা-হারের ভজ
পাগল হইয়াছেন।

ক্রমে এই কথা যোধাবাই-বেগমের
কর্ণে উঠিল। একজন দাসী তাহাকে
বলিল, “শুনিয়াছ বেগমসাহেব, এক রাণী
মুক্তার কণ্ঠ গড়াইতেছে, তোমার অপেক্ষাও
না কি উৎকৃষ্ট হইবে ?”

যোধাবাই একে রাজপুতকন্যা, অশ্রের
ছহিতা, তাহাতে রাজরাজেশ্বরী, আকবর-
শাহের মহিষী। কোথেকে তাহার চক্ষু জলিয়া
উঠিল, কহিলেন, “কাহার এমন স্পর্ধা ?
তাহাকে বাঁদীর বাঁধী করিয়া রাখিব।”

“বিলাসপুরের রাণী।”

বেগমের কোথাপি তৎক্ষণাৎ নির্দোষিত
হইল। হাসিয়া কহিলেন, “কে ? চত্রাবতী ?”

“সে-ই।”

“মুক্তার মালা কি পাইয়াছে ?”

“কোথায় পাইবে ? তোমার মত মালা
কি পৃথিবীতে আর কোথাও আছে ?”

বেগম অক্লান্ত হইয়া কি ভাবিতে লাগিলেন।

এদিকে, বিলাসপুরে রাণী চন্দ্রাবতী ভণ্ড সন্ন্যাসীর কথা রাজার নিকট অধিক-দিন গোপন করিতে পারিলেন না। সকল কথা প্রকাশ না হইক, অনেক কথা প্রকাশ হইয়া পড়িল। তুমিহা রাজা হাত করিলেন ও রাণীকে অনেক বিরূপ করিলেন। মুন্সীর হারের অন্ত রাণী রাজাকে আর অধিক তাক করিতে পারিতেন না। হারের কথা ক্রমে লোকে বিস্তৃত হইতে লাগিল।

এমন সময় সংবাদ আসিল, বাদশাহ বিলাসপুরের নীচের ভঙ্গলে শিকার করিতে আসিতেছেন। তখন আর কোন কথাই কাহারও শ্রবণ রহিল না। রাজ্যের সর্বত্র চলছিল পড়িয়া গেল। বাদশাহের শিকারের অন্ত রাজ্যের বহু হস্তী ও অশ্ব প্রেরিত হইল। চারিদিকে বন্যের উল্লাস হইতে লাগিল। নানাবিধ উপত্যকনাদি গাইয়া রাজা বাদশাহের আগমনের অন্ত আগ্রহ হইয়া প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন।

বাদশাহের আগমন ত সহজ ব্যাপার নহে। তিনি যেখানেই গমন করুন, তাঁহার সঙ্গে একটি রাজধানী চলিত। বাজার-বাট, লোকজন, দাসদাসী, বাহিরের লোক বিলিয়া আর লক্ষ্যন হইত। এখন বাদশাহ মুগ্ধার বাইবেন বলিয়া অল্প লোক, তথাপি দশ-বিশ-সহস্র হইবে।

রাজা প্রতাপসিংহ নজর দিয়া বাদশাহকে অভিবাসন করিলেন। বাদশাহ রাজাকে নুতন উপাধি প্রদান করিলেন ও পাচমহল অদ্বারোহী নৈবেদ্য অশাক নিযুক্ত

করিলেন। এ সম্মান পাইবার রাজা কিছু-মাত্র আশা করেন নাই।

বাদশাহের সঙ্গে বোধাবাই-বেগম আসিয়াছিলেন। তাঁহার স্বতন্ত্র শিবির, সমুদ্র আরোহণ স্বতন্ত্র। মোগল বাদশাহের নহিবা হইয়াছিলেন বটে, কিন্তু বোধাবাই স্বার্থ পরিত্যাগ করেন নাই। আগ্রা-দুর্গে তাঁহার মহল দেখিলেই বুঝিতে পারা যায় হিন্দুর অট্টালিকা, অপর কোন মহলের সহিত তাহার সাম্য নাই। বোধাবাই নিষ্ঠাবতী হিন্দুস্তানীর মত বাগ করিতেন; আকবরও তাহাতে কোন আপত্তি করিতেন না, কারণ ধর্ম্মস্বত্ব তাঁহার উদারতা অসীম। বোধাবাইর মহলের খোজা গিয়া প্রতাপ-সিংহকে সংবাদ দিল, বেগমসাহেব রাণী-সাহেবের সহিত সাক্ষাৎ করিতে চাহিয়াছেন।

এরূপ আবেশ লঙ্ঘন করিতে পারা যায় না। রাজা বিলাসপুরে সংবাদ পাঠাইয়া রাণীকে আনয়ন করাইলেন। রাণী শিবিকা আরোহণ করিয়া মহাসমারোহে বেগম-দর্শনে গমন করিলেন।

বোধাবাই চন্দ্রাবতীকে স্বগত বিজ্ঞাপা করিয়া আপনার পার্শ্বে উপবেশন করাইলেন, কহিলেন, “আমি তোমার নাম অনেকদিন শুনিয়াছি, একবার দেখিবার সাধ ছিল।”

উভয়ে পদম্পর্ক দেখিতেছিলেন। চন্দ্রাবতী বোধাবাইয়ের অপেক্ষা সুন্দরী বটে, কিন্তু বেগমের তেজোদর্পে সে রূপ পরিত্যক্ত হইল।

বেগম রাণীকে অনেক কথা বিজ্ঞাপা করিলেন, রাণী উত্তর দিতে লাগিলেন, কিন্তু প্রগল্ভতা-প্রদর্শন-ভয়ে অধিক কিছু বিজ্ঞাপা

করিলেন না । যোধাবাই কথাবার্তা কহিতে লাগিলেন, কিন্তু চম্ভাবতীকে কিছু আহার করিবার অমুদ্রোধ করিতে সাহস হইল না । যোধাবাই প্রাণপণে হিন্দুধর্ম রক্ষা করিলেও তিনি বদনী ; চম্ভাবতী তাঁহার গৃহে বল্প্পর্শ করিতেন না ।

অবশেষে চম্ভাবতী বিদায় গ্রহণ করিবার মানসে পাক্সোখান করিলেন । তখন বেগম একজন দাসীকে সঙ্কেত করিলেন । বেগমও উঠিয়া রাণীর সহিত কয়েক পদ গমন করিলেন, এমন সময় দাসী হস্তবস্ত্রনির্ধৃত, কাঞ্চকাঁথাখচিত, একটু ক্ষুদ্র পেটিকা লইয়া আসিল । বেগম পেটিকা খুলিয়া সেই অমূল্য মুক্তার কণ্ঠমালা বাহির করিলেন ! যে মাগার তুলা আর একছড়া মাগার লজ্জ রাণী রাজা ভোণপাড় করিয়াছিলেন, বাহার বুধা আশার তাঁহার অলঙ্কাররাশি গিয়াছিল, সেই মালা আজ তাঁহার চক্ষের সম্মুখে ! বেগম কি সমস্ত কথা তনিয়াছেন ও সেইলজ্জ তাঁহাকে অপমান করিতেছেন ?

বেগম মালা রাণীর গলায় পরাইয়া দিলেন । দাসীকে কহিলেন, “রাণী-নাহেবকে শিবিকাখ তুলিয়া দিয়া পেটিকা তাঁহার সঙ্গে দিয়া আইস ।”

রাণীর পদতলে ধরনী বেন দিখা হইল । লজ্জার আকর্ণপণ্ড রক্তবর্ণ হইয়া উঠিল । বলিলেন, “এ মালা অমূল্য ; আমি ইহার অযোগ্য ।”

বেগম রাণীর চিবুক ধারণ করিলেন, বলিলেন, “এ মালা তোমারই যোগ্য । তুমি ইহা কণ্ঠে ধারণ করিয়া যোধাবাইকে কখন কখন দ্রবণ করিও !”

রাণী নিরন্তরে বিদায় গ্রহণ করিলেন ।

সমাাপ্ত ।

এই ত সেই মুক্তামালা !

ইহারই লজ্জ রাণী রাজ্যে অশান্তি উৎপাদন করিয়াছিলেন । ইহার লজ্জও নহে, কারণ ইহার তুলা আর একছড়ার লজ্জ রাণী উত্তলা, এছড়া যে কখন পাইবেন, এক্ষণে অপ্নেও বনে করেন নাই । অথচ যোধাবাইর সেই মালাই তিনি কণ্ঠে ধারণ করিয়াছেন ।

কিন্তু কল্পনার যে আনন্দ অমুভব করিতেন, বাস্তবিক ত তাহার কিছুনার অমুভব করিলেন না !

রাণী ফিরিয়া আসিয়া দেখিলেন, রাজা তাঁহার প্রতীক্ষায় পাড়াইয়া রহিয়াছেন । রাজা রাণীর কণ্ঠে নিরীক্ষণ করিতেছিলেন । মাগার কথা ইতিপূর্বেই রাষ্ট্র হইয়া গিয়াছিল ।

রাজা কহিলেন, “দেখি, দেখি, বেগমের প্রসাদ দেখি !”

রাণী ক্রোধে মুক্তামালা ছিন্ন করিয়া নিক্ষেপ করিতে উত্তত হইলেন ।

রাজা হস্তসঞ্চালন করিয়া তাঁহাকে নিষেধ করিলেন, কহিলেন, “ইহা বাদশাহের বেগমের প্রসাদ, সম্রাটের চলনা নহে । বেগমপ্রদত্ত মালা তুমি তুমিতে নিক্ষেপ করিয়াছ, এ কথা প্রকাশ হইলে আমরা বিপদে পড়িব ।”

রাণী মুক্তামালা কণ্ঠ হইতে উন্মোচন করিয়া বাস্তে তুলিয়া রাখিলেন । মুক্তামালা বাস্তে উঠিল বটে, কিন্তু রাণীর কণ্ঠে আর উঠিল না ।

ত্রীনগেন্দ্রনাথ গুপ্ত ।

তরল-বায়ু ।

প্রায় ৭৫ বৎসর পূর্বে, যখন আচার্য্য ক্যারাডে সর্বপ্রথমে বায়বীয় পদার্থ তরলীকৃত করিবার উপায় আবিষ্কারের জন্য অহো-রাত্র পরীক্ষাধারে আবদ্ধ থাকিতেন, সেই সময়ে আচার্য্যের জ্ঞানৈক বদ্ধ তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন,—“তোমার এই আবিষ্কার-দ্বারা সংসারের কি উপকার হইবে?” ক্যারাডে তদুত্তরে বদ্ধবরকে বলিয়াছিলেন,—“শিশুসম্মানদ্বারা গৃহস্থের কি উপকার হয় বলিতে পার?” তরলীকৃত বায়বীয় পদার্থ যে একদিন সংসারের নানা-কার্য্যে ব্যবহৃত হইবে, সেই প্রাথমিক বৈজ্ঞানিকস্থে প্রাচীন অধ্যাপক ক্যারাডে তাহা বিবাক্ষুতে স্পষ্ট দেখিয়াছিলেন। সাংসারিক সহস্রকার্য্যে তরলীকৃত বায়ুর নানা উপযোগিতা ও বায়ু তরল করিবার সহজ প্রক্রিয়ার ব্যাপার আবিষ্কৃত হওয়ার, স্বর্ণীয় আচার্য্যের পূর্বোক্ত উক্তিটির প্রত্যেক বাক্য ভবিষ্যদ্বাণীর ভাষা সকল হইল বলিয়া মনে হইতেছে,—এখন সত্যই ক্যারাডের সেই অক্ষয় শিশুসম্মানটি পূর্ণতা-লাভ করিয়া, এক অদ্বিতীয় শক্তিধারা সংসারের ছোট-বড় নানা কাজ সহজে সম্পন্ন করিবার আরোহণ করিতেছে।

যে মূলপদ্ধতিক্রমে বায়ু তরলীকৃত হইয়াছে, সেটা অতি সহজ এবং সকলেরই পরিজ্ঞাত। ডাল্টন্ ও ক্যারাডে হইতে আরম্ভ করিয়া, ছোট-বড় বিজ্ঞানবিন্-মায়েই,

সেই একই পদ্ধতিক্রমে বায়বীয় পদার্থ তরল করিবার চেষ্টা করিয়া আসিতেছিলেন, কিন্তু সহজে সেই পদ্ধতিপ্রয়োগের কৌশল জানা না থাকায়, প্রাচীন ও আধুনিক বিজ্ঞানবিশ্বগণের সকল চেষ্টা ব্যর্থ হইয়া আসিতেছিল। অরুদিন হইল, অধ্যাপক ডিওয়ার-(Dewar)-নারক জ্ঞানৈক পণ্ডিতের আবিষ্কৃত কৌশলক্রমে মার্কিন শিল্পী ট্রিপ্লার-(Tripler)-সাধেব বায়ু তরল করিবার একটি যন্ত্র গঠন করিয়া, জগতের একটা মহান উপকার সাধনের উপক্রম করিয়াছেন।

চাপ ও শীত প্রয়োগ ব্যতীত বায়বীয় পদার্থ তরল করিবার উপায়ান্তর নাই। একটা দৃঢ় কাচগোলকের মধ্যে পম্প দ্বারা বাহিরের বায়ু বা অপর কোনও বায়বীয় পদার্থ প্রবেশ করাইলে, কাচগোলকের ভার ক্রমেই বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়; কারণ যে বায়বীয় পদার্থ পূর্বে মুক্তাবস্থায় বাহিরের অনেকটা স্থান অধিকার করিয়াছিল, তাহাই এখন গোলক-সম্বাহিত ক্ষুদ্রস্থানে সঙ্কুচিত হইয়া রহিয়াছে। বায়ু, অক্সিজেন, হাইড্রোজেন ইত্যাদি অম্লত বায়বীয় পদার্থগুলিকে পূর্বোক্তপ্রকারে গোলকাবদ্ধ করিতে থাকিলে, তাহার অবস্থা ক্রমে কিপ্রকারে পরিবর্তিত হয়, তাহা প্রত্যক্ষ দেখিবার উপায় নাই, কিন্তু একটু চিন্তা করিলে স্পষ্টই বুঝা যায়, মুক্তাবস্থায় যে বায়ুশিশু বৃহৎ স্থান অধিকার করিয়াছিল,

এখন তাহাই ক্ষুদ্র গেলিকগর্ভে আবদ্ধ হইয়া পড়ায়, বায়ুর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অণুগুলি নিশ্চয়ই ঘনসন্নিবিষ্ট হইয়া পড়িবে। সুতরাং দেখা যাইতেছে, বায়বীয় পদার্থের পরস্পর দূরবিচ্ছিন্ন অণুগুলিকে পূর্বোক্ত প্রক্রিয়া দ্বারা বেশ সহজে ঘনসন্নিবিষ্ট করা যাইতে পারে। এতদ্ব্যতীত বায়বীয় পদার্থের অণু ঘনসন্নিবিষ্ট করিবার আর একটা উপায় আদি। পত্রীকা করিয়া দেখা গিয়াছে, আবদ্ধ বায়ুতে পূর্বোক্ত প্রকারে চাপ না দিয়া, তাহাকে কেবলমাত্র দীপ্ত করিলেও, ঠিক চাপ-প্রয়োগের অধরূপ কল পাওয়া যায়। কতিপয় বায়বীয় পদার্থ কেবল চাপ-প্রয়োগেই তরলাপ্ত হয়। কিন্তু অক্সিজেন, হাইড্রোজেন প্রভৃতি বায়ু যুগল শৈত্য ও চাপ প্রয়োগ না করিলে তরল হয় না। ফলে প্রত্যেক বায়বীয় পদার্থেরই একটা নির্দিষ্ট উষ্ণতার সীমা আছে। যতক্ষণ সেই বায়ু সেই সীমার উচ্চে উষ্ণ থাকে, ততক্ষণ, যতই চাপ প্রয়োগ কর, উহা তরল হইবে না। শৈত্য-প্রয়োগে উষ্ণতা ক্রমশ কমাইয়া গেই সীমার নিম্নে লইয়া যাও; পরে চাপ প্রয়োগ করিলে উহার তরলাপ্ত হয়।

প্রাচীন ও আধুনিক পণ্ডিতগণ পূর্বোক্ত-প্রকারে চাপ ও শৈত্য প্রয়োগদ্বারা অনেকগুলি বায়বীয় পদার্থ তরলীভূত করিয়াছেন, অধ্যাপক ডিওয়ার (Dewar)-সাহেবও ঠিক ঐ প্রকার একই কালে চাপ ও শৈত্য প্রয়োগ করিয়া বায়ু তরল করিয়াছেন।

একজন পণ্ডিতে পুত্রজীবনব্যাপিনী গবেষণায় একটা বড় বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার

সাধনের কথা অসম্ভব না হইলেও, অগতে তাহা বড়ই দুর্লভ। গত একশত বৎসর হইতে নানোদেশীয়-পণ্ডিতগণ-কণ্টক বায়বীয় পদার্থ তরলীভূত করিবার যে আয়োজন হইয়া আসিতেছিল, অধ্যাপক ডিওয়ার পূর্বপণ্ডিতগণের সংগৃহীত তথ্য অবলম্বন করিয়া, তাহাদেরই সন্নিহিত পত্রীকাকারে কিছুদিন গবেষণা করিয়া, বায়ু তরলীভূত করিয়াছেন যাত্র। শতাব্দিক বৎসর পূর্বে ফ্যারাডের স্ত্রীর অগণিষ্ঠা পণ্ডিত ডাল্টন ও বায়ু তরল করা সম্ভবপর বলিয়া অস্বাভাবিক করিয়াছিলেন, এবং কেবল চাপ ও শৈত্য প্রয়োগে যে বায়বীয় পদার্থমা এই তরলীভূত হইতে পারে, এ কথাও তিনি স্পষ্ট বলিয়া-ছিলেন, কিন্তু সহজে অধিক চাপ ও শৈত্য প্রয়োগের কোণল তখন জানা না থাকায়, তাহার উক্তি সত্যতা সেই সময়ে সম্পূর্ণ বুঝা যায় নাই।

১৮২৩ খৃষ্টাব্দে তৎকালিক ইংরাজ বিজ্ঞানবিশ্বগণের নেতা আচার্য ফ্যারাডে, ডাল্টনের নির্দিষ্ট প্রথায় ক্লোরিন বাষ্প তরল করিয়া, লড়বিজ্ঞানের এই অংশ-বিশেষের দিকে দক্ষপ্রথমে বিজ্ঞানবিশ্বগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন; কিন্তু তৎকালে বিষয়টার গুরুত্ব কেহই ভাল বুঝিতে পারেন নাই,—তজ্জন্ত তা'র পর বহুকাল পণ্ডিতগণের নিকট হইতে সে সম্বন্ধে কোনও নূতন সংবাদ পাওয়া যায় নাই। সেবে ১৮৪৪ অব্দে অধ্যাপক থাইলোরিয়ার (Thilorier) অস্বাভাবিক বাষ্প তরল করিয়া পরে তাহাকে কঠিনাকারে পরিণত করিয়াছেন ওনিয়া, বৃহৎ আচাৰ্য্য ফ্যারাডে-প্রণীত পণ্ডিতগণ

আবার নবোৎসাহে পরীক্ষারত হইয়াছিলেন। ক্যাম্ব্রিড্জের অসাধারণ অধ্যাপক ও পরীক্ষা-নৈপুণ্যে পরিজ্ঞাত ব্যারবীর পদার্থের মধ্যে অবিকাশেই তরল করিবার কৌশল এই সময়ে প্রচারিত হইয়াছিল; কিন্তু অস্মিৎসেন, নাইট্‌জেন ও হাইড্রোজেন, এই তিনটি ব্যারবীর পদার্থ তরলীকৃত করিবার কৌশল তাঁহাদের মধ্যে কেহই আবিষ্কার করিতে পারেন নাই। প্রধান পণ্ডিতগণের সমবেত চেষ্টা ব্যর্থ হইতে দেখিয়া, অস্মিৎসেন প্রতীতি বাষ্পের স্থায়ী বাষ্প (Permanent Gas) বলিয়া এই সময়ে বিজ্ঞানবিশ্বগণের মনে একটা সন্দেহ উপস্থিত হইয়াছিল। ফলে কেবলমাত্র চাপ দ্বারা ইহাদিগকে তরল করা যায় না। পূর্বে কোনরূপে ইহাদের উষ্ণতা কমানিতে হইবে, তৎপরে চাপ-প্রয়োগে তারিণ্য জন্মিবে।

ইহার পর কিছুদিন কোন পণ্ডিতই এই বিষয়ের পুনঃপরীক্ষার হস্তক্ষেপ করেন নাই,—কুড়ি বৎসর পূর্বেও অস্মিৎসেন প্রতীতি বাষ্প “স্থায়ী বাষ্প” বলিয়া পণ্ডিত-গণের মনে দৃঢ়বিশ্বাস ছিল। তার পর স্ত ১৮৭২ অব্দে ফরাসী পণ্ডিত কাইল্‌টে (Caillietet) এবং জর্জান অধ্যাপক পিক্টেটের (Pictet) পরীক্ষানৈপুণ্যে তথাকথিত “স্থায়ী বাষ্প”গুলি তরল করিবার পদ্ধতি আবিষ্কৃত হইলে, কোন বাষ্পই স্থায়ী নয় বলিয়া পণ্ডিতগণের বিশ্বাস হইয়াছিল। বায়ু তরল করিবার চেষ্টা এই সময় হইতে আরম্ভ,—অধ্যাপক ডিওয়ার এই কয়েক বৎসর নীরবে গবেষণা করিয়া সম্ভ্রান্তি বিজ্ঞানবিশ্বগণের বহুকালপোষিত আশা পূরণ করিয়াছেন।

ভরল বায়ু হঠাৎ দেখিলে, মিনিখটাকে পরিষ্কার জল বলিয়া ভ্রম হয়,—সুস্পষ্ট, উজ্জলতা ও স্বর্ণ প্রভৃতিতে ইহা প্রায় জলের অনুরূপ, কিন্তু সাধারণ অবস্থায় ইহা অসুস্পষ্ট ঐতল। বহু প্রকৃতি পদার্থ তাহার সংস্পর্শে আদিবাস্যই জমিয়া কঠিনাকার প্রাপ্ত হয়। পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে, বরফের তুলনায় ভরল বায়ু প্রায় ৩৪০ ডিগ্রি পরিমাণে ঐতল। কোন একটা পদার্থকে বাষ্পীভূত করিতে হইলে, আমরা সাধারণত তাহাতে তাপ প্রদান করিয়া থাকি,—কিন্তু তরল বায়ু স্বতই এত অধিক ঐতল যে, বরফের দ্বারা নীতল পদার্থ তাহাতে অগ্নির দ্বারা কার্য্য করিয়া থাকে; পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে, কিয়ৎকাল বরফাচ্ছন্ন রাখিলেই, তরল বায়ু বরফের তাপেই ফুটাই শীত বাষ্পীভূত হইয়া যায়।

এতদ্ব্যতীত তরল বায়ুর আরো অনেক-গুলি ধর্ম আবিষ্কৃত হইয়াছে। ত্রয়োদশাতম পদার্থের উপর তাহার কার্য্যটা বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

বিজ্ঞানবিশ্বগণ পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন, অতি অল্পপরিমাণ তরল বায়ু ক্ষণ-কালের অন্তর কোন ধাতুর সংস্পর্শে আদিলেই তাহাকে সম্পূর্ণ রূপান্তরিত করিয়া তোলে। কঠিন ইস্পাত বা লৌহ তরল বায়ুর স্পর্শে কাচবৎ ভঙ্গপ্রবণ হইয়া পড়ে, কিন্তু তাম্র, রৌপ্য ও স্বর্ণ প্রভৃতি ধাতু আবার তাহারই সংযোগে মৌলিকবৎ কোমলতা প্রাপ্ত হয়। তরল বায়ুর অপভ্রংশ ধর্ম আবিষ্কারের অন্তর আশ ও খুব পরীক্ষা চলিতেছে—এবং সহজে বাষ্পীভূত হইবার যে একটা প্রধান ধর্ম

ইহাতে দেখা যায়, কল-কারখানার কাছে, তাহা সাধারণ জনীয় বাষ্পের শক্তি অপেক্ষা অধিক উপযোগী হইবে বলিয়া মনে হইতেছে। একজন বিজ্ঞানবিৎ পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন, তরল বায়ুর সম্প্রদায়-শক্তি অগ্নিগন্ত্য বারুদ বা লিভাইট অপেক্ষাও অধিক, বাহাতে তদ্বারা বস্ক ও কামানের গোলাগুলি চালাইবার সুব্যবস্থা হয়, তদ্ব্যতীত অনেকে সচেষ্ট আছেন।

আমাদের প্রচলিত নিত্যব্যবহার্য পদার্থ অপেক্ষা কার্যোপযোগী দ্রব্যাদির আবিষ্কার-সম্ভার আধুনিক বৈজ্ঞানিক যুগে বড় হ্রাস পাইয়াছে, কিন্তু এই সকল নূতন দ্রব্যকে পুরাতনের স্থান অধিকার করিতে কদাচিৎ দেখা গিয়া থাকে। বায়বাহ্য নূতনের প্রচলনের প্রধান অন্তরায়,—সাধারণত এই সকল নূতন দ্রব্যাদি প্রস্তুত করিবার ব্যয় এত অধিক দেখা যায় যে, উপযোগিতা ও ব্যয়ে প্রায়ই সামঞ্জস্য থাকে না, কাজেই সেগুলি সংসারে পুরাতনকে স্থানচ্যুত করিতে পারে না, এজন্যই সেই করাদী পণ্ডিতের আবিষ্কৃত হীরক-প্রস্তুত-প্রণালী আজও তাঁহার ক্ষুদ্র পরীক্ষাগারের বাহিরে আসিতে পারে নাই। তরল বায়ুর আবিষ্কারসংবাদ ও তাহার নানা কার্যোপযোগী গুণের কথা প্রথমে প্রচারিত হইলে, ইহাকেও কৃত্রিম হীরকের স্তায় কেবল ল্যাবরেটোরির পরীক্ষণীয় ব্যাপার বলিয়া অনেকে মনে করিয়াছিলেন; কিন্তু সম্প্রতি ট্রিপ্লার-

নামক জটিল মাকিন যন্ত্রবিহীন অতি সরল-ব্যয়ে তরলবায়ু প্রস্তুত করিবার উপায় উদ্ভাবন করিয়া এই সম্ভেদ দূর করিয়াছেন। অধ্যাপক ডিওয়ার এক আউল তরলবায়ু প্রস্তুত করিতে প্রায় ছয়শত গিনি ব্যয় করিয়াছিলেন, কিন্তু ট্রিপ্লার এখন একশত গিনিতে এক পাইপেরও অধিক তরলবায়ু প্রস্তুত করিতেছেন এবং দ্বিগুণই ইহা অপেক্ষাও অল্পব্যয়ে তরলবায়ু পাওয়া যাইবে বলিয়া আশ্বাস দিতেছেন।

ট্রিপ্লারের বায়ু তরল করিবার কৌশলটা অতি সূক্ষ্ম ও সহজ। প্রথমে বায়ু তরল করিবার সময় সর্বাধিক-পাত্রাবদ্ধ বায়ু নীতল করিবার জন্য অধ্যাপক ডিওয়ার, নাইট্রস অক্সাইড ও ইথেনিন বাষ্প ইত্যাদি ব্যবহার করিয়াছিলেন, ট্রিপ্লার তাঁহার নবোদ্ভাবিত পদ্ধতিতে কোন রাসায়নিক পদার্থেরই সাহায্য না লইয়া কেবল বায়ুদ্বারা বায়ুকে লম্বাইয়া তরল করিবার সুব্যবস্থা করিয়াছেন। বায়বীয় পদার্থে তাপ প্রয়োগ করিয়া সর্বাঙ্গস্থানে আবদ্ধ করিলে, সঙ্কোচনকালে সেই-পদার্থ-বিশিষ্ট অনেক তাপ স্বতই বহির্গত হইয়া পড়ে * ; এবং আবার সেই সর্বাঙ্গস্থান হইতে মুক্ত হইলেই উহা প্রশান্ত হইয়া ও প্রশান্তকালে বাহির হইতে তাপ আত্মসাৎ করিয়া, নিকটস্থ পদার্থগুলিকে নীতল করিতে থাকে। বায়ু-তরলীকরণ-ব্যাপারে ট্রিপ্লার-সাধেব বায়বীয় পদার্থের কেবলমাত্র এই দ্বিগুণ

* বাহিসিকেল-এর পাঠক, তাঁহার বিস্তারিত চাকার রচনার ধর্মিত বাতাস পূর্ববার সমত, এই ব্যাপারটা সহজে সত্যক করিতে পারিবেন,—ধর্মিতে বহুই সময়ে বাতাস পূর্ণ করা যায়, তাৎক্ষণিক উপরিভাগে সঙ্কচিত বায়ুর পরিভাগ তাপে ততই উষ্ণ হইতে থাকে:

বর্ষের সাহায্য গ্রহণ করিয়াছেন। এই প্রকার, প্রথমেই কতকগুলি দৃঢ় বাস্তব নলে বস্তুর বস্তুর সাহায্যে বায়ু আবদ্ধ রাখিয়া, বরফজল দ্বারা সেগুলিকে বেশ শীতল করা হয়; তা'র পর সেই নলগুলিতে যে এক একটি ক্ষুদ্র বায়ুনির্গমনপথ থাকে, তাহা কিয়ৎকালের জন্য উন্মুক্ত রাখিতে হয়। এইপ্রকারে কক্ষ বায়ু ক্ষুদ্র নির্গমনপথ পাইয়া, যেমন নলমধ্যস্থ অপর বায়ু হইতে তাপ হরণ করিয়া মহাবেষে বর্ধিত হইতে থাকে,—সেই ক্ষুদ্র তাপে অবশিষ্ট বায়ুর উষ্ণতা কমিয়া যায়। এই শীতল বায়ুর কিয়দংশ আবার প্রদারণকালে আরও তাপ হরণ করে; তাহাতে অবশিষ্ট বায়ুর উষ্ণতা আরও কমে। এইরূপে ক্রমশ উষ্ণতা কমিয়া বায়ু অত্যন্ত শীতল হইলে অল্প

চাপেই তরল হইয়া পড়ে। নলে বায়ু আবদ্ধ করিবার ক্ষমতা যে বস্তুর বস্তুর কথা বলা হইয়াছে, ট্রিপ্লার সে বস্তুটিও কেবল তরল-বায়ু দ্বারা চাপাইতেছেন; অল্প, অধিক ইত্যাদি কোন সাহায্য না লইয়া, উক্ত বস্তুর পরিচালনে তিন-পাউণ্ড তরলবায়ু ব্যয় করিয়া, তিনি আর দশ-পাউণ্ড পর্যন্ত তরল-বায়ু প্রস্তুত করিতেছেন।

শুল্ক তরলবায়ু দ্বারা পূর্ণোক্ত ক্ষুদ্র বস্তু পরিচালনে কৃতকার্য হইয়া, ট্রিপ্লার এখন তরলবায়ু-চালিত একটা বৃহৎ বস্তু নির্মাণের জন্য সচেষ্ট আছেন। আধুনিক স্টীমার ও রেলপাড়ি ইত্যাদিতে সংলগ্ন বস্তুর ক্রিয়াকলাপ পরিবর্তন করিলেই, সেগুলি নূতন শক্তির ব্যবহারোপযোগী হইবে বলিয়া তিনি আশ্বাস দিতেছেন।

ঐজগদানন্দ রায় ।

দাবার জন্মকথা ।

দাবা-খেলায় আদিম উৎপত্তিগান ভারতবর্ষ। পারস্য-সাহিত্য-পাঠে জানা যায় যে, এই খেলা ভারত হইতে পারস্যে, পারস্য হইতে আরবে, এবং আরব হইতে সম্ভবত ইরোপে, নীত হইয়া থাকিবে। পুরাতন পারসিকেরা বিদেশীর আবিষ্কৃত বিষয় নিজস্ব করিয়া

লইতে বিশেষ শই ছিল। তাহার্য বাণিজ্য-ব্যপদেশে এ দেশে আসিয়া এখানকার সাহিত্য, শিল্পকলা, ধর্ম, বিজ্ঞান, অস্ত্রশাস্ত্র, জ্যোতিষ প্রভৃতি অনেক বিষয় নিজদেশে বহন করিয়া লইয়া যায়। বিজ্ঞপত্রার হিতোপদেশ গ্রন্থ ৪৫০ পৃষ্ঠায়ে পারস্যে ও ৭০০

খৃষ্টাব্দ হইতে ৮০০ খৃষ্টাব্দের মধ্যে আরবে উপনীত হয়; দাবা-খেলাও বোধ হয় এই সময়েই ভারত হইতে তৎকালে নীত হইয়াছিল। দাঃ উইলিয়ম্ ম্যাক্সমুহোব্দের অনুমান করিয়াছেন, ৫৩১—৫৭৯ খৃষ্টাব্দের মধ্যে বিখ্যাত পারস্যরাজ খলফা নশিরবানের প্রিয় চিকিৎসক ‘বরজু-বেদাশ্রয়’ কাজকুজ হইতে পারস্যারাজ্যে এই খেলা লইয়া যান। (Vide ‘Antiquarian Researches of Asia’ and Prof. Max Muller’s ‘Ancient Sanskrit Literature’.) রাজা রাধাকান্ত দেব বাহাদুর বলিয়াছেন যে, গোড়ের ত্রাশ্বপণ এককালে এই খেলার জন্য বিশেষ প্রসিদ্ধ ছিলেন।

দাবার পুরাতন সংস্কৃত নাম ছিল ‘চতুরঙ্গ’; অমরকোষ অভিধানে চতুরঙ্গ-শব্দার্থ লেখা হইয়াছে—‘হস্তাশ্বরণপাদাতম্’, অর্থাৎ সৈন্য-বিভাগের চারিটি অঙ্গ বা অংশ—হস্তী, অশ্ব, রথ ও পদাতি সৈন্য; রথবংশ প্রভৃতি কাব্যেও এই অর্থই সমর্থিত হইয়াছে। অতএব, এই জাঁড়া যে জাতির মস্তিষ্কসমুদ্ভূত, সে জাতি যে এক সময়ে সমরনিপুণ ছিল, সে বিষয়ে কি আর সন্দেহ থাকিতে পারে ?

পুরাতন পারসিক জাতি এই সংস্কৃত ‘চতুরঙ্গ’শব্দকে অপভ্রংশ করিয়াছিল চতুরঙ; তার পর যখন আরবীয়েরা পারস্যান্ত্রদেশ অধিকার করিল, তখন তাহাদের মধ্যে এই খেলার নাম আরো পরিবর্তিত হইয়া ‘শতরঞ্জ’নামের প্রচলন হইল; কারণ,

আরবী বর্ণমালায় ‘চতুরঙ্গ’ শব্দের আদি ও অন্ত্য বর্ণের অসদ্যাব পরিলক্ষিত হয়। অবশেষে এই ‘শতরঞ্জ’ শব্দ আধুনিক পারস্য-ভাষায় পরিণতীত হইয়া ‘তারতবর্ষে পুনরাগমন করিয়াছে এবং তাহার আদিম-অর্থ-যুক্ত ‘চতুরঙ্গ’সংজ্ঞা সকলের মন হইতে একেবারে অগম্য হইয়া পড়িয়াছে। এক্ষণে ‘শতরঞ্জ’শব্দকেই অর্থযুক্ত করা হইয়াছে—‘শত ব্যক্তিকে যেরূপন করে, তাহারই নাম শতরঞ্জ।’

এই ‘শতরঞ্জ’শব্দ আরো পরিবর্তিত হইয়া ভিন্ন ভিন্ন দেশে ভিন্ন ভিন্ন অদ্ভুত অর্কার ধারণ করিয়াছে, যথা—শতরক, দ্যাক্টি, ইচেক্‌স্। ইংরাজিতে অবশেষে ইহা সংক্ষিপ্ত ‘চেস’মায়ে পর্য্যবসিত হইয়াছে। (বিবর্তনের বিশেষ বর্ণনা Antiquarian Researches of Asia নামক পুস্তকে দ্রষ্টব্য।) এই ‘চেস’ হইতেই ‘চেক’- নাম করা)-শব্দের উৎপত্তি।

‘দাবা’শব্দে যেমন খেলাকে বুঝায়, তেমনি মস্তীকেও বুঝায়। বোধ হয়, ‘দাবা’-শব্দ পারসিক দেওয়ান-(দবান)-শব্দের অপভ্রংশ। তাই ‘দাবা’শব্দে মস্তীকে বুঝাইয়াছে। তার পর মস্তীই খেলার প্রধান বল বলিয়া তাহারই নামে সমগ্র খেলার নামকরণ হইয়া থাকিবে। ‘পিল’ বা ‘কিল’ শব্দও পারসিক, অর্থ—হস্তী।

আধুনিক খেলার অগুদাশি-প্রক্রিয়া কোন প্রাচীন সংস্কৃতগ্রন্থে আছে কি না,

১. বিভিন্ন জাতির ভাষায় উপর উক্তর ভাষায় যথেষ্ট প্রভাব; এজন্য পারস্যের ১৫ তাহানের ‘চতুরঙ, চাড়িঙ্গ ‘শতরঞ্জ’ নামেই পরিচিত থাকায় করে। এ শব্দকে নিপুণ আচলান অর্থাৎ খেলা করিব, আশা রাখিব।

জানি না ; তবে 'ভবিষ্য-পুরাণে' এতৎসমূহ
আর একটু খেলার যে ক্রম লিখিত আছে,
তাহাই এখানে বিবৃত করিতেছি। ভবিষ্য-
পুরাণে এই খেলার নাম 'চতুরঙ্গ' বা 'চতুরাঙ্গি'।
'চতুরাঙ্গি' অর্থে 'চারি রাজা' ; এই খেলার
চারিটি রাজার আধেশ্যক, এজন্য ঐ নাম
কল্পিত হইয়াছে। ব্যাণ ও বুদ্ধিতিরের কথোপ-
কথনকালে এই ক্রীড়ার প্রক্রিয়া উক্ত
পুরাণে বর্ণিত আছে।

স্বর্গীয় মহাত্মা রাধাকান্ত দেব বাহ্যিক
পণ্ডিতপ্রবরসমূহ উইনিয়ন্-কোল্‌ম্‌মোরগকে
বলিয়াছিলেন, "এই খেলার বিবরণ পুরা-
তন অষ্টাদশ 'খণ্ডশাস্ত্র' হইতে এইরূপ জানা
যায় যে, ইহা লঙ্কেশ্বর রামের পরীক্ষার্থক
সমরপ্রিয় বানীর তত্ত্বার্থে উদ্ভাবিত হইয়া-
ছিল।" বাসুদেব বুদ্ধিতিরকে শিকা দিবার
সময় 'রাক্ষসনির্যাসের' উল্লেখ করিয়া এই
উক্তির বর্ণাবর্তা প্রতিপন্ন করিতেছেন।

উত্তর

পশ্চিম	নৌকা	ক	রাজা	হস্তী	জয়	লোক
	রাজা	প	হস্তী	দা	তি	ক
	জয়	তি	দা	প	রাজা	হস্তী
	ক	জয়	হস্তী	রাজা	দা	তি

দক্ষিণ

ব্যালদেব যুধিষ্ঠিরকে বুঝাইয়া দিতেছেন—
“চারিদিকে ৮টি করিয়া সমতুল্যকোণ ৩৪টি
ঘরের একটি ছক অঙ্কিত করিয়া, এই চকের
পূর্বে লোহিত, দক্ষিণে হরিৎ, পশ্চিমে পীত
এবং উত্তরে কৃষ্ণবর্ণ দেমাংসকে সংস্থাপিত
করিতে হইবে। বলসজ্জার নিয়ম এই—
রাজার বামে হস্তী, তৎপরে অশ্ব ও তৎ-
পার্শ্বে নৌকা বসাইয়া, তাহার পর উছা-
দের সম্মুখে চারিট পরাশ্রিতক বা ‘বোড়ে’
বসাইতে হইবে; আর নৌকাগুলি চকের
কোণের ঘরে বসিবে। পূর্ণপুষ্ঠায় প্রদর্শিত
চকের মধ্যে বলসজ্জার নিদর্শন দেওয়া হইল।
চালগুলি ইহার সর্বত্র বিলাইয়া, একটু
মনোযোগ-সহকারে চোঁটা করিলে, এ খেলা
আয়ত্ত করা কঠিন হইবে না।

একণে ব্যালদেব যুধিষ্ঠিরকে ‘চাল’
(move) শিক্ষা দিতেছেন। প্রথম চালসকল
পাশা-খেলার চালের মত পাশ্চাৎ ফেলিয়া
হির করিতে হয়, কিন্তু ইহাতে একটু-
মাত্র পাশ্চাৎ ব্যবহার্য্য; বশা—পাচ পড়িলে
রাজা বা বোড়ে চালিতে হইবে, চারি
পড়িলে হস্তী, তিনে অশ্ব ও দুই পড়িলে
নৌকা চালিতে হইবে। রাজা সকল দিকেই
একঘরমাত্র ঘাইতে পারে এবং ঐ নিয়মাত্ম-
সারেই (অর্থাৎ একঘরমাত্র) বোড়ে চলিয়া
থাকে। কিন্তু বোড়ের সকল দিকে ঘাইবার
ক্ষমতা নাই, কেবল সম্মুখের দিকে ঘাইবে,
আর কোন বল মারিবার সময় কোণাকূর্ণি
ঘরে মারিবে (আধুনিক খেলার মত)।
বোড়াও বর্তমান খেলার নিয়মত ‘আড়াই’-
ঘর অর্থাৎ মোজাহুজি ঊঠ ঘর ও কোণে
একঘর, মোটে ‘আড়াই’-ঘর প্রত্যেক ঘরে

অতিক্রম করিবে। নৌকা কোণাকূর্ণি দুই ঘর
ঘাইবে। হস্তীর ক্ষমতা আশ্রয়ের মস্তীর মত,
অর্থাৎ আধুনিক মস্তীর মত সকল দিকেই
যতদূর ইচ্ছা ঘাইতে পারে। নৌকা আধুনিক
শিলের মত কোণাকূর্ণি ঘর, কিন্তু দুই
ঘরের অধিক ঘাইবার ক্ষমতা নাই, ইহাই
ইহার বিশেষত্ব।

বোড়ে ও নৌকা অন্য বল মারিতে
পারে এবং অশ্ব মারা ঘাইতেও পারে;
কিন্তু রাজা, হস্তী এবং অশ্ব, শত্রুদল
করিতে পারে, অগতঃ নিজে মরিবার ইচ্ছার
অধিকার নাই। একণে এ নিয়মটা কেবল
রাজার পক্ষেই প্রযোজ্য। ‘চতুর্বারি’-
খেলার রাজাকে সতর্কভাবে রক্ষা করিতে
হইবে, এবং চোঁটা বলের জন্য বড় বল
নষ্ট করা ঘাইতে পারিবে না।

বল-সকলের তারতম্য নিয়ন্ত্রিত উপায়ে
হির করা হইয়াছে। অশ্ব অধাতল হইতে
আটটি চাল পাইতে পারে এবং নৌকা
কেবলমাত্র চারিট পায়, একজ্ঞ অশ্ব নৌকা
হইতে শ্রেষ্ঠ বল। হস্তী সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ
বল, এজন্য হস্তীর জন্য সকল বল নষ্ট
করিয়াও হস্তীকে রক্ষা করা কর্তব্য।

গোতমের নিয়মাত্মসারে রাজা, বিশেষ
আবশ্যক না হইলে, এক হস্তীর সম্মুখে অপর
হস্তী সংস্থাপিত করিতে পারিবে না। যদি
একপক্ষের রাজা এককালে অপরপক্ষের
দুইটি হস্তীকেই বিনাশ করিবার অভিযোগ
প্রাপ্ত হয়, তাহা হইলে উই দক্ষিণের
হস্তীকে ত্যাগ করিয়া বামপার্শ্বের হস্তীকে
বিনাশ করিবে। গোতমের ন্যায় পার্শ্বনিক
ও সংতিতাকারও যখন ‘চতুর্বারি’ নিয়ম

ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তখন ইহা যে ভারতের বিজ্ঞানশ্রীতেও বিশেষ আদৃত ছিল, তাহা বিবেচনা করিয়া নাই।

চাউধুরী ক্রীড়কের মধ্যে কে-কেই জয় করিতে পারে। এই চাউধুরীর দুই দুই জন এক এক পক্ষে বৃত্ত করিতেছে বলিয়া ধরিয়া লইতে হইবে। দুইজন একতরফা রাজা পরস্পরের সাহায্যে (ally) যেমন বৃত্তের করিতে পারেন, এ খেলাও তদ্রূপ। একপক্ষের রাজা অল্প পক্ষের কোনও রাজার ঘরে গিয়া উপস্থিত হইলে, সেই অবস্থাকে 'সিংহাসন' বলা হয়; তখন বৃত্তিতে হইবে, সেই রাজা অপরপক্ষের রাজার উপর জয়ী হইল। আবার যদি সেই রাজা পরপক্ষের রাজাকে ঐ ঘরে (অর্থাৎ রাজার নিজ ঘরে) ঘাইয়া মারিতে পারে, তবে দুই বাজী হয় হইল বৃত্তিতে হইবে। ইহার উপর যদি অপরপক্ষের রাজার সিংহাসন অধিকার করিতে পারে, তবে স্বপক্ষীয় সমগ্র বলের অধিনেতা বলিয়া স্বীকৃত হইবে, বহু রাজার আর কোন কনতা থাকিবে না। যদি কোন রাজা ক্রমান্বয়ে তিন রাজার সিংহাসন অধিকার করিতে পারে, তাহা হইলে সে জয়ী হয় এবং তাহাকেই 'চতুর্-রাজি' বলে। ইহার পরও যদি ক্ষেত্র সর্বশেষে বিজিত সিংহাসনের রাজাকে মারিতে পারে, তবে জয় আরো বশবর্তী হয়। ব্যাসদেব স্পষ্টই বলিতেছেন যে, 'চতুর্রাজি' বা 'সিংহাসন' হইবার সময় রাজা হস্তিয়ার বা সমগ্র বল থাড়া সংরক্ষিত হইয়া কার্য্য করিবে। স্বপক্ষীয় কোন রাজা ধৃত হইলে, পরপক্ষীয় উভয় রাজাকে ধৃত করিয়া

তাহাদের দ্বাধীনতার নিষ্ফলরূপে স্বপক্ষীয় বহু রাজাকে ফিরাইয়া পাওয়া যায়; অথবা তাহা না পারিলে, আপনাকে খোজায়া ধরা পিয়া, বহু রাজাকে কেবল পাইতে পারে; বহু রাজা ফিরায়া আসিয়া দলত সমগ্র বলের অধিনেতৃত্ব গ্রহণ করিবে। ইহা ঘোড়-রাজপক্ষকে মহাহতবৃত্ত। শিক্ষা দিবার একটি সুন্দর উপায় নহে কি? এই আশ্চর্য্যবিশদানের নাম 'দুপাকট' অর্থাৎ দুপ-দ্বারা উদ্ধার প্রাপ্ত। যদি রাজা বা নৌকা তিন অল্প কোন ঘরের বোড়ে চলিতে চলিতে অপরপক্ষের ঘরে ঘর পয্যন্ত পৌঁছিতে পারে, তবে সেই বোড়ে যে বলের ঘরের, সেই বল হইবে,—ইহার নাম 'বটুপদ'। কিন্তু গোত্র এই নিয়মের প্রতিবাদ করিয়া বলিতেছেন যে, যতক্ষণ কোন ক্রীড়কের তিনটি পয্যন্ত বোড়ে থাকিবে, ততক্ষণ এই 'বটুপদ' হইতে পারিবে না; কেবল একটি-মাত্র বোড়ে অবশিষ্ট থাকিলেই, তাহা নৌকা বা রাজা সমগ্র হইতে পারিবে। যদি তিন নৌকা একত্র হয় এবং চতুর্থ নৌকাকেও চালিয়া সেখানে লওয়া যায়, তাহা হইলে চতুর্থ নৌকা সকল নৌকাই ধৃত করে। এই জয়ের নাম 'বৃহস্রোকা'। ব্যাস 'রাক্ষসবিধান' অংশেরে বৃহত্তিরকে বলিতেছেন যে, যদি কোনও পক্ষের রাজা সর্ববল-বিরহিত হইয়া একক অবশিষ্ট থাকে, তাহা হইলে সে ক্ষেত্রে কোন পক্ষেই জয় বা পরাজয় হইবে না, অর্থাৎ সন্ধি হইবে, কিংবা খেলার ভাষার বলিতে হইলে, 'বাজী চড়িয়া' ঘাইবে, ইহার নাম 'কাককট'।

‘চতুরঙ্গ’ খেলের মধ্যে ‘রথ’ অস্ত্রতন, তাহা পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি । কিন্তু ‘চতুরাঙ্গি’ ও আধুনিক, উভয় খেলাতেই এই ‘রথ’ ‘নৌকা’রূপে পরিণত হইয়াছে দেখা যায় । উভয় খেলাতেই নৌকার কোন আকর্ষণতা দৃষ্ট হয় না । অপরন্তু চীনদেশীয় খেলার দেখা যায় যে, হকের উপর নবী অঙ্কিত থাকে, কাজেই তাহাতে ‘নৌকা’ নিত্য আবশ্যক । চীনরাজ্য নদীপ্রধান ; ভারত হইতে এ খেলা যখন সে দেশে যায়, বোধ হয় এই রথই তখন নৌকার পরিবর্তিত হইয়াছিল । তাহার পর যখন তাহার গণ এবং কুবলাই খা ও চেন্সি খা প্রমুখ বিজয়ী পারসিকগণ

চীনজয় করিয়াছিলেন, সেই সময় যে চৈন পরিবর্তন পাত্রক্রীড়ার মধ্যেও প্রবেশলাভে সমর্থ হইয়াছিল, এক্ষণ অস্থান করা ঘাইতে পারে । সম্ভবত আনানের দেশে তাঁহারাই নৌকার আয়দানি করিয়া যবন অধিকার হ্রাস করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন । চতুরাঙ্গি খেলার কি করিয়া নৌকা আসিল, ঠিক বুঝা যায় না ; তবে রথ ও নৌকার উক্তরূপ ব্যতিক্রম যদি প্রমানসিক বলিয়া স্বীকৃত হয়, তাহা হইলে ইগাই বৃদ্ধিতে হইবে যে, অতি প্রাচীন ভারতও নৌসময়ের বিষয় অপরিজ্ঞাত ছিল না ; অতথা প্রকৃষ্ণ মত-বাদের অশ্রয়গ্রহণ বাতীত গত্যন্তর নাই ।

ত্রিচারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ।

আরাধ্যা ।

হৃৎময়—দৈত্য সম,

থাক্ চির-দগি-সম,

নাহি ভাবি তার !

তিরিকার—পুরকার,

যশ-অপযশ-ভার

বিহি ভব পার !

তোমাতেই অতুরাগী,

রাখিয়াছি তোমা' লাগি

যা ছিল আমার ;—

আমার আকাঙ্ক্ষা, আশা,

আমার ভাবনা, ভাষা,

চাহিব না কারো সুখে, রাখ হুখে-রাখ সুখে,

জীবনে—মরণে !

হয় হবে পরাম্বর, তাহে দেখি, নাহি ভয়,

নাহি ভাবি মনে ।

শত লোক—শত কাজে, র'য়েছে বিশ্বের মাঝে,

আমি উদাসীন ;

উদ্ভাব - পাগল-পারো, কারু প্রেমে আত্মহারা—

বাপি নিষিদ্ধিন ?

ও কারু মজার-রব, কানে কারু অন্তরব,

কোথা হ'তে আসে ?

ও কারু অলক-গরু ভাগে ওগো, মুণ্ডমন—

সঞ্চার বাতালে ?

প্রাবৃটে বেধের কোলে, ও কারু নিচোল ঘোলে

ভ্রামল শোভায় ?

ও কারু চরণ মুটে' রক্ত-কোকনদ ফুটে

শায়র উষায় ?

ভাব-তোরে ভুবে থাকি, তোমায়ে ক্রময়ে রাখি,

হে আত্মাধো, মন !

সুখ-তৃষ্ণা ভুলে বাই, ও করুণ সুখ চাই—

চিত্র নিক্রপম !

অভাব-সহস্র ল'য়ে জীবন যে যায় ব'য়ে,

হুঃখ নাহি গনি !

কাটে দিন অত্যাশনে, স্পর্ধা দেখি, রাখি মনে

—বেধেছ এমনি !

যে দৈন্ত তোমার তরে, বহিব তা অকাতরে,
 গর্ল ভাবি মনে !
 বহুহস্তে দেহ বাহা, শিরে তুলি ল'ব তাহা—
 হে দেবি, বতনে ।
 শত-অনাদয়-মাথে, তোমারি করুণা মাতে,
 —তাই নেহ ঢেকে !
 মলিন ললাটে মম, তিলক উজ্জলতম,
 —তাই দেহ এঁকে ।

ঐগিরিজান্নাথ মুখোপাধ্যায় ।

সার সত্যের আলোচনা ।

জাগরিত অবস্থার বিশেষত্ব ।

জীবাত্মার অবস্থা অনেক ; তাহার মধ্যে সর্বাপেক্ষা গোড়া-ঘাণা অবস্থা তিনটি—(১) জাগ্রৎ, (২) স্বপ্ন এবং (৩) ব্রহ্মণি । অবস্থা-শব্দের মূখ্য অর্থ অবস্থিতি । অবস্থিতি দুই-রূপ—(১) দেশে অবস্থিতি, (২) কালে অবস্থিতি । অবস্থা-শব্দের প্রচলিত ভাবার্থ—কালে অবস্থিতি । বাহ্য আবির্ভূত হইয়া কিয়ৎকাল অবস্থিতি করে এবং তৎপরে তিরোহিত হয়, তাহারই নাম অবস্থা । সাধারণত অর্থাৎ মোটামুটি হিসাবে, মনুষ্যের জাগরিতাবস্থার ত্রিভুজাকার-সংযোগ ;

যদ্যাবস্থার ত্রিভুজাকার পূর্ণরাজি এবং শেষ-রাজি ; ব্রহ্মপুত্র অবস্থার ত্রিভুজাকার মধ্য-রাজি । ঐ তিনটি মৌলিক অবস্থা এক-দিকে যেমন তিন বিভিন্ন কালের তিন বিভিন্ন অবস্থা, আর এক দিকে তেমনই উহা একই অতিশ্রম জীবাত্মার তিন বিভিন্ন অবস্থা । এটা যখন হুমুসিত যে, ও-তিন অবস্থা একই জীবাত্মার তিন কালের তিন অবস্থা, তখন তাহাতেই প্রতিপন্ন হইতেছে যে, ও-তিন অবস্থা পরস্পরের সহিত অবিচ্ছেদ্য যোগ-স্থয়ে সংগঠিত । 'কলেও এই-রূপ বোধ্য যাহা যে, ভাগ্যবিভাবস্থার কণ্ঠো-দাম ক্রমে ক্রমে অবস্থান-পাপ হইয়া নিত্যের

দিকে অগ্নে অগ্নে পা বাড়ায়; নিস্তার
 আগ্নেয় বায়ু ক্রমে ক্রমে অবসান গ্রাপ্ত
 হইয়া জাগরণের দিকে অগ্নে অগ্নে পা
 বাড়ায়; পূর্ণরাত্রের স্বপ্ন সুবুস্তির দিকে,
 এবং শেখরাত্তরের স্বপ্ন জাগরণের দিকে
 অগ্নে অগ্নে পা বাড়ায়। জাগরণ এবং
 নিস্তা একপ গায়ে গায়ে সংলগ্ন রহিয়াছে
 যে, নিস্তার হ'ব হ'ব অবতার নামই জাগ-
 রণের বা'ব বা'ব অবতা, আর, জাগরণের
 বা'ব-বা'ব অবতার নামই নিস্তার হ'ব হ'ব
 অবতা। পূর্ণরাত্রের জাগরণ এবং নিস্তার
 সন্ধিতান দেখ দেখিবে যে, তাহা জাগরণের
 অস্ত এবং নিস্তার আদি; শেখরাত্তরের
 নিস্তা এবং জাগরণের সন্ধিতান, দেখ—
 দেখিবে যে, তাহা নিস্তার অস্ত এবং জাগ-
 রণের আদি। উট সন্ধিতানই না জাগরণ,
 না নিস্তা, অপবা জাগরণ এবং নিস্তা উটই
 একসঙ্গে। উভয়ের সন্ধিতান এখন না
 জাগরণ না নিস্তা, তখন তাহাতেই প্রমাণ
 হইতেছে যে, নিস্তা এবং জাগরণ স্বত
 কিছুই নহে তাহা একই অতির কীবাঘার
 বিভিন্ন রূপান্তর-ঘটনা মাত্র। তা ছাড়া তিন
 কালের তিন অবতার প্রত্যেকেরই গাত্রে
 একই অতির অধিষ্ঠাতার নাম লেখা রহি-
 য়াছে স্পষ্ট;—তোমার তিন অবতার
 গাত্রে তোমার নাম লেখা রহিয়াছে, আমার
 তিন অবতার গাত্রে আমার নাম লেখা
 রহিয়াছে, দেবদত্তের তিন অবতার গাত্রে
 দেবদত্তের নাম লেখা রহিয়াছে। তবে
 কি না—নীলবর্ণ আলোপ-পটে যেমন সোণার
 অক্ষর বেঁধী কোটে, রূপার অক্ষর কোটে
 'ক' তত না, গোহার অক্ষর আদখেই

কোটে না; তেমনি (তপকঙ্কলে বলা
 বাইতে পারে যে) সুপ্রোথিত ব্যক্তির
 অস্তঃকরণ-পটে যখন তাহার নাম স্বর্গরশ্মির
 সুবর্ণ-লেখনী দিয়া সোণার অক্ষরে লিখিত
 হয়, তখন তাহা অলু-অলু করিতে থাকে;
 অর্ধসুপ্র ব্যক্তির অস্তঃকরণ-পটে যখন
 তাহার নাম চাত্রমণী রত্ন-লেখনী দিয়া
 রূপার অক্ষরে লিখিত হয়, তখন তাহা
 আপ্লা আপ্লা মাখায়; সুপ্র ব্যক্তির
 অস্তঃকরণ-পটে যখন তাহার নাম মৈশ
 অঙ্ককারের নৌহ-লেখনী দিয়া সোণার
 অক্ষরে লিখিত হয়, তখন তাহাকে খুঁজিয়া
 পাওয়া কঠিন। তার সাক্ষী সত্য ব্যক্তি
 স্পষ্ট বৃত্তিতে পারে যে, “এ জাগরিত অবতা
 আমারই জাগরিত অবতা”। অর্ধসুপ্র
 ব্যক্তি এটা ঘনিষ্ঠ বৃত্তিতে পারে যে, “এ
 বাহা আমি দেখিতেছি, তাহা আমিই
 দেখিতেছি”, কিন্তু তা বই, এটা সে বৃত্তিতে
 পারে না যে, “আমি স্পষ্ট দেখিতেছি”।
 সুপ্র ব্যক্তির জ্ঞান ঘনিষ্ঠ নিশ্চয়তার
 ফোড়ে নিশীন হইয়া প্রাণের আরাগম,
 মনের শান্তি এবং শরীরের আরাগম অহু-
 তব করে, কিন্তু তথাপি এটা সে বৃত্তিতে
 পারে না যে, “আমি নিস্তা রাইতেছি”।
 অতএব এটা যেমন সুনিশ্চিত যে, তিন
 অবতা একেরই তিন অবতা, এটাও তেমনি
 সুনিশ্চিত যে, তিন অবতা যে একেরই
 তিন অবতা, তাহা স্বাক্ষর হয় কেবল এক
 অবস্থায়; অপর দুই অবতার তাহা অবাক
 থাকে। স্বাক্ষর হয় কোন্ অবস্থায়? না
 জাগরিত অবস্থায়। জাগরিত অবস্থাতে—
 তাহাকে বলে জাগরিতাবতা, তাহাকে

বলে সুপ্রাণতা, কাহাকে বলে সুব্রূণাবস্থা, সমস্তই জ্ঞাত। পুরুষের নিকটে সুবাস্ত হইয়াছে। ইহাতে প্রমাণ হইতেছে এই যে, - জাগ্রতিতাবস্থার মধ্যেই অপর দুই অবস্থা তলে তলে জানান্ বিতেছে; কেন না, জাগ্রতিতাবস্থার মধ্যে যদি অপর দুই অবস্থার কোনো নিদর্শনই বিদ্যমান না থাকিত, তাহা হইলে জাগ্রৎকালে সে দুই অবস্থার সম্বন্ধ কোনো কথা চলিতে পাতা দূরে থাকুক, কোনো কথা উঠিতেই পারিত না।

জাগ্রৎকালের অর্থ।

ইতিপূর্বে বলিয়াছি যে, চিত্ত-বীক্ষণ যন্ত্রের অভ্যাসে দৃষ্টি-নিক্ষেপ করিলে একপ্রকার প্রাতিভাসিক চূর্ণ দর্শকের উৎকর্ষ সম্মুখে উপস্থাপিত হয়। সে দৃশ্যের ভিতরের ব্যাপারটা যে কি, তাহা বিজ্ঞানের কৃপার অনেকেই আমরা বুঝি। কিন্তু আমরা বুঝিলে কি হইবে—আমাদের চক্ষুরিস্ত্রির বোঝে না। আমাদের চক্ষুরিস্ত্রিরকে আমরা বসতই বুঝাইয়া বলি না কেন—যে, “তুমি বাহ্য দেখিতেছ, তাহা সর্গের মিথ্যা”—সে কিন্তু কিছুতেই আপনাদের গোঁ ছাড়ে না; সে বলে, “বাস! স্পষ্ট আমি দেখিতেছি অজ্ঞ-জ্ঞেয়ী পরীক্ষিত, স্রোতস্বতী নদী, পুষ্পিত টুগান-কানন, হংসকারগুবাকীর্ণ সযোবর, সুব্যবস্থিত রাস্তা-ঘাট-দেবালয়-প্রাসাদ-উদ্যান-পুষ্করিণী-পরিপোষিত লোকালয়—তুমি বলিতেছ কি না ‘সর্গের মিথ্যা’! তোমার চক্ষুটিকে তুমি কোথায় রাখিয়া

আসিয়াছ!” ইহার প্রত্যুত্তরে বুদ্ধি বলে যে, “তুমি দেখিতেছ এটা সত্য, কিন্তু বাহ্য দেখিতেছ তাহা মিথ্যা।” ইহারই নাম হর-পার্ষতীর কল্পন। হার্যার হো’ক বুদ্ধি অবলা স্ত্রী; মন বগামার্ক-গোয়ার। মনের গায়ের কোয়ের কাছে বুদ্ধি আঁটিয়া উঠিতে পারে না। বুদ্ধি বেচারী নিতান্তই দ্বারে পড়িয়া, মন বাহ্য বলিতেছে, তাহাই থাক পাতিয়া গয়। বুদ্ধিমত্তা বুদ্ধি বলে, “মতি! কেমন দেখ বাগান! দিখি দোণালি রঙের চাপাঙ্গুল কুটে’ রয়েছে! ঐ ফুলটি এনে দিখে আমাকে বাঁচাও! আমার বড় লাভ পিরেছে—ঐ ফুলটিকে ছল্ করে কাণে পরি।” মন ফুল ছলিতে গিয়া দেখে যে, সে ফুলও নাই, সে উদ্যানও নাই, সবই ভৌঁ ভৌ! মন তখন মনের খেঁবে বলে—“নাথেকি নায়ে লেপে ‘দৌবুদ্ধি: প্রলচকরী’! তাহার দৌড়কে বলিহারি! কঠোর পদী-কার নিকট হটেতে কণমণা খাইয়া সব-মাত্র এখন আমার এইরূপ ধারণা হইতেছে যে, বুদ্ধি বা সর্গের মিথ্যা; বুদ্ধির কিন্তু এক-মুহূর্তও ষ্টর সহিল না—প্রথম উদ্যমেই বলিয়া বলিল ‘সর্গের মিথ্যা’! কালিদাস ঠিকই বলিয়াছেন যে, জীঘাতি অশিক্ষিত পটু অর্থাৎ, না পড়িয়া পণ্ডিত!” এক্ষত কথা এই যে, বুদ্ধি প্রথম উদ্যমেই ও-কথা বলে নাই; বুদ্ধি পবাকের দ্বারে উঁকি দিয়া মনকে অনেকবার ঐরূপ প্রভারিত হইতে দেখিয়াছে; আর, সেই ত্রয়োদশনের ফলেই জানিতে পারিয়াছে যে, মন বাহ্য দেখিতেছে—সবই ফাঁকি। মনের দ্বাষ্টিও এক-

প্রকার ভূয়োদর্শনের মত। কিন্তু মনের ভূয়োদর্শন প্রকৃত প্রভাবে ভূয়োদর্শন নহে, তাহা একপ্রকার অন্ধ সংস্কার। এ সম্বন্ধে পরে অনেক কথা বলিবার আছে; এখানে এ বাহা ব্রহ্ম ইঙ্গিত করিলাম—এই অবস্থাই ভাল। বর্তমান স্থলে অন্ধ ভূয়োদর্শনের চক্ষে পড়িয়া মন কিরূপে বিভ্রান্ত হয়, তাহার একটা মন্থন দেখাই—তাহা হইলেই মনের বিভ্রান্তি কোন্ পন্থা দিয়া বাতায়ত করে, তাহার কতকটা ত্রিকানা পাওয়া যাইতে পারিবে।

দর্শক যখন সমুখবর্তী দৃষ্টিক্ষেত্রে চক্ষু নিবিষ্ট করে, তখন সেই দৃষ্টিক্ষেত্রে ঈষৎ বিভিন্ন ছই দিকের ঈষৎ বিভিন্ন ছইখানি ছবি দর্শকের চতুর্নৈঃ নিপতিত হয়। ঐ-প্রকার ছবি-দৃশ্যের ঈষৎ আকার-ভেদ, উভয়ের অন্তর্গত ভিন্ন ভিন্ন বস্তু-সকলের দৃশ্যবীৰ্যতার আপেক্ষিক পরিমাণ, • এবং তাহাদের সমাপ্রাপ্ত চারাতপের প্রতি-যোগিতা, ইত্যাদি-বহুত কতকগুলি চিত্রের সহিত উক্ত বস্তুসকলের দূরত্ব-নৈকট্যের ভান ভূয়োদর্শনের সংস্কার-স্বত্রে দর্শকের মনোমধ্যে জমাগতই দৃঢ় হইতে দৃঢ়তর রূপে বাধা পড়িয়া যাইতে থাকে। ঐ সকল সাক্ষেতিক চিত্রের কোন্-কোন্-গুলি কোন্ কোন্ বস্তুর পাশে কি-কি-ভাবে কি-কি-পরিমাণে বিস্তৃত রহিয়াছে, তাহা দর্শকের চক্ষে পড়িবান্যই দর্শকের মনে জব

প্রতীতি হয় যে, অমুক বস্তু বেগে দূরে রহিয়াছে, অমুক বস্তু কম দূরে রহিয়াছে, অমুক বস্তু খুব নিকটে রহিয়াছে; আর, দর্শকের মনে ঐ বাহা প্রতীতি হয়, দর্শক তাহাই চক্ষে প্রত্যক্ষবৎ দর্শন করে। দৃষ্ট-দর্শন-কালে একই দৃষ্টের ঈষৎ বিভিন্ন ছই দিকের যেরূপ ছইখানি ছবি দর্শকের ছই চক্ষে সচরাচর নিপতিত হয়, চিত্রবীক্ষণ যন্ত্রের ছবি ঠিক তেজিতির চইখানি ছবি; অর্থাৎ তাহা একই দৃষ্টের ঈষৎ বিভিন্ন ছই দিকের ছইখানি ছবি; এটী মত দর্শক সেই ছই ছবির ঈষৎ আকার-ভেদ, উভয়ের অন্তর্গত চিত্রিত বস্তুসকলের দৃশ্যবীৰ্যতার আপেক্ষিক পরিমাণ, এবং তাহাদের সমাপ্রাপ্ত চারাতপের প্রতিযোগিতা, ইত্যাদি-বহুত বিশেষ বিশেষ সাক্ষেতিক চিত্র দেখিবামাত্র তদনুসারে সেই সকল বস্তুর বিশেষ বিশেষ দূরত্ব-নৈকট্য অবধারণ করিতে অগত্যা বাধ্য হয়; আর, সেইরূপে বাধ্য হইয়া আপনাতঃ চক্ষের সমুখে একটা বৃহৎ দৃষ্ট-ব্যাপার উদ্ভাবন করে—আপনিই উদ্ভাবন করে, অথচ এটা সে যুগ্মকরেও জ্ঞানিতে পারে না যে, “আমি উদ্ভাবন করিতেছি”। এই কারণ-বশত দর্শকের মনো-মধ্যে এইরূপ একটা ছরণনের ভ্রম জন্মে যে, যে যে বস্তু চক্ষের সমুখে যে যে দূরত্বে প্রতিভাত হইতেছে, ব্যতীকই যেন সেই সেই বস্তু সেই সেই স্থানে অবস্থিত করি-

• ইহার পরিমার্গ “ভিন্ন ভিন্ন বস্তুসকলের গাত্র-নিম্নস্থত রসি-চক্ষুর কোণোত্তর সমনোচ্চতার তারতম্য” বলিলে কথটা বৈজ্ঞানিক হইত। কিন্তু এটাও বিবেচ্য যে, ‘আঁটান’টা বৈজ্ঞানিক পরিভাষা অপেক্ষা নৌকিক ভাবের আটপোরে দৃষ্টিভঙ্গিই বর্তমান প্রবন্ধের পাশ্বে মান্য ভাগ।

তেছে। ইহাতে প্রমাণ হইতেছে এই যে, অপ্রাণবতার দর্শকের মনের চিত্রাভাস সংস্কার যেমন বুদ্ধির অসাক্ষাতে কার্য্য করিয়া নানাপ্রকার দৃষ্ট উদ্ভাবন করে, তাপরিচিত-বস্তুতেও অবিকল তাহাটি করে; প্রত্যেক কেবল এই যে, অপ্রাণবতার চিত্রাভাস সংস্কার অবিকারিত-ভাবে যাহা প্রাণ চাহে, তাহাই উদ্ভাবন করে, (এ একপ্রকার মনে ডাকাতি)। তাপরিচিতবস্তু মনোরাজ্যের অঙ্গ বিজ্ঞান-রাজ্যের প্রাচীরের আড়ালে লুকাইয়া থাকিয়া পূর্ববাসীদিগের চক্ষু ধূলিমুটি নিক্ষেপ করিতে পারে।

জাগ্রৎকালের সূক্ষ্মপ্তি।

নিদ্রাকালে আমরা যেক্ষণ আমাদের জ্ঞানের অসাক্ষাতে নিশ্বাস-প্রশ্বাস আকর্ষণ-বিসর্জন করি, এবং তৎসমিত দ্বাধ্যাত্ম উপভোগ করি, তাগ্রৎকালেও সেটরূপ করিয়া থাকি। তাগ্রৎকালে দৈবান্বিত কখনো নিশ্বাস-প্রশ্বাসের পরিচালনা-পথে কক্ষাদির বিষ উপস্থিত হইলে, তবেই যাহা-হুই কার্য্যের প্রতি আমাদের দৃষ্টি পড়ে, নহিলে নিদ্রাকালেও যেমন—জাগ্রৎকালেও তেমনি—সে-হুই কার্য্য আমাদের জ্ঞানের অসাক্ষাতে স্বভাব-ভাণে আপনা-আপনি চলিতে থাকে। যুমানো আর কিছুই না—প্রকৃতির অব্যক্ত সত্তাতে হাত-পা ছড়াইয়া বা ভাসাইয়া দেওয়া। যখন নৌকা পা'ল পাটয়াচে—এবং অহুকুল স্রোত বহিতেছে—দাঁড়ি তখন ঘুমন্ত-ভাবে দাঁড় টানে। নৌকা যখন বেশ পা'ল পাটয়াচে, কিম্বা স্রোতের প্র'তুলে চলি-

তেছে, দাঁড়ি তখন অর্ধঘুম-ভাবে দাঁড় টানে। যখন বায়ু এবং স্রোত দুইই প্রতি-কূলে বহিতেছে, তখনই দাঁড়ি পূর্ণামাত্রা জাগ্রত-ভাবে দাঁড় টানে। তেমনি সচরাচর আমরা ঘুমন্ত-ভাবে নিশ্বাস-প্রশ্বাস আকর্ষণ-বিসর্জন করি; তাই বই, যখন আমরা মাত্রাতীত পারীক্ষিক পরিভ্রম করিয়া হাঁপাইতে থাকি, তখনই কেবল আমরা জাগ্রত-ভাবে নিশ্বাস-প্রশ্বাস আকর্ষণ-বিসর্জন করিতে থাকি। সচরাচর আমাদের প্রাণ আমাদের জ্ঞানের অসাক্ষাতে আমাদের-তইয়া নিশ্বাস-প্রশ্বাস আকর্ষণ-বিসর্জন করে;—প্রাণের এইরূপ অব্যক্ত দৃষ্টির নানাই অর্থাৎ অচেতন দৃষ্টির নামই) সূপ্তি। নিশ্বাস-প্রশ্বাসের পথে বিষ উপস্থিত হইলেই তখন প্রাণের হাতের কাজ আপনায় হাতে টানিয়া লয়; তাহা যখন করে, তখন নিশ্বাস-প্রশ্বাসের সূপ্তি ভাঙিয়া যায়। তবেই হইতেছে যে, তাপরিচিতবস্তু মনোও সূক্ষ্মপ্তি তলে তলে আপনায় রাজ্য চাণায়; কোন্ রাজ্য? না প্রাণরাজ্য। তঁতিপূর্বে আমরা দেখি-রাছি যে, জাগ্রৎকালে মনোরাজ্যের অঙ্গ বিজ্ঞান-রাজ্যের প্রাচীরের আড়ালে লুকাইয়া থাকিয়া স্বকাৰ্য্য সাধন করে; এক্ষণে অধিকতর দেখিতে পাইতেছি যে, প্রাণরাজ্যের সূক্ষ্মপ্তি মনোরাজ্যের প্রাচীরের আড়ালে লুকাইয়া থাকিয়া অব্যক্ত সত্তার তামস পরিচ্ছদ বরন করিতে থাকে। মোট কথা এই যে, তাপরিচয়ের কার্য্য-ক্ষেত্রে—উপরের কক্ষচারী উপরের কার্য্য করে, নিচের কক্ষচারী নিচের কার্য্য করে,

মথোর কণ্ঠচ্যারী মথোর কাণ্য করে; তা বই, কেহই চুপ করিয়া বসিয়া থাকে না।

মনে কর, আমি একটা হাঁড়িতে আধ-সের দুধ, এক-সের গুত এবং দুই-তুলুকে চোঁটল নিক্ষেপ করিয়া সেই তিন-দ্রব্য-সংশ্লিষ্ট হাঁড়িটা ঘরের এক কোণে রাখিয়া দিলাম। কিয়ৎপরে এক ব্যক্তিকে ডাকিয়া বলিলাম, “দেখিয়া আইস তো—উহাতে কি আছে।” সে বলিল, “গুত আছে।” আমি বলিলাম, “উহাতে আর কোনো সামগ্রী তো নাই?” সে বলিল, “আর তো কিছুই দেখিতে পাইলাম না।” সে দেখিতে না পা’ক্—আমি কিন্তু দিবাচকে দেখিতেছি যে, ঐ হাঁড়িটার উপরি-স্তরে গুত রহিয়াছে, মধ্যস্তরে দুধ রহিয়াছে, নিম্নস্তরে তুলু রহিয়াছে। তেমনি, আর কেহ দেখিতে পা’ক্ বা না-পা’ক্—যে দেখিতেছে, সে দেখিতেছে যে, ভাগরিভাবস্থার উপরিত্তরে বুদ্ধি ব্যাবহারিক সত্তাতে ব্যাপ্ত রহিয়াছে; মধ্যস্তরে মন প্রাতিভাসিক সত্তাতে ব্যাপ্ত রহিয়াছে; নিম্নস্তরে প্রাণ অব্যক্ত সত্তাতে ব্যাপ্ত রহিয়াছে। আগ-রিভাবস্থা এবং অগ্ন্যবস্থার মধ্যে প্রধান একটি প্রভেদ এই যে, প্রাতিভাসিক সত্তা আগরিভাবস্থার মধ্যস্তরে চাপা থাকে, অগ্ন্যবস্থার তাহা উপরি-স্তরে ভাসিয়া ওঠে। তেমনি আবার, ভাগরিভাবস্থা এবং হুস্থ অগ্ন্যবস্থার মধ্যে প্রধান একটি প্রভেদ এই যে, অব্যক্ত সত্তা আগরিভাবস্থার নিম্নস্তরে চাপা থাকে, হুস্থ অগ্ন্যবস্থা তাহা উপরিত্তরে ভাসিয়া ওঠে।

এতক্ষণ পর্য্যন্ত একট দীর্ঘ রাত্রা

অবলম্বন করিয়া পদতলে সটান চলিয়া আসিয়াছি। এখন যে স্থানটিতে পৌছি-
য়াছি—এ স্থানটি অনেকগুলি পথের সঙ্গম-স্থান; তাহার মধ্যে কোন পথ আপাতত অবলম্বনীয়, তাহা বিবেচনার বিষয়। এই সঙ্গমস্থানটিতে পদার্পণ করিবামাত্র আলোচকে একটু থম্কিয়া পাড়াইয়া চারিদিক্ নিরীক্ষণ করিতে হইতেছে। এই স্থানটির নানা-দিক্ হইতে নানা-ভাবের ত্রিক আসিয়া যখন-তখন আলোচকের সম্মুখে দেখা দিতে আরম্ভ করিয়াছে; সময়ে সময়ে সেগুলিকে সামান্যনো ভাব হইয়া পড়ে। আশ্চর্য্য এই যে, যেমন ‘সব পেরানের একই রায়’, তেমনি সব ত্রিকেরই ভিতরের কথা একই ধরণের। একটু দূরের চাৰি পাইলেই তাহা দিয়া সব ত্রিকেরই ডালা খোলা যায়। আলোচিতব্য ত্রি-দণ্ড-এ নিম্নে পংক্তি সাজাইয়া প্রদর্শন করা হইল।

ত্রিক-সম্প্রক।

(১) প্রাণ	মন	বুদ্ধি।
(২) উদ্ভিদ	জন্তু	মহুয়া।
(৩) হুস্থপ্রি	বপ	ভগ্নেয়।
(৪) প্রাণ	হৃষ্টি	দ্বিত্তি।
(৫) অব্যক্ত	প্রাতিভাসিক	ব্যাবহারিক
সত্তা	সত্তা।	সত্তা
(৬) ভোগ	কর্ম	জ্ঞান।
(৭) তম	রজ	সব।

এই পংক্তি-সম্প্রকের মধ্যে মোটামুটি যে একপ্রকার সৌন্দর্য্য দেখিতে পাওয়া যায় তাহা তো দেখতে পাওয়া যায়ইতেছে; তা ছাড়া তাহার মধ্যে অনেক-

গুলি নিগূঢ় রহস্য প্রজ্জ্বল বহিঃক্ষেপে । সে-
 গুলির ভিতরের সমাচার সংগ্রহ করিতে
 হইলে, নিগূঢ়ত্বের সমুদ্রে ডুব নিতে হয় এইখানেই ইতি কথা গাউক ।

ঐতিহ্যেস্ত্রনাথ ঠাকুর ।

চোখের বালি ।

(২১)

ইতিমধ্যে আরও এক চিঠি আসিয়া উপস্থিত
 হইল ।—

“তুমি আমার চিঠির উত্তর লিখে না ?
 ভালই করিয়াছ ! ঠিক কথা ত লেখা যায়
 না, তোমার দা’ জবাব, সে আমি মনে
 মনে বুঝিয়া লইলাম । তরু যখন তাহার
 দেহতাকে ডাকে, তিনি কি মুখের কথায়
 তাহার উত্তর দেন ? ছুখিনীর বিষণ্ণতানি
 চরণতলে বোধ করি স্থান পাইয়াছে ।

“কিন্তু ভক্তের পূজা লইতে গিয়া
 শিবের যদি ভগ্নোভঙ্গ হয়, তবে তাহাতে
 স্নান করিবে না ভয়দেব ! তুমি বর দাও
 বা না দাও, চোখে মেলিয়া চাও বা না চাও,
 জানিতে পার বা না পার, পূজা না দিয়া
 ভক্তের আর গতি নাই ! তাই আজিও এই
 হুঁহু চিঠি লিখিলাম—হে আমার পয়াম-
 ঠাকুর, তুমি অবচলিত হইয়া থাক !”

মহেন্দ্র আবার চিঠির উত্তর লিখিতে
 প্রবৃত্ত হইল । কিন্তু আশাকে লিখিতে
 গিয়া বিনোদিনীর উত্তর কলনের মুখে
 আপনি আসিয়া পড়ে । চাকিয়া লুকাইয়া
 কোশল করিয়া লিখিতে পারে না । অনেক-
 গুলি ছিঁড়িয়া রাসের অনেক প্রহর কাটাইয়া
 একটা যদি বা লিখিল, সেটা লেফাফার পুরিয়া
 উপরে আবার নাম লিখিবার সময় হঠাৎ
 তাহার পিঠে ঘেন কাহার চাবুক পড়িল—
 কে ঘেন বলিল, ‘পাষাণ, বিষণ্ণ বালিকার
 প্রতি এমন করিয়া প্রতারণা !’ চিঠি মহেন্দ্র
 সহস্র টুকরা করিয়া ছিঁড়িয়া ফেলিল, এবং
 বাকি রাতটা টেবিলের উপর ছুই হাতের
 মধ্যে ধুখ চাকিয়া নিজে কে ঘেন নিজের দৃষ্টি
 হইতে লুকাইবার চেষ্টা করিল ।

তৃতীয় পত্র ।—“যে একেবারেই অভ্যস্ত
 করিতে জানে না, সে কি ভালবাসে ?
 নিজের ভালবাসাকে যদি অনাদর-অপমান

হইতে বাচাইয়া রাখিতে না পারি, তবে সে ভালবাসা তোমাকে বিধ কেমন করিয়া ?

“তোমার মন হর ত ঠিক বুঝি নাই, তাই এত সাহস করিয়াছি। তাই, এখন ভাঙ্গ করিয়া গেলে, তখনো নিজে অগ্রসর হইয়া চিঠি লিখিয়াছি;—যখন চূপ করিয়া ছিলে, তখনো মনের কথা বলিয়া ফেলিয়াছি! কিন্তু তোমাকে যদি চূপ করিয়া থাকি, সে কি আমারই বোধ? একবার যুক হইতে শেখ পর্যন্ত সব কথা মনে করিয়া দেখ দেখি, বাহা বুঝিরাতিলাম, সে কি তুমিই বোঝাও নাই ?

“সে যাই হোক, চূপ হোক সত্য হোক, বাহা লিখিয়াছি, সে আশ নুটিবে না, বাহা দিয়াছি, সে আর কিবাষ্টতে পারিব না, এই আশেপাশে তি তি, এমন গভীর মস্তুর ভাগ্যে ঘটে। কিন্তু তাই বলিয়া মনে করিয়া না, ভাল যে বাসে, সে নিজের ভালবাসাকে বারবার অপসর করিতে পারে! যদি আমার চিঠি না চাও ত থাক—যদি উত্তর না লিখিবে, তবে এই পর্যন্ত !”

ইহার পর মহেন্দ্র আর থাকিতে পারিল না। মনে করিল, অত্যন্ত রাগ করিয়াই ঘরে ফিরিয়া বাইতেছি। বিনোদিনী মনে করে, তাহাকে জুলিবার লজ্জাই বর ছাড়িয়া পালাইয়াছি! বিনোদিনীর সেই স্পর্ধাকে হাতে হাতে অগ্রসর করিবার লজ্জাই তখনি মহেন্দ্র ঘরে ফিরিবার সঙ্গ করিল।

এমন সময় বিহারী ঘরে প্রবেশ করিল। বিহারীকে দেখিবামাত্র মহেন্দ্রের ভিতরের পূর্ণক ঘন হিংসা বাড়িয়া উঠিল। উতি-

পূর্ণে নানা সন্দেহে ভিতরে ভিতরে বিহারীর প্রতি তাহার ঈর্ষা লম্বিতছিল, উভয়ের বন্ধুত্ব ফ্রিট হইয়া উঠিতেছিল। পরপাঠের পর আজ সমস্ত ঈর্ষা তার বিলম্বন দিয়া বিহারীকে সে অতিরিক্ত আবেগের সহিত আহ্বান করিয়া লইল। জৌকি হইতে উঠিয়া, বিহারীর পিঠে চাপড় মারিয়া, তাহার হাত ধরিয়া, তাহাকে একটা কেদারার উপরে টানিয়া বসাইয়া দিল।

কিন্তু বিহারীর মুখ আজ বিমর্ষ। মহেন্দ্র ভাবিল, বেচারী নিষ্ঠুর ইতিমধ্যে বিনোদিনীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়াছে এবং সেখান হইতে ধাক্কা খাইয়া আসিয়াছে। মহেন্দ্র জিজ্ঞাসা করিল—“বিহারি, এর মধ্যে আমারেও ওখানে গিয়াছিলে ?”

বিহারী গভীরমুখে কহিল, “এখন সেখান হইতে আসিতেছি।”

মহেন্দ্র বিহারীর বেদনা কল্পনা করিয়া মনে মনে একটু কোচুক বোধ করিল। মনে মনে কহিল—“হতভাগা বিহারী! স্ত্রীলোকের ভালবাসা হইতে বেচারী একেবারে বঞ্চিত।” বলিয়া নিজের বুকের পকেটের কাছটার একবার হাত দিয়া চাপ দিল—ভিতর হইতে তিনটে চিঠি বড়বড় করিয়া উঠিল।

মহেন্দ্র জিজ্ঞাসা করিল—“সবাইকে কেমন দেখিলে ?”

বিহারী তাহার উত্তর না করিয়া কহিল—“বাড়ী ছাড়িয়া তুমি যে এখানে ?”

মহেন্দ্র কহিল—“আজকাল প্রায় নাইট-ডিউটি পড়ে—বাড়ীতে অসুবিধা হয়।”

বিহারী কহিল, “এর আগেও ত নাইট-

ডিউটি পড়িচ্ছে, কিন্তু তোমাকে ত বাড়ী চাড়িতে দেখি নাই ।”

মহেন্দ্র হাসিয়া কহিল—“মনে কোন সন্দেহ, অস্তিত্ব আছে না কি ?”

বিহারী কহিল—“না, ঠাট্টা নয়, এখনি বাড়ী চল !”

মহেন্দ্র বাড়ী কিরিবার জন্য উদ্ভত হইয়াই ছিল, বিহারীর অহুরোধে তিনিয়া সে হঠাৎ নিঃশব্দে ভুলাইল, যেন বাড়ী ঘাইবার জন্য তাহার কিছুনার আগ্রহ নাই। কহিল, “সে কি হয় বিহারি ! তা হ’লে আমার বংসরটাই নষ্ট হইবে !”

বিহারী কহিল, “দেখ মহিন্দ্রা, তোমাকে আমি এতটুকু বয়স হইতে দেখিতেছি, আমাকে ভুলাইবার চেষ্টা করিয়া না। তুমি অস্তায় করিতেছ !”

মহেন্দ্র। কার ‘পরে’ অস্তায় করিতেছি জ্ঞানাহেব ?

বিহারী রাগ করিয়া বলিল, “তুমি যে চিরকাল জন্মের বড়াই করিয়া আসিয়াছ, তোমার জন্মের গেল কোথায় মহিন্দ্রা !”

মহেন্দ্র। সম্প্রতি কালেক্টর হাঁস-পাতালে !

“বিহারী। ধাম মহেন্দ্র, ধাম ! তুমি এখানে আমার সঙ্গে হাসিয়া ঠাট্টা করিয়া কথা কহিতেছ, দেখানে আশা তোমার বাহিরের ঘরে, অন্দরের ঘরে, কাঁদিয়া বেড়াইতেছে।

জ্ঞানার আগার কথা তিনিয়া হঠাৎ মহেন্দ্রের মন একটা প্রতীকিত পাইল। জগতে আর যে কাহারো স্বথঃখ আছে, সে কথা তাহার নূতন নেশার কাছে তান

পার নাই। হঠাৎ চমক লাগিল, ভিজ্ঞান। করিল—“আশা কাদিতেছে কি জন্য ?”

বিহারী বিরক্ত হইয়া কহিল—“সে কথা তুমি জান না, আমি জানি !”

মহেন্দ্র। তোমার মহিন্দ্রা সর্বজন নয় বলিয়া যদি রাগ করিতেই হয় ত মহিন্দ্রার সৃষ্টিকর্তার উপর রাগ কর !

তখন বিহারী যাহা দেখিয়াছিল, তাহা আগাগোড়া বলিল বলিতে বলিতে বিনো-দিনীর বকোণের আশার সেই অশ্রুসিক্ত মুখখানি মনে পড়িয়া বিহারীর প্রায় কণ্ঠ-রোধ হইয়া আসিল।

বিহারীর এট প্রবল আবেগ দেখিয়া মহেন্দ্র আশ্চর্য হইয়া গেল। মহেন্দ্র জানিত, বিহারীর জন্মের বলাই নাট এ উপসর্গ কবে ছুটিল ? যেদিন কুমারী আশাকে দেখিতে পিয়াছিল, সেই দিন হইতে না কি ? বেচারী বিহারী !—মহেন্দ্র মনে মনে তাহাকে বেচারী বলিল বটে, কিন্তু দ্বঃখবোধ না করিয়া বরঞ্চ একটু আমোদ পাইল। আশার মনট একান্তভাবে যে কোন দিকে, তাহা মহেন্দ্র নিশ্চয় জানিত। অস্ত্র লোকের কাছে যাহারা বাছুর ধন, কিন্তু আরক্তের অতীত, আমার কাছে তাহার চিরদিনের জন্য আপনি ধরা দিয়াছে, ইহাতে মহেন্দ্র বন্ধের মধ্যে একটা সর্ব্বের স্বীকৃতি অস্বস্ত্য করিল।

তার পরে বিহারীর বর্ণিত সমস্ত দৃশ্যটি সে কল্পনাচক্ষে দেখিতে লাগিল। আশা কাদিতেছে, বিনোদিনী তাহাকে বন্ধে গইয়া সাধনা করিতেছে ! এ গৃহস্থনা কি মায়াবিনীর ছলনা, না আমি চিত্তি পাড়য়া

নাহা বুঝিয়াছি, তাহা আগাগোড়া ভুল ?
নারীর গুণগরহণ; বুঝিবার জো নাই—
মহেন্দ্র মনে মনে কহিল, “আমার বুঝিয়া
কাজ নাই; বাহ্যকে বুঝিয়াছি, সেই আমার
ভাল। আমার আশার ভয়ে অন্য লোকে
পাপল, সেই আশা আমারই ভয়ে আমার
স্বভাবের ভিন্নবর্ণের নথো কামিয়া কামিয়া
বেড়াইতেছে।” মহেন্দ্র বিচক্ষণকে কহিল
“আজ্ঞা, চল, যাওয়া যাক! তবে একটা
গাড়ি ডাক!”

২২

মহেন্দ্র ঘরে ফিরিয়া আসাবার তাহার
মুখ দেখিয়াই আশার মনের সমস্ত সংশয়
কণকালের ক্রোধের মত এক মুহুর্তেই
কাটিয়া গেল। নিম্নের চিত্তির কথা শ্রবণ
করিয়া লক্ষ্যর মহেন্দ্রের সামনে সে যেন
মুখ তুলিতেই পারিল না! মহেন্দ্র তাহার
উপরে তর্কসন্ম। করিয়া কহিল—“এমন
অপরাধ দিয়া চিত্তিগুলা পিণ্ডিল কি করিয়া?”

বলিয়া পকেট হইতে বহুবায়পণ্ডিত
সেই চিত্তি তিনখানি বাহির করিল। আশা
ব্যাভুল হইয়া কহিল—“তোমার পায়ে পড়ি,
ও চিত্তিগুলো ছিঁড়িয়া ফেল।”—বলিয়া
মহেন্দ্রের হাত হইতে চিত্তিগুলো লইবার ক্ষমতা
বাত হইয়া পড়িল। মহেন্দ্র তাহাকে নিরস্ত
করিয়া সেগুলি পকেটে পুরিল। কহিল—
“আমি কর্তব্যের অহুয়োথে গেলাম, আর
তুমি আমার অভিপ্রায় বুঝিলে না?
আমাকে সম্বোধ করিলে?”

আশা চলচল চোখে কহিল—“এবার-
কার মত আমাকে নাপ কর! এমন আর
কখনই হইবে না।”

মহেন্দ্র কহিল—“কখনো না?”

আশা কহিল—“কখনো না!”

তখন মহেন্দ্র তাহাকে টানিয়া লইয়া
চুপন করিল। আশা কহিল—“চিত্তিগুলো
হাও, ছিঁড়িয়া ফেল!”

মহেন্দ্র কহিল—“না, ও থাক!”

আশা সবিনয়ে মনে কহিল, “আমার
সাক্ষিবল্লভ এ চিত্তিগুলি উনি রাখিলেন!”

এই চিত্তির বাপায়ে বিনোদিনীর উপর
আশার মনটা একটু যেন ব্যক্তিগত পাকটিল।
স্বামীর আগমনবার্তা লইয়া সে সখীর কাছে
আনন্দ করিতে গেল না—বলক বিনো-
দিনীকে একটু যেন এড়াইয়া গেল। বিনো-
দিনী সেটুকু লক্ষ্য করিল এবং কাতের ছল
করিয়া একেবারে দূরে সরিল।

মহেন্দ্র ভাবিল—“এ ত বড় অদ্ভুত!
আমি ভাবিয়াছিলাম, এবার বিনোদিনীকে
বিশেষ করিয়াই দেখা বাইবে। উন্টা হইল?
তবে সে চিত্তিগুলার মর্ম কি?”

নারীজগতের রহস্য বুঝিবার কোন চেষ্টা
করিবে না বলিয়াই মহেন্দ্র মনকে পূর্ণ
করিয়াছিল—ভাবিয়াছিল, “বিনোদিনী যদি
কাছে আসিবার চেষ্টা করে, তবু আমি দূরে
থাকিব।” আজ সে মনে মনে কহিল—“না
এ ত ঠিক হইতেছে না! যেন আমাদের
মধ্যে সত্যই কি একটা বিকার ঘটয়াছে।
বিনোদিনীর সঙ্গে সহজ স্বাভাবিক ভাবে
কথাবার্তা আমোদপ্রমোদ করিয়া এই
সংসারজগত শুভমের ভাবটা দূর করিয়া
দেওয়া উচিত।”

আশাকে মহেন্দ্র কহিল—“দেখিতেছি,
আমিই তোমার সখীর চোখের দালি ৩৫-

লাল। আরকাল তাহার আর বেথাই পাওয়া যায় না।”

আশা উদাসীনভাবে উত্তর করিল—
“কে জানে, তাহার কি হইয়াছে।”

এদিকে রাজলক্ষ্মী আসিয়া কাঁধোকাঁধে হইয়া কহিলেন—“খিপিনের বোকে আর ত থরিয়া রাখা যায় না।”

মহেন্দ্র চকিতভাবে সামলাইয়া লইয়া কহিল—“কেন যা ?”

রাজলক্ষ্মী কহিলেন—“কি জানি বাছা, সে ত এবার বাড়ী যাটবার জন্য নিতান্তই থরিয়া পড়িয়াছে। দুই ত কাণকে খাতির করিতে আনিব না। ভ্রূণোক্তের মেরে পরের বাড়ীতে আছে, উহাকে আপনায় লোকের মত আলবৎ না করিলে থাকিবে কেন ?”

বিনোদিনী শোবার ঘরে বসিয়া বিছানায় চাদর মেলাই করিতেছিল। মহেন্দ্র প্রবেশ করিয়া ডাকিল—“বাঁলি।”

বিনোদিনী সংযত হইয়া বসিল। কহিল
“কি মহেন্দ্রবাবু।”

মহেন্দ্র কহিল—“কি সন্ধান। মহেন্দ্র আবার বাবু হইলেন কবে ?”

বিনোদিনী আবার চাদর মেলাইয়ের দিকে মতচক্ষু নিবদ্ধ রাখিয়া কহিল—“তবে
- কি বলিয়া ডাকিব ?”

মহেন্দ্র কহিল—“ভোমার সবীকে যা বল—চোখের বাঁলি।”

বিনোদিনী অন্য দিনের মত ঠাট্টা করিয়া তাহার কোন উত্তর দিল না—
মেলাই করিয়া যাইতে লাগিল।

মহেন্দ্র কহিল “ওটা বুঝি সত্যকার

সবক হইল, তাই ওটা আর পাতানো চলিতেছে না।”

বিনোদিনী একটু পামিয়া ধাত দিয়া মেলাইয়ের প্রান্ত হটতে খানিকটা বাড়তি হুতা কাটিয়া কেপিয়া কহিল—“কি জানি, সে আপনি জানেন।”

বলিয়াই তাহার সর্সপ্রকার উত্তর চাপা দিয়া গভীরমুখে কহিল—“কলেজ হইতে হঠাৎ ফেরা হইল যে।”

মহেন্দ্র কহিল—“কেবল মড়া কাটিয়া আর কতদিন চলিবে ?”

আবার বিনোদিনী দশ দিয়া হুতা ছেদন করিল এবং মুখ না তুলিয়াই কহিল—
“এখন বুঝি জীয়েদের আবশ্যক ?”

মহেন্দ্র স্থির করিয়াছিল, আজ বিনোদিনীর সঙ্গে অত্যন্ত সহজ স্বাভাবিক ভাবে হাতপরিহাস উত্তরপ্রত্যুত্তর করিয়া আসার জন্যই তুলিবে। কিন্তু এমনি গাভীখোর ভাগ তাহার উপর চাপিয়া আসিল যে, লম্বা জবাব প্রাপণণ চেষ্টাতেও মুখের কাছে গোপাইল না। বিনোদিনী আজ কেমন-এক-রকম কঠিন দৃষ্টি রক্ষা করিয়া চলিতেছে দেখিয়া, মহেন্দ্রের মনটা সবেগে তাহার দিকে অগ্রসর হইতে লাগিল—ব্যবধানটাকে কোন একটা নাড়া দিয়া ভূমিলাৎ করিতে ইচ্ছা হইল। বিনোদিনীর শেষ বাক্যখাতের প্রতিবাদ না দিয়া, হঠাৎ তাহার কাছে আসিয়া বসিয়া কহিল—“তুমি আমাদের ছাড়িয়া চলিয়া যাইতেছ কেন ? কোনো অপরাধ করিয়াছি ?”

বিনোদিনী তখন একটু সরিয়া মেলাই হইতে মুখ তুলিয়া দুই বিশালা উজল চক্ষু

মহেন্দ্রের মুখের উপর গির রাখিয়া কহিল—
“কর্তব্য-কর্ম ত সকলেরই আছে। আপনি
যে সকল ছাড়িয়া কলেজের বাগান বান, সে
কি তাহারো অপরাধে? আমারো বাইতে
হইবে না? আমারো কর্তব্য নাই?”

মহেন্দ্র ভাল উত্তর অনেক তাহিয়া
খুঁজিয়া পাইল না। কিছুক্ষণ ধামিরা
জিজ্ঞাসা করিল—“তোমার এমন কি কর্তব্য
যে না গেলেই নয়?”

বিনোদিনী অত্যন্ত সাবধানে স্মৃতিতে
দৃষ্টা পরাইতে পরাইতে কহিল—“কর্তব্য
আছে কি না, সে নিজের মনই জানে।
আপনার কাছে তাহার আর কি তালিকা
দিব?”

মহেন্দ্র গভীর চিন্তিতমুখে ছানলার
বাহিরে একটা শ্রুত নারিকেল-গাছের
মাথার দিকে চাহিয়া অনেকক্ষণ চুপ করিয়া
বসিয়া রহিল। বিনোদিনী নিঃশব্দে সেলাই
করিয়া বাইতে লাগিল। ঘরে ছুঁচটি পড়িলে
শব্দ শুনা যায়, এমনি হইল। অনেকক্ষণ
পরে মহেন্দ্র হঠাৎ কথা কহিল। অকস্মাৎ
নিঃশব্দভাঙে বিনোদিনী চমকিয়া উঠিল—
“তাহার হাতে ছুঁচ কুটিয়া গেল।

মহেন্দ্র কহিল—“তোমাকে কোন
অজুনর-বিনয়েই রাখা বাইবে না?”

বিনোদিনী তাহার আহত অঙ্গুলি
হইতে রক্তবিশু শুবিয়া লইয়া কহিল—
“কিসের জন্ত এত অজুনর-বিনয়? আমি
থাকিলেই কি, আর না থাকিলেই কি?
আপনার তাহাতে কি আসে যায়?”

বলিতে বলিতে গলাটা ঘেন ভাবি হঠাৎ
আসিল; বিনোদিনী অত্যন্ত মাথা নীচু

করিয়া সেলাইয়ের প্রাচ্য একান্ত মনোনিবেশ
করিল—মনে হইল, হর ত বা তাহার নত-
নেত্রের পলকপ্রান্তে একটুখানি ভলের খেঁচা
দিয়াছে! মাথের অপরাধ তখন সত্যায়
অঙ্ককারে মিলাইবার উপক্রম করিতেছিল।

মহেন্দ্র সুহৃৎসের মধ্যে বিনোদিনীর হাত
চাপিয়া ধরিয়া রক্ত সঞ্চলনকে কহিল—“এমি
তাহাতে আমার আসে যায়, তবে তুমি
থাকিবে?”

বিনোদিনী ভাড়াভাড়ি হাত ভাড়াইয়া
লইয়া সরিয়া বসিল। মহেন্দ্রের চমক
ভাঙিয়া গেল। নিজের শ্বেত রূপটি তীব্র
বাগের মত তাহার নিজের কানে বাতঃবাতঃ
প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল। অপরাধী
জিজ্ঞাসে মহেন্দ্র দত্ত দ্বারা ধংশন করিল—
“তাহার পর হইতে রমনা নির্বাক হইয়া
রহিল।

এমন সময় এই নৈঃশব্দ্যপরিপূর্ণ ঘরের
মধ্যে আশা প্রবেশ করিল। বিনোদিনী
তৎক্ষণাৎ ঘের পূর্ব কথোপকথনের অঙ্গ-
বৃত্তিধরণে হাসিয়া মহেন্দ্রকে বলিয়া উঠিল—
“আমার শুভর তোমরা যখন এত বাড়াইলে,
তখন আমারও কর্তব্য, তোমাঘের একটা
কথা রাখা। বতক্ষণ না বিদায় দিবে,
ততক্ষণ রহিলাম।”

আশা স্বামীর কৃতকার্যতার উৎফুল্ল
হইয়া উঠিয়া সখীকে আনিজন করিয়া ধরিল।
কহিল—“তবে এই কথা রহিল? তা হইলে
তিন সত্য কর, বতক্ষণ না বিদায় দিবে,
ততক্ষণ থাকিবে, থাকিবে, থাকিবে।”

বিনোদিনী তিনবার সীকার করিল।
আশা কহিল, “ভাই চোখের দাগ, সেই

যদি রহিলেই, তবে এত করিয়া সাধাইলে কেন ? শেষকালে আমার স্বামীকে কাছে ত হার মানিতে হইল ?”

বিনোদিনী হাসিয়া কহিল, “ঠাকুরপো, আমি হার মানিয়াছি, না তোমাকে হার মানাইয়াছি ?”

মহেন্দ্র এতক্ষণ স্তম্ভিত হইয়া ছিল ; মনে হইতেছিল, তাহার অপরাধে যেন সবত ঘর ভরিয়া রহিয়াছে, লাহুনা যেন তাহার সর্বাঙ্গ পরিবেষ্টন করিয়া ! আশার সঙ্গে কেমন করিয়া সে প্রসঙ্গমুখে দ্ব্যস্তবিক-ভাবে কথা কহিবে ? একমুহুর্তের মধ্যে কেমন করিয়া সে আপনার বীভৎস অসংযমকে সহ্যনা চটুলতায় পরিণত করিবে ? এই পৈশাচিক ঈর্ষকাল তাহার আয়তনের বহির্ভূত ছিল। সে গম্ভীরমুখে কহিল—আমারি ত তার হইয়াছে।” বলিয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

অনতিকাল পরেই আবার মহেন্দ্র ঘরের মধ্যে ঢুকিয়া বিনোদিনীকে কহিল—“আমাকে মাপ কর।”

বিনোদিনী কহিল—“অপরাধ কি করিয়াছ ঠাকুরপো !”

মহেন্দ্র কহিল—“তোমাকে জোর করিয়া এখানে ধরিয়া রাখিবার অধিকার আমাদের নাই !”

বিনোদিনী হাসিয়া কহিল—“জোর কই করিলে, তাহা ত দেখিলান না ! ভাল বাসিয়া ভালমুখেই ত থাকিতে বলিলে। তাহাকে কি জোর বলে ? বল ত ভাই চোখের বাসি, মাথের জোর আর ভালবাসা কি একত হইল ?”

আশা তাহার সঙ্গে সম্পূর্ণ একমত হইয়া কহিল, “কখনই না !”

বিনোদিনী কহিল—“ঠাকুরপো, তোমার ইচ্ছা আমি থাকি, আমি গেলে তোমার কষ্ট হইবে, সে ত আমার সৌভাগ্য ! কি বল ভাই চোখের বাসি, সংসারে এমন সুদৃষ্টি কয়জন পাওয়া যায় ? তেমন ব্যাধার বাধী, সুখের সুখী, অদৃষ্টগুণে যদিই পাওয়া যায়, তবে আমিই বা তাহাকে ছাড়িয়া যাইবার অজ্ঞ বাস্ত হইব কেন ?”

আশা তাহার স্বামীকে অপবিত্রভাবে নিকন্তর থাকিতে দেখিয়া ঈশং ব্যথিতচিত্তে কহিল—“তোমার সঙ্গে কথার কে পারিবে ভাই ? আমার স্বামী ত হার মানিয়াছেন, এখন তুমি একটু থাম।”

মহেন্দ্র আবার দত নর হইতে বাহির হইল। তখন প্রাণলব্ধীর সঙ্গে কিছুক্ষণ গল্প করিয়া বিহারী মহেন্দ্রের নিকানে আসিতেছিল। মহেন্দ্র তাহাকে ঘরের সম্মুখে দেখিতে পাঠিয়াই বলিয়া উঠিল—“ভাই বিহারি, আমার মত পাষাণ আর জগতে নাই।”—এমন বেগে কহিল, সে কথা ঘরের মধ্যে গিয়া পৌছিল।

ঘরের মধ্যে হইতে তৎক্ষণাৎ আহ্বান আসিল—“বিহারি-ঠাকুরপো।”

বিহারী কহিল—“একটু বাঘে আস্টি বিনোদ-বোঠা’ন।”

বিনোদিনী কহিল—“একবার শুনেই বাও না।”

বিহারী ঘরে ঢুকিয়াই মুহূর্তের মধ্যে একবার আশার দিকে চাহিল—বোমটার মধ্যে হইতে আশার মুখ গতটুকু দেখিতে

ପାଇଲ, ସେখানে ବିସାସ ବା ବେମନାର କୋନ ଡିହୁଇ ତ ବୋଧା ମେଲ ନା । ଆମା ଉଠିଆ ବାହିସର ଡେଇଁ କରିମ, ବିନୋଦିନୀ ତାହାକେ ଘୋର କରିଆ ବରିଆ ରାଧିଲ—କହିଲ, “ଆଜ୍ଞା ବିହାରି-ଠାକୁରପୋ, ଆମାର ଚୋଧେର ବାଲିର ମଲ୍ଲେ କି ତୋମାର ମଣିନ୍-ମଲ୍ଲକ ? ତୋହାକେ ବେଧ୍‌ଲେଇ ଓ ମାଳାତେ ଚାର କେନ ?”

ଆମା ଅତ୍ୟନ୍ତ ମଜ୍ଜିତ ହେଲା ବିନୋଦିନୀକେ ଡାଢ଼ିଲା କରିମ ।

ବିହାରି ଚାଲିଲା ଉତ୍ତର କରିମ—“ବିଧାତା ଆମାକେ ତେମନ ସୁଦୃଢ଼ କରିଆ ମଢ଼େନ ନାହିଁ ବଳିଆ ।”

ବିନୋଦିନୀ । ବେଧ୍‌ଢ଼ିଲ ଡାଟ ବାଲି, ବିହାରି-ଠାକୁରପୋ ବାଟାଣିଆ କଥା ବାଲିତେ ଜାଣେନ—ତୋର କଢ଼ିକେ ମୋବ ନା ମିଆ ବିଧାତାକେଟି ମୋବ ନିଶେନ । ମଞ୍ଜୁଗତିର ମତ ଏମନ କୁଳକ୍ଷ୍ମା ବେବର ମାଟିରାଓ ତାହାକେ ଆମର କରିତେ ନିଧିଲି ନା—ତୋରଟି କମାଳ ମନ୍ଦ !

ବିହାରି । ତୋମାର ଯଦି ତାତାତେ ମୟା ହର ବିନୋଦ-ବୋଠା’ନ, ତବେ ଆର ଆମାର ଆକ୍ଷେପ କିସେର ?

ବିନୋଦିନୀ । ମନ୍ତ୍ର ତ ମଢ଼ିଆ ଆଢେ, ଡବୁ ସେଧେର ଧାରା ନହିଲେ ଚାତକେର ଡ଼ାକା ମେଟେ ନା କେନ ?

ଆମାକେ ଧରିଆ ରାଧା ମେଲ ନା । ସେ ଘୋର କରିଆ ବିନୋଦିନୀର ହାତ ଛାଡ଼ାଣିଆ ବାହିର ହେଲା ମେଲ । ବିହାରି ଓ ଚାଲିଲା ବାଟ-ବାର ଉପକ୍ରମ କରିତେଇଲ । ବିନୋଦିନୀ କହିଲ, “ଠାକୁରପୋ, ମହେନ୍ଦ୍ରବାବୁ କି ହେ-ରାଜେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ମାର ?”

ତୁମିଆଟି ବିହାରି ମର୍ଦ୍ଦିନୀ କରିଆ

ମାଡ଼ାଣିଲ । କହିଲ—“ତାହା ତ ଜାଣି ନା । କିଛି ହେବାହେ ନା କି ?”

ବିନୋଦିନୀ । କି ଜାଣି ଠାକୁରପୋ, ଆମାର ତ ଭାଲ ବୋଧ ହର ନା !

ବିହାରି ଉଦ୍‌ବିଗ୍ନରେ ଚୋକିର ଉପର ବସିଲା ମଢ଼ିଲ । କମାଟା ଖୋଲିଲା ଗୁମିରେ ବାଲିଆ ବିନୋଦିନୀର ଗୁଦେର ହିକେ ବାସ୍ତବତାବେ ଗାହିଆ ଅମେକା କରିଆ ରହିଲ । ବିନୋଦିନୀ କୋନ କଥା ନା ବାଲିଆ ନରୋଗୋଷ ମିଆ ଗାହର ମେଲାଣି କରିତେ ମାରିଲ ।

କିଛିକ୍ଷଣ ପ୍ରତୀକ୍ଷା କରିଆ ବିହାରି କହିଲ—“ସହୌନ୍ଦାର ମଧ୍ୟକେ ତୁମି କି ବିଶେଷ କିଛି ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଆଛ ?”

ବିନୋଦିନୀ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସାଧାରଣତାବେ କହିଲ—“କି ଜାଣି ଠାକୁରପୋ, ଆମାର ତ ଭାଲ ବୋଧ ହର ନା । ଆମାର ଚୋଧେର ବାଲିର ଗଜ୍ଜେ ଆମାର କେବଳି ଡାବନା ହର ।”—ବାଲିଆ ମୌର୍ଦ୍ଧବିଶାସ କେଲିଆ ମେଲାଣି ରାଧିଆ ଉଠିଆ ବାହିତେ ଉଦ୍‌ଗତ ହେଲ ।

ବିହାରି ବାତ୍ତ ହେଲା କହିଲ—“ବୋଠା’ନ, ଏକଟୁ ବୋଲ ।”—ବାଲିଆ ଏକଟା ଚୋକିତେ ବାଲିଲ ।

ବିନୋଦିନୀ ସତ୍ତର ମସତ୍ତ ଜାନ୍‌ଲା-ସହଜା ମଲ୍ଲୁର୍ପୁ ବୁଲିଆ ମିଆ କେରୋମିନେର ବାତି ଡିକାଣିଆ ମେଲାଣି ଡାଲିଆ ମଣିଆ ବିହାନାର ପୁରସ୍କାରେ ମିଆ ବାଲିଲ । କହିଲ—“ଠାକୁରପୋ, ଆମି ତ ଡିହାରିନି ଏଥାମେ ବାକିବ ନା—କିନ୍ତୁ ଆମି ଚାଲିଆ ମେଲେ ଆମାର ଚୋଧେର ବାଲିର ଉପର ଏକଟୁ ମୁଠି ରାଧିଆ—ସେ ସେନ ଅହୁଧୀ ନା ହର ।”—ବାଲିଆ ସେନ ଗଜ୍ଜେଘୋଡ଼ାସ ମଂବରଣ କରିଆ ମଠିମାର ଗଜ୍ଜ ବିନୋଦିନୀ ଅଜ୍ଞାନିକେ ସ୍ତବ୍ଧ ହିରାଜେଲ ।

বিহারী বলিয়া উঠিল—“বোটা’ন, তোমাকে থাকিতেই হইবে। তোমার নিজের বলিতে কেহ নাই—এই সরলা মেয়েটিকে সুখে দুখে রাখা করিবার ভার তুমি লও—তুমি তাহাকে কেলিয়া গেলে আমি ত আর উপায় দেখি না।”

বিনোদিনী। ঠাকুরপো, তুমি ত সংসারের গতিক জান। এখানে বসাবর থাকিব কেমন করিয়া? লোকে কি বলিবে?

বিহারী। লোকে যা বলে বলুক, তুমি কান দিও না। তুমি দেখী—অসহায় বালিকাকে সংসারের নিষ্ঠুর আঘাত হইতে রক্ষা করা, তোমারি উপযুক্ত কাজ। বোটা’ন, আমি তোমাকে প্রথমে তিনি নাই, সেজন্য আমাকে কমা কর। আমিও সর্বাঙ্গদ্বয় সাধারণ ইতরলোকদের মত মনে মনে তোমার সবকে অন্তর্য ধারণা স্থান দিচ্ছিলাম;—একবার এমনো মনে হইয়াছিল, যেন আশার সুখে তুমি ঈর্ষ্য করিতেছ—যেন—কিন্তু সে সব কথা সুখে উচ্চারণ করিতেও পাও আছে। তার পরে, তোমার দেবীজন্মের পরিচয় আমি পাই-
যাছি,—তোমার উপর আমার পতীর ভক্তি জন্মিয়াছে বলিয়াই, আমি তোমার কাছে আমার সমস্ত অপরাধ বীকার না করিয়া থাকিতে পারিলাম না।

বিনোদিনীর সঙ্গশরীর পূলকিত হইয়া উঠিল। যদিও সে ছলনা করিতেছিল, তবু বিহারীর এই ভক্তি-উপহার সে মনে মনেও মিথ্যা বলিয়া প্রত্যাখ্যান করিতে পারিল না। এমন তিনিষ সে কখনো

কাহারো কাছ হইতে পায় নাই। ক্ষণ-কালের জন্ত মনে হইল, সে যেন বর্ষাধী পবিত্র, উন্নত—আশার প্রতি একটা অনি-
র্দেহ দয়ার তাহার চোখ দিয়া জল পড়িতে লাগিল। সেই অশ্রুপাত সে বিহারীর কাছে গোপন করিল না, এবং সেই অশ্রু-
ধারা বিনোদিনীর নিজের কাছে নিজেকে পূজনীয় বলিয়া মোহ উৎপাদন করিল।

বিহারী বিনোদিনীকে অশ্রু কেলিতে দেখিয়া নিজের অশ্রুবগ সংবরণ করিয়া উঠিয়া বাহিরে মহেন্দ্রের ঘরে গেল। মহেন্দ্র বে হঠাৎ নিজেকে পায়ও বলিয়া কেন ঘোষণা করিল, বিহারী তাহার কোন তাৎ-
পর্য্য খুঁজিয়া পাটল না। ঘরে গিয়া দেখিল, মহেন্দ্র নাই। খবর পাইল, মহেন্দ্র বেড়াইতে বাহির হইয়াছে। পূর্বে মহেন্দ্র অকারণে কখনই ঘর ছাড়িয়া বাহির হইত না। সুপরিচিত লোকের ও সুপরিচিত ঘরের বাহিরে মহেন্দ্রের অত্যন্ত ক্লান্তি ও পীড়া বোধ হইত। বিহারী ভাবিতে ভাবিতে বীরে বীরে বাড়ী চলিয়া গেল।

বিনোদিনী আশাকে নিজের শরন-
ঘরে আনিয়া বৃকের কাছে টানিয়া দুই চক্ষু
জলে ভরিয়া কহিল, “ভাই চোখের বালি,
আমি বড় হতভাগিনী, আমি বড়
অলক্ষণা।”

আশা বাধিত হইয়া তাহাকে বাহ্যপানে
বেঠেন করিয়া দেহাত্মকণ্ঠে বলিল—“কেন
ভাই, এমন কথা কেন বলিতেছ?”

বিনোদিনী রোমনোজ্বলিত শিশুর মত
আশার বক্ষে মুখ রাখিয়া কহিল—“আমি
গোথানে থাকিব, সেখানে কেবল মন্দই হইবে।

যে তাই, আমাকে ছাড়িয়া দে, আমি আমার জন্মের মধ্যে চলিয়া যাই।”

আশা ভিক্টর হাত দিয়া বিনোদিনীর হৃৎ স্পন্দিত করিয়া বলিল—“লক্ষীটি তাই, এমন কথা বলিস্ নে—তোকে ছাড়িয়া আমি থাকিতে পারিব না,—আমাকে ছাড়িয়া যাইবার কথা কেন আর তোর মনে আসিল?”

মহেন্দ্র দেখা না পাটয়া বিহারী কোন একটা ছুতার পুনর্বার বিনোদিনীর ঘরে আসিয়া মহেন্দ্র ও আশার মধ্যবর্তী আশঙ্কার কথাটা আর একটু স্পষ্ট করিয়া শুনিবার জন্য উপস্থিত হইল।

মহেন্দ্রকে পরদিন সকালে তাহাদের বাড়ী গাইতে বাটতে বলিবার জন্য বিনোদিনীকে অনুরোধ করিবার উপলক্ষ্য লইয়া সে উপস্থিত হইল। “বিনোদ-বেটা’ণ’ বলিয়া ডাকিয়াই তাত্ত কেরোসিনের উজ্জল আলোকে বাহির তইতেই আলিঙ্গনবদ্ধ সাদ্রশ্যে দুই সখীকে দেখিয়াই পমকিয়া ধাক্কাইল। আশার চোখে মনে হইল, নিশ্চয়ই বিহারী তাহার চোখের বাণিকে কোন অজ্ঞার নিশা করিয়া কিছু বলিয়াছে, তাই সে আজ এমন করিয়া চলিয়া যাইবার কথা ভুলিয়াছে। বিহারীবাবুর ভারি অজ্ঞার! তাঁহার মন ভাল নয়। আশা বিরক্ত হইয়া বাহির হইয়া আসিল। বিহারী ও বিনোদিনীর প্রতি ভক্তির মাত্রা ঢাকাইয়া বিগলিত-দৃষ্টিতে দ্রুত প্রস্থান করিল।

সেদিন রাতে মহেন্দ্র আশাকে কহিল, “চুনি, আমি কাল সকালের প্যাসেঞ্জারেই কাশি চলিয়া যাইব।”

আশার বক্ষস্থল ধক্ করিয়া উঠিল—কহিল, “কেন?”

মহেন্দ্র কহিল, “কাকীমাকে মনেক্ষুধিন দেখি নাই।”

শুনিয়া আশা বকুই লক্ষ্যবোধ করিল;—এ কথা পূর্বেই তাহার মনে উদয় হওয়া উচিত ছিল। নিতের সুখভ্রমের আকর্ষণে দেহমত্তী মানীমাকে সে যে ভুলিয়াছিল, অথচ মহেন্দ্র সেই যে প্রবাসি-তপস্বিনীকে মনে করিয়াছে, টহাতে নিজেই কতিন-দময়্য বলিয়া বড়ই দিকার জন্মিল।

মহেন্দ্র কহিল—“তিনি আমারই হাতে তাহার সংসারের একমাত্র দেহের ধনকে সমর্পণ করিয়া দিয়া চলিয়া গেছেন—তাহাকে একবার না দেখিয়া আমি কিছুতেই স্থির হইতে পারিতেছি না।”

বলিতে বলিতে মহেন্দ্রের কণ্ঠ বাস্পাক্ত হইয়া আসিল; দেহপূর্ণ নীরব আশীর্বাদ ও অব্যক্ত মঙ্গলকামনার সঞ্চিত বাস্তবতার সে আশার লগাট ও মন্তকের উপর দক্ষিণ কর-তল চালনা করিতে লাগিল। আশা এই অকস্মাৎ দেহাবেগের সম্পূর্ণ মগ্ন বৃত্তিতে পারিল না, কেবল তাহার দ্রব্য বিগলিত হইয়া অঙ্গ পড়িতে লাগিল। আজই সন্ধ্যাবেলায় বিনোদিনী তাহাকে অকারণে ঘেহাতিশয্যে যে সব কথা বলিয়াছিল, তাহা মনে পড়িল। উভয়ের মধ্যে কোথাও কোন যোগ আছে কি না, তাহা সে কিছুই বুঝিল না। কিন্তু মনে হইল, যেন ইহা তাহার জীবনে কিসের একটা দৃঢ়তা! ভাল কি মন্দ কে জানে!

ভয়ব্যাকুলচিত্তে সে মহেন্দ্রকে বাচ-

পাশে বদ্ধ করিল। মহেন্দ্র তাহার সেহ অকারণ আশঙ্কার আবেশ অদূতব করিতে পারিল। কহিল, “চুনি, তোমার উপর তোমায় পুণ্যবতী মাসীমার আশীর্বাদ আছে, তোমার কোন ভয় নাই, কোন ভয় নাই ! তিনি তোমারই মঙ্গলের জন্য তাঁহার সমস্ত ত্যাগ করিয়া গেছেন, তোমার কখনো কোন অকল্যাণ হইতে পারে না !”

আশা তখন দৃঢ়চিত্তে সমস্ত ভয় দূর করিয়া কেলিল। সামীর এই আশীর্বাদ অক্ষরকবচের মত গ্রহণ করিল। সে মনে মনে বারংবার তাহার মাসীমার পবিত্র পদ-ধূলি মাথায় তুলিয়া লইতে লাগিল—এবং একাগ্রমনে কহিল, “মা, তোমার আশীর্বাদ আমার স্বামীকে সর্বদা রক্ষা করুক।”

পরদিনে মহেন্দ্র চলিয়া গেল, বিনো-দিনীকে কিছুই বলিয়া গেল না। বিনো-দিনী মনে মনে কহিল, “নিজে অজ্ঞান করা হইল, আবার আমার উপরে রাগ ! এমন সাধু ত দেখি নাই ! কিন্তু এমন সাধুও বেশিদিন টেকে না।”

(২৩)

সংসারত্যাগিনী অরপূর্ণা বহদিন পরে হঠাৎ মহেন্দ্রকে আসিতে দেখিয়া যেমন স্নেহে আনন্দে আদ্যুত হইয়া গেলেন, তেমনি তাঁহার হঠাৎ ভয় হইল, বৃষ্টি আশাকে লইয়া মার সন্ধে মহেন্দ্রের আবার কোন বিরোধ ঘটনাছে এবং মহেন্দ্র তাঁহার কাছে নালিশ জানাইয়া সাশ্বনাশ ক্রিতে আসিয়াছে। মহেন্দ্র শিশুকাল হইতেই সকলপ্রকার সম্বট ও সম্বাপের সময় তাহার কাকীর কাছে ছুটিয়া আসে। কাহারাও উপরে রাগ করিলে

অরপূর্ণা তাহার রাগ থামাইয়া দিয়াছেন, দুঃখবোধ করিলে তাহা সহজে সহ করিতে উপদেশ দিয়াছেন। কিন্তু বিবাহের পর হইতে মহেন্দ্রের জীবনে সর্কীপেক্ষা যে সম্বটের কারণ ঘটনাছে, তাহার প্রতিকার-চেষ্টা দূরে থাকুক, কোনপ্রকার সাশ্বনা পর্দান্ত তিনি দিতে অক্ষম। সে সম্বন্ধে যে ভাবে যেমন করিয়াই তিনি হস্তক্ষেপ করি-বেন, তাহাতেই মহেন্দ্রের সামান্যিক বিদ্রব আরো বিস্তৃত বাড়িয়া উঠিবে, ইহাই বখন নিশ্চয় বুদ্ধিলেন, তখনই তিনি সংসার ত্যাগ করিলেন। অরপূর্ণা শিশু বখন জল চাহিয়া কাঁদে, এবং জল দেওয়া বখন কবিরাজের নিত্য নিবেদ, তখন পাণ্ডিত্যচক্রে মা বেনন অস্তম্বরে চলিয়া যান, অরপূর্ণা তেমনি করিয়া নিজেই প্রবাসে লইয়া গেছেন ! দূর তীর্থবাসে থাকিয়া ধন্যকর্মের নিয়মিত অহুটানে একরদিন সংসার অনেকটা তুলিয়া-ছিলেন, মহেন্দ্র আবার কি সেই সকল বিরোধের কথা তুলিয়া তাঁহার প্রজ্ঞার ক্ষতে আঘাত করিতে আসিয়াছে ?

কিন্তু মহেন্দ্র আশাকে লইয়া তাহার মার সম্বন্ধে কোন নালিশের কথা তুলিল না। তখন অরপূর্ণার আশঙ্কা অন্তর্গত গেল। যে মহেন্দ্র আশাকে ছাড়িয়া কালেজে বাইতে পারিত না, সে আজ কাকীর খোঁজ লইতে কাশি আসে কেন ? তবে কি আশার প্রতি মহেন্দ্রের টান ক্রমে ঢিলা হইয়া আসিতেছে ? মহেন্দ্রকে তিনি কিছু আশঙ্কার সহিত বিজ্ঞাসা করিলেন—“হাঁবে মইনু, আমার মাথা খা, ঠিক করিয়া বল দেখি, চুনি কেমন আছে ?”

মহেন্দ্র কহিল, “সে ত বেশ ভাল আছে কাকীমা।”

“আজকাল সে কি করে মরীন্ ? তোমার কি এখনো তেমনি ছেলেমানুষ আছিল, না কালকণ্ঠে ঘরকন্নার মন দিরাছিল ?”

মহেন্দ্র কহিল—“ছেলেমানুষী একে-বারেই বন্ধ। সকল কড়াটের মূল সেই চাকুপাতখানি যে কোথার অদৃষ্ট হইয়াছে, তাহার আর সন্ধান পাইবার জো নাই। তুমি থাকিলে দেখিবা খুঁসি হইতে—লেখা-পড়া দেখার অবহেলা করা স্ত্রীলোকের লক্ষ্যে বতদূর কর্তব্য, চুন্নী তাহা একান্ত-মনে পালন করিতেছে।”

“মরীন্, বিহারী কি করিতেছে ?”

মহেন্দ্র কহিল, “নিজের কাজ ছাড়া আর সমস্তই করিতেছে। নাহেব-গোমস্তার তাহার বিষয়সম্পত্তি দেখে; কি চক্ষে দেখে, তাহার তিক বলিতে পারি না। বিহারীর ভিন্নকাল ঐ বশা। তাহার নিজের কাজ পরে দেখে, আর, পরের কাজ সে নিজে দেখে।”

অন্নপূর্ণা কহিলেন—“সে কি বিবাহ করিবে না মরীন্ ?”

মহেন্দ্র একটুখানি হাসিয়া কহিল, “কই কিছুমাত্র উদ্বেগ ত দেখি না !”

তুমিরা অন্নপূর্ণা জগন্নাথের গোপনস্থানে একটা আশ্রয় পাইলেন। তিনি নিষ্ঠুর বৃত্তিতে পারিত্রাহিণী, তাহার বোনবিকে দেখিবা এবার বিহারী আগ্রহের সহিত বিবাহ করিতে উদ্বত হইয়াছিল, তাহার সেই উল্লুখ আগ্রহ অন্তর করিয়া একমাত্র

দলিত হইয়াছে। বিহারী বলিয়াছিল, “কাকীমা, আমাকে আর বিবাহ করিতে কখনো অগ্ররোধ করিও না।” সেই বড় অতিমানের কথা অন্নপূর্ণার কানে বাজিতে-ছিল। তাহার একান্ত অল্পপত সেই মেহের বিহারীকে তিনি এমন মনভাঙা অবস্থায় ফেলিয়া আসিয়াছিলেন, তাহাকে কোন দাননা দিতে পারেন নাই। অন্নপূর্ণা অত্যন্ত বিমর্ষ ও ভীত হইয়া তাহাতে লাগিলেন, “এখনো কি আমার প্রতি বিহারীর মন পড়িয়া আছে ?”

মহেন্দ্র কখনো তাড়ার ছলে, কখনো গম্ভীরভাবে, তাহারের ঘরকন্নার আধুনিক সমস্ত ব্যবস্থার্তা জানাইল, কেবল বিনো-বিনীর কথার উল্লেখমাত্র করিল না।

এখন কালেজ খোলা, কাণ্ডিতে মহেন্দ্রের বেশিদিন থাকিবার কথা নয়। কিন্তু কতিন রোগের পর স্বাস্থ্যকর আবহাওয়ার মধ্যে গিয়া আরোগ্যলাভের যে সুখ, মহেন্দ্র কাণ্ডিতে অন্নপূর্ণার নিকটে থাকিয়া প্রতি-দিন সেই সুখ অগ্রতব করিতেছিলেন—তাই একে একে দিন কাটিয়া বাইতে লাগিল। নিজের সঙ্গে নিজের যে একটা বিরোধ অস্বিবার উপক্রম হইয়াছিল, সেটা যেথিতে যেথিতে দূর হইয়া গেল। কয়দিন সর্বদা বর্ষপন্নায়ণা অন্নপূর্ণার দেহবৃদ্ধির সমুখে থাকিয়া, সংসারের কর্তব্যপালন এমনি সহজ ও সুখকর মনে হইতে লাগিল যে, তাহার পূর্বেকার আতঙ্ক হালান্নকর বোধ হইল। মনে হইল, বিনোদিনী কিছুই না! এমন কি, তাহার মুখের চেহারাও মহেন্দ্র স্পষ্ট করিয়া মনে আনিতে পারে

না। অবশেষে মহেন্দ্র খুব জোর করিয়াই মনে মনে কহিল, “আশাকে আমার জদর হইতে এক চুল সরাইয়া বলিতে পারে, এমন ত আমি কোথাও কাহাকেও দেখিতে পাই না।”

মহেন্দ্র অরপূর্ণাকে কহিল—“কাকীমা, আমার কালেক কামাই যাইতেছে—এবারকার মত তবে আসি। যদিও তুমি সংসারের দ্বারা কাটাईয়া একান্তে আসিয়া আছ—তবু অনুমতি কর, মাঝে মাঝে আসিয়া তোমার পায়ের ধূলা লইয়া যাব।”

মহেন্দ্র গৃহে কিরিয়া আসিয়া যখন আশাকে তাহার মাসীর ঘেহোপহার সিন্দুরের কোটা ও একটি শাখা পাপরের চুম্বকি ঘটি দিল, তখন তাহার চোখ দিয়া বরবর করিয়া জল পড়িতে লাগিল। মাসীমার সেই পরমহংসময় দৈর্ঘ্য এবং মাসীমার প্রতি তাহাদের ও তাহার শাওড়ির নানাপ্রকার উপলব্ধ অরণ করিয়া তাহার জদর ব্যাকুল হইয়া উঠিল। স্বামীকে জানাইল, “আমার বড় ইচ্ছা করে, আমি একবার মাসীমার কাছে গিয়া তাহার কুমা ও পায়ের ধূলা লইয়া আসি। সে কি কোন-মতেই ঘটিতে পারে না?”

মহেন্দ্র আশার বেদনা বুঝিল, এবং কিছুদিনের অন্ত কালিতে সে তাহার মাসীমার কাছে যাব, ইহাতে তাহার সম্মতিও হইল। কিন্তু পুনর্বার কালেক কাকীই করিয়া আশাকে কাশি পৌছাইয়া দিতে তাহার বিধা বোধ হইতে লাগিল।

আশা কহিল, “জ্যাঠাইমা ত অন্ন-দিনের মধ্যেই কাশি যাইবেন, সেই সঙ্গে গেলে কি কতি আছে?”

মহেন্দ্র রাজলক্ষ্মীকে গিয়া কহিল—“মা, বৌ একবার কাশিতে কাকীমাকে দেখিতে যাইতে চায়।”

রাজলক্ষ্মী মেঘবাক্যে কহিলেন, “বৌ যাইতে চান ত অবশ্যই যাইবেন, যাও তাহাকে লইয়া যাও।”

মহেন্দ্র বে আবার অরপূর্ণার কাছে যাতায়াত আরম্ভ করিল, ইহা রাজলক্ষ্মীর ভাল লাগে নাই। বৃষ্ণ দাঁড়বার প্রস্তাবে তিনি মনে মনে আরো বিরক্ত হইয়া উঠিলেন।

মহেন্দ্র কহিল—“আমার কালেক আছে, আশি-রাখিতে যাইতে পারিব না। তাহার জাঠামশায়ের সঙ্গে যাইবে।”

রাজলক্ষ্মী কহিলেন—“সে ত ভাল কথা! জাঠামশায়রা বড়লোক, কখনো আমাদের মত গরিবের ছাড়া মাড়ান না, তাহাদের সঙ্গে যাইতে পারিলে কত পৌরব!”

মাতার উত্তরোত্তর মেঘবাক্যে মহেন্দ্রের মন একেবারে কঠিন হইয়া থাকিল। সে কোন উত্তর না দিয়া আশাকে কাশি পাঠাইতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়া চলিয়া গেল।

বিহারী যখন রাজলক্ষ্মীর সঙ্গে ঘোষা করিতে আসিল, রাজলক্ষ্মী কহিলেন—“ও বিহারি, গুলিয়াছিনু, আমাদের ঘোষা বে কাশি যাইতে ইচ্ছা করিয়াছেন!”

বিহারী কহিল—“বল কি মা, মহীন্দ্রা আবার কালেক কামাই করিয়া কাশি যাইবে?”

রাজলক্ষ্মী কহিলেন, “না, ত্বা, মহীন্দ্র কেন যাইবেন? তা হইলে আর বিধিমান।

হইল কই? মহীন্দ্র এখানে থাকিবেন, বৌ তাঁহার জ্যাঠানহারাভের সঙ্গে কাশী যাইবেন। সবাই সাহেব-বিবি হইয়া উঠিল!”

বিহারী মনে মনে উদ্বিগ্ন হইল, বর্তমান কালের সাহেবিদ্যানা দ্রবণ করিয়া নহে। বিহারী ভাবিতে লাগিল, “ব্যাপার-খানা কি? মহেন্দ্র যখন কাশী গেল, আশা এখানে রহিল; আবার মহেন্দ্র যখন ফিরিল, তখন আশা কাশী যাইতে চাহিতেছে! দুজনের মাঝখানে একটা কি গুরুতর ব্যাপার ঘটনাছে! এমন করিয়া কতদিন চলিবে? বন্ধ হইয়াও আমরা তাঁহার কোন প্রতীকার করিতে পারিব না—দূরে দাঁড়াইয়া থাকিব?”

মাতার ব্যবহারে অত্যন্ত দুঃস্থ হইয়া মহেন্দ্র তাহার শরনধরে আসিয়া বসিয়া ছিল। বিনোদিনী ইতিমধ্যে মহেন্দ্রের সঙ্গে লাক্ষ্য করে নাই—তাই আশা তাহাকে পানের ঘর হইতে মহেন্দ্রের কাছে লইয়া আসিবার স্তম্ভ অস্বরোধ করিতেছিল।

এমন সময় বিহারী আসিয়া মহেন্দ্রকে জিজ্ঞাসা করিল—“আশা-বোঠা’দের কি কাশী বাওয়া দিহ হইয়াছে?”

মহেন্দ্র কহিল—“না হইবে কেন? বাধাটা কি আছে?”

বিহারী কহিল—“বাধার কথা কে বলিতেছে? কিন্তু হঠাৎ এ খেরাল তোমাদের মাঝার আসিল যে?”

মহেন্দ্র কহিল, “মানীকে দেখিবার ইচ্ছা—প্রবাসী আত্মীরের জন্য ব্যাকুলতা, মানবচরিত্রের এমন মাঝে মাঝে ঘটনা থাকে!”

বিহারী জিজ্ঞাসা করিল, “তুমি সঙ্গে যাইতেছ?”

এর তিনটাই মহেন্দ্র ভাবিল, “জ্যাঠার সঙ্গে আমাকে পাঠান সম্ভব নহে, এই কথা লইয়া আলোচনা করিতে বিহারী আসিয়াছে।” পাছে অধিক কথা বলিতে গেলে ক্রোধ উজ্জ্বলিত হইয়া উঠে, তাই সংক্ষেপে বলিল—“না!”

বিহারী মহেন্দ্রকে চিনিত। সে যে রাগিয়াছে, তাহা বিহারীর অগোচর ছিল না। একবার মৃদু ধরিলে তাহাকে টলানো যায় না, তাহাও সে জানিত। তাই মহেন্দ্রের যাওয়ার কথা আর তুলিল না। মনে মনে ভাবিল, “বেচারা আশা যদি কোন বেদনা বহন করিয়াই চলিয়া যাইতেছে হয়, তবে সঙ্গে বিনোদিনী গেলে তাহার সাহায্য হইবে।” তাই ধীরে ধীরে কহিল—“বিনোদ-বোঠান তাঁর সঙ্গে গেলে হয় না?”

মহেন্দ্র গর্জন করিয়া উঠিল—“বিহারি, তোমার মনের ভিতর যে কথাটা আছে, তাহা স্পষ্ট করিয়াই বল। আমার সঙ্গে অসম্মততা করিবার কোন দরকার দেখি না! আমি জানি, তুমি মনে মনে সন্দেহ করিয়াছ, আমি বিনোদিনীকে ভালবাসি। বিধ্যা কথা! আমি বাসি না! আমাকে রক্ষা করিবার জন্য তোমাকে পাহারা দিয়া বেড়াইতে হবে না! তুমি এখন নিজেই রক্ষা কর! যদি সত্য বন্ধুর তোমার মনে থাকিত, তবে বহুদিন আগে তুমি আমার কাছে তোমার মনের কথা বলিতে এবং নিজেকে বন্ধুর অঙ্গপুত্র হইতে বহুদূরে

লইয়া বাইতে । আমি তোনার মুখের সামনে নম্র করিয়া বলিতেছি, তুমি আমাকে ভাল বানিয়াছ ।”

অত্যন্ত বেদনার স্থানে গুই পা দিয়া মাড়াইয়া দিলে, আহত ব্যক্তি মুহূর্তকাল বিচার নাস্তকরিয়া আঘাতকারীকে যেমন সবলে ধাক্কা দিয়া ফেলিতে চেষ্টা করে—রক্তকণ্ঠ বিহারী ভেমনি পাণ্ডুপথে তাহার চৌকি হইতে উঠিয়া মহেন্দ্রেশ্বর দিকে ধাবিত হইল—হঠাৎ থামিয়া বহুকষ্টে ঘর বাহির করিয়া কহিল—“দুঃখর তোমাকে কমা করুন, আমি বিধায় হই !”—বলিয়া টলিতে টলিতে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল ।

পাশের ঘর হইতে বিনোদিনী ছুটয়া আসিয়া ডাকিল—“বিহারি-ঠাকুরপো !”

বিহারী দেয়ালে ভর করিয়া একটুখানি হাসিবার চেষ্টা করিয়া কহিল—“কি বিনোদ-বোঠা'ন !”

বিনোদিনী কহিল “ঠাকুরপো, চোখের বালির সঙ্গে আমিও কাঁধেতে বাইব ।”

বিহারী কহিল—না, না, বোঠা'ন, সে হইবে না, সে কিছুতেই হইবে না ! তোমাকে মিনতি করিতেছি—আমার কথায় কিছুই করিয়ো না ! আমি এখানকার কেহ নই, আমি এখানকার কিছুতেই হস্তক্ষেপ করিতে চাহি না, তাহাতে ভাল হইবে না ! তুমি বেবী, তুমি বাহা ভাল বোধ কর, তাহাই করিবে ! আমি চলিলাম !”

বলিয়া বিহারী বিনোদিনীকে বিনম্র নমস্কার করিয়া চলিল । বিনোদিনী কহিল—“আমি দেবী নই ঠাকুরপো, গুনিয়া যাও ! তুমি চলিয়া গেলে কাহারো ভাল

হইবে না ! ইহার পরে আমাকে ধোব দিয়ো না !”

বিহারী চলিয়া গেল । মহেন্দ্র স্তম্ভিত হইয়া বসিয়া ছিল । বিনোদিনী তাহার প্রতি অলস বজ্রের মত একটা কঠোর কটাক্ষ-বিক্ষেপ করিয়া পাশের ঘরে চলিয়া গেল । সে ঘরে আশা একান্ত লজ্জার সঙ্কোচে বসিয়া বাইতেছিল । বিহারী তাহাকে ভালবাসে, এ কথা মহেন্দ্রের মুখে শুনিয়া সে আর মুখ তুলিতে পারিতেছিল না । কিন্তু তাহার উপর বিনোদিনীর আর দয়া হইল না । আশা যদি তখন চোখ তুলিয়া চাহিত, তাহা হইলে সে ভর পাইত । সমস্ত সংসারের উপর বিনোদিনীর যেন পুনঃ চাপিয়া গেছে ! মিথ্যা কথা বটে ! বিনোদিনীকে কেহই ভালবাসে না বটে ! সকলেই ভালবাসে এই লজ্জাবতী ননীর পুতুলটিকে !

মহেন্দ্র সেই যে আবেগের মুখে বিহারীকে বলিয়াছিল “আমি পাবও”—তাহার পর আবেগশান্তির পর হইতে সেই হঠাৎ আশ্ব-প্রকাশের জন্য সে বিহারীর কাছে কুণ্ঠিত হইয়া ছিল । সে মনে করিতেছিল, তাহার সব কপাই যেন ব্যক্ত হইয়া গেছে । সে বিনোদিনীকে ভালবাসে না, অথচ বিহারী জানিয়াছে যে, সে ভালবাসে, ইহাতে বিহারীর উপরে তাহার বড় একটা বিরক্তি জন্মিতেছিল । বিশেষত তাহার পর হইতে যতবার বিহারী তাহার সম্মুখে আসিতেছিল, তাহার মনে হইতেছিল, যেন বিহারী সর্বকৌতুহলে তাহার একটা ভিতরকার কথা গুঞ্জিয়া বেড়াইতেছে । সেই সমস্ত বিরক্তি

উত্তরোত্তর কমিতেলিল—আজ একটু
আঘাতেই বাহির হইয়া পড়িল।

কিন্তু বিনোদিনী পাশের ঘর হইতে
বেগুন ব্যাকুলভাবে ছুটিয়া আসিল—বেগুন
অর্ন্তকণ্ঠে বিহারীকে রাখিতে চেষ্টা করিল
এবং বিহারীর আবেশপালনরূপে আশার
সহিত কান্না ধাইতে প্রবৃত্ত হইল, ইহা
মহেন্দ্রের পক্ষে অস্বাভাবিক। এই দৃশ্যটি
মহেন্দ্রকে প্রবল আঘাতে অভিভূত করিয়া
দিল। সে বলিয়াছিল, সে বিনোদিনীকে
ভালবাসে না, কিন্তু যাহা শুনিল, যাহা
দেখিল, তাহা তাহাকে স্মৃতির হইতে দিল না;
তাহাকে চারিদিক হইতে বিচিত্র আকারে
পীড়ন করিতে লাগিল! আর, কেবল
নিম্নলিখিত পরিভাষার সহিত মনে হইতে
লাগিল—“বিনোদিনী ভুলিয়াছে,—আমি
বলিয়াছি, ‘আমি তাহাকে ভালবাসি না।’”

(২৪)

মহেন্দ্র তাহাতে লাগিল—“আমি বলি-
য়াছি, ‘নিখা কণা, আমি বিনোদিনীকে
ভালবাসি না।’ অত্যাশ্চর্য্য কঠিন করিয়া
বলিয়াছি। আমি যে তাহাকে ভালবাসি,
তাহা না-ই হইল, কিন্তু ভালবাসি না, এ
কথাটা বড় কঠোর!—এ কথার আঘাত না
পার, এমন স্ত্রীলোক কে আছে! ইহার
প্রতিবাদ করিবার অবসর কবে কোথায়
পাইব? ভাল বাসি, এ কথা ঠিক বলা যায়
না; কিন্তু ভাল বাসি না, এই কথাটাকে
একটু কিকা করিয়া—নগ্নন করিয়া জানান
দরকার। বিনোদিনীর মনে এমন একটা
নিষ্ঠুর অশুচি ভুল সংস্কার পাকিতে দেওয়া
অসম্ভব।”

এই বলিয়া মহেন্দ্র তাহার বাক্যর মধ্য
হইতে আর একবার তাহার চিহ্ন তিনখানি
পড়িল। মনে মনে কহিল—“বিনোদিনী
আমাকে যে ভালবাসে, ইহাতে সন্দেহ নাই।
কিন্তু কাল সে বিহারীর কাছে এমন করিয়া
আসিয়া পড়িল কেন? সে কেবল আমাকে
খেদাইয়া। আমি যখন তাহাকে ভাল বাসি
না স্পষ্ট করিয়া বলিলাম, তখন সে কোন
সুযোগে আমার কাছে তাহার ভালবাসা
প্রত্যাখ্যান না করিয়া কি করিবে? এমি
করিয়া আমার কাছে অবমানিত হইয়া হয়
ত সে বিহারীকে ভালবাসিতেও পারে!”

মহেন্দ্রের ক্ষোভ এতই বাড়িয়া উঠিতে
লাগিল যে, নিঃশেষ চাকল্যে সে নিজে
আশ্চর্য্য এবং ভীত হইয়া উঠিল। না হয়
বিনোদিনী ভুলিয়াছে মহেন্দ্র তাহাকে ভাল-
বাসে না, তাহাতে দোষ কি? না হয় এই
কথার অভিমানিনী বিনোদিনী তাহার
উপর হইতে যন সরাইয়া লইতে চেষ্টা
করিবে, তাহাতেই বা ক্ষতি কি? ঋতুর
সময় নৌকার শিকল যেমন নৌগরকে
টানিয়া ধরে, মহেন্দ্র তেমনি ব্যাকুলতার
সঙ্গে আশাকে যেন অতিরিক্ত মোহ করিয়া
ধরিল।

গ্রামে মহেন্দ্র আশার মুখ বন্ধের কাছে
ঘুরিয়া জিজ্ঞাসা করিল—“তুমি, তুমি আমাকে
কতখানি ভালবাস, ঠিক করিয়া বল!”

আশা তাহিল, “এ কেমন প্রশ্ন?
বিহারীকে লইয়া অত্যাশ্চর্য্য লজ্জাজনক যে
কথাটা উঠিয়াছে, তাহাতেই কি তাহার
উপরে সংশয়ের ছায়া পড়িয়াছে?” সে লজ্জায়
মরিয়া গিয়া কহিল, “ছি ছি, আজ তুমি

অমন গ্রন্থ কেন করিলে ? তোমার চুটপায়ে পড়ি, আমাকে পুলিশ বল, আমার ভালবাসার তুরি কবে কোথায় কি অভাব দেখিয়াছে ?”

মহেন্দ্র আশাকে পাঁড়ন করিয়া তাহার মাথুখা বাহির করিবার জন্ত কহিল—“তবে তুমি কান্ধি ঘাইতে চাহিতেছ কেন ?”

আশা কহিল—“আমি কান্ধি ঘাইতে চাই না, আমি কোথাও ঘাইব না।”

মহেন্দ্র । তখন ত চাহিয়াছিলে !

আশা অত্যন্ত পাঁড়িত হইয়া কহিল, “তুমি ত জান, কেন চাহিয়াছিলাম !”

মহেন্দ্র । আনাকে ছাড়িয়া তোমার মানীর কাছে বোধ হয় বেশ সুখে থাকিতে !

আশা কহিল, “কখনো না ! আমি সুখের জন্ত ঘাইতে চাই নাই।”

মহেন্দ্র কহিল, “আমি সত্য বলিতেছি চুনি, তুমি আর কাহাকেও বিবাহ করিলে চেষ্টা বেশি স্বাধী হইতে পারিতে !”

শুনিয়া আশা চকিতের মধ্যে মহেন্দ্রের বক হইতে সরিয়া গিয়া, বাগিলে মুখ ঢাকিয়া, কাঁঠের মত আড়ষ্ট হইয়া রহিল,—মুহূর্ত্তপরেই তাহার কান্না আব চাপা রহিল না। মহেন্দ্র তাহাকে সাধনা দিবার জন্ত বকে তুলিয়া লইবার চেষ্টা করিল, আশা বাগিল ছাড়িল না। পতিব্রতীর এই অভিমানে মহেন্দ্র সুখে গর্বে বিকারে ফুট হইতে লাগিল।

বে সব কথা ভিতরে ভিতরে আভাসে ছিল, সেইগুলি হঠাৎ স্পষ্ট কপায় পরিণত হইয়া সকলেরই মনে একটা গোলমাল বাগাইয়া দিল। বিনোদিনী নব নব ভাবিতে লাগিল—অমন স্পষ্ট অভিযোগের

বিকল্পে বিহারী কেন কোন প্রতিবাদ করিল না ? যদি সে বিয়া প্রতিবাদও করিত, তাহা হইলেও যেন বিনোদিনী একটু খুশি হইত ! বেশ হইয়াছে, মহেন্দ্র বিহারীকে যে আঘাত করিয়াছে, তাহা তাহার প্রাণাই ছিল ! বিহারীর মত অমন মহৎ লোক কেন আশাকে ভালবাসিবে ? এই আঘাতে বিহারীকে যে দুঃখে লইয়া গেছে, সে যেন ভালই হইয়াছে—বিনোদিনী যেন নিশ্চিন্ত হইল।

কিন্তু বিহারীর সেই মুহূর্ত্তাবগত রক্তহীন পাণ্ডু মুখ বিনোদিনীকে সকল কণ্ঠের মধ্যে যেন অহুসরণ করিয়া ফিরিল। বিনোদিনীর অন্তরে যে সেবাপরায়ণা মাত্নী-প্রকৃতি ছিল, সে সেই আত্মমুখ দেখিয়া কান্ধিতে লাগিল। ঋণশূলভুক্ত বৈদ্যন মাতা বুকের ‘কাছে’ বোলাইয়া বেড়াই, তেমনি সেই আত্মর মূর্ত্তিকে বিনোদিনী আপন জননের মধ্যে রাখিয়া বোলাইতে লাগিল ;—তাহাকে স্মরণ করিয়া সেই মুখে আবার রক্তের রেখা, পাণের প্রবাহ, হাড়ের বিকাশ দেখিবার জন্ত বিনোদিনীর একটা অধীর ওৎসুক্য অগিল।

দুই তিন দিন সকল কণ্ঠের মধ্যে এই-রূপ উন্মনা হইয়া ফিরিয়া বিনোদিনী আর থাকিতে পারিল না। বিনোদিনী এক-খানি সাধনার পত্র লিখিল—কহিল, “ঠাকুরপো, আমি তোমার সেদিনকার সেই শুকমুখ দেখিয়া অবধি ত্রাণমনে কামনা করিতেছি, তুমি সুস্থ হও, তুমি যেমন ছিলে, তেমনিটি হও—সেই সহজ হাসি আবার কবে দেখিব, সেই উদার কথা আবার

তবে তুমিই ? তুমি কেমন আছ, আমাকে
একটি ছাত্র শিখিয়া জানাও !

তোমার বিনোদ-বোটা'ণ।"

বিনোদিনী দরোয়ানের হাত দিয়া
বিহারীকে টিকানার ভিত্তি পাঠাইয়া দিল।

আমাকে বিহারী ভাণবাণে, এক কথা যে
এমন জুড় করিয়া। এমন গহিঁতভাবে মহেশ্বর
মুখে উচ্চারণ করিতে পারিবে, তাহা বিহারী
স্বপ্নেও কল্পনা করে নাই। কারণ, সে
নিজেও এমন কথা শ্রুতি করিয়া কখনো
মনে স্থান দেয় নাই। প্রথমটা বস্তুত
হইল—তার পরে ক্রোধে স্ফূরণ ছট্‌ফট্‌
করিয়া বলিতে লাগিল—“অজ্ঞান, অপরত,
অমূলক !”

কিন্তু কথাটা যখন একবার উচ্চারিত
হইয়াছে, তখন তাহাকে আর সম্পূর্ণ মারিয়া
কেলা যায় না। তাহার মধ্যে যেটুকু সত্যের
বীজ ছিল, তাহা দেখিতে দেখিতে অঙ্কুরিত
হইয়া উঠিতে লাগিল। কত দেখিবার
উপলব্ধি সেই যে একদিন সন্ধ্যাকালে
বাগানের উজ্জ্বল পুষ্পগন্ধপ্রবাহে লক্ষিত।
বাগিকার সুসুনার সুগন্ধানিকে সে নিতান্তই
আপনার মনে করিয়া বিগলিত অশ্রুধারের
সহিত একবার চাহিয়া দেখিয়াছিল, তাহাই
বারবার মনে পড়িতে লাগিল, এবং বুকের
কাছে কি বেন চাপিয়া ধরিতে লাগিল, এবং
একটা অত্যন্ত কঠিন বেধনা কর্ত্তর কাছ
পর্যন্ত আলোড়িত হইয়া উঠিল। দীর্ঘ-
রাত্রি ছাণের উপর শুইয়া শুইয়া, বাড়ীর
সম্মুখের পথে 'ফ্রুটপদে' পারচারি করিতে
করিতে করিতে, যাহা এতদিন অব্যক্ত ছিল,
তাহা বিহারীর মনে ব্যক্ত হইয়া উঠিল।

যাহা সংঘত ছিল, তাহা উন্মাদ হইল, নিঃশেষ
কাছেও বাহার কোন প্রমাণ ছিল না,
মহেশ্বরের বাক্যে তাহা বিরুদ্ধ প্রাণ পাইয়া
বিহারীর অন্তর-বাহির ব্যাপ্ত করিয়া দিল।

তখন সে নিজেই অপরাধী বলিয়া
বুঝিল। মনে মনে কহিল, “আমার ত আর
জ্ঞান কহা শোভা পায় না, মহেশ্বরের কাছে
ত ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া বিদায় লইতে হইবে!
সে দিন এমনভাবে চলিয়া আসিয়াছিলাম,
যেন মহেশ্বর দোষী, আমি বিচারক—সে
অজ্ঞান স্বীকার করিয়া আসিব।”

বিহারী জানিত, আশা কাণ্ড চলিয়া
গেছে। একদিন সে সন্ধ্যার সময় ঘরে
ঘরে মহেশ্বরের ঘরের সম্মুখে আসিয়া
উপস্থিত হইল। রাজলক্ষীর দূর-সম্পর্কের
মামা সাধুচরণকে দেখিয়া লিজ্জালা করিল,
“সাধু, কদিন আসিতে পারি নাই—
এখানকার সব ব্যবস্থা ভাল ?” সাধুচরণ সকলের
কুশল জানাইল। বিহারী লিজ্জালা করিল—
“বোটা'ণ কানীতে কবে গেলেন ?”

সাধুচরণ কহিল—“তিনি যান নাই।
তাঁহার কানী যাওয়া হইবে না।”

তুমি, কিছু না মানিয়া অস্তঃপুরে বাইবার
অন্ত বিহারীর মন ছুটিল। পূর্বে যেমন সহজে,
যেমন আনন্দে, আত্মীয়ের মত সে পরিচিত
সিঁড়ি বাহিয়া ভিতরে বাইত, সকলের সঙ্গে
বিড়কোতুকের সহিত হাস্যালাপ করিয়া
আসিত, কিছুই মনে হইত না, আর তাহা
অবিহিত, তাহা দুর্লভ, জানিগাই তাহার
চিত্ত বেন উন্মত্ত হইল। আর একটিবার,
কেবল শেষবার, তেমনি করিয়া ভিতরে
গিয়া ঘরের ছেলের মত রাজলক্ষীর সহিত

কথা দারিদ্র্য, একবার ঘোমটানুত আশাকে
বোটা'ন বলিয়া বুটো। তুচ্ছ কথা কহিয়া
আশা তাহার কাছে পরম আকাঙ্ক্ষার
বিষয় হইয়া উঠিল। সাধুচরণ কহিল,
“তাই অন্ধকারে গাড়াইয়া রাখিলে যে,
ভিতরে চলে।”

শুনিয়া বিহারী দ্রুতবেগে ভিতরের
দিকে কয়েকপদ অগ্রসর হইয়াই কিরিয়া
সাধুকে কহিল, “বাট, একটা কাগজ আচ্ছ।”
বলিয়া ভাড়াভাড়ি প্রদান করিল। সেই
রাত্রেই বিহারী পশ্চিমে চলিয়া গেল।

দয়োরান বিনোদিনীর চিঠি লইয়া
বিহারীকে না পাইয়া চিঠি ফিরাইয়া লইয়া
আসিল। মহেন্দ্র তখন দেউড়ির সম্মুখে
ছোট বাগানটোতে বেড়াইতেছিল। জিজ্ঞাসা
করিল “এ কাহার চিঠি?” দয়োরান সমস্ত
বলিল। মহেন্দ্র চিঠিখানি নিজে লইল।

একবার সে ভাবিল, চিঠিখানা লইয়া
বিনোদিনীর হাতে দিবে—অপরোধিনী
বিনোদিনীর লজ্জিতমুখ একবার সে দেখিয়া
আসিবে—কোন কথা বলিবে না। এই
চিঠির মধ্যে বিনোদিনীর লজ্জার কারণ
যে আছেই, মহেন্দ্র মনে তাহাতে কোন
সন্দেহ ছিল না। মনে পড়িল, পূর্বেও
আর একদিন বিহারীর নামে এমন এক-
খানা চিঠি পিয়াছিল। চিঠিতে কি লেখা
আছে, এ কথা না জানিয়া মহেন্দ্র কিছুতেই
হির থাকিতে পারিল না। সে মনকে
বুঝাইল—বিনোদিনী তাহার অভিভাবকতার
আছে, বিনোদিনীর ভাল-মন্দর অন্ত সে
দায়ী। অতএব একপু সন্দেহজনক পদ
গুলিয়া দেখাই তাহার দস্তখ। বিনো-

দিনীকে বিপথে গাইতে দেওয়া কোনমতেই
হইতে পারে না।

মহেন্দ্র ছোট চিঠিখানা খুলিয়া পড়িল।
তাহা সরলভাবের লেখা, সেইজন্য অকৃত্রিম
উৎসর্গ তাহার মধ্য হইতে পরিকার প্রকাশ
পাইয়াছে। চিঠিখানা পুনঃপুন পাঠ
করিয়া এবং অনেক চিন্তা করিয়া মহেন্দ্র
ভাবিয়া উঠিতে পারিল না, বিনোদিনীর
মনের গতি কোন্ দিকে। তাহার কেবলি
আশঙ্কা হইতে লাগিল “আমি যে তাহাকে
ভালবাসি না বলিয়া অপমান করিয়াছি,
সেই অভিমানেই বিনোদিনী অন্তরিকাকে
মন দিবার চেষ্টা করিতেছে। রাগ করিয়া
আমার আশা সে একেবারেই ছাড়িয়া
দিয়াছে।”

এই কথা মনে করিয়া মহেন্দ্রের ধৈর্য-
রক্ষা করা একেবারে অসম্ভব হইয়া উঠিল।
যে বিনোদিনী তাহার নিকট আত্মসমর্পণ
করিতে আসিয়াছিল, সে যে মুহূর্তকালের
মৃত্যুর সম্পূর্ণ তাহার অধিকারচ্যুত হইয়া
যাইবে, সেই সম্ভাবনায় মহেন্দ্রকে হির
থাকিতে মিল না। মহেন্দ্র ভাবিল—
“বিনোদিনী আমাকে যদি মনে মনে ভাল-
বাসে, তাহা বিনোদিনীর পক্ষে মঙ্গলকর—
এক জায়গার সে বন্ধ হইয়া থাকিবে।
আমি নিজের মন জানি, আমি ত তাহার
প্রতি কখনই অন্যায় করিব না। সে
আমাকে নিরাপদে ভালবাসিতে পারে।
আমি আশাকে ভালবাসি, আমার দ্বারা
তাহার কোন ভয় নাই! কিন্তু সে যদি
অন্য কোন দিকে মন দেয়, তখন তাহার
কি সর্জনশ হইতে পারে, কে জানে!”

মহেন্দ্র দ্বির করণ, নিজেতে ধরা না দিয়া
বিনোদিনীর মন কোন অবকাশে আর
একবার কিরাইতেই হইবে।

মহেন্দ্র অন্তঃপুরে প্রবেশ করিতেই
বেশিল, বিনোদিনী পথের মধ্যেই যেন
কাহার জন্য উৎকণ্ঠিত হইয়া প্রতীক্ষা
করিতেছে। অমনি মহেন্দ্রের মনে চকি-
তের মধ্যে বিবেচনালিয়া উঠিল। কহিল,
“ওগো, মিথ্যা পাড়াইয়া আচ, দেখা পাইবে
না! এই তোমার চিঠি কিরিয়া আসি-
রাছে!” বলিয়া চিঠিখানা ফেলিয়া দিল।

বিনোদিনী কহিল, “খোলা যে?”

মহেন্দ্র তাহার জবাব না দিয়াই চলিয়া
গেল। বিহারী চিঠি ফুলিয়া পড়িয়া কোন
উত্তর না দিয়া চিঠি ফেরৎ পাঠাইয়াছে,
মনে করিয়া বিনোদিনীর সঙ্গাক্তের সমস্ত
শিরা ধ্বংস করিতে লাগিল। সে দরো-
য়ান চিঠি লইয়া গিয়াছিল, তাহাকে ডাকিয়া
পাঠাইল; সে কতকালে অল্পপণ্ডিত ছিল,
তাহাকে পাওয়া গেল না। প্রদীপের বৃথ
হইতে যেমন অলস্ত তৈলবিশু করিয়া পড়ে,
কৃদ্ধ শরনকঙ্কর মধ্যে বিনোদিনীর দীপ-
নেত্র হইতে তেমনি জ্বরের আলা অক্ষমলে
গলিয়া পড়িতে লাগিল। নিজের চিঠিখানা
ছিঁড়িয়া ছিঁড়িয়া কুড়িকুট করিয়া কিছুতেই
তাহার সত্যনা হইল না—সেই ছই-চারি-
লাইন কাগীর বাগকে অতীত হইতে, বর্তমান
হইতে, একেবারেই বহিরা ফেলিবার, একে-
বারেই না করিয়া বিবার, কোন উপায় নাই
কেন? ক্রুদ্ধা মধুকরী বাতাকে মধুখে গায়,
তাহাকেই মংশন করে, দুঃখা বিনোদিনী
তেমনি তাহার চারিদিকের সমস্ত সংসার-

টাকে আলাইবার জন্য প্রস্তুত হইল। সে
বাধা চাষ, তাহাতেই বাধা? কোন-কিছুতেই
কি সে কৃতকার্য হইতে পারিবে না?
স্বপ্ন যদি না পাইল, তবে যাহারা অহা
সকল সূত্রে অস্তরায়, যাহারা তাহাকে
কৃতার্থতা হইতে ত্রুট, সমস্ত সম্বল
হইতে বঞ্চিত করিয়াছে, তাহাবিপক্ষে
পরাণ—গুলিদুগ্ধিত করিলেই, তাহার বার-
জীবনের কণ্ঠ সমাধা হইবে।

(২৪)

সেদিন নূতন কান্তনে প্রথম বঙ্গের হাওয়া
দিতেই আশা অনেকদিন পরে শঙ্কর
আরম্ভে ছাড়ে মাদুর পাতিয়া বসিয়াছে।
একখানি নাসিক কাগজ লইয়া বংশ প্রকা-
শিত একটা গল্প খুব মনোযোগে দিয়া সেই
অল্প আলোকে পড়িতেছিল। গল্পের নায়ক
তখন সংবৎসর পরে পূজার ছুটিতে বাড়ী
আসিবার সময় ডাকাতের হাতে পড়িয়াছে,
আশার জ্বর উৎপে কীপিতেছিল; এদিকে
হস্তভাগিনী নায়িকা ত্রিক সেই সময়েই
বিপদের অগ্নিবেধিয়া কামিয়া জালিয়া উঠি-
রাছে। আশা চোখের জল আর রাখিতে
পারে না। আশা বাংলা গল্পের অত্যন্ত
উদার সমালোচক ছিল। বাধা পড়িত,
তাহাই মনে হইত চমৎকার। বিনো-
দিনীকে ডাকিয়া বলিত, “ভাই চোখের
বাগি, মাথা খাও, এ গমটা পড়িয়া দেখ।
এমন সুন্দর! পড়িয়া আর কামিয়া বাটি
না।” বিনোদিনী ভাল-মন্দ বিচার করিয়া
আশার উজ্জ্বলিত উৎসাহে বড় আশাক
করিত

আজিকার এই গরমটা আশা মহেন্দ্রকে পড়াইবে বলিয়া স্থির করিয়া যখন সন্ধ্যা-চক্রে কাগজখানা বন্ধ করিল, এমন সময় মহেন্দ্র আসিয়া উপস্থিত হইল। মহেন্দ্রের মুখ দেখিয়াই আশা উৎকণ্ঠিত হইয়া উঠিল। মহেন্দ্র জোর করিয়া প্রশ্নের আনিবার চেষ্টা করিয়া কহিল—“একলা ছাণের উপর কোন্ ভাব্যবানের ভাবনার আছ ?”

আশা নারক-নাটিকা কণা একেবারে তুলিয়া গিয়া কহিল, “তোমার কি শরীর আজ ভাল নাই ?”

মহেন্দ্র। শরীর বেশ আছে।

আশা। তবে তুমি মনে মনে কি একটা ভাবিতেছ, আমাকে তুলিয়া বল !

মহেন্দ্র আশার বাটা হইতে একটা পান তুলিয়া লইয়া মুখে দিয়া কহিল—“আমি ভাবিতেছিলাম, তোমার মাসীমা-বেচারী কতদিন তোমাকে দেখেন নাই। একবার হঠাৎ যদি তুমি তাঁহার কাছে গিয়া পড়িতে পার, তবে তিনি কত পুলিসে হন !”

আশা কোন উত্তর না করিয়া মহেন্দ্রের মুখের নিকে চাহিয়া রহিল। হঠাৎ একথা আবার নুতন করিয়া কেন মহেন্দ্রের মনে উদয় হইল, তাহা সে বুঝিতে পারিল না।

আমাকে চুপ করিয়া থাকিতে দেখিয়া মহেন্দ্র কহিল, “তোমার ঘাইতে ইচ্ছা করে না ?”

এ কথা উত্তর দেওয়া কঠিন। মাসীকে দেখিবার অজ্ঞ ঘাইতে ইচ্ছা করে, আবার মহেন্দ্রকে ছাড়িয়া যাটতে ইচ্ছাও করে না। আশা কহিল—“কালেক্সের ছুটি পাঁচলে তুমি যখন বাইতে পারিবে, আমিও সঙ্গে যাইব।”

মহেন্দ্র। ছুটি পাঁচলেও ঘাইবার জো নাই ; পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হইতে হইবে।

আশা। তবে থাক, এখন নাই থেলায় !
মহেন্দ্র। থাক কেন ? ঘাইতে চাহিয়াছিলে, বাও না !

আশা। না, আমার শাইবার ইচ্ছা নাই !

মহেন্দ্র। এই, সেদিন এত ইচ্ছা ছিল, হঠাৎ ইচ্ছা চলিয়া গেল ?

আশা এই কথায় চুপ করিয়া চোখ নীচু করিয়া বসিয়া রহিল। বিনোদিনীর সঙ্গে সন্ধি করিবার অজ্ঞ বাধাহীন অবসর চাহিয়া মহেন্দ্রের মন ভিতরে ভিতরে অত্যন্ত অধীর হইয়া উঠিয়াছিল। আশাকে চুপ করিয়া থাকিতে দেখিয়া তাহার একটা অকারণ রাগের স্ফোরক হইল। কহিল, “আমার উপর মনে মনে তোমায় কোন সন্দেহ জন্মিয়াছে না কি ? তাই আমাকে চোখে চোখে পাহারা দিয়া রাখিতে চাও ?”

আশার স্বাভাবিক মৃদুতা, নব্রতা, ধৈর্য, মহেন্দ্রের কাছে হঠাৎ অত্যন্ত অসহ্য হইয়া উঠিল। মনে মনে কহিল, “মাসীর কাছে ঘাইতে ইচ্ছা আছে, বল যে, আমি ঘাইবট, আমাকে যেমন করিয়া হোক, পাঠাইয়া দাও—তা নয়, কখনো হাঁ, কখনো না, কখনো চুপচাপ—এ কীরকম !”

হঠাৎ মহেন্দ্রের এই উগ্রতা দেখিয়া আশা বিস্মিত, ভীত হইয়া উঠিল। সে অনেক চেষ্টা করিয়া কোন উত্তরই ভাবিয়া পাইল না। মহেন্দ্র কেন সে কখনো হঠাৎ এত অদম্য করে, কখনো হঠাৎ এমন নিদ্রুপ হইয়া উঠে, তাহা সে কিছুই

বৃত্তিতে পারে না! এইরূপে মহেন্দ্র বতই তাহার কাছে অধিক চক্ষুর্দোষ হইয়া উঠিতেছে, ততই আশার কম্পাবিত চিত্ত ভয়ে ও ভাল-বাসার ভাবকে যেন অত্যন্ত অধিক করিয়া বেঁধেন করিয়া ধরিতেছে।

মহেন্দ্রকে আশা মনে মনে সন্দেহ করিয়া চোখে চোখে পাহারা দিতে চাহ! ইহা কি কঠিন উপহাস, না নির্দয় সন্দেহ? নৃপথ করিয়া কি ইহার প্রতিবার আবশ্যক, না হাসা করিয়া ইহা উড়াইয়া দিবার কথা?

ধনবৃদ্ধি আশাকে পুনশ্চ চূপ করিয়া থাকিতে দেখিয়া অধীর মহেন্দ্র ভ্রতবেগে সেখান হইতে উঠিয়া চলিয়া গেল! তখন কোথায় রহিল মাসিক পত্রের সেট গল্পের নারিক, কোথায় রহিল গল্পের নারিক। স্বর্গা-স্তের আভা অন্ধকারে নিশাইয়া গেল, সন্ধ্যা-রস্তের ক্ষণিক বসন্তের খাতাস গিয়া শীতের হাওয়া দিতে লাগিল—তখনো আশা সেই মাদুরের উপর দৃষ্টিত হইয়া পড়িয়া রহিল।

অনেক রায়ে আশা শয়নঘরে গিয়া দেখিল, মহেন্দ্র তাহাকে না ডাকিয়াই শুইয়া পড়িয়াছে। তখনি আশার মনে হইল, মেহেরী মাসীর প্রতি তাহার উদাসীনতা করুণা করিয়া মহেন্দ্র তাহাকে মনে মনে স্থগা করিতেছে। বিছানার মধ্যে ঢুকিয়াই আশা মহেন্দ্রের দুই পা জড়াইয়া তাহার পায়ের উপর মুখ রাখিয়া পড়িয়া রহিল। তখন মহেন্দ্র করুণায় বিচলিত হইয়া তাহাকে টানিয়া লইবার চেষ্টা করিল। আশা কিছুতেই উঠিল না। সে কহিল—“আমি যদি কোন দোষ করিয়া থাকি, আমাকে দাপ কর!”

মহেন্দ্র আশ্চর্য হইয়া কহিল, “তোমার কোন দোষ নাই চুনি! আমি নিতান্ত পাবত্ত, তাই তোমাকে অকারণে আশঙ্ক করিয়াছি।”

তখন মহেন্দ্রের দুই পা অতিবিক্ত করিয়া আশার অঙ্গ খরিয়া পড়িতে লাগিল। মহেন্দ্র উঠিয়া বসিয়া তাহাকে দুই বাহুতে তুলিয়া আপনার পাশে শোয়াইল। আশার ত্রোমন-বেগ ধারিলে সে কহিল—“মাসীকে কি আমার দেখিতে যাইবার ইচ্ছা করে না? কিন্তু তোমাকে কেলিয়া আমার বাইতে মন সরে না। তাই আমি বাইতে চাই নাই, তুমি রাগ করিয়ো না!”

মহেন্দ্র ধীরে ধীরে আশার আত্মকণোল মুছাইতে মুছাইতে কহিল—“এ কি রাগ করিবার কথা চুনি? আমাকে ডাকিয়া বাইতে পার না, সে লইয়া আমি রাগ করিব? তোমাকে কোথাও যাইতে হইবে না!”

আশা কহিল—“না, আমি কানী বাইব!”

মহেন্দ্র। কেন?

আশা। তোমাকে মনে মনে সন্দেহ করিয়া বাইতেছি না—এ কথা এখন একবার তোমার মুখ দিয়া বাহির হইয়াছে, তখন আমাকে কিছুদিনের অন্তর বাইতেই হইবে!

মহেন্দ্র। আমি পাপ করিলাম, তাহার প্রায়শ্চিত্ত তোমাকে করিতে হইবে?

আশা। তাহা আমি জানি না—কিন্তু পাপ আমার কোনখানে হইয়াছে, নহিলে এমন সকল অসম্ভব কথা উঠিতেই পারিত

না। যে সব কথা আমি শ্রবণে ও ভাবিতে পারিতাম না, সে সব কথা কেন শুনিতে হইতেছে ?

মহেন্দ্র । তাহার কারণ, আমি যে কি মন্দ লোক, তাহা তোমার শ্রবণে ও অশ্রোচর !

আশা ব্যস্ত হইয়া কহিল—“আবার ! ও কথা বলিয়ো না ! কিন্তু এবার আমি কান্দী যাইবই !”

মহেন্দ্র হাসিয়া কহিল—“আজ্ঞা যাও, কিন্তু তোমার চোখের আড়ালে আমি যদি নষ্ট হইয়া যাউ, তাহা হইলে কি হইবে ?”

আশা কহিল—“তোমার আর অত ভয় দেখাইতে হইবে না ! আমি কি-না ভাবিয়া অস্থির হইতেছি ?”

মহেন্দ্র । কিন্তু তাহা উচিত । তোমার এমন স্বামীটিকে যদি অসাবধানে বিগুড়াইতে যাও, তবে এর পরে কাহাকে ঘোষ দিবে ?

আশা । তোমাকে ঘোষ দিব না, সেজন্য তুমি ভাবিয়ো না !

মহেন্দ্র । তখন নিজের ঘোষ স্বীকার করিবে ?

আশা । একশোবার !

মহেন্দ্র । আজ্ঞা, তাহা হইলে কাল একবার তোমার ব্যাঠামশায়ের সঙ্গে দিয়া কথাবার্তা ঠিক করিয়া আসিব ।

এই বলিয়া মহেন্দ্র অনেক রাত হইয়াছে বলিয়া পাশ ফিরিয়া গেল । কিছুক্ষণ পরে হঠাৎ পুনর্বার এ পাশে ফিরিয়া কহিল—“তুমি, কার নাই, তুমি না-ই যা গেলে ?”

আশা কাতর হইয়া কহিল—“আবার বারংবার কহিতেছে কেন ? এবার একবার না

গেলে তোমার সেই ভৎসনাটা আমার গায়ে লাগিয়া থাকিবে ! আমাকে দু-চার-দিনের জন্যও পাঠাইয়া দাও !”

মহেন্দ্র কহিল—“আজ্ঞা !” বলিয়া আবার পাশ ফিরিয়া গেল !

কান্দী যাইবার আগের দিন আশা বিনোদিনীর গলা জড়াইয়া কহিল—“তাই বালি, আমার পা ছুঁইয়া একটা কথা বল ।”

বিনোদিনী আশার গাল টিপিয়া ধরিয়া কহিল, “কি কথা তাই ? তোমার অশ্রুতোষ আমি রাখি না ?”

আশা । কে জানে তাই, আত্মকাল তুমি কি-রকম হইয়া গেছ ? কোনমতেই যেন আমার স্বামীর কাছে বাহির হইতে চাও না !

বিনোদিনী । কেন চাই না, সে কি তুমি জানিস্ যে তাই ? সেদিন বিহারি-বাবুকে মহেন্দ্রবাবু যে কথা বলিলেন, সে কি তুই নিজের কানে শুনিষ্ নাই ? এ সকল কথা যখন উঠিল, তখন কি আর বাহির হওয়া উচিত—তুমিই বল না তাই বালি ?

ঠিক উচিত যেনহে, তাহা আশা বৃথিত । এ সকল কথার লজ্জাকরতা যে কতদূর, তাহাও সে নিজের মন হইতেই সজ্জতি বৃথিয়াছে । তবু বলিল—“কথা অমন কত উত্তিয়া থাকে, সে সব যদি না সহিতে পারিষ্, তবে আর ভালবাসা কিসের তাই ? ও কথা জুলিতে হইবে !”

বিনোদিনী । আজ্ঞা তাই জুলিব ।

আশা । আমি ত তাই কাল কান্দী যাইব, আমার স্বামীর যাহাতে কোন অশ-

বিধা না হয়, তোমাকে সেইটে বিশেষ
করিয়া দেখিতে হইবে! এখনকার মত
পালাইয়া বেড়াইলে চলিবে না!

বিনোদিনী চুপ করিয়া রহিল। আশা

বিনোদিনীর হাত চাপিয়া ধরিয়া কহিল—
“মাথা খা তাই বাণি, এই কথাটা আমাকে
ঝিড়েই হইবে।

বিনোদিনী কহিল—“আজ্ঞা।।”

ক্রমশঃ ।

গ্রন্থ-সমালোচনা ।

ক'নে বউ । সামাজিক উপন্যাস ।
শ্রীযোগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় প্রণীত । চতুর্থ
সংস্করণ । মূল্য ১০ এক টাকা চারি
আনা ।

এই উপন্যাসের বহন চতুর্থ সংস্করণ-হইয়াছে, তখন যে ইহা সাধারণের আদর পাইয়াছে, এ কথা বলাই বাচনা । ইহা আনুত হইবার উপযুক্তও বটে। ক'নে বউটি অতি লক্ষী ঘেরে। এমন ঘেরে যে গৃহে, সে গৃহ শান্তিময়, সুখময়, পূণ্যবর হইবেই ত। হইয়াছেও তাই। কিন্তু গ্রন্থকার যোগেন্দ্রবাবু কল্পিত করি যে, এই পুত্রকের তৃতীয় বন্দের তৃতীয় পরিচ্ছেদে কলিকাতার পার্গেন-পাটিল অবতারণা করিয়াছেন কেন? এই পরিচ্ছেদের মত উপন্যাসখানির উপদেশতা কমিয়াছে বই বাড়ি নাই। এমন সুন্দর পুত্রকে এমন কুৎসিত চিত্র কেন? যদি আমাদের পরামর্শ লইতে অপমান-বোধ না হয়, তাহা হইলে যোগেন্দ্রবাবু

যেন পরবর্তী সংস্করণে এট পরিচ্ছেদটা উঠাইয়া দেন।

আর একটা কথা। ভ্রামকুমারের পুত্র-ছুটিটিকে বিব বাওয়ান এবং গৃহদাহ-বাণা-রের অবতারণা গ্রন্থকার করিয়াছেন কেন? ইহা ‘কামিনীর’ উপযুক্তই হইয়াছে; কিন্তু এইরূপ উপন্যাসে ‘কামিনীর’ নাম শ্রীলোকের চরিত্র কি সাজে? হিন্দুর পরী-গৃহ-সমাজের শত্রু, ঈতল, পবিত্র চিত্রে এই রোদ্দরদের অবতারণা নিতান্তই অসঙ্গত হইয়াছে। গ্রন্থকার যে একটি সুন্দর ভালো একটি সুন্দর স্বর গ্রন্থের আরম্ভ হইতে অনেকদূর পর্যন্ত বাধিয়া দািত্তেছিলেন, তাহা কেন শেষকালে—বেসুয়া, যেতালা করিয়া ফেলিলেন? তথাপি উপন্যাসখানি সুন্দর হইয়াছে। আর কোন কারণও না হউক, কেবল ক'নে বউটির মতই এট পুত্রক সকলেরই—অন্তত সকল হিন্দু শ্রীলোকের—পাঠ করা উচিত।

শ্রীচন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায় ।

বঙ্গদর্শন।

বাঙ্গালার ইতিহাস। *

নবাবী আমল।

নানা কারণে নবাবী আমলের ঐতিহাসিক-তথ্যনির্ণয়ের পথ নিতান্ত ঊর্ধ্ব হইয়া উঠিয়াছে। সুতরাং একালের নিখিত দে-কালের ইতিহাস সঙ্গতস্থল হইবার সম্ভাবনা নাই। তৎকাল কেত কেত সেকালের ইতিহাসের লুপ্তাঙ্করের চেষ্টা নিতান্ত পণ্ডিত বলিয়া মনে করেন। তথাপি পূর্বকাহিনীর তথ্যসংগ্রহের চেষ্টা যে মাহুকের পক্ষে অসাধ্য, তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই।

বাঙ্গালার ইতিহাস নাট; -ইহা নূতন কথা না হইলেও, বাঙ্গালীর কলকের কথা। বাহারা এই কলঙ্ক দূর করিবার চেষ্টা করিতেছেন, তাঁহাদের শ্রম সফল হইলে, তদ্বারা বঙ্গসাহিত্যে এক নবমুগ প্রবর্তিত হইবে। তাঁহাদের গ্রন্থে বঙ্গসাম্রাজ্য কল-জাতি থাকিলে, তাহা কালে ক্রমশঃ সংশোধিত হইবে। তৎকাল তাঁহাদের সাহিত্য-প্রবের মর্যাদা ক্ষুণ্ণ হইবে না।

ইংরাজলিখিত একদেশ-ঐতিহাসিক মতামতের সংক্ষিপ্ত বঙ্গাভিধান্যএট বাঙ্গালার

ইতিহাস নামে পরিচিত ছিল। বিদ্যালয়ের পাঠ্যক্ৰমে ব্যবহৃত হইবার জন্যই তাহা লিখিত ও মুদ্রিত হইত। প্রথম ভাগ আদৌ লিখিত হয় নাই, অথচ দ্বিতীয় ভাগ লিখিত ও মুদ্রিত হইয়া গিয়াছে, একমাত্র বড়ই দুর্লভ। সেই দুর্লভ গ্রন্থ -বাঙ্গালার ইতিহাস।

স্বাধীনভাবে তথ্যসংগ্রহ করিয়া বঙ্গদেশের অসংলগ্ন ইতিহাস প্রচার করা যে বঙ্গসাহিত্যবৈকল্যের কষ্টবোধের মধ্যে পরিস্ফুট, তাহা বঙ্গদর্শনের পৃষ্ঠায় স্বর্গীয় বঙ্কিমচন্দ্রই প্রথমে বিবোধিত করেন। তাহার প্রথম কল,—স্বর্গীয় রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়-কৃত শিতপাঠ। বাঙ্গালার ইতিহাস। সেই সংক্ষিপ্ত ইতিহাসের সমালোচনার বঙ্কিমচন্দ্র লিখিয়াছিলেন, তাহা “গুপ্তিচ্ছিন্দ্যাত্র—কিত্ত্ব সুবর্ণমুদ্রি!” তথাপি বঙ্গসাহিত্যের ঐতিহাসিক বিভাগে স্বর্গীয় মুখোপাধ্যায় মহাশয়কেই স্বাধীন অঙ্গ-সন্ধিস্থার পথপ্রদর্শক বলিতে হইবে।

তাহার পর দুই চারি খানি ঐতিহাসিক গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়া বঙ্গসাহিত্যে ইতি-

হাসের নব্যবাস্তবিকি করার, নানা ঐতিহাসিক প্রবন্ধ সংগৃহীত হইবার সুসুপাত হইয়াছে। এইরূপ গ্রন্থ একটা ক্ষুদ্র প্রবন্ধে বন্যোপাখ্যায় মহাপরমের তথ্যসংগ্রহের পরিচয় পাইয়া, তাহার লেখনীপ্রসূত নবাবী আনন্দের সুবহু ইতিহাস পাঠ করিবার জন্য অনেকেই আগ্রহ জন্মিয়াছিল। এতদিনে সেই চিরায়মান ইতিহাস বহু বাধাবিহীন অতিক্রম করিয়া মুদ্রাধস্তের লৌকিকায়গার হইতে বিনির্গত হইল। ইহা বঙ্গবাসিদের পক্ষে আনন্দের সংবাদ।

বাঙ্গালার সুবিস্তৃত ইতিহাস প্রচারের ইহাই প্রথম উদ্যম প্রথম বলিয়া উৎসাহলাভের যোগ্য;—সন্দেহাত্মক যেহেতু চক্রে দর্শনীয়। ক্রমে যোগাভ্যন্তরীণ ঐতিহাসিক তথ্যসংগ্রহে নিযুক্ত হইবেন; সুতরাং কালে অবশ্যই বাঙ্গালার ইতিহাসের পক্ষপাতশূন্য সত্যসিদ্ধান্ত লোকসমাজে প্রতিষ্ঠালাভ করিবে। এখন মতানত উদ্ভূত করিয়া নবপ্রকাশিত পুস্তকের কোথায় কি ক্রটি ও অসঙ্গতি আছে, তাহার বিস্তৃত সমালোচনা লিপিবদ্ধ করা অনাবশ্যক। বর্তমান চেষ্টা যে সর্বোপায়ে সফল হইতে পারে না, তাহা জানিয়াও, সে চেষ্টার তৃণী প্রশংসা না করিয়া থাকি যায় না।

ইতিহাস লিখিবার সময় হইলেও, বাঙালীর ভগ্নপযোগী সামর্থ্যগত এবং বিলম্ব আছে। এখনও কিছুকাল বিবরণসংগ্রহের ও বতামতের সমালোচনার প্রয়োজন আছে। এ সময়ে ভাড়াভাড়ি ইতিহাস নাম বিদ্যা সুবহু এই প্রকাশ করা সম্পূর্ণ নিরাপদ বলিয়া বোধ হয় না। বন্যোপাখ্যায় মহা-

শয়ের ইতিহাস পড়িয়া বোধ হইতেছে,— এখনও অনেক পুস্তক বঙ্গের অসুযোগ-উপযোগ ইতিহাসলেখকের স্বাধীন বক্তব্যত প্রকাশে বাধা প্রদান করে; এখনও বন্ধুবান্ধবের সুখের বিবেচনা আছে। অনেক সরল সিদ্ধান্তকে নিতান্ত জটিল করিয়া তুলিতে হয়। ইহাতে ইতিহাসের যথার্থতা নষ্ট হইবার কথা। সংগৃহীত বৃত্তান্ত বিচার করিয়া বাহা বুঝা উচিত; তাহা না বুঝিয়া,—বাহা বলা উচিত, তাহাতে “হত ইতি গমঃ” করিয়া,—বাহা লিখা উচিত নহে, কষ্টকল্পিত কৈকিৎ লাঞ্ছনায় তাহাই সংগ্ৰহণ করিবার আয়োজনে ইতিহাস রচনা করিলে, কালে তিরস্কৃত হইবার আশঙ্কা থাকে। কিন্তু বন্যোপাখ্যায় মহাপরমকে তজ্জন্ত কেহ তিরস্কার করিতে পারিবেন না। তিনি বহুসংখ্যক বিদ্যালয়ে শিশুশিক্ষায় ব্যাপৃত থাকিয়া, মুরশিদাবাদী মেহনতায় বেষ্টিত হইয়া, বন্ধুবান্ধবের প্ররোচনায় নিয়ত ভ্রাতাক্রান্ত কলেবরে নানা অসুবিধার পতিত হইয়াও যে পরিমাণে স্বাধীনভাবে বক্তব্যত প্রকাশের চেষ্টা করিয়াছেন, বর্তমানে তাহা লইয়াই পরিতৃপ্ত হওয়া উচিত। নচেৎ এরূপ সুবহু এই আদৌ সংগৃহীত হইত না; হইলেও, উৎসাহলাভের অভাবে প্রকাশিত হইত কি না, সন্দেহ। একালের কোন গ্রন্থেই ধারাবাহিক ইতিহাস নাই; কোন গ্রন্থেই সম্পূর্ণরূপে পক্ষপাতশূন্য বলিয়া বোধ হয় না। অগতঃ তজ্জন্ত কোন গ্রন্থকে একেবারে উপেক্ষা করিবারও উপায় নাই। ইহাতেও বন্যোপাখ্যায় মহাপরমের চেষ্টা ক্ষয়পরিমাণে বেজ্ঞানতের চাপা নষ্ট হইয়া,

পদে পদে প্রতিহত হইবার কথা। তথাপি
এই বিশেষ অবলম্বনে ঘটনাবিশেষের বর্ণনা
করিয়া, অন্যত্র সেই গ্রন্থকে উল্লেখন ও
সম্বন্ধিত সমালোচনা দ্বারা উত্তরস্থলের দোষ-
ভণের ব্যাখ্যা না করায়, স্রোতের স্থানে
তথ্যাহরণস্থানের অসুযোগ অপেক্ষা, মত-
বিশেষের সংস্থাপনকামনার পরজের ভাব
প্রকাশিত হইয়া পড়িয়াছে। তখন নিত্য
গারে পড়িয়া অনেক কথা লিখিতে হইয়াছে;
নিতান্ত দ্বারে পড়িয়া অসুযোগে অনেক
কৈফিয়ৎ রচনা করিতে হইয়াছে। অনেক
স্থলে বাহা প্রমাণরূপ উদ্ধৃত হইয়াছে,
তাহা সমালোচনা দ্বারা খণ্ডিত না করিয়া
তথ্যপূরীত সিদ্ধান্ত প্রচার করায়, কিয়ৎপরি-
মাণে অসঙ্গতির অবতারণা করা হইয়াছে।
প্রথম চেষ্টার একপ ক্ষুণ্ণ একেবারে পরিহার
করা সম্ভব নহে। সুতরাং একপ ক্ষুণ্ণ
দৃষ্টান্ত উদ্ধৃত করা অনাবশ্যক।

বঙ্গালার কত দিনের সভা জনপদ,
তাহা নির্ণয় করিবার সম্ভাবনা নাই।
মৌলসমান-শাসন প্রবর্তিত হইবার পূর্বে
এ দেশের অবস্থা কিরূপ ছিল, তাহার কোন
ধারাবাহিক ইতিহাস প্রাপ্ত হওয়া যায় না
কবে বঙ্গিয়ার খুলিজি কি হুত্রে কতদূর
পৰ্য্যন্ত অধিকার বিস্তার করেন এবং কোন্
পাঠানভূপতি কতদিন পৰ্য্যন্ত রাজ্যশাসন
করিয়াছিলেন, তৎসম্বন্ধে সচরাচর প্রচলিত
ইতিহাসে বাহা লিখিত আছে, তাহাও
স্বল্পমাত্রা নহে। একপ অবস্থায় বঙ্গালার
ইতিহাস প্রচারে তাড়াতাড়ি থাকিলে,
প্রথমভাগ না লিখিয়াই দ্বিতীয়ভাগ মুদ্রিত
করিতে হয়। বঙ্গোপাধায়নমহাশয় তৎক্ষণই

দ্বিমু, বৌদ্ধ ও পাঠান আমল ডাফিয়া দিয়া,
মৌলসমানকাল হইতে প্রচারিত করিয়া-
ছেন।

তথাপি এই সুস্থলং এই সকলন করা
নিতান্ত সহজ ব্যাপার হয় নাই। যে সকল
পুরাতন গ্রন্থাদি অবলম্বনে এই ইতিহাস
সঙ্কলিত হইয়াছে, তাহাতে মতপার্থক্যের
জ্ঞাতব্য নাই, পক্ষপাতের অভাব নাই, অতি-
সূক্ষ্ম অতিশয়োক্তির অভাব নাই। এই
সকল পুরাতন লিখিত প্রমাণের মধ্যে কোন
কোন ইংরাজলিখিত চিঠিপত্র ভিন্ন অস্ত্রা-
প্রমাণ ঘটনার সমন্বয়ে লিখিত না হইয়া
উত্তরকালে লিখিত হইয়াছিল। বাহারা
লেখক, তাহার কেহই নিরপেক্ষ ইতিহাস-
লেখকের উচ্চাঙ্গন-লাভের প্রধিকারী ছিলেন
না। এই সকল কারণে, কেবল কতক-
গুলি পুরাতন পুস্তক হস্তগত হইলেই, নবাবী
আমলের ইতিহাস লেখা সম্ভব হয় না।
বাহারা এষ্ট কারণে হস্তক্ষেপ করিয়াছেন,
তাঁহারা সকলেই বুঝিয়াছেন—ইহা কত
কঠিন, কত প্রমথসা, কত ব্যয়সাধ্য
জটিল ব্যাপার। তৎক্ষণ বঙ্গোপাধায়নমহা-
শয়ের নবাবী আমলের বঙ্গালার ইতিহাস
তাঁহার অস্বাস্থ্য অধাবসায় ও অপরিণীত
পরিপ্রসঙ্গের কীর্ত্তিস্তম্ভরূপে চিরকাল সমাদর
লাভ করিবে। পরবর্তী ইতিহাসলেখক-
গণ যে ইহা হইতে কত উপকার লাভ করি-
বেন, তাহা বলা বাহুল্যমাত্র। এই গ্রন্থ
এত অধিক বিবরণপূর্ণে ভারাক্রান্ত যে,
এক কথায় বলিতে গেলে বলিতে হইবে—
ইহা নবাবী আমলের জ্ঞাতব্য তথ্যের
গীমান্ধ দীর্ঘ নির্বচনবিশেষ। তাহার সহিত

নবাববর্ণের চিত্রপট ও বঙ্গভূমির মানচিত্র সংরক্ষিত হইয়া প্রাগৈতিহাসিক সন্নিবেশে বহিত করিয়াছে।

এখন আর যোগল-পাঠান বাঙালীর “ক্রীড়াপটেও” বিরাগ করে না! বাহাদুর একদা তরবারিহস্তে অধিকার-বিস্তার-কাম-নায় এ উহাত কণ্ঠশোণিত পান *করিবার অস্ত্র বাঙ্গালার বহু যুদ্ধক্ষেত্রে উদ্বৃত্ত হইয়াছিল, তাহারে বংশধরগণ এখন শত্রু, স্ত্রী, স্ত্রীলোক, বালকের জার এককক্ষে হনুচালনা করিতে করিতে একত্রে কণ্ঠে কণ্ঠে মিলাইয়া গ্রামসঙ্গীত গান করিতেছে। কটকট পর শত্রুর জার বিপ্লবের পর বিশ্রাম আসিয়া নব-যুগের অবতারণা করিয়াছে। এখন দীর্ঘভাবে জাতিবন্দের বিচার করিয়া উত্তীর্ণ হইতে বসিলে, প্রতিদ্বন্দ্ব সনালোচনার জন্ত, অসহিষ্ণু স্বাক্ষরোপচার বিনা বিচারে সহ্য কঠোর করিবার আশঙ্কা নাই! এখন যোগল-পাঠান বাঙালীর দৃষ্টিপট হইতে অপসৃত হইয়া গিয়াছে; বর্গীয় হানাদ, বঙ্গ-কিরীড়ার অত্যাচার, বহুযুদ্ধের উৎসাহ, উপদ্রবের অসীমতা হইয়াছে। এখন বাঙ্গালার ইতিহাসের এই অংশ উপজ্ঞানের জার কোমলপূর্ণ,— উপজ্ঞানের জার বহু বিষয়ের আকর! কিন্তু এককাল পরেও এই অংশের আলোচনা করিবার সময়ে, বন্যোপাখ্যার মহাশয় যেন স্থানে স্থানে নিত্যন্ত সম্বন্ধে লেখনী-চালনা করিয়াছেন! নবাবী আমলের ইতিহাস লিখিত হইয়াছে; কিন্তু নবাবী আমল তিরোহিত হইল কেন, তাহার সমালোচনা

করা প্রচেষ্টা মূল উদ্দেশ্য হইলেও, তাহা সর্বতোভাবে সুরক্ষিত হয় নাই। বলিতে বলিতে অনেক কথাই অচোক্ত রহিয়া গিয়াছে। অতিরিক্ত বৃত্তান্তভাবে ভাষা-জ্ঞাত হইয়া, লেখকের মূলমন্ত্র যেন কোথায় লুপ্ত হইয়া পড়িয়াছে!

বৃত্তান্তসমষ্টির নাম ইতিহাস নহে,— তাহা ইতিহাসের উপাধানমাত্র। সেই উপাধান অবলম্বন করিয়া কাব্য-কাব্য-মূল্যের বিশদব্যাখ্যার ঘটনাবলীর সংক্ষেপ-সংকলন করাই ইতিহাসের কার্য। নবাবী আমলের ইতিহাসের আদ্যোপাধ্যায় তদন্তকারী লিখিত হইলে ভাল হইত; —শেষের বিবেচনায় যেন ঘটনাবলি প্রাধান্যপাতি করিয়াছে। বিশেষতঃ তদন্ত, এত অধিক ঘটনাবলি পাঠ করিয়া তাহা হইতে সাবোক্ত করিয়া সম্বোধন করা সাধারণ পাঠকের অগ্ৰসারের জ্ঞাপিত; উত্তীর্ণ হইয়া সম্ভবনা অত্র। তাহা নাই, আশঙ্কিত পাঠ করিতে পারিবেন, তাহারা নিশ্চয়ই বহু-জ্ঞাতব্য-তথ্য-লাভে শ্রম সফল জ্ঞান করিবেন।

বাঙ্গালার ইতিহাস লোকশিক্ষার উপাধানে পরিপূর্ণ। কত অরুণায়ে সংসার চলাইয়া সভ্যসমাজ সংকীর্ণ সংস্থাপন করিতে পারে,—কত অরুণায়ে সেনাবলে দেশ সুরক্ষিত ও দেশ বিজিত হইতে পারে,—কত কুহু কারণে দেশের লোক দেশের জাতিবন্দের উদ্বাসিত হইয়া পার্শ্ববর্তী প্রদেশে অকাব্যসাধনে অগ্রসর হইতে পারে,—কত অরুণায়ে বঙ্গসমাজ বহু-সংযোগে বহুলা ক্রীড়া-কাব্যগতি বিচিত্র

পণ্যদ্রব্য উৎপাদিত হইতে পারে,—তাহা বৃষ্টি কেবল বাঙ্গালার ইতিহাসেই দেখী-
মান। বাঙালী কত অমূল্য পরিতৃপ্ত,—
এমন নিরীহ, এমন শান্তিশ্রিয়, এমন
কুশাগ্ৰবৃদ্ধি সভাজাতি বৃষ্টি আর কোন দেশে
নাই! অস্ত্রবেশের দৃষ্টান্ত দরিদ্র ইতিহাস
লিখিতে সিদ্ধ। বিদেশীয় লেখকবর্গ কত ভ্রমেই
না পতিত হইয়াছেন! কেহ বলিয়াছেন—
বাঙালী ভীত! কিন্তু বাঙ্গালার ইতিহাসে
তাহার প্রমাণ পাওয়া যায় না; বাঙালী
মরিতে ভয় করে নাই। কেহ বলিয়াছেন
—বাঙালী দুর্বল! কিন্তু বাঙ্গালার ইতিহাস
তাহার সাক্ষ্যদান করে না। বাঙালীর বীর-
বাহুই বৃটনরাজ্যস্থাপনের প্রথম সহায়!
বাঙালীর ভাত্যগ্রামীবনে স্বার্থভাগের
দৃষ্টান্ত বিরল; ভাত্যগ্রাম্যাপকামনার
একপ্রাণতা অবলম্বন করিবার প্রবৃত্তি
দুর্বল। এই দুইট বাঙালীর প্রধান কলঙ্ক,—
ইহা বাঙ্গালার ইতিহাসের সর্বত্র সুব্যক্ত।
সেইজন্ত বাঙ্গালার ইতিহাস বাঙালীর
জাতিগত স্বকীর্তি-স্বকীর্তির ইতিহাস নহে,
ব্যক্তিগত স্বকীর্তি-স্বকীর্তির জীর্ণত্ব! না
বৃষ্টি বিদেশের লোক ব্যক্তিগত দোষ-
গুণ জাতিবৈধে সংস্থাপিত করিয়া ইতিহাস-
রচনা করিয়া গিয়াছেন। বন্যোপাধায়
মহাশয় জাতীয়-অসুভাগ-বশত ব্যক্তিগত
স্বকীর্তির কৈফিয়ৎ সংগ্রহ করিয়া প্রধান
প্রধান পাত্রমিত্রগণকে ইতিহাসের কলাঘাত
হইতে রক্ষা করিবার ক্ষীণ উদ্যমে লেখনী-
চালনা করিয়াছেন। দীরদাক্ষরবীকে দমত
ইতিহাসলেখক ভৎসনা করিয়া গিয়া-
ছেন; বন্যোপাধায় মহাশয় লেখনীবনে

তাহাকে রক্ষা করিবার চেষ্টা করিতে গিয়া
এত অনর্থ উৎপন্ন হইয়াছে!

নবাবী আমলে দেশের অবস্থা কিরূপ
ছিল, এখনও তাহার কিছু কিছু জনজ্ঞতির
সন্ধান পাওয়া যায়। শুনা যায়,—সেকালে
মাসিক একটাকা আর হইলেই না-কি লোকে
প্রতাহ কোম্পা-শোণাও আহাৰ করিতে
পারিত। কিন্তু একদিকে মূল্য ততোধিক,
অল্পদিকে খণ্ডী হস্তায়া, বগ-কিরীসীর
উপদ্রব, দহা-তররের উৎপত্তি! একদিকে
নিত্য বিপ্লব,—আবার অল্পদিকে দোষ-
মন্দির ও মসজিদ-চূড়া মতক উত্তোলন
করিত, জনদৈবজ দূর করিবার জন্ত পুণ্য-
প্রদানে দীর্ঘ দীর্ঘিকা খনিত হইত। এই
সকল কথা কতদূর সভ্য, নবাবী আমলের
বাঙ্গালার ইতিহাসে তাহার যথেষ্ট পরিচয়
প্রাপ্ত হওয়া যায়। নৃপে-পাধ্যায় মহাশয়ের
শিষ্টপাঠা সরল ইতিহাস “স্ববর্ণভূমি”;—
বন্যোপাধায় মহাশয়ের প্রৌঢ়পাঠা জটিল-
গ্রন্থ “স্ববর্ণত্বপ”। শিল্পনিপুণ অধাবসায়-
শীল পরবর্তী লেখকগণ এই ত্বপ হইতে স্বর্ণ
সংগ্রহ করিয়া বঙ্গমাহিত্যের দর্শনে বহু
ব্রহ্মলকার সংযুক্ত করিতে পারিবেন। আক-
রোচিত ধাতুপিণ্ডের সহিত অনেক অসার
আবর্জনা মিশ্রিত থাকিলেও তাহার মূল্য নষ্ট
হয় না; বন্যোপাধায় মহাশয়ের ঐতি-
হাসিক স্ববর্ণত্বপের সহিত অনেক অসঙ্গত
মতামত সংযুক্ত হইয়াছে বলিয়া, তাহারও
মূল্য নষ্ট হইবে না। বরং বন্যোপাধায়
মহাশয়ের জ্ঞান তথ্যসুসজ্জননিপুণ অধা-
বসায়শীল লেখক ঐতিহাসিক পাত্রমিত্র-
গণের প্রকৃত-মহাশয়-নিরূপণের পক্ষে সহক

করিয়া দিলেন। নোকে এখন তাহার মতামতের সহিত অন্তান্ত মতামত তুলনায় সমালোচনা করিয়া সহজে তথ্যনির্ণয় করিতে সক্ষম হইবে।

চরিতাখ্যায়ক এবং ইতিহাসলেখকের কার্যপদ্ধতির মধ্যে পার্থক্য আছে। চরিতাখ্যায়ক দেশের দিক্ দিয়া না দেখিয়া ব্যক্তিবিশেষের দিক্ দিয়া ঘটনাবিচার করিতে পারেন; কিন্তু ইতিহাসলেখককে প্রধানত দেশের দিক্ দিয়া দেখিয়াই ঘটনা-বিচার করিতে হয়। কোন্ ঐতিহাসিক পাত্র কিরূপ অবস্থাতক্রে পতিত হইয়া কোন্ ঘটনার লিপ্ত হইয়াছিলেন, তাহার আলোচনার ভার চরিতাখ্যায়কের উপর রাখিয়া দিয়া, কাহার কাণ্ডে দেশের কিরূপ উন্নতি-অবনতির স্থাপত্য হইয়াছিল, কেবল তাহারই আলোচনা করিলে, নবাবী আমলের ইতিহাস এত জটিল ও গহনরতন হইত না। নবাবী আমলের কাণ্ডকলাপের মধ্যেই যোগলমানশাসনের ধ্বংসধীর নিহিত ছিল; তাহা ক্রমে অকুচিত হইয়া বিব-বুদ্ধে পরিণত হয়। বাহ্যায় সয়রসিকিত ব্যয়িধারায় সেই বিববুদ্ধের উন্নতিসাধন করেন, তাহারো যোগলমানশাসন উৎখাত করিবার উদ্দেশ্যে কদাপি চেষ্টা করেন নাই;—ঐহাঘের কর্ণকলে ইচ্ছার বিরুদ্ধে ঘটনা-চক্রের আবর্তনে নবাবীশাসন উৎখাত হইয়া গিয়াছে। ইহাঘের কার্যকলাপ যে সর্বথা নিশ্চলীয়, তাহা বন্দোপাখ্যায় মহা-শর নিজেও স্পষ্টাক্ষরে উল্লেখ করিতে বাধ্য হইয়াছেন; অথচ ইহাঘের কার্যকলাপের জন্ত ইহাঘের বিশেষ অপরাধ ছিল না, এই

ভাব পরিস্ফুট করিতে গিয়া অনেক কষ্ট-কল্পনায় আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন। সে চেষ্টা সফল হয় নাই; বরং উদ্ধৃত প্রমাণা-বলী তাহা সম্পূর্ণ বিকল করিয়া দিয়াছে। এ পর্যন্ত নবাবী আমলের ঐতিহাসিক ঘটনা-বলীর যে সকল প্রমাণ ক্রমশ লোকসমক্ষে প্রচারিত হইয়াছে, তাহার প্রতিফল প্রকাশ আবিষ্কৃত না করিয়া, কেবল প্রতিফল মতা-মত লিপিবদ্ধ করিয়া, বন্দোপাখ্যায় মহাশয় বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছেন যে,—এ পর্যন্ত অন্তান্ত লেখক এ সহজে বাহা লিখিয়া গিয়াছেন, তাহা ভ্রমলভুল; এক্ষণে বাহা লিখিত হইতেছে, তাহাই যথার্থ ইতিহাস। এই ভাব, গ্রন্থের আদ্যস্ত সংযোগনের চেষ্টা থাকিতেও, পরিস্ফুট হইয়া পড়িয়াছে। এক্ষণ সত্যের সমালোচনা না করিয়া, অকুতোভয়ে পূর্বপ্রকাশিত মতামত উদ্ধৃত করিয়া, তাহার অপারক প্রতিপাদন করিতে পারিলে ভাল হইত; ত্রাস নত সংশোধনের উপায় হইত। নিত্য নগণ্য ঘটনার বিস্তৃত আলোচনার পূর্বস্বর্তী লেখকগণের ভুলত্রুটি ইঙ্গিতে প্রদর্শিত করিয়া বিশেষ কল হয় নাই। মূল সিদ্ধান্তগুলি তদ্বারা নিশ্চীকৃত হয় না; মনের সন্দেহ তদ্বারা বিদূষিত হয় না; নবাবী আমলের মনপ্রকাশিত ইতিহাসের সিদ্ধান্তই যে সর্বত্র সমীচীন, তাহাও তদ্বারা সংস্থাপিত হয় না।

নবাববিশেষের ব্যক্তিগত চরিত্রহীনতা নবাবীশাসন তিরোহিত হইবার মুখ্য কারণ বলিয়া বোধ হয় না;—দেশের রাজ-পুরুষবর্গের সাধারণ চরিত্রহীনতাই প্রকৃত কারণ। নবাবী আমল উৎখাত হইয়া

বুটশশাসন সংস্থাপিত হইয়াছে। নবাবী-শাসন উৎখাত হইবার যে কারণ, বুটশ-শাসন সংস্থাপিত হইবারও সেই কারণ। নবাবীশাসন উৎখাত হইল কেন, কোন অযোগ্য ইতিহাসলেখক তাহার সমালোচনা করেন নাই; কিন্তু বুটশশাসন সংস্থাপিত হইল কেন, বহু অযোগ্য ইতিহাসলেখক তাহার সমালোচনা করিয়া গিয়াছেন। আমাদের চরিত্রহীনতাই যে তাহার মূল, তাহাই তাহাদের ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত। বন্দোপাধার মহাশয়ের সিদ্ধান্ত কি, তাহা পরিকার বুঝিয়া উঠা যায় না, বৃত্তান্তপুঞ্জ সে সিদ্ধান্ত ভুবিয়া গিয়াছে; এবং যে ভাবে বৃত্তান্তপুঞ্জ সজ্জীভূত হইয়াছে, তদ্বারা একান্ত সিদ্ধান্ত লুক্কায়িত হইয়া নবাববিশেষের ব্যক্তিগত চরিত্রহীনতাই বঙ্গবিশ্ববের মূল বলিয়া প্রতিষ্ঠাত হইয়াছে। ইহা হয় ত বন্দোপাধার মহাশয়ের নিজেরও অজ্ঞেয়তা নহে; কারণ, তাহার ভায় ইতিহাস-পাঠকের নিকট সত্যসিদ্ধান্ত অজ্ঞাত থাকিতে পারে না। কিন্তু অগ্ররোধ-উপরোধে গ্রন্থের

কল অন্তরূপ পাড়াইয়াছে;—এছাপাঠ শেষ করিলে পাঠকচিত্তে এইরূপ ভাবই জাগিয়া উঠিবে!

এই সকল ত্রুটি ও মতভেদ থাকিলেও, বন্দোপাধার মহাশয়ের নবাবী আমলের বাঙ্গালার ইতিহাস, বৃত্তান্ত-সঙ্কলন-গৌরবে বঙ্গমাহিত্যে অতি উচ্চতর অধিকার করিবার যোগ্য হইয়াছে। কোনরূপে টকিতে, কোনরূপে সংক্ষেপে, কোনরূপে বা বিস্তার-বাহুল্যে নবাবী আমলের প্রায় সকল কথাই গ্রহণযোগ্য মন্তব্যে চটয়াছে। এই সকল বৃত্তান্ত যে সকল পুরাতন প্রচলিত-অপ্রচলিত গ্রন্থাদি হইতে সংগৃহীত, তাহারও পরিচয় প্রদত্ত হইয়াছে। যাহা বা বাঙ্গালার ইতিহাসের তথ্যগুণসন্ধানকার্যে বাপ্ত হইবেন, তাহাদের শ্রবণে যে এতদূরো অনেক পরিমাণে সহজ হইয়া অগ্নিবে, তাহাতে সন্দেহ নাই। একরূপভাবে বৃত্তান্তসঙ্কলন করিয়া স্বদেশের ইতিহাসরচনার চেষ্টা অতি অল্পদিনমাত্র আরম্ভ হইয়াছে; কালে এইরূপ চেষ্টা হইতেই ইতিহাস সুগঠিত হইবে।

ঐঅক্ষয়কুমার মৈত্রেয় ।

সংস্কৃত-ব্যাকরণের ইতিবৃত্ত ।

জর্মান শব্দতত্ত্ববিৎ পণ্ডিত অধ্যাপক রট (Roth) বলেন, অস্ত্রান্ত সেনে বেঙ্গলে ব্যাকরণশাস্ত্রের উৎপত্তি হইয়াছিল, চারত-বর্ষেও ঠিক সেইরূপে সংস্কৃত ব্যাকরণের উৎপত্তি হইয়াছে। কেবলনারী চলিত ভাষা হইতে ইহা জন্মগ্রহণ করে নাই; পরন্তু কথিত ও লিখিত ভাষার পার্থক্য যখন নছবোয় ভাবিবার বিষয় হইয়াছিল, তখনই ইহার ভঙ্গ্যভাষ হইয়াছে বলিয়া মনে হয়। প্রথমে ব্যাকরণ এই সমস্ত কথিত ও লিখিত ভাষার পার্থক্যগ্রন্থনেই তৎপর ছিল। তার পর কেবল সমাজ-বিশেষে প্রচলিত ও সাহিত্য-বিশেষেরই অঙ্গ-শাসনে প্রযুক্ত হয় এবং ক্রমে কালসহকারে, কি কথিত কি লিখিত, উত্তরবিধ ভাষারই প্রবেশবার প্রস্তুত ও ভারতবর্ষের সকল প্রেয়ী সর্গবিধ সংস্কৃতসাহিত্যের শব্দের অঙ্গশাসন করিতে থাকে। এইরূপ সর্গাঙ্গ-স্থল্যের শব্দাঙ্গশাসন সর্গপ্রথমে আমরা পাণিনিভেই দেখিতে পাই। এই সময় হইতেই সমাজবিশেষে প্রচলিত ও সাহিত্য-বিশেষের অঙ্গশাসনে নিরন্তর ব্যাকরণগুলি বিদ্যুৎ হইতে থাকে।

ব্যাকরণ কেন বেদাঙ্গ হইল, * তাহার কারণ অঙ্গশাসন করিতে গিয়া ভাষার

বর্ণেল (Burnell) বলেন, প্রাচীনতম যুগের ভারতের সমুদয় গ্রন্থই হিন্দোবদ। এইহেতু সংস্কৃত-ভাষা-সম্বন্ধে হিন্দোবদ বোধের ব্রাহ্মণ প্রকৃতিতে অতি আবশ্যক বলিয়া আলোচিত হইয়াছে। এই সময়ে শব্দ-শাস্ত্রেরও সামান্ত সামান্ত আলোচনা বহুলপরিমাণে দৃষ্ট হয়। ইহা হইতে আমরা অনুমান করিতে পারি যে, ইতি-পূর্বেই বৈদিক ক্রিয়াকলাপের ব্যাখ্যা-প্রসঙ্গে শব্দের অর্থ লইয়া নতুংগ উপস্থিত হইয়াছিল। বেদশাস্ত্রকারগণের মধ্যে যাহাদের নিজের মত অঙ্গ প্রতীপন করি-বার অঙ্গ অভিনব পথ। আবিষ্কার আবশ্যক হইয়াছিল, তাহারাই শব্দশাস্ত্রের প্রথম আবির্ভূত। এইমতই আমরা বেদের ব্রাহ্মণ প্রকৃতিতে নানাগ্রন্থে ধাতু, প্রত্যয় প্রকৃতি ব্যাকরণের আবশ্যক বিষয়ের বাদাঙ্গবাদ দেখিতে পাই। একপক্ষে সুনিপুণভাবে পদ ও সাহিত্যশাস্ত্রের সম্বন্ধ-বিনির্দেশ ও শব্দের বিশ্লেষণ দেখান হইয়াছে—ইহা হইতেই শিক্ষা ও প্রাতিশাস্ত্রের উৎপত্তি †। অস্ত্রপক্ষে পদসাধন ও শব্দের দার্শনিক ব্যাখ্যা-প্রতীপন হইয়াছে, এবং ইহা হইতেই নিরুক্ত ও ব্যাক্যের অর্থ লইয়া পদবোজনাসম্বন্ধে বাদাঙ্গবাদের উৎপত্তি

* শিক্ষা করো ব্যাকরণ নিরুক্তং হিন্দোবদঃ ।

ভ্যোতিষান্যনৈকং বেদাঙ্গানি বক্তব্যং তু ।

নিরুক্তঃ ১১৭৭ দুর্ভেদ্যোঃ টিকা ।

হয়। এইরূপে যখন বৈদিক শ্রুতসমূহকে পরিবর্তন-পরিবর্তন হইতে কঠোর নিত্যতাব্যবহৃত হইয়া উঠিয়াছিল, তখনই ব্যাকরণ-নামক বেদাঙ্গের উৎপত্তি নির্দেশ করা যাইতে পারে। অতএব প্রাচীনতম কাল হইতে বৈদিকযুগের শব্দগত অর্থ নির্ণয় করিতে শব্দবিবেচনের সম্পূর্ণ প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি হইয়াছিল। শব্দসমূহ যে অতি বৃদ্ধিনতার সহিত বিদেশিত হইত, তাহা প্রাতিশাখ্যাপাঠে আমরা অবগত হইতে পারি। অনেক আবৃত্তক-অনাবৃত্তক ও সামান্য সামান্য বিষয়ের প্রতিও প্রাতিশাখ্যাকারগণের দৃষ্টি পতিত হইয়াছিল। বিশেষতঃ তাঁহাদের সময়ে শব্দসকলের অত্যুচ্ছোভায় যে আবৃত্ত হইয়াছিল, তাহা তাঁহাদের এ বিষয়ে অতিসাবধানতা হইতেই অসূচন করিতে পারি *। এইরূপে দেখিতে পাই, কঠ, তালু, জিহ্বা প্রভৃতি উচ্চারণস্থানের নির্দেশ (Physiological analysis of sound) প্রাচীন ব্যাকরণশাস্ত্রের একটি প্রধান বিষয় ছিল।

পাণিনির পূর্বে হইতেই ব্যাকরণ বেদাঙ্গ বলিয়া পরিগণিত হইয়াছিল। এই ব্যাকরণ কোন ব্যক্তিবিশেষের গ্রন্থকে না বুঝাইয়া ব্যাকরণশাস্ত্রকেই লক্ষ্য করিত। শুক্ল, যজু

ও অথর্ববেদের প্রাতিশাখ্যগুলিকে এ ৮ একখানি বেদাঙ্গ-ব্যাকরণ বলিলেও বলা যায়। অধ্যাপক গোল্ডষ্টুক (Prof. Goldstucker) বলেন, † বেদাঙ্গ বলিতে কেবলমাত্র পাণিনির ব্যাকরণকেই বুঝাইত; কিন্তু, অধ্যাপক রট, ডাক্সার বর্ণেল প্রভৃতি কোন কোন পণ্ডিত তাহা স্বীকার করেন না। তাহারা বলেন, পাণিনির পূর্বে প্রচলিত সমগ্র ব্যাকরণশাস্ত্রকেই বেদাঙ্গ বলিত। যথেষ্টের : টাকার সাধারণ্যে যে বেদাঙ্গ-ব্যাকরণের উল্লেখ করিয়াছেন, সেখানে তিনি কোন ব্যক্তি-বিশেষের ব্যাকরণকে লক্ষ্য করেন নাই। আর দুর্গাচার্যের “ব্যাকরণম্ অষ্টাধা নিরুক্তং চতুর্দশা” প্রভৃতি উক্তি হইতেও আমরা ইহাই বুঝিতে পারি।

যথেষ্টের ঐতরেয় ব্রাহ্মণেই § বেদাঙ্গ হই ব্যাকরণের পারিভাষিক শব্দ সর্বপ্রথম দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাতে বৈদিক ক্রিয়াকলাপের বাখ্যাশ্রমে অক্ষর, অক্ষরপঞ্জি, চতুরক্ষর, বর্ণ, কার (ক-কার, খ-কার প্রভৃতি) ও পদ ইত্যাদির অসংখ্য বাখ্যাশ্রমত হইয়াছে। ৩-পদের গুরুবহু-কৌণ্ডীন শতপথব্রাহ্মণে ৭ “একবচনেন বহুবচনং বাবাধ্যমেতি” প্রভৃতি ব্যাক-

* যথেষ্টপ্রাতিশাখ্য, চতুর্দশ অধ্যায়।

† Academy, July, 1870.

‡ Sayana's com: on the Rigv. I. P. 34. (Ed. Maxmuller)

§ ঐতরেয় ব্রাহ্মণ ১৮, ২৪ ও ৪৫ অধ্যায়।

¶ শতপথব্রাহ্মণ Dr. Weber's Edition P.990. (ইহাতে যাজু প্রভৃতিরও বাখ্যা দেখিতে পাওয়া যায়।)

রণের কথা দৃষ্ট হয়। ছান্দোগ্য উপনিষদে •
 স্পর্শ, স্বর, উচ্চ প্রভৃতি পারিভাষিক
 শব্দ ও তৈত্তিরীর উপনিষদে + “শীকাং
 বাখ্যাভ্যসঃ। বর্ণাঃ স্বরঃ। মাত্ৰা বর্ণম্। সাম
 স্তবানঃ। ইত্যুক্তঃ শীকাধ্যায়ঃ।” প্রভৃতির
 উল্লেখ আছে। গোপব্রাহ্মণে ; ওকুরের
 বাখ্যাংশে খাত্ত, প্রাতিপদিক, নাম,
 আখ্যাত, শিঙ্গ, বচন, বিভক্তি, স্বর, উপসর্গ
 ও নিপাত প্রভৃতি ব্যাকরণের প্রায় অধি-
 কাংশ পারিভাষিক শব্দেই উল্লেখ করা
 হইয়াছে।

নিহতি, ঙ্গ শিকা প্রভৃতিতে ব্যাক-
 রণের কোন কোন বিষয় খানোচিত হইলেও,
 সেগুলিকে ব্যাকরণশ্রেণিতে আনয়ন
 করা যুক্তিসঙ্গত নহে। ব্যাকরণে বাহ্য
 বাহ্য বাহ্য উচিত, প্রাতিশাখ্যে সদিও সে
 সমস্ত বিষয় নাই, তথাপি এগুলি ব্যাকরণ-
 শ্রেণীর গ্রন্থ। বৈদিক ভাষার ব্যাকরণ-
 শিকার নিমিত্ত এই সমস্ত প্রাতিশাখ্য বির-
 চিত হয় নাই, কিংবা শব্দ, খাত্ত প্রভৃতির
 প্রকৃতি অথবা গঠনপ্রণালী সম্বন্ধে ইহাতে
 কোন নিয়মাদি দেখিতে পাওয়া যায় না।

কিন্তু অক্ষর ও শব্দের উচ্চারণবি-সম্বন্ধে
 পাণিনি যে সমস্ত বিধিব্যবস্থা করিয়াছেন,
 সে সমস্তই তিনি প্রাতিশাখ্য হইতে গ্রহণ
 করিয়া থাকিবেন ।

বস্তুত পদ অথবা সংহিতার প্রত্যেক
 শব্দ কথিতভাষার অথবা শব্দীতে কিন্তু
 উচ্চারণবৈলক্ষণ্য প্রাপ্ত হয়, উচ্চারণবি-
 ত্তেবে কেমন করিয়া এইরূপ পরিবর্তন
 ঘটে, প্রাতিশাখ্যে তাহাই শিক্ষা দেয়। এই
 নিমিত্তই প্রাতিশাখ্যে শব্দসমূহের উচ্চারণ,
 উচ্চারণাধির লঘুগুরুভেদ, প্রত্যেক অক্ষর
 অথবা শব্দের উচ্চারণের বিশেষ বিশেষ
 নিয়ম, প্রকৃতি, কাব্যকারিতা, ছই বা ততো-
 ধিক শব্দের সন্ধিবিধি প্রভৃতি বিদ্রুতভাবে
 দেখিতে পাওয়া যায়।

প্রাতিশাখ্যের মধ্যে ঋগ্বেদ-প্রাতি-
 শাখ্যই প্রাচীনতম। মহাত্মনি শৌনক ॥
 ইহার রচয়িতা। গ্রন্থখানি সরল ছন্দে
 বিরচিত, সুতরাং সরণে রাখিবার পক্ষে
 বিশেষ সুবিধাকর। সুতরাং অতি সহজ;
 পাণিনির দ্বারা ইহাতে পারিভাষিক কৌশল
 একটুও প্রদর্শিত হয় নাই। শৌনক

* ছান্দোগ্য উপনিষদ্ ২।২২।৩, ৪।

† তৈত্তিরীর উপনিষদ্ (ডা॰ রাজেন্দ্রনাথ মিত্র) ৭২৪ পৃ॰।

‡ গোপব্রাহ্মণ (ডা॰ রাজেন্দ্রনাথ মিত্র) ১১২৪।

§ বিহুজির্ব্যোমতো বায়াবর্ষাৰ্ঘ্যশব্দমবন্।

ইদৃশৈকরিতৈর্ভাষ্যে সত্যং বোধ্যাকরো ভবান্।

চন্দ্রাবলোক, ৪।১০৮।

¶ Maxmüller's History of the Ancient Sanskrit Literature.

|| দ্রব্যতাত্ত্বিকঃ সর্গান্ প্রবদ্য শিঙ্গা ত্রুতিঃ।

শৈবিকক বিশেষণ যেমনঃ পায়ঃ কৃতম্।

৩৫ প্রাতিশাখ্যাদীকার উৎসতট।

শাকল্যের গ্রন্থ হইতে এই গ্রন্থের অনেক উপাধান সংগ্রহ করিয়াছেন। পাণিনি যৌর গ্রন্থে যে অষ্ট শাকল্যের দ্বয় উদ্ধৃত করিয়াছেন, সেগুলি স্বক্-প্রাতিশাখ্যে দেখিতে পাওয়া যায়। গোল্ডষ্টুক (Goldstucker) বলেন, স্বক্-প্রাতিশাখ্যে পাণিনির পরে বিরচিত হইয়াছিল। তাঁহার প্রধান যুক্তি এই যে, ইহার বর্ণনীর বিষয় পাণিনি অপেক্ষা বিস্তৃত ও সম্পূর্ণ। কিন্তু উক্ত পুস্তকের সাদৃশ্য অতি অল্পই দেখিতে পাওয়া যায়। “ন” কিরূপে “ণ”তে ও “স” কিরূপে “ষ”তে (স্বক্-প্রা- ৫ম অ.) পরিবর্তিত হয়, এবং ‘অ’, ‘ই’, ‘উ’-এর দীর্ঘ-উচ্চারণবিধি, (স্বক্-প্রা- ৭ম, ৮ম ও ৯ম অধ্যায়) পাণিনি ও প্রাতিশাখ্যকার একই নিয়মে সনাদান করিয়াছেন। তাঁহার মতে পাণিনির অসম্পূর্ণতা পণ্ডের প্রাতিশাখ্যে সম্পূর্ণতা লাভ করিয়াছে। উল্লিখিত গহ-বহ ও হ্রস্ব-দীর্ঘ বিধান পাণিনিতে অসম্পূর্ণ থাকিলেও স্বক্-প্রাতিশাখ্যে কেবলমাত্র অণ্বেদের শাকল্য-শাখার সহিত সৰ্বসম্মত; সুতরাং শুদ্ধ ঐ শাখার প্রয়োগবীর বিষয় শৌনক পুঙ্খ-রূপে বিবৃত করিয়াছেন। পাণিনির ব্যাকরণ বেদেও শাখাবিশেষ অথবা আধুনিক সংস্কৃত গ্রন্থবিশেষের অন্ত নহে। নৌকিক সংস্কৃতভাষার সম্পূর্ণ একখানি ব্যাকরণ প্রণয়নই তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল। বৈদিক ব্যাকরণ যে তিনি সংক্ষেপে সম্পন্ন করিয়াছেন, তাহার একমাত্র কারণ তাঁহার পূর্ববর্তিগণ এ বিষয় বিস্তৃতভাবে আলোচনা করিয়া গিয়াছেন এবং শৌনক সেই পূর্ববর্তিগণের অন্ততম। স্বক্-প্রাতিশাখ্যের

চুটপ্রকার টাকা বর্তমান। তদ্বাধ্য উবট-ভট্টের “পার্বন-ব্যাখ্যাই” এসিদ্ধ। উবটভট্টের নিবাস আনন্দপুরে (বারাণসী?) ছিল। স্বক্-প্রাতিশাখ্যে আখ্যায়ন-হ্রস্ব অপেক্ষাও প্রাচীনতর। আখ্যায়ন শৌনকেরই দ্বারা ছিলেন। ইহা তিন কাণ্ড ও প্রত্যেক কাণ্ডে ছয় পটলে বিভক্ত। এই প্রাতিশাখ্যখানি যে বৈদিক যুগ হইতে অপরিবর্তিত ও অপরিবর্তিত হইয়া আসিয়াছে, তাহা অনেকেই মনে করেন না।

কৃত্তবজ্জর্গেন্দের তৈত্তিরীয় প্রাতিশাখ্যে তত নৌকিকতা দৃষ্ট হয় না। অধ্যাপক হুইটনী (Whitney) মনে করেন যে, ইহার অধিকাংশই প্রকৃষ্ট। স্বক্-প্রাতিশাখ্যের দ্বারা হ্রস্বগুলি সরল নহে। পারিভাষিক শব্দের প্রয়োগ অতি বহুল। ইহার টীকাব্যাকরণ নাম উল্লিখিত নাই। ঐদীন নাকি বরুণি, আত্রেয় ও দার্ভিষেয় নামক এই প্রাতিশাখ্যের টীকাব্যাকরণের টীকা হইতে তাঁহার ভাষা সংগ্রহ করিয়াছেন। এই টীকার চতুর্দশ শতাব্দীতে বিরচিত সারগাঢ়াচার্য্যের কালনির্ণয়নামক পুস্তকের উল্লেখ আছে।

কৃত্তবজ্জর্গেন্দের বাজসনেয় প্রাতিশাখ্যও পরবর্তী কালের পরিবর্তন-পরিবর্তনের হাত হইতে রক্ষা পায় নাই। কাত্যায়ন ইহার প্রণেতা বলিয়া ইহাকে কাত্যায়ন-প্রাতিশাখ্য বলে। ইহার প্রথম অধ্যায়ে সংজ্ঞা ও পরিভাষা, দ্বিতীয় অধ্যায়ে শব্দ-সকলের উচ্চারণের নিয়ম, তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম অধ্যায়ে সংস্কার অর্থাৎ সংদীর নিয়মাদ্বারা অক্ষরের ক্ষয়, বৃদ্ধি, পরিবর্তন ও ব্যত্যয়, ষষ্ঠ অধ্যায়ে ব্যাকরণ অন্তর্গত ক্রিয়া-

পদের উপর যতিপাতের নিয়ম ও উচ্চারণ-বিধি, ৭ম ও ৮ম অধ্যায়ে বর ও বাজন বর্ণের তালিকা, ঐশ্বপাতের নিয়ম এবং ব্যাকের নিয়ম অনুসারে শব্দকণের বিভাগ প্রভৃতি প্রদত্ত হইয়াছে। এই প্রাতিশাখ্যে শাক-টায়ন, শাকল্য, পার্শ্বা, (স্বক্-প্রাতিশাখ্যেও ইহাদের নাম দেখিতে পাওয়া যায়) কান্তপ, দালুতা, আতুর্কর্ণা, শৌনক, (স্বক্-প্রা-কার?) ঔপশিবি, কার প্রভৃতির নাম উল্লিখিত আছে। ইহার মাতৃশব্দক নামে উৎপত্তির টীকা অতি প্রসিদ্ধ। এতব্যতীত নিত্যত আধুনিক কালে বিরচিত “প্রাতিশাখ্য-শ্যোৎখা” নামে ইহার আর একখানি টীকা আছে। সিদ্ধেশ্বরের পুত্র রানচন্দ্র ইহার রচয়িতা। অধ্যাপক গোল্ডষ্টুকর (Prof. Goldstucker) মনে করেন, এই কাত্যায়ন ও পানিনির ভাষ্যকার কাত্যায়ন একই ব্যক্তি। কিন্তু তিনি ইহার সন্তোষজনক প্রমাণ দিতে পারেন নাই। কেবল নামসম্বন্ধে এ বিষয়ের প্রকৃত সত্য নির্দ্ধারিত হইতে পারে না। আর পানিনি তাঁহার ব্যাকরণের সূত্রে (৪।১।১৮) যে কাত্যায়নের নাম উল্লেখ করিয়াছেন, তিনিও বোধ হয় এই প্রাতিশাখ্যকার। কেন না, ভাষ্যকার পানিনির পরে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। শৌনকীয় চাতুর্য্যধারিক। অথর্ববেদ-প্রাতিশাখ্যের অন্ততম নাম। ঋগ্বেদপ্রাতি-

শাখ্যকার ইহার রচয়িতা বলিয়া প্রসিদ্ধি আছে। এখানি পূর্ববর্তী প্রাতিশাখ্যগুলি অপেক্ষা আধুনিক বলিয়া বোধ হয়। পণ্ডিত সত্যজ্ঞান শাস্ত্রী মহাশয় পুণ্ড-ঋষি-প্রণীত শাস্ত্রবেদ-প্রাতিশাখ্য সূত্রিত করিয়াছেন।

অন্যোদয় শতাব্দীতে প্রাদুর্ভূত হইয়া বোপদেব আটজনমাত্র শাবিকের নাম উল্লেখ করিয়াছেন *। ইহাদের মধ্যে ইন্দ্রই সর্বপ্রথম ব্যাকরণের প্রণেতা, এইরূপ প্রসিদ্ধি আছে। কিন্তু এ পর্য্যন্ত ইন্দ্রপ্রণীত কোন ব্যাকরণ আবিষ্কৃত হয় নাই। ষাটশপতাব্দীতে বিরচিত পোদ-দেবের কথাসংসাগরনামক গুরুগুরু হইতে আমরা জানিতে পারি, পানিনির ব্যাকরণের আবির্ভাবের পর হইতেই ইন্দ্র-ব্যাকরণের চর্চা বিপুল হয়। বৃহৎকথা-মঞ্জরী হইতেই কথাসংসাগরের গুরুগুরু সংগৃহীত হইয়াছে। ইহাতেও ঠিক এইরূপই উল্লিখিত আছে। বৌদ্ধ গ্রন্থাবলী হইতেও ইন্দ্রব্যাকরণের কথা জানিতে পারা যায়। অবদানশতকে লিখিত আছে, শারিপূর বাণ্যকালে ইন্দ্রব্যাকরণ অধ্যয়ন করিয়াছিলেন †। তিব্বতীয় ইতিহাসেও দেখিতে পাওয়া যায়, ৯ সঙ্কজান (শিব) সর্বপ্রথম ব্যাকরণ প্রণয়ন করেন। কিন্তু এই ব্যাকরণ তিনি অস্বরূপে কখনও প্রেরণ করেন নাই। ইন্দ্র ইন্দ্রব্যাকরণের

* ইন্দ্রকল্প: কামত্বংরপিনী শাকটায়নঃ ।

পানিন্যবত্বেন্দ্রো জয়ত্যাট্টাদিশাবিকাঃ ।

ধাতুপাঠ, উপক্রমিকা ।

† Eugene Burnouf.

Taranath's Tibetan History of the Indian Buddhism. P. 294 ; 54.

অণরন ও বৃহস্পতি ইহা অধারন করেন।
পাণিনির ব্যাকরণ প্রচলিত হইবার পূর্ক
পর্বাৎ অক্ষীণে এই ব্যাকরণই প্রচলিত
ছিল। অল্প একস্থানে ত্রিকতীর ঐতি-
হাসিক ভাৱানাপ বলিতেছেন—সপ্তবর্ষন্
(সর্ববর্ষন্?) বঙ্গুথকে (কার্তিকের)
ইন্দ্রব্যাকরণ প্রকাশ করিবার অল্প প্রার্থনা
করিলে, কার্তিকের বলিলেন, “সিদ্ধো বর্ষ-
সমাদায়াঃ।” এইটুকু শুনিয়াই সপ্তবর্ষন্
(সর্ববর্ষন্) ব্যাকরণের অবশিষ্ট সমুদ্র
অংশ বৃত্তিতে পারিলেন। ইহা কাতর
অর্থাৎ কলাপ ব্যাকরণের প্রথম সূত্র।
সুতরাং ভাৱানাপের সময়ে বোড়প
মতাবীতে কাতর-ব্যাকরণ ইন্দ্র-ব্যাকরণ
নামে প্রসিদ্ধ ছিল, বৃত্তিতে পাৱা যায়।
আর ভাৱানাপ তাঁহার ইতিহাসেও
লিখিয়াছেন যে, পতিতগণের নতে কলাপ-
ব্যাকরণ ইন্দ্রব্যাকরণের অত্করণে লিখিত।
ভাৱানাপ সপ্তবর্ষন্থকে কালিদাস ও
নাগার্জুনের সমসাময়িক বলিয়া উল্লেখ
করিয়াছেন। কথ্যেদের টীকাৱ সারণা-
চার্যের উল্লিখিত একটি বাক্য হইতেও
ইন্দ্রই সর্বপ্রথম বৈয়াকরণ ছিলেন বলিয়া
বোধ হয় ১। বোড়প মতাবীতে লিখিত
ভোক্তচন্দ্রুতে “ঐন্দ্রী বাগিব” ও দ্বর্গাচার্যের
নিরুক্তবৃত্তিতে “যথার্থ পদমৈত্ৰাণাম্”
প্রকৃতি বাক্য দৃষ্ট হয়। সাধারণ ব্যাকরণের

টীকাৱ “ইন্দ্র প্রকৃতিঃ যে শব্দসমুদ্রের
অন্তে বাইতে পারেন নাই” প্রকৃতি নোক
যায় ইন্দ্রকেই প্রথম ও প্রধান বৈয়াকরণ
যলা হইয়াছে। বঙ্গবর্ষন্ও তাঁহার
শাকটায়ন-ব্যাকরণের টীকাৱ “ইন্দ্রজ্ঞা-
বিত্তিঃ শাটৈবর্গজ্ঞঃ শব্দলকণম্” প্রকৃতিতে
ইন্দ্রের নাম উল্লেখ করিয়াছেন। এই সমস্ত
হইতে আমরা জানিতে পারি যে, ইন্দ্র-
ব্যাকরণনামক কোন গ্রন্থ একণে বর্তমান
না থাকিলেও এক কালে ছিল এবং
পাণিনির ব্যাকরণের ত্রায় পাণিনির পূর্কে
তাহা অতি প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল।

শাকটায়ন একজন প্রাচীন বৈয়াকরণ।
বজ্রকর্ষেদের কাত্যায়ন-প্রাতিশাখা, অপর্যবেদ-
প্রাতিশাখা ও পাণিনির ব্যাকরণে ইহার
সূত্রসমূহ প্রমাণরূপে উদ্ধৃত করা
হইয়াছে। নিরুক্ত শব্দবিজ্ঞানসম্বন্ধে এক-
খানি অতি প্রাচীন গ্রন্থ। যাহ ইহাতে
শাকটায়নের আবিষ্কৃত সমস্ত নাম
যে ধাতুজ, তাহা সপ্রমাণ ও গার্গ্যের প্রতি-
বাদের নিরাকরণ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন।
যাহের নাম কথ্যেপ্রাতিশাখাে দেখিতে
পাওয়া যায়। সুতরাং শাকটায়ন প্রাতি-
শাখাকারণেরও পূর্কে প্রাহত্বুত হইয়া-
ছিলেন, আমরা অহমান করিতে পারি।
শাকটায়নের ব্যাকরণে ইন্দ্র, আৰ্য্যবজ্র
প্রকৃতি হই এক জন বৈয়াকরণের নাম দৃষ্ট

* বাম্বেই পরচ্যাবাক্যভাবং তে বোবা ইন্দ্রমন্ত্রধরিমঃ বো বাভঃ ব্যাকৃজিত। সোৱতরীন্দ্রং কুপে সয়াঃ
বৈবেব যারনে চ সহ গুণাত্য ঈত তম্বাসৈন্দ্রযাযঃ সহ (গ্র)গুণতে। তামিপ্রো মনাঃতাইনজনা ব্যাকরোব।
তম্বাদিঃ ব্যাকৃত্য সাহসাতে। [১৩-সং ৩৪৭৭:৩৭] ইতি।

ধর •। প্রতারা: ইত্র মরপ্রথম বৈয়াকরণ
হওয়া অসম্ভব নহে। ১৮৭০ খৃষ্টাব্দে অক্ষ
দ্বার মলয় (malayalam) অক্ষরে লিখিত
শাকটায়ন-ব্যাকরণের সমগ্র হস্তলিপি ইণ্ডিয়া
আর্কিভ লাইব্রেরীতে প্রদান করিয়াছেন।
এ পর্যন্ত এই গ্রন্থ মুদ্রিত হয় নাই।

আপিনিশি পাপিনিয় পূর্বে প্রাহ্লুত
হইয়াছিলেন। পাপিনিয় হুত্রে তাঁহার নাম
উল্লিখিত আছে। উজ্জলনত তাঁহার
উগাদিহুত্রেয় করেক স্থানে এবং সায়ণাচার্য
তাঁহার প্রাহ্লুতি ও পদচন্দ্রিকা (১৪৩১
খৃঃ লিখিত) অনেক স্থানে আপিনিশির মত
উদ্ধৃত করিয়াছেন। তাঁহার করেকটি
উদ্ধৃত হুয় দেখিয়া অধ্যাপক আউফ্রেট
(Dr. Aufrecht) অহুমান করেন, তিনি
একজন শাস্ত্রিক ছিলেন।

পূর্বেই একটি কথা বলিয়া রাখা ভাল।
পাপিনিয় পূর্বে ও পরে বহুতর শাস্ত্রিক
অথবা বৈয়াকরণ বর্তমান ছিলেন। বোপদেব
তবে কেবলমাত্র আটজনের নাম উল্লেখ
করিলেন কেন? অবশ্য, এই আটজন
যাতিত অনেক বৈয়াকরণগ্রন্থই নাম তাঁহার
জানা ছিল। যাত্তের নিকট, যথেষ্ট-প্রাতি-
শাখ্যো, তৈত্তিরীয়-প্রাতিশাখ্যো, কাত্যা-
য়ন-প্রাতিশাখ্যো, অঙ্গকবেদ-প্রাতিশাখ্যো
তিনি বহুতর নামের উল্লেখ পাঠিয়াছেন।
আর পাপিনিয় ব্যাকরণে যেমন আপি-
শি, শাকটায়ন প্রহ্লুতির মত উদ্ধৃত
আছে, তেমনি পার্গা, গালব, চাক্রবর্তন,
পৌন্দর্যসি, শাকলা, শোনক, ফোটারন

প্রহ্লুতির নামও আছে, তবে তাঁহার শাস্ত্রিক-
শ্রেণীতে পড়িলেন না কেন? হইতে পারে,
ইহাদের অনেকেই কোন মনগ্রন্থ প্রণয়ন
করেন নাই অথবা প্রণয়ন করিয়া থাকিলেও
বোপদেবের সময়ে সে সমস্ত বর্তমান ছিল
না; কিন্তু তাই বলিয়া কাত্তর অথবা
কলাপ ব্যাকরণের নাম উল্লিখিত হইল
না কেন? পাপিনিয় ব্যাকরণের নিম্নেই
যাহাকে আসন প্রদান করা যাইতে পারে,
সেখানি পরিত্যক্ত হইল কেন? ত্রয়োদশ
শতাব্দীতে কলাপ-ব্যাকরণ প্রচলিত ছিল,
তাহাও অস্বীকার করিতে পারা যায় না।
বোপদেব নিজে “ভাস্তাকৌমদী” এই হুত্রে
কলাপব্যাকরণের পারিভাষিক শব্দ “লি”
লিঙ্গের পরিবর্তে ব্যবহার করিয়াছেন,
এ কথা আমরা মৃদুবোধের দীক্ষা হইতেই
জানিতে পারি। বোপদেবের কথিকরক্কনের
দীক্ষা কাব্যাকামধেহুতে বিশোচনদাসের
কাত্তরবৃত্তিপঞ্জিকা অর্থাৎ কাত্তর-ব্যাক-
রণের দীক্ষা হইতে অনেক বাক্য
উদ্ধৃত করা হইয়াছে। দুর্গাদাস বলেন,
এই কাব্যাকামধেহু বোপদেবের নিজের
রচিত। ত্রয়োদশ শতাব্দীতে আবহুত
হইয়া উজ্জলনত কাত্তর-ব্যাকরণের হুত-
সমূহ বীর গ্রন্থে উদ্ধৃত করিয়াছেন। বোপ-
দেব ও ইনি সমসাময়িক লোক। প্রাহ্লু-
সম্বন্ধে প্রাচীন লেখক যৈত্রেয় রচিত কলাপ-
ব্যাকরণের উল্লেখ করিয়াছেন। বোপদেব
এই সমস্ত শাস্ত্রিক অথবা বৈয়াকরণের নাম
কেন উল্লেখ করিলেন না, এ সম্বন্ধে ডাক্তার

• Dr. George Buhler "Orient and Occident. III. P. 162. •

বর্ণেল বাহা বলিয়াছেন, আমরা তাহা অনেকটা সমীচীন মনে করি। তাহার মতে ইন্দোনামক কোন বৈয়াকরণ কোনদিন ছিলেন না^১। পানিনির পূর্বে কেবল দুই এক জন ব্যতীত যিনি যে ব্যাকরণ রচনা করিতেন, তাহারই নাম ইন্দুব্যাকরণ রাখিতেন। যেমন কথাসরিৎসাগরে কাত্যায়ন বলিতেছেন, “ভেন প্রনষ্টেইমন্তঃ শুভম্‌ব্যাকরণং কুবি।” নিক্কমুত্তিতে “পথার্থ পদমৈগ্রাণাম্” ইত্যাদি। ইতিপূর্বেই বলা হইয়াছে, বোড়স শতাব্দীতে তিস্তপ্রদেশে কলাপ-ব্যাকরণকে ইন্দুব্যাকরণ বলিত। ডাক্তার বর্ণেল ভোলকাপ্পিয়াম্-(Tolkappiyam)-নামক তামিল ব্যাকরণ, কাত্তম্ব-ব্যাকরণ ও কাত্যায়নের পালি-ব্যাকরণের গঠন-প্রণালী ও বিষয়নির্মাচন যে একট-প্রকার, তাহা স্বরূপে প্রদর্শন করিয়াছেন। এই বৈয়াকরণত্রয় য য ব্যাকরণের বিষয় ও গঠনপ্রণালী নির্মাচনে পানিনির অনুসরণ না করিয়া তাহার পূর্ববর্ত্তিগণের অনুসরণ করিয়াছিলেন। (কাগর ও কাহারও মতে পালি-ব্যাকরণ-প্রণেতা কাত্যায়ন পানিনির পূর্বে প্রচলিত হইয়াছিলেন।) প্রাতিশাখ্যের পদবিভাগ ও উক্ত ব্যাকরণ-ত্রয়ের পদবিভাগে অনেক সামঞ্জস্য পরিলক্ষিত হয়। সুতরাং ইহারা সকলেই যে ইন্দু-ব্যাকরণের অনুসরণ করেন নাই, তাহা কে বলিতে পারে অতএব ইন্দু-

ব্যাকরণের অনুসারী বলিয়াই বোধ হয় বোপদেব ঐ সকল বৈয়াকরণ অপবা শাস্ত্রিকের নাম উল্লেখ করেন নাই।

অধ্যাপক যোক্তম্বলর পানিনির আবির্ভাবকাল-সম্বন্ধে বাহা বলেন, তাহার সংক্ষিপ্ত মর্ম্ম এইরূপ—ক্রীষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীতে কাম্বীরের সোমদেব তট্ট কথাসরিৎসাগর-নামক গ্রন্থ পণয়ন করেন। তাহাতে লিখিত আছে, কাত্যায়ন-বরকৃষ্টি বঙ্গদেশের রাজধানী কৌশারীনগরে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি অতি দুঃখিনী ছিলেন ও তাহার অসাধারণ স্বরশক্তি ছিল। তিনি মহাবিবর্ষের শিকার হইবার করিয়া সমগ্র বেদশাস্ত্রে ব্যাংগ হইয়া ব্যাকরণসম্বন্ধী তর্কযুক্ত পানিনিকে পরাস্ত করেন। পানিনি মহাবেবের আরাধনা করিয়া তাহার বরম্বাড়ে অবশেষে কাত্যায়নকে পরাস্ত করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। কাত্যায়ন নিজে পানিনির ছাত্র হইবার স্বীকার করিয়া তাহার ব্যাকরণ সম্পূর্ণ ও সংশোধন করিয়া দিয়াছিলেন। অবশেষে তিনি পাটলিপুত্রে নৃপতি নন্দের মন্ত্রী হন। নন্দ যে ধুং পুং চতুর্থ শতাব্দীতে রাজত্ব করিয়াছিলেন, যোক্তম্বলর তাহা প্রদর্শন করিয়াছেন। সুতরাং কথাসরিৎসাগর হইতে (বদিও ইহা উপাখ্যানমাত্র) আমরা জানিতে পারি যে, কাত্যায়ন-বরকৃষ্টি ও পানিনি ধুং পুং চতুর্থ শতাব্দীতে বিদ্যমান ছিলেন। কিন্তু যোক্ত-

* আমরা বলি, ইন্দুনামক একজন আদি-বৈয়াকরণ ছিলেন। পানিনির পূর্বে অনেকটাই সেই ব্যাকরণের পদ্ধতি অবলম্বন করিয়া য য ব্যাকরণ রচনা করিতেন ও উক্তের অনুসরণ করিতেন। তাহাকে ইন্দু ব্যাকরণ নাম দিয়া উক্ত করিতেন। আমরা ইতিপূর্বে যে সমস্ত প্রমাণ সাংগ্ৰহীত, তাহাতে ইন্দুর অস্তিত্ব অস্বীকার করা যায় না।

দ্বন্দ্ব মৃত্যুর কিছুকাল পূর্বে 'বঙ্গদর্শনের ইতিহাস' নামক গ্রন্থে পৃ. পৃ. ৬৪ শতাব্দী পানিনির আবির্ভাবকাল কল্পনা করিয়া গিয়াছেন। তাহাতে তত কিছু বৃদ্ধি প্রদর্শন করেন নাই।

ডাক্তার বেবার (Dr. Weber) বলেন, পানিনি বৃদ্ধের পরে, এমন কি আলেক্সান্ডারের ভারতাক্রমণের পরে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। তিনি বলেন, হেরেনসাস-এর মতে পানিনি বৃদ্ধের ৫০০ পাঁচশত বৎসর পরে ও কাত্যায়ন (ভাষাকার ?) বৃদ্ধের ৩০০ বৎসর পরে প্রচলিত হন। ডাক্তার বেবার, হেরেনসাস-এর এই সম্বন্ধনির্দেশ বিশ্বাস করিতে পারেন না। তিনি বলেন, এই কাত্যায়ন হয় ত ভাষাকার না হইতে পারেন, প্রত্যুত কাত্যবংশের কোন কাত্যায়ন হওয়াই সম্ভব। তাহার মতে পানিনি খ্রীস্টের তিন, তিন, কাব্যাবসন প্রভৃতি শব্দের অত্যন্ত বেশি ব্যবহার করিয়াছেন; ইহা দ্বারা বোধ তিন ও তাহাদের পরিধেয়কেই লক্ষ্য করা হইয়াছে। তবে তিনি সেণ্টিমিটার্‌বর্গ-নগরে রচিত সংস্কৃত অস্তি-ধান ও উইলসন-নাথেরের অভিধানে হিন্দু-পণের চতুর্থ আশ্রমকে যে তিন আশ্রম ও তাহাদের পরিধেয়কে যে কাব্যাবসন বলিত, তাহাও পাইয়াছেন। তথাপি তিনি ঐগুলি দ্বারা বোধ অর্থই গ্রহণ করিয়াছেন। আর পানিনি যে আলেক্সান্ডারের ভারতাক্রমণের পর প্রচলিত হইয়াছিলেন, তিনি বলেন, তাহাও পানিনির

দ্বন্দ্ব হইতেই পাওয়া যাইতেছে। পানিনি খ্রীস্টের দ্বন্দ্ব ও যবনানী পণের ব্যবহার করিয়াছেন। এ সম্বন্ধে যে গ্রীক জাতিকেই লক্ষ্য করিতেছে, তাহাতে সন্দেহ-মাত্র নাই। তবে তাহারা আভ্যন্তরীণ পণিয়া-ছেন, তাহারা হয় ত স্বীকার করিবেন যে, আভ্যন্তরীণ সময়ে হিন্দুজাতির সহিত পারসীক জাতির মিলন হইত। অমরসিংহও পারসীক জাতিকে যবন বলিয়াছেন। ডাক্তার বর্ণেলও বলেন, * পারসীক-শব্দ 'দিপি' ('Dipi') হইতে সংস্কৃত 'লিপি'-শব্দের উৎ-পত্তি হইয়াছে। অধ্যাপক মোক্ষমূলর স্বীকার করেন, আলেক্সান্ডারের ও পূর্বে সেমিটিক অক্ষর ভারতবর্ষে প্রচলিত ছিল। গোল্ড-ষ্টেকার বলেন, ইহা সেমিটিক অক্ষর নহে, পারস্তদেশে প্রচলিত অক্ষরবিশেষ; ইহাকে 'শরীরীক্ষর' বা 'কৌলকলিখন'—Cuneiform writing—বলে। 'দেয়ারিয়' (Darius)-এর ও পূর্বে এই অক্ষর ভারতে প্রচলিত ছিল। সুতরাং পানিনির যবনানী-বৃদ্ধের তাহা যে যবনলিপি দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা পারসীক অক্ষর।

অধ্যাপক গোল্ডষ্টেকার (Prof. Goldstucker) কয়েকটি বৃদ্ধি দ্বারা প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন যে, বৃদ্ধ, বৃদ্ধ ও সামবেদ এবং যাকের নিকট মাত্র পানিনির সময়ে প্রচলিত ছিল। তাহার মতে আর্য্যাক পানিনির সময়ে ছিল না। যদিও তিনি বৃদ্ধে পাইয়াছেন—“অরণ্যায়দ্বন্দ্বো” (৪। ২। ১২২)। বাঙ্গালনেরি-সংহিতা, তৈত্তিরীয়-সংহিতা, শত

পথত্রাঙ্কণ, উপনিষৎসমূহ, অপর্যবেশ প্রভৃতি কিছুই পাণিনির সময়ে প্রচলিত হয় নাই। কেন না, তাঁহার মতে এ সমস্ত পাণিনি স্বীয় যুগে ও মূলে ব্যবহার করিলেও, ইহাদের পারিভাষিক ব্যাখ্যা প্রদান করেন নাই *। এইরূপ তিনি বহু বর্ণনের পারিভাষিক শব্দ, নির্দোষের বোদ্ধব্যাখ্যা, শাক্যবৃন্দের নাম প্রভৃতি কিছুই পাণিনিতে দেখিতে পান নাই।

অধ্যাপক গোল্ডষ্টুক (Prof. Goldstucker) ভুলিয়া যাঁতে চান যে, পাণিনি ব্যাকরণ † রচনা করিয়াছেন; অতিথান অথবা মহাকোষ (Encyclopaedia) লেখা তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল না। নির্দোষ-শব্দের 'মোক' অর্থ বুঝের অশুদ্ধগণ, আর "বাক্য্য-কৃত্তিজাতরস্ত পরার্থঃ" জাহ্নবহ ২২।৬৮) দ্বোতমের শিষ্যগণ স্বীকার করিবেন। কিন্তু বৈয়াকরণগণ তাহা স্বীকার করিবেন কেন? শব্দ অথবা ধাতু পত অর্থেই তাঁহারা অহু-সরণ করিবেন, কিন্তু দ্বোতম, কণার অথবা বুঝের অহুসরণ করিবেন না! নির্দোষের ব্যাখ্যা নাই বলিয়া পাণিনি বুঝের পূর্বে, আর শতপথত্রাঙ্কণের ব্যাখ্যা নাই বলিয়া তিনি বৈদিকযুগের প্রারম্ভে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, আমরা এ যুক্তির পক্ষপাতী নহি। আর পাণিনি উপনিষদ, ত্রাঙ্কণ অথবা আত্মগ্যক যুগের পূর্বে জন্মগ্রহণ করিয়া লৌকিকভাষার ব্যাকরণ রচনা করিতে গেলেন কেন? তখন কি লৌকিক ভাষার পুস্তকাদি বিদিত হইয়াছিল? পাণিনির যুগে

উল্লিখিত শৌনক, শাকটায়ন, শাকণা, আপিনি, চাক্ষবদন, শালব, শার্গা, কত্মপ, ভর-দ্বাজ, কাতায়ন, দ্বোটায়েন প্রভৃতি বৈয়াকরণ ও শাস্ত্রিকগণকে প্রাক্তন বলিয়া ভাড়াইয়া না বিলে, তাঁহারা যে পাণিনির পূর্বে প্রচলিত হইয়া পড়েন।

আর একজন পাক্ষাতা পণ্ডিত বলেন—সংস্কৃত সাহিত্যে পাণিনির ব্যাকরণ যুগান্তর উপস্থিত করিয়াছিল। তাঁহার ব্যাকরণের হুত্র পূর্ববর্ত্তিগণের সমুদয় ব্যাকরণহুত্রে প্রযোজিত করিয়াছে। বিজাতীয় লোক ও ধর্ম্মসম্প্রদায়ের ভীত কোলাহলে ভারত যখন প্রাবৃত হইতেছিল, পাণিনির জ্ঞান মনোবীর সংস্কৃতভাষারকার নিমিত্ত সেই সময়ে অগ্রসর হওয়া কল্পনা করা অগ্রাহ্য নহে। গ্রীকজাতি বর্ত্তদিন রোমানগণকে গ্রীকভাষা শিখাইতে আরম্ভ না করিয়াছিল, ততদিন তাহাদের ব্যাকরণ অতি অরহি উন্নতি লাভ করে। আরবের সেমিটিক জাতির সহিত পারসীক, সিন্ধীয় ও অন্যান্য বিজাতীয়ের সংস্রবের অতই বোধ হয় আরব্য ও হিব্রু ব্যাকরণের উৎপত্তি হইয়াছিল। আর পাণিনির আবির্ভাব খৃঃ পূঃ চতুর্থ শতাব্দীতে কল্পনা করিলে আমরা সেইরূপ একটা যুগান্তর দেখিতে পাই। বৌদ্ধধর্ম্ম প্রবলবলে ভারতবর্ষ প্রাবৃত করিতে উদ্যত, ওষিকে পারসীকজাতির সহিত গ্রীকজাতির সংঘর্ষ আরম্ভ হইয়াছে। বৌদ্ধধর্ম্মের প্রবলতাই যে সংস্কৃত ব্যাকরণের উন্নতির কারণ

* পাণিনি ৮।২।১২২, ৮।৩।৩৭৭, ৮।৩।১২, ৮।৩।১০০ পৃ., ৮।৩।১০৫, ৮।৩।১০১ ও ১০৩ প্রকৃতি ত্রিষ্টব্য।

† ব্যাকরণে দ্বাংগাভ্যন্তে দ্যাপুশকা অনেক চর্চা ব্যাকরণে।

হইয়াছিল, তাহা আমরা অধ্যাপক স্যে- (Prof. Sayce) -এর মিল্লিপিত উক্তি হইতে অস্থান করিতে পারি* । তিনি বলেন, “বৌদ্ধধর্মের প্রচারের নিমিত্ত কথিত ভাষাগুলি এখন মৃত মৃত প্রচারিত ও অত্যন্ত সম্মানিত হইয়া আসিতে-ছিল, খুব সম্ভব সেই সময় সংস্কৃত বৈয়াকরণ ব্যাকরণের উদ্ভাবন নিমিত্ত বহুগণিক হইয়াছিলেন।” অতি প্রাচীনকাল হইতেই শাস্ত্রিকগণ শব্দসকলের কথিত ভাষা অনুসারে উচ্চারণ ও আকারের পাথক্যের প্রতি মনোযোগ দিয়া আসিতেছেন। মহাভাষ্যেও আমরা পুত্র প্রাচ্যেণ্ডক শব্দের ব্যবহার দেখিতে পাই। ঐশ্বর্যময়ী তাহার বীনাংসাহুতে প্রদর্শন করিয়াছেন যে, বেদে পণ্ডিত অগণ; ব্যবহারে দৃষ্ট হয়। পাপি-নির হুতে কতগুলি বিবরণের নাম পাওয়া যায়। ইহাদের মধ্যে কোন কোনটি প্রকৃষ্ট হওয়াও অসম্ভব নহে। এই সমস্ত অবস্থা আলোচনা করিয়া আমরা অস্থান করিতে পারি যে, এখন নানাবিধ উপভাষা ও বিজাতীয় ভাষা সংস্কৃতভাষাকে গ্রাস করিতে উদ্যত হইয়াছিল, সেই সময়েই পাপিনির ব্যাকরণ প্রণীত হয়। অস্তুত অন্তান্ত দেশের ব্যাকরণের উৎপত্তির বিষয় চিন্তা করিলে, আমাদের এই ধারণাই সঙ্গত।

পাপিনি ব্যাকরণ লিপিতে দিয়া গার সর্ববিধে নূতন প্রদর্শন করিলেও, প্রধা-

নত চারিটি বিষয়ে আমরা তাহার অসাধারণ পাণ্ডিত্য ও প্রতিভার পরিচয় প্রাপ্ত হই।

(ক) পাপিনিই শিবহুত্রেয়† সর্ব-প্রথম আবিষ্কার ও প্রত্যাখ্যার দ্বারা সে-গুলির গ্রহণ করিয়াছেন। পাপিনির পূর্বে কেহই এ প্রতিভা প্রদর্শন করিতে পারেন নাই। সেইজন্যই বোধ হয় পাপিনির সাক্ষ্যকারণ ইং শিবের অস্থগ্রহে লক্ষ্য, এই কথা বলেন। শিবহুত্রেয় কিন্তু অসাধারণ প্রতিভার বিকাশ হইয়াছে, একটিমাত্র দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিলেই তাহার যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যাইবে। পাপিনির পূর্ববর্তী বৈয়াকরণগণ শব্দ, শব্দ, নামক ও পাবক এই চারিটি শব্দের সন্ধিবিচ্ছেদের ক্ষমতা চারিটি পৃথক্ হুত্রেয় অবতারণা করিয়াছেন। কিন্তু পাপিনির “এতৌহুত্রেয়াঃ” (১.১.৭৮) এই একটি হুত্রেই সমস্ত সম্পন্ন হইয়াছে।

(খ) অস্থবকগুলি পাপিনির নিজের উদ্ভাবিত। তাহার পূর্বে কোন বৈয়াকরণ অস্থবকের ব্যবহার করিয়াছেন কি না, জানিতে পারা যায় নাই। কোন প্রাতি-শাখ্যেই অস্থবকের ব্যবহার দৃষ্ট হয় না।

(গ) পাপিনি অনেকগুলি পারিভাষিক সংজ্ঞার উদ্ভাবন করিয়াছেন। যেমন কৃৎ-প্রত্যয়, নদী, স্ত্রী, সংখ্যা, য, বি, বৃ, টি প্রভৃতি।

(ঘ) যদিও পাপিনির পূর্বে অতি সামান্য পরিমাণে গণের ব্যবহার দৃষ্ট হয়, কিন্তু

* Principles of Comparative Philology.

† অষ্টক্. মন্তক্. প্রভৃতি হুত্রেয় হুত্. পণ্ডিত বর্গগুলিকে শিবহুত্. মন্তক্. অষ্টক্. এই কয়েকটি সর্ব-কেন্দ্রীয় গ্রন্থ ও শব্দার্থ-সংগ্রহ দ্বারা প্রকাশ করিতে প্রত্যাখ্যার বলের। এইকণ অস্থ. অস্থ. অস্থ. প্রভৃতি।

বলিতে গেলে পাপিনিই গণসমূহের উদ্ভাবন করিয়াছেন। অধরপেধ-প্রাতিশাখ্যে অর অর গণের ব্যবহার দেখিতে পাওয়া যায়।

যে সমস্ত পারিভাষিক শব্দ পাপিনির নিজের উদ্ভাবিত, তাহাদের সকলেরই তিনি ব্যাখ্যা প্রদান করিয়াছেন। আর যে সমস্ত ভাষার পূর্ববর্তী বৈদ্যাকরণগণের নিকট হইতে গৃহীত, তাহাদের বেগুলির ব্যাখ্যা ভাষার নিকট অসম্পূর্ণ বোধ হইয়াছে, সেগুলি তিনি নিজে নূতন ব্যাখ্যা দ্বারা সম্পূর্ণ করিয়া গাইয়াছেন। ভাষার পূর্ববর্তীগণের উদ্ভাবিত প্রথমা, দ্বিতীয়া, তৃতীয়া প্রকৃতি বিভক্তি, অমুস্মার, অস্ম, একবচন, দ্বিবচন, বহুবচন, উপসর্গ, নিপাত, ধাতু, প্রত্যয়, প্রধান, প্রবহ, ভবিষ্যৎ, বর্তমান প্রকৃতি শব্দের তিনি ব্যাখ্যা প্রদান করেন নাই। আবার অহুনাগিক, আনুদৈনিক, আনুয়িত, উপধা, ভগ, দীর্ঘ, পদ, পরস্মৈপদ, বিভক্তি, বুদ্ধি, সংযোগ, লবণ, ইত্য প্রকৃতি শব্দ ভাষার পূর্বপ্রচলিত ব্যাকরণসমূহ হইতে গ্রহণ করিয়াও তাহাদের নূতন ব্যাখ্যা প্রদান করিয়াছেন। ভাষার পূর্ববর্তীগণ এই সমস্ত শব্দের যে ব্যাখ্যা প্রদান করিয়াছিলেন, তাহা ভাষার নিকট যথেষ্ট বলিয়া মনে হয় নাই। এই সমস্ত শব্দ যে ভাষার পূর্ববর্তী ব্যাকরণ হইতে গৃহীত, তাহা তিনি স্থানে স্থানে স্বীকারও করিয়াছেন। যেমন—“চতুর্থীতি সংজ্ঞা প্রাচীন” ইত্যাদি।

পাপিনির পূর্বের বৈদ্যাকরণগণ ব্যাকরণ-রচনার বস্তুদ্রষ্ট কৃত্তির প্রদর্শন করুন না কেন, পাপিনিই যে সংস্কৃতভাষার মেরুদণ্ড, তাহা বোধ হয় কেহ অস্বীকার করিবেন না। সহস্র সহস্র বৎসর অতীত হইয়া গেল, কিন্তু দ্বিতীয় একজন পাপিনি দৃষ্ট হইলেন না। পাপিনির জীবনীর বিষয় কিছুই জানিতে পারা যায় না। ভারতের উত্তর-পশ্চিম প্রান্তে (পাঞ্জাবপ্রদেশে ?) শলাভূম-নামক গ্রামে তিনি জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। ভাষার মাতার নাম দাক্ষী ছিল *। ইহাই কেবল আমরা জানিতে পারি। প্রবাদ আছে, তিনি সিংহের হস্তে † নিহত হইয়াছিলেন।

পাপিনির পরে কাশকব্র, জৈত্র, অমর, জৈনেন্দ্র, সপ্তমহন্ত, কাতকব্র, বোপদেব, সারস্বতব্যাকরণগ্রন্থের প্রকৃতি বহু বৈদ্যাকরণ বর্তমান ছিলেন সংস্কৃত ব্যাকরণ হইতে উপাদান সংগ্রহ করিয়া কাচ্চা-রনের পালি-ব্যাকরণ মহাসদ- (শব্দ)-নীতি, রূপসিদ্ধি, বালাবতায়, পদোপ-সিদ্ধি, আখ্যাত পদ, ধাতুসংস্থা যোগ্যগুণান্বয়ের ব্যাকরণ প্রকৃতি পালি, সিদ্ধসংস্কৃতভ-নামক সিংহলী ব্যাকরণ ও ভ্রামদেবীর, কাথোড়িয়াদেশীয় বহু ব্যাকরণ বিরচিত হইয়াছিল। প্রবন্ধ মতি বৃহৎ হইল দেখিয়া আমরা আপাততঃ এ সম্বন্ধে কোন কথা বলিলাম না।

ত্রীযতীভূষণ আচার্য্য ।

* নাগভূমরকে দাক্ষীপুত্র পাপিনিবাহিকঃ।

† হা ব্যাকরণতঃ কষ্টং বৎসং প্রাচীনং সিদ্ধান্তং পাপিনিঃ।

পদ্যেব, বোপদেব সংস্করণ

পল্লীপার্বণ ।

আষাঢ়ের প্রথম হইতেই রথযাত্রার বিভিন্ন উদ্দেশ্যে পল্লীপ্রকৃতি চকল হইয়া উঠিয়াছে। সেখানে বাণেশ্বর রথ প্রস্তুত হইবে, বিশ-পঁচিশ-দিন পূর্বেই সেখানে কার্য্যারম্ভ হইল। কোথাও কাঠনির্মিত রথের সংস্কার, কোথাও ধাতব রথের মাঝা-বন্ধ্যা চলিতে লাগিল। গ্রামের ব্রাহ্মণ-পুত্র, ভদ্রাজ্ঞ, বাল-বৃদ্ধ-যুৱ, সকলে উৎসাহে সে সমস্ত কর্ম্মে যোগদান করিয়াছে। কোন আদর-অভ্যর্থনা নাই, সাধ্যসাধি নাই, ধন্বানবর্ষণের চিত্তমান নাই।

সকালে-বিকালে রথতলায় এখন প্রতি-দিন সভা বসে। সেখানে ত্রাণ-তন্ত্র-কূটের শ্রাভ হয়, অকালে অকারণে অনেক মাঝা-উজীরকে পক্ষদণ্ডে করিতে হয়। তা ছাড়া বিনি-একবার শ্রীক্ষেত্রে বা আর কোনখানে রথে গিয়াছিলেন, তিনি সে সকল স্থানের রথের আভরণ, কারুকার্য্য, লোকারণ্য, হঠাৎ রথ বন্ধ হওয়া, হাতীর দ্বারা রথ-চালানোয় চেষ্টা, রথের ঢাকার নীচে পড়িয়া তিনজন বলিষ্ঠ পঞ্জাবীর স্বরণ, ইত্যাদি সত্যাসত্য শত গল্প করিতে থাকেন, আর সকলে তৎপরচিত্তে তাঁহার সুখের প্রতি চক্ষু নিবিষ্ট করিয়া কান পাতিয়া নিরাপত্তিতে সেগুলি শুনিয়া চরিতার্থ হইতে থাকেন।

এইরূপে রথের দিন উপস্থিত হইল। নিম্ন গ্রামের এবং পার্শ্ববর্তী গ্রামগুলির লোক-

সকল দলে দলে যথাস্থানেই যথোৎসবে উপস্থিত হইতে লাগিলেন; নানা দল নিশান লইয়া, শিঙা বাজাইয়া, ধোণ-করতাল-যোগে সঙ্গীত করিতে করিতে আসিতে লাগিলেন। নিম্নশ্রেণীর গৃহস্থ মুল্লারীকুল দলে দলে নির্দিষ্ট অংশে উপস্থিত হইয়া উচ্চ কলধ্বনিতে ও উল্লুধ্বনিতে রথপ্রাঙ্গণ পুনঃপুনঃ সূত্রিত করিয়া তুলিল। বালক-বালিকারা, শ্রী-পুরুষ উভয় দলেই যাত্রায়াত করিতেছে, তাহাদের আনন্দ অথও—পরিপূর্ণ! আনন্দমানে প্রায়ই বর্ষা হইয়া থাকে, অধিকাংশ বাত্রি-দলকে নৌকার করিয়া আসিতে হয়, কাজেই নৌকার শ্রেণী নদীর ঘাট বা খালের দুই পার্শ্ব পূর্ণ করিয়া রহিয়াছে। অদূরে মন্দিরচূড়ার পতপতশব্দে পতাকা উড়িতেছে। রথপ্রাঙ্গণে দলপতাকাবৃত্ত পুষ্পদামবেষ্টিত রথের শোভা।

অপরাত্তের আরম্ভে শত শত লোকের মৌলদৃষ্টির ব্যগ্রতা বজ্রাইয়া দেবদেবক ব্রাহ্মণ মনোহরবেষভূষিত শ্রীবিগ্রহ রথে তুলিবার অভিপ্রায় জ্ঞাপন করিবারাত্র চারিদিকে সঙ্গীত, সঙ্গীত, উল্লুধ্বনি, শব্দ-ঘণ্টা-কীসরের রোল, শিশুস্বরের আনন্দ-কোলাহল উচ্ছলিত—উষলিত হইয়া উঠিল,—সেই আনন্দগোলযোগের মধ্যে ব্রাহ্মণ রথের প্রকোচে ঠাকুর তুলিলেন। অমনি দলে দলে স্ত্রী, পুত্র, বালক, সুবক,

রথের রজ্জু ধরিয়া আকর্ষণ করিতে লাগিল। যদ্যপ্য কচ্ছক শব্দে রথ চলিতে আরম্ভ করিল; চতুর্দিকে উচ্চ জয়ধ্বনি পড়িয়া গেল; মত্তমত্ত লোকের মত্তক ভুলুপিত হইতে লাগিল। মণ্ডপের বারেও ও রথের চারিদিক আগন্তুকগণের প্রবৃত্ত উপহারকলে পূর্ণ। রথের উপর হইতে ব্রাহ্মণগণ আনারস, কাঠাল, ডাব, বেল, জনতার মধ্যে ছুঁড়িয়া ফেলিতেছেন; লাকালাফি-কাড়াকাড়ি করিয়া সেই প্রসাদী কল ধর্শকদল গ্রহণ করিতেছে; কোন স্থলে বা এই উপলক্ষে বলিষ্ঠগণের বলপরীক্ষা হইতেছে। একজন একটা কাঠাল ধরিয়াছে, আর-এক-জন তাহা বলপূর্বক ছাড়াইয়া লইবার চেষ্টা করিতেছে; কোন স্থলে একজন বিশেষ বলশালীর প্রতি ছই, তিন, চারি-জন পর্য্যন্ত প্রতিপক্ষ বল ও কৌশল প্রয়োগ করিতেছে; লুটপুটি-গড়াগড়ি করিয়া তাহারা ধূলায় ধূসরিত অথবা বৃষ্টি-সিক্ত প্রান্তরে কষ্টমাক্ত হইতেছে।

যে যে স্থলে রথ উপলক্ষে মেলা বসে, সেই সকল স্থানে স্ত্রীলোকেরা ছেলেমেয়ের আবিষ্কার মিটাইতেছেন, নিজেদের চুড়ি-চিক-ণির কথাও ভুলিতেছেন না। মূলমানেরাও মেলার অব্যাহাত ক্ষর করিতেছেন, আর দূরে থাকিয়া রথের ব্যাপার দেখিতেছেন। ক্রমে সন্ধ্যা হইয়া আসিল, রথ বিগ্রহের আরতি দর্শন করিতে তখন শ্রেণীবদ্ধ হইয়া দর্শক-মণ্ডলী দাঁড়াইলেন। ধূপধূনার সঙ্গে—পুশ-কপূরের সৌরভে চতুর্দিক্ আমোদিত হইয়া উঠিল। আরতির পূর্বে আরম্ভ হইল, কীর্তনসম্ভাষণ আরও গান ধরিলেন।

পূজক যথাক্রমে ধূপ, কপূরপ্রদীপ, শকপ্রদীপ ও জলশ্রাবাদি দ্বারা নানাপ্রকারে হস্ত-সঞ্চালন করিয়া তালে তালে আরতি করিতে লাগিলেন;—আরতির শেষে শম্মের প্রসাদী জল সকলের মস্তকে নিক্ষেপিত হইল। লকষ্টে অবনতমস্তকে সেই মঙ্গল-জলবিশ্ব গ্রহণ করিয়া, স্তবস্ততি ও প্রণামাদির পর, প্রসাদী কলমূল ও পুশ-মাগ্যাদি গ্রহণ-পূর্বক বিদায় লইতে লাগিলেন।

ক্রমে কর্তৃপক্ষ রথপ্রাঙ্গণ হইতে পুশ-সম্ভারকে হানাত্তরিত করিলেন। গ্রামের সম্ভারস্থলের মহিলাগণ তখন শুদ্ধবসন-ভূষণ-পরিহিত হইয়া সেখানে উপস্থিত হইলেন। তাহারা সমগ্রাম রথ-বিগ্রহ-দর্শন ও রথসঞ্চালন করিয়া বিদায় গ্রহণ করিলেই, পুনর্বার বাল্যধর্মের সহিত উৎসব নিবৃত্ত হইয়া গেল।

সাতদিন পরে আবার পুনর্যাত্রা। তাহাও পূর্ব রথেরই অধরূপ, তবে তাহাতে অতটা জনতা বা আড়ম্বর দেখা যায় না।

স্রাবণমাসের জলজাঁড়া আশ্বিও চিত্তকে একান্ত চঞ্চল করিয়া তোলে। তখনকার অবিভ্রায ধারাবর্ষণ, দিনদিন জলবৃষ্টি, অনবরত বিদ্যাপ্রকাশ, ধূপধূপ হর্ষ-ভয়ের সঞ্চার করে। পূর্ববর্ষের তরানদী পল্লীর পদ-তল বিদৌত করিয়া উজ্জ্বলিত ব্রোভোবেগে হু'কুল ভাঙ্গাইয়া উধাও চলিয়াছে। সেই অবিভ্রায গতি, চঞ্চল তরসবিকোভ, কুটিল আবর্ত, নৈরিকস্রাগরচিত ধূলধারা, কত লোকের চিত্তে কত ভাবের ধূরণ করে। খলগুলিতে নদীর মত স্রোত তহিতেছে, ফের-প্রান্তর ভগ্নে ভগ্ন—চারিদিকে জলের

কমল, নদীর কল্কল, মাঠের হুলহুল, বিলের তরুতরু অবনিত চলিতেছে। প্রান্তরের তৃণ-খাত্তর ভেলের উপর ভাসিতেছে। চাবীরা সেই ভালে বক পর্ষাত্ত নিমগ্ন করিয়া পাকা-ধান কাটিতেছে, আর ভিত্তিতে বোঝাই দিতেছে। মাঝে মাঝে এক এক খানি নৌকা ক্ষেত্রের নধ্য দিয়া চলুচ করিয়া চলিয়া যাইতেছে। নানাকর্ণে নানাদেশের বিচিত্র ব্রকমের তরগির্শ্রেণী নদী, খাল, বিল, প্রান্তরে দশদিকে ছুটিয়াছে। ফুল-ফুলসীপণ বর্ষাকালে একবার অবশ্যই পিত্তভবন, মাতুলভবন প্রভৃতি হইতে সাধর নিমগ্ন লাত করিয়া থাকেন। সেই উপলক্ষে শ্রিতবদনা রমণীদিগকে লইয়া চারিদিকে তরগির্শ্রেণী হেলিয়া চলিয়া চলিয়াছে; আর সেই তরগীর অগ্রভাগ উৎস্রুকা প্রমদাদিগের ঘরোতোলিত কুমুদকল্যারে—সালুকফুল-পানিকলে—বিচিত্র জলীয় লতার পাতার সমাচ্ছন্ন হইয়া যাইতেছে। কত শাক্সার মালা ও অলঙ্কার প্রস্তত করিয়া, কত ব্রকনের শাক-তরকারি সংগ্রহ করিয়া, তাঁহারা বর্ষার অনন্দ পূর্ণহৃদয়ে উপভোগ করিতেছেন, তাহার সংখ্যা কে করে ?

বর্ষার ভালে যখন চতুর্দিক্ ভাসিয়া যায়, তখন গ্রামগুলি মাঝে মাঝে ক্ষুদ্র বীপের ন্যস্ত ভাসিতে থাকে। সেই বীপাধিবাসীরা কোন-একর ভরগির সহায়তা ছাড়া গ্রাম ছাড়িয়া একপদ অগ্রসর হইতে পারে না; কাণেই ঘাটে ঘাটে ক্ষুদ্র তরি, কণাগাহের ডোবা বা বাশের 'ভেরো'।

ক্ষুণ্ণ বা হিংস্রান বৃন্দাবনের রমণীলার অন্ততন হৃৎকল, একপে তাহা সর্প-

শেষবালী উৎসব; তবে সর্পগৃহবালী নহে। প্রাণের গুল্লা একাধীন হইতে পূর্ণিমা পর্যন্ত পাঁচদিন অবধা অগোবিন্দ হইতে পূর্ণিমা পর্যন্ত তিনদিন দেবালয় বা ব্যক্তি-বিশেষের গৃহে স্থলন হইয়া থাকে। স্থলন নিকট হইলেই গ্রামের উৎসাহী দল সিংহাসনের কারকাব্যো, নাট্যমন্দিরের সাজ-সজ্জার ব্যস্ত হইয়া উঠেন। স্থলন-প্রান্তরের পূর্বদিনে বা যে দিন স্থলন, সেই দিন প্রাতঃকালে স্থনির্ধৃত উজ্জল সিংহাসন-খানি ভূমিতল চাইতে কিঞ্চিৎ উর্দ্ধে তুলিয়া পাশ্চাতে ধড়ি বাধিয়া দেবমণ্ডপের উপরি-ভাগ হইতে স্থলাইয়া দেওয়া হয়। সিংহাসনের নিম্নে কলাইপূর্ণ কতকগুলি স্তম্ভ প্রাথিত থাকে এবং সস্তম্ভদিকের ভূটি পাশ্চাতে ছ'গাছি স্থলর স্থরজিত বক্ষু সংলগ্ন করিয়া ঘাতের পার্শ্বে বারেণ্ডার রাখা হয়। স্থলন রজনীর ব্যাপার। বিহিত দিনে সন্ধ্যার পর সিংহাসনে বিগ্রহ স্থাপন করিলেই তরুণল বাহির হইতে ঐ বক্ষু আকর্ষণ করিতে থাকেন, সেই আকর্ষণে সমস্ত সিংহাসন আন্দোলিত হইতে থাকে। টানে টানে তালে তালে সিংহাসন আদে আদে, আবার পিছাইয়া যায়; সিংহাসনের কম্পনে বিচিত্র-রসালঙ্কার-ভূষিত বিগ্রহেরও চকলতা লক্ষিত হয়; আর নীচের স্তম্ভগুলি ভূমিতলে সংলগ্ন হইয়া কুমুম কুমুম হ্রস্ব হ্রস্ব ধ্বনি করিতে থাকে। সিংহাসনের ছই পার্শ্বে দুইটি বৈঠকী ঝাড়,—উজ্জল আলোকে সিংহাসন উদ্ভাসিত করিয়া তোলে। সস্তম্ভে দর্শকমণ্ডলী আলোক-মালা-সমুদ্ভল নাট্য-মন্দিরের বাহিরে ও বারেণ্ডার দাঁড়াইয়া

সকালিত হুহুজিত সিংহাসনের মধ্যে উজ্জ্বল-মধুরবেশে সম্ভ্রিত যুগলমাধুরী নিরীক্ষণ করিয়া তৃপ্তিস্নাত করেন ।

‘অবলোকেশ্বরের ঘেষে শ্রাবণে মনসা-পূজা সার্বজনীন হিন্দু উৎসব । বর্ষাকালে প্রচুর সর্পভয়, তজ্জন্মই সর্পমাতা সর্পভূমিতা মনসা শ্রাবণে তত্ত্বিবৃত্ত অর্চনা লাভ করেন । শ্রাবণের প্রথম পক্ষমী চইতে একটি মনসার ডাল বা চাচা সংগ্রহ করিয়া যথাবিধি পকোপচারে প্রতি পক্ষমীতে তাহাতে পূজা করা হয় । ইতার নাম স্থাপন । শ্রাবণের শেষ—সংক্রান্তিদিনে আসল পূজা । এই পূজার প্রারম্ভে প্রতি বাড়ীতেই চতুর্ভুজা, বিচিত্রনাগসর্পসংগীতা, হংসবাহিনী, গৌরী, মনসাস্তীর্ণ আনন্দন করা হয় । সর্পভীত আনন্দগর অবস্থায় মনসাপূজার আয়োজনে কিছুমাত্র কুপণতা প্রকাশ করেন না । পুরোহিতগণ মনসাপূজার একান্তই গল্গৎস্বর্গ হইয়া পড়েন ; কেন না, সর্পজন্যের পূজার প্রতি বর্ষমানগণের পূব সতর্ক মনোযোগ । পূজা-জপ-হোমাদি কর্ত্তে একান্ত ভাড়াভাড়ি করিলে বর্ষমানেরা পুরোহিতের শাস্ত্রজ্ঞান এবং নিষ্ঠার প্রতি অবিশ্বাস স্থাপন করিতে পারে, এই সন্দেহে অনেকসময় মিথ্যা বিলম্ব করিয়া অসময় পর্য্যন্তও মনসা-পূজার তাহাদিগকে বাস্তবাক্ষিতে হয় ।

ব্রাহ্মণগৃহের লক্ষ্মীরা অন্নব্রাহ্মণ-পারল-শিষ্টকাহ্নি করিয়া মনসার ভোগ ঘেন । সকলের অবস্থার অবশ্য সকল রকম ঘটয়া উঠে না । ঘাই হোক, পূজাশ্রেণে অপরাধ হইতে রাগি পদ্যান্ত সমস্ত পাড়ায় পাড়ায়

পত্রস্পরের মধ্যে প্রসাদ পাওয়ায় ও প্রসাদ আদান-প্রদানের অভিনয় চলে । ব্রাহ্মণ-বাড়ীতেই প্রসাদার্থীর অধিক ভিড় হয় ।

পূর্বে মনসার প্রভাববিষয়ক বাঙালী-প্রাচীন-পদ্যময় পদ্যপুরাণ পাঠ হইত এবং উহা জ্ঞানপথ-মরনারীকে মাদম্যাপী আনন্দে মগ্ন করিয়া রাখিত । শ্রাবণের প্রথম হইতেই পদ্যপুরাণ-পাঠক পাড়ার সমস্ত বাল-বৃদ্ধ-তরুণকে সমবেত করিয়া—বে-দিন বেধানে যেমন সুবিধা—বাহিরে, ঘরের বাহ্যেভার বা বৈঠকখানায় পাতি, চোটাট, শতরঞ্জ বিছাইয়া, খোল-করতালের কলরোলে পাঠ আরম্ভ করিয়া দিতেন । পাঠকের ভক্তি ও শক্তি অল্পসারে প্রথমেই বন্দনাগীতি হয় বা দীর্ঘ হইয়া পড়িত । বন্দনাগীতির পরই একটি ধুরার সহিত ‘রাম রাম রাম রাম রাম রাম রাম রাম’ ইত্যাদি বচনপরম্পরা, খোল-করতাল এবং সমবেত কণ্ঠের বিচিত্র অট্টরোলে, পন্নীবাঙ্গী সকলে পাঠের সমাচার পরিজ্ঞাত হইতেন । তার পরে ধুরার অংশ-বিশেষ সকলে তালগলে মিনাইয়া গান করিতেন, আর সেই রাগিণীর অল্পপাতে পাঠক পদ্যপুরাণ পাঠ করিতে থাকিতেন । পদ্যপুরাণপাঠ অনেকটা রামায়ণগানের মত । পাড়ার পাড়ায় আড়াআড়ি করিয়া পদ্যপুরাণপাঠের স্বর যখন সপ্তমে চড়িয়া উঠিত, আর সকলের কণ্ঠে “রামনারায়ের মালা বার গলে, শমনের তর নাই তার কোন কালে” প্রভৃতি ধুরার অংশ উচ্চ হইতে উচ্চতর হইতে থাকিত, তখন সেই কোলা-হল দেশপ্রাচীর বর্ষার জলে প্রতিহত হইয়া কেবল পাড়াকে সুখরিত করিত না,

সমস্ত গ্রাম এবং চতুর্দিকের পরীক্ষালৈকে ও বিস্তৃত করিয়া তুলিত !

মনে পড়ে, শেষদিনে পদ্মসুভাষণার্থে কত আড়ম্বর ! সেদিন সন্ধ্যার পর বিশেষ-রূপে সাজগজ্জা করিয়া পদ্মসুভাষণার্থে আরম্ভ করা হইত। ভূগর্ভস্থ গৌহসিদ্ধকেও অভ্যন্তরবর্তী হইয়াও নিঃশব্দে অঞ্চলীয় প্রভাবে ঘাঘাঘী কানীক্ষনামের সংশনে লক্ষীকর বধন জীবনভাগ করিলেন, তখন পাঠক, গায়ক এবং শ্রোতৃকুল বাস্তবিকই আতুল হইয়া উঠিলেন। সতী বেহুলায় আদর্শ-পতি-প্রেম, নন্দ্যস্তিক করুণাবিলাপ, সে সময়ে বাস্তবিকই চন্দ্রবানের চন্দ্রে বেদনা উপস্থিত করিল। বেহুলা মৃতস্বামি-সেহ বক্ষে লটয়া ভাসিয়া চলিলেন ! তাঁহার ধর্মবলে—সতীত্বপ্রভাবে মনসার কৃপা হইল; সেই করুণায় লক্ষীকরের মৃতদেহে পুনর্জীবন সঞ্চারিত হইল। এই অংশ পাঠ হইবার সময় উচ্চ আনন্দধ্বনির সহিত ‘জীয়ো জীয়ো রে লখাই চাঁদের নন্দন’ বলিয়া সকলে বধন ধুয়া ধরিলেন, লক্ষীকর তখন সমবেদনামূলক জনগণের মেহে বর্ধার্বি ‘লখাই’ হইয়া উঠিলেন। এই অংশ পাঠ করিতে ভোর হইয়া গেল,—তখন লোকের ভিড় একান্তই অধিক। পুনর্জীবন-লাভের উপক্রমে একটা নূতন হাঁড়ীতে বর্ধার নূতন জল পূর্ণ করিয়া তাহাতে সপন্নব আশ্রাধা ডুবাইয়া পাঠকের সম্মুখে স্থাপন করা হইল; পাঠক ঠিক জীবন-লাভের সময়ে সেই আশ্রাধার দ্বারা চতুর্দিকে গুলদের উপরে জীবনবারিধরূপে সেই শীতল জল সেচন করিলেন। অনেক

ঘণ্টে করিয়া সেই জল বাড়ীতে ভেলেমেহেদের অস্ত্র লইয়া গেলেন। পদ্মপুরাণ সমাপ্ত হইতে পরদিন অর্থাৎ ১লা ভাদ্র গ্রাম একগ্রামের বেলা হইয়া গেল। সর্বশেষে সকলে আনন্দ-ব্যাপী পাটোংসেবের সমাপ্তিকর হরিধ্বনি করিয়া নানাহারে প্রবৃত্ত হইলেন।

অপরাত্রে মনসার ভাগান। পাঁচ সাত ঘণ্টা খানা-গ্রামের মধ্যবর্তী কোন একটা সুগ্রন্থস্থ স্থান ভাগানের অস্ত্র নির্দিষ্ট আছে। সেখানে সেদিন মোড়ের নৌকা (বাচের নৌকা) সমবেত হইয়া থাকে। ময়ূরপঙ্খী, খোড়া-মুখা, ‘লাখাই’, ‘উপার’, ‘সরগা’ প্রভৃতি বিচিত্র তরলিশ্রেণী সুসজ্জিত হইয়া বাচ্ খেলবার অস্ত্র নাচিয়া নাচিয়া নির্দিষ্ট স্থানে উপস্থিত হইল। যে দেশের পরীক্ষাহিনী বিবৃত হইতেছে, সেখানে এইরূপ নির্দিষ্ট স্থানের নাম ‘খলী’। ‘খলী’তে সেই বাচের নৌকা-গুলি উপস্থিত হইয়া প্রথমে নানাবিধে নানাগতিতে বিচরণ করিতে লাগিল। কোন নৌকার মধ্যস্থলে বা অগ্রভাগে দাঁড়াইয়া একজন বলপ্রধান কর্তৃত্বাল বালাইয়া গান ধরিয়াছে—“বেলা গেল রে শাদ্ বাইবার করে বাড়ী।” অস্ত্র নৌকার আর একজন দীর্ঘকেশ আন্দোলিত করিয়া নাচিয়া নাচিয়া আরম্ভ করিয়াছে—“গদি গোরাক্ষপ্রেমে বোর মন দজিল।” কেহ বা গলা কাঁপাইয়া লক্ষের সঙ্গে হুর ধরিয়াছে—“হুর করিয়া ডাকে বাঈ রাধা কলকিনী।” আর সেই সকল নৌকার দুই পার্শ্বে প্রেণিবদ্ধ মাল্লারা গানের তাগে বৈঠার মণ্ডল নৌকার পার্শ্বে স্পর্শ করাইয়া ঠকাইক্ শব্দের সঙ্গে তাহার প্রতিধ্বনি করিতেছে বা ঠিক্ ঠাক্ বুঝিয়া

‘হা হা হাঃ’ বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিতেছে ।

যাত্রা-সাকীদের লোকসম্ভাও বিচিত্র রকমের । কোন দল লাল পাগড়ী, কোন দল নীল পাগড়ী, কোন দল হরিদ্রাবর্ণ পাগড়ীতে বস্কর বেঠেন করিয়াছে । কোন বড় নৌকা বিশেষ সজ্জার সহিত সজ্জিত হইয়াছে,—ঝাড়-লঠন টাঙ্গান হইয়াছে, তার মধ্যে নৃত্য-গীত-বায়োর তুফান ছুটিয়াছে, আর সেই সম্বোধনীয় তরঙ্গী হেলিয়া চলিয়া ধীরমহুর্গতিতে ইতস্তত বিচরণ করিতেছে । বধূরা, ভাওলিয়া, ‘মৌট্টা,’ ডিঙি প্রভৃতি দলকমণ্ডলীর অগণ্য তরী ছই পার্শ্বের নিরাপন্ন রানে অতি সাবধানে বাধারহিয়াছে ; নিশানে নিশানে ‘পলী’ ছাইয়া ফেলিয়াছে ; নৌকার বাহিরে, ভিতরে, ছাপরের উপরে, কেবল মহুয়ামুণ্ড । কোন কোন সৌখীন বড় লোকের নৌকা ছইতে ঘনঘন বন্দুকের আগুয়াজ ছইতেছে, কোন নৌকার বা ডকা পিটান ছইতেছে । খানার দায়দা সঙ্গী সহ ‘রথ দেখা ও কলা বেচা’ প্রবচনের সার্থকতা সম্পাদন করিতেছেন, টিকরা-ধ্বনি করিয়া সেই ‘লাল-পাগড়ী’র নৌকা চতুর্দিকে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে ।

বলা বাহুল্য, নিকটে মহকুমা থাকিলে এইরূপ ক্ষেত্রে হাকিম, উকীল, মোক্তার প্রভৃতি বধ্যযোগ্য আড়ম্বরে ‘পলীর’ শোভা-বর্ধন করিতে কিছুমাত্র উদাসীনতা প্রকাশ করেন না ।

ক্রমে বেলা শেষ হইয়া আসিতে লাগিল । তখন অস্ত্র আনোব ছাড়িয়া বাচের নৌকার পরস্পরে বাজি ধরিতে আরম্ভ করিল । হুট

নৌকার চারি নৌকার বাজি ধরিয়া সকলেই প্রাণপণে আপন আপন তরঙ্গী বিদ্যুদবেগে চালাইতে লাগিল । তখন নৃত্য, গীত, বাদ্য, সমস্ত বাধিয়া গেল । তরঙ্গিভ্রমীর তীব্র পরিচালনে নদীতে প্রবল তরঙ্গ, সবল-ক্ষিপ্ত, বৈঠার তাড়নে উৎক্লিষ্ট জলরাশি, আর জলপিপ্পু চালকগণের বলদৃষ্ট উজ্জাসপূর্ণ অবাক্রম অট্ট কলরোল তখন উদ্যমে উৎসাহে চতুর্দিক্ আচ্ছন্ন করিয়া কোলিল ! অবিদ্যায় দলে দলে ধোড়ের নৌকা ধড়ের মত ছুটিয়াছে, চালকেরা উন্নতের মত ‘বৈঠা’ চালাইতেছে, কেবল মাঝি এই ভয়ানক তুফানে দ্বির-দ্বির-ভাবে নৌকার গতি ঠিক রাখিতেছে । কেহ জিড়িল, কেহ ছারিল, কোন কোন দল সমান হইল । যাহারা জিড়িয়াছে, তাহারা ফিরিবার সময় নৌকার গলুইটি একখানি রুমাল বা বস্ত্রখণ্ডে আবৃত করিয়াছে,—ইহা ভয়চিহ্ন ! জয়গীল বাহকদের মনে, মুখে, ভরীতে হাসির রাশি । পরাক্রান্তেরা ফ্রিট ক্লয় বিষয় মনে ফিরিতেছে,—আর উপস্থিত অপ-মানের প্রতিশোধের উপায় ভাবিতেছে । এই জয়পরাজয় লটুয়া, চালাইবার গুণদোষ লইয়া, অনেকসময় চাচাকুলের মধ্যে যারায়ারির পালা আরম্ভ হয় ; তবে ‘লাল-পাগড়ী’র ভয়ে সেটা অবশ্য সকল সময় ভেদন অগ্রসর হইতে পারে না ।

ভাসান উপলক্ষেই ‘পলী’ অর্থে বটে, ভাসান কিন্তু প্রায়ই পূর্বাঙ্কে স্ব স্ব গ্রামের নদী বা নিজেদের পুকুরিগীড়ে ছইয়া যায় । অনেক ‘দেবীপ্রতিমা’ সম্বন্ধে গৃহে রাখিয়া দেন । ‘পলী’তে যে কয়খানি প্রতিমা আইসে, সন্ধ্যা হইতে না চতুর্ভুজ তৎসমস্তের ভাসান

হইয়া যায়। সন্ধ্যাপনে ক্রমে সকলে গৃহাভি-
মুখে যাত্রা করেন ।

ভাত্রের প্রথম উৎসব জন্মাষ্টমী । ভাত্রের
কৃষ্ণাষ্টমীতে ঐক্কক রজনীর নিমীষকালে
ঐতৃন্যাবনের মন্যগৃহে যশোদার কোড়-
বেশ আলোকিত করিয়াছিলেন । ‘জন্মা-
ষ্টমী’ সেই ঐক্ককজন্মের উৎসব । নিমীষ-
যাত্রি পর্য্যন্ত অন্ন লোকই জাগিয়া থাকেন ;
সুতরাং জন্মবিষয়ক সঙ্গীতের মাদুরীতে
ভক্তবিশেষেরাই মগ্ন হন । পকামৃত, চরণা-
মৃত এবং নানাবিধ সুখরোচক-প্রসাদসুখাও
কাজেই সকলের ভাগ্যে ঘটয়া উঠে না ।

পরদিন প্রভাতে নারীগণ আসিয়া
যশোদার হান অধিকারপূরক কৃষ্ণগাভের
আনন্দলগ্নীতলহরীতে অতঃপর ককৃত করিয়া
তোলেন । পুরুষসম্প্রদায় খোল-করতাল-
সংযোগে কৃষ্ণ-জন্মানন্দ-বিভোর নন্দের
আনন্দগাথা গাহিয়া মত্ত হইয়া উঠেন ।
নন্দোৎসব শেষে পঞ্চোৎসবে পরিণত হইয়া
যায় এবং সমস্ত পল্লীপথ ও পল্লীনিবাস
উৎসবমত্তসংগের সনৃত্য সঙ্গরণে কল্লিত
হইয়া উঠে ।

রাধাষ্টমী-তালনবন্দীতে তেমন কিছু
উল্লেখযোগ্য ঘটনার কথা মনে হয় না ।
কিন্তু তালের পিঠেকাদি ভাত্রমাসের একটা
প্রধান অঙ্গ । ভাত্রমাসে প্রতি বাড়ীতেই
তালের পিঠেকাদি ভক্তগণের বথেষ্ট উল্লেখ্য
হইয়া থাকে । পরম্পরের নিমন্ত্রণ-আমন্ত্রণও
খুব চলে । এই উপলক্ষ্যে সম্ভ্রান্ত ধনাও
রসনার তৃপ্তিসম্পাদন করিয়া থাকে । একটা
প্রবাদ আছে, ভাত্রে তালভক্ষণ করিলে
সপ্তর্ষি থাকে না । তত্ত্বজটী তালের পারস-

পিঠেকাদি পরিপাক করিতে যিনি অসমর্থ,
তাঁহাকেও কিঞ্চিৎ তালভোগ করিয়া সপ্তর্ষি
বারণ করিতে হয় ।

উল্লিখিত প্রদেশে ভাত্রের শেষদিনে
প্রদেশান্তরের অরক্ষকের পরিবর্তে অগস্ত্য-
মুনির পূজা প্রচলিত । এতি হিন্দুগৃহেই
তাহা হইয়া থাকে ।

এই পূজার, দশ-বার-দিন পূর্বে কাঠের
পিড়ে বা আর কিছুতে কাদার ছোট ছোট
ক্ষেত্র করিয়া তাহাতে ধান, মুগ, অরহর, তিল,
তিদি প্রভৃতি শস্যবীজ ভাগে ভাগে রোপণ
করা হয় । ছইচারি-দিনেই তাহা অমূরিত
হইয়া বাড়িতে থাকে । সেগুলিকে ‘জালা’
কহে । পূজার দিনে সেই বিচিত্র ‘জালা’
কুস্তকারিনির্ভিত অগস্ত্য-শোণামৃত্তার মূল-
মূর্ত্তির চারিদিকে সাজাইয়া দেওয়া হয় ।
নব প্রকারের তরকারি অপর অবতার
পার্শ্বে রক্ষিত থাকে । সম্ভবত এই সকল
ভাহার ভিন্নপ্রস্থানের পণের সম্বল । ফলমূল
সজ্জিত করিয়া ধূপদীপদৈবেদ্য দিয়া মুনি-
দম্পতির অর্চনা করা হয় । অরক্ষন ঐ
দেশে নাই বটে, কিন্তু প্রকৃতপ্রস্তাবে সেই-
দিনকার মধ্যাহ্ন অধিকাংশেরই অগস্ত্য-
প্রসাদভক্ষণে কাটিয়া থাকে । শত্ৰু তাহার
প্রধান অংশ । কেন না, মুনিদম্পতি
নিভাত্তই বৃদ্ধ । সাধারণ ভাষায় সেইজন্যই
এই পূজার নাম ‘বুড়াই-বুড়ীর পূজা’ ।
শাক্সার মালা ও অলঙ্কার ‘বুড়াই-বুড়ী-
পূজা’র বথেষ্ট ব্যবহৃত হইয়া থাকে । তদ্ব-
কারির পার্শ্বেও শাক্সা-শাক্সা শোভা পায় ।

ক্রমে শরতে বেঘনিস্মৃক নবরবির
হির্ভাবার্থ উজ্জল করিতে প্রকৃতির শাস্ত্র অঙ্গ

দীপ্তিসহ হইয়া উঠিয়াছে। কল্কল করিয়া নদী চলিতেছে, শীত-স্বপ্নে বৃহসপতি পৃথিবীতে শাস্ত্রের সমাচার প্রচার করিতেছে, অশে-হলে, গ্রহভারকর, গগনে শব্দে বিকশিত অবিচ্ছিন্ন-উজ্জ্বল শারদশ্রী নয়নে মনে আনন্দধারা ঢালিয়া দিতেছে।

আশ্বিনের আরম্ভেই গ্রানের সখের দল কবির মহলা আরম্ভ করিয়াছে। মাসিক সাহিত্যনা ধার্য্য করিয়া ঢুলী একজনও হাজির হইয়াছে। টাকার অনটনে অত আগে যদি ঢুলী না-ও আসে, খোল বাজাইয়াই মহলায় কাজ চলিয়া যায়।

কবির মধ্যে টপ্পা, গান, কবি প্রকৃতি নানা শ্রেণীবিভাগ, আর তিন কলি, পাচ কলি প্রকৃতি গানের অঙ্গ-বিভাগ আছে। প্রতিদিন বিকালে ও রাতে পূর্ণক পূর্ণক করিয়া সেই বিভিন্ন বিভিন্ন গানের আখড়া চলিতে থাকে। প্রথম হইতেই গানের দল 'মোহাড়া' ও 'খাদ' দুই দলে বিভক্ত করা হয়। মোহাড়ার প্রধান গায়ক বড় বড় আর পাচ-ছয়-জন সূক্ষ্ম গায়ককে লইয়া গান আরম্ভ করেন; আর খাদের দলে বাকি বিশ-পচিশ-তিনিশ জনে দুই-চারি-জন ভাললয়জের অধীনে ঠিক সমনি হুয়ে তাহা পাণ্টাইয়া গায়। পৌরাণিক সূর্য্য-সুৰ্য্য-সমস্ত উপাখ্যানের সৰ্ব্ব লইয়াই কবির গান প্রথিত। মধ্যে মধ্যে অস্ত্রপ্রকারের বিভিন্ন প্রহেলিকাও তাহাতে স্থানলাভ করে। সমস্ত গানের ভিত্তর কতকগুলি 'জিজ্ঞাসা' থাকে। অপর পক্ষ তাহার উত্তর দিতে বাধ্য হয়, না পারিলে সে উত্তর মিথ্যেগ্রাহি সাহিয়া দেয়।

এদিকে বাহাদের বাড়ীতে দুর্গোৎসব, তাহার একটি তৃতদিন দেখাইয়া, বাহার উপর প্রতিমানির্মাণ হইবে, সেই বাণের বা কাঠের 'পাটখানি' প্রস্তুত করাইলেন। আনন্দ বলকবুর সেই শুক কারুহীন 'পাটখানি'র ভিত্তর করনায় কত-কি অনির্বচনীয় সৌন্দর্য্য দেখিয়া চক্ষু জুড়াইতে লাগিল। ঘণাসময়ে একজন সহকারী সঙ্গে প্রতিমানির্মাণে কারিকর আসিল, আর খড়, বাণ, পাট, কাটারী, তাহার কাছে ধরা হইল। তাহার হৃদয়মতে বলকেরা ছোট-বড় সন্মোটা নানারকমের দড়ি পাকাইতে বলিয়া গেল। কারিকর তখন তাম্রকূটের বিশেষ সমাদর করিয়া প্রথমে 'পাটখানি'র উপর বাণ পুতিয়া কাঠামো বাঁধিল, তাহার পর তাহাতে খড় গড়াইয়া প্রতিবার আকার প্রস্তুত করিতে লাগিল। দুই তিন দিনে খড়ের কাজ শেষ হইল। অবনি মাটির ডাক পড়িয়া গেল; তালতাল আঁটাল মাটি বাছিয়া ঠিক করিয়া রাখা হইয়াছে,—সমস্ত কারিকরের কাছে উপস্থিত করা হইল। তখন খড়ের উপরে মাটির প্রতিমা তৈয়ার হইতে লাগিল। ক্রমে একমেটে, একমেটের পর দোমেটে হইয়া গেল। এইরূপে প্রতিমানির্মাণের কার্য্য বতই অগ্রসর হইতে থাকে, সেই উৎসবাকুল আনন্দমগ্নগণীও দিনে দিনে ততই উৎসুক হইয়া উঠে। মাটি শুক না হইলে আর রং দেওয়া চলে না; কাজেই মাঝে দুই-চারি-দিন প্রতিমার কাজ বন্ধ থাকে। সেই বন্ধের সময় শিশুরা বড়ই অধীর হইয়া পড়ে। পারিলে তাহারি বোধ হয় মাটির বল চুবিয়া গিয়া প্রাণোত্তর করিয়া:

তবে নিশ্চিত হইত। সকালে বিকালে শিত্তা প্রতিমার তুচ্ছতা পরীক্ষা করিতে ভোগে না। কাজেই কারিকর বেটা অথবা বিলব করিয়া মিথ্যানিধি। যে তাহাদিগকে অন্যায় কষ্ট দিতেছে, সে বিষয়ে তাহাদের আর কিছুমাত্র সংশয় থাকিতে পারে না। অবশেষে এইরূপ অন্যায় বিলবের পর যে দিন কারিকর রংমগ্না ও তুলিকা সহ ততাসমন করিল, সেই দিন বালক-বালিকার আনন্দসিঁদু বাওঁবিকই উৎফুল্লিত হইয়া উঠিল। সেই উজ্জ্বলিত আনন্দের বেগে কারিকরের কণ্ঠের অতিরিক্ত সহায়তা করিতে গিয়া, কতবার কত বালক আকণ্ঠ ধমক্ তক্ষণ করিয়া দুহুর্ন্তের মধ্যে তাহা নিঃশেষে হজম করিতে লাগিল। ক্রমে কার্ত্তিক-গণেশ-লক্ষ্মী-সরস্বতী-সিংহ-মহিষাসূর-সমেন্ত দুর্গা-প্রতিমা বখাবোগ্য বর্ণে রঞ্জিত হইলেন। চন্দ্রবান অধিক পুঙ্কে হওয়ার বিনি নাই; কাজেই সর্বশেষে চন্দ্রবান হইল। উপরের 'চালে' মধ্যস্থলে শিবমূর্ত্তি অঙ্কিত বা নির্মিত করিয়া চারিদিকে চতুর্নিকুস্তাদির সূচ চিত্রিত হইল। কোন কোন স্থলে প্রাচীন রসিক কারিকর শিবসখী তুতপ্রেতের নামে রল-বিশেষে অশ্লীল চিত্র অঙ্কিত করিয়া রস-জ্ঞানের পরিচয় দিতে লক্ষ্যবোধ করিল না। পূজার পূর্বদিন মধ্যাহ্নেই রঙন-ভোজন শেষ হইয়া পেল। তার পর অপরাহ্নে গ্রামের কৃতকর্মী অনেকে মিলিয়া গাল নীল বস্ত্রে ও নানান্তর ভাঙের পহনায় মনোমত্ত করিয়া প্রতিমা সাঙাইতে আরম্ভ করিলেন, সে সময়ে, প্রতিমার চারিদিকে লোক লোকারণ্য।

পূজাবাড়ী দুই-এক-দিন পূর্ণ হইতেই উৎসবময় হইয়া উঠিয়াছে। আত্মীয়-মহিলা-কুল সাধর নিমন্ত্রণে বালকবালিকা সহ পূজাবাড়ীতে উপস্থিত হইয়াছেন। নিমন্ত্রিত বন্ধুবান্ধবেরা সমাগত। আবার বাহিরের নিমন্ত্রণ না পাইলেও উত্তরণকের অন্তরের আকর্ষণে গ্রামের প্রবাসীরা দূরদূরান্তের প্রবাসভবন হইতে,—কেহ ছুটি পাইয়া, কেহ ছুটি লইয়া,—প্রগ্রামের সহস্রর আশ্রয়ে বন্ধুবর্গের অন্ত্রনিহিত করুণ আস্থানে উপস্থিত হইয়াছেন।

পূজাবাড়ীর কঠা বা কঠাও বশভনের একজন, নিজের বাড়ীর পূজা বলিয়া তাহাদের বিশেষত্ব কিছুই নাই, বশভনেরই উৎসব, বশভনকে লইয়াই উৎসব। অতঃপূরে প্রমথামণ্ডলী পূজাবাড়ীর প্রয়োজনীয় রমণী-জনযোগ্য কার্ধ্যাশ্রয় বেঙ্কাহ, সহাস্যো, সানন্দে, বিনম্রাতি পরিশ্রম করিয়া সম্পন্ন করিতেছেন। আবার কারুকার্যে তাহাদের হাত আছে, তাহারা তাহাদের নিপুণহস্তে পূজার জন্য কতই কারুখচিত উপহার প্রস্তুত করিতেছেন।

পূর্বদিন সন্ধ্যাকালে অধিবাস। সেই সময় হইতেই বাহ্যভাঙের তুলুপদ্রবিন্তে গ্রাম কম্পিত হইতে পাকে। পাড়ার পাড়ার পূজা। প্রতি পাড়ার প্রতি পূজাবাড়ীতে সব-বেত বালকবাল নিজেদের উৎসবকে অধিক-তর গৌরবাযিত করিবার জন্য উৎকণ্ঠিত হইয়া পড়ে। অন্য বিষয়ে বিশেষ অধিকার না থাকায় তাহারা বড়ি কাঁদর, লক্ষ-বটী, ডকা-ঢকার উপরে সময়ে অসময়ে আপনাদের অধিকার সপ্রমাণ করে। সে-

ওগির সমবেত ধনি যে পূজার জাঁক-
সমকের একটা প্রধান অঙ্গ, এ বিশ্বাস
তাহাদের কিছুতেই টলাইতে পারে না।

অধিবাস-রজনীতেই দূরদূরান্তর হইতে
বেত-রক্ত পদ্মরাশি ও বিবর্ণজের সস্তার
উপস্থিত হইতে থাকে; বাড়ীর নাটমন্দিরের
সাজসজ্জা সমাধা হইয়া যায়; স্থানে স্থানে
বিচিত্র পতাকা উড়িতে থাকে।

প্রভাত হইতে না হইতেই পূজার
আয়োজনে সকলে ব্যস্ত। কি অটুট উৎসাহে
রাশি-রাশি পুষ্প-বিবর্ণ ও আর আর
পূজার উপকরণ সংগৃহীত হইল, মণ্ডপ ভরিয়া
নৈবেদ্য সুলভিত হইতে লাগিল, পুরোহিত-
গণ মণ্ডলাদি নির্মাণ করিলেন। কি আন্ত-
রিক অহুসারে সকলে মিলিয়া বগুহের স্নান
এই মহান হোমসময়ের যথাযোগ্য বিচিত্র কর্ণ
অর্চনায় সন্মাহিত করিতে লাগিলেন।
কর্ণকর্তা যথোচিত উপচারে পূজক, তত্ত্ব-
ধারক ও চণ্ডীপাঠকে ভক্তির সহিত বরণ
করিলেন। পূজা আরম্ভ হইল। তত্ত্ববাস্য
পুরোহিতগণের প্রতি সকলে ভক্তি-
ধিনত্ৰ সাধুভাবে পোষণ করিতে লাগি-
লেন। ঢকার নিনাদে, শব্দের শব্দে, বড়ি-
কালরের রোলে, বালকের গোলে, উলু-
ধরিতে, ভক্তবৃন্দের গীতে, সমস্ত পরী-
প্রকৃতি সমাচ্ছন্ন হইয়া উঠিল। ধূপের গন্ধে,
কুসুম-চন্দনের সৌরভে, মশকি আমোদিত
হইল। নববস্ত্রনভিত বালকবালিকাগণ
চারিদিকে দলে দলে আমোদে আচ্ছাদে
নাচিয়া বেড়াইতে লাগিল। পাছে কোন
অঙ্গহানি হয়, এই অশঙ্কায় গৃহবাসী ও
গৃহকণ্ঠীর মূখে সঙ্গ বিনয়বনত একট

বিড়কোমল দীনভাব লাগিয়াই আছে।
কণে কণে উত্তরীষধারী কর্ণকর্তা কৃতাজলি
হইয়া প্রতিমার সম্মুখে দীনভাবে গাড়াইয়া
মনে মনে নিজের শতদ্রুটি ও অপরাধ
জানাইয়া মাঝের চরণে ক্রমাতিকা
করিতেছেন।

পূজা সমাপ্ত হইল। আবার বাধ্যতবে
গগনন্তল বিদীর্ণ হইতে লাগিল, পুরোহিত
মণ্ডপ-প্রাঙ্গণ চণ্ডীপাঠের ধরিতে পূর্ণ করিয়া
তুলিলেন। শুধন পরিমিত শুকনন আয়ীর-
কুটুবে, অগ্রামবাসী বজাতীর নরনারী, দলে
দলে উপস্থিত হইয়া দেবীর চরণে পুষ্পাঞ্জলি
দিতে লাগিলেন। পুরোহিতের উচ্চারিত
খণ্ড খণ্ড শ্লোকের প্রতিধ্বনি পুত্র-
সম্প্রদায়ের বিচিত্রকণ্ঠে ধরিত হইতে
লাগিল। বারম্বার তাহার। এইরূপে
সন্মেন পুষ্প-বিবর্ণের অঞ্জলি প্রতিমার
চরণে বা ঘটে উৎসর্গ করিলেন। অঙ্গনায়
পুরোহিতের ময় ভক্তির সহিত মনে মনে
পাঠ করিয়া পর্দার আড়াল হইতে পুষ্পাঞ্জলি
দান করিতে লাগিলেন। পরে সকলে
গলার বস্ত্র দিয়া ছোড়হাতে মশকুজার
সম্মুখে গাড়াইয়া মনে মনে যথাক্রমে নানা
প্রার্থনা আবৃত্তির পর মাটিতে লুটাইয়া
প্রণাম করিয়া অন্তরিকে প্রদান করিলেন।
তখন ভোজনের—জলযোগের—প্রসাধ-
প্রাপ্তির সার্থক কর্ণ আরম্ভ হইয়া গেল।
কোনখানে নিমন্ত্রিতগণের, কোথাও বা স্ববা-
হুতের পংক্তি জলপানাদিতে বসিয়া গেলেন।
পূজার বিনাবেতনের বেজ্ঞাপ্রবৃত্ত কর্ণ-
চোরীরা মহোৎসবে এই পংক্তিভোজনের তথা-
বধান করিয়া শেষে আপনাদের উদরপুত্র

ব্যবস্থা করিতেও ক্রটি করিলেন না । কর্তৃপক্ষ কতবার আসিয়া কৃতজ্ঞলিপিতে 'এই ভুজ্ঞ আয়োজনেও কোনপ্রকারে ক্ষুণ্ণনিবারণ করিতে হইবে', এই বলিয়া সকলের কাছে আপনায় বিনয়-বৈজ্ঞ জ্ঞানাইতে লাগিলেন । এইরূপে পূজা, পুষ্যজলি, প্রাধনা, আহার, আমোদ, প্রসাধ-বিতরণ ও পুনঃপুনঃ বাস্তবধনিত্তে দিব্য-বসন হইল । তখন সাক্ষাৎ আরতির ঘটা পড়িয়া গেল । চিকের আড়ালে কুলবধূরা সারি দিয়া গাড়াইলেন,—কোমল কামিনী-কণ্ঠের আরতি-গাথায় কাকদীনিকর ধ্বনিত হইয়া উঠিল । বাস্তবতায় দিগন্ত মুখরিত হইল । পুরুষেরা খোল-করতালের সহিত আরতিগান গাহিতে লাগিলেন ; শিশুজলের কলধ্বনিতে আনন্দের লহরী উদ্বেলিত হইতে লাগিল ; প্রবীণা মহিলারা হাত-ঝোক করিয়া তলতলিতে পার্শ্ব গাড়াইলেন । তখন বামহস্তে ঘণ্টা বাজাইয়া পটুবস্ত্রধারী পুরোহিত দীর্ঘকাল ধরিয়া বিচিত্রভঙ্গিতে আরতি করিতে লাগিলেন । আরতিশেষে সকলে প্রসাদী পক্ষপ্রদীপের নির্দোষোদ্ভূত মঙ্গল-লিখায় হস্ত স্পর্শ করাইয়া সেই হস্ত বৃক্ক মাথায় বুলাইতে লাগিলেন । তার পরে চরণ-দ্বিত পান করিয়া প্রণামান্তে পুরুষসম্রাট সজীর্ভনে মত্ত হইলেন । সজীর্ভনসমাপ্তির পর আবার আহারের ধূম লাগিয়া গেল ।

বে বাঙীতে গ্রামের লখের দলের কবি হইবে, সেখানে যথেষ্ট জনতা । লখের দলের সঙ্গে পাশ্চাৎ গাহিবার জন্ত পেশাদার একদল কবির বাহিনী হইয়াছে অথবা অল্প এক লখের দল নিমন্ত্রিত

হইয়া আসিয়াছেন । প্রথম গান কে গাহিবে, তাহার একটা নিয়ম আছে । সে নিয়ম সব ভাগ্যের সমান নহে । যাই হোক, সেই পুরুষপুরুষগণ সনাতন নিয়মের ব্যাবিধি বর্ণ্যাদারকা করিয়া এক দলের ঢুলী ও কাদীওয়ারা আসরে উপস্থিত হইল । দেবী-মূর্তি ও সত্তার প্রতি সেলাম চুকিয়া প্রথমে তাহার চুল, মাথা, হাত, পা, মুখ, নানারকমে নাড়িয়া চাড়িয়া বাহাজুরী দেখাইতে লাগিল । তার পর দৌধীন সারকেতা পরিকার-পরি-জ্ঞের বেশে আগের অবতারণ হইল । তাহার হাতে এক এক খামি কবাল, পায়ে নুপুর, হৃদয় জয়লিঙ্গায় পূর্ণ । তাহার প্রথমে জয়প্রার্থনা জানাইয়া দেবীপ্রতিমার সম্মুখে ভূমিষ্ট হইয়া প্রণাম করিল, তাহার পর বিগুনায় লক্ষ্যবোধ না করিয়া ঢুলীর বাস্ত-সঙ্কেতে বিচিত্ররঙ্গে অঙ্গলকালনপূর্বক নৃত্য করিতে লাগিল । নৃত্যশেষে প্রবীণ দলপ্রধানেরা আসিয়া উপস্থিত হইলেন । তখন সকলে মিলিয়া একটা-কিছু নিম্নরূপ বা সার্বক লক্ষ উচ্চারণ করিল এবং ক্রমে ক্রমে এইরূপে সপ্তমে গলা চড়াইয়া গলাটা শানাইয়া লইল । তখন মোহাডার দল মালুগান আরম্ভ করিলেন । একজন দাতব্যর লোক বই দেখিয়া গানের কথাগুলি খণ্ড খণ্ড করিয়া উচ্চৈঃস্বরে বলিয়া দিতে লাগিলেন, আর বাদ্যের দল তাহার প্রতি-ধ্বনি করিতে লাগিল । এইরূপে মালুগী পরঃপ্রস্তুত গান আরম্ভ হইল,—গান, টাঙ্গা, কবি, সমস্তই যথারীতি পাওয়া হইল ।

প্রতিদলেই একজন 'পাচাগাদার' থাকে, সে সর্বশেষে নানা স্তব-স্ততি-বন্দনাদি গাহিয়া

‘পাচালী’র হৃদযাত করে। দাশরথি রায় প্রকৃতির পাচালীর সহিত এই পাচালীর কিছুমাত্র নান্দ্র্য দেখা যায় না। ইহাতে পাচালীওবালা উপস্থিতমত বিভিন্ন ছন্দে নিবদ্ধ পদ্ম উত্তর-প্রত্যুত্তর ছোট-বড় নানা রাস-রাগিণী ও ছোট-বড় নানাতালে গাহিয়া শ্রোতৃকুলকে একাত্মই মুগ্ধ করিয়া দেয়। পাচালীদ্বারকে ‘দরকার’-নামে অভিহিত করা হয়।

দরকার ‘পাচালী’ শেষ করিলেই দ্বিতীয় বলের ঢুলী ও কানীওয়াল আসিয়া ষ্টিক পুরের মত সমস্ত স্তব্ধতা করে,—সেইরূপ নৃত্য, মাল্লী, টপ্পা, গান, কবি, সমস্তই হইতে থাকে। অধিকতর তাহার পূর্বদলের গানের উত্তর গানে, টপ্পার উত্তর টপ্পার গাহিয়া যায়। পাচালীদ্বারও পৌরচন্দ্রিকা-সমাপনান্তে পাচালীর উত্তর গান করে, আবার নিজেও নূতন প্রবেশ চাপান দেয়। অনেক স্থলে পূর্ণ পাচালীবক্তার প্রশ্ন হইতেই ধারাবাহিক একটা উত্তর-প্রত্যুত্তরের শ্রোত চলিতে থাকে।

ক্রমাগত দুই দল উত্তর-প্রত্যুত্তর গাহিতে লাগিল,—গানের সঙ্গেও নৃত্যের বিয়াই নাই। অশ্রুতপূর্ব অজ্ঞাত গানের প্রস্তোত্তর অপরদলের কোন ক্রমভাঙ্গালী ব্যক্তি তৎক্ষণাৎ মুখে মুখে ঠিক গানের আকারে ‘তিনকলি’ বা ‘পাঁচকলিতে মিলাইয়া বলিয়া বাইতে লাগিলেন, আর গায়কেরা সেই সম্মোহিত গান বলের মত গাহিয়া বাইতে লাগিল; কোথাও ভালমানের একটুও গোল বাধিল না। বস্তুত এ খুড় সহজ শক্তির কথা নয়। পাচালীবক্তা উত্তর-প্রত্যুত্তরের অবস্থা

চিন্তা করিয়া একটা স্বপ্রণীত ধূম্য পরিয়া দেয়, আর বলের লোকেরা দুই পার্শ্বে বলিয়া সেই ধূম্য গাহিতে থাকে। দরকারদি মধ্যে গাড়াইয়া হেলিয়া চলিয়া, হাত নাড়িয়া, কেহ বা বাঁধনের মত লাফাইয়া, অনঙ্গল সেই সকল উত্তর-প্রত্যুত্তর ও অনেক অনাবস্তক রসলাপ ছন্দোবন্ধে গাহিয়া যায়। দরকার পাচালী-বক্তাদের পৌরগিকী অভিজ্ঞতা, বচনরচনা-চাতুরী ও কবির বাস্তবিকই প্রশংসার যোগ্য।

অপর পক্ষের প্রবেশের ঠিক অব্যব না হইলে, বাহাদেব অব্যব ঠিক না হয়, তাহাদের প্রতি প্রতিপক্ষের শাপিত বাক্যবাণ অজস্র পতিত হইতে থাকে। সভাতেও সে দল নিতান্ত লজ্জিত হইয়া পড়ে, কিন্তু তাই বলিয়া তাহার মুখের বাহাদুরী ছাড়ে না বা হাল ছাড়িয়া পালায় না।

সপ্তমীরাত্রির গান প্রভাতেই সমাপ্ত হইয়া যায়; কেন না, তখনই মহাষ্টমীর মহাপূজা,—পুরোহিতগণের মন্ত্রপাঠাদিকালে কোনরূপ গোলযোগ হইতে পারে না। অষ্টমীর সমস্ত বাপারও পূর্বদিনেরই অমুদ্রপ; তবে কতকটা অধিকতর উজ্জ্বল, উৎসাহ, আনন্দ, আড়ম্বরে পূর্ণ। এইদিন অষ্টমী ও নবমীর সন্ধিক্ষণে সন্ধিপূজার নরনারীর দ্বন্দ্ব হইতে যে নাট্যক্ৰিয় নহো-জুস উদ্ভিত হয়, তাহার আর তুলনা নাই!

অষ্টমীরাত্রির গানও প্রভাতেই নিবৃত্ত হইয়া যায়। মহানবমীপূজার তখন মহা আড়ম্বর। মহানবমীর মহামহোৎসবময়ী রজনীর আরক কবিগান কিন্তু দশমীর প্রভাতে নিবৃত্ত হয় না। সেদিন পূজা

অন্ন-বস, চণ্ডীপাঠের ঘণ্টা বা মন্ত্রের তেমন আভাষ নাই। কাহ্নেই সে দিন সন্ধ্যের দল সন্ধ্যা মিটাইয়া—কঠোর কণ্ঠধ্বন বধেই দূর করিয়া, প্রায় আড়াই-প্রহর বেলায় গান সমাপ্ত করেন। উত্তর দলের মধ্যে সপ্তমী-অষ্টমীর সজ্জিত বিবাদের বিষ সেইদিন সম্পূর্ণরূপে উৎপ্লবিত হইয়া উঠে; পুরাণের উপাখ্যান সেদিন ক্রমশ অস্তিত্ব পালাপালিতে পরিণত হয়। অনেক সময় সেই উন্নত কবির লড়াই এতটা জ্বলন্ত নীচ কলহের ভাষায় অগ্রসর হয় যে, অষ্ট-পুরের চিকের অন্তরাগ-বস্ত্রী মহিলাপ্রোহকুল বাগা হইয়া বানভাগ পূর্বক পলায়ন করেন। বিশেষ ভ্রম সভাকে তখন অগত্য। উত্তরদলের বিবাদমীমাংসা করিয়া দিতে হয়। এই বিবাদমীমাংসাতেই গানের শেষ। ইতরশ্রেণীর লোক পালাপালির পটুতা-অপটুতা লইয়াই অন্ন-পর্যায়ের নির্ধারণ করিয়া থাকে। বলা বাহুল্য, তিনদিনের স্নানজাগরণ ও চীৎকারে পায়কমলের বান্ধ এত প্রবল হইয়া পড়ে যে, সেই চীৎকারভর বিকৃত কণ্ঠে মহাকণ্ঠে গান করিয়াও তাহাদের সন্ধ্যা আর বেটে না। সাধুর্বা, দ্বাধ্য ও শিষ্টাচার সেইটার তাহাদের নিকট হইতে বেন বহুদূরে সরিয়া যায়।

অপরায়ের ভাসান। ভাসানের নামে সকলের প্রাণই নিত্য কাতর-ক্লিষ্ট হইয়া পড়ে। গৃহলক্ষ্মীরা তখন বিভিন্ন বাসাজীবন পরিগ্রহন করিয়া ধাতুদ্রব্যাদি লইয়া মায়ের বিদায়সজ্জাবণ করিতে উপস্থিত হন। বিদায়-কালে তাঁহারা কত করুণভাবে সাশ্রনয়নে মেনকার মত একবার মাতৃস্নেহ প্রকাশ করেন, আবার কতবার মত—দীনদীন দানীর

মত কত করুণ দীনতা—কত কাতরপ্রার্থনা জানাইয়া শত ক্লিষ্ট-প্রগতি মহাকারে সকল দেবদেবীর সহিত পরিতনদিনীর বিদায়বন্দনা করেন।

যখন দেবীপ্রতিমা মণ্ডপ হইতে বাহিরে আনীত হইলেন, তখন বিদায়কাণীন আরতির বাজ্রভাও ও কীর্তনের ধ্বনির সঙ্গে ধূপদ্বারার স্রবাস চতুর্দিকে বিস্তৃত হইয়া পড়িল। সে বাধ্যধ্বনি, সে কীর্তনের স্নানিধী, সে ধূপের সোণক, সকলের প্রাণে কি-এক করুণ আকুলতা আগাহিয়া তুলিল। অবশেষে দেবীপ্রতিমা বহুকের স্বরে ‘ধনী’, নদী বা পুষ্করিণীতে নাত হইতে লাগিলেন। শতশত বাগক, দ্বাধ্য, প্রৌঢ়, বৃদ্ধ সঙ্গে চলিল, কীর্তন করিতে করিতে কীর্তনসম্ভারও সঙ্গ লইলেন। তাহার পর সকলে যথাস্থানে উপস্থিত হইলে, শত লোকের সম্মল করুণদৃষ্টির সমুদ্রে গভীর জলে দেবীপ্রতিমার বিশুদ্ধন হইল। তখন মর্মান্বিত অশ্রুচরমণ কাতরভাবে গান ধরিলেন—“ছেড়ে বেতে বিদায়ের পরাণ গো অভয়া। মারে ভাগারে জলে কি লয়ে বকিষ বনে, ছেড়ে বেতে বিদায়ের পরাণ গো অভয়া।” বাস্তবিকই তখন জানদীন-নরনারীর প্রাণ বেন বিদীর্ণ হইতে থাকে। শূন্য প্রাণ, শাল্য নরন লইয়া সকলে ফিরিয়া আসিয়া যখন শূন্যমণ্ডপের দিকে দৃষ্টিপাত করেন, তখন তাঁহাদের দেহবন্ধনগুলি বেন শিথিল হইয়া পড়ে,—বধাধই অন্তরে বাহিরে তখন একটা ব্যাকুল বিরহকাতরতা পরিদ্রুট হইয়া উঠে।

সেই চাপের অরুকারে পুরোহিত

প্রশস্তিবন্ধন করিয়া সকলের মস্তকে শান্তিঙ্গল সেচন করিলেন, আর সকলে তন্ত্রির সহিত ঠাহার আশীর্বাদ মস্তকে করিয়া, একে একে তুলুঠিত হইয়া ঠাহাকে প্রণাম করিতে লাগিলেন। তৎপরে বিজয়ার সম্ভাষণ, আলিঙ্গন, আশীর্বাদ, অভিবাদন আরম্ভ হইল। সেই ক্রিষ্ট-কাতর অন্তঃকরণ লইয়া পরস্পরের এই সাদর-সম্ভাষণ সমবেদনার পরিচয় দিল এবং যথার্থই মিষ্টকথার, মিষ্ট-মুখ করিয়া, পরস্পর পরস্পরের হৃদয়ভার লঘু করিয়া দিলেন। সেই আকুলতার মিনে শক্রমিত্রের প্রভেদ লোপ পাইল। বিজয়ার বিজয়নিশানের নিয়মেণে গাড়াইয়া মিত্রে মিত্রে—শক্রতে শক্রতে,

বাগকে বাগকে—বাগকে বুকে, তরুণে তরুণে—তরুণে বুকে, বুকে বুকে—বুকে বাগকে, ইতরে ভিত্রে—ব্রাহ্মণে শূদ্রে, অকপট সাদরসম্ভাষণ—আশীর্বাদ-অভিবাদনের বিনিময় এবং আলিঙ্গন-আপ্যায়ন চলিতে থাকিল। বালিকা-ভরুণী, প্রৌঢ়া-বৃদ্ধার পরস্পরের প্রেম-বিনিময়ে বিজয়ার দ্বিত্যোচ্ছল পৌরব সকলের চিত্তে জাগ্রত হইয়া উঠিল। সম্পর্কের মর্যাদার রক্ষা করিয়া আত্মীয় মহিলাকূলের সহিত আত্মীয় পুরুষসম্প্রদায়ের সম্ভাষণবিনিময়েও বিজয়ার কোমলমাধুর্য্য বিকশিত হইতে লাগিল।
বাংলার শারদোৎসব একদিন এমনই আন্তরিকতাময়, এমনই মহিমাখিত, এমনই মাধুর্য্যবর্ষী ছিল !

শ্রীশিবধন বিভাগ্যব ।

বশীকরণ ।

(সংক্ষিপ্ত নাট্য)

প্রথম অঙ্ক ।

আগু ও অন্নদা ।

আগু । আচ্ছা অন্নদা, তুমি বেন ব্রাহ্মই হয়েছিলে, কিন্তু তাই বলে শ্রী-পরিভাগ করতে গেলে কেন ? শ্রী ত তেত্রিশ কোটির মধ্যে একটিও নয় ! ঐটুকু পৌত্তলিকতা—রাশুলেও ক্ষতি ছিল না।

অন্নদা । সে ত ঠিক কথা। শ্রী-পরিভাগ করা যায়, কিন্তু শ্রীজাতি ও বিদ্যার হন না,—শ্রীকে ছাড়লে শ্রীজাতি বিস্তারানী হয়ে দেখা দেন—শ্রীপূজার মূর্ত্তা মনে মনে বেড়ে ওঠে।

আগু । তবে ?

অন্নদা । তবে শোন। আমার শাড়ি

ছিলেন না, শব্দের ভাষ্যের হিন্দু ছিলেন।
যখন তুঙ্গেন আমি ত্রাণ হইছি, আমার
ত্রীকে বিধবার বেশ পরিয়ে ব্রহ্মচারিণী কোরে
কান্নিতে গিয়ে বাস করলেন। তার পরে
তুঙ্গি হিন্দুশাস্ত্রের সমস্ত বেবতাত্তেও তৃপ্তি
হয় নি, তার উপরে অলুকাট, দ্বাতটুকি,
আনি বেদান্ত, হুঙ্গলরী, মহায়া, দ্রাব-
টে, কৃতশ্রেষ্ঠ, কিছুই বাস যায় নি—

আত। কেবল তুমি ছাড়া।

অন্নদা। আমাকে ব্রহ্মধৈর্যতা বলে বাস
দিলে।

আত। তুমি তার আশা একেবারে
ছেড়ে দিবেছ ?

অন্নদা। আশার অপরাধ নেই—তার
পক্ষান্তে এত বড় রেঞ্জিমেন্ট লেগেছে, সে
আর টিকল না! ভ্রমেন্তি আমার শব্দের
মাত্রা পেছেন, এবং আমার ত্রী এখন পতিত
উদ্ধার কোরে বেড়াচ্ছেন।

আত। তুমি একবার চরণে পতিত
হওগে না, যদি উদ্ধার করেন !

অন্নদা। ঠিকানাও জানিনে, প্রবৃত্তিও
নেই।

আত। তুমি কি এইরকম উড়ে উড়ে
বেড়াবে ?

অন্নদা। না হে, সোনার খাঁচার সন্ধান
আছি।

আত। খাঁচাওয়ালার অভাব নেই, তবে
সোনা-জিনিষটা দুর্লভ বটে !

অন্নদা। আচ্ছা, আমার আলোচনা
পরে হবে, কিন্তু তোমার কি বল দেখি ?
তোমার স্ত্রী আইবড়লোক প্রাপ্তির বিধান
কোন দায়েই লেখে না। তার বেলা চূপ !

বিওসকিন্তে তোমাকে খেলে ! মন্ততত্ত,
আপাখান, হঠাৎ, হুতুয়া-ইড়া-পিন্ধা, এ
সমস্তই তোমাকে ছাড়, যদি বিবাহ কর !

আত। তুমি মনে কর, আমি সবই
অন্ধভাবে বিশ্বাস করি—তা নয়। এ সমস্ত
বিশ্বাসের যোগ্য কি না, তাই আমি পরীক্ষা
কোরে দেখতে চাই ! অবিশ্বাসকেও ত
প্রমাণের উপর স্থাপন করতে হবে।

অন্নদা। বসে বসে তাই কর ! মরী-
চিকা-স্থাপনের জন্যে পাথরের তিত্তি গাঁথ।
আমি এখন চলেম।

আত। কোথায় যাক ?

অন্নদা। সবসাধনার নয়।

আত। তা ত জানি।

অন্নদা। একটু সজীবের সন্ধান
পেরেছি।

আত। তবে যাও ! শুভকাণ্ডে বাধা
দেব না !

দ্বিতীয় অঙ্ক।

বাড়ীওয়ালার ও তাহার ত্রী।

ত্রী। মাতালি যদি হবে, তবে অমন
চেহারা কেন ?

বাড়ীওয়ালার। দেখতে শুনে তাড়কা-
রাকসীর মত না হ'লেই বৃত্তি আর মাতালি
হয় না !

ত্রী। হবে না কেন ! কিন্তু তা হ'লে
কি এই সমর্থবয়সে মামীর ঘরে না থেকে
তোমার মত বোকা ভোলাবার জন্যে
মাতালি-গিরি করতে পেরত ? তা হ'লে কি

পিতাজি তোমার মাতাজিকে ভাঙুত ? আর
এত টাকাই বা পেলে কোথায় ?

বাড়ীওয়াল। ওগো, ব্যাঃ যোগবিদ্যা
আবে, তাদের যদি টাকা না হবে—চেহারা
না হবে, তবে কি তোমার হবে ? রোগ
না,—ওর কাছে মস্তরটন্তরগুলো শিখে
নেওয়া বাক্ না।

স্রী। বুড়োবয়সে মস্তর শিখে হবে কি
তিনি ! কাকে বশ করবে ?

বাড়ীওয়াল। থাকে কিছুতেই বশ
মানাতে পারলেম না !

স্রী। তিনি কে ?

বাড়ীওয়াল। আগে বশ মানাই, তার
পরে সাহস কোরে নাম বলব !

মাতাজির প্রবেশ ।

মাতাজি। এ বাড়ীতে আমার থাকার
সুবিধা হচ্ছে না। এর চেয়ে বড় বাড়ী
আমাকে দিতে হবে।

বাড়ীওয়াল। এ বাড়ী ভাড়া আমার
আর একটিনার বড় বাড়ী আছে। সেটা
বড় বটে, কিন্তু—

মাতাজি। তা ভাড়া বেশি ধেব, কিন্তু
সেই বাড়ীতেই আমি কাল বেতে চাই।

বাড়ীওয়াল। তবে পত্তদিন সেখানে
একটি ভাড়াটে এসেছে। একটি কোন্
সম্রাজ্যলার বিধবা স্রী,—পশ্চিম থেকে
যেহের জন্যে পাত্র খুঁজতে এসে আমার সেই
উনপকাশ নব্বের বাড়ীতে উঠেছে।

মাতাজি। উনপকাশ নব্বর ! ঠিক
আমি যা চাই ! তোমার এ বাড়ীর নব্বর
ভাল নয় :

বাড়ীওয়াল। বাইশ নব্বর ভাল নয়
মাতাজি ? কারণটা কি বুঝিয়ে বলুন।

মাতাজি। বুঝতে পারচ না—হুয়ের
পিঠে দুই—

বাড়ীওয়াল। ঠিক বলেছেন মাতাজি,
হুয়ের পিঠে দুইই ত বটে ! এতদিন ওটা
তাবি নি !

মাতাজি। হুইয়েতে কিছু শেষ হয় না,
তিন চাই। দেখ না, আমরা কথার বলি, হু
তিন জন—

বাড়ীওয়াল। ঠিক ঠিক, তা ত বলেই
থাকি।

মাতাজি। যদি দুই বলেই চুকে যেত,
তা হ'লে তার সঙ্গে আবার তিন বলব কেন ?
বুঝে দেখ !

বাড়ীওয়াল। আনাদের কি বা বুদ্ধি,
তাই বুঝ ! সবই ত জানুহুম, তবু ত
বুঝিনি !

মাতাজি। তাই, ঐ হুইয়ের পিঠে দুই
বলেই আমার মস্ত কিছুই সকল হচ্ছে না !

স্রী। (আশ্চর্য) বেচে থাক্ আমার
হুইয়ের পিঠে দুই ! মস্ত সকল হ'য়ে কাজ দেই !

মাতাজি। উনপকাশের মত এমন সংখ্যা
আর হয় না !

বাড়ীওয়াল। (জনান্তিকে) শুনলে ত
গিরি !

স্রী। (জনান্তিকে) শুনে হবে কি !
তোমার উনপকাশ যে অনেককাল হ'ল
পেরিয়েছে !

বাড়ীওয়াল। কিন্তু মাতাজিকে কি
কালই সে বাড়ীতে দেতে হবে ?

মাতাজি। কাল উনত্রিশে তারিখে

মঙ্গলবার পড়েছে। এমন দিন আর পাওয়া যাবে না !

বাড়ীওয়াল। ঠিক কথা ! কাল উনত্রিশেও বটে, আবার মঙ্গলবারও বটে ! কি আশ্চর্য ! তা হ'লে ত কালই বেতে হচ্ছে বটে ! তা-ই ঠিক কোরে দেব ! (মাতাজির প্রস্থান) এখন আমার সেই নতুন জাক্টোমেয় ওঠাই কি বোলে ? বিদেশ থেকে এসেছে, হঠাৎ তারা এখন বাড়ীই বা পার কোথায় ?

স্ত্রী। তাদের আপাতত এই বাড়ীতে এনেই রাখ না ! আমরা না হয় কিছুদিন জামাপুকুরে জামাইবাড়ী গিয়েই থাকব ! তোমার ঐ মস্তুর-ভানা মেয়েমাল্লুকে এখানে রেখে কাজ নেই ! বিদায় কোরে যাও ! ছেলেপিলের ঘর, তাক কখন অপ-রাধ হয়, বলা যায় কি !

বাড়ীওয়াল। সেই ভাল। তাদের কোন-রকম কোরে ভুলিয়ে-ভালিয়ে আজকের মধ্যেই উনপকাশ নব্বর থেকে বাইশ নব্বরে এনে ফেলা যাক্ । বলি গে, পাড়ায় প্লেন দেখা দিয়েছে, উনপকাশ নব্বরে প্লেন-হাঁদ্যাভাল বসবে !

তৃতীয় অঙ্ক ।

আশু ও অন্নদা ।

অন্নদা। তোমার ঐ টাটকা-লকার ধোঁয়ার নাকের জলে চোখের জলে করলে যে বে ! তোমার ঘরে আগা ছাড়তে হল !

আশু। টাটকা লকার ধোঁয়া তুমি কোথায় পেলে ?

অন্নদা। ঐ যে তোমার তর্কালঙ্কারের বহুনি ! শোকটা ত বিস্তর টিকি নাড়লে, মাথামুত্ৰ কিছু পেলো কি ?

আশু। মাথামুত্ৰ নইলে শুধুটুকি নড়বে কোথায় ? কথাগুলো যদি শ্রদ্ধা কোরে শুনতে, তবে বুঝতে।

অন্নদা। যদি বুঝতেম, তবে শ্রদ্ধা কন-তেম ! তুমি আশু ফিজিকাল সাহায়ে এম্, এ, দিবে এলে—তুমি যে এত ঘনঘন টিকি-নাড়া বরদাস্ত করচ, এ যদি দেখতে পায়, তবে প্রেসিডেন্সি কলেজের চূণকামকরা দেয়ালগুলো বিনি খরচে লজ্জার লাগ হোয়ে ওঠে। আজ কণাটা কি হ'ল বুঝিয়ে বল দেখি !

আশু। পশ্চিমশস্য পরিগণনতর বাণ্য্য করছিলেন।

অন্নদা। তবুটা আনার জন্যে খুব দর-কার হোয়ে পড়েছে। তর্কালঙ্কারমশায় বলছিলেন, বিবাহের পূর্বে কন্যার সঙ্গে জানাশুনার চেষ্টা না করাই কর্তব্য। সুক্তিটা কি দিছিলেন, ভাল বোঝা গেল না।

আশু। তিনি বলছিলেন, সঞ্চল জিনিবের আরম্ভের মধ্যে একটা গোপনতা আছে। বীজ হাতির নীচে অঙ্ককারের মধ্যে থাকে, তার পরে অঙ্কুরিত হ'লে তখন হৃদ্য-চন্দ্র-জল-বাতাসের সঙ্গে সুখোমুখি লড়াই করবার সময় আসে। বিবাহের পূর্বে কন্যার চরমকে বিলাতী অঙ্কুরণে বাইরে টানাটানি না কোরে তাকে আঙ্গুর আবৃত রাখাই কর্তব্য। তখন তার উপরে তাড়া-তাড়ি স্ট্রীক্‌সেপ করতে যোয়া না। সে যখন স্বভাবতই নিজে অঙ্কুরিত হোয়ে তার অঙ্ক-

মুহুরিত সলফ দৃষ্টিটুকু গোপনে তোমার
খিকে অগ্রসর করতে থাকবে, তখন
তোমার অবসর।

অন্নদা। আমার অদৃষ্টে সে পরীক্ষা ত
হ'য়ে গেছে। বিলাতী প্রথামতে বিবাহের
পূর্বে কন্যার ছবর নিয়ে টানাহেঁচুড়া
করিনি;—ছবরটা এত অকস্মিকের মধ্যে
ছিল যে, আমি তার কোন খোঁজ পাইনি,
তার পরে অত্মরিত হ'ল কি না হ'ল, তারো ত
কোন ঠিকানা পেলেন না। এবারে উন্টো-
রকম পরীক্ষা করতে চলেছি, এবার আগে
ছবর, তার পরে অন্য কথা!

আণ্ড। পরীক্ষার দিন কবে?

অন্নদা। কাল।

আণ্ড। স্থান?

অন্নদা। উনপকান নগর রায় বৈরাগীর
গলি।

আণ্ড। নগরটা ত ভাল শোনাত্তে
না!

অন্নদা। কেন? উনপকান বায়ুর
কথা ভাব্চ? সে আমাকে টলাতে পারবে
না—ভূমি হলে বিপদ ঘটত।

আণ্ড। পাত্র?

অন্নদা। কস্তুর বিধবা মা তাকে
পশ্চিম থেকে সঙ্গে করে এনেছে। আমি
ঘটককে বলে রেখেছি যে, ভাল কোরে
যেয়েটির সঙ্গে পরিচয় কোরে নিয়ে তবে
বিবাহের কথা হবে।

আণ্ড। কিন্তু অন্নদা, শেষকালে সন্ত-
বিবাহে প্রবৃত্ত হলে!

অন্নদা। তোমাদের সন্ত আমি নাম
মেখে ভড়কাই নে। যে বড়বিবাহের মধ্যে

আর সমস্ত আছে, কেবল বহুকুই নেই,
তাকে মেখে চড়কাও কেন ভাই!

আণ্ড। তবু একটা প্রিন্সিপল আছে
ত—বহবিবাহকে বহবিবাহ বলতেই হবে।

অন্নদা। আমার নামমাত্র স্ত্রী বোঝানে
আছে, প্রিন্সিপলও সেইখানে আছে। সে
স্ত্রীও আস্তে না, প্রিন্সিপলও বইল—অত-
এব এখন আমি ডকা ঘেরে বহবিবাহ করব,
প্রিন্সিপল-জুজুকে ডরাব না!

রাধাচরণের প্রবেশ।

রাধা। আণ্ডাবু!

আণ্ড। কি হে রাধে!

রাধা। সেদিন আপনি আমার সঙ্গে
ময় নিয়ে তর্ক করলেন এক একটা শব্দের
যে এককপ্রকার বিশেষ ক্ষমতা আছে,
আমার বোধ হল আপনি যেন তা সম্পূর্ণ
বিশ্বাস করেন না।

অন্নদা। বল কি রাধে—তা হলে আণ্ডার
অবিশ্বাস করবার ক্ষমতা এখনো সম্পূর্ণ
লোপ হয় নি—এখনো দুটো একটা আঁহগার
ঠেক্চে! শব্দের মধ্যে শক্তি আছে, এ কথা
বাঙালীর ছেলে বিশ্বাস কর না।

রাধা। বলুন ত অন্নদাবাবু! তা হ'লে
যারণ, উচাটন, বশীকরণ, এগুলো কি
বেবাক্ গাঁজাপুরি!

অন্নদা। তাও কি কখনো হয়? সংসারে
কি এত গাঁজার চাষ হতে পারে!

রাধা। পশ্চিম থেকে একজন যোগ-
সিদ্ধ মাতাজি এসেছেন, শুনেছি তিনি মস্তের
বল একেবারে প্রত্যাক দেখিয়ে দিতে পারেন।
মেখেই মিরেতিলেন, কিন্তু সকলকে তিনি

যেখা দেন না; বল্লেচেন, যোগ্য লোক
পেলে তাকে তিনি তাঁর সমস্ত বিদ্যা দেখিয়ে
যেবেন। আশ্চর্য্য, আপনি চেষ্টা করলে
নিশ্চয় বিফল হবেন না।

আত্ম। তিনি থাকেন কোথায়?

রাধা। বাইশনম্বর ভেড়াডলার।

অন্নদা। বাইশনম্বরটা উন্নপকাশের
চেয়ে ভাল হ'তে পারে, কিন্তু জায়গাটা ভাল
ঠেকে নে! একে বশীকরণ-বিদ্যা, তার
উপরে ভেড়াডলার! মাস্তাখির কাছে দুটুকুটি
খুইয়ে এসে না!

আত্ম। আরেছি! কি বকো, তার ঠিক
নেই! তাঁরা হলেন সাধু স্ত্রীলোক, সেখানে
দুপুর ভাবনা ভাবতে হয় না। তুমি বুঝে-
সুঝে উন্নপকাশে পা বাড়িয়ে।

অন্নদা। তুমি ভাবচ বাইশ একেবারেই
নির্বিধি! তা নয় হে! বিশেষ উপরেও ছুই-
মাথা চড়িয়ে তবে বাইশ! আপাদমস্তক
জরুর হয়ে ফিরবে!

চতুর্থ অঙ্ক।

বাইশ নম্বরে কস্তার বিধবা মাতা।

শ্রামাস্ত্রন্দরী।

শ্যামা। পেলেগু শুনে ভরে বাচিলে!
ভাড়াভাড়ি কোরে পালিয়ে ত এলুম! কিন্তু
অন্নদা বোলে ছেলেটির আজ যে সেই উন্ন-
পকাশ নগরে আসবার কথা আছে, সে কি
সেখান থেকে চিনে এখানে ঠিক আসতে
পারবে? এত কোরে পাওয়াদাওয়ার

ভোগাড়ি করলেম, সব মাটি হবে না ত?
যে ভাড়াটা লাগালে, একবার খবর
সেবার সমস্ত মিলে না! বটক বলেছে,
ছেলেটি আমার নিরুপমাকে ভাল কোরে
মেখে-শুনে নিতে চায়, এর পড়াশুনো
গানবাজনা সব পরীক্ষা করবে—তা করুক!
কর্তী ত নিরুপমাকে সেই বকম কোরেই
শিখিয়েচেন! বরাবর পশ্চিমে ছিলেন, আমা-
দের কখনো ত বন্ধ কোরে রাখেন নি! তবু
কল্কাতার ছেলে কিন্তুকম জানিলে!
ভয় হয়! আমাদের ধরনধারণ মেখে হয় ত
অভ্যস্ত মনে করবে! তাবা মেয়েদের সঙ্গে
শেক্ষাও করে না কি, কে জানে! হয় ত
ইংরাজিতে গুডমনিং বলে। শুনেচি তাদের
নিজের হাতে চুরট আলিয়ে দিতে হয়—এ
সব ত পারব না! বটক বলে, ছেলেটি ছোট-
কোট পরে! আমার মেয়ে আবার ফিরিজির
সাজ হ'লকে দেখতে পারে না! কি বকম
বে হবে, বুঝতে পারচি নে! মস্ত পড়ে' বিয়ে
করতে রাজি হবে ত?

ভূত্যের প্রবেশ।

ভূতা। মা ঠাকরণ, একটি বাবু এসে-
ছেন। আমি তাঁকে বল্লেন, বাড়ীতে পুরুষ-
মাহুষ কেউ নেই। তিনি বল্লেন, তিনি মায়
সঙ্গেই দেখা করতে এসেছেন।

শ্যামা। তবে ঠিক হয়েছে। সেই
ছেলেটি এসেছে। ডেকে নিয়ে আর।
(ভূত্যের প্রস্থান) ভয় হচ্ছে—কল্কাতার
ছেলে, তার সঙ্গে কি রকম কোরে চলতে
হবে! কি জানোছারই মনে করলে!

আন্তর প্রবেশ ।

(শ্যামাভূষারীর পায়েৰ কাছে একটি সিনি
রাখিয়া আন্তর তুলিষ্ট হইয়া প্রণাম)

শ্যামা । (বপত) এ যে প্রণামী বিরে
প্রণাম কর্লে গো ! এ ত শেক্ষ্যাও করে
না ! বাচলে ! লক্ষী চেলে ! কেমন ধুতি-
চামর পরে এসেছে !

আন্ত । মাতাজি, আমাকে যে আপনি
দর্শন দিবেন, এ আমি আশা করিনি !
বড় অহুগ্রহ করেচেন !

শ্যামা । (সবেহে সপুলকে) কেন
বাবা, তুমি আমার চেলের মত, তোমাকে
দেখা দিতে দোষ কি !

আন্ত । দেহ রূপেবন । আশীর্বাদ
করবেন, এই অহুগ্রহ পেকে কখনো বকিত
না হই !

শ্যামা । বাবা, তোমার কথা শুনে
আমার কান জুড়ালো—আমি নিশ্চয়
অনেক তপস্তা করেছিলেম, তাই—

আন্ত । মাতাজি, আপনি তপস্তার
দ্বারা যে নিকৃপমা-সম্পদ লাভ করেচেন,
আমাকে তার—

শ্যামা । তোমাকে দেবার অজ্ঞেই ত
প্রস্তত হয়ে এসেছি । অনেক সন্ধান কোরে
যোগপাত্র পেয়েছি—এখন বিতে পার্শ্বেই
ত নিশ্চিত হই ।

আন্ত । (শ্যামার পদধূলি লইয়া)
মাতাজি, আমাকে কৃতার্থ করলেন—এত
সহজেই যে ফলপ্রাপ্ত কর্ণ, এ আমি স্বপ্নেও
জানুতন না ।

শ্যামা । বল কি বাবা, তোমার আশ্রয়
যত, আমার আশ্রয় তার চেয়ে বেশি !

আন্ত । তা হ'লে যে কামনা কোরে
এসেছিলেম, আজ কি তার কিছু পরিচয়—

শ্যামা । পরিচয় হবে বৈ কি বাবা,
আমার তাতে কোন আপত্তি নেই—

আন্ত । আপত্তি নেই মাতাজি ?
তবে বড় আশ্রয় পেলেম—

শ্যামা । দেখাওনা সমগ্রই হবে বাবা,
আগে কিছু খেয়ে নাও !

আন্ত । আবার খাওয়া ! আপনি
আমাকে যথার্থ জননীর মতই দেখ
দেখালেন !

শ্যামা । তুমিও আমাকে মায় মতই
দেখবে, এই আমার প্রাণের ইচ্ছা—আমার
ত ছেলে নেই, তুমিই আমার ছেলের মত
পাকবে ।

আহার্য লইয়া ভৃত্যের প্রবেশ ।

আন্ত । করেচেন কি ? এত আরোজন ?

শ্যামা । আরোজন আর কি কর্লেম ?
আজই ত্রিক আস্তে পার্শ্বে কি না, মনে
একটু সন্দেহ ছিল, তাই

আন্ত । সন্দেহ ছিল ? আপনি কি
জানুতেন, আমি আসব ?

শ্যামা । তা জানুতেন বৈ কি ।

আন্ত । (আশ্চর্য) কি আশ্চর্য !
আমাকে না কেনেই আমার জীতে পূর্ক
হতেই অপেক্ষা করছিলেন ? তবু অন্নদা
যোগবলে বিশ্বাস করে না ! তাকে বলে
বোধ হয় ঠাট্টা করেই উড়িয়ে দেবে !
(আহায়ে প্রবৃত্ত)

ভ্রামা। আশ্বগত ছেলেটি শোনার টুকরো! যেমন কাঠিকের মত দেখতে, তেমনি মধুঢালা কথা! আমাকে প্রথম থেকেই মাতাজি বলে ডাক্তে। পশ্চিম থেকে এসেছে কি না, তাই বোধ হয় মা না বলে' মাতাজি বলতে (প্রকৃত্তে) কিছুই খেলে না যে বাবা?

আশু। আমার যা লাগা, তার চেয়ে বরক বেশিই খেয়েছি মাতাজি।

ভ্রামা। তা হ'লে একটু বোস—আমি ভেঙে নিয়ে আসি। (প্রস্থান)

আশু। রাখে বলেছিল বটে, মাতাজি কুমারী কস্তার দ্বারা মস্তুর ফল দেখিয়ে থাকেন। বশীকরণ-বিদ্যার আমার একটু বিশ্বাস জন্মাতো। এর মধ্যে মাতাজির মাতৃদেহে আমার চিত্ত কেনমন যেন আঁশ হয়ে এসেছে। আমার মা নেই, মনে হচ্ছে যেন মাকে পেলেম! এ কোন্ মন্ত্রবলে কে জানে! মাতাজি মিথ দৃষ্টি দ্বারা আমার সমস্ত শরীর যেন অভিযুক্ত কোরে বিরোধে। প্রথম দেখাতেই উনি যে আমাকে তাঁর পুত্রদ্বানীর করে নিয়েছেন, এ যেন পূর্বজন্মের একটা সখ্যের স্মৃতি।

নিরুপমাকে লইয়া স্ত্রামার প্রবেশ।

আশু। (স্বগত) আহা কি সুন্দর! মাতাজির বশীকরণ-বিদ্যা যেন স্মৃতিসত্য। এ'র সুখে কৈন মরই বিরুল হতে পারেন না।

ভ্রামা। বাও, লজ্জা কোরো না মা! উনি যা দ্বিজ্ঞান করেন, উত্তর দিও।

আশু। লজ্জা করবেন না! মাতাজি আমার প্রতি যে-রক্তন অঙ্গপ্রহ প্রকাশ

করেছেন, আপনিও আমাকে আপনার লোকের মতই দেখবেন। (আশ্বগত) যেহেতু কি লাঙ্ক! আমার কথা শুনে আত্মা যেন লাগ হয়ে উঠল।

ভ্রামা। বাবা, তোমার ইচ্ছামত ওকে বিজ্ঞানাপত্ত কর!

আশু। আপনার কোন্ কোন্ বিজ্ঞান অধিকার আছে, জানতে উৎসুক হ'য়ে আছি।

ভ্রামা। বহল অন্ন, বিদ্যা কতই যা বেশি হবে—তবে—

আশু। যত অন্নই হোক মাতাজি, আমাদের মত লোকের পক্ষে দেখতে হবে।

ভ্রামা। (আশ্বগত) বিজ্ঞান কোন পরিচয় না পেয়েই যখন এত সন্তুষ্ট, তখন ঘেঁষে পছন্দ করেছে বলেই বোধ হচ্ছে। বাচা গেল, আমার বড় তাবনা ছিল। (প্রকৃত্তে) নিরু, একটা গান শুনিতে দাও ত মা।

আশু। গান! এ আমার আশার অতীত! আপনি বোধ হয় পূর্বে থেকেই জানেন, গানের চেয়ে আমি কিছুই ভাল বাসিনে। (স্বগত) অন্নপ্রাশন মত এত বড় সম্বোধী, সে থাকলে আজ যোগের বল প্রত্যক্ষ করতে পারতাম। (প্রকৃত্তে নিরু-গায় প্রতি) আপনাতা আমাকে একদিনেই চিরঞ্জয় করেছেন—যদি গান করেন, তবে বিজয়ী হ'য়ে থাকব!

(নিরুপমার গান)

কাকি—কাপতাল।

(আমি) কি বলে' করিব নিবেদন
আমার রুদ্র প্রাণমন।

ভিত্তে এসে দখা করি' নিজে লহ অপহরি'

কর তারে আপনার ধন—

আমার হৃদয় প্রাণমন !

ওধু, মূলি ওধু ছাই মূল্য বার কিছু নাই

মূল্য তারে কর সমর্পণ

তব স্পর্শে পরশরতন !

তোমার পৌরবে হবে আমার পৌরব হবে

লক্ষ্যসহ দিব বিসর্জন

চরণে হৃদয় প্রাণমন !

আণ্ড। (বগত) আর মস্ত্রের দরকার

নেই। বর্ণীকরণের কি আর বাকি রইল !

কস্তাটি দেবকস্তা ! (প্রকাজে) মাতাজি !

ভ্রামা। কি বাবা !

আণ্ড। আমাকে আপনার পুত্র কোরেই

রাখবেন, এমন হৃদয়ঙ্গীত শোনার

অধিকার পেকে বঞ্চিত করবেন না। বা

পাওয়া গেল, এই আমি পরম লাভ মনে

করছি। মস্ত্রচরের কথা ভুলেই গেছি। এখন

বুঝতে পারছি। মস্ত্রের কোন দরকারই নেই !

ভ্রামা। অমন কথা বোলো না বাবা !

মস্ত্রের দরকার আছে বৈ কি ! নইলে

পাত্রে—

আণ্ড। সে ত ঠিক কথা ! মস্ত্র আমি

অগ্রাহ্য করি নে। আমি বলছিলাম, মস্ত্র

পড়লেই বে মন বশ হয়, তা নয়, গানের

মোহিনী শক্তির কাছে কিছুই লাগে না।

(বগত) মেয়েটি আমার লক্ষ্যের লাল হ'রে

উইল ! ভারি লাভুক !

ভ্রামা। (আশ্চর্যত) ছেলেটি খুব ভাল !

কিন্তু একটু যেন লজ্জা কম বণে' বোধ হয় !

মন বশ করার কথাগুলো শাড়ির গায়ে

না বলেই ভাল হত।

আণ্ড। কিন্তু আপনি বিরক্ত হবেন না, আমার যা মনে উদয় হচ্ছে আমি বলি, তার পরে—

ভ্রামা। তা বোবা, সে সব কথা এখন থাক ! আগে—

আণ্ড। আমি বলছিলাম, গানে বে মন বশ হয়, সেও ত শব্দমাত্র—মনের সঙ্গে তার যদি যোগ থাকে, তা হলে মস্ত্রের শব্দশক্তিকেই বা না মানি কি বোলে ?

ভ্রামা। ঠিক কথা। মস্ত্রটা মানাই ভাল !

আণ্ড। (সোৎসাহে) আপনার কাছে

এ সব কথা বলা আমার পক্ষে খুটতাই

কিন্তু শাকী শক্তির সঙ্গে আস্থার বে একটি

নিগূঢ় যোগ আছে, তার স্বরূপ নিরূপণ

করা কঠিন,—তৎকাণ্ডকারমশায় বলেন, সে

অনির্বাচনীয়। শারে বে বলে শব্দ ব্রহ্ম,

তার কারণ কি ? একই যে শব্দ বা শব্দই

যে ব্রহ্ম তা নয়—কিন্তু ব্রহ্মের বাবহারিক

সত্তার মধ্যে শব্দস্বরূপই ব্রহ্মের সব চেয়ে

যেন নিকটতম। (নিঃশব্দতার প্রতি) আপনি

ত এ সকল বিষয় অনেক আলোচনা

করেছেন—আপনার কি মনে হয় না, রূপ-

রস-গন্ধ-স্পর্শের চেয়ে শব্দই যেন আমাদের

আস্থার অবাবহিত প্রত্যক্ষের বিষয়। সেই-

অস্ত্রেই এক আস্থার সঙ্গে আর এক আস্থার

মিলনসাধনের প্রধান উপায় শব্দ। আপনি

কি বলেন ? (বগত) মেয়েটি ভারি লাভুক।

ভ্রামা। বল না মা, বাঁ জিভাসা

কম্বুচেন বল ! এত বিস্তে শিখলে, এই

কথাটার উত্তর দিতে পারত না ? বাবা,

প্রথমদিন কি না, তাই লজ্জা করছে।

ও যে কিছু শেখে নি, তা মনে কোনো না।

আত। ঠর বিজ্ঞান উদ্ভাৱতা মুখ্যজীৱেই
প্রকাশ পাকে। আমি কিছুমাত্র পল্লব
কল্পচিনে।

ভ্রামা। নিব, মা, একবার ও-ঘরে
যাও ত। (নিরুপনার প্রৱণ) দেখ বাবা,
মেয়েটির বাপ নেই, সকল কথা আমাকেই
কইতে হচ্ছে—তুমি কিছু মনে কোরো না।

আত। মনে কর! বলেন কি!
আপনার কথা শুনেই ত এসেছিলাম—
বাচালের মত কেবল নিজেই কতকগুলো
বোকে গেলাম। আমাকে মাগ করবেন।

ভ্রামা। তোমার ঘনি মত থাকে, তা
হ'লে একটা দিনটির কবুতে হচ্ছে ত!

আত। (বগত) আমি ভেবেছিলাম,
আজই সন্ধ্যা হ'য়ে যাবে কিন্তু আর
বৃহস্পতিবার, তাই বোধ হয় চল না।
(প্রকাশ্যে) তা আস্তে রবিবারেই ঘনি
পিত্ত করেন!

ভ্রামা। বল কি বাবা! আজ বৃহস্পতি-
বার, যাবে ত কেবল দুটো দিন আছে!

আত। এর ভুলে কি অনেক আয়ো-
জনের দরকার হবে?

ভ্রামা। তা হবে বৈ কি বাবা—ব্যা-
সাধা করতে হবে। তা ছাড়া, পাঞ্জি দেখে
একটা শুভদিন স্থির করতে হবে ত।

আত। তা বটে, শুভদিন দেখতে
হবে বৈ কি! আসল কথা, বত স্ত্রীর হয়!
আমার সেরকম আগ্রহ-ইচ্ছে চক্ষে, এই
মুহূর্তেই—

ভ্রামা। তা আমি অনর্থক দেরি করব
না বাবা। আস্তে অগ্রগমনাই হ'য়ে
যাবে। মেয়েটিরও বিবাহযোগ্য বয়স

হ'য়ে এসেছে, একেও ত আর রাখা
যাবে না।

আত। ঠর বিবাহ হ'য়ে গেলেই বুঝি—
ভ্রামা। তা হলেই আবার আমি
কান্নিতে কিরে বেতে পারি।

আত। তা হ'লে তার আগেই
আমাদের—

ভ্রামা। সব ঠিক কোরে নিতে হবে।

আত। তবে দিনকণ দেবুন!

ভ্রামা। তুমি ত রাগি আছ বাবা!

আত। বিলম্ব! রাগি যদি না
থাকতো ত এখানে এলেম কেন! আপনাকে
নিরে কি আমি পরিহাস করছি! আমার
সে-রকম দৃষ্টাব নহ। আমি এখনকার
ছেলেদের মত এ সকল বিষয় নিয়ে তামাশা
করিনে!

ভ্রামা। তোমার আর মত বদলাবে না!

আত। কিছুতেই না! আপনার পদ-
ল্লপ কোরে আমি বলছি, আপনার কাছ
থেকে যা গ্রহণ করতে এসেছি, তা আমি
গ্রহণ কোরে তবে নিরস্ত হব!

ভ্রামা। দেওয়া-পাওয়ার কথা কিছু
হল না যে!

আত। আপনি কি জানু বলুন।

ভ্রামা। আমি কি চাইব বাবা! তুমি
কি চাও, সেইটে বল!

আত। আমি কেবল বিভে চাই, আর
কিছু চাইনে!

ভ্রামা। (বগত) ছেলেটি কিন্তু বেহায়া,
তা বলতেই হবে! ছি ছি ছি, বিভেজ্ঞানবের
কথা আমার কাছে পাড়লে কি কোরে!
আমার নিকটকে বলে দি না বিদ্যা!

(প্রকাশ্যে) তা হ'লে পানপত্রটার কথা কি বল বাবা !

আত। (স্বগত) পানপাত্র ! এ'র দেখু'চি সমস্তই শাক্তমতে । এমিকে কুমারী কত্তা, তার পরে আবার পানপাত্র ! এইটে আমার ভাল ঠেকু'চে না ! (প্রকাশ্যে) তা মাতাজি, আপনি কিছু মনে করবেন না—অবশ্য যে কাণের বা অঙ্গ, তা কর্তেই হয়—কিন্তু ঐ যে পানপাত্রের কথা বলেন, ওটাও আমার ঝাড়া হবে না ।

ভ্রামা। বাবা তোমরা এ কাণের ছেলে, তোমরা ওটাকে মসভাতা মনে কর, কিন্তু আমি ত ওতে কোন দোষ দেখিনে—

আত। আপনি ওতে কোন দোষই দেখেন না ? বলেন কি মাতাজি ?

ভ্রামা। তা না হয়, পানপত্র রইল, ওর লত্রে কিছু আটকাবে না, এখন বিবাহের কথা ত পাকা ?

আত। কার বিবাহের কথা !

ভ্রামা। তুমি আমাকে অবাক করলে বাপু ! এতকণ কথাবার্তার পর জিজ্ঞাসা করু'চ, কার বিবাহের কথা ! তোমারি ত বিবাহের কথা হ'চ্ছিল—কেবল পানপত্রের কথা শুনেই তুমি চমকে উঠলে । তা পানপত্র না হয় না-ই হ'ল ।

আত। (হতবুদ্ধিতাবে) ও, হী, তা বুঝেছি, তাই হ'চ্ছিল বটে ! (স্বগত) মত একটা কি ভুল হ'য়ে গেছে । না বুঝে একেবারে জড়িয়ে পড়েছি । কি করা যায় ! (প্রকাশ্যে) কিন্তু এত তাড়াতাড়ি কিসের, আর-এক-দিন এ সব কথা খোলসা করে আলোচনা করা যাবে ! কি বলেন ?

ভ্রামা। খোলসার আর কি বাকি রেখেচ বাবা ! আর-এক-দিন এর চেয়ে আর কত খোলসা হবে । তাড়াতাড়ি ত তুমিই করছিলে ! আস্তে রবিবারেই তুমি দিনদ্বির করতে চেয়েছিলে !

আত। তা চেয়েছিলেম বটে ।

ভ্রামা। তুমি দেখাওনা করু'তে চাইলে বলেই আমি মেয়েকে তোমার সাক্ষাতে বের করলুম ; তার গানও শুন্লে—একটা পানপত্রের কথা শুনেই যদি বৈকে ঝাড়াও, তা হ'লে ত আমার আর মুখ দেখাবার জো থাকবে না । তোমাকেই বা লোকে কি বলবে বাবা ! ভ্রূণগোচকের মেয়ের সঙ্গে এমন ব্যবহার কি ভাল ? আমার নিজ তোমার কাছে কি দোষ করেছিল যে (ক্রন্দন)—

নিরুপমার দ্রুত প্রবেশ ।

নিরুপমা। মা, কি হয়েছে মা, অমন কোরে কান্দি কেন ?

আত। (স্বগত, কি সর্বনাশ ! আমাকে এ'রা সবাই কি মনে করবেন না জানি ! (প্রকাশ্যে) কিছুই হয় নি, আমি সবশুই ঠিক কোরে দিচ্ছি । আপনারা কান্নাকাটি করবেন না । শুভকর্মে ওতে অমঙ্গল হয় । (ভ্রামার প্রতি) তা, আপনি একটা দিন-দ্বির করে দিন—আমার তাতে কোন আপত্তি নেই ।

ভ্রামা। তা বাবা যদি ভাল দিন হয়, তা হ'লে তুমি যা বলেছিলে, আস্তে রবি-বারেই হোয়ে যাক । আমার আরোজনে কাজ নেই । এই কটা দিন তোমার মত গির থাকলে বাঁচি ।

আত্ম। অমন কথা বলবেন না—
আমার মতের কখনো নড়ুড়ে, হয় না।

ভ্রামা। আমার পা ছুঁয়ে ত তাই
বলেওছিলেন, কিন্তু দশমিনিট না যেতেই
এক পানপত্রের কথা শুনেই তোমার মত
বদলে গেল।

আত্ম। তা বটে। পানপত্রটা আমি
আবহে পছন্দ করি না—

ভ্রামা। কেন বল ত বাবা ?

আত্ম। তা ঠিক বলতে পারছি নে—
ওটা আমার কেমন—বোধ হয়, ওটা—কি
জানেন, পানপত্রটা যেন কে জানে ও
কথাটাই কেমন—হঠাৎ তুলে কি যেন—
তা এই বাড়ীটার নথর কি বলুন দেখি!

ভ্রামা। হুঃ, তাই বৃষ্টি ভাব্চ! আমরা
তোমাকে তাঁড়াকি নে বাবা! আমরাই
উনপঞ্চাশ নথর ছিলুম, কাল এই বাইল
নথরে উঠে এসেছি। যদি মনে কোন
সন্দেহ থাকে, উনপঞ্চাশ নথরে বরফ এক-
বার খোঁজ কোরে আসতে পার!

আত্ম। (স্বগত) উঃ, কি জুলই করেছে!
বা হোক, এখন একটা পরিভ্রাণের সাত্তা
পাওয়া গেছে। অন্নদাকে এনে দিলেই
সমস্ত সোল নিটে বাবে! বা হোক, অন্নবার
অনুষ্ঠান ভাল। এক-একবার মনে হচ্ছে,
জুলসী শেষ পর্যন্ত টেনে নিয়ে গেলে মন্দ
হয় না।

ভ্রামা। কি বাবা! এত ভাব্চ কেন ?
আমরা ভ্রত্বরের মধ্যে—তোমাকে ঠকা-
বার জন্যে পটিন থেকে এখানে আসিনি।

আত্ম। ও কথা বলবেন না, আমার
মনে কোন সন্দেহ নেই এখন আমি

বাচ্চি—একঘণ্টার মধ্যে কিরে আসবে—
আজকের দিনের মধ্যেই একটা সন্তোষ-
জনক বন্দোবস্ত করবই, এ আমি আপনাদের
পা ছুঁয়ে শপথ কোরে বাচ্চি।

ভ্রামা। বাবা, ও শপথে কাজ নেই—
পা ছুঁয়ে আরো একবার শপথ করেছিলেন—
আত্ম। আচ্ছা, আমি আমার ইষ্ট-
দেবতার শপথ কোরে বাচ্চি, আজকের
মধ্যেই সমস্ত পাকা কোরে তবে অল্প কথা।

ভ্রামা। (স্বগত) ছেলোটী কথাবার্তার
বেশ, কিন্তু ওকে কিছুই বোঝবার জো নেই!
কখনো বা তাঁড়া দেয়, কখনো বা ঢিল দেয়,
অথচ মুখ বেখে ওর প্রতি অবিচল হই
না।

আত্ম। তবে অহুমতি করেন ত এখন
আসি!

ভ্রামা। তা এস বাবা। (প্রণাম
করিয়া আত্মর প্রস্থান)

পঞ্চম অঙ্ক।

অন্নদা।

অন্নদা। ব্যাপারখানা ত কিছুই
বুঝতে পারলুম না। ঘটকের কথা শুনে
এলেম কত্না দেখতে। যিনি দেখা দিলেন,
ওঁকে ত বয়স বেখে কোনমতেই কত্নার
মা বলে' বোধ হয় না—চেহারা বেখে বোধ
হ'ল অপ্সরী—যদি চ অপ্সরীর চেহারা কি-
রকম, পূর্বে কখনো দেখিনি। শেক্সপীয়ার
কবুতে যেমনি হাত বাড়ি। দিমেতি, অমনি
কবু কোরে আমার হাতে কড়িবাণা এক-

গাছি লাগ হুতো বেঁধে দিলে। আর কেউ হ'লে গোলমাগল কর্ত্তম—কিন্তু যে হুন্দর চেঁহারা, গোলমাগল কড়বার জো কি। কিন্তু এ সমস্ত কোন্-দেশী বস্ত্র, তা ত বুঝতে পার্চিনে।

মাতাজির প্রবেশ।

মাতাজি। (বগত) অনেক লন্ধান কোরে তবে পেরেছি। আগে আমার গুরুদত্ত বশীকরণ-মন্ত্রটা খাটাই, তার পরে পরিচয় দেব। (অন্নদার কপালে নরকপাল ঠেকাইয়া) বল, হুন্দিং।

অন্নদা। হুন্দিং।

মাতাজি। (অন্নদার গলায় জবার মালা পরাইয়া) বল, কুড়বং কড়বং কুড়াং।

অন্নদা। (বগত) ছি ছি ভারি হাতকর হ'রে উঠ্চে। একে আমার কোটের উপর জবার মালা, তার উপরে আবার এই অদ্বুত-শব্দগুলো উচ্চারণ!

মাতাজি। চুপ কোরে রইলে যে!

অন্নদা। বল্চি। কি বল্ছিলেন বলুন!

মাতাজি। কুড়বং কড়বং কুড়াং!

অন্নদা। কুড়বং কড়বং কুড়াং!

(বগত) রিডিক্লুস!

মাতাজি। মাথাটা নীচু কর। কপালে সিঁদুর দিতে হবে!

অন্নদা। সিঁদুর! সিঁদুর কি এই বেশে আমাকে ঠিক মানাবে!

মাতাজি। তা জানিনে, কিন্তু ওটা দিতে হবে! (অন্নদার কপালে সিঁদুর লেপন)

অন্নদা। ইস, সমস্ত কপালে যে একে-বারে লেপে দিলেন!

মাতাজি। বল বহুযোগিত্ত নমঃ।

(অন্নদার অহরূপ আকৃতি) প্রণাম কর। (অন্নদাকর্ত্ত্বক তথাকৃত) বল কুড়বে কড়বে নমঃ! প্রণাম কর! বল হুন্দিং হুন্দিং নমঃ! প্রণাম কর!

অন্নদা। (বগত) গ্রহশনটা ক্রমেই হবে উঠ্চে!

মাতাজি। এইবার মাতা বস্ত্রবোদিনীরা এই প্রসাদী বস্ত্রবৎ মাথার বাধ!

অন্নদা। (বগত) এই শালুর টুকরোটা মাথার বাঁধতে হবে! ক্রমেই যে বাড়াবাড়ি হ'তে চম! (প্রকাশ্যে) দেখুন, এর চেয়ে বরক আমি পাগুড়ি পরতেও রাজি আছি এমন কি, বাঙালিবাধুনা যে টুপি পরে, তাও পরতে পারি—

মাতাজি। দে সমস্ত পরে হবে, আপাতত এইটে জড়িয়ে দিই!

অন্নদা। দিন!

মাতাজি। এইবার এই পিড়িটাতে বহুন!

অন্নদা। (বগত) মুকিলে কেনে। আমি আবার ট্রাউজার্স পোরে এলেছি। যাই হোক, কোনমতে বসতেই হবে! (উপবেশন)

মাতাজি। চোখ বোজ। বল, খটকারিণী, হঠবারিণী, ঘটবারিণী, নটতারিণী জং। প্রণাম কর। (অন্নদার তথাকরণ) কিছু দেখতে পাক?

অন্নদা। কিছু না।

মাতাজি। আচ্ছা, তা হ'লে পুংমুখো হ'রে বস—ডান কানে হাত লাগ। বল খটকারিণী, হঠবারিণী, ঘটবারিণী নটতারিণী জং। প্রণাম কর। এবার কিছু দেখতে পাক?

অন্নদা। কিছুই না।

মাতাজি। আচ্ছা তা হ'লে পিছন
কিরে বস! দুই কানে দুই হাত দাও!
বল খটকাতিথী হঠবারিণী খটসারিণী নট-
তারিণী ক্রম। কিছু দেখতে পাচ্ছ ?

অন্নদা। কি দেখতে পাওয়া উচিত,
আগে আমাকে বলুন ?

● মাতাজি। একটা গর্দভ দেখতে
পাচ্ছ ত ?

অন্নদা। পাচ্ছি বৈ কি! অত্যন্ত
নিম্নেই দেখতে পাচ্ছি।

মাতাজি। তবে মত্ত ফলেচে। তার
পিঠের উপরে—

অন্নদা। হী হী তার পিঠের উপরে
একজনকে দেখতে পাচ্ছি বৈ কি!

মাতাজি। গর্দভের দুই কান দুই হাত
চেপে ধরে—

অন্নদা। ঠিক বলেছেন, কোসে চেপে
ধরেচে—

মাতাজি। একটা সুন্দরী কস্তা—

অন্নদা। পরমা সুন্দরী—

মাতাজি। ঈশানকোণের দিকে চলে-
ছেন—

অন্নদা। দিক্‌ভ্রম হোয়ে গেছে— কোন্
কোণে যাচ্ছেন, তা ঠিক বলতে পারছিনে!
কিন্তু ছুটিয়ে চলেছেন বটে! গাধাটার হাঁক
ধরে' গেল!

মাতাজি। ছুটিয়ে যাচ্ছেন না কি ?
তবে ত আর একবার—

অন্নদা। না, না, ছুটিয়ে যাবেন কেন—
কি-রকম যাওয়াটা আপনি প্তির করছেন
বলুন দেখি ?

মাতাজি। একবার এগিয়ে যাচ্ছেন,
আবার পিছু হটে পিছিয়ে আসছেন।

অন্নদা। ঠিক তাই! এগিয়ে আসি
গিচ্চেন! গাধাটার ঝিঝ বেহিরে পড়েচে।

মাতাজি। তা হ'লে ঠিক হয়েছে। এবার
সহর হ'ল। ওলো মাতঙ্গিনী, তোরা
দবাই আর!

হলুধনি-শম্ভুধনি করিতে করিতে

ক্রীড়নের প্রবেশ।

(অন্নদার বামে মাতাজির উপবেশন
ও ডানার হস্তে হস্তধারণ)

অন্নদা। এটা বেশ লাগ্‌চে, কিন্তু
ব্যাপারটা কি ঠিক বুঝতে পারছিনে!

রমণীগণের গান।

এবার সখি সোনার মৃগ

দেখ বুকি দেখ ধরা!

আর গো তোরা পুরাঙ্গনা

আর হবে আর ধরা!

ছুটেছিল পিঙ্গলভরে

মরীচিকা-বারি তরে,

ধরে' তারে কোমল করে

কঠিন ফাঁসি পরা!

ধরামারা করিলুনে গো,

ওদের নয় সে ধরা!

হরার বোহাই মানবে না গো

একুই পেণেই ছাড়া!

বীধন-কাটা বস্ত্রটাকে

দায়ার কাঁধে ফেলাও পাকে,

‘জুলাও তাকে বীশির ডাকে

বুড়িবিচারইরা!

অন্নদা। বুকিবার একে বাধেই যায় নি!

অতি সাধাশ্রমই তাঁর জীবন।
 খেতে নেন হতে
 হারি বলা হ'ল
 হাফা, উপরি
 পারে না
 বস্ত্রের
 ভে
 কোরে সবটা
 সপক্ষে আপনাতা
 এমন আশঙ্কা
 তাড়া দিলেও নয়।
 কেন এলুম, কোথায়
 মানবমনে স্বভাবতই
 কে।

১। তোমার স্ত্রীকে কি মাঝে
মাঝে মনে হয় ?

যদি। কোরে লাভ কি, কেবল সময়
! তাঁকে দ্বন্দ্ব কোরে বেটুকু স্বপ্ন,
আপনাদের ধর্ষণ কোরে তার চেয়ে চেয়ে
বেশি আনন্দ !

যাতায়াত। তোমার স্ত্রী যদি তোমাকে
স্বরণ কোরে সমস্ত নষ্ট করেন ?

অন্নদা। তা হ'লে তাঁর প্রতি আমার
উপবেশ এই যে, আর অধিক নষ্ট করা উচিত
হয় না—হয় বিস্তারণ করতে আরম্ভ করন,
ময় ঘর্পন দিন, সমরটা যথ্যবান জিনিষ।

মাতাজি। সেই উপদেশই নিরোবার্য।
আমিই তোমার সেবিকা। শ্রমণী মহী-
মোহিনী সেবী।

অন্নদা। বাঁচালে! মনে ধে-ব্রহ্ম
ভাবোত্থেক করেছিলে, নিজের জী না ছুঁলে
গলায় বড়ি দিতে 'হ'ত। কিন্তু নিজের
স্বামীর জন্তে এ সমস্ত ব্যাপার কেন ?

মাতাঙ্গি। শুকর কাছে যে বশীকরণ-
মন্ত্র শিখেছিলেন, আগে সেইটে প্রয়োগ
কোরে তবে আত্মপরিচয় বিলম্ব, এখন আর
তোবার নিষ্ফল নেই।

অন্নদা। আর কারো উপর এ মস্তকের
পরীক্ষা করা হয়েছে ?

মাতাঃ। না, তোমার ভেতরেই এক-
দিন এ মন্ত্র ধারণ কোরে রেখেছিলেম।
আজ এর আশ্চর্য্য প্রত্যাক্কল পেয়ে শুক্ল
চরণে মনে মনে শতবার প্রণাম করছি।
অবশ্য মন্ত্র! মন্ত্রে তোমার কি
হ'ল না ?

অন্নদা। বর্ষাকালগে কণা
করতে পারি নে। এখন তোমার
বার এই মন্তব্যগুলো পড়িয়ে নিজে
আমি নিশ্চিত হই।

(सामौकिक सम्प्रदाय आचार्यशासन)

অন্নদা। এও বশীকরণের অঙ্গ। বস্ত্র-
মুগই হোক, আর সতের পাখাট
পোষ মানাবার পক্ষে এটা খুব
(আহারে প্রস্তুত)

আন্তর দ্রুত প্রবেশ।

প্রভুতির প্রশংসা

আত্ম। ওহে অন্নদা, তুমি
 যেখে গেছে। বাঃ, তুমি যে বিধি
 কর্ত্তে বসেছ! তোমার এ কি
 সাজ! (উচ্ছ্বাস) ব্যাপারখানা
 নরদুঃ, বাঁড়া, বাতি, জ্বায় মালা
 তোমার বলিদান হবে না কি?

অন্ন। । হোরে গেছে ।

ଆମ୍ଭ । ତୋହେ କି ବୁଝ ?

অন্নহা। সে সকল বাখা পুরে করব। তোমার দুবরটা আগে বল।

আণ্ড। তুমি বিবাহের জন্তে যেতে চাও। কল্লাতিকে দেখবে বোলে দ্বিগ্ন করেছিলে, আরেছে, আবার হ'তে পারে না কি। এক-দুই হঠাৎ উনপঞ্চাশ নব্বই থেকে বাইশ নব্বই উঠে গেছে। আমি কল্লার বিশ্বাস করে মাতাঙ্গি মনে কোরে বরাবর এমন নির্দোষের মত কথাবার্তা করে গেছি যে, তাঁরা ঠিক কোরে নিবেশন—আমি যেহেতু বিবাহ করতে সম্মত হয়েছি। এখন তুমি না গেলে ত আর উদ্ধার নেই!

অন্নহা। যেহেতু দেখতে কেমন?

আণ্ড। সেবকল্লার মত।

অন্নহা। তা হোক, বহুবিবাহ আমার মতবিরুদ্ধ।

আণ্ড। বল কি? সেদিন এত তর্ক করলে—

অন্নহা। সেদিনকার চেয়ে চেয়ে ভাল মুক্তি আজ পাওয়া গেছে—

আণ্ড। একেবারে অশওনীয়া?

অন্নহা। অশওনীয়া।

আণ্ড। হুঁতীটা কি-রকম দেখা যাক!

অন্নহা। তবে একটু বোস। (প্রস্থান ও মাতাঙ্গিকে লইয়া প্রবেশ) ইনি আমার প্রীতীমতী বহীমোহিনী দেবী।

আণ্ড। অ্যা! ইনি তোমার—আপনি

আমাদের অন্নহা—কি আশ্চর্য! তা হ'লে ত হ'তে পারে না!

অন্নহা। হ'তে পারে না কি বলচ। আরেছে, আবার হ'তে পারে না কি। এক-বার হয়েছে, এই আবার হ'বার হ'ল, তুমি বলচ হ'তে পারে না।

আণ্ড। না আমি তা বলছি। আমি বলছি, সেট বাইশ নব্বইর কি কথা বার।

অন্নহা। সে আর শক্ত কি! সহজ উপায় আছে।

আণ্ড। কি বল দেখি!

অন্নহা। কিসে কোরে কেল।

আণ্ড। সমস্ত বিসর্জন দেব—আমার হঠাৎ, প্রাণাশ্রয়, বস্তুসাধন—

অন্নহা। তবু কি, তুমি যেগুলো ছাড়বে, আমি সেগুলো গ্রহণ করব। সে ঘাই হোক, তোমার বশীকরণটা কি-রকম হ'ল?

আণ্ড। তা নিতান্ত কম হয় নি! তোমার এই একটা ঠাট্টা করবার বিশ্বাস হ'ল!

অন্নহা। আর ঠাট্টা চলবে না।

আণ্ড। কেন বল দেখি?

অন্নহা। আমারও বশীকরণ হোয়ে গেছে।

আণ্ড। চলেন। এক ঘণ্টার মধ্যেই যাবার কথা আছে। কথাটা পাকা কোরে আসি গে!

বঙ্গদর্শন।

চোখের বালি।

(২৬)

একদিকে চন্দ্র অশ্রু বার, আর একদিকে সূর্য্য উঠে। আশা চলিয়া গেল। কিন্তু মহেশ্বরের ভাগ্যে এখনো বিনোদিনীর দেখা নাই। মহেন্দ্র ঘুরিয়া ঘুরিয়া বেড়ায়, মাঝে মাঝে ছুতা করিয়া সময়ে অসময়ে তাহার দ্বার ঘরে আসিয়া উপস্থিত হয়, বিনোদিনী কেবলি কঁাকি দিয়া পালায়, ধরা দেয় না।

রাজলক্ষ্মী মহেশ্বরের এতরূপ স্বভাব সন্তোষ দেখিয়া ভাবিলেন, ‘বৌ সিরাজে, তাই এ বাড়ীতে মহিনের কিছুই আর ভাল লাগিতেছে না।’ আজকাল মহেশ্বরের সুখ-দুঃখের লক্ষ্যে না যে বোধের তুলনায় একান্ত অনাবস্তব হইয়া পড়িয়াছে, তাহা মনে করিয়া তাঁহাকে বিধি—তবু মহেশ্বরের এই লক্ষ্মীছাড়া বিষমরূপ দেখিয়া তিনি বেদনা পাইলেন। বিনোদিনীকে ডাকিয়া বলিলেন, “সেই ইন্দুসুয়েতার পর হইতে আমার ইংপানির মত হইয়াছে;—আমি ত আজ-কাল সিঁড়ি ভাঙিয়া ঘনঘন উপরে বাইতে পারি না। তোমাকে বাড়া, নিকে থাকিয়া মহিনের পাণ্ডালাওয়া সমস্তই দেখিতে

হইবে। বরাবরকার অভ্যাগ, একজন কেহ বর না করিলে মহিন্ থাকিতে পারে না। দেখ না, বৌ পাণ্ডার পর হইতে ও কেমন-একরকম হইয়া গেছে! বৌকেও দস্ত বলি! কেমন করিয়া গেল!”

বিনোদিনী একটুখানি মুখ বাকাইয়া বিচানার চাবের পুঁতিতে লাগিল। রাজলক্ষ্মী কহিলেন, “কি বৌ, কি ভাবিতেছ? ইহাতে ভাবিবার কথা কিছু নাই। বে বাহা বলে বলুক, তুমি যামাদের পর নও!”

বিনোদিনী কহিল—“কাজ নাই মা!”

রাজলক্ষ্মী কহিলেন, “আজ্ঞা, তবে কাজ নাই। দেখি, আমি নিজে যা পারি, তাই করিব।”

বলিয়া তখনি তিনি মহেশ্বরের তেতালার ঘর ঠিক করিবার জন্য উত্তত হইলেন। বিনোদিনী ব্যস্ত হইয়া কহিল, “তোমার অসুখ শরীর, তুমি দাঁড়ো না, আমি দাঁড়িতেছি। আমাকে মাগ কর পিসিমা, তুমি যেমন আদেশ করিবে, আমি তাহাই করিব।”

রাজলক্ষ্মী লোকের কথা একেবারেই চুজ করিতেন। আমার সুভার পর হইতে

সংসারে এবং সমাজে তিনি মহেন্দ্র ছাড়া আর কিছুই জানিতেন না। মহেন্দ্রসদৃশক বিনোদিনী সমাজনিষ্ঠার আভাস দেওয়াতে তিনি বিব্রত হইয়াছিলেন। আজন্মকাল তিনি মহিনকে বেশিরা আসিভেঁড়েন, তাহার মত এমন ভাল ছেলে আছে কোথায়! সেই মহিনের সহকর্মে শিক্ষা! যদি কেব করে, তবে তাহার শিক্ষা যদি বা! ঐহার নিঃস্বের কাছে যেটা ভাল লাগে ও ভাল বোধ হয়, সে সহকর্মে বিশ্বের লোককে উপেক্ষা করিবার জন্য রাজস্বায়ীর একটা স্বাভাবিক ভয় ছিল।

আজ মহেন্দ্র কলীকট চটেতে ফিরিয়া আসিয়া আলমার পরদখব দেখিয়া আন্দর্গ হইয়া গেল। দাব গুলিরাই বেশিল, চন্দনগুড়া ও ধুমার গন্ধে ঘর আমোদিত হইয়া আছে। মশারিতে গোলাশি রেশমের আলর লাগানো। নীচের বিছানার ওপর জাতিম তক্তক্ করিতেছে এবং তাহার উপরে পূর্ণেকার পুরাতন তাকিয়ার পরিবর্তে রেশম ও পশমের ফুলকাটা বিলাতী চৌকা বালিশ স্থাপিত। তাহার কাককাঁধ বিনোদিনীর বহুবিনের পরিশ্রমজাত। আশা তাহাকে বিজ্ঞাসা করিত, “এগুলি কুই কাস্ জনো তৈরি করিতেছিল তাই?”—বিনোদিনী হাসিয়া বলিত, “আমার চিতাশয্যার জন্য। মরণ ছাড়া ত সোহাগের লোক আমার আর কেহই নাই!”

ঘেঁষালে মহেন্দ্রের যে বাঁধানে কোটো-গ্রাকশানি ছিল, তাহার ফ্রেমের চার কোণে রত্নী-কিতার বাঁধা স্তম্ভপুণ্ড্রাবে চারিটি গ্রাফি বাধা,—এবং সেই চবির নীচে ত্রি-

গারে একটি টিপাইয়ের দুই ধারে দুই ফুল-দানিতে ফুলের তোড়া,—যেন মহেন্দ্রের প্রতিমূর্ত্তি কোন মজাও তক্তের পূজা গ্রাপ্ত হইয়াছে। সবস্বত সমস্ত ঘরের চেঁহারা অন্যত্রকম। খাট দেখানে ছিল, সেখান হইতে একটুখানি সরানো। ঘরটিকে দুই ভাগ করা হইয়াছে; খাটের সম্মুখে ছাট বড় আলমার কাপড় কুলাইয়া থিরা আড়ালের মত প্রস্তুত হওয়ার নীচে বসিবার বিছানা ও রাত্রে শুইবার খাট স্বতন্ত্র হইয়া গেছে। যে আলমারীতে আশার সমস্ত পথের জিমিষ, চীনের পেলনা প্রভৃতি সাজানো ছিল, সেই আলমারীর কাচের দরজার ভিতরের গায়ে লাল সাস্ কুক্তিত করিয়া রাখিয়া দেওয়া হইয়াছে,—এখন আর তাহার ভিতরের কোন জিমিষ দেখা যায় না। ঘরের মধ্যে তাহার পূর্ণ ইতিহাসের যে কিছু চিত্র ছিল, তাহা নূতন হস্তের নব সজ্জার সম্পূর্ণ আচ্ছন্ন হইয়া গেছে।

পরিশ্রাব মহেন্দ্র ঘেঁষার উপরকার ওপর বিছানার শুইয়া নূতন বালিশগুলির উপর মাথা রাখিবারাত্র একটি বৃহৎ সুগন্ধ অহুত্তব করিলেন—বালিশের ভিতরকার তুলার সঙ্গে প্রচুর গরিমাণে নাগকেশর ফুলের রেণু ও কিছু অন্তর মিশ্রিত ছিল।

মহেন্দ্রের চোখ বুজিয়া আসিল, মনে হইতে লাগিল, এই বালিশের উপর বাহার নিপুণ হস্তের শিল্প, তাহারি কোমল চম্পক-অঙ্গুলির যেন গন্ধ পাওয়া যাইতেছে!

এমন সময় দাসী তপার রেকাবিতে ফল ও মিষ্ট, এবং কাচের মাংস বরফ-দেওয়া আনারসের সর্ব্বং আনিয়া দিল। এ সময়ই

পূর্ণপ্রণা হইতে কিছু বিভিন্ন এবং বহু বয় ও পারিপাট্যের সহিত রচিত । সমস্ত স্বাদে, গন্ধে, সূত্রে, নূতনত্ব আনিয়া মহেশ্বরের ইচ্ছা-লক্ষ্য আবিষ্ট করিয়া তুলিল ।

তৃপ্তিপূর্ণক ভোজন সমাধা হইলে, রূপার বাটার পান ও মগলা লইয়া বিনোদিনী ঘরে ঘরে ঘরে প্রবেশ করিল । হাসিতে হাসিতে কহিল—“এ করদিন তোমার খাবার সময় হাজির হইতে পারি নাই, মাগ করিছো ঠাকুরপো ! আর সাই কুব, আমার মাগার দিবা রহিল, তোমার অমর হটেতে, এ খবরটা আমার চোখের বালিকে দিয়ে না । আমার গলাগাধা আমি করিতেছি—কিন্তু কি করিব ভাই, লংগারের সমস্ত কাজই আমার ঘাড়ে !”

এই বলিয়া বিনোদিনী পানের বাটা মহেশ্বরের সম্মুখে অগ্রসর করিয়া দিল । আভিজাত্য পানের মধ্যেও কেহা-খয়েরের একটু বিশেষ নূতন গন্ধ পাওয়া গেল ।

মহেশ্বর কহিল—“বহুর মাঝে মাঝে এমন এক একটা তুট পাকাই ভাল !”

বিনোদিনী কহিল—“ভাল কেন, তুমি !”

মহেশ্বর উত্তর করিল, “তার পরে পোটা দিয়া জ্বজ্বল আহার করা যায় ।”

“মহাজন মশার, জ্বল কত জ্বিল ?”

মহেশ্বর কহিল—“খাবার সময় হাজির ছিলে না, এখন খাবার পরে হাজিতি পোষাইয়া আরো পাওনা বাকি থাকিবে ।”

বিনোদিনী হাসিয়া কহিল, “তোমার হিসাব যে রকম কড়াকড়, তোমার হাতে একবার পড়িলে আর উদ্ধার নাই দেখিতেছি !”

মহেশ্বর কহিল—“হিসাবে বাই থাক, আমার কি করিতে পারিলাম !”

বিনোদিনী কহিল—“আমার করিবার মত আছে কি ! তবু ত বন্দী করিয়া রাখিয়াছ !”—বলিয়া ঠাট্টাকে হঠাৎ গাড়ীঘোঁরা পরিণত করিয়া দ্রব্যং একটু দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিল ।

মহেশ্বরও একটু গম্ভীর হইয়া কহিল—“ভাই বালি, এটা কি তবে জেলখানা ?”

এমন সময় দেহারা নিরমলত আগো আনিয়া উপাইয়ের উপর রাখিয়া চলিয়া গেল ।

হঠাৎ গোপে আগো লাগাতে মুখের সাম্মুখে একটু হাতের খাড়াগে করিয়া নত-নেমে বিনোদিনী বলিল—“কি জানি ভাই ! তোমার সঙ্গে কণাধ কে পারিবে ! এখন বাই, কাজ আছে !”

মহেশ্বর হঠাৎ তাহার গাত চাপিয়া ধরিয়া কহিল, “বন্ধন এখন বাকার করিয়াছ, তখন ঘাইবে কোথায় ?”

বিনোদিনী কহিল—“ভি, ভি ছাড় ! বাহার পালাটবার রাত্রা নাই, তাহাকে আবার বাধিবার চেষ্টা কেন ?”

বিনোদিনী জোর করিয়া হাত ছাড়াইয়া লইয়া প্রস্থান করিল ।

মহেশ্বর সেট বিধানার জগক বাহিন্যের উপর পড়িয়া রহিল, তাহার বৃক্কের মধ্যে রক্ত ভোলপাড় করিতে লাগিল । নিস্তব্ধ লক্ষ্য, নির্জন দর, নব বসন্তের বাতাস দিতেছে, বিনোদিনীর মন—যেন ধরা দিল দিল—উদ্ভাঙ্গ মহাক্ষ আপনাকে আর ধরয়া রাখিতে পারিলে না, এমন বোধ

হইল। তাড়াতাড়ি আলো নিবাইয়া ঘরের প্রবেশদ্বার বন্ধ করিল, তাহার উপরে শালি আঁটিয়া দিল—এবং সময় না হইতেই বিছানার মধ্যে গিয়া শুইয়া পড়িল।

এও ত সে পুরাতন বিছানা নহে! চারপাঁচখানা তোবকে শয্যাভল পূর্বের চেয়ে অনেক নরম। আবার একটি গন্ধ— সে অগুসর, কি খুশুসের, কি কিলের ঠিক বুঝা গেল না! মহেন্দ্র অনেকবার এশাপ ওশাপ করিতে লাগিল—কোথাও যেন পুরাতনের একটা কোন নিদর্শন খুঁজিয়া পাইয়া তাহা আঁকড়াইয়া ধরিবার চেষ্টা। কিন্তু কিছুই হাতে তৈলিল না।

স্নানি নটার সময় ঋদ্ধ ঘরে যা পড়িল। বিনোদিনী বাহির হইতে কহিল—“ঠাকুর-পো, তোমার খাবার আনিয়াছে, চুয়ার খোল!”

তখন দ্বার খুলিবার জন্য মহেন্দ্র খড়খড় করিয়া উঠিয়া শালির অর্গলে হাত লাগাইল। কিন্তু খুলিল না—যেহেতু উপর উপড় হইয়া লুটাইয়া কহিল—“না, না, আমার ক্ষুধা নাই, আমি খাইব না।”

বাহির হইতে উদ্বিগ্নকণ্ঠের প্রশ্ন শোনা গেল—“অস্থ করেনি ত? জল আনিয়া দিবা? কিছু চাই কি?”

মহেন্দ্র কহিল—“আমার কিছুই চাই না—কোন প্রয়োজন নাই!”

বিনোদিনী কহিল—“যাথা যাও, আমার কাছে জাঁড়াইয়ো না! আজ্ঞা অস্থ না থাকে ত একবার দরজা খোল।”

মহেন্দ্র সবগে বলিয়া উঠিল—“না খুলিব না, কিছুতেই না! তুমি যাও!”

বলিয়া মহেন্দ্র তাড়াতাড়ি উঠিয়া পূনর্কায় বিছানার মধ্যে গিয়া শুইয়া পড়িল এবং অন্তর্হিতা আশার স্বভিক্তে মুক্তমনা ও চকল ভ্রমরের মধ্যে অহঙ্কারে খুঁজিয়া বেড়াইতে লাগিল।

খুব যখন কিছুতেই আসিতে চার না, তখন মহেন্দ্র বাতি জ্বালাইয়া ঘোঘাত-কলম লইয়া আশাকে চিঠি লিখিতে বসিল। লিখিল,—“আশা, আর অধিকদিন আমাকে একা ফেলিয়া রাখিহো না! আমার জীবনের লক্ষী তুমি,—তুমি না থাকিলেই আমার সমস্ত প্রসূতির লক্ষণ ছিঁড়িয়া আমাকে কেন্ দিকে টানিয়া লইতে চায়, হুঁকিতে পারি না! পণ বেখিয়া চলিব, তাহার আলো কোপার - সে আলো তোমার বিশ্বাসপূর্ণ হৃদে চোখের প্রেমাবিধ দৃষ্টিপাতে! তুমি শ্রব এল, আমার শুভ, আমার ধ্রুব, আমার এক! আমাকে তির কর, রক্ষা কর, আমার ভ্রমর পরিপূর্ণ কর! তোমার প্রতি লেশমাত্র অশ্রাবের মহাপাপ হইতে, তোমাকে যুহুর্ভকাল বিশ্বরূপের বিতৌষিকা হইতে, আমাকে উদ্ধার কর!”

এমনি করিয়া মহেন্দ্র নিম্নেক আশার অভিব্যক্তি লেখেনে তাড়না করিবার লজ্জা অনেক রাত ধরিয়া অনেক কথা লিখিল। দূর হইতে শ্রুত্রে অনেকগুলি নির্ঝরায় বড়িতে চংচং করিয়া তিনটা বাজিল। কলিকাতার পথে পাড়ির শব্দ আর শ্রাব নাই, পাড়ার পরগ্ৰাস্তে কোন বোতলা হইতে নটীকণ্ঠে বেহাগ-রাগিণীর বে সান উঠিতেছিল, সেও বিশ্বব্যাপিনী শান্তি ও মিত্রতার মধ্যে একেবারে চুবিয়া গেছে। মহেন্দ্র

একাত্তরমনে আশাকে ঘরয় করিয়া, এবং মনের উত্তেজ দীর্ঘপত্রে মানাক্রমে ব্যক্ত করিয়া অনেকটা সাধনা পাইল এবং বিদ্যানার শুইবামাত্র যুগ্ম আশিতে তাহার কিছুমাত্র বিলম্ব হইল না ।

সকালে মহেন্দ্র যখন আশিয়া উঠিল, তখন বেলা হইয়াছে, ঘরের মধ্যে রৌদ্র আসিয়াছে । মহেন্দ্র তাড়াতাড়ি উঠিয়া বসিল; নিস্তার পর পতরাজির সমস্ত ব্যাপার মনের মধ্যে হাজা হইয়া আসিয়াছে । বিদ্যানার বাহিরে আসিয়া মহেন্দ্র দেখিল—পতরাজি আশাকে সে যে চিঠি লিখিয়াছিল, তাহা টিপাটের উপর দোয়াত দিয়া চাপা রহিয়াছে । সেখানে পুনরায় পড়িয়া মহেন্দ্র ভাবিল—“করেছি কি ! এ যে নভেল ব্যাপার ! ভাগ্যে পাঠাই নাই ! আশা পড়িলে কি মনে করিত ? সে ত এর অর্ন্তক কথা বুঝিতেই পারিত না ! রাত্রে স্বপ্নিক কারণে ছন্দাবেগে যে অলসত বাড়িয়া উঠিয়াছিল, ইহাতে মহেন্দ্র লজ্জা পাইল ; চিঠিখানা টুকরা টুকরা ছিঁড়িয়া ফেলিল ; সহজ ভাষায় আশাকে একখানি সংক্ষিপ্ত চিঠি লিখিল ;—“তুমি আর কত বেশি করিবে ? তোমার আঠামলারঘের যদি শীঘ্র ফিরিবার কথা না থাকে, তবে আমাকে লিখিও, আমি নিজে গিয়া তোমাকে লইয়া আসিব । এখানে একলা আমার ভাল লাগিতেছে না !”

(২৭)

মহেন্দ্র চলিয়া যাওয়ার কিছুদিন পরেই আশা যখন কান্নাতে আসিল, তখন অগ্র-পূর্ণার মনে বড়ই অলসতা জাগিল । পাশাকে

তিনি নানা প্রকারে নানা প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন । “হাতে চুনি, তুই যে তোর সেই চোখের বালির কথা বলিতে-ছিলি, তোর মতে তার মতন এমন অপবিত্রী মেয়ে আর অগতে নাই !”

“পতাই মাসী আমি বাড়াইয়া বলিতেছি না ! তার যেমন বুদ্ধি, তেমন রূপ, কাল-কর্মে তার তেমন হাত !”

“তোর মণী, তুই ত তাহাকে সর্বগুণ-বতী দেখিবি, বাড়ীর আর সকলে তাহাকে কে কি বলে শুনি ।”

“মার সুখে ত তার প্রশংসা ধরে না ! চোখের বালি দেখে ঘাটবার কথা বলিলেই তিনি অশ্রুত হইয়া পড়েন । এমন সেবা করিতে কেহ জানে না । বাড়ীর চাকর-দাসীরও যদি কারো বামো হয়, তাকে যোনের মত—মার মত দর করে !”

“মহেন্দ্রর মত কি ?”

“তাকে ত জানই মাসী, নিত্যন্ত ঘরের লোক ছাড়া আর কাউকে তার পছন্দই হয় না । আমার বালিকে সকলেই ভাল-বাসে, কিন্তু তার সঙ্গে তার আজ পর্যন্ত ভাল বনে নাই !”

“কি রকম ?”

“আমি যদি বা অনেক করিয়া দেখা-সাক্ষাৎ করাইয়া দিলাম, তার সঙ্গে তাঁর কথাবার্তাই প্রায় বন্ধ । তুমি ত জান, তিনি কি-রকম কুণো,—লোকে মনে করে, তিনি অহঙ্কারী, কিন্তু তা নয় মাসী, তিনি ছুটি একটি লোক ছাড়া কাচাকেও সহ্য করিতে পারেন না ।”

শেষ কথাটা বলিয়া ফেলিয়া হঠাৎ

আশার লজ্জাযেণ্ড ৪৪ল, গাল দুট লাল হইয়া উঠিল। অল্পপূর্ণা খুসি হইয়া মনে মনে হাসিলেন কহিলেন, “তাঁই বটে, সে-দিন মইনু যখন আসিয়াছিল, তাঁর বালির কথা একবার মুখেও আসে নাই।”

আশা হুঃখিত হইয়া কহিল, “ঐ তাঁর ঘোষ! থাকে ভালবাসেন না, সে” যেন একেবারে নাই! তাকে যেন একখিনো দেখেন নাট—জানেন নাট, এমনি তাঁর ভাব।”

অল্পপূর্ণা শাস্ত্রান্বিত হাসো কহিলেন, “আবার থাকে ভালবাসেন, মইনু যেন কল্প-জগতের কেবল তাকেই দেখেন এবং জানেন, এ ভাবও তাঁর আছে। কি বলিস্ চুনি!”

আশা তাহার কোন উত্তর না করিয়া চোখ নীচু করিয়া হাসিল। অল্পপূর্ণা কিজালা করিলেন, “চুনি, বিহারীর কি ধর বন্ দেখি? সে কি বিবাহ করবে না?”

মুহুর্তের মধ্যেই আশার মুখ গভীর হইয়া গেল,—সে কি উত্তর দিবে, ভাবিয়া পাইল না।

আশার নিরুত্তর ভাবে অত্যন্ত তর পাইয়া অল্পপূর্ণা বলিয়া উঠিলেন, “সত্য বুল চুনি, বিহারীর অল্প-বিস্ত্র কিছু হরনি?”

বিহারী এই চিরপতনীনা রমণীর মেহ-সিংহাসনে পুত্রের মানস-অশ্রুপত্রে বিরাজ করিত। বিহারীকে তিনি সঙ্গের প্রতি-শ্রিত দেখিয়া আসিতে পারেন নাই, এ ছুঃখ পবাসে আসিয়া প্রতিদিন তাঁহার মনে জাগিত। তাঁহার কদ সংসারের আর সমস্তই এক পক্ষার সম্পূর্ণ চরিত্র, কেবল

বিহারীর সেই গৃহধীন অবস্থা দ্রবণ করিয়াই তাঁহার পরিপূর্ণ বৈরাগ্যচোঁড়ার বাঘাত ঘটে!

আশা কহিল, “মাদী, বিহারি-ঠাকুরপোর কথা আমাকে জিজ্ঞাসা করিও না!”

অল্পপূর্ণা আশ্চর্য্য হইয়া কিজালা করিলেন, “কেন বন্ দেখি!”

আশা কহিল, “সে আমি বলিতে পারিব না।—বলিয়া ঘর হইতে উঠিয়া গেল।

অল্পপূর্ণা চুপ করিয়া বলিয়া ভাবিতে লাগিলেন।—“অমন লোনার চেলে বেহারী, এত্রি মধ্যে তাহার কি এতই বল হইয়াছে যে, চুনি আর তাহার নাম তনিয়া উঠিয়া যাহ! অদৃষ্টেরই খেলা! কেন তাহার সহিত চুনির বিবাহের কথা হইল, কেনই বা মহেন্দ্র তাহার হাতের কাছ হইতে চুনীকে কাড়িয়া লইল!”

অনেকদিন পরে আজ আবার অল্পপূর্ণার চোখ মিমা জল পড়িল;—মনে মনে তিনি কহিলেন, “মাদা, আমার বেহারী যদি এমন কিছু করিয়া থাকে, মাদা আমার বেহারীর যোগ্য নহে, তবে সে তাহা অনেক ছুঃখ পাইয়াই করিয়াছে, সহজে করে নাই!”

বিহারীর সেই ছুঃখের পরিমাণ কল্পনা করিয়া অল্পপূর্ণার বক বাণিত হইতে লাগিল।

সন্ধ্যার সময় যখন অল্পপূর্ণা আত্মিকে বসিয়াছেন, তখন একটা মাড়ি আসিয়া বসিয়া থাকিল, এবং সহস্র বাড়ীর লোককে ডাকিয়া কুড়িয়াবে বা মাড়িতে লাগিল। অল্পপূর্ণা পূজাগৃহ চত্বরে বলিয়া উঠিলেন, “ঐ বা, আমি একেবারেই চুনিয়া গিয়াছিলাম, আজ কুড়ার শাস্ত্রীর বেং তাঁর চট বোন-

খির এলাহাবাদ হটতে আসিবার কথা ছিল। ঐ বৃষ্টি ভাঙিয়া আসিল। চুমি, তুই একবার আলোটা লইয়া দরজা খুলিয়া দে !”

আপা লঠনহাতে দরজা খুলিয়া দিতেই ফেলিল, বিহারী পাড়াইয়া। বিহারী বলিয়া উঠিল, “এ কি বোটা'ন, তবে যে ভুলিলাম, তুমি কান্দী আসিবে না ?”

আপার হাত হটতে লঠন পড়িয়া গেল। সে যেন প্রেতমূর্তি দেখিয়া এক নিশ্বাসে ঘোড়ার ছুটির গিরা আঁর্টসরে বলিয়া উঠিল,—“বাসীমা, তোমার ওট পারে পড়ি, উঁহাকে এখন যাঁহেতে বল !”

অন্নপূর্ণা পূজার আসন হইতে চমকিয়া উঠিয়া কহিলেন, “কচাকে চুমি, কচাকে ?”

আপা কহিল,—“বিহারি-ঠাকুরপো এখানেও আসিয়াছেন !”—বলিয়া দে পাশের ঘরে গিয়া দ্বার বোধ করিল।

বিহারী নীচে হটতে সকল কথাই শুনিতে পাইল। সে তখন ছুটিয়া গাটে উত্তত—কিন্তু অন্নপূর্ণা পূজাত্তিক ফেলিয়া বখন মাঝিয়া আসিলেন, তখন দেখিলেন—বিহারী দ্বারের কাছে মাটিতে বসিয়া পড়িয়াছে,—ভাহার শরীর হইতে সমস্ত শক্তি চলিয়া গেছে।

অন্নপূর্ণা আলো আনেন নাই। অন্ধকারে তিনি বিহারীর মূখের ভাব দেখিতে পাইলেন না, বিহারীও তাঁহাকে দেখিতে পাইল না।

অন্নপূর্ণা কহিলেন—“বিহারি !”

হাঃ, সেট চিরদিনের বেহুস্থ্যাসিত্ত কণ্ঠস্ব কোথায় ! কণ্ঠের মধ্যে যে

কঠিন বিচ্যেবন বস্ত্র-বসি প্রচ্ছন্ন হইয়া আছে ! জননী অন্নপূর্ণা, সাহারথক্স তুলিলে কার পথে ! ভাগ্যহীন বিহারী যে আজ অন্ধকারে তোমার দলল চরণাশ্রয়ে মাথা রাখিতে আসিয়াছিল !

বিহারীর অবশ শরীর আপাদমস্তক বিছাটের আঘাতে চকিত হইয়া উঠিল—কহিল, “কান্দীমা, আর নহ, আর একটি কথাও বলিও না ! আমি চলিলাম।”

বলিয়া বিহারী ভূমিতে মাথা রাখিয়া প্রণাম করিল, অন্নপূর্ণার পা-ও স্পর্শ করিল না। জননী যেমন গলাসাগরে সন্তান বিসর্জন করে, অন্নপূর্ণা তেমনি করিয়া বিহারীকে সেট রাত্রের অন্ধকারে নীরবে বিসর্জন করিলেন, একবার কিরিয়া ডাকিলেন না। গাড়ি বিহারীকে লটকা দেখিতে দেখিতে অদৃশ্য হইয়া গেল।

সেই রাত্রেই আপা মহেন্দ্রকে চিঠি লিখিল, “বিহারি-ঠাকুরপো হঠাৎ আজ সন্ধ্যাবেলায় এখানে আসিয়াছিলেন। জাঠা-দশাধরা কবে কলিকাতায় কিরিবেন, ঠিক নাই—তুমি শীঘ্র আসিয়া আমাকে এখান হইতে লইয়া যাও !”

(২৮)

সেদিন রাত্রিমাগরণ ও প্রবল আবেগের পরে সকাল বেলায় মহেন্দ্রের শরীর-মনে একটা অবসাদ উপস্থিত হইয়াছিল। তখন কাহ্ননের মাঝামাঝি,—গরম পড়িতে আরম্ভ করিয়াছে। মহেন্দ্র অস্তম্বিন লকালে তাঁহার শরনগৃহের কোণে টেবিলে বই লটকা বসিতেন। আজ নীচের বিছানার তাকিয়ায় তেগান দিয়া পড়িলেন। বেলা

হইয়া যায়, যানে সেগেন না : রাস্তা দিয়া
কেরিওরালা হাঁকিয়া যাইতেছে । পথে
আপিসের পাড়ির শব্দের বিরাম নাই ।
প্রতিবেশীর নূতন বাজী তৈরি হইতেছে,
মিত্রিকজায়া তাহারই ছাত পিটাইবার
ভালে ভালে সময়ে একঘেরে গান
ধরিল । উৎকণ্ঠাপূর্ণ হৃদয়ের চাওয়ায় নহে-
স্ত্রের পীড়িত হৃদয়াল দিলিল হইয়া আদি-
রাছে ;—কোন করিন পণ, উত্তর দেই,
মানস সংগ্রাম আজিকার এত হাল-চাড়া
গা-ঢালা বসন্তের দিনে উপযুক্ত নহে !
“ঠাকুরপো, তোমার অজ্ঞ হরণে কি ?
জান করিবে না ? এদিকে খাবার দে
প্রস্তুত ! ও কি নাই, তটীরে দে ? অল্প
করিয়াছে ? মাথা ধরিয়াছে ?” বলিয়া
বিনোদিনী কাছে আসিয়া মহেন্দ্রের কপালে
হাত দিল ।

মহেন্দ্র অর্ধেক চোখ বুজিয়া জড়িত-
কণ্ঠে বলিল, “আজ শরীরটা ভেমন ভাল
নাই—আজ আর জান করিব না !”

বিনোদিনী কহিল, “জান না কর ত
দুটিখানি খাইয়া ৯০ !” —বলিয়া পীড়াপীড়ি
করিয়া সে মহেন্দ্রকে ভোজনমন্ডানে লইয়া
গেল, এবং উৎকণ্ঠিত হৃদয়ের সহিত অমুরোধ
করিয়া আহ্বান করাইল ।

আহারের পর মহেন্দ্র পুনরায় নীচের
বিছানায় আসিয়া শুইলে, বিনোদিনী
শিয়রে বসিয়া ধীরে ধীরে তাহার মাথা
টিপিয়া দিতে লাগিল । মহেন্দ্র নিবীলিত-
চক্ষে বলিল, “ভাতি বালি, এখনো ত তোমার
পাওয়া হয় নাই, তুমি পাউতে পাও !” —

বিনোদিনী কিছুতেই গেল না । অলস

মধ্যাহ্নের উত্তপ্ত চাওয়ায় ঘরের পর্দা
উড়িতে লাগিল এবং প্রাচীরের কাছে
কম্পমান নারিকেলপাতার অর্থহীন মর্ম্মর-
শব্দ ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিল । মহেন্দ্রের
জ্যপিত জন্মশয়ী দ্রুততর ভালে নাড়িতে
লাগিল এবং বিনোদিনীর ঘননিশ্বাস সেই
ভালে মহেন্দ্রের কপালের চুলগুলি কাঁপা-
ইতে থাকিল । কাহারও কর্তৃ দিয়া একটি
কপা বাহির হইল না । মহেন্দ্র মনে মনে
ভাবিতে লাগিল—“অসীম বিশ্বাস্যতার
অনন্ত প্রবাহের মধ্যে ভাসিয়া চলিয়াছি,
তরঙ্গী ক্ষণকালের ক্ষণ কবন্ কোথায় ঠেকে,
তাহাতে কাহার কি আসে যায় এবং কত-
দিনের ক্ষণট বা যায় আসে !—”

শিয়রের কাছে বসিয়া কপালে হাত
বুলাইতে বুলাইতে বিহ্বল দৌরনের গুরু-
ভারে ধীরে ধীরে বিনোদিনীর মাথা মত
হইয়া আসিচেছিল ; অবশেষে তাহার
কেশাগ্রভাগ মহেন্দ্রের কপোল স্পর্শ করিল ।
বাতাসে আন্মোলিত সেই কেশগুচ্ছের
কম্পিত সূক্ষ্মস্পর্শে তাহার সমস্ত শরীর ব্যাং-
বার কাঁপিয়া উঠিল, হঠাৎ যেন নিশ্বাস
তাহার - বুকের কাছে অবরুদ্ধ হইয়া
বাহির হইবার পথ পাইল না । ধড়কড়
করিয়া উঠিয়া বলিয়া মহেন্দ্র কহিল—“নাঃ
আমার কালেজ আছে, আমি যাই !”—
বলিয়া বিনোদিনীর মুখের দিকে না চাহিয়া
দাঁড়াইয়া উঠিল ।

বিনোদিনী কহিল—“ব্যস্ত হইয়ো না ।
আমি তোমার কাপড় আনিয়া দিই !”—
বলিয়া মহেন্দ্রের কালেকের কাপড় বাহির
করিয়া আনিল । *

মহেন্দ্র ভাড়াভাড়ি কাগজে চলিয়া গেল, কিন্তু সেখানে কিছুতেই স্থির থাকিতে পারিল না। পড়াশুনার মন বিতে অনেক-কণ তুখা চেষ্টা করিয়া সকাল সকাল বাড়ী করিয়া আসিল।

ঘরে ঢুকিয়া দেখে, বিনোদিনী বুকের তলার বালিশ টানিয়া লইয়া নীচের বিছানার উপরুই হইয়া কি-একটা বই পড়িতেছে—রানীকৃত কাগো চুল পিঠের উপর ছড়ানো। বোধ করি বা সে মহেন্দ্রের জুতার শব্দ শুনিতে পার নাই। মহেন্দ্র আস্তে আস্তে পা টিপিয়া কাছে আসিয়া দাঁড়াইল। শুনিতে পাইল, পড়িতে পড়িতে বিনোদিনী একটা গভীর দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিল।

মহেন্দ্র কহিল, “ওগো করুণাময়ি, কামনিক লোকের অস্ত্র জনদের বাজে খরচ করিয়ে না ! কি পড়া হইতেছে ?”

বিনোদিনী ত্রস্ত হইয়া উঠিয়া বসিয়া ভাড়াভাড়ি বইখানা অকলেশ মধ্যে লুকাইয়া ফেলিল। মহেন্দ্র কাড়িয়া দেখিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। অনেককণ হাতাহাতি-কাড়াকাড়ির পর পরাভূত বিনোদিনীর অকল হইতে মহেন্দ্র বইখানি ছিনাইয়া লইয়া দেখিল—বিষবৃক্ষ। বিনোদিনী ঘন নিশ্বাস কেলিতে কেলিতে রাগ করিয়া মুখ কিরাইয়া চুল করিয়া বসিয়া রহিল।

মহেন্দ্রের বক্ষতল তোলপাড় করিতেছিল। অনেক চেষ্টার সে হাসিয়া কহিল—“ছি ছি বড় ক'কি দিলে ! আমি ভাবিয়া-ছিলাম, খুব একটা গোপনীয় কিছু হইবে বা ! এত কাড়াকাড়ি করিয়া শেষকালে কি না বিষবৃক্ষ বাতির হইয়া পড়িল !”

বিনোদিনী কহিল, “আমার আবার গোপনীয় কি থাকিতে পারে শুনি !”

মহেন্দ্র কসু করিয়া বলিয়া ফেলিল—“এই মনে কর যদি বিহারীর কাজ হইতে কোন চিঠি আসিত ?”

নিমেষের মধ্যে বিনোদিনীর চোখে বিদ্যুৎ-স্পন্দিত হইল। এককণ জ্বলন্ত ঘরের কোণে থেলা করিতেছিল, সে যেন দ্বিতীয়বার ভ্রমসাৎ হইয়া গেল। সুহৃৎ-প্রজ্ঞিত অগ্নিশিখার মত বিনোদিনী উঠিয়া দাঁড়াইল। মহেন্দ্র তাহার হাত ধরিয়া কহিল, “মাগ কর, আমার পরিহাস মাগ কর !”

বিনোদিনী নববেগে হাত ছিনাইয়া লইয়া কহিল—“পরিহাস করিতেছ কাহাকে ! যদি তাহার সঙ্গে বন্ধু করিবার যোগ্য হইতে, তবে তাহাকে পরিচয় করিলে সহ করিতাম ! তোমার ছোট মন, বন্ধু করিবার শক্তি নাই, অথচ ঠাট্টা !”

বিনোদিনী চলিয়া বাইতে উদাত হইয়া-মাত্র মহেন্দ্র দ্রুই হাতে তাহার পা বেঁধে করিয়া বাধা দিল।

এমন সময় সম্মুখে এক ছায়া পড়িল, মহেন্দ্র বিনোদিনীর পা ছাড়িয়া চমকিয়া মুখ তুলিয়া দেখিল, বিহারী।

বিহারী স্থির দৃষ্টিপাতে উত্তরকে বহু করিয়া শান্ত দীর্ঘশ্বাসে কহিল—“অত্যন্ত অসময়ে উপস্থিত হইয়াছি, কিন্তু বেশকণ থাকিব না। একটা কথা বলিতে আসিয়া-ছিলাম। আমি কানী গিয়াছিলাম; জানিতাম না, সেখানে বৌঠাকরুণ আছেন। না জানিয়া ঠাণ্ডার কাজে অপরাধী হইয়াছি ; ঠাণ্ডার

কাছে কমা চাহিবার অবসর নাই, তাই তোমার কাছে কমা চাহিতে আসিয়াছি। আমার মনে জানে-সম্মানে যদি কখনো কোন পাপ স্পর্শ করিয়া থাকে, সে জন্যে তাঁহাকে বেন কখনো কোন হুংস সহ্যকরিতে না হয়, তোমার কাছে আমার এই প্রার্থনা।”

বিহারীর কাছে চর্যলতা চঠাৎ প্রকাশ পাইল বলিয়া মহেন্দ্রের মনটা বেন অলিয়া উঠিল। এখন তাহার ঔষাণের সময় নহে। সে একটু হাসিয়া কহিল—“ঠাকুর-ঘরে কলা খাইবার যে গরম আছে, তোমার ঠিক তাই দেখিতেছি! তোমাকে গোব স্বীকার করিতেও বলি নাট, অস্বীকার করিতেও বলি নাট, তবে কমা চাহিয়া সাধু হইতে আসিয়াছ কেন?”

বিহারী কাঠের পুতুলের মত কিছুকণ আঁড়ই হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল—তার পরে যখন কথা বলিবের প্রবল চেষ্টায় তাহার ঠোঁট কাঁপিতে লাগিল, তখন বিনোদিনী বলিয়া উঠিল—“বিহারি-ঠাকুরপো, তুমি কোন উত্তর দিয়ো না! কিছুই বলিয়ো না। ঐ শোকট বহা মুখে আসিল, তাহাতে উহারি মুখে কলক লাগিয়া রহিল, সে কলক তোমাকে স্পর্শ করে নাই!”

বিনোদিনীর কথা বিহারীর কানে প্রবেশ করিল কি না সন্দেহ—সে বেন অপ্রচলিতের মত মহেন্দ্রের ঘরের সন্মুখ হইতে কিরিয়া সিঁড়ি দিয়া নামিয়া হাইতে পারিল।

বিনোদিনী তাহার পশ্চাতে গিয়া কহিল, “বিহারি-ঠাকুরপো, আমাকে কি তোমার কোন কথা বলিবার নাই? যদি তির-স্বাধের কিছু থাকে, তবে তিরস্বার কর!”

বিহারী যখন কোন উত্তর না করিয়া চলিতে লাগিল, বিনোদিনী সন্মুখে আসিয়া ছুই হাতে তাহার দক্ষিণ হাত চাপিয়া ধরিল। বিহারী অপরিমিত দুগার সহিত তাহাকে ঠেলিয়া দিয়া চলিয়া গেল। সেই আঘাতে বিনোদিনী বে পড়িয়া গেল, তাহা সে জানিতেও পারিল না।

পতনশক্তি বিনোদিনী মহেন্দ্র ছুটিয়া আসিল। দেখিল, বিনোদিনীর বাম হাতের কস্টাইয়ের কাছে কাটিয়া রক্ত পড়িতেছে।

মহেন্দ্র কহিল, “ইস, এ যে অনেকটা কাটিয়াছে।”—বলিয়া তৎক্ষণাৎ নিজের পাতলা জামার খানিকটা টানিয়া ছিঁড়িয়া ক্ষতস্থানে ব্যাগেজ্ বাঁধিতে প্রস্তুত হইল।

বিনোদিনী ভাড়াভাড়ি হাত সরাইয়া লইয়া কহিল—“না, না, কিছুই করিয়ো না, রক্ত পড়িতে লাগে।”

মহেন্দ্র কহিল—“বাঁধিয়া একটা ঔষধ দিতেছি, তা হইলে আর বাধা হইবে না, শীঘ্র সারিয়া যাইবে।”

বিনোদিনী সরিয়া গিয়া কহিল—“আমি বাধা সারাইতে চাই না, এ কাটা আমার থাকুক!”

মহেন্দ্র কহিল—“আজ অধীর হইয়া তোমাকে আমি লোকের সামনে অপবন করিয়াছি, আমাকে মাণ করিতে পারিলে কি?”

বিনোদিনী কহিল—“মাণ কিসের জন্য? বেশ করিয়াছ। আমি কি লোককে ভয় করি? আমি কাহাকেও মানি না! বাহারা আঘাত করিয়া ফেলিয়া চলিয়া যায়, তাহারাই কি আমার দল, আর বাহারা আমাকে পায়ে

ধরিয়া টানিয়া রাখিতে চাহ, তাহার। আমার কেহই নহে ?”

মহেন্দ্র উদ্বিগ্ন হইয়া গলাগলকণ্ঠে বলিয়া উঠিল—“বিনোদিনী, তবে আমার ভালবাসা তুমি পারে তেলিবে না ?”

বিনোদিনী কহিল—“মাথায় করিয়া রাখিব। ভালবাসা আমি জন্মাবধি এত বেশি পাই নাই যে, চাই না বলিয়া কিরাইয়া দিব !”

মহেন্দ্র তখন শুই হাতে বিনোদিনীর শুই হাত ধরিয়া কহিল—“তবে এস, আমার ঘরে ! তোমাকে আজ আমি ব্যাধা দিয়াছি, তুমিও আমাকে ব্যাধা দিয়া চলিয়া আসি-
রাছ—যতক্ষণে তাহা একেবারে মুছিয়া না যাইবে, ততক্ষণ আমার খাটরা শুইয়া কিছুতেই মুখ মট ।”

বিনোদিনী কহিল—“আজ নয়—আজ আমাকে ছাড়িয়া নাও। যদি তোমাকে হুঃ দিয়া থাকি, মাপ কর ।”

মহেন্দ্র কহিল—“তুমিও আমাকে মাপ কর, নহিলে আমি রাতে ঘুমাইতে পারিব না ।”

বিনোদিনী কহিল—“মাপ করিলাম ।”

মহেন্দ্র তখন অধীর হইয়া বিনোদিনীর কাছে হাতে হাতে কমা ও ভালবাসার একটা নিদর্শন পাইবার জন্য ব্যগ্র হইয়া উঠিল। কিন্তু বিনোদিনীর মুখের দিকে চাহিয়া থমকিয়া পড়াইল। বিনোদিনী সিঁড়ি দিয়া নামিয়া চলিয়া গেল—মহেন্দ্রও

ধীরে ধীরে সিঁড়ি দিয়া উপরে উঠিয়া ছাবে = বেড়াইতে লাগিল। বিহারীর কাছে হঠাৎ আজ মহেন্দ্র ধরা পড়িয়াছে, ইহাতে তাহার মনে একটা মুক্তি আনন্দ উপস্থিত হইল। লুকাচুরির যে একটা দৃশ্যতা আছে, এক-জনকে কাছে প্রকাশ হইয়াই যেন তাহা অনেকটা দূর হইল। মহেন্দ্র মনে মনে কহিল—“আমি নিজেকে ভাল বলিয়া সিঁধ্যা করিয়া আর চালাইতে চাহি না—কিন্তু আমি ভালবাসি—আমি ভালবাসি সে কথা মিথ্যা নহে।” নিজের ভালবাসার গৌরবে তাহার স্পন্দা এতই বাড়িয়া উঠিল যে, নিজেকে মন বলিয়া সে আপন মনে উজ্জত-ভাবে গর্জ করিতে লাগিল। নিতম্ব সন্ধ্যা-কালে নীরব কোণঠিকমণ্ডলী-অধিরাগিত অনন্ত অগতের প্রতি একটা অবজা নিক্ষেপ করিয়া মনে মনে কহিল—“যে আমাকে যত মন্দই মনে করে করুক, কিন্তু আমি ভাল-বাসি!” বলিয়া বিনোদিনীর মানসী মুক্তিকে দিয়া মহেন্দ্র সমস্ত আকাশ, সমস্ত সংসার, সমস্ত কর্তব্য আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল। বিহারী হঠাৎ আসিয়া আজ যেন মহেন্দ্রের জীবনের ছিপি-আঁটা নদীপাত্রে উটাইয়া ভাঙিয়া ফেলিল—বিনোদিনীর কালো চোখ এবং কালো চুলের কালী দেখিতে দেখিতে বিস্মৃত হইয়া পুরোকার সমস্ত শাণা এবং সমস্ত লেখা লেখিয়া একাকার করিয়া দিল।

ক্রমশ ।

মদন-মহোৎসব ।

—o—

স্বাধীন নাট্যকার যে মদন-মহোৎসবের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা এক-সময়ে সমগ্র আৰ্য্যাবৰ্ত্তে সমুচিত সংবৰ্দ্ধনার সহিত সৰ্ব্বত্র অঙ্গুষ্ঠিত হইত। তখন নাগ-রিকগণ বঙ্গদেশমাগমে আরম্ভকরী নবোৎসব-প্রতীকার ঐশ্বর্য্যকোর সহিত দিন গণনা করিত, এবং উৎসবদিন উপনীত হইবামাত্র আনন্দে উৎসব হইয়া উঠিত। ক্রিয়াক্রিয়সের মত প্রাচীন শিষ্টাচার তিরোহিত হইয়া অশান্ত নৃত্যগীত,—হুতা, কুছুম ও আবীর প্রভাব,—সগর্বে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিত। রাজা, প্রজা, স্ত্রী, পুরুষ, সকলেই সে মহা-মহোৎসবে যোগদান করিতেন। বসন্ত-বিজয়যোযা নাগরিক-হর্ষকোলাহল মত-তল শব্দধ্বনি করিয়া তুলিত। ইহা ভারতবর্ষের বহু পুরাতন জাতীয় মহোৎসব।

বহুদিন হইল, এই জাতীয় মহোৎসব তিরোহিত হইয়া গিয়াছে; কেবল তাহার বুলে “হোলী” অধিকার বাক্য করিয়া অভ্যাগি আবীর-কুছুমের মর্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছে;—কিন্তু শক্তিসমাবে তাহার প্রভাবও ক্রমশ বশীভূত হইয়া পড়িতেছে।

সম্প্রতি স্বাধীন নাট্যকার যে অত্যাং-কৃত বঙ্গাঙ্গবঙ্গ প্রকাশিত হইয়াছে, তাহার চুম্বিকার অঙ্গুষ্ঠাবলী ঐশ্বর্য্য জ্যোতির্বিজ্ঞানাপ-চাক্ষুৰ মধ্যম নিখিরাছেন,—“কোন সময়ে হইতে এ দেশে মদন-মহোৎসব হইত হইয়া

ঐশ্বর্য্যকোর দোলোৎসব আরম্ভ হয়, ইহা একটি ঐতিহাসিক রহস্য।” এই রহস্য তেজ করিব্যার পর্যাপ্ত উপকরণ প্রাপ্ত হওয়া যায় না। কারণ, অতি বীরে বীরে এই পরিবর্তন সংঘটিত হইয়াছে। কিন্তু উৎসবের বাহুবল্যের বিশেষ পরিবর্তন হইয়াছে বলিয়া বোধ হয় না; নামের পরিবর্তনও বঙ্গামাত্র। বর্তমানে “হোলি” বা “হোয়ী” শব্দ পুরাতন “হোলাকা” শব্দের সংক্ষিপ্ত পাঠ। হোলাকার অর্থ বসন্তোৎসব। বসন্ত-কালে অঙ্গুষ্ঠিত হইত বলিয়া মদনোৎসবকেই বসন্তোৎসব বলিত। জনসাধারণের মধ্যে বসন্তোৎসব “হোলাকা” নামে পরিচিত ছিল; তাহাই এখন “হোলী” নাম ধারণ করিয়াছে। হোলাকার সেকালের নাগরিকগণ আবীর-কুছুমে প্রমোদিত হইয়া, নাগরীসঙ্গে হোলাহোলা করিতেন বলিয়া, তাহা “হোল”-নামেও পরিচিত ছিল। এই হোল এক-দিনে শেষ হইত না; সমগ্র বসন্ত ঋতু ভরিয়া হিন্দোলা আন্দোলিত হইত; এবং রাজা, প্রজা, সকলেই হিন্দোলায় হোল খাইতে খাইতে বসন্তোৎসবের মাদুর্য্য বিস্তার করিতেন। মহাকবি কালিদাস নানারূপে এই দোলোৎসবের আভাস প্রদান করিয়া গিয়াছেন। “মালবিকাগ্নিমিত্র” রাজা অগ্নি-মিত্র দোলখোলা, মত রাণী ইরাবতী কল্কক আঁধিত; “রঘুবংশ” মন্দর্য্য সভাসভাই

কামিনীভূষণতাপ্ত্রেবকটকিতকর্থে হিন্দোলার
খোলারমান । বধাঃ—

“অনুত্তরবদনোদবুৎসবঃ

পটুগণি নিরকর্টকিতকর্ম্ম ।

অনরদাসনবদুশরিহরে :

ভুগলঃ ২ঃ কলভানবলাজনঃ ।

এই মদনোৎসবের প্রকৃতি কিরূপ ছিল,
কোন সময় হইতে কিরূপেই বা তাহা
বীরে বীরে পরিবর্তিত হইয়া বর্তমান
মোলোৎসবমাত্রে পর্দাবসিত হইল, তাহার
ঐতিহাসিক তথ্যানির্ণয় করা কঠিন হইলেও,
একেবারে অসম্ভব নহে । বর্তমান প্রবন্ধে
তাহার তথ্যাস্থান প্রণালী প্রদর্শিত হইল ।
পুরাণে মদনমহোৎসবের বিবৃত বিবরণ
প্রদত্ত হইয়াছে ; নাটকাদিতে তাহার
লৌকিক চিত্র স্পষ্ট চিত্রিত রহিয়াছে ।
প্রকৃতিনির্ণয়ের জন্য ইহাই আপাতত
যথেষ্ট ।

কল, ভবিষ্য ও মন্ত পুরাণে মদন-
মহোৎসবের পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায় ।
মৎস্যপুরাণে সমধিক বিবৃত বিবরণ প্রদত্ত
হইয়াছে । চৈত্রমাসের শুক্লা দ্বাদশী হইতে
এই মহোৎসবের আরম্ভ হইত । তিথিগুলি
বর্ণাক্রমে মদনদ্বাদশী, মদনত্রয়োদশী ও
মদনচতুর্দশী নামে পরিচিত ছিল । ত্রু-
নন্দন দ্বার্ত্তশিবোদয়ির ‘অষ্টাবিংশতি তর্বে’ ও
মদনচতুর্দশীর উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায় ।
ইহা পুরাকালে ত্রতমধ্যে পরিগণিত হইত ।
অত্রান্ত ত্রতের স্থায় ইহারও কলপ্রতি ছিল ;
সাধারণ কল আপদের বিনাশ, বিশেষ কল
পুত্রলাভ । সুপুত্রলাভকামনার গৃহলক্ষীগণ
সমুচিত ভক্তভরেই ত্রতপালন করিতেন ।

তাহাতে উপবাস ছিল, কঠোরতা ছিল,
ভাগ্যস্বীকার ছিল,—ত্রতশেষে দক্ষিণাধান ও
ব্রাহ্মণতোষনেরও ব্যবস্থা ছিল । রত্নাবলী
নাটিকার বিদ্যুৎ মহাশয় তাহা ইন্দিতে
সুব্যক্ত করিয়া গিয়াছেন । বধাঃ—

“রাজা । দ্বিত-ক রাজ্য এই,

সুযোগ্য সচিব স্তম্ভ এ রাজ্যের ভার

সমাক-পালিত প্রজা,

এসমিত উপহ্রব সঙ্গ অত্যাচার ।

প্রদ্যোতজনরা সেই

প্রচলী বালবনস্তা রাণী,

তুমি বদন্তক ওগো,

প্রিয়দর্শা নন্দ-সমানি ঐ

কল্প সে কামদেব,

নামে মাতৃ তুমি অমৃত,

এ তাঁর উৎসব নহে,

—আমারি এ মহান উৎসব ।

বিদ্যুৎক । (সংঘে) মহারাজ ! তা নয় ।

আমনি যে উৎসবের কথা বল্ছেন, আমি বলি সে
অংশনারক নয়, কামদেবেরই নয় ; সে শুধু এই
ব্রাহ্মণবটুই উৎসব ।”

ত্রতান্তে রাজা পাদা, অর্ঘ্য, মালাচন্দন ও
প্রণামমাত্র লাভ করিবার সময়ে বসন্তক-
ঠাকুর রাণীর নিকট হইতে হাতভরা স্বস্তি-
বাচনের ডালা দক্ষিণা পাইয়া এ কথার
অর্থ নীরবে বুঝিয়া দিরাছিলেন ! মদন-
মহোৎসবের পূজাপদ্ধতি সংক্ষিপ্ত ছিল ।
বাহুপূজাতে “চাপেদুহক কামদেবো কলবান্
দ্বিধমোহনঃ” এই সংক্ষিপ্ত ধ্যান, এবং
ধ্যানান্তে প্রণাম । বধাঃ—

“পুণ্যধন ! নমস্তস্ত নমস্তে বীনকেন্দন ।

মুখীনঃ সোমপালনাঃ বৈদ্যচ্যুতিভূতে নমঃ ।

স্বাদবাস্তবঃ কলপঃ । পথগারঃ । ইতিপ্রঃ ।

নমস্ততাঃ । (ইত্যেতৎসময়ে মনোভূতঃ)

আধাশো মম নশ্বর ব্যাংচর শরীংখাঃ।

সম্মত্যভাবকীৰ্ত্তং মে সম্পদঃ সত্বে মে হিরাঃ।

নখো দ্বাৰাধ কাম্যার নেবংবন্ত দূৰ্ত্তবে।

ব্রহ্মবিষ্ণুশিবেজ্ঞাণাঃ মনঃকোচকরাঃ চ।”

এই কামজ্জতি পাঠ করিলেই বৃকিতে পারা যায়, ইহা “কামগুরুহীন,” আদি-ব্যাধিবিনাশপ্রার্থনাত্মক সাধারণ ইষ্টসিদ্ধি-পুত্র। স্তুতরাং নরনাট্যমাত্রেই মদনোৎসবে ব্যাপ্ত হইতেন। পুত্র, ব্রত, উপবাসাদি ইহার সাবিক অঙ্গ, পিতৃধারা ও নৃত্যোৎসব তাত্ত্বিক ও তামসিক অঙ্গ বলিয়া পরিচিত ছিল। তাহার স্পষ্ট জনসাধারণের বনিষ্ট সংস্রব সংদাপিত হইরাছিল। তাহাতে যে খণ্ডে বাহ্যিকের প্রকাশিত হইত, তাহা সহজেই বৃকিতে পারা যায়। বাহ্যিকের আধীত-কুচুন মহাৰ্থ হইয়া উঠিত, রাতপথে অন্তঃপ্রবেশে গমনাগমন করা কঠিন হইয়া পড়িত; উন্মুক্ত বাতাসে উপবেশন করিবার উপায় ছিল না; ধারাবাহিকঃ স্তম্ভলিঙ্গসকল শ্রীংকার করিতে হইত।

রত্নাবলীতে দেখিতে পাওয়া যায়, রাণী বাসবদত্তা অশোকবৃক্ষমূলে কামদেবের অৰ্জনা করিয়াছিলেন। অৰ্জনাতে সৌভাগ্যবতী সধবাগণ যে পতিপারম্পর পূজা করিতেন, বাসবদত্তা তাহাও দেখাইয়া গিয়াছেন। অশোকবৃক্ষই মদনপুন্ডর প্রপত্ত ক্ষেত্র। সিদ্ধিহারক বলিয়া অশোক পঞ্চবটীর অন্তর্গত। তগবান্ মকরকেশবের সঙ্গে অশোকবৃক্ষের ইহা অপেক্ষাও বনিষ্ট সংস্রব ছিল। তাঁহার সুবিখ্যাত পঞ্চবাণ পুষ্পময়, তাহা পঞ্চপুণ্ড্রে গঠিত হইত। তদন্ত কুসুমধারকে পদ্ম, অশ্রু, নবমলিক;

ও নীলোৎপলের স্তায় অশোকপুন্ডরও সজ্জন করিতে হইত। বথাঃ—

“মরবিশ্ববশোকক হৃতক নবমলিকা।

নীলোৎপলক পটকতে পঞ্চবাণত সারকাঃ চ”।

বসন্তমহাগমে অশোকের পুশোকনমে বিলম্ব ঘটিলে, প্রমদাকুল প্রমদ গগনা করিতেন। স্তুতরাং অশোকের মূল ফুটাইবার মন্ত মন্তত্বের আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইত। ইহাকে অশোকের “সাধ” বলিত; “সাধ” বিশেষ মূল ফুটত। সে “সাধ” আর কিছু নয়,—সম্পূর্ণচরণতাড়না।

“সম্পূর্ণচরণে ব্রীচরণে নাস্তিতাড়নং।

বোহমঃ ধবশোকক ততঃ পুশো-ল্লমো ভবেৎ চ”

অভিধানে ইহাকে “কবিপ্রসিদ্ধি” বলিয়া থাকে। কিন্তু ইহা কবিপ্রসিদ্ধি-মাত্রই—সম্পদা কালমিক, একপ অসুখান করা যায় না। প্রমদাগণ সভাসভাই অশোককে এইরূপে “বোহম” বান করিতেন। তদন্ত মূল ফুট কি না, সে বস্তুর কথা। কিন্তু সেকালের মহিলাসমাজে যে এই প্রথা প্রচলিত ছিল, “মালবিকাগ্নিত্রে” তাহার পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। রাজমহিষী দারিদ্রী দেবী বিদূষক গৌতমের “নট্যমিতে বোলা হইতে পড়িয়া গিয়া” পায়ে বড় বাধা পাইয়াছিলেন, তাই বহু অশোককে “বোহম” বান করিতে অশক্ত হইয়া মালবিকার উপর ভারপ্রাপ্ত করেন। মালবিকা অশোককে চরণধাগ স্পন্দন করিয়া স্বর্ণপুন্ডরশোভিত চরণের তাড়নার কিরূপে সোহমবান্ধিরা নির্দোষ করিয়াছিলেন, কবি তাহা বিলক্ষণ নিপুণতার সঙ্গে বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন।

অশোকবৃক্ষমূলে মদনপুত্রের বাবরা হইবার বোধ হয় আরও একটু কারণ ছিল। অশোক কামিনীকূলের সর্পশোকবিনাশক; ত্রীয়োনিবারক অব্যর্থ ঔষধ। চৈত্র্যমাসে অশোকতরু মঞ্জরিত হইবার সময় হইতেই মহিলাযুগলীর নানাতরুণ অশোকব্রতপালনের ব্যবস্থা দেখিতে পাওয়া যায়। চৈত্র্যশুক্র। বজ্রিতে অশোকবজ্রী পুষ্পবতীর পক্ষে অবশ্যপ্রতিপাল্য ব্রত; চৈত্র্যশুক্র। অষ্টমীতে অশোকাষ্টমী ব্রতে অষ্ট অশোককলিকা পানের অশেষ ফল কীর্তিত। এই সকল কারণে মনে হয়, বৃষ্টি বসন্তসামাগমে নানা ব্রতনিয়মব্যাপদেশে মহিলাগণকে অশোক-মূলে সমবেত হইবার ব্যবস্থা করিয়া শাস্ত্র-কার্য্যগণ কোণে লোপকাব্যের সহায়তা করিয়া গিয়াছেন। তাবপ্রকাশে অশোকের অনেক গুণ উল্লিখিত আছে। যথা :—

“অশোকঃ শিউলপত্রিকো গ্রন্থী বর্ষাঃ কবায়কঃ ।
বোমণটীতুগাহতুঃশিখোঃপরিণামপ্রিভবঃ ।”

মদনদেবের পুত্রের জন্ম অশোকবৃক্ষমূলে প্রাপ্ত হইলেও, অম্লিদানে চুতমঞ্জরীর প্রাধান্ত দেখিতে পাওয়া যায়। “অভি-জ্ঞানপঞ্চমূলে” তাহার আভাস আছে। পঞ্চাভ্যাপ্তগুণ প্রস্তুত মদনমহোৎসব নিবারণ করিবার জন্ত চুতমঞ্জরীচরন নিবেদ্য করিয়া দিয়াছিলেন। এই সকল পুরাতন প্রথা কোনপ্রকার বৈজ্ঞানিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল কি না, তাহা জানিতে না পারিলেও, সেকালের গৃহস্থের বাস্তবসংলগ্ন জ্ঞানোদ্যানে আত্ম ও অশোক যে পরস-সমাগমে প্রতিপালিত হইত, তাহার অনেক প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। এখন সেই

সকল গ্রন্থ অন্তঃপ্রেরিত বিভিন্ন বিদেশীয় পাদপ দীপ্তে দীপ্তে অধিকার করিয়া লইয়াছে। বিদেশীয় শাসনের জ্ঞান বিদেশীয় রুচিও আমাদের আন্তরিক স্বাধীনতা বিলুপ্ত করিয়া আমাদের পুরোপদেশোপদেষ্টা-দ্বারা প্রতিষ্ঠিত পরিণত করিয়াছে। এখন অশোক জন্মিত হইবে না কেন?

মদনমহোৎসবের বাহ্যভঙ্গের বড় জঘন্য-স্বাদক বলিয়া নরনারী সহজেই তাহার অহরহ হইয়া উঠিয়াছিল। ভারত-বর্ষের জ্ঞান স্থপতিরা বিভিন্ন দেশের বসন্ত-সমাগম সভ্যতাই অবলম্বন করত। বোধ হয়, পূর্বার আত্মপ্রভাবের ভারতীয়গণকে প্রথমে বনজ লতাপুষ্পে স্থাপিত করিয়া উৎসবময় করিয়াছিলেন। কালে তাহাই জাতীয় বঙ্গোৎসবে পরিণত হইয়াছিল। কালক্রমে তাহার সহিত নৃত্যগীত, অধীর-কুসুম, হিলোলা ও হুয়া সম্মিলিত হইয়া মোহাবেশে মধুমাগকে সত্যসত্যই মধুময় করিয়া তুলিয়াছিল। সেট মধুসামাগমময় বাহিতজননগুণে সপ্তম-সকোচ তিরোহিত হইয়া কত নিভৃত জনহবেদনা সঙ্গীতজ্বলে উজ্জ্বলিত হইয়া উঠিত। বঙ্গবরের মধ্যে সেই এক দিন! তাহার প্রতীক্ষার কে না দিবস গণনা করে?

এই মহোৎসবের উদ্ভাসদূশা “রত্নাবলী”তে কেমন সুকোণে চিত্রিত হইয়াছে;—যেন এখনও তাহা প্রত্যক্ষবৎ প্রতীয়মান। রথায়ুধ প্রতিশব্দিত করিয়া মাদনের উদ্ভাস বাদানিনাদ চতুর্দিকে প্রসাধিত হইতেছে; বিকীর্ণ অধীরচূর্ণে দিনগত আচ্ছন্ন হইয়া পড়িতেছে; ধারাবাহিকঃস্বত সুসজ্জিত বায়-

বালা'কম্পনশব্দ' হঃ প্রবৃত্তা' পাণ্ডব' তঃ পং
কেন্তকীপক্ষপুতঃ তদ্ব্যবাসঃ সপ্তকম্পনশব্দঃ
কুছুমঃ পাণ্ডবীকৈ বৎ মধুবতী ভমৌভিতম্ ।
বিবৎপাত্তুরবর্গঃ তদবসঃ সপ্তকম্পনশব্দঃ ।

এই সময়ে ইসলামের নবোন্মিত মহা-
শক্তি বীরে বীরে পশ্চিমদগুপ্তভীরে শক্তি-
শক্তি কবিত্তেছিল। ক্রমে তাহা যখন
ভারতশীমার সমুদ্রগত হয়, তখনও ভারত-
বর্ষে মদনমহোৎসবের প্রাদান্য ছিল। অল-
বেহীকৃত ভারতবিবরণীতে তাহার পরি-
চয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। তখন পর্য্যন্তও
হোলাক। হোলীতে পরিণত হয় নাট।
ঐশ্বর্যবোত্তমদেবরত্ন 'গারাবলী' নামক স্থি-
থিত লক্ষ্যকোষেও হোলাক। মদনমহোৎসব
নামেই বাখ্যাত দেখিতে পাওয়া যায়। যমজী-
ভাষানিবন্ধ 'কবিচরিত'-নামক গ্রন্থে পুরুষো-
ত্তমদেব শালিবাহন-শতাব্দীর চতুর্দশ
শতকের কলিকাতাধিপতি বলিয়া পরিচিত। এট
'হোলাক।' নাম 'হোলী' উক্তি 'ভাষা' বলিয়া
দায়ভাগের টীকায় প্রথম বাখ্যাত দেখিতে
পাওয়া যায়। সুতরাং মূলগমানশাসন-সময়েই
যে পুরাতন হোলাক। আধুনিক হোলী
হইয়া পড়িয়াছে, তাহাটী সিদ্ধান্ত করিতে হয়।

যাহা জাতীয়মহোৎসবরূপে দীর্ঘকাল
প্রচলিত থাকে, তাহা সহস্র ভিবেদিত
হইতে পারে না। যৌদ্ধবৃণের বথবাত্রা
ভিবেদিত হয় নাই; বথাজুড় বুদ্ধবৃষ্টির
পরিবর্তে নারায়ণবিগ্রহ আগমন গ্রহণ করি-
য়াছেন। মদনমহোৎসবেও এইরূপ ঘটি-
য়াছে বলিয়া বোধ হয়। মদনমহোৎসব
পর্য্যটন জাতির মর্যাদারক্ষা করিতে
অক্ষম। অববোধপথঃ ঈশ্বর সম্পূর্ণ প্রতি-

কূল। সুতরাং মূলগমানশাসনের সঙ্কট
এই মদনমহোৎসবের প্রকৃতি কিয়ৎপরিমাণে
পরিবর্তিত করিয়া দিয়াছে। পুরাকালে
মদনপূজার সঙ্গে বিকৃপ্ণাও অঙ্গীকৃত হইত;
মদনপূজা অঙ্গীকৃত হইয়া বিকৃপ্ণাই অব-
শিষ্ট রহিয়াছে। উত্তর পূজায়ই বাহ্যিক
একরূপ ছিল; সুতরাং মাঘী-কুছুম, নৃত্য-
গীত সমভাবে প্রচলিত আছে; কেবল যে
উৎসব সমগীমগুনীর বিশেষ অধিকারে শীমা-
বদ্ধ ছিল, তাহা পুণ্যসমাবেশে বানগত
করিয়া সমগীমগুনীর নৃত্যগীত মৌল্যবোধ
হইতে বীরে বীরে অসম্বত করিয়া দিয়াছে।
তাঁহার অগ্রাণি মাঘী-কুছুমের চড়াহুড়ি
করেন; কিন্তু তাঁহাতে মদনমহোৎসবের
উদ্ভাদনুভোজ অভাব।

মদনমহোৎসব হোলীতে পরিণত হই-
বার পরেও বর্তমান পর্য্যন্ত হিন্দু সর্বপ্রধান
পূর্ণ বনিয়া মূলগমানশাসনের নিকট পরিচিত
ছিল। কোম্পানীবাগান্তর শাসনকর্তার
"কলিকাতা গেজেট" যে ছুটির তালিকা
মুদ্রিত হয়, তাহাতেও দেখা যায় যে, অষ্টাদশ
শতাব্দীর শেষভাগেও হোলীর ছুটই সর্বা-
পেক্ষা বড় ছুট ছিল;—দুর্গোৎসব তাহার
তুলনায় যেন কিছুই নয়! কাল ও অবস্থার
পরিবর্তনে জনসমাজের আচার-ব্যবহারের
স্তায় উৎসব-আনন্দের প্রকৃতিও যে কতদূর
পরিবর্তিত হইয়া যায়, ভারতবর্ষের ইতিহাসে
তাঁহার প্রমাণের অভাব নাই। দেকালে
যে সকল জাতীয় মহোৎসব প্রচলিত ছিল,
সে সমস্তই বিলুপ্ত বা রূপান্তরিত হইয়া
নূতন মহোৎসবের প্রচলন করিয়া দিয়াছে।
ইতিহাসের অভাবে সনাতনবাসিগণ প্রচলিত

উৎসবত্বনিকটে ডিবপুরাতন বলিয়া কৃষ্ণ-
লাভ করিতেছেন।

“চন্দ্রনাথকন্তরীতকৃত্তবৎসবৎসবঃ।

আবীরচূর্ণঃ কঠিঃ পুণ্ড্রাং পরমেশ্বরঃ।”

ইতিমধ্যে ঐক্যকে আবীরচূর্ণ প্রদান
করিবার কথা ব্রহ্মবৈবৰ্ত্তপুরাণে দেখিতে
পাওয়া যায়। অনেক ইহাকেই হোমীর
ঐতিহাসিক স্মৃতি বলিয়া ব্যাখ্যা করিতে
পারেন। কিন্তু ঐক্য স্বয়ং মদনমহোৎস-
বে আবীরচূর্ণ লাভ করিতেন; তাহাই
তখনকার দোল ছিল। মদনমহোৎসবের
স্বায়ং আবীর ও ক্রমশঃ বর্ণ পরিবর্তন করি-
তেছে! আর কিছুদিন পরে আবীরের
“লালে লাল” চলিত হটরা উঠিবে; এখনই
দোলের সময় বিলাতী হাটের প্রভাবে নাগ-
রিকগণের উত্তরী ও পরিণত নীল বেগুনি,
নানা বর্ণে সুরঞ্জিত চটতেছে! প্রাচীন মদন-
মহোৎসবে আবীরের লাল ও কৃত্তবৎসব
বর্ণেরই প্রাধান্ত ছিল; বঙ্গব্রতনে “কৌজুত”
ব্যবহৃত হইত। বাক্যপ্রকৃতির বসন্তোৎসব
বিচিত্র বর্ণসমাবেশের সঙ্গে এটী সকল ব্যবহার
বর্ণসামঞ্জস্য ছিল। কথা :-

“বিকীর্ণ আবীরচূর্ণে রাহা বেন অকং উৎসবঃ।

কৃত্তবৎসবঃ চূর্ণে বেন চারিদিক পীতবর্ণময়ঃ।

বর্ণ-আভরণ-আত্মা “কিভিরাং” পুণ্ড্র কোটে কত,

ওহ ওহ পুণ্ড্রাং তরলি কিবা অবতঃ।”

মদনমহোৎসবে পুষ্পের বথেষ্ট সমাদর ছিল;
হোলীতে সেরূপ পুষ্পসমাদর নাই। পুষ্পের
সঙ্গে মালোর পৌরবও তিরোহিত হইয়া
গিয়াছে। মদনমহোৎসবে সে সকল প্রিয়
পদার্থ ব্যবহৃত হইত, তন্মধ্যে আবীর-কৃত্ত-
বৎসব নামকটাই বর্তমান; চন্দ্রনাথ বলিয়া

কৃত্তবৎসব পরিভাষ্য হটরাতে, বিলাতী-বর্ণচূর্ণ-
প্রভাবে আবীর হাট হইয়া উঠিয়াছে!

মদনমহোৎসবে নাগর-নাগরী পুণ্ড্র-
দ্বায়ে স্নোভিত হইয়া হিন্দোনার দোল
বাইত; তাহা এখন ঐ প্রাচীনকালের-
বিন্দে সমর্পিত হইয়াছে! এই পরিবর্তনের
মূলে মুসলমানশাসনের দ্বার বৈষ্ণবচাচারের
প্রভাবও পরিণত হইয়াছে। তৎকাল বৈষ্ণব
বিষয়বিরুদ্ধ অনাসক্ত রূপে আত্মবৎ সেবা-
পদ্ধতি প্রচলিত করিয়াছেন। বাহ্যতে
আত্মসুখ, তাহাই ভগবানে অর্পিত হইয়াছে
বলিয়া, ভগবানকে এখন মনকম্পন-
নিবারণের জন্য মশারি পণ্ডিত্য ব্যবহার
করিতে হয়। তন্মতের মালাচন্দন ও
মোলাবোহণও এইরূপে ভগবানের
মোহোৎসবের যথিমা বৃদ্ধি করিতেছে
পুণ্ড্রকালের মদনমহোৎসবে একতরু আত্ম-।
ত্যাগের দৃষ্টান্ত দেখা বাইত না। তখন
মানবদমাজ সরল শিশুর দ্বারা আনন্দে
হাসিত, উৎসবে নাচিত, উল্লাসে উদ্ভূত
হইত; বৃক্কের মধ্যে চিত্তের আগুন চাপিয়া
রাখিয়া তৎক্ষণে প্রসাদভিখারী ধর্মকঙ্ক-
ধারী ভগবতের দ্বারা পুণ্ড্রমন্দিরে বসিয়া
ধাকিত না! এখন কামিজ-ঢাকা বৃক্কের মধ্যে
কি থাকে, কেমন করিয়া বলিব? তাই
আমরা বেশ বৃক্ক হুলাইয়া সেকালের মদন-
মহোৎসবকে কৃত্তচূর্ণ অলীক মেনাচার
বলিয়া নিন্দা করি। আমাদের স্মৃতি ও সন্না-
চার আমাদিগকে কৃত্তমতার অন্তর সলিলে
কতদূর নিমজ্জিত করিতেছে, কবিধাতের
ইতিহাস তাহার গভীরতার পরিমাপ করিবে!
ঐক্যকুমার মৈত্রেয়।

ফ্যাটিমুটিন্স-রহস্য ।

সোমবার। বিলাসপুরের পানার চৌকী-
দারেরা হাজিরা দিতে আসিয়াছে।
পুলিস-বাঙ্গলোর সম্মুখে দুটো দুটো খানি টুক-
রচিত ক্ষুদ্র বেদী সমান্তরাল শ্রেণীতে
বিতস্ত, এবং সংখ্যায় প্রায় দেড় শত।
ইহাই তাগাদের বসিবার স্থান।
পুলিসের ভাবায় ইহার নামান্তর 'বিট'
জনপ্রিয় নীল-কুর্তী-পরিহিত এবং সেই
রংয়ের পাগড়ীধারী চৌকীদার নিজ নিজ
নির্দিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া বসিয়া আছে
এবং জমাদারসাহেবের আগমন প্রতীক্ষা
অক্ষুণ্ণরূপে নিজেদের ভিতর কলহ-কচুকটি
স্রু করিয়া দিয়াছে। তাহাতে গোষ্ঠীভূত
মধুরমবৎ, হাতে সমাগত জনকন্ডালের
দুরন্ত অস্পষ্টস্বনিবৎ, একটা অবাঞ্ছিত কণ-
বর্ষণ স্থানটাকে মুখরিত করিয়া তুলিয়াছে।
প্রত্যেক চৌকীদারের হাতের কাছে হয়
চুত বা ছড়তাণ্ড, পার্বাণা দুটো একটা
“মহুনিবিহ পক্ষী” অথবা তাহারই করটা
অণুমাত্র সাজান—নহিলে হাজিরা জমে
না। জন কয়েক চৌকীদার পানার সংলগ্ন
দারোগা-সাহেবের ফুল ও তরকারির বাগান
কোদালি-সহযোগে খনন করিতেছে, তাহা-
দের গায়েই কুর্তী ও মাথার পাগড়ী সম্মুখ-
বর্তী অশ্বখগাছের শাখাপাশাখ লম্বমান
হইয়া “উফি-বিরহিত” চৌকীদার-জীবন

প্রত্যক্ষ করিতেছে। অদূরে নদীর ধারে
জন কতক চৌকীদার উর্দি ও কুর্তী পরি-
হিত হইয়াই খুরপা হাতে জমাদার-সাহেবের
ঘোড়ার ঘাল ছুনিতে বসিয়া গিয়াছে।
আজ তাহারা বড় আনন্দে আছে, দুই প্রহ-
রের পরই বাড়ী ফিরিতে পারিবে। কেন
না, স্বয়ং দারোগা-সাহেব তাঁহার অশ্বখুল
লইয়া তিনদিন হইল বেহাং রওনা হইয়া-
ছেন। তিনি সন্দেরে থাকিলে বেচারী
দের সত্যায় পূর্বে থানাভাগের হুকুম
নাই।

সাধারণত জমাদারজী বেলা ৮টার
পূর্বে পথভাগ করেন না, “অপসরের”
অনুপস্থিতিতে আজ তাঁহার আরেদের মাত্রা
আরো ঘণ্টাখানেক বর্ধিত হইয়াছিল।
অতএব দক্ষিণ কর্ণের শিরোভাগে শুটি-
কতক ঝড়িকা রক্ষা করিয়া বামহস্তে
আলবোলা নলটি তাৎক্ষণিকরূপে ওষ্ঠাধরে
স্থাপন করিতে করিতে দোহলামান-উদর
জমাদার কিম্বদন্তীর যখন পানার আফিস
বাস্তান্বায় “উসরিফ্” লইয়া আসিলেন,
বেলা তখন দশটা বাজিয়া গিয়াছে।

বৈশাখী সাহায্যের বাতাব্যর্থগর্ভ অকাল-
জলদের সঙ্গে কিম্বদন্তীরই স্নেহ-চিহ্ন
মুর্তিখানির ধাহারা তুলনা করিতে চান,
তাঁহাদের সাধুপ্রজ্ঞান নাট এমত বলিলে

লেখক বর্ষে পড়িত হইবেন। সন্তুষ্ক বগেই
এবং তাহার প্রাণবৎসল ইহা বলিতে পারি
বে, দুই হইতে তাহার সে মূর্তি দেখিয়া
চৌকীদারের দল ইতিপূর্বেই “চমক
সত্তনে উঠি যেন” পাড়াইয়াছিল। অমায়-
সাহেব বাবান্নার সমাগত হইবামাত্র তাহার
একযোগে সিপাহী-ধরণে তাহাকে অভি-
বাচন করিল। সেখানে ঢালা-বিছানা ও
চেয়ার-টেবিল, দুই রকম আসনেরই ব্যবস্থা
ছিল। কিরণসহায় আরানটাই বুঝেন
ভাল, অতএব বর্জনিনির্নিত নেত্র তাকিয়া
ঠেসান দিয়া বলিলেন। তখন তাহার
সম্মুখে “ডেট সওগ’দ” উপস্থিত করার ভক্ত
চৌকীদারমহলে চড়াচড়ি পড়িয়া গেল।
কোন্ কুনাধিকারীর প্রতাপ ইহার সঙ্গে
তুলনীয়? সরকারী খাজানা না; বিদ্যাও যে
দারোগা এবং অমায়ার কনষ্টেবলের দল
এদেশে এতটা আধিপত্যস্থাপন সংস্থাপন করে,
ইহাতেই হয় ত অমায়ারের দল দীর্ঘায়িত;
এবং সরকারী বাহাদুরের বামহস্তরূপ
পুলিশবিভাগের এতটা নিম্নাবাদ যে শুনা
যায়, তাহার প্রধান কারণ সম্ভবত ইহাই।
বাছা হউক, অমায়ারসাহেব সেই উপহারের
রাশি নিভাত্ত অপ্রসঙ্গপূর্ণিত বেধিতে-
ছিলেন না। পাকিস্তানীয় উপহারের
দিকে কটাক্ষ করিয়া তিনি দারোগা মজব-
আলীর বাসার দিকে তর্জনী নির্দেশ করি-
লেন। পথারসের বেগার অঙ্গুলিটি বস্তাই
সেমিন—মহাহিন্দু তিনি—তাহার বাস-
গৃহের দিকে ফেলিল। সুহৃৎ সে সওগাৎ-
স্থল ছই দিকে চলিয়া গেল, অথচ কিরণ-
সহায়কে একটু বাক্য ব্যয় করিতে হইল

না। বাক্যবলের চেয়ে বাহুবলটাই যে
শাসনপ্রণালীর পক্ষে অধিকতর উপযোগী,
এই দৃষ্টান্তে তাহা প্রমাণ হয় কি না?

খানার খানার প্রতি গৌরব মঙ্গলবারে
চৌকীদারদের বেহাজিরি হয়, তাহার বিবরণ
হরদয়ে একই-রকম। দারোগা বা অমা-
য়ার সাহেব যেকোনো উন্টাইয়া “বিটে”র
জনাহুগারে হাঁকিয়া যাইতেছেন, অমনি
১০১৪১২০ জন চৌকীদার খাড়া হইয়া
উঠিয়া জম্ম, মুখা, চুরী-চামারি প্রভৃতির
চাপা গুলি পাঠাণার ছেলের মত মুগ্ধ
উত্তরে পূর্ণ করিতেছে। কেহ সে অবস্থায়
গালি খাইতেছে, তাহাকেও তখনমত
আপনার কান আপনি মলিতে হইতেছে,
এ দৃষ্ট হিমালয় হইতে কুমারিকা পর্যন্ত
বোধ করি সর্বত্র স্থপরিচিত। কিলটা
ঘুঘোটা চাপড়ু। কখন বেতাবাচ—ইহারও
অগ্রতুল নাই। জেলার বা মহকুমার
হাকিম জরিমানার কার্যাকাঁড়িতা সম্বন্ধে
আয়বান, পুলিশ কন্সটারীদেব এরূপ ধারণা
হইয়া গেলে তাহার “কেদিয়ে”রও অভাব
হয় না। ইহার ফলে তিনটাকার চৌকী-
দার তিনমাস পরে কখন কখন নগদ
ষেড় টাকা গৃহঘাত = করিয়া থাকে,
তথাপি উর্দি ও কুর্তির বায়া ত্যাগ করিতে
পারে না। চৌকীদারপত্নী তাহাতে খুঁৎ-
খুঁৎ করিলে ভর্তীর কাছে গুলিতে পারি—
“বলিস্ কি কোঁপ, পুলিশের অমন ইচ্ছান্তের
চাকরী এক কপার ছেড়ে দেব? সময়ে;
অন্যসময়ে অমন কত ষেড়টাকা হাতে
আসবে!” উর্দি ও হিন্দী প্রচলিত জেলার
পাঠকবহাশয় উক্তটুকুকে মনে মনে অস্থ-

বাদ করিয়া গইলেই দেখিতে পাইবেন,
সহস্রাচরিত সর্বত্র একরূপ !

তা বক্ষ্যমাণ গোম্বায়ে বিলাসপুর-
খানার কথা হইতেছিল। পরকারী কাল
পর্য্যব চৌকীদারের হাঙ্গি-অঙ্গুতে শিখা-
খিনি হইয়া ঘটাব্যাক্ষেপ চলিয়াছে, কর্ণ-
দীর্ঘে রক্ষিত জমানারসাহেবের সেই
খড়্গাগুলি তাঁহার বস্ত্রক্ষেপ দূর করিতে
অনেকবার বাবলুত হইয়াছে, বাটার পান
আয় নিঃশেষিত হইয়াছে, এমন সময়ে ডাকে
বহুকুমার হাকিম 'জইট'সাহেবের এক
পরোয়ানা আসিয়া উপস্থিত। হুকুম, তাঁহার
এলাকার তিতর কত গদত, ঘোড়া এবং টাট্টু
আছে, এবং সর্পোক্ত ও সন্ধানিত ঘোড়ার
মাগ কি—তিন দিনের ভিতর রিপোর্ট
করিতে হইবে। জমানারসাহেব হুকুমটা
পড়িয়া মনে মনে খানিকটা গল্পগল্প করি-
লেন। তার পর জইটসাহেব ও
দারোগার উদ্দেশে একটো বিনাম
অভিধানবহিত্ব বিশেষ প্রোগণপূর্বক
একছিলিম তামাকু চড়াইতে পার্শ্ববর্তী
চৌকীদারকে আদেশ করিয়া কনটেবল
মেয়ুসিংকে তলব করিলেন। মেয়ু অনেক-
কাল গুলিসে চাকরী করিয়া বিস্তর অভি-
জ্ঞতা সঞ্চয় করিয়াছিল, খানার অপ্সরেরা
তার মুঠার মধ্যে বলিলেই হয়। বাতবিকও
তাঁহার কোনরূপ 'মুদ্রিল' উপস্থিত হইলে
মেয়ুসিং সিপাহীজী ত্রিধ 'আসান' কেহ
করিতে পাতিত না। সিপাহী এইমাত্র
জ্ঞান করিয়া আসিষ্ট খড়মপায়ে তাহার
মুগ্ধ শিখাটি ফাড়াইতেছিল, সেট অবগত
হাজিরিকেই দেখা দিল। জমানারসাহেব

কতক বা হুকুম পড়িয়া, কতক ইঙ্গিতে,
জইটসাহেবের পরোয়ানার অর্থ তাহাকে
জানাইতে না জানাইতে সে স্বয়ং হাঙ্গিয়া
তাঁহার কানে কানে কি বলিল। অতঃপ
সেদিন চৌকীদারেরা ছাপার কারমে লিপিত
একুশটি প্রেরণ উত্তর দিয়া সতরে দেখিল,
আর একটা উৎকট রকমের সওয়াল তাহা-
বের লগাবের প্রতীক্ষা করিতেছে।

গ্রামে মোট কয়টা ঘোড়া এবং গাধা
আছে, এ খবর একরকম করিয়া বলা যায়,
কিন্তু কোন্ ঘোড়াটা কত উঁচু, সহসা বলিয়া
সরকারের দ্বারা কে ফাদে পড়িবে ?
চৌকীদারেরা একবাক্যে আপত্তি করিয়া
বলিল, একহুতা সময় না পাইলে তাহার
সে কথাই লগাব দিতে অক্ষম।

জমানারক্ষিকগণসাহেবের মতে এবেদবিদ
মাফু নার। শিকারী বিড়াল অতিক্রান্তভাবে
যেমন মূষকের উপর থাকাইয়া পড়ে, সেই
ভাবে সহস্র তিনি চৌকীদারসহলে পড়ি-
লেন এবং পার্শ্বস্থিত বেতখণ্ড জনকরেক
চৌকীদারের পিতে ও হাতে একরূপ জোরে
জোরে বর্ষণ করিলেন যে, তাহাতে তাঁহার
নিজের কোমল হাতখানিতে পথ্যস্ত বেদনার
সঞ্চার হইল—এবং তিনি ও তাঁহার অগ্রগামী
দোহল্যামান উদর দুগপৎ হাঁকাইতে হাঁকা-
ইতে যে ভাবে সেই দুর্দীর্ঘ বারান্দা
পরিক্রমণ করিতেছিলেন, চিত্রকর কেহ
উপস্থিত থাকিলে তাহার সৌন্দর্য্যমণ্ড বৃদ্ধিত !

বাহার চোটে হৃত ভাগে এবং শাপের
বিষ উড়িয়া যায়, তাহাতে যে গরিব চৌকী-
দারের দিখানু করিয়া দিবে, ইহা আর
বেগী কথা কি ? বাস্তবিক মেয়ুসিংয়ের

সুপ্রভাত্রে কিষণী সেটদিনই বেলা ১২টার
কিছু বিলাসপুর-পানাতুচ্ ৪৪২ গ্রামের
মধ্যে বার-আনা মৌজার অর্থ এবং অর্থভয়ের
সংবাদ সংগ্রহ করিতে সক্ষম হইলেন। যে
চারি-আনা খবর বাকী ছিল, পরদিন
মঙ্গলবার প্রাতে ৮টা বাজিতে না বাজিতে
তাহারও কিনারা হইয়া গেল। ফের্ন না,
সৌমবার মধ্যাহ্নে পানাগ্রামে যে ঋতু
বহিয়াছিল, সন্ধ্যা হইতে না হইতে তুচ্-
তোগী সহযোগীদের মুখে মুখে প্রবাহিত
হইয়া তাহা গ্রামা-চৌকীদার-গৃহমাত্রকেই
সবেগে আন্দোলিত করিয়াছিল। কাজেই
নরটার আমলে পনাতাগ করিয়া কিষণ-
সহায় বাহিরে আসিলে, হেয়ুসিং এখন
সমস্ত পকতেশ মাথাটি নাড়িয়া ঈষৎ
হাসিতে হাসিতে তাহাকে বলিল যে, তিন-
দিন কোন চার, চারিগ্রহের ভিতরই
এমন পরোয়নার কিনারা হইতে পারে,
তখন তিনি সন্তোষজনক কথাটা বানিয়া
লইলেন।

হেয়ুসিং লিখিতে পড়িতে জানে না,
কিন্তু কিষণসহায় হিন্দী ও ফারসীতে
'লায়েক' ব্যক্তি, সহজেই একটা সলার
অফিস মঙ্গলবার প্রাতে আসন গ্রহণ
করিতে না করিতে তাহার মাথার সজা-
ইয়া উঠিল। জইন্টসায়েব রিপোর্ট চাহি-
য়াছেন তিন দিনে, কিষণসহায় বহি
আজই সন্ধ্যার ভাঙে তাহা পাঠাইয়া
আপন 'খয়েরখাই' কাছিয় করিতে পারে,
তবে তাহার 'তরকির' পথ প্রশস্ত হয়
কি না? বিশেষত তাহার স্বসম্পর্কীয়
বলদেও-সহায় জাইন্টসায়েবের একলাসে

কোটবাসু; রিপোর্ট পড়িয়া হুটো
তারিক যে তিনি করিবেনই, ইহা
ত জানা কথা। জমাদারসায়েব এমন
সুযোগ উপেক্ষা করিবার পাত নহেন, সন্ধ্যার
ভাঙে রিপোর্ট চলিয়া গেল। সেই সঙ্গে
কোট সন্-ইনস্পেক্টার 'চাচাসায়েব'কে
একখানি চিঠিও তিনি লিখিতে ভুলিলেন না।

জইন্টসায়েব সুখবার প্রাতে বাড়ালী
হেডক্লার্ক বাবুর আনীত ডাক দেখিতেছেন
ও তাহার বাড়লা পরীক্ষা দিবার সুবিধা
হইবে বলিয়া সেই তাহার মাঝে মাঝে
কথাবার্তা চলিতেছে, এমন সময় কোটবাসু
সেখানে হাজির হইয়া সুঁকিয়া সেলাম
করিলেন। এটা ওটা পেনের পর কিষণ-
সহায়ের রিপোর্ট তিনি একটি সংক্ষিপ্ত
ভূমিকা সহ সায়েববাহাদুরের নেত্রপথে
এরূপ ভাবে ধরিলেন, বাহাতে বিশ্বাস্যিষ্ট
'অপসর' স্বতই খুশী হইয়া তদীয়
ভ্রাতৃপুত্রের 'তরকির' জন্ত 'কোমিস' করিতে
পারেন। জইন্টসায়েব সম্প্রতি কার্যত
হিন্দীতে পাসু করিয়াছেন, রিপোর্টটা
নিজেই পড়িয়া উচ্চহাস্য সংবরণ করিলেন।
কোটবাসুকে জিজ্ঞাসা করিলেন, রিপোর্ট
ঠিক কি না এবং "বহৎ ঠিক হায়ে—উত্তর
পাইয়া পর্দত, ঘোড়া ও টাটুর তালিকা
তাহাকে পড়িতে বলিলেন। কোটবাসু
শ্রিতমুখে পড়িলেন, "গাথা ১২, ঘোড়া
১২০, টাটু ২২।" হেডক্লার্কের দিকে কিরিয়া
সায়েব গভীরমুখে বাড়লা বলিলেন, "গাথার
নম্বর ঠিক না আছে!" বৃদ্ধ কোটসায়েব
বুড় প্রতিবাদের জন্য বলিতেছিলেন, "জনাব
আলি!"—জইন্ট সাইকিষ্টেট উচ্চ হাসিয়া

বলিলেন—“আর দুট নম্বর উঠাতে যোগ ওঠে মৃতদেহাদি চাপিয়া মূখ অবনত করিলেন ।
করিয়া ডাও, যে লিটে বানাইয়াছে ও যে কোর্টবাবু একটু একটু বাঙালী বৃত্তিতেম,
টাছাতে ১৭ ঘ করে!” হেডক্লার্ক বাবু তিনিও মাথা চুলকাইয়া দৃষ্টি নত করিলেন ।

মহাকর্ষণ ।



আচার্য্য প্রবর-মিউটন-প্রচারিত মহাকর্ষণ-
সিদ্ধান্তট বিদ্যালয়ের পণ্ডিতমহোদয়ের
নিম্নম বৈজ্ঞানিকভাবে আমরা অতি শৈশবেই
গলাধঃকরণ করিয়া রাখিয়াছি । তার পর
গতিবিজ্ঞান, পরমাণুবিদ্যা ও জ্যোতিঃশাস্ত্র
সম্বন্ধীয় বিবিধগ্রন্থে তাহার সহিত বিশেষ
পরিচিত হইয়াছি এবং বিশাল নক্ষত্র-
জগতের ধাবন হইতে আরম্ভ করিয়া অতি
বৃহৎ ধূলিকণারও চালচলন এই মহাকর্ষণ-
তত্ত্বের সাহায্যে বুঝা ও বুঝান হইয়া থাকে,
তাহা আমরা দেখিতেছি । কিন্তু জড়পদার্থে
সেই মহাকর্ষণশক্তি আসিল কোথা হইতে,
তাহা আমরা দেখিতে পাইতেছি না । ইষ্টক
আকাশে নিক্ষেপ করিলে, তাহা শেষকালে
পড়ে কোথায়, তাহা মূৰ্খ এবং পণ্ডিত উভ-
য়েই বলিতে পারে । মূৰ্খও বলিবে, পৃথিবীর
টানে সেটা মাটিতেই পড়িবে । পণ্ডিতও
অতি গভীরভাবে সেট কপাটাট বড় করিয়া

বলেন । তার পর ভিজ্ঞান কর,—পৃথিবীর
এই টান আসিল কোথা হইতে? তখন
পণ্ডিতও যেমন, মূৰ্খও তেমন—উভয়েই
নিরস্তর ।

মহাকর্ষণের জার একটা বৃহৎ ব্যাপা-
রের উৎপত্তির কারণ জানিবার তত্ত্ব বিজ্ঞান-
গ্রন্থ খুঁজিলে, তাহাতে কেবলমাত্র দুইটি
অসুমানমূলক কারণের উল্লেখ দেখিয়া
আমাদিগকে সন্তুষ্ট থাকিতে হয় । এই
দুইটির মধ্যে একটি অধ্যাপক হেলমহোল্
ও লর্ড কেলভিন্ প্রবর্তিত সেই আবর্ত-
সিদ্ধান্তের (Vortex theory of matter)
সাহায্যে আবিস্কৃত এবং অপরটি প্রসিদ্ধ
বৈজ্ঞানিক লেসাজের (Le Sage) কতক-
গুলি আভ্যন্তরীণবিশুদ্ধি দ্বারা গঠিত ।

অধ্যাপক লেসাজের কম্পিত সিদ্ধান্তটির
মূল মর্ম এই যে,—অনন্ত বিশ্বটার সর্বসাংগে
অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অণু নিরন্তর এক

একটি নির্দিষ্ট সংল পথে পরিভ্রমণ করিতেছে। ইহাদের গতির দিকের ত্রিরতা নাই,—সকল দিকে ইহারা প্রচণ্ডগতিতে অগ্রসর হইতেছে এবং জড়পদার্থবাহক এই বেগবান্ অণুমাণের নিমজ্জিত থাকিয়া নিরন্তরই সেই সকল অণুদ্বারা আহত হইতেছে। লেনাড বলেন, ঐ সকল আঘাতদ্বারা জড়পদার্থে যে বেগের উৎপত্তি হয়, তাহাকেই আমরা আকর্ষণবেগ বলি। সমগ্র ভগ্নতে যদি একটিনাশ জড়পিণ্ডের অস্তিত্ব থাকিত, তবে আমরা তাহাতে মহাকর্ষণের কোনট বিকাশ দেখিতে পাইতাম না, কারণ পূর্ণোক্ত অণুপ্রবাহের তা লাগিয়া তাহাতে যে গতি উৎপন্ন হইত, তাহার ঠিক বিপরীত পার্শ্বও অণুসংঘাতে ঠিক বিপরীত গতির উৎপত্তি হইত, কাজেই চুই সমান ও বিপরীত গতিদ্বারা পরস্পরে কোন বেগই উৎপন্ন হইতে পারিত না। কিন্তু একাধিক দ্রব্যের অস্তিত্ব থাকা করিলে, অন্ততঃ দেখা যায়। চুইটি দীপ-নিখার মাক্থানে সেট দীপদ্বয়ের সমক্রে যদি চুইটি গোলার রাখা যায়, তাহা হইলে কি হয়? গোলার যে ভাগটা দীপের দিকে, সে ভাগটা আলোকিত ও অল্প ভাগটা অন্ধকারময় হয়; কেবল তাহাট নয়, পাশের গোলারও পাশে পরস্পরে ছায়া ফেলে। এই আলোককে যদি অণুস্রোত বনে করা যায়, তবে দেখা যাইবে, চুই বিক্ হইতে বিপরীতদিকারী অণুস্রোত আসিলে চুই গোলার চুই পিঠে বা লাগিবে, অল্প পিঠে লাগিবে না; আলোককে প্রতিরোধ করিয়া তাহারা পরস্পরের সে পিঠে ছায়া ফেলিত,

সেই পিঠে থাকাকেও আসিতে দিবে না—সুতরাং তাহারা উভয়েই এক পিঠে থাকা খাইয়া চলিতে থাকিবে—অবশেষে পরস্পরের পাশে আসিয়া পড়িবে। সুতরাং লেনাডের মতে, পরস্পরে মহাকর্ষণশক্তির একটা পৃথক্ অস্তিত্ব নাই,—আছে কেবল সেই সর্বদিক্গামী অসংখ্য অসীমিয় অণুদ্বারা এবং তাহার অল্প-খাড়া-জনিত জড়পদার্থের গতি।

লেনাডের পূর্ণোক্ত সিদ্ধান্তটি কেবল অসুমান ও কল্পনা দ্বারা গঠিত। এই সিদ্ধান্তপ্রচারের পর প্রায় এক শতাব্দী-কাল অতিবাহিত হইয়া গিয়াছে, কিন্তু এ পর্য্যায় লেনাড বা তাহার শিষ্যগণমধ্যে কেহই পূর্ণোক্ত অসুমানের পোশক কোন প্রমাণই দেখাইতে পারেন নাই। এ অবস্থায় মহাকর্ষণের উৎপত্তি প্রসঙ্গে লেনাডের উক্তি কতদূর বিশ্বাসযোগ্য, পাঠকগণ বিবেচনা করুন।

এখন আবার সিদ্ধান্তদ্বিগের মতে মহাকর্ষণের উৎপত্তির কারণ কি, দেখা যাক। এট কারণটা বৃষ্টিতে হইলে, আবর্তসিদ্ধান্তটা কি, তাহা যেটামুট জানা আবশ্যক। উক্ত সিদ্ধান্তের প্রতিষ্ঠাতা লর্ড কেলভিন্ বলেন যে,—বিশ্ববাসী যে ঈশ্বরের কম্পনাধি দ্বারা তাপ, আলোক ও চৌম্বকশক্তি ইত্যাদির বিকাশ দেখা যায়, তাহারই অবতাবিশেষ দ্বারা আকর্ষণাদি ধর্মগুহ জড়ের উৎপত্তি হইয়াছে। চা-পূর্ব পেরালায় মতো চামচ-বুড়াইলে চারে যে প্রকারে আবর্ত জন্মে,—সেইরূপ কোন অনির্লুচনীর কারণে ঈশ্বরের মধ্যে সূর্য জন্মিলে, ঈশ্বরের সেই সূর্যবিশেষটি বলে জড়পদার্থ।

পন্থারের আবর্তনগতির অনেক তথ্য প্রাচীন পণ্ডিতগণের জানা ছিল, কিন্তু তৎসাহায্যে যে মহাকর্ষণশক্তির উৎপত্তি-তথ্যবিচার সম্ভবপর, এ কথা ঐহাদের মধ্যে কাহারও মনে স্থান পায় নাই। প্রায় চল্লিশ বৎসর পূর্বে আচার্য্য হেলমহোজ্ আবর্তনগতিসম্বন্ধীয় কতকগুলি গুটিল ব্যাপারের বীমাংসা করিয়া কিছুদিন পবেষণায় নিযুক্ত ছিলেন। তখন সেই সকল ব্যাপারের বীমাংসার সহিত আবর্তনগতিসম্বন্ধীয়ও কয়েকটি নূতন তথ্য তিনি প্রচার করেন। সেই সময়ে বর্ণগতির সঙ্গে মহাকর্ষণশক্তির কোন একটা গূঢ় সম্বন্ধ আছে বলিয়া কয়েকজন পণ্ডিত অশ্রুমান করিয়াছিলেন। পণ্ডিতসাহায্যে হেলমহোজ্ স্পষ্টই দেখাইয়াছিলেন,—বহিঃ বায়ু ইত্যাদির সংঘর্ষজাত বাধা না থাকিলে, যে কোন পন্থার একবার বর্ণগতি উৎপন্ন করিতে পারিলে, সেই আবর্তিত পন্থারের তাৎকালিক গঠন ও আবর্তবেগ অনন্তকাল পর্যন্ত সমভাবেই থাকিয়া যাইবে। আবর্তনগতির এই অদ্বুত বিশেষত্ব এবং ইহার আরো দুই একটি শক্তির কথা গুনিবামাত্রই, তদ্বারা হয় ত ভবিষ্যতে অকোম্পত্তি-সম্ভারও বীমাংসা হইবে বলিয়া লর্ড কেল্ভিনের মনে একটা সংকার হইয়া গিয়াছিল। কিন্তু পূর্বোক্ত ব্যাপারের সত্যতা প্রতিপাদক বৃক্সিসুলির মধ্যে পরীক্ষাসিদ্ধ প্রমাণের একান্ত অভাব দেখিয়া, তিনি কেবল গণিতমূলক প্রমাণ অবলম্বন করিয়া, হঠাৎ সেই মনোগত ভাব প্রচার করিতে সাহসী হন নাই। এদিকে হেলমহোজের অদ্বুত

আবিষ্কারবিধরণ দেখিয়া, অধ্যাপক টেট্ তাহার প্রত্যক্ষ-প্রমাণ-সংগ্রহের অস্ত্র নানা পরীক্ষায় নিযুক্ত হইয়াছিলেন; এবং বায়ুর বর্ণগতি উৎপাদনের বহুচেষ্টায় ব্যর্থমনো-রব হইয়া শেষে বিদ্যুতের ডাগাখোলা ব্যাক্সের জার একটা ছোট ব্যাক্সের কোন এক পার্শ্বে একটি ছিদ্র করিয়া এবং তাহার ঠিক বিপরীত দিকে খোলা পার্শ্বে একখণ্ড তুল কাপড়ের আবরণ সংলগ্ন করিয়া, তিনি বায়ুর বর্ণগতি উৎপাদনের একটি অতি সহজ উপায় উদ্ভাবন করিয়াছিলেন। এই সামান্য যন্ত্রের বস্ত্রাচ্ছাদিত প্রান্তটতে বীরে বীরে চাপ দিলে, প্রত্যেক চাপ প্রয়োগে আবহ বায়ুর যে অংশ সেই ক্ষুদ্র ছিদ্রপথ দিয়া বহির্গত হয়, তাহা বর্ণগতি প্রাপ্ত হয়, অধ্যাপক টেট্ এই তথ্য সন্মুখপানে এই সময়ে অগ্রে প্রচার করেন; এবং উক্ত যন্ত্রের সাহায্যে উৎপন্ন বায়ুর অদৃশ্য আবর্তন প্রত্যক্ষ দেখিবার জন্য, যন্ত্রমাধ্যমিত বায়ুতে ক্লোরাইড এমনিয়া (Chloride of Ammonia) বাষ্প মিশ্রিত করিয়া দিবার যে পদ্ধতি আছে, তাহাও অধ্যাপক টেট্ দ্বারা এই সময়ে আবিষ্কৃত হয়।

হেলমহোজের আবিষ্কারের সঙ্গে সঙ্গেই বায়ুকে বর্ণগতিসম্পন্ন করিবার উন্নিষিত উপায়টি উদ্ভাবিত হওয়ায় লর্ড কেল্ভিনের পবেষণায় খুব সুবিধা হইয়া গিয়াছিল। যন্ত্রের উদ্ভাবক অধ্যাপক টেটের সহিত পরীক্ষা করিয়া, অধ্যাপক হেলমহোজের পণনালক সকল ধর্মই আবর্তিত বায়ুতে তিনি প্রত্যক্ষ দেখিয়াছিলেন এবং তদ্বাস্তীত ইহার আরো কতকগুলি মত ধর্ম দেখিয়া বিস্মিত

হইয়াছিলেন। পুঙ্খানুপুঙ্খ প্রক্রিয়ার পৰীক্ষার পরে প্রচুর ঘূর্ণি বায়ু উৎপন্ন করিলে,— সেই ক্রম ঘূর্ণিমান অস্থায়ীকণগুলিতে অস্থি-
হীন (Inertia), আকর্ষণ ও স্থিতিস্থাপকতা প্রভৃতি জড়প্রসিদ্ধ সকল ধর্মই, ইহারা প্রত্যেক দেখিয়াছিলেন। উক্ত পরীক্ষাগুলি দ্বারা কেল্ভিনের মনে স্থির বিশ্বাস হইয়াছিল যে, ঐশ্বরে একবার আবর্তনগতি উৎপন্ন হইলে, ঘর্ষণাদিজনিত বাধার অভাবে সেই আবর্তনগুলি অনন্তকাল ঐশ্বরমাগরে ভাসমান থাকিবে। জগতে জড়ধর্মের বিকাশ করিতে পারে। এই বিশ্বাসের উপরই লর্ড কেল্ভিন তাহার প্রসিদ্ধ সিদ্ধান্তের প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন, এবং তাহাই অবলম্বন করিয়া একমুখ বলিতেছেন,— এই ভগ্নতে বস্তু জড়-
পদার্থ দেখিতেছে, তাহাদের সকলেরই সূক্ষ্মতম অংশগুলি লক্ষ্যবস্তু। ঐশ্বরের সূত্র সূত্র ঘূর্ণন চাড়া আর কিছুই নহে; আর জড়পদার্থমাত্রই মহাকর্ষণ-শক্তি ও স্থিতি-
স্থাপকতা প্রভৃতি যে সকল ধর্ম দেখা যায়, তাহাও সেই ঐশ্বরীয় ঘূর্ণনের স্বভাবসিদ্ধ দ্বারী বর্ম। ঐশ্বরপদার্থ সহজেই ঘর্ষণ-
বাধার অতীত, সুতরাং কোনকালে উক্ত আবর্তনগুলির লয় নাই, কাজেই জড়পদার্থ ও তাহার দ্বারী ধর্মগুলির জন্ম নাই। *

প্রাচীন ও আধুনিক বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্ত-
গুলির ইতিহাস আলোচনা করিলে দেখা যায়,

অধ্যাপক ইয়ট্‌, কল্ট্‌ক সেই আলোকোৎপাদক ঐশ্বর আবিষ্কারের পর হইতেই, যেন সকল সিদ্ধান্তগুলিরই গতি ঐশ্বরের বিবেক চালিত হইতেছে,— আধুনিক সিদ্ধান্তের মতে বিদ্যুৎ, চৌম্বকশক্তি এবং তাপালোক প্রভৃতি প্রধান প্রধান প্রাকৃতিক ব্যাপার-
মাত্রই ঐশ্বর দ্বারা উৎপন্ন। আবার দেখা যাইতেছে, আবর্তনসিদ্ধান্তের মতে জড় ও জড়ধর্ম সেই ঐশ্বরেরই অবস্থাবিশেষদ্বারা উৎপন্ন। পরীক্ষামূলক প্রমাণের অপেক্ষা না করিয়া কেবল কতকগুলি সম্ভবপর যুক্তির উপর বিশ্বাস স্থাপন করিয়া, আবর্তনবাদিগণ সুবুদ্ধির পরিচয় দিয়াছেন কি না, তাহা আমাদের দ্বারা অসম-
বাস্তবিক বিচার্য্য নহে। তবে সিদ্ধান্তটি যে কতদূর অগ্রদূত, তাহা যথঃ আবিষ্কারক মহাশয়ের নিরোদ্ধৃত উক্তিই হইতে পাঠকগণ সহজেই বুঝিতে পারিবেন। মার্কিন বৈজ্ঞানিক ডাক্তার উইলিয়ম্‌ গ্রনলন্ড্রের লর্ড কেল্ভিনকে আবর্তন-
সিদ্ধান্তসম্বন্ধে প্রশ্ন করিলে, কেল্ভিন স্পষ্ট বলিয়াছিলেন :—The Vortex theory is only a dream. Itself unproven, it can prove nothing and any speculations founded upon it are mere dreams about a dream.

কাজেই দেখা যাইতেছে, নিউটনের মহাকর্ষণসিদ্ধান্ত আবিষ্কারের পর হইতে

* অধ্যাপক ইয়ট্‌ ও কল্ট্‌ বলেন, আমরা এ কাল পর্যন্ত ঐশ্বরকে যে একবারে ঘর্ষণবাহীন বলিয়া জানিতেছি, তাহা ঠিক নয়। ঐশ্বরেরও বাধা আছে। তাইই সেই বাধা দ্বারা জড়পদার্থের উৎপাদক আবর্তনগুলির লয় অন্তত্বাবী, এবং সঙ্গে সঙ্গে জড়ের জন্মও নিশ্চিত।

সহস্র অধিপতিরকার তাগার ধ্রুবের প্রচুর সম্বৎ সেই বিশ্ববাপিনী মহাপ্রতি
প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে মতা, কিন্তু উৎপত্তি আশ্রয় বহুদায়িত্ব বহিরাছে।
উপযুক্ত দুইটি সিদ্ধান্ত প্রচারিত হওয়া

শ্রীজগদানন্দ রায়।

—:O—

কুমারসম্ভব ও শকুন্তলা । *

সমায়গ-মহাভারতের সমস্ত বৃহৎ কাব্যের মধ্যে আশাপোড়া যেন একটা কুকান উঠি-
বাছে। জনসম্মত, অর্থসম্মত, চিত্তসম্মত,
একবারে আকাশপাতাল উঠাপড়া করি-
তেছে। কেবল স্বয়ং এবং বিবেক এবং
বৈচিত্র্য।

মহাভারতকে কোন ঘরের-কোণে-বসা
শিমীর কারুকান্না বসিয়া মনে হয় না। মনে
হয়, দেশ-তখনকার সেই প্রকৃত অতীতকাল
কবির প্রতিভাবে গুলিয়া উঠিয়াছে,
এবং তাহার মধ্যে যত কথা ছিল—দুগ্ধাস্তরীণ
অর্গলভের, অর্য্যামগরের, দেবমহুঘোর,
তাপস ও বীরমত্তলী যত পাপপুণ্য, যত
স্বপ্নপ্রব, সমস্ত কেনাইয়া কেনাইয়া গজিয়া
উঠিতেছে।

কাল মাপনার বিশাল কার্য আচ্ছন্ন-
ভাবে সম্পন্ন করে। বর্তমান কাল বসিয়া
বসিয়া কি করিতেছে, তাহা আমরা কিই
বা জানি! তাহার অসংখ্য অদৃশ্যশক্তি
দিকে দিকে, ঘরে ঘরে, কত লক্ষ হাতের কি
জাল গাথিতেছে, তাহা কে সম্পূর্ণরূপে
কবিত্তে পার? মহাভারত যেন একটা

স্বপ্নের সেই প্রকাণ্ড কালের ঢাকাটা উপর
হইতে তুলিয়া লইয়াছে—একট বৃহৎ-জনতা
চিরকালের জন্য উন্মত্ত হইয়া গেছে—
আর তাহার লুকাইবার জো নাই, মরিবার
জো নাই; তাহার চিন্তা-চেষ্টা-চরিত্র সমস্ত
অনাবৃত।

এই মহা-ইতিহাসের ভিত্তির মধ্য হইতে
কালিঙ্গাণে হঠাৎ আমরা একান্ত নিভৃত
আসিয়া উপস্থিত হই। এই কাব্যভবনট
শিমীর নিম্নের হাতের রচিত সৌন্দর্যের
পর্দা দিয়া ঘেরা,—ইহা কবিপ্রতিভার অশ্রু-
পুর—ঐতিহাসিক কাল ইহার মধ্যে তাহার
বলবল লইয়া প্রবেশ করিতে পার নাই।
কোণার মহাপ্রতাপশালী বিক্রমাদিত্য,
কোণার যবনের সহিত ভাবতবর্ষের সংঘর্ষ,
কোণার শকেশ্বরের সঙ্গে হিন্দু রাজার বৃহৎ-
বিগ্রহ,—কালিদাসের পুণ্ডিতকঙ্করায়ণ
কাব্যনিকুঞ্জে তাহার কোন সাজা পাওয়া
যায় না।

পুৰাণ-ইতিহাসের কথা কালিদাসের
কাব্যে যে নাই, তাহা নহে। কিন্তু তাহার
কেনন ভাবে আছে? সুগৌরব আলোক

* গ্রন্থ ১৯৯৭ সন্থাভরণ মনুসংহিতা-সংস্করণের অধ্যায়িত আশাপোড়ান-প্রতিভা উপলক্ষে প্রণীত।

যখন চন্দ্র হঠাৎ প্রতিফলিত হইয়া আসে, তখন সে যেমন আপনাতাপ, আপনাতা মহিমা রাখিয়া আসে, সে যেমন হৃৎস্রাব্তিকে কমনীয় করে, দিবলের কণ্ঠক্ষেত্রকে জাগাইয়া তোলে না—কালিদাসের কাব্যেও পুরাণ-ইতিহাস সেইরূপ কেবল শোভা দেয়, জীবন দেয় না। রত্নবংশের স্বাম-লক্ষণ, অজ-বংশবৎ আমাদের কাছে আপনাদের কোন একটা নূতন পত্রিতর আনিয়া উপস্থিত হয় নাই। তাহার সারি সারি চপ—কেবল সাজে সজ্জা, উপহার অলঙ্কার, যন্ত্র গুণপনার সাহিত্যসৌখ্যের তিত্তি সত্যটয়া রাশিরাঙে। কালিদাসের কাব্য উত্তরপ কণ্ঠসুহৃদের কাব্য নহে, তাহা নিতৃত ভাবরসসম্ভোগের কাব্য।

এই পণ্য পড়িয়া পাঠক টেনিসনের কলানিকেতনের কথা (Palace of Art) স্মরণ করিবেন। স্বতঃস্বেপ, কালকর্ষের সংসারকে দূরে রাখিয়া, যে বিদ্যারী নির্জনে কলাসৌন্দর্য্যসম্ভোগেট নিজেই আত্মাকে নিবিষ্ট রাখেন, টেনিসন্ তাহাকে দিক্কার দিয়াছেন। কালিদাস কি সেই সৌন্দর্য্য-গোলুপ ভোগস্ববিলাসেরই কবি ?

আপাতত সেইমতই মনে চর। কিন্তু এইখানে এ কথা বলিয়া রাখা ভাল, আমরা বর্ণনাত্মক বিচারে বসি নাই। সৌন্দর্য্যমাত্রই মাহুকের মন হইতে সঙ্গীত টানিয়া আনিতে চায়। কবি সেই চেষ্টার উপলক্ষ্যমাত্র। ভোগস্বরের মধ্যে যে সৌন্দর্য্যের উপকরণ আছে, সেও সাহিত্যে ঐতরুনি জাগাইয়া তোলে ;—মাহুকের মনকে কোন্ সমালোচকের ডুকুটি নুশচাপা দিয়া রাখিবে ? কাণ্ডার তরল কটাক্ষের সন্দেহে মাহুস কবিকণ্ঠস্বরের

সঙ্গান করিয়া কিরে, আবার বেবদম্বিরের ঘরেও কবির বীণার জন্ত অপেক্ষা করিয়া থাকে। তাই সাহিত্যে সকল শ্রেণির কাব্যই স্বস্থানে প্রশ্রয়ান, কাহাকেও পরিত্যাগ করিতে পারি না।

কালিদাস একান্তই সৌন্দর্য্যসম্ভোগের কবি, এ মত লোকের মধ্যে প্রচলিত। সেইজন্য লৌকিক গল্প-গুজবে কালিদাসের চরিত্র কলঙ্কে মাথানো। এই গল্পগুলিই জনসাধারণকর্তৃক কালিদাসের কাব্যসমালোচনা। ইহা হইতে বুঝা যাইবে, জনসাধারণের প্রতি আর যে কোন বিষয়ে আস্থা রাখণ করা যাক্, সাহিত্যলম্বাণোচনা-সম্বন্ধে সেই অন্তের উপরে অন্ধ নির্ভর করা চলে না।

মহাভারতের মধ্যে যে একটা বিপুল কণ্ঠের আন্দোলন দেখা যায়, তাহার মধ্যে একটা বৃহৎ বৈরাগ্য তির অনিবেশ ভাবে রহিয়াছে। মহাভারতে কণ্ঠেই কণ্ঠের চরন সমাপ্তি নহে। তারার মনস্ত্র নৌদ্য-বীর্ষ্য, রাগবেশ, হিংসাপ্রতিহিংসা, প্রহাস ও সিদ্ধির মাঝখানে শ্রমণ হইতে মহাপ্রত্যনের ভৈরবসঙ্গীত বাজিয়া উঠিতেছে। জামায়ণেও তাহাই ;—পরিপূর্ণ আরোহণ বার্থ হইয়া যায়, কথারত সিদ্ধি খলিত হইয়া পড়ে,—সকলেরই পরিধামে পরিত্যাগ। অথচ এই ভ্রাসে, হুংখে, নিম্নলভ্যতেই কণ্ঠের মহত ও পৌরুষের প্রভাব রক্তসিঁরি স্রাবি উজ্জল অন্তঃকণ্ঠে হইয়া উঠিয়াছে।

সেইরূপ কালিদাসের সৌন্দর্য্যচাক্ষুণ্যের মাঝখানে ভোগবৈরাগ্য স্তব হইয়া আছে। মহাভারতকে যেমন কেহ কালে সঙ্গ এন:

বৈরাগ্যের কাব্য বলা যায়, তেমনি কালিদাসকেও একই কালে মৌল্যগোত্রের এবং ভোগবিবর্তির কবি বলা হইতে পারে। তাঁহার কাব্য মৌল্যগোত্রবিশেষেই দেখ হইয়া যায় নাই—তাঁহাকে অতিক্রম করিয়া তবে কবি ক্ষান্ত হইয়াছেন।

কালিদাস কোথায় খামিষাছেন এবং কোথায় খামেন নাই, সেইটে এখনকার আদর্শের সহিত তুলনা করিয়া আলোচনা করিবার বিষয়। পথের কোন একটা অংশে খামিষা তাঁহাকে বিচ্যুত করা যায় না, তাঁহার পন্থাত্তান কোপায়, তাহা দেখিতে হইবে।

আমার দৃঢ় বিশ্বাস, দীর্ঘের হাত হইতে আঁটি লাইয়া দেখানে দ্ব্যস্ত্র আপনায় ভ্রম বৃত্তিতে পরিগ্রহেন, সেইখানে বাথ পরি-তাপের মধ্যে যুরোপীয় কবি শকুন্তলা-নাটকের যবনিকা ফেলিতেন। শেষ অঙ্কে স্বর্ণ হইতে কিরিয়ার পথে বৈবক্রমে দ্ব্যস্ত্রের সহিত শকুন্তলার যে মিলন হইয়াছে, তাহা যুরোপের নাট্যরীতি অনুসারে অবশ্য-ঘটনীয় নহে। কারণ, শকুন্তলানাটকের আরম্ভে যে বীজবপন হইয়াছে, এই বিচ্ছেদই তাহার প্রথম ফল। তাহার পরেও দ্ব্যস্ত্র-শকুন্তলার পুনর্মিলন বাথ উপায়ে দৈবানুগ্রহে ঘটাইয়া তুলিতে হইয়াছে। নাটকের অন্তর্গত কোন ঘটনানুসারে, দ্ব্যস্ত্র-শকুন্তলার কোন ব্যবহারে ঐশিলন ঘটবার কোন পথ ছিল না।

তেমনি, এখনকার কবি কুনারসত্ত্বের হৃত-মনোরণ পার্শ্বদীর ভাষা ও পদ্যের মধ্যে কাব্য শেষ করিতেন। অকালবসন্তের প্রকরণ অশোক-

কূজে মদনদাহনের দীপ দেবরোবারিচ্ছটার নতমুখী লক্ষ্যাকণা গিরিগজকন্তা তাঁহার সমস্ত বাথ পুষ্পাভরণ বহিরা পাঠকের বাণিত ভ্রমের কক্ষর রূপান্তর উপর আসিয়া পাড়াইতেন,—অন্ততঃ প্রেমের বেদনা তাঁহাকে চিত্তকালের জন্য বেরিয়া থাকিত। এখনকার সমালোচকের মতে এইখানেই কাব্যের উচ্ছলনম স্থগাত, তাহার পরে বিবাহের স্রাতি অত্যন্ত বর্ণচ্ছটাধীন।

বিবাহ প্রাত্যহিক সংসারের কৃত্রিমতা ; তাহা নিরমলক সংসারের অঙ্গ। বিবাহ এমন একটি পথ নির্দেশ করে, যাহার এক-মাত্র সঙ্গ লক্ষ্য, যে পথে প্রবল প্রবৃত্তি দম্বাতা করিতে প্রবল নিবেদ প্রাপ্ত হয়। সেইজন্য এখনকার কবিরা বিবাহব্যাপারকে তাঁহাদের কাব্যে বড় করিয়া দেখাইতে চান না। যে প্রেম উদ্ভাবনযোগে নর-নারীকে তাহার চারিদিকের সহস্র বন্ধন হইতে মুক্ত করিয়া দেয়, তাহাদিগকে সংসারের চিত্তকালের অভ্যন্তর পথ হইতে বাহির করিয়া লইয়া যায়।—যে প্রেমের বলে নর-নারী মনে করে, তাহারা আপনাতঃই আপ-নারা সম্পূর্ণ, মনে করে যে, যদি সমস্ত সংসার বিমূখ হয়, তবু তাহাদের ভয় নাই—অতঃ-নাই, যে প্রেমের উত্তেজনার তাহারা ঘূর্ণ-বেগে বিজিত-বিক্রান্ত গ্রহের মত তাহাদের চারিদিক হইতে স্বতন্ত্র হইয়া নিজেকে মধ্যেই নিবিড় হইয়া উঠে। সেই প্রেমই প্রধানরূপে কাব্যের বিষয়।

কালিদাস অনাস্ত-প্রেমের সেই উন্নত মৌল্যগোত্রকে উপেক্ষা করেন নাই—তাঁহাকে শুকনোপায়ে উচ্ছল বড়ই আঁকিয়া

তুলিয়াছেন। কিংবা এত অসুস্থতার মধ্যেই তিনি তাহার কাব্যকে শেষ করেন নাই। যে প্রাপ্ত বয়সেই পরিচালিত হইতে পারিতেন, তাহা হইলেই তাহার কাব্যের চরম কথা। মহাভারতের সমস্ত কৰ্ম যেমন মহাপ্রস্থানে শেষ হইয়াছে, তেমনি কুমারসম্ভবের সমস্ত প্রেমের বেগ মঙ্গলমিলনেরই পরিমাপ।

কুমারসম্ভব এবং শকুন্তলকে একত্রে তুলনা না করিয়া থাকি না। দুটোই কাব্যবিষয় নিগূঢ়ভাবে একট। দুটো কাব্যেই মন যে মিলন সংলাপন করিতে চেষ্টা করিয়াছে, তাহাতে বৈষম্য লাগিয়াছে; সে মিলন অসম্পূর্ণ, অসম্পূর্ণ হইয়া, আপনাতঃ বিচিত্রকল্পবচিত্ত পরমসুন্দর বাসরশয্যার মধ্যে দৈবাহত হইয়া মরিয়াছে। তাহার পরে কঠিন চাঞ্চল্য ও চাঞ্চল্য বিরহের দ্বারা যে মিলন সম্পন্ন হইয়াছে, তাহার প্রকৃতি অন্যরূপ,—তাঁহা সৌন্দর্যের সমস্ত বাহ্যসরল পরিভাষা করিয়া বিরল নির্মল বৈশিষ্ট্য কলা-শিল্পের গুণগোষ্ঠিতে কমনীয় হইয়া উঠিয়াছে।

সম্পন্ন মন যে মিলনের কর্তৃহতার নইয়াছিল, তাহার আশোজন প্রচুর। সমাপ্ত-বেষ্টনের বাহিরে চাই তপোবনের মধ্যে অহেতুক আকস্মিক নবপ্রমোদে কবি যেন কৌশলে, তেমনি সমারোহে, স্বর্য অকণ্ঠ দান করিয়াছেন।

যতী কৃত্তিবাস তখন হিমালয়ের প্রান্তে বসিয়া তপস্যা করিতেছিলেন। শীতল বায়ু যুগলান্তির গন্ধ ও কিরণের স্পর্শে বহন করিয়া গঙ্গাপ্রবাহনিকিত দেবদাক্ষ্যপ্রদিকে আকোশিত করিতেছিল। সেখানে শুভাং

অকালবসন্তের সমাগম হইতেই দক্ষিণের নিম্নস্থ সত্ত্বপুঞ্জিত অশোকের নবগন্ধবতাল মর্ম্মিত করিয়া আতপ্ত বীৰ্যমিশ্রাঙ্গ ফেলিলেন। ভ্রমরবৃন্দ এককুসুমপাত্রে যথু খাইতে লাগিল এবং কক্ষসার যুগলস্পর্শ-নিমীলিতাকী হস্তিগীর গায় শূন্যতা ঘর্ষণ করিল।

তপোবনে বসন্তসমাগম! তপস্যার অকঠোর নিয়মসংঘের কঠিন বেষ্টনমধ্যে হঠাৎ প্রকৃতির আত্মকপবিত্তার! প্রমোদ-বনের মধ্যে বসন্তের বাসনিকতা এমন আশ্চর্যরূপে বেধা দেয় না।

মহর্ষি কথের মালিনীভীরবর্তী আশ্রমে ও এইরূপ। সেখানে তত হোমের ধূমে তপোবনতরুর পল্লবসকল বিবর্ণ, সেখানে জলাশয়ের পশপকল স্নিগ্ধের নিকুবকল-কবিকুল জলধরার অস্তিত এবং সেখানে বিশ্বস্ত যুগলকল রথচক্রস্নিগ্ধ ও জ্যান্মির্ঘোষ নির্ভর কোতৃহলের সতিত স্নিগ্ধেছে। কিন্তু সেখানে হইতেও প্রকৃতি দূরে পলায়ন করে নাট,—সেখানেও কখন কলবকলের নীচে হইতে শকুন্তলার নবযৌবন অগোচ্য উদ্ভিন্ন হইয়া দুঢ়সিন্দু বন্ধনকে চারিদিক্ হইতে ঠেলিতেছিল। সেখানেও বায়ুকম্পিত-পল্লব-ছলিয়ারা চূতবৃক যে সন্তোষ করে, তাহা সম্পূর্ণ সাময়িকের অঙ্গুণ্ড নহে এবং নব-কুসুমযৌবনা নবমালিকা সহকারিতরুকে বেষ্টন করিয়া প্রিরমিলনের ঔৎসুক্য প্রচার করে।

চারিদিকে অকালবসন্তের অঙ্গুণ্ড সমারোহ, তাহারই নাথখানে গিরিপ্রাকমন্ডিনী কি মোহনবেশেই দেখা দিলেন। অশোক-

কর্ণিকারের পূর্ণভূষণে তিনি সজ্জিত, অগ্রে
বালাকর্ণবর্ণের বসন, কেশস্রমালায় কাকী
পুনঃপুনঃ সজ্জ হইয়া পড়িতেছে এবং ভ্রু-
চকললোচনা সৌন্দর্য্যে কণে কণে লীলাসমু-
দ্রাঙ্গলন করিয়া দ্রুত প্রমত্তগণকে নিবারণ
করিতেছেন।

অন্তরিক্বে দেবদাক্ষক্যমবেদিকার উপরে
শাঙ্গীলচন্দ্রীসনে দুর্ভট ভূঙ্গপালবন্ধ জটা-
কলাপ এবং গ্রহিযুক্ত কক্ষমুগুর্জা গায়ন
করিয়া ধ্যানস্থিতিলোচনে অমৃতরস
সমুদ্রের মত আপনাকে আপনি নিরীকণ
করিতেছিলেন।

অতানে অকালবসন্তে মগন এই ভট
বিশদূষণ পুরুষ-রমণীঃ মধো মিলনসাধনের
অন্ত উদ্ভূত ছিলেন।

কথাস্রোতঃ সেইরূপ। কোণায় বহল-
বসনা তপসকর্তা, এবং কোণায় সঙ্গম-
ধরণীর চক্রবর্তী অমীশ্বর! দেশকাল-
পাত্রকে মূর্ত্তের মধ্যেই এমন করিয়া সে
বিপর্য্যাস করিয়া দেয়, সেই মীনকেতনের যে
কি শক্তি, কালিদাস তাহা দেখাইয়াছেন।

কিন্তু কবি সেটখানেই থামেন নাই।
এই শক্তির কাছেই তিনি তাহার কাব্যের
সমস্ত রাজকর নিঃশেষ করিয়া দেন নাই।
তিনি যেমন ইহার হঠাৎ জরসংবাদ আনিয়া-
ছেন, তেমনি পরক্ষণেই ইহার চঠাৎ পরাতন
প্রচার করিয়াছেন। তিনি অস্ত চর্য্য শক্তি
দ্বারা পূর্ণতার চরম মিলন ঘটাইয়া তবে কাব্য
বন্ধ করিয়াছেন। শব্দের দেবরাজের দ্বারা
উৎসাহিত এবং বসন্তের মোহিনী শক্তির
দ্বারা সহায়বান্ মনকে কেবলনাত পরাস্ত
করিয়া ছাড়েন নাই, তাহার পলে বাহ্যকে

ভয়ী করিয়াছেন, তাহার সজ্জা নাই, সহায়
নাই, তাহা তপস্যা হইয়াছে, হৃদয়ে মলিন।
শব্দের দেবরাজ তাহার কথা চিন্তাও করেন
নাই।

যে প্রেমের কোন বন্ধন নাই, কোন নিয়ম
নাই, বাহা অকস্মাৎ নন্দনারীকে অতিক্রান্ত
করিয়া সংগম-দুর্গের ভগ্ন প্রাকারের উপর
আপনার জরপদা নিখাত করে, কালি-
দাস তাহার শক্তি স্বীকার করিয়াছেন, কিন্তু
তাহার কাছে আত্মসমর্পণ করেন নাই। তিনি
দেখাইয়াছেন, যে অন্ধ প্রেমসংযোগ আমা-
দিককে স্বাধিকারপ্রমত্ত করে, তাহা ভক্ত-
শাপের দ্বারা প্রতিভা, অবিশাপের দ্বারা প্রতিহত
ও দেবরাজের দ্বারা ভ্রমসং হইয়া থাকে।
শকুন্তলার কাছে বসন আতিথ্যদক্ষ কিছুই
নহে, হৃদয়স্তম্ভ সমস্ত তখন শকুন্তলার সে
প্রেমে আর কণাও রাখেন না। যে উদ্ভূত
প্রেম প্রিয়জনকে ছাড়া আর সমস্তই বিস্মৃত
হয়, তাহা সমস্ত বিবনাটিকে আপনার
প্রতিকূল করিয়া তোলে, সেইজন্যই সে
প্রেম অসমর্থনক বধোই ছুঁত হইয়া উঠে,
সকলের বিরুদ্ধে আপনাকে আপনি সে আর
বহন করিয়া উঠিতে পারে না। সে আশ্র-
সংবৃত্ত প্রেম সমস্ত সংসারের অগ্রকূল, বাহা
আপনার চারিদিকের ছোট এবং বড়, আত্মীয়
এবং পর, কাহাকেও তোলে না, বাহা প্রিয়-
জনকে কেন্দ্রস্থলে রাখিয়া বিশ্বপরিধির মধ্যে
নিজের মঙ্গলমাধুর্য্য বিকীর্ণ করে, তাহার
প্রববে দেবে-মানবে কেহ আঘাত করে না,
আঘাত করিলেও সে তাহাতে বিচলিত
হয় না। কিন্তু দ্বারা মর্তীর তপোবনে তপো-
উল্লস, গৃহীর গৃহপাশে সংসারবন্ধের

অকস্মাৎ পরাতৎপরূপে আবির্ভূত হয়, তাহা
তজ্জ্বল মত অন্তরে নষ্ট করে বটে, কিন্তু
নিজের বিনাশকেও নিজেই বহন করিয়া
আনে।

কিন্তু এ তবে কাব্যের কোন্ প্রয়োজন?
কৰ্মকলে কিসে ভাল হয়, কিসে মন্দ হয়,
তাহা যে ভাবে ধর্মশাস্ত্রের আলোচ্য সে
ভাবে কবির আলোচ্য নহে। বস্তুর ফলা-
ফলের বিচারভার কবির উপর নাই।
কবি বলিতেছেন, এখন,

“স্বপ্নচক্রে পদমংগলং।

বিশিনে ভবম কুতমংকং।”

তখন বনের মধ্যে রাত্রিকালে গইয়া
শ্যামচক্রে ভুলিতে উচ্ছ্বসিত। চৈতন্যসক
বলিতে পারেন, ইহার ফল ফল নয়—শরৎ-
কালের হিমে নিশ্চয় অর, এবং ইহার
আবশ্যে যতই মাধুর্য্য থাকুক, ইহার পরিণামে
কুইনীনের তিত্ততঃ—কিন্তু সে বিচারে
কবিকে ফিরাইতে পারে না। যতক্ষণ
আকাশে শরৎচক্রে এবং বনে পুষ্পগন্ধ আছে,
ততক্ষণ ম্যালেরিয়ায় আশঙ্কায় কাব্যের
রসভঙ্গ হইবার কথা নাই।

কালিদাসও ভাল প্রেম ও মন্দ প্রেম
লইয়া ঐহিক বা পারত্রিক লাভ-কতির
হিসাবে কোন আলোচনা উত্থাপন করেন
নাই। বরঞ্চ তিনি ঘনিষ্ঠ অসংযত প্রেমের
অপব্যাস্তবতা দেখাইয়া বিভীষিকার তাহার
কাব্য-নাটকের উপসংহার করিতেন, তাহা
হইলেও এমন-সম্মেহ হইতে পারিত যে,
কবি বুঝি ভয় দেখাইয়া উপদেশ দিতে
বসিয়াছেন, ওকৎ এমন অত্যাচার করিয়া

ভূত ছাড়ায়, তিনিও তেমনি প্রেমের ভূতকে
মারিয়া খেবাইবার আয়োজন করিয়াছেন।
কালিদাস সে পথে যান নাই। ভালবাসার
বিচারভার তিনি শাস্ত্রকারের উপর রাখিয়া-
ছেন এবং যে প্রেম সুলভতর, যে মিলন-
মাধুর্য্য সম্পূর্ণতর, তাহাকেই চরমে রাখিয়া
তিনি তাহার কাব্যকে রসগোবরে পূর্ণ
করিয়াছেন।

ইহার বিপরীত কারণেই টেনিসনের
‘প্যাপাস্ অফ্ আর্ট’ কবিতাটি আমার কাছে
অসম্পূর্ণ ও অকৃষ্টিকর তৈরিক। যে বিলাসী
আপনার চারিদিকে সৌন্দর্যের উপকরণ
সকল করিয়া নিরবচ্ছিন্ন সন্তোষপূর্ণে প্রবৃত্ত
হইয়াছিল, তিনি তাহার পরিণামকল
বর্ণনা করিয়াছেন নাই। তিনি বলিয়াছেন,
ঠিক তিন বৎসর পরে সেই বিলাসীর চিত্ত
পীড়িত হইতে লাগিল, সৌন্দর্য্যজুবি তাহার
চারিদিকে বীভৎস হইয়া উঠিল। কিন্তু
এ ত একটা সংবাদমাত্র। রোগের কারণ
অগ্নিবার কতদিন পরে রোগ ভয়ে এবং
সে রোগ কতদিন পরে পূর্ণপরিণাম গ্রাস্ত
হয়, ডাক্তার তাহার হিসাব দিয়া থাকেন।
ভোগী তিন বৎসর সুখভোগ করিয়া চতুর্থ
বৎসরে বিরক্তিবোধ করিল, তাহার কাব্যগত
কারণ কি থাকিতে পারে? এ পথের আমরা
বিশ্বাস করিতেও পারি, না-ও করিতে পারি।

কিন্তু কালিদাস এক্ষণ একটা সংবাদ-
মাত্র দেন নাই। তিনি এমন কোন তৎ-
কথার অবতারণা করেন নাই, যাহা প্রমাণের
উপর নির্ভর করিয়া আমাদের বিশ্বাস দাখ্য
করে। তিনি রসের পথে গিয়াছেন। তিনি
সন্তোষপাতি সুখের উজ্জ্বল সৌন্দর্য্যকে পরিপক

ফলের সম্পূর্ণ মাধুর্য্যে পরিণত করাইয়া দেখাইয়াছেন ।

পর্যাপ্ত যৌবনপূর্ণে অবনমিতা উমা সফারিণী পন্নবিনী লতার জ্ঞার আসিরা গিরিশের পদশ্রোতে লুপ্তিত হইয়া প্রণাম করিলেন, তাঁহার কর্ণ হইতে পন্নব এবং অলক হইতে নবকর্ণিকার বিচ্যুত হইয়া পড়িয়া গেল । মল্যাকিনীর জলে যে পদ্ম ছুটিত, সেই পদ্মের বীজ সৌন্দর্য্যকরণে শুক করিয়া নিজের হাতে গোঁড়ী থেে জপমালা গাঁথিয়াছিলেন, সেই মালা তিনি তাঁহার তাম্রকটি করে সম্রাসীর হস্তে সমর্পণ করিলেন । হাতে হাতে তৈকিয়া গেল । নিচলিতচিত্র ধোণে একবার উমার মুখে, উমার বিধাধরে তাঁহার তিন নেত্রকেই ব্যাপৃত করিয়া দিলেন । উমার শরীর তখন পুলকাকুল, দুই চক্ষু লক্ষ্যার পদ্যাত এবং মুখ একদিকে লাটীকৃত ।

কিন্তু অপূর্ণ্য সৌন্দর্য্যে অকস্মাৎ উদ্ভাসমান এই যে বর্ষ, দেবতা ইহাকে বিশ্বাস করিলেন না,—সরোষে ইহাকে প্রত্যাখ্যান করিলেন । নিজের ললিতযৌবনের সৌন্দর্য্য অপমানিত হইল জানিয়া লক্ষ্যাকুটিতা রমণী কোনমতে গৃহে স্থিরিয়া গেলেন ।

কব্ধহিতাকেও একদিন তাঁহার যৌবন-লাবণ্যের সমস্ত ঐশ্বর্য্যসম্পদ লইয়া অবমানিত হইয়া কিরিতে হইয়াছিল । দুর্কীসার শাপ কবির রূপকমায় । দ্ব্যাক্ত-শকুন্তলার বন্ধনবিহীন গোপনমিলন চিরকালের অতিশায়ে অভিশপ্ত । উন্নততার উজ্জল উদ্বেগ কণকালের ভ্রষ্ট হয়—তাঁহার পরে অবসাদের, অপনানের, বিদ্যুতির অরুকার

আসিরা আক্রমণ করে । ইহা চিরকালের বিধান । কালে কালে বেশে বেশে অপমানিতা নারী “বার্ধ্য সমধা ললিতঃ বপুয়াশ্চ ন-চ” আপনার ললিত দেহকান্তিকে বার্ধক্য জান করিয়া, “শূভ্রা জগাম তবনাত্তিমুখী কথঞ্চিৎ” শূভ্রত্ববশে কোনক্রমে গৃহের দিকে ক্রিরিয়াছে । ললিত দেহের সৌন্দর্য্যই নারীর পরম গৌরব চরম সৌন্দর্য্য নহে ।

সেইজন্যই “নিমিন্স রূপং দ্ববয়েন পার্শ্বতী” পার্শ্বতী রূপকে মনে মনে লিন্স করিলেন । এবং “ইদেষ সা কর্তৃমবজ্ঞা-রূপতাম্” তিনি আপনার রূপকে সকল করিতে ইচ্ছা করিলেন । রূপকে সকল করিতে হয় কি করিয়া ? সাজে সম্ভার, বসনে অলঙ্কারে ? দে পত্রীক্ষা ত বার্ধ হইয়া গেছে ।

ইদেষ সা কর্তৃমবজ্ঞারূপতাঃ
সমাধিনাহার উপোত্তরাধানঃ—

তিনি তপস্তাধারা নিজের রূপকে অবজ্ঞা করিতে ইচ্ছা করিলেন । এবারে গোঁড়ী তরুণ্যকরক্ৰিমবসনে শরীর মণ্ডিত করিলেন না, কর্ণে চূতপন্নব এবং অলকে নবকর্ণিকার পরিলেন না ; তিনি কঠোর মৌজী মেথলা দ্বারা অঙ্গে বস্ত্রল বাঁধিলেন এবং ধ্যানাসনে বসিয়া দীর্ঘ অপাঙ্গে কালিমাপাত করিলেন । বসন্তসখা পঞ্চশর মদনকে পরিভ্যাগ করিয়া কঠিন ছুৎথেকেই তিনি প্রেমের সহায় করিলেন ।

শকুন্তলাও দিব্য আশ্রমে মদনের মাদকতাম্মানিকে ছুৎথাপে দগ্ধ ক্রিয়া কল্যাণী তাপসীর বেশে সার্থক প্রেমের প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন ।

যে নিগোচন বসন্তসম্পাতরূপা গৌরীকে একমুহুর্তে প্রত্যাখ্যান করিয়াছিলেন, তিনি দিবসের শশিলেখার স্তায় কণ্ঠিতা, প্রথ-
লবিত-গিল্ললজটাবাহিণী তপস্বিনীর নিকট সংশয়বহিত সম্পূর্ণভাবে আপনাকে সমর্পণ
করিলেন। সাধারণপাত্রাকৃত ঘোবনকে পরাক্রম
করিয়া পার্বতীর নিরাকরণা নবো-
মহী কান্তি অবলা ভ্যোতিলেখার মত উদ্ভিত
হইল। প্রার্থিতকে সে সৌন্দর্য বিচলিত
করিল না, চরিতার্থ করিয়া দিল। তাহার
মধ্যে লজ্জা-আশঙ্কা আঘাত-আগোড়ন
হইল না; সেই সৌন্দর্যের বরুনকে আত্মা
আত্মের আত্মের বরণ করিল, তাহার মধ্যে
নিজের পিতামহ অহতব করিল না।

এতদিন পরে—

ধর্মপাপি পনঃ শব্দে কারিঃ পাক্ষতীঃ প্রতি।

পুষ্কাপরাবতীতঃ কাম্যতোচ্ছৃঙ্গিতঃ মনঃ।—

ধর্ম যখন মহাশেষের মনকে পার্বতীর
অভিমুখে আকর্ষণ করিলেন, তখন পুষ্কাপরা-
বতীত কাম্যের মন আশ্বাসে উজ্জ্বলিত হইয়া
উঠিল। ধর্ম যেখানে হই ছদ্মরূপে একত্র
করে, সেখানে মনের সহিত কাহারো কোন
বিরোধ নাই। সে যখন ধর্মের বিরুদ্ধে
বিরোধ বাধাইতে চায়, তখনি বিরূপ উপ-
স্থিত হয়; তখনি প্রেমের মধ্যে প্রবল এবং
সৌন্দর্যের মধ্যে শান্তি থাকে না। কিন্তু
ধর্মের অধীনে তাহার বে নির্দিষ্ট স্থান
আছে, সেখানে সেও পরিপূর্ণতার একটি
অলংকরণ, সেখানে থাকিয়া সে সুখমাত্ত
করে না। কারণ, ধর্মের অর্থই সামঞ্জস্য;
এই সামঞ্জস্য সৌন্দর্যকেও রক্ষা করে,
মঙ্গলকেও রক্ষা করে এবং সৌন্দর্য ও

মঙ্গলকে অভিন্ন করিয়া উভয়কে একটি
আনন্দময়-সম্পূর্ণতা দান করে। সৌন্দর্য
যেখানে ইন্দ্রিয়কে ছাড়াইয়া তাবের মধ্যে
শিরা প্রবেশ করে, সেখানে বাহ্যসৌন্দর্যের
বিধান তাহাকে আর খাটে না। সেখানে
তাহার আর ভূষণের প্রয়োজন কি?
প্রেমের মন্ত্রবলে মন যে সৌন্দর্য সৃষ্টি করে,
তাহাকে বাহ্যসৌন্দর্যের নিরমে বিচার করাই
চলে না। উল্লার সৌন্দর্য প্রধানত ইন্দ্রিয়ের
ভোগ্য, এইজন্য তাহার অলংকার প্রচুর;
রূপের সৌন্দর্যভোগে অধিকতর পরিমাণে
চিত্তবৃত্তির প্রয়োজন হয়, এইজন্য তাহার
অলংকার বিরল—মন তাহাকে নিজের
অলংকার দিয়া লাবায়। উচ্চ অবস্থার সৌন্দর্য-
মাত্রই মনের সহায়তা প্রার্থনা করে, সেই-
জন্য বিচিত্র আয়োজন দূর করিয়া সে নিজের
মধ্যে মনের বিচরণের সুবিধার্থ অবকাশ
রাখিয়া দেয়। প্রেমের সৌন্দর্যে, মঙ্গলের
সৌন্দর্যে মনেরই অধিকার—এইজন্য বাহ্য-
সৌন্দর্যের সহায়তাকে সে উপেক্ষা করিতে
পারে। শিবের স্তায় তপস্বী সৌরীর স্তায়
কিশোরীর সঙ্গে বাহ্যসৌন্দর্যের নিরমে ঠিক
যেন সঙ্গত হইতে পারেন না। শিব নিজেই
ছদ্মবেশে সে কথা তপস্বীরতা উমাকে
জানাইয়াছেন। উমা উত্তর দিয়াছেন,
“মহাত্ম তাটৈবকরনঃ মনঃ দ্বিতম্” আমার মন
তাঁহাতেই তাটৈবকরন হইয়া অবস্থিত করি-
তেছে। এ বেরন, এ তাবের রন; সুতরাং
ইহাতে আর কথা চলিতে পারে না। মন
এখানে বাহিরের উপরে জরী—সে নিজের
আনন্দকে নিজে সৃষ্টি করিতেছে। শব্দও
একদিন বাহ্যসৌন্দর্যকে প্রত্যাখ্যান করিয়া-

ছিলেন, কিন্তু প্রেমের দৃষ্টি, মঙ্গলের দৃষ্টি, ধর্মের দৃষ্টি দ্বারা যে সৌন্দর্য দেখিলেন, তাহা তপস্বীত্ব ও আভরণহীন হইলেও, তাহাকে লয় করিল। কারণ, সে জগৎ তাহার নিজের মনই সত্যতা করিয়াছে—মনের কর্তৃত্ব তাহাতে নষ্ট হয় নাই।

ধর্ম বধন তাপস-তপস্বিনীর মিলনসাধন করিল, তখন স্বর্ণমর্ত্য এই প্রেমের সাক্ষি ও সহায় রূপে অবতীর্ণ হইল; এই প্রেমের আত্মান সপ্তর্ষিগুরুকে স্পর্শ করিল; এই প্রেমের উৎসব লোকলোকান্তরে ব্যাপ্ত হইল। ইহার মধ্যে কোন গুঢ় চক্রান্ত, অকালে বসন্তের আবির্ভাব ও গোপনে মননের পরপাতন গ্রহিত না। ইহার যে অগ্নানমঙ্গলত্রী, তাহা সমস্ত সংসারের আনন্দের সায়ত্রী। সমস্ত বিশ্ব এই শুভমিলনের নিমন্ত্রণে প্রসঙ্গমুখে যোগদান করিয়া ইহাকে সুলস্পন্দ করিয়া দিল।

সপ্তম সর্গে সেট বিশ্ববাসী উৎসব। এই বিবাহ-উৎসবেই কুমারসম্ভবের উপসংহার।

শান্তির মধ্যেই সৌন্দর্যের পূর্ণতা, বিরোধের মধ্যে নহে। কালিদাস তাহার কাব্যের রসপ্রবাহকে সেই স্বর্ণমর্ত্যবাসী সর্গীকসম্পন্ন শান্তির মধ্যে মিলিত করিয়া দিয়া তাহাকে মহান পরিণাম দান করিয়াছেন, তাহাকে অর্ধপথে “ন যদৌ ন তদৌ” করিয়া রাখিয়া দেন নাই। মাঝে তাহাকে যে একবার বিচ্যুত করিয়া দিয়াছিলেন, সে কেবল এই পরিণত সৌন্দর্যের প্রাণান্তিকে প্লাবিত করিয়া দেখাষ্টবার জন্ত,—উচ্চাির ত্রিভুজ মঙ্গলমূর্তিকে বিচিত্রবেশী উদ্ভাসিত

সৌন্দর্যের তুলনায় উজ্জ্বল করিয়া তুলিবার জন্ত।

মহেশ্বর বধন সপ্তর্ষিদের মধ্যে পতিভ্রতা অরুণভীকে দেখিলেন, তখন তিনি পত্নীর সৌন্দর্য যে কি, তাহা দেখিতে পাইলেন।

সুন্দর্যবাক্য : পত্নোহুর্ভানু দানার্থবাক্যঃ ।

ত্রিভাষা : বল বর্ধাণাঃ সংপত্তো মূলকারবন্ ।

তাঁহাকে বেশির শস্ত্র দারগ্রহণের জন্ত অন্তঃস্থ আশ্রয় করিল। সংপত্নীই সমস্ত ধর্ম্যকার্যের মূলকারণ।

পতিভ্রতার মুখচ্ছবিতে বিবাহিতা রমণীর যে গৌরবত্রী অস্তিত আছে, তাহা নিরন্ত-আচরিত কল্যাণকর্মেয় ত্রি সৌন্দর্য্য,—শস্ত্র করনানয়ে সেই সৌন্দর্য্য বধন অরুণভীর সৌম্যমূর্তি চটতে পতিকলিত চটয়া নববধু-বেশিনী গৌরীর মলাট স্পর্শ করিল, তখন শৈলমুখতা যে লাগলো লাগ করিলেন, অকাল-বসন্তের সমস্ত পুষ্পসম্মার তাঁহাকে সে সৌন্দর্য্য দান করিতে পারে নাই।

বিবাহের দিনে গৌরী—

স। মঙ্গলস্থাননিভুতসংগ্রী

গৃহীতপত্নীসঙ্গনীংগ্রা।

সিবৃন্দগর্তভক্তাভিবেক।

প্রভুরকাশটুংগ্রবেব বেধে।

মঙ্গলস্থানে নির্মলগাটী হইয়া বধন পতি-মিলনের উপযুক্ত বসন পরিধান করিলেন, তখন বর্ষার জগাতিবেকের অবসানে কাপ-কুমুদে প্রোক্ষা বহুবার ক্রায় বিসর্জ করিতে লাগিলেন।

এই যে মঙ্গলগাণ্ডি নির্মল শোভা, ইহার মধ্যে কি শান্তি, কি ত্রী, কি সম্পূর্ণতা! ইহার মধ্যে সমস্ত চেষ্টা অবদান, সমস্ত

সজ্জার শেষ পরিণতি।—ইহার মধ্যে ইন্দ্র-
সভার কোন প্রকাশ নাই, মননের কোন
সোহ নাই, বসন্তের কোন আত্মকূল্য নাই—
এখন ইহা আপনার নির্মলতায়—মঙ্গলতায়
আপনি অক্লান্ত—আপনি সম্পূর্ণ।

জননীপদ আশ্রয়ের বেশের নারী
প্রধান পদ ; সন্তানের জন্য আশ্রয়ের বেশে
একটি পবিত্র মঙ্গলবাণী। সেইজন্য মহু
রমণীদের সবকে বলিয়াছেন, “প্রজন্মার্থে
মহাভাগাঃ পূজার্তা গৃহদীপ্তাঃ”—তাহারা
সন্তানকে জন্য সেন বলিয়া মহাভাগা, পূজ-
নীয়া ও গৃহের দীপ্তিযুক্ত।। সমস্ত কুমার-
সম্ভব কাব্য কুমারজনরূপ মহৎবাণীর
উপযুক্ত ভূমিকা। মদন গোপনে শর
নিক্ষেপ করিয়া ধৈর্যবান ভক্তিয়া বে মিলন
ঘটাইয়া থাকে, তাহা পুণ্যভয়ের বোগ্য
নহে ; সে মিলন পরস্পরকে কামনা করে,
পূজকে কামনা করে না। এইজন্য কবি
মদনকে ভয়সং করাইয়া গৌরীকে দিয়া
তপস্করণ করাইয়াছেন। এইজন্যই কবি
ঐশ্বর্যের চাক্ষুস্যে প্রবর্তিত একাগ্রতা,
সৌন্দর্য্যমোহের ফলে কল্যাণের কমলীর ছাতি
এবং বসন্তবিলসল বনানীর ফলে আনন্দ-
নিবন্ধ বিশ্বলোককে দাঁড় করাইয়াছেন, তবে
কুমারজন্মের সূচনা হইয়াছে। কুমারজন্ম
ঘাপায়টী কি, তাহাই বুঝাইতে কবি মদনকে
বেবদ্যোবানলে আহুতি দিয়া অমাধা রক্তিকে
বিলাপ করাইয়াছেন।

শকুন্তলাতেও প্রথম অঙ্কে প্রেমসী
সহিত দ্রব্যস্তের বার্থ প্রণয় ও শেষ অঙ্কে
ভরতজননীসু সঙ্গে তাহার শরৎ মিলন
কবি অঙ্কিত করিয়াছেন।

প্রথম অঙ্ক চাক্ষুস্য-প্রেক্ষণো পূর্ণ ;
তাহাতে উষ্মগোবিন্দা কবিকল্পা, কৌতু-
কোচ্ছলিতা গণীষর, নবপুণ্ডিতা বনতোবিত্তি,
সৌরভভ্রাতৃ মৃত ভ্রমর এবং তরু-অন্তরালবর্তী
মুগ্ধ রাজা তপোবনের একটি নিতৃতপ্রান্ত
আশ্রয় করিয়া সৌন্দর্য্যমোহিত এক অপ-
কৃত্ত দৃষ্ট উদ্ঘাটিত করিয়াছে। এই প্রমোদ-
বর্ণ হইতে দ্রব্যস্তপ্রেমসী অপমানে নির্দা-
সিত হইয়া গিয়াছেন, কিন্তু কল্যাণরূপিনী
ভরতজননী যে দিব্যতরু তপোভূমিতে
আশ্রয় লইয়াছেন, সেখানকার দৃষ্ট অস্তরঙ্গ।
সেখানে কিশোরী তপসকল্পারা আলবালে
জলসেনে করিতেছে না, শতভাগিনীকে
সেহৃদীয়ারা অভিষিক্ত করিতেছে না,
কৃতকপূর যুগপিত্তকে নীবারদৃষ্টিয়ারা
পালন করিতেছে না। সেখানে তরুলতা-
পুষ্পজন্মের সমুদয় চাক্ষুস্য একটিমাত্র
বালক অধিকার করিয়া বসিয়া আছে,
সমস্ত বনানীর কোল সে তরিয়া গ্রহিয়াছে ;
সেখানে মহাকারপাখার মুগ্ধ ধরে কি না,
নবমলিকার পুষ্পময়ী কোটে কি না, সে
কাহারো চক্ষেও পড়ে না। প্রেমবাহুল্য
তাপসী মাতারা দ্রুত বালকটিকে লইয়া
যাত হইয়া গিয়াছেন। প্রথম অঙ্কে শকু-
ন্তলার সহিত পরিচয় হইবার পূর্বে দৃষ্ট হইতে
তাহার নববোবনের লাভালাভীলা দ্রব্যস্তকে
মুগ্ধ ও আকৃষ্ট করিয়াছিল। শেষ অঙ্কে
শকুন্তলার বালকটী শকুন্তলার সমস্ত লাভাভার
হান অধিকার করিয়া লইয়া রাজার অন্তর-
তর জয় আশ্র করিয়া দিল।

এমন সময়ে—

বদনে পরিবৃত্তে বদনা

নিমকানন্দী পুটকরণেঃ।—

বলিনধূরবননা, নিঃসঙ্গার শুকদ্বীপ, এক-
বেণীধরা, বিরহভট্টারকী, শুকদ্বীপা শকুন্তলা
প্রবণ করিলেন। এমন তপস্তার পরে
অক্ষরবরলাভ হইবে না? সুদীর্ঘতপস্তারপে
প্রথম সমাগমের সান্নিধ্য বড় চইয়া পূত্রপোষ্য
পরমকুসুমিতা দে কল্পকল্যাণচ্ছবি জননী-
মুষ্টি বিকশিত হইয়া উঠিয়াছে, তাহাকে কে
প্রত্যাখ্যান করিবে?

ধূর্তির মধ্যে গোবী কোন অভাব—
কোন দৈন্য দেখিতে পান নাই, তিনি
তাঁহাকে ভাবের ঢক্ষে দেখিয়াছিলেন, সে
দৃষ্টিতে ধন-বহু রূপ-দোবনের কোন হিসাব
ছিল না। শকুন্তলার প্রেম সুতীর অপমানের
পরেও মিলনকালে দ্ব্যস্তের কোন অপরাধই
লইল না, ছঃসিনার ছুই চক্ষু নিঃক্ষেপল
পড়িতে লাগিল। যেখানে প্রেম নাই,
সেখানে অভাবের, দৈত্যের, কুপের সীমা
নাই—যেখানে প্রেম নাই, সেখানে পদে
পদে অপরাধ। গোবীর প্রেম যেমন
নিজের সৌন্দর্য্যে-সম্পদে সন্ন্যাসীকে হুন্দর ও
ঈশ্বর করিয়া দেখিয়াছিল, শকুন্তলার প্রেমও
দেইরূপ নিজের বঙ্গদৃষ্টিতে দ্ব্যস্তের
সমস্ত অপরাধকে দূর করিয়া দেখিয়াছিল।
দ্ব্যস্ত-দ্ব্যস্তীর মোহিনী প্রেমে এত কমা
কোথার? ভবভট্টজননী বেদন পুত্রকে জঠরে
ধারণ করিয়াছিলেন, সন্তোষতামরী ক্যমাকেও
তেননি শকুন্তলা তপোবনে বদিয়া আপনায়
অস্তরের মধ্যে পরিপূর্ণ করিয়া কুলিয়াছিলেন।
বালক ভরত দ্ব্যস্তকে দেখাইয়া জিজ্ঞাসা
কবিল, “মা, এ কে আমাকে পুত্র বলি-
তেছে?” শকুন্তলা উত্তর করিলেন, “বাছা,
আপনার ভাগ্যকে জিজ্ঞাসা কর!”—ইহার

মধ্যে অতিমান ছিল না—ইহার অর্থ এই যে,
‘যদি ভাগ্য প্রসন্ন হয়, তবে ইহার উত্তর
পাইবে’—বলিয়া রাজার প্রশ্নের তার অপেক্ষা
করিয়া রহিলেন। যেই মুহূর্ত্তে, দ্ব্যস্ত
তাঁহাকে অস্বীকার করিতেছেন না, তখন
নিঃস্বীকার নাহি বিগলিত চিত্তকে
দ্ব্যস্তের চরণে পূজাভাজি দান করিলেন,
নিজের ভাগ্য ছাড়া আর কাহারও কোন
অপরাধ দেখিতে পাইলেন না। আত্মসন্তি-
মানের দ্বারা অস্তকে খণ্ডিত করিয়া দেখিলে
তাঁহার দোষ-ত্রুটি বড় হইয়া উঠে—ভাবের
দ্বারা, প্রেমের দ্বারা সম্পূর্ণ করিয়া দেখিলে, সে
সমস্ত কোণার অনূধ্য হইয়া যায়!

যেমন নোকেবর এক চরণ সম্পূর্ণ মিলের
জন্ত অস্ত চরণের অপেক্ষা করে, তেমনি
দ্ব্যস্ত-শকুন্তলার প্রথম মিলন সম্পূর্ণতা-
লাভের জন্ত এই বিস্তার মিলনের একান্ত
আকাঙ্ক্ষা রাখে। শকুন্তলার এত ছঃক্ষে
নিষ্কল করিয়া শূন্য হুগাইয়া রাখা যায় না।
যজ্ঞের আয়োজন যদি কেবল অগ্নিই অলে,
কিন্তু তাহাতে অরপাক না হয়, তবে নিম-
জিতদের কি দশা ঘটে? শকুন্তলার শেব
অস্ত, নাটকের বাহুসীতি অহুগারে নছে,
তদপেক্ষা গভীরতর নিরমের প্রবর্ত্তনার উচ্চ
হইয়াছে।

দেখা গেল, কুমারসম্ভব এবং শকুন্তলার
কাব্যের বিষয় একই। উভয় কাব্যেই কবি
দেখাইয়াছেন, মোহে বাহ্য অকৃতার্থ, মঙ্গলে
তাহা পরিসমাপ্ত; দেখাইয়াছেন, ধর্ম্ম যে
সৌন্দর্য্যকে ধারণ করিয়া রাখে, তাহাই ধ্রুব
এবং প্রেমের শাস্তসংগত কল্যাণরূপই শ্রেষ্ঠ
কণ; বরুনেই গাথা আছে এবং উচ্চমণ্ডলার

ମୌକ୍ଷର୍ଯ୍ୟର ଆତ୍ମ ବିକୃତି । ତ୍ରାସତବର୍ଷର ପୁରାତନ କବି ଶ୍ରେୟଙ୍କେଇ ଶ୍ରେୟେଷ ଚନ୍ଦ୍ରସମ୍ପର୍କର ବଳିଆ ଶୌକାର କଲେ ନାହିଁ, ବଜ୍ରଲଙ୍କେଇ ଶ୍ରେୟେଷର ମରମ ଲକ୍ଷ୍ୟ ବଳିଆ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି । ତାହାର ଯତେ ନରନାଶୀର ଶ୍ରେୟେଷ ହୁଏ ନାହିଁ—ହାଣୀ ନାହିଁ, ଧରି ତାଣୁ ବନ୍ଦା ହୁଏ,—ଧରି ତାହା ଆପଣାର ଯଥୋପାୟ ନିର୍ଦ୍ଦୀର୍ଣ୍ଣ ହୁଏ ଧାକେ,—କଳାପାକେ ଚନ୍ଦ୍ରମାନ ନା କରେ ଏବଂ ସଂସାରେ ପୁରୁଷକର୍ତ୍ତା ଅତିପିପ୍ରିତବିଶୌର ଯଥୋପାୟ ବିଚିତ୍ରମୌକ୍ଷାପାତ୍ରପେ ବ୍ୟାପ୍ତ ହୁଏ ନା ଧାଏ ।

ଏକଦିନେ ଗୁରୁଦର୍ଶନର କଳାପାବନ, ଅନ୍ତର୍ଦ୍ଧିକେ ନିର୍ମିତ ଆହାର ବନମୋଚନ, ଏହି ଛୁଇଁ ତ୍ରାସତବର୍ଷର ବିଶେଷ ଭାବ । ସଂସାର-ଯଥୋପାୟ ତ୍ରାସତବର୍ଷ ବଚନୋକ୍ତର ସହିତ ବଜ୍ରସବଦେ ଉଦ୍ଧୃତ, କାଳାକେତୁ ସେ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବେ ଧାଏ ନା,—ତପସ୍ୟାର ଆମ୍ଭେ ତ୍ରାସତବର୍ଷ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏକାକୀ । ଗୁରୁତର ଯଥୋପାୟ ସମସ୍ତେ ଅଭାବ ନାହିଁ, ଗୁରୁତର ଯଥୋପାୟ ତାହାତର ପଥ—ଆଦାନପ୍ରଦାନର ସମ୍ପର୍କ ଗାତେ, କାଳିକାଳ ତାହାର ମହତ୍ତ୍ୱଶାଳୀ-କୁମାରସନ୍ତବେ ତାହା ଘୋଷାଟି-ରାହେନ । ତାହାର ତପୋବନେ ଦେବମାନ ସିଂହ-ନାବକେ-ନରମାନଙ୍କେ ଖେଳା କରିବେ, ତେଜସ୍ବି, ତାହାର କାବ୍ୟତପୋବନେ ଘୋଷିତ ଭାବ, ଗୁରୁତର

ଭାବ ବିକୃତି ହୁଏ ଧାଏ । ସନ୍ତାନ ଆମ୍ଭେ ସେହି ମହତ୍ତ୍ୱ ବିକୃତି କରିବାର ଗୋଟିଏ କରିବାବଳି ବଳିଆ, କବି ତାହାର ଉପରେ ବଜ୍ରନିପାତ କରିବା ତପସ୍ୟାର ଧାବ୍ୟ କଳାପାବନ ଗୁରୁତର ସହିତ ନିରାଶଙ୍କ ତପୋବନେ ଅପବିତ୍ର ମହତ୍ତ୍ୱ ମୁନିବୀର ହାସନ କରିଛନ୍ତି । ଗୁରୁତର ଆଦାନ-ପ୍ରଦାନେ ତିନି ଗୁରୁତର ପତନ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ନରନାଶୀର ମହତ୍ତ୍ୱକେ କାବ୍ୟର ହତ୍ୟା ଆକ୍ରମଣ ହୁଏ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ତପୋବନେ ନିର୍ମଳ ଘୋଷାବନେ ଉପରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କରିଛନ୍ତି । ତ୍ରାସତବର୍ଷର ସଂଚିତାର ନରନାଶୀର ସଂସତ ମହତ୍ତ୍ୱ କଠିନ ଅହଂକାରର ଆକାରେ ଆଦିତ, କାଳି-କାବ୍ୟର କାବ୍ୟ ତାହାହିଁ ମୌକ୍ଷର୍ଯ୍ୟର ଉପକରଣେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ । ସେହି ମୌକ୍ଷର୍ଯ୍ୟ ଶ୍ରୀ, ଶ୍ରୀ ଏବଂ କଳାପେ ଉଦ୍ଧାସନାନ ; ତାହା ମହତ୍ତ୍ୱତର ଦିନେ ନିତାନ୍ତ ଏକପଦ୍ୟ ଏବଂ ବ୍ୟାପ୍ତିର ଦିନେ ବିଶେଷ ଆଦାନ-ପ୍ରଦାନ । ତାହା ତାହାର ଧାବ୍ୟ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ, ଗୁରୁତର ଧାବ୍ୟ ଚରିତାର୍ଥ ଏବଂ ଦର୍ଶନର ଧାବ୍ୟ ଏବଂ । ଏହି ମୌକ୍ଷର୍ଯ୍ୟ ନରନାଶୀର ଗୁରୁତର ଗୁରୁତର ଶ୍ରେୟେଷ ଶ୍ରେୟେଷେ ଆପଣାକେ ସଂସତ କରିବା ମହତ୍ତ୍ୱ-ମହତ୍ତ୍ୱଶାଳୀ ଯଥୋପାୟ ମହତ୍ତ୍ୱତା ଲାଭ କରି-ରାହେ—ଏହି ଗୁରୁତର ତାହା ବଜ୍ରବିହୀନ ଗୁରୁତର ଶ୍ରେୟେଷ ଅପେକ୍ଷା ମହତ୍ତ୍ୱ ଏବଂ ବିଶ୍ୱାସକର ।

মাস্তাবী প্রেম ।

হারে অলস প্রেম !
কে বলেছে তোরে পরশ-মাণিক,
কে বলেছে তোরে হেম !
আমি জানি তোর লীলা যুগে যুগে,
সব রহস্য ভাই ;
বেই বরিয়াছে তোরে দুর্ভাগা,
তারি ভাগ্যেই চাই !

ওরে প্রাণস্ব মায়া !
বুধা আশ্বাসে ধরেছি 'অঁকড়ি'
তোর অশ্রু ছায়া !
নববসন্তে মরীচিকা গাথি'
চাহিছু পরিত্যক্ত হার ;
আজ কিছু নাই, বকে কেবল
অঁলছে পিপাসা তার ।

হারে অস্বিম লিখা !
পড়িয়া লয়েছি তোমার আশোক
আমার লগাট-লিখা ।
তোমারে সাজাহু উৎসব-ধীপ
বাসরশয়ন ঘিরে,
তুমি যে আলাও চিতার আশ্রন
সর্বনাশায় তীরে ।

ওরে অতৃপ্ত আশা !
আমার জীবনে বিবর্ত ঘনিষা
কেনরে করেছ বাসা !
যত ব্যথা পাই তবু তোরে চাই,
যত ব্যজে চাপি বৃকে ;
বানশি স্বাক্ষরে খেলাইয়া কিরি
কাল-ফণীটরে স্মৃথে !

শ্রীপ্রমথনাথ রায় চৌধুরী ।

সার সত্যের আলোচনা ।

তিনে এক, একে তিন । *

সত্যবাদের আলোচনার শেষ-ভাগে ত্রিকের কথা উপস্থিত হওয়াতে তাহার গোটা-কত নমুনা বাহ্য দেখানো হইয়াছিল, তাহা এইরূপ :—

(১)	(২)	(৩)
প্রাণ	মন	বুদ্ধি
উদ্ভিদ	মৃত্তক	মহুবা
স্বপ্ন	বস	ভাঃ
তম	রক্ত	স্ব

ইত্যাদি ।

ত্রিক দুই অক্ষরের নয় বই নয়, কিন্তু তাহার শুদ্ধ নিখিল বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে ফুলায় না। বলা যাইতে পারে যে, ভাবব্রহ্মাণ্ডের চাৰি একটিনাক্ষর, আর সে চাৰি ত্রিক। ত্রিকের ঘোড় সারা বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের গোড়া হইতে শেষ পর্যন্ত ঘুরিয়া ঘুরিয়া চলিয়াছে—কোথাও তাহার পরিসমাপ্তি নাই।

ত্রিকের অস্তিত্বের পথ একট চক্রাকৃতি সোপান; আর, তাহারই নাম ব্রহ্মচক্র; সংক্ষেপে—ব্রহ্মচক্র।

ব্রহ্মচক্রের দুইটি ক্রম—(১) নাবিবার ক্রম বা সৃষ্টির ক্রম বা অহলোম-ক্রম; এবং (২) উত্তিরার ক্রম বা সাধনের ক্রম বা প্রতিলোম-ক্রম। অহলোম-ক্রমের গতি স্থল

হইতে ফুলের দিকে; প্রতিলোম-ক্রমের গতি ফুল হইতে স্থলের দিকে।

বলিগাম “দুই ক্রম”; কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে তাহা দুই নহে; তাহা একই ক্রমের দুই অর্ধাঙ্গ। এক দিবা+এক রাত্রি = দুই দিন নহে, পরন্তু তাহা একই দিনের দুই অর্ধাঙ্গ; তেমনি অহলোম-ক্রম+প্রতিলোম-ক্রম = একই ক্রমের দুই অর্ধাঙ্গ। কতকগুলি বিষয় এখানে সবিশেষ দ্রষ্টব্য।

প্রথম দ্রষ্টব্য এই যে, সমগ্র ত্রিক-শ্রেণী একটি চক্রাকৃতি সোপান। দ্বিতীয় দ্রষ্টব্য এই যে, ত্রিক-গুলি গোল সিঁড়ির ধাপের স্তায় উপক্র-পরস্পর। এক-এক ত্রিক এক-এক উপক্রের কেন্দ্র।

তৃতীয় দ্রষ্টব্য এই যে, সমগ্র ত্রিক-চক্র দুই ভাগে বিভক্ত; সে দুই ভাগ দুইটি গোল সিঁড়ি। একটি গোল সিঁড়ি নাবিবার সিঁড়ি, আর একটি গোল সিঁড়ি উত্তিরার সিঁড়ি। প্রথম গোল সিঁড়িতে ত্রিক-শ্রেণী ঘুরিয়া ঘুরিয়া নাবিবা চলিয়াছে, দ্বিতীয় গোল সিঁড়িতে ত্রিক-শ্রেণী ঘুরিয়া ঘুরিয়া বাহিয়া উঠিয়াছে। ঐ দুইটি গোল-সিঁড়ির বথাক্রমে নাম বেওয়া যাইতে পারে (১) অহলোম-সোপান এবং (২) প্রতিলোম-সোপান।

চতুর্থ দ্রষ্টব্য এই যে, যেমন রজনীর সমাপ্তিই দিবসের আরম্ভ এবং দিবসের

সমাপ্তিই রজনীর আরম্ভ, তেমনি অহুলাম-সোপানের সমাপ্তিই প্রতিশোম-সোপানের আরম্ভ এবং প্রতিশোম-সোপানের সমাপ্তিই অহুলাম-সোপানের আরম্ভ। ইহা হইতে আসিতেছে এই যে, রজনীর শেষাংশ যেমন শিবপের প্রথমার্শে গিয়া ঠাঁকে, তেমনি প্রতিশোম-সোপানের শেষ ত্রিক অহুলাম-সোপানের প্রথম ত্রিকে গিয়া ঠাঁকে। অহুলাম-সোপানের প্রথম ত্রিক কি ? না,—সং, চিৎ, আনন্দ; প্রতিশোম-সোপানের শেষ ত্রিক কি ? না,—প্রাণ, মন, বুদ্ধি। দুয়ের সংযোগ কোথায় ? না,—যেখানে প্রাণ-মন-বুদ্ধির চরম উৎকর্ষ সং-চিৎ-আনন্দে গিয়া পদাঙ্গু লাত করে।

অতঃপর ঐষ্টবা এই যে, কি গোড়ার ত্রিক, কি মাঝের ত্রিক, কি শেষের ত্রিক, সকল ত্রিকেরই ভিতরকার কল একই-প্রকার। সে কলের নুখ অবয়ব তিনটি—(১) শাস্তি, (২) প্রতিযোগ, (৩) সংযোগ; আর, সে কলের গতি তাহার ঐ তিন অবয়বের মধ্যেই আবদ্ধ। সে গতি এইরূপ:—শাস্তি হইতে প্রতিযোগে, প্রতিযোগ হইতে সংযোগে, সংযোগ হইতে নূতন শাস্তিতে, নূতন শাস্তি হইতে নূতন প্রতিযোগে, নূতন প্রতিযোগ হইতে নূতন সংযোগে, নূতন সংযোগ হইতে নবতর শাস্তিতে; ইত্যাদি, ইত্যাদি।

ত্রিকের ঐ যে ভিতরকার কল, উহা একপ্রকার রূপক-তাল। রূপক-তালের অঙ্গ তিনটিমাত্র—দুই তাল এবং এক কঁক। দুই তাল হ'লে প্রতিযোগ এবং সংযোগ; আর এক কঁক হ'লে শাস্তি।

সকল ত্রিকের ভিতরকার কল যেহেতু একই-প্রকার, এত বড় আদি এবং অন্ত, এই দুই মুড়ার দুই ত্রিকের প্রতি আপাতত লক্ষ্য নিবদ্ধ করিয়া, সেই দুই ত্রিকে মাঝ-খানের আর আর ত্রিক-শ্রেণীর আদর্শরূপে গ্রহণ করা বাইতে পারে। আমি এক্ষণে তাহারই করিব; তাহার পরিবর্তে গোড়ারই যদি আমি বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের ত্রিকের গোলোক-ধামার প্রবেশ করিয়া আপনিঃ বিদ্রাভ হই এবং পাঠকবর্গকেও বিদ্রাভ করিয়া তুলি, তাহা হইলে একূল ওকূল জকূল বাইবে; তাহাতে কাজ নাই। আপাতত এইরূপ মনে করা গা'ক্ যে, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সমস্ত ত্রিক যেন তাহার দুই মুড়া'র দুই ত্রিকেই পরিসমাপ্ত; সং, চিৎ, আনন্দ—এই এক ত্রিক, এবং প্রাণ, মন, বুদ্ধি—এই আরেক ত্রিক, এই দুই ত্রিকেই পরিসমাপ্ত। তাহা হইলে সংক্ষেপে গাঁড়াইবে এই যে, সং-চিৎ-আনন্দ হইতে প্রাণ-মন-বুদ্ধিতে অবতরণ করিবার ক্রম অহুলাম-ক্রম, এবং প্রাণ-মন-বুদ্ধি হইতে সং-চিৎ-আনন্দে উত্থান করিবার ক্রম প্রতিশোম-ক্রম। উপনিষৎশাস্ত্রেও আছে—“আনন্দাত্মো ববিমানি ভূতানি জায়ন্তে”—আনন্দ হইতেই সমস্ত ভূত স্বয়ং-গ্রহণ করে; • • • “কো হেবাভ্যং কঃ প্রাণাৎ যথেষ আকাশ আনন্দো ন স্যাৎ”—কে বা প্রাণধারণ করিত, কাহারই বা প্রাণ-বুদ্ধি হইত, যদি এই আনন্দ আকাশে না থাকিতেন। অতএব আনন্দ হইতে অহু-লোম-ক্রমে প্রাণ অভিযাত হইয়াছে, এ কথা শাস্ত্র এবং গুক্তি উভয়-সম্মত। এ কথাও তেমনি উভয়-সম্মত যে, প্রাণ-

মন-বুদ্ধি প্রতিলোম-ক্রমে সং-চিৎ-আনন্দে
উত্থান করিতেছে। সর্বপ্রথমে প্রথম
ত্রিকের অবয়ব-পারিপাট্য এবং ভিত্তিকার
কল-কিত্তপ, তাহা পর্যালোচনা করিয়া
যেবা বা'ক্।

আবার সমুখে, মনে কর, একখণ্ড
কাগজ উড়িয়া পড়িল। বলিলাম—“এক
বণ্ড”; কিন্তু সেই একের মধ্যে তিন রহি-
য়াছে; তার সাক্ষী—(১) এ পিট, (২) ও
পিট, এবং (৩) দুই পিটের উত্তর-সাধারণ
চারিধার। তেমনি সত্য এক; কিন্তু
সেই একের মধ্যে তিন রহিয়াছে—সং
রহিয়াছে, চিৎ রহিয়াছে, আনন্দ রহিয়াছে।
একপ কাগজ কেহ কখনো চক্ষে দেখেও
নাই, দেখিতে পাইবেও না—যাহাও এ-পিট
আছে, ও-পিট নাই; ও-পিট আছে, এ-পিট
নাই; অথবা দুই পিটই আছে, কিন্তু উত্তর-
সাধারণ পরিধি(periphery) নাই। তেমনি
একপ সত্য কেহ কখনো জ্ঞানে বা ধ্যানে
উপলব্ধি করিতে পারেও না, পারিবেও না,
যে-সত্যের অস্তিত্ব (অর্থৎ সত্য) আছে,
ভাতি (অর্থৎ প্রকাশ) নাই; ভাতি
আছে, অস্তিত্ব নাই, অথবা অস্তিত্ব-ভাতি দুইই
আছে, কিন্তু দুয়ের মধ্যে কোনো-প্রকার
ঐক্যের বন্ধন নাই। কেমন করিয়াই বা
সেদ্ধপ অঙ্গহীন সত্যের উপলব্ধি সম্ভব
হইবে?—মূলেই বাহ্যের ভাতি নাই,
কাহারো নিকটে কল্পিত কালেও বাহ্যের
প্রকাশ নাই—প্রকাশের সম্ভাবনাও নাই,
তাহাকে “আছে” বলিলে কি বুঝায়?
ওড় কেবল আ এবং ছে এষ্ট দুই অক্ষর

বুঝায়, তাহা চাড়া আর কিছুই বুঝায় না
বাহ্যের ভাতি আছে, অস্তিত্ব নাই, তাহাই
বা কিত্তপ সত্য? “মাথা নাই, মাথাবাথা”
যেহুপ সত্য, “অস্তিত্ব নাই ভাতি” ত্রিক্ সেই-
রূপ সত্য, তাহা দেখিতেই পাওয়া যাই-
তেছে। তুমি বলিতেছ, “অস্তি আবার
কি—সবই তো ভাতি”; তোমার এ কথা
বলি সত্য হয়, তবে তুমি আবার কে—
সবই তো তোমার মুখের কথা! ফলে, সূর্য্য
নাই, দিবালোক আছে এবং অস্তি নাই,
ভাতি আছে, এ দুই কথা একই ধরনের
কথা; দুয়ের কোনোটিরই অর্থ সূর্য্যাকরেও
কাহারো বোধগম্য হইবার নহে। যদি বল
যে, অস্তিও আছে, ভাতিও আছে; কিন্তু
দুয়ের মধ্যে কোনোপ্রকার ঐক্যের বন্ধন
নাই—যোগ-বৃদ্ধি নাই—সম্বন্ধ নাই, তবে
তোমাকে জিজ্ঞাসা করি—ভাতি যে, সে
কাহার ভাতি? অস্তিরই তো ভাতি!
অস্তি যে, সে কাহার অস্তি? বাহ্য প্রকাশ
পাইতেছে, তাহারই তো অস্তি—ভাতিরই
তো অস্তি! তবে আর কেমন করিয়া
বলিব যে, অস্তি এবং ভাতির মধ্যে কোনো-
প্রকার ঐক্যের বন্ধন নাই—সম্বন্ধ নাই।
এখন জিজ্ঞাস্য এই যে, অস্তি এবং ভাতির
মধ্যে সেই যে বন্ধনের আঁট, তাহা কি?
ইহার উত্তর এই যে, তাহা আনন্দ। এ বাহ্য
বলিতেছি, ইহার প্রথম উপমাঙ্গল—পিতা-
মাতার সহিত পুত্রকন্যাদিগের ঐক্যবন্ধন
এবং ভ্রাতৃভ্রাতৃসঙ্গ আনন্দ। পৈতৃক ঐক্য-
বন্ধন প্রকৃতপ্রস্তাবেই ঐক্যের (কিনা—
একত্বের) বন্ধন; কেন না, পুত্রকন্যা পিতা-

মাতার শরীর-মন এইরূপে অগ্রগত করে ; পুত্রকল্পিত পিতামাতার সাক্ষাৎ ভাষ্টি (কিনা—আবির্ভাব)। বর্তমান বিষয়ের দ্বিতীয় উপমাগুল—ভ্রাতার ভ্রাতার ঐক্যবন্ধন এবং তৎসংক্রান্ত আনন্দ ; এ ঐক্যবন্ধন বিচ্ছিন্নের মধ্যে ঐক্যের বন্ধন। তৃতীয় উপমা—পতিপত্নীর ঐক্যবন্ধন এবং তৎসংক্রান্ত আনন্দ ; এ ঐক্যবন্ধন বিপরীতের মধ্যে ঐক্যের বন্ধন। এই তিনপ্রকার ঐক্যবন্ধন সমূহা-সমাজের গোড়া'র বাঁধুনি, তাহা দেখিতেই পাওয়া যাইতেছে ; অধিকন্তু এখানে দ্রষ্টব্য এই যে, তিনই সত্ত্বি এবং ভাষ্টির ঐক্যবন্ধন। পিতামাতা পুত্রকল্পিতে আপনাই ভাষ্টি দেখেন ; ভ্রাতার পরস্পরের আকারপ্রকার-ভাবভঙ্গীতে আপনাদের ভাষ্টি দেখেন, স্বামী-স্ত্রী আপনাবিশেষ উভয়কে পরস্পরের সহিত অভেদ দেখেন ; স্বামী স্ত্রীতে আপনাদের ভাষ্টি দেখেন, স্ত্রী স্বামীতে আপনাদের ভাষ্টি দেখেন। বিশেষতঃ দম্পতির ঐক্যবন্ধনে আনন্দ অতীব সুপরিপূর্ণ ভাবধারণ করে ; আর, তাহা যে করে, তাহার বিশেষ একটা কারণ আছে ; সে কারণ আর কিছু না—প্রতিযোগের মধ্য দিয়া সংযোগের অভি-বাক্তি। এ'দ্বারা বলিগাম, ইহার বৎ-কিকিং টীকা কল্পা আবশ্যক ; তাহা এই :—

পুত্রকল্পিত পিতামাতার নিত্যতাই আপনায়। বাহ্যে আপনায়, তাহাতে আপনাদের ভাষ্টি দেখিতে পাওয়া কিছুই আশ্চর্যের বিষয় নহে। ভ্রাতা-ভগিনীরা এক মাতার পুত্রভ্রাতা, কালেই পরস্পরের আকারপ্রকার, ভাব-ভঙ্গী এবং আচার-ব্যবহারের দর্পণে

পরস্পরের মুখ দেখিতে পাওয়া, তাহাদের পক্ষেও কিছুই আশ্চর্যের বিষয় নহে। পক্ষান্তরে, এক পিতামাতার পুত্র এবং আর-এক পিতামাতার কল্পা, বোহে দৌহার নিত্যতাই পর ; তাহা সবেও যে, স্বামী স্ত্রীকে এবং স্ত্রী স্বামীকে দ্বিতীয় আপনি বা আপনাদের অর্দ্ধাঙ্গ বলিয়া চরিত্ররূপ করেন ; চরিত্ররূপ করিয়া স্ত্রী স্বামীতে এবং স্বামী স্ত্রীতে আপনাদের ভাষ্টি দর্শন করেন ; তাহাই আশ্চর্যের বিষয়। বর-কল্পার গুণদৃষ্টি একপ্রকার ভাষ্টি-বিনিময় অর্থাৎ পরস্পরের নয়ন-দর্পণে পরস্পরকে দেখা ; নিত্যতঃ পর-বাক্তির নয়ন-দর্পণে আপনাকে দেখা ; ইহারই নাম প্রতিযোগের মধ্য দিয়া সংযোগের সংঘটন। দাম্পত্য-বন্ধনে প্রতিযোগের সংগ্রেষে সংযোগ সুপরিপূর্ণ হই বলিয়া, সে বন্ধনে আনন্দ সঙ্গাপেক্ষা ঘনীভূত ভাবধারণ করে। এইরূপ দেখা যাইতেছে যে, সত্ত্বি এবং ভাষ্টির ঐক্যবন্ধন আনন্দেরই প্রস্রবণ।

পূর্বে বলিয়াছি যে, সকল ত্রিকেরই ভিত্তিকর কল্প একই-প্রকার ইহাও বলিয়াছি যে, সে কল্পের মুখা অবয়ব তিনটি—(১) শাষ্টি, (২) প্রতিযোগ, এবং (৩) সংযোগ। এ তিনটি অবয়ব মূল ত্রিকে অতীব সুস্পষ্ট আকার ধারণ করিয়াছে ; তার সাক্ষী :—

প্রথমতঃ সৎ অর্থাৎ নিত্যসত্য চির-কালই সমান। এই যে অপরিবর্তনীয় নিত্য-সত্যের ভাব বা সত্যের ভাব, এই প্রথম ভাবটি শাষ্টি-প্রধান। তাহা দেখিতেই পাওয়া যাইতেছে।

দ্বিতীয়তঃ অসতের প্রতিযোগে সতের, এবং সতের প্রতিযোগে অসতের যে প্রকাশ, তাহারই নাম চিৎ বা জ্ঞান; কাজেই বলিতে হইতেছে যে, চিৎ প্রতিযোগ-প্রধান। কেহ বলিতে পারেন যে, ছায়ার উপলব্ধি আলোকের প্রতিযোগিতা-সাপেক্ষ, একথা স্বীকার করি; কিন্তু আলোকের উপলব্ধিও যে ছায়ার প্রতিযোগিতা-সাপেক্ষ, তাহা কে বলিব? একটা ঘর যখন দীপালোকে আলোকিত হয়, তখন ছায়ার প্রতিযোগিতা তাহার মধ্যে কোথায়? ইহার উত্তর এই যে, একটা ঘর যখন দীপালোকে আলোকিত হয়, তখন সেই আলোকের প্রত্যেক ছেদ স্থানেই ছায়া নিপতিত হয়; কোথাও বা ঘনচ্ছায়া নিপতিত হয়, কোথাও বা অর্ধ ছায়া নিপতিত হয়; তা ছাড়া ঘরের মধ্যে দীপালোক অপেক্ষা বলিন বর্ণের বস্ত্র বস্তু কিছু আছে, যেমন আবলুৰ কাঠ, সূক্ষ্ম কাপড় ইত্যাদি, তাহাও ছায়ারই সান্নিধ্য। কল কথা এই যে, আনন্দের চক্ষুর সম্মুখে যদি কেবলমাত্র একরঙা আলোক নিত্যনিরন্তর বর্তমান থাকিত, আর তাহার কোনো স্থানে যদি কোনো প্রকার রঞ্জন বা অভ্রানের সংস্পর্গ না থাকিত, তাহা হইলে হইত এই যে, আনন্দের যেমন নতম্নন বায়ুর ভার মস্তকের উপরে অষ্টপ্রহর বহন করিয়াও তাহার পরিমা-ভোরও উপলব্ধি করি না, তেমনি আমাদের চক্ষুর উপরে অষ্টপ্রহর আলোকের বর্ষণ হইলেও আমরা তাহার কণামাত্রও উপলব্ধি করিতে পারিতাম না। যেখানেই আনন্দ স্বেচ্ছাতপ বা চেষ্টাতপ দেখি, সেইখানেই তাহার আপে-

পাশে, ছেদ-স্থানে এবং সীমা-প্রদেশে ছায়া বা বর্ণমালিনা সংলগ্ন দেখি, আর সেই ছায়া বা বর্ণমালিনা সংলগ্ন দেখি বলিয়া তাহারই প্রতিযোগে স্বেচ্ছাতপ বা চেষ্টাতপ দেখিতে পাই—নচেৎ দেখিতে পাইতাম না।

অতএব এটা স্থানান্তিত যে, ছায়ার প্রতিযোগেই আলোকের প্রকাশ সম্ভবে; অসতের প্রতিযোগেই সতের প্রকাশ সম্ভবে; আর সতের সেই যে প্রকাশ, তাহারই নাম চিৎ বা জ্ঞান। এইরূপ দেখা যাইতেছে যে, সৎ: সারিপ্রধান, চিৎ প্রতিযোগ-প্রধান। অতঃপর ব্রহ্ম এই যে, আনন্দ সংযোগ-প্রধান। একদিকে সতের প্রশান্তি এবং অসৎ-প্রতিষ্ঠা, আর-এক দিকে চিত্তের উজ্জ্বলতা এবং প্রকাশ, এই দুয়ের ঐক্যাত্মিক সংযোগই আনন্দের উৎস। গোড়ার দিকের ভিতরে রূপকতালের তরঙ্গলীলা, এ যেমন দেখিতে পাওয়া গেল—শেষের দিকের ভিতরে উঁকি দিয়া দেখিলে অবিকল তাহাই দেখিতে পাওয়া যায়।

শেষের ত্রিক হ'চ্ছে—(১) প্রাণ, (২) মন, (৩) বুদ্ধি। কল-প্রধান শতাব্দীর, (Mechanical age-এর) এক কথার—কলিযুগের—প্রধান একজন তত্ত্ববিদ্যার পণ্ডিত (আর কেহ নহেন—স্পেন্সার; প্রাণের সংজ্ঞা-নির্ধারণ করিতে গিয়া বিভ্রান্তির তরঙ্গকম্বোলে হাবুডুপ খাইয়াছেন! হাবুডুপ খাইবারই কথা। প্রাণকে বুদ্ধি এবং মন হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া দেখিতে গিয়াছেন—কাজেই হাবুডুপ খাইয়াছেন।

তিনি যদি সর্বাগ্রে বুদ্ধিকে ধরিতেন, আর তাহার পরে মনকে অর্ধপরিপূট বৃদ্ধি, এবং; প্রাণকে অপরিসূট মন বলিয়া অবধারণ করিতেন, তাহা হইলে তাহাকে হাবুডুব খাইতে হইত না; কিন্তু তিনি ঠিক তাহার বিপরীত পথ অবলম্বন করিয়াছেন; তিনি প্রথমেই প্রাণকে একপ্রকার উচ্চ অঙ্গের বক্তির কল-রূপে প্রতিপাদন করিয়াছেন; তাহার পরে তিনি মনকে উচ্চ অঙ্গের প্রাণ, এবং বুদ্ধিকে উচ্চ অঙ্গের মন করিয়া গাড় করাইয়াছেন; কালেক্ট হাবুডুব খাইয়াছেন। বড়দের দৃষ্টান্ত ছোটোদের উপরে কাজ করে—ইহা খুবই সত্য; কিন্তু সকল ছোটো'র উপরে সমানতরো কাজ করে না; একমূল ছোটো'র ঢকে ধূলিসুটী নিক্ষেপ করে, আর-এক-মূল ছোটো'র চক্ষু ফুটাইয়া তোলে। বড় বড় বিশেষীর দার্শনিক পণ্ডিতগণের অনেকগুলো নিছক বল-পূর্ব উক্তি (অর্থাৎ গায়ের জোয়ের কথা) আমাদের দেশের বিদ্বানদের বালকদিগের ঢকে ধূলিসুটী নিক্ষেপ করে—ইহা আমার দাখা কথা। ক্যান্টের কথা ভাঙিয়া নেও—ক্যান্ট, ধৈত-ফুলের প্রজ্ঞান! তাহার জ্ঞান অকৃত্রিম সত্যপ্রয়োগী দার্শনিক পণ্ডিতের বুদ্ধিপূর্ণ বিশেষীমতে ওলনের বাক্য-সকলের সহিত স্পেন্সর, মিল প্রভৃতি পণ্ডিতগণের অনবচ্ছিন্ন প্রাণোপাঙ্গি-সকলকে তুলাইয়া দেখিলে শেখোক্ত পণ্ডিতগণের বিপদ-দামিতার প্রতি কাহার না চক্ষু ফুটে! নিতান্ত যে অন্ধ—তাহারও চক্ষু ফুটে। বলিতে কি—স্পেন্সর প্রভৃতি আধুনিক খাতনামা পণ্ডিতগণ যে-পথে চলিয়া সত্যি কূপে নিমর

হইয়াছেন, আমি তিস্ তাহার বিপরীত পথে চলিয়া সে বিপদ হইতে রক্ষা পাইয়াছি। স্পেন্সর প্রভৃতি পণ্ডিতেরা শুধুকে জ্ঞানের সংস্পর্শ হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া, প্রাণকে একপ্রকার বক্তির কল করিয়া গাড় করাইয়াছেন। আমি তাহা না করিয়া প্রথমেই বুদ্ধিকে আলোচ্য-পদবীতে বরণ করিয়াছি। বুদ্ধির অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের প্রতি পরিধান করিয়া দেখিলাম যে, বুদ্ধির ভিতরেই তিনপ্রকার সত্তা একত্র জমাটবদ্ধ রহিয়াছে;—অব্যক্ত সত্তা গভীরে নিমগ্ন রহিয়াছে; প্রাতিভাসিক সত্তা উপরে উপরে ভাসিয়া বেড়াইতেছে এবং বাস্তবিক সত্তা গুহ্যে জোড়ে করিয়া বুদ্ধির সম্মুখে উপস্থিত হইতেছে। বুদ্ধির মুখা উপভৌমিকতা হ'লে বাস্তবিক সত্তা; মনের মুখা উপভৌমিকতা—প্রাতিভাসিক সত্তা; প্রাণের মুখা উপভৌমিকতা—অব্যক্ত সত্তা। এখন দেখিতে চাইবে এই যে, প্রাণকে একপ্রকার উচ্চ অঙ্গের বক্তির কল বলিলে, তাহার পরিচয়-জ্ঞাপক প্রভেদ-লক্ষণের কিছুই বলা হয় না; অর্থাৎ আর আর কল হইতে প্রাণের বিশেষত্ব যে কোন্স্থান-টিতে, তাহার কিছুই বলা হয় না। স্পেন্সরের দলের পণ্ডিত-বর্গের প্রতি আমার সন্নিহিত নিবেদন এই যে, প্রাণের সংজ্ঞা-নির্দীচন বহি করিতেই হয়, তবে এইমাত্র বলিয়াই ক্ষান্ত থাকা উচিত যে, কল যেমন ভরসী-ভূত বাস্প এবং বরফ যেমন বনীভূত জল; তেমনি, মন প্রাতিভাসিক বুদ্ধি, এবং প্রাণ অব্যক্ত মন। পূর্বে আমি দেখাইয়াছি যে, সং-প্রাতি-প্রাণ, চিত্ত প্রতিযোগ-প্রাণ, এবং আনন্দ সংযোগ-

প্রধান ; এখন দেখাটের ডাট বে, প্রাণ-
শান্তি-প্রধান, মন প্রতিযোগে প্রধান, এবং
বুদ্ধি সংযোগ-প্রধান । কিন্তু তাহার পূর্বে
প্রাণ, মন এবং বুদ্ধির পরস্পরের সহিত
পরস্পরের কিরূপ তেজাভেদ, তাহা পর্যা-
লোচনা করিয়া দেখা আবশ্যক ।

প্রাণের প্রধান আচ্ছাদ্য হ'চ্ছে তাব-রাজ্যো
সুস্থুষ্টি, এবং আবির্ভাবরাজ্যো তরুলতাদি
উদ্ভিদ পদার্থ । মনের প্রধান আচ্ছাদ্য হ'চ্ছে
তাব-রাজ্যো স্বপ্ন, এবং আবির্ভাব-রাজ্যো
পঞ্চপক্ষী প্রভৃতি মুক্তজীব বুদ্ধির প্রধান
আচ্ছাদ্য হ'চ্ছে তাব-ভগতে জাগরিতাবস্থা
এবং আবির্ভাব-ভগতে মমুখ্য ।

ত্রিক-পণের মধ্যে সৌভাগ্য-বন্ধন কি
চমৎকার ! একটা ষেককে ডাকিলে
দশটা ত্রিক জোটবদ্ধ হইয়া তাহার পাদু-
পাদু ছুটয়া আইসে । ডাকিলান প্রাণ-মন-
বুদ্ধিকে ; আর অমনি দেখিতে-না-দেখিতে
সুস্থুষ্টি-স্বপ্ন-আগ্রা এবং তরুলতা-পঞ্চপক্ষি-
মমুখ্য জোটবদ্ধ হইয়া তাহার পদাং পদাং
আসিয়া উপস্থিত ! এক্ষণে আবার, আর-
একটি ত্রিক নুতন দেখা দিতেছে—সে
ত্রিক হ'চ্ছে (১) ভোগ, (২) কর্ম, (৩)
জ্ঞান । এই নুতন ত্রিকটির সহিত উদ্ভিদ,
মুক্তজীব এবং মমুখ্য—এই পন্ডিতমান
ত্রিকটির তাগ-মান-পণের মিল যে কেমন
চমৎকার, তাহা যেখানে মন আচ্ছাদ্য-রসে
প্রবীকৃত হয় ; তাহা এইরূপ :—

ভোগ-পণের মুখ্য অর্থ পূরণ—অভাবের
পূরণ ; তার দ্যাকী—অগ্রহায়া শরীরে
অভাব-পূরণের নাম অগ্র ভোগ করা ;
জ্ঞান-পণের মনের অভাব-পূরণের নাম

জ্ঞান-পণের ভোগ করা ; ইত্যাদি । যে সৌভাগ্য-
শালী ব্যক্তির গৃহ ভোগের সামগ্রীতে পরি-
পূর্ণ, তাহাকে আমরা বলি “সুখী” । কিন্তু
সমস্তিপর ব্যক্তি সমগ্র সুখী হইলেও তাহার
ভোগের সামগ্রী ক্রমাগতই কম পাইতে
থাকে ; আর, সেইজন্য তাহাকে পুনঃপুনঃ
ভোগের সামগ্রী ক্রোধান্ড করিতে হয় ।
ভোগ্যবস্তুর আধোজন কষ্টের ব্যাপার ;
কাজেই, চেতনাবান জীবমাত্রকেই সুখ-
ভোগের সঙ্গে সঙ্গে, অন্নই হউক আর
অধিকই হউক, দুঃখ ভোগ করিতে হয় ।
কলে, দুঃখের প্রতিযোগেই সুখের স্বাদ-গ্রহণ
সম্ভবে এবং সুখের প্রতিযোগেই দুঃখের স্বাদ-
গ্রহণ সম্ভবে । পথ্যাক্রমে সুখদুঃখের গলট্ট-
পালট ব্যতিরেকে সুখও অসুখ হইতে
পারে না, দুঃখও অসুখ হইতে পারে না ।
বৃক্ষলতাদি উদ্ভিদ পদার্থের ভোগের সামগ্রী
প্রতিনিয়তই তাহাদের চাতের কাছে
সাজানো রহিয়াছে :—তাহাদের একতালার
ভাঙার-ধরে আর মুক্তিকা রহিয়াছে ; সেই
স্থান হইতে তাহারা পানীয় আহরণ করে ;
তাহাদের দ্বোতালার মুক্ত ভাঙার বাধু
রহিয়াছে ; সেই স্থান হইতে তাহারা
কাঁবনাদি অন্ন আহরণ করে ; তাহাদের
তেতালার ধরে সূর্য্যাতপ রহিয়াছে, সেই
স্থান হইতে তাহারা আলোক এবং উত্তাপ
আহরণ করে । বৃক্ষের কোনো দুঃখ নাই ;
দুঃখ নাই—কাজেই সুখও নাই ; কেন না,
(ইতিপূর্বে যেমন বলিয়াছি) দুঃখের প্রতি-
যোগিতা ব্যতিরেকে সুখের স্বাদ-গ্রহণ সম্ভবে
না । সুখদুঃখের অসুখত্ব উৎপাদন করিতে
হইলে ভোগের আরম্ভ ন কিনা শরীর, এবং

ভোগের সামগ্রী কিনা অম্মাণি, এ-দুখেও মাথখানে একটা প্রান্তরের বাবধান নিতাই আবশ্যক । কলেও এইরূপ দেখা যায় যে, প্রকৃতি-মাতা বৃক্ষ-লতাদির ভোগ্য-সামগ্রী যেমন প্রতিদিনই তাহাদের হাতের কাছে লাগাইয়া রাখে—পতপক্ষাদিগের ভোগের সামগ্রী তেমন করিয়া কেহ তাহাদের হাতের কাছে লাগাইয়া রাখে না । পতপক্ষাদিগের শরীর সুধাতৃষ্ণার অগ্নিশর বা অগ্নিমন্দির, আর সেই অগ্নির হবনীর-পদার্থ যোজন-যোজন দূরে ঠতুত বিক্ষিপ্ত রহিয়াছে ; কানেট, কর্থ-চেষ্টার পথ দিয়া ঐ অগ্নি এবং ঐ হবাসামগ্রীর মধ্যে ক্রমাগতই সংযোগ-বিয়োগ চলিতে থাকে, আর সেইগতিকে স্ব-দুঃখের ক্রমাগতই ওলট-পালট হইতে থাকে ।

বৃক্ষলতাদি উদ্ভিদ পদার্থের কর্থ-চেষ্টা নাই—ভোগই তাহাদের সঙ্গ । পতপক্ষীরা পর্যায়ক্রমে ভোগ এবং কর্থ ব্যাপৃত হয় । একজন প্রসিদ্ধ বৈদ্যাত্মিক এরূকর ভাই বলিয়াছেন যে, মৃতদেহেরা “কূর্সতে কর্থ ভোগায় কর্থ কৰ্ত্তৃক ভুজতে”—ভোগের অন্ত কর্থ করে এবং কর্থের অন্ত ভোগ করে । আশাঘের দেশের সকল শত্রুই একবারো বলে যে, দুঃখই কর্থের প্রবর্তক ; অথচ, বিশ্ববিধাতার কি আশ্চর্য্য ভায় এবং দয়া, কৰ্ম্মেতে ভোগের স্ব স্ব প্রতিবিম্বিত হইয়া, দুঃখকে কেবল যে ভুলাইয়া দায়, তাহা নহে, অধিকতর স্ব স্বকে দ্বিগুণিত—চতুর্গুণিত করিয়া তোলে । মনে কর, একটা বিজন প্রান্তরের মধ্যে আমার সুধাতৃষ্ণার উল্লেখ হইয়াছে ; আর, কোশ-খানেক দূরে

একটা দেবালয়ের অতিথি-শালা রহিয়াছে জানিতে পারিয়া তাহার প্রভাবমুখে আমি ক্রতবেগে পদনিক্ষেপ করিতে লাগিলাম । এরূপ অবস্থার—কে বলিল যে, আমার সুধার আলা দুঃখ, তাহা স্বপ্নের নিদান । আমি যে, অতিথি-শালায় অন্ন-ভোজন করিয়া সুখী হইব—আমার সুধার আলা তাহারই স্তম্ভ-চিহ্ন । কে বলিল যে, ক্রত-গমনের পরিশ্রম দুঃখ ? তাহা স্বপ্নের নিদান ! আমি যে, অতিথি-শালায় উপনীত হইয়া বিশ্রামের সুখ উপভোগ করিব—আমার ক্রত-গমনের পরিশ্রম তাহারই স্তম্ভ-চিহ্ন । সুধার দুঃখ যদি স্বপ্নের বিষয় না হইত, তবে লোকে পরমা খরচ করিয়া অগ্নিকর গুহ্য ক্রম করিত না । অন্ন-চালনার পরিশ্রম যদি স্বপ্নের বিষয় না হইত, তবে ইউরোপের ধনাঢ্য ব্যক্তির নানের মজ্জিনে নুড়া করিয়া হাঁপাইতে হাঁপাইতে ভোগ-মন্দিরে প্রবেশ করিত না । এইরূপ দেখা বাইতেছে যে, জীবের কর্থ-চেষ্টাতে এক-তো ভাবী স্ব স্ব প্রতিবিম্বিত হইয়া কর্থের দুঃখকে দুঃখ বলিয়াই মনে করিতে দায় না ; তাহাতে আবার কর্থ-চেষ্টা নিজেই একপ্রকার ভোগ (অর্থাৎ অভাবের পূরণ), যে হেতু কর্থদ্বারা অন্ততাক্রমী অভাবের পূরণ হয় ।

শ্রষ্টাই দেখিতে পাওয়া বাইতেছে যে, বৃক্ষলতাতে ভোগ-ক্রিয়ারই একাধিপত্য ; মৃতদেহে ভোগ-ক্রিয়া এবং কর্থ-চেষ্টা উল্টিয়া-পালটিয়া পদ্যায় ক্রমে প্রাহতুত হয় । মনুষ্য সময়ে সময়ে ভোগ এবং কর্থ হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া—উভয়ের ভাল-মন্দের

বিচার করে;—কোন সময়ে ভোগ ভাগ—কোন সময়ে কণ ভাগ—কিরূপ ভোগ ভাগ—কিরূপ কণ ভাগ—কতদ্বারা ভোগ ভাগ—কতদ্বারা কণ ভাগ—কিরূপ প্রণালীতে ভোগ করা ভাগ—কিরূপ প্রণালীতে কণ করা ভাগ, এই সব ভাগ-মন্দের বিচার করে; ভাগমন্দের বিচার করিয়া কর্তব্যাকর্তব্য স্থির করে। ভাগ-মন্দের বিচার সত্যাসত্যের প্রতীতির উপরে নির্ভর করে। বাহ্যর সত্যাসত্যের জ্ঞান নাই, তাহার ভাগ-মন্দ-বিবেচনার গোড়া'র বাহুনি নিতান্তই আলগা। সত্যই বুদ্ধির মুখা আলোচ্য বিষয়। সত্য বস্তুত এক, কিন্তু কার্য্যভ অনেক। ভিন্ন ভিন্ন সত্য ভিন্ন ভিন্ন কার্য্যের উপযোগী। জ্যোতিষ্য সত্য। পত্রিকা-প্রেরণ-কার্য্যের উপযোগী; জ্যামিতিক সত্য। স্থাপত্য-কার্য্যের উপযোগী; রাসায়নিক সত্য। ছায়াঙ্কন (photography), ঔষধ-প্রস্তুত-করণ প্রভৃতি কার্য্যের উপযোগী; সমগ্র সত্য। সমগ্র ব্যাঘ্রের পুরুবার্থ-সাধনের উপযোগী। সমগ্র সত্য অখণ্ড এবং অপরিচ্ছিন্ন; ব্যবহারিক সত্য। খণ্ড খণ্ড এবং পরিচ্ছিন্ন; তার সাক্ষী—দার্শনিক সত্য, বৈজ্ঞানিক সত্য, বৈদিক সত্য, পৌরাণিক সত্য, জ্যামিতিক সত্য, রাসায়নিক সত্য, এবং বিধ নানাশ্রেণীর নানা সত্য একই অখণ্ড সত্যের বহু-বিচিত্র শাখা-প্রশাখা। সব সত্যই বুদ্ধির আলোচ্য বিষয়। একই অখণ্ড সত্যকে যেমন ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীর লোকের কাজের সুবিধার জন্য ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়া লওয়া হয়; তেমনি একই জ্ঞাত পুণ্যের বুদ্ধিকে ভিন্ন-ভিন্ন

প্রকার কার্য্যের সুবিধার জন্য ভিন্ন ভিন্ন পরিচ্ছেদে বিভক্ত করিয়া লওয়া হয়; তার সাক্ষী—প্রজা এক থাকের বুদ্ধি; বিজ্ঞান দ্বিতীয় আর-এক থাকের বুদ্ধি; ধর্মবুদ্ধি তৃতীয় আর-এক থাকের বুদ্ধি, বিষয়বুদ্ধি চতুর্থ আর-এক থাকের বুদ্ধি; ইত্যাদি। তাহার মধ্যে—প্রজার আলোচ্য বিষয় অখণ্ড সত্য; বিজ্ঞানের আলোচ্য বিষয় জ্যামিতিক, জ্যোতিষ, রাসায়ন প্রভৃতি খণ্ড খণ্ড বৈজ্ঞানিক সত্য; ধর্মবুদ্ধির আলোচ্য বিষয় মজ্জ-বোধ পুরুষকার, বিশ্ববিধাতার জ্ঞান এবং ধর্ম, কর্মকল প্রভৃতি আধ্যাত্মিক সত্য; বিষয়-বুদ্ধির আলোচ্য বিষয় অর্থের আর-বার, সামাজিক ঐতিহ্য-নীতি-প্রথা প্রভৃতি লৌকিক সত্য।

এখানে একটি বিষয় পরিবেশে দ্রষ্টব্য—বিষয়টি শুকতর; তাহা এট যে, উপরের উপরের ধাপে নীচের নীচের ধাপ সমস্তোক্তাবে সম্মুখ থাকে; অর্থাৎ নীচের নীচের ধাপে যা কিছু আছে, সমগ্রই উপরের উপরের ধাপে যেটি-বাঁধা হয়—কোনো-কিছুই বাদ পড়ে না। তার সাক্ষী—বিদ্যালয়ের বালক যখন নীচের শ্রেণীতে ব্যাকরণ পড়িয়া-চুকিয়া উপরের শ্রেণীতে রঘুবংশ পড়িতে আরম্ভ করে, তখন সে রঘুবংশের ভিতরে তাহার পূর্বশিক্ষিত সমস্ত বৈয়াকরণিক সত্যই সম্মুখ রহিয়াছে যেখান আশ্চর্য্যাবিত হয়। ইহাও তেমনি আশ্চর্য্যের বিষয় যে, বুদ্ধির ভিতরে যেন এবং প্রাণ, হৃদেই সম্মুখ রহিয়াছে; বাস্তবিক সত্যতে প্রাতিভাসিক সত্য এবং অব্যক্ত সত্য, হৃদেই সম্মুখ রহিয়াছে; অখণ্ড এবং অপরিচ্ছিন্ন সত্য। সমগ্র সত্যই সম্মুখ

বাংলা ব্যাকরণ যে প্রায় সংস্কৃত ব্যাকরণ, ইহাই প্রতিপন্ন করিবার জন্য তাহার বাংলায় কারক-বিভক্তিকে সংস্কৃত-কারক-বিভক্তির সঙ্গে অল্পত সংখ্যাতঃ সমান বলিতে চান।

সংস্কৃতভাষার সম্প্রদানকারক বলিয়া একটা স্বতন্ত্র কারক আছে, বিভক্তিতেই তাহার প্রমাণ। বাংলার সে কারক নাই, কর্তৃকারকের মধ্যে তাহা সম্পূর্ণ লুপ্ত। তবু সংস্কৃত-ব্যাকরণের নজিরে যদি বাংলা ব্যাকরণে সম্প্রদানকারক অবস্থাপ্ত করিয়া চালাইতে হয়, তবে এ কথাই বা কেন না বলা যায় যে, বাংলার দ্বি৪৫ন আছে? যদি “ধোপাকে কাপড় দিলাম” কর্তৃ এবং “গরিবকে কাপড় দিলাম” সম্প্রদান হয়, তবে এক্ষণে “বাগল” দ্বি৪৫নে “বাগল-কেয়া” ও বহুবচনেও “বাগলকেয়া” না হইবে কেন? তবে বাংলা ক্রিয়াপদের ই বা এক-বচন, দ্বিবচন, বহুবচন ছাড়া আর কি অন্য? তবে ছেলেদের মুখত করাটোতে হয়—এক-বচন “হইল”, দ্বিবচন “হইল”, বহুবচন “হইল”; এক্ষণে “দিরাছে”, দ্বিবচন “দিরাছে”, বহুবচন “দিরাছে”। ইত্যাদি। “তাহাকে দিলাম” যদি সম্প্রদানকারকের কোঠার পড়ে, তবে “তাহাকে মারিলাম” সন্ধান-কারক, “ভেলেকে কোলে লইলাম” সংলগ্ন-কারক, “সন্দেশ খাইলাম” সন্ধান-কারক, “মাথা নাড়িলাম” সন্ধানকারক এবং এক বাংলা কর্তৃকারকের গর্ত হইতে এমন সহস্র সত্তের সৃষ্টি হইতে পারে।

সংস্কৃত ও বাংলার কেবল যে কারক-বিভক্তির সংখ্যা মিলাই না, তাহা নহে।

তাহার চেয়ে গুরুতর মনেকা আছে। সংস্কৃতভাষার কর্তৃবাচ্যে ক্রিয়াপদের জটিলতা বিস্তর, এইজন্য আধুনিক গৌড়ীয় ভাষাগুলি সংস্কৃত-কর্তৃবাচ্যে অবলম্বন করিয়াই প্রধানত উত্থ। “করিণ” ক্রিয়াপদ “কৃত” হইতে, “করিব করিবে” “কর্তব্য” হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। এ সবকে বিভাজিত আশোচনা এ সবকে হওয়া সম্ভবপর নহে; হর্ণলে-সাহেব তাহার তুলনামূলক গৌড়ীয় ব্যাকরণে ইহার প্রভূত প্রমাণ দিয়াছেন। এই কর্তৃবাচ্যের ক্রিয়া বাংলার কর্তৃবাচ্যে ব্যবহার হইতে থাকায় সংস্কৃত ব্যাকরণ আর তাহাকে বাণ্ মানাইতে পারে না। সংস্কৃত কৃত্যার বিভক্তি “এন” বাংলার “এ” হইয়াছে—যেমন, “বাণে মাথা ফাটিয়াছে”, “চোখে দেখিতে পাই না” ইত্যাদি। “বাণে খাইল” কপাটের ঠিক সংস্কৃত কর্তৃবাচ্য “বাণেণ খাদিতঃ”—কিন্তু “খাদিত” শব্দ বাংলার “খাইল” আকার ধরিয়া কর্তৃবাচ্যের কাজ করিতে লাগিল—জুতরাং বাণ বাহাকে খাইল, সে বেচারা আর কর্তৃকারকের রূপ ধরিতে পারে না—এইজন্য “বাণেণ রামঃ খাদিতঃ” বাংলার হইল “বাণে রামকে খাইল”—“বাণে” শব্দে করণকারকের একত্র বিভক্তি থাকা সত্ত্বেও “রাম” শব্দে কর্তৃকারকের “কে” বিভক্তি লাগিল। এ বিচ্ছিন্ন সংস্কৃত ব্যাকরণের কোন পর্যায়ের ই পড়ে না। পণ্ডিত-মশায় বলিতে পারেন, হর্ণলে সাহেব-টাহেব আমি মানি না, বাংলার “একার” বিভক্তি কর্তৃকারকের বিভক্তি। আচ্ছা দেখা যাক, তেমন করিয়া বেলানে: আর কি না। “ধনে জাগকে বশ করা গেছে” ইহার সংস্কৃত

বান্ধ বাহির হইয়া গেছে। আমার সাক্ষী হাতির নাই, এট অবকাশে বান্ধের পুর্কেই প্রতিবাদকে পাঠকসভায় উপস্থিত করিয়া একতরফা সীমাংসার চেষ্টা করাকে ঠিক বর্ণনীয় বলে না।

এখন সে লইয়া আক্ষেপ করা যুগ্ম।

বাংলার জল হইতে জোলা, নদ হইতে ঘোঁষা, পানি হইতে পান্ডা, স্রু হইতে নোন্ডা, বান্দর হইতে বাঁদ্রান, জাঠা হইতে জাঠাধ প্রকৃতি চলিত কথাকণ্ডি হইতে উজা, তা, আম প্রকৃতি প্রচার সঞ্চলন করিয়া জাবী ব্যাকরণকারের সমুখে উপস্থিত করিয়াছিলাম। ব্যাকরণ তাহারাই করিবেন, আমার কেবল মজুরিই সার। সেই মজুরির মন্ত, যে অন্ন একটুখানি যেতন আমার পাওনা আছে বলিয়া আমি সাধারণের কাছে মনে মনে দাবি করিয়াছিলাম, তাহা নামকর হইয়া গেলেও বিশেষ ক্ষতিবোধ করিতাম না। সম্প্রতি গাড়াইয়াছে এই যে, ত্রিকার কাল নাই, এখন কুঁড়া দুলাইয়া লইলে বাঁচি।

এখন আমার নাম উন্টা অতিযোগ আদিয়াছে যে, আমি এট চলিতক কথাকণ্ডি ও তাহার প্রচার সংগ্রহে সহায়তা করিয়া বাংলা ভাষাটাকেই বাট করিবার চেষ্টার আছি।

বে কথাকণ্ডি লইয়া আমি আলোচনা করিয়াছিলাম, তাহাদিগকে বাংলার ভাষা বা বাংলা হইতে খারিজ করিয়া দেওয়া আমার বা আর কাহারো গাণ্ডাই নহে। তাহার্য আছে; এবং কাহারো কণার তাহার্য নিজের দান চাড়াইবে না। জগতে যে কোন ভিনিষট আছে, তাহা ছোট হউক

আর বড় হউক, কৃৎসিত হউক আর হস্তী হউক, প্রাদেশিক হউক আর নাগরিক হউক, তাহার ভবনির্গর বিজ্ঞানের কাল। পরীকৃত কেবল উত্তরাক্ষেরই বিচার করে এমন নহে, পরাশ্রুতিকেও অবজ্ঞা করে না। বিজ্ঞানের ঘৃণা নাই, পক্ষপাত নাই।

কিন্তু এই বাংলা চলিতকথাকণ্ডি এবং তাহার সংস্কৃত-ব্যাকরণ-নিরপেক্ষ বিশেষ নিয়মগুলির উল্লেখনার করিলেই বাংলা ভাষা নষ্ট হইয়া যাইবে, এমন ভাবনা কেন হয়? হিন্দুধর্মের গ্রাম্য আত্মীরের—ধর্মজ আত্মীরেরও ত প্রবেশনিষেধ নাই। যদি কেহ নিষেধ করিতে উদ্ভূত হয়, তবে তাহাকে বিজ্ঞানা করিলে সে হয়ত জবাব দেয়, উহার্য আত্মীর বটে, কিন্তু কুলভাগ করিয়া জাতিদ্রষ্ট হইয়াছে।

বাংলার ভাষা কিছু সংস্কৃতের নিয়ম মানে না, তাহাকে এককল লোক কুলভাগি বলিয়া ভাগ করিতে চান। এবং সংস্কৃতের নিয়মকে বাংলার সর্বত্রই প্রচলিত করিতে তাহারের চেষ্টা। তাহারের বিশ্বাস, স্বরচিত ব্যাকরণে তাহার্য সংস্কৃত-নিয়মকে আহির করিলে এবং বাংলা নিয়মের উল্লেখ না করিলেই, বাংলা ভাষা সংস্কৃত হইয়া গাড়াইবে। তাহার্য মনে করেন, “পাপ্লাম” এবং “সাংহেবিয়ানা” কথা বে বাংলার আছে, ও “আম” এবং “আনা” নামক সংস্কৃতের প্রচার দ্বারা তাহার্য সিদ্ধ, এ কথা না তুলিলেই আপদ চুকিয়া যাইবে—এবং যখন প্রয়োজন হয়, তখন “উন্নততা” ও “ইংরাজীভুক্তি-শীলত্ব” কথা ব্যবহার করিলেই গ্রাম্যকথা-চটোর প্রতিবর্তি ঢাকিয়া রাখা যাইবে।

বাংলা ব্যাকরণ যে প্রায় সংস্কৃত ব্যাকরণ, ইহাই প্রতিপন্ন করিবার জন্য তাহার বাংলায় কারক-বিভক্তিকে সংস্কৃত-কারক-বিভক্তির সঙ্গে অত্র সংখ্যাত্তেও সমান বলিতে চান।

সংস্কৃতভাষার সম্প্রদানকারক বলিয়া একটা স্বতন্ত্র কারক আছে, বিভক্তিতেই তাহার প্রমাণ। বাংলার সে কারক নাই, কর্তৃকারকের মধ্যে তাহা সম্পূর্ণ লুপ্ত। তবু সংস্কৃত-ব্যাকরণের নজিরে যদি বাংলা ব্যাকরণে সম্প্রদানকারক জবাবদিগ্নি করিয়া চালাইতে হয়, তবে এ কপাই বা কেন না থালা যায় যে, বাংলায় দ্বিঘটন আছে? যদি “ধোপাকে কাপড় দিলাম” কর্তৃ এবং “গরিবকে কাপড় দিলাম” সম্প্রদান হয়, তবে একবচনে “বাগক”, দ্বিঘটনে “বাগকেয়া” ও বহুবচনেও “বাগকেয়া” না হইবে কেন? তবে বাংলা ক্রিয়াপদেরই বা এক-ঘটন, দ্বিঘটন, বহুবচন ছাড়া যায় কি অন্য? তবে ছেলেদের মুখের করাটিতে হয়—এক-ঘটন “হইল”, দ্বিঘটন “হইল”, বহুবচন “হইল”; একঘটন “দিয়াছে”, দ্বিঘটন “দিয়াছে”, বহুবচন “দিয়াছে”। ইত্যাদি। “তাঁহাকে দিলাম” যদি সম্প্রদানকারকের কোঠার পড়ে, তবে “তাঁহাকে দিরালাম” সম্বন্ধিন-কারক, “ছেলেকে কোলে লইলাম” সংলগ্ন-কারক, “সন্দেশ খাইলাম” সম্ভোগন-কারক, “মাথা নাড়িলাম” সঞ্চালনকারক এবং এক বাংলা কর্তৃকারকের গর্ত হইতে এমন সহস্র সংখ্যক সৃষ্টি হইতে পারে।

সংস্কৃত ও বাংলায় কেবল যে কারক-বিভক্তির সংখ্যা মিলে নাই, তাহা নহে।

তাঁহার চেয়ে অনেক অধিক আছে। সংস্কৃতভাষার কর্তৃবাচ্যে ক্রিয়াপদের জটিলতা বিস্তর, এইজন্য আধুনিক পৌরী ভাষাগুলি সংস্কৃত-কর্তৃবাচ্য অবলম্বন করিয়াই প্রধানত উদ্ভূত। “করিণ” ক্রিয়াপদ “কৃত” হইতে, “করিব করিবে” “কর্তব্য” হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। এ সবকে বিস্তারিত আলোচনা এ প্রবন্ধে হওয়া সম্ভবপর নহে; হর্ণলে-সাহেব তাঁহার তুলনামূলক পৌরী ব্যাকরণে ইহার প্রভূত প্রমাণ দিয়াছেন। এই কর্তৃবাচ্যের ক্রিয়া বাংলায় কর্তৃবাচ্যে ব্যবহার হইতে পাকায় সংস্কৃত ব্যাকরণ আর তাহাকে বাণ্য নানাইতে পারে না। সংস্কৃত কৃত্তারা বিভক্তি “এন” বাংলার “এ” হইয়াছে—যেমন, “বাণে নাথ। কাটিয়াছে”, “চোখে দেখিতে পাট না” ইত্যাদি। “বাণে খাইল” কথাটার ত্রিক সংস্কৃত তর্জমা “বাণেণ খাদিতঃ”—কিন্তু “খাদিতঃ” শব্দ বাংলায় “খাইল” আকার ধরিয়া কর্তৃবাচ্যের কারক করিতে লাগিল—সুতরাং বাণ্য বাহ্যকে খাইল, সে বেচোরা আর কর্তৃকারকের রূপ ধরিতে পারে না—এইজন্য “বাণেণ রামঃ খাদিতঃ” বাংলায় হইল “বাণে রামকে খাইল”—“বাণে” শব্দে করণকারকের একার বিভক্তি থাকা সত্ত্বেও “রাম” শব্দে কর্তৃকারকের “কে” বিভক্তি লাগিল। এ বিচ্ছিন্ন সংস্কৃত ব্যাকরণের কোন পর্যায়েরই পড়ে না। পণ্ডিত-মশায় বলিতে পারেন, হর্ণলে সাহেব-চাঁহেদ আমি মানি না, বাংলার “একার” বিভক্তি কর্তৃকারকের বিভক্তি। আচ্ছা দেখা যাক, তেমন করিয়া যেখানে যায় কি না। “ধনে ক্রামকে বশ করা গেল” ইহার সংস্কৃত

বাহ্য বাহির হইয়া গেছে। আমার লক্ষ্যী হাজির নাট, এট অথবাণে বাসের পূর্বেই প্রতিবাদকে পাঠকমণ্ডার উপস্থিত করিয়া একতরুকা বীমাংগার চোটে কথাকে ঠিক কর্তৃত্ব বলে না।

এখন সে লাইলা আকেপ করা বুঝ।

বাংলায় জল হইতে জোলা, বদ হইতে ঘোষা, পানি হইতে পান্‌তা, হুন্ হইতে নোন্‌তা, বাঁদর হইতে বাঁদ্রাম, জ্যাঠা হইতে জ্যাঠাম প্রভৃতি চলিত কথাস্থলি হইতে উঠা, তা, আম প্রভৃতি প্রত্যয় সঙ্কলন করিয়া গুণী ব্যাকরণকারের সম্মুখে উপস্থিত করিয়াছিলেন। ব্যাকরণ গ্রাহ্যগঠি কবি-বেন, আমার কেবল মজুরিই সার। সেই মজুরির ভক্ত, যে মঙ্গ একটুখানি বেতন আমার পাওনা আছে বলিয়া আমি সাধা-রণের কাছে যেন মনে দাখি করিয়াছিলেন, তাহা মানিয়া হইয়া গেলেও বিশেষ কতি-বোধ করিতার না। সম্প্রতি গাঁড়াইয়াছে এই যে, ভিকার কাছ নাট, এখন কুতা হুলাইয়া গটলে বাঁচি।

এখন আমার নাম উঠা অভিযোগ আসিয়াছে যে, আমি এট চলিতক বাস্তব ও তাহার প্রত্যয় সংগ্রহে সহায়তা করিয়া বাংলা ভাষাটাকেই মাটি করিবার চেষ্টার আঁধি।

যে কথাস্থলি লইয়া আমি আলোচনা করিয়াছিলেন, তাহাবিপক্ষে বাংলায় কথা বা বাংলা হইতে খারিজ করিয়া দেওয়া আমার বা আর কাহারো সাধাই নহে। তাহায়া আছে, এবং কাহারো কথার তাহায়া নিজেই স্থান চাড়িবে না। অগ্রে সে কোন ভিন্নিষ্ট আছে, তাহা ভোট হউক

আর বড় হউক, কুণ্ডিত হউক আর হুণী হউক, প্রাথমিক হউক আর মাগরিক হউক, তাহায়া তত্ত্বনির্ণয় বিজ্ঞানের কাজ। শরীরতত্ত্ব কেবল উত্তমাত্মেরই বিচার করে এমন নহে, পদাঙ্গুলিকেও অবজ্ঞা করে না। বিজ্ঞানের বুঝা নাট, পক্ষপাত নাই।

কিন্তু এই বাংলা চলিতকথাস্থলি এবং তাহাদের সংস্কৃত-ব্যাকরণ-নিরপেক্ষ বিশেষ নিয়মগুলির উল্লেখনার করিলেই বাংলা ভাষা নষ্ট হইয়া বাটবে, এমন ধারণা কেন হয়? হিন্দুধর্মের গ্রাম্য আত্মীয়ের -দরিদ্র আত্মীয়েরও ত প্রবেশনিষেধ নাই। যদি কেহ নিষেধ করিতে উত্তর হয়, তবে তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলে সে হয় ত ভাবাব দেয়, উহায়া আত্মীয় বটে, কিন্তু কুলভাগ করিয়া আতিথ্যই হইয়াছে।

বাংলায় যাহা কিছু সংস্কৃতের নিয়ম মানে না, তাহাকে একদল লোক কুলভাগী বলিয়া ভাগ করিতে চান। এবং সংস্কৃতের নিয়মকে বাংলায় সর্বত্র প্রচলিত করিতে তাহাদের চেষ্টা। তাহাদের বিশ্বাস, স্রষ্টিত ব্যাকরণে তাহায়া সংস্কৃত-নিয়মকে জাহির করিলে এবং বাংলা নিয়মের উল্লেখ না করিলেই, বাংলা ভাষা সংস্কৃত হইয়া গাঁড়াইবে। তাহায়া মনে করেন, “পাঙ্গলাম” এবং “সাহেবিমানা” কথা যে বাংলায় আছে, ও “আম” এবং “আনা” নামক সংস্কৃতের প্রত্যয় দ্বারা তাহায়া দিচ্ছ, একথা না তুলিলেই আপত্তি করিয়া যার—এবং যখন প্রয়োজন হয়, তখন “উদ্বৃত্তা” ও “ইংরাজীভুক্তি-শিল্প” কথা ব্যবহার করিলেই গ্রাম্যকথা-ওটার অস্তিত্বই ঢাকিয়া রাখা বাটবে।

“ইন্”প্রত্যয়সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছি, স্ত্রী-
লিঙ্গে “ইনী” ও “ঈ” সম্বন্ধেও সেই একই
কথা। বাংলার স্ত্রীলিঙ্গে “ইনি” “ই” পাওয়া
গায়, কিন্তু তাহা সংস্কৃত-ব্যাকরণের হাঁচ
মানে না। সে বাঙালী হইয়া আর এক
পদার্থ হইয়া গেছে। তাহার চোহারাও বদল
হইয়াছে। রয়ের পরে সে আর সূর্য্য ন
এংশ করে না (কলমের মুখে করিতে পারে,
কিন্তু জিহ্বাগ্রে করে না) —সংস্কৃত-বিধান-
মতে সে কোথাও স্ত্রীলিঙ্গে আকার মানে না,
এইজন্য সে অধীনাকে অধীনি বলে। সে
যদি নিজেকে সংস্কৃত বলিয়া পরিচয় দিতে
বাকুল হইত, তবে “পাত্রা” হইতে “পাত্রি”
হইত না, “বাব” হইতে “বাবিনি” হইত না।
কলু হইতে কলুনি, ঘোড়া হইতে ঘুড়ি, পুরুষ
হইতে পুরুষনি নিম্ন করিতে হইলে, মুন্ড-
বোধের দ্বারা টুকুয়া টুকুয়া এবং বিদ্যাবাণী-
শের ঢাকা আশ্রয় হইয়া উঠিত।

পণ্ডিতমশায় বলিবেন, তিচ্ছ ও কথা-
শূণ্য অকিকিংকর, উচ্চাদের সম্বন্ধে কোন
বাক্যব্যয় না করাই উচিত। তাহার উত্তর
এই যে, “কমলি নেট ভোক্তা !” পণ্ডিত-
মশায়ও যরের মধ্যে কলুর স্ত্রীকে “কবী”
অথবা “তৈলবস্ত্রপরিচালিকা” বলেন না,
সে কলি আয়ত্না কোন্ দ্বার ! যাকে মা
বলিয়া স্বীকার না করিয়া প্রপিতামহীকেই
মা বলিতে বাওয়া ঘোষণার দ্বার—সেইরূপ
বাংলাকে বাংলা না বলিয়া কেবলমাত্র
সংস্কৃতকেই যদি বাংলা বলিয়া গণ্য করি,
তবে তাহাতে পাণ্ডিত্যপ্রকাশ হইতে পারে,
কিন্তু কাণ্ডজ্ঞানের পরিচয় পাকে না।

পণ্ডিত যথেন, বাংলা স্ত্রীলিঙ্গসম্বন্ধে

হুনি দীর্ঘ ঈ চাড়িয়া হয় ট দ্বিগে যে ?
আমি বলিব, চাড়িলাম আর কই ? এক-
তলাতেই যাহার বাস, তাহাকে যদি জিজ্ঞাসা
কর, নীচে নারিলে যে, সে বলিবে, নারিলাম
আর কই, নীচেই ত আছি। “ঘোটকী”র
দীর্ঘ হইতে দ্বিগিত আছে ; সে ব্যাকরণের
প্রাচীন সনন্দ দেখাইতে পারে,—কিন্তু
“ঘুড়ি”র তাহা নাই। প্রাচীন ভাষা তাহাকে
এ অধিকার দেয় নাই, কারণ, তখন তাহার
জন্ম হয় নাই,—তাৎপাৎ পক্ষ্যাবধি সে
তাচার ইকারের পৈতৃক দীর্ঘতা খোয়াইয়া
বসিয়াছে। টিপুসুলতানের কোন বংশধর
যদি নিজেকে নৈকতরের রাজা বলেন, তবে
তাঁহার পারিধনরা তাগাতে সার দিতে পারে,
কিন্তু রাজ্যই মিলিবে না। হুয় ইকে ধোর
করিয়া দীর্ঘ লিখিতে পার, কিন্তু দীর্ঘত্ব
মিলিবে না। যেখানে বাস বাংলা স্ত্রীলিঙ্গ-
শব্দ, সেখানে হুয় ইকারের অধিকার, স্তত্রাৎ
দীর্ঘ ঈর সেখান হইতে ভাস্করের মত দূরে
চলিয়া যাওয়াই কর্তব্য।

পণ্ডিতমশায় বলিবেন, বানানের মধ্যে
পূর্ণ ইতিহাসের চিত্র বজায় রাখা উচিত।
যেথা বাক্, “যেছনি” কথাটার মধ্যে পূর্ণ
ইতিহাস কতটা বজায় আছে। ৭, স এবং
যকলা কোথায় গেল ? যবে একার কোন্
প্রাচীন ব্যবহারের চিত্র ? “ন”টা কোথা-
কার কে ? ওটা কি মন্তজীবিনীর “ন” ?
তবে জীবিতা গেল কোথায় ? এমন আরো
অনেক প্রশ্ন হইতে পারে। সহস্রর এই
যে, ৭ এবং স বাংলার ছ হইয়া গেছে—এই
“ছ”ই ৭ এবং সের ঐতিহাসিক চিত্র,
এট চিত্র বাংলা “বাঙা”শব্দের মধ্যেও

নব অতুর্বাণিঃ আপনঃ পোতাশিনঃ।

পঞ্চম-খণ্ডিঃ অশ্বিনীয়েঃ।

গোবিন্দমালা মহাশয়ের বর্ণনার অতি-প্রায় একশ নহে যে, তাত্কার্য্য রাগ সর্বদা পঞ্চমেই চড়িয়া আছে। ইহা হইতে স্পষ্ট দেখা যাইতেছে, সঙ্গীতের “রাগিণী” কথাটী সংস্কৃত প্রত্যয়ের দ্বারা তৈরি। “অতুর্বাণি” কথাটাও সেইরূপ।

পণ্ডিতমহার বর্ণনেন, সে যেমনি হউক, এ সমস্তই সংস্কৃতভাষার ব্যবহার হইতে উৎপন্ন, আমিও সে কথা স্বীকার করি। প্রমাণ হইয়াছে, একট নূন চটতে “হংস” এবং টংরাঙ্গি “গ্যাভার” নূন উৎপন্ন। কিন্তু তাই বলিয়া “গ্যাভার” সংস্কৃত “হংস”-পক্ষের ব্যাকরণগত নিয়ম মানে না, এবং তাহার স্থানিধে “গ্যাভার” হইয়া “গুন্” হয়। ইহাও প্রমাণ হইয়াছে, একট অর্ধাংশতম হইতে বপু, বার্কু, প্রভৃতি যুরোপীয় শব্দিত ও বাঙালি ব্যাকরণের পণ্ডিত ভ্রমিয়াছেন, কিন্তু যুরোপীয় পণ্ডিতরা ব্যাকরণকে যে বিজ্ঞানসম্মত ব্যাপকভাবে দেখেন, আমাদেব পণ্ডিতরা তাহা দেখেন না; অতএব উৎপত্তি একই হইলেও ব্যুৎপত্তি ভিন্ন প্রকারের হওয়া অসম্ভব নহে। “ইন্”প্রত্যয় হইতে বাংলা “ই”প্রত্যয় উৎপন্ন হইয়াছে বটে, তবু তাহা “টন্”প্রত্যয়ের সমস্ত নিয়ম মানিয়া চলে না,—এইজন্য এই ছুটিকে ভিন্ন কোঠায় না কেলিলে কাজ চালাইবার অসুবিধা হয়। লাঙলের কলার লোহা হইতে ছুঁচ তৈরি চটতে পারে, কিন্তু তাই বলিয়া সেট ছুঁচ দিয়া মাটি চাষিবার চেষ্টা করা পাণ্ডিত্য নহে।

বস্তুত প্রত্যেক ভাষার নিজের একটা ছাঁচ আছে। উপকরণ যেখান হইতেই সে সংগ্রহ করুক, নিজের ছাঁচে ঢালিয়া সে তাহাকে আপনার স্ববিধামত করিয়া বানাইয়া লয়। সেই ছাঁচটাই ভাষার প্রকৃতিগত, সেই ছাঁচেই ভাষার পরিচয়। উদ্ভূতভাষার পারসি আরবি কথা চের আছে, কিন্তু সে কেবল আপনার ছাঁচেই চতুর ভাষান্তর-বিদের কাছে হিন্দীর বৈমাত্র মহোদয় বলিয়া ধরা পড়িয়া গেছে। আমাদের বাঙালি কেহ যদি মাথার হ্যাট, পায়ে বুট, গলার কলার এবং সর্পাঙ্গে বিলাতী পোষাক পরেন, তবু তাহার রক্ত এবং ঘেহের ছাঁচে কুল-লক্ষ্মণ প্রকাশ হইয়া পড়ে। ভাষার সেই প্রকৃতিগত ছাঁচটা বাহির করাই ব্যাকরণ-কারের কাজ। বাংলার সংস্কৃতশব্দ কটা আছে, তাহার তালিকা করিয়া বাংলাকে চেনা যায় না, কিন্তু কোন বিশেষ ছাঁচে পড়িয়া সে বিশেষরূপে বাংলা হইয়া উঠিয়াছে, তাহা সংস্কৃত ও অন্ত ভাষার আমদানিকে কি ছাঁচে ঢালিয়া আপনার করিয়া লয়, তাহাই নির্ণয় করিবার জন্য বাংলা ব্যাকরণ। সুতরাং ভাষার এই আসল ছাঁচটি বাহির করিতে গেলে, এখনকার যরণকা কেতাবি ভাষার বাহিরে গিয়া চলিত কথার মধ্যে প্রবেশ করিতে হয়। সে সব কথা গ্রামা হইতে পারে, ছাপাখানার কালির ছাপে বঙ্কিত হইতে পারে, লাহু-ভাষার ব্যবহারের অব্যোমা হইতে পারে, তবু ব্যাকরণকারের ব্যবসা রক্ষা করিতে চটলে, তাহাদের মধ্যেই গতিবিধি রাখিতে হয়।

“ইন্” প্রত্যয়সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছি, স্ত্রী-
লিঙ্গে “ইনী” ও “ঈ” সম্বন্ধেও সেই একই
কথা। বাংলার স্ত্রীলিঙ্গে “ইনি” “ই” পাওয়া
দ্রুত, কিন্তু তাহা সংস্কৃত-ব্যাকরণের ছাঁচ
মানে না। সে বাঙালী হইয়া আর এক
পদার্থ হইয়া গেছে। তাহার চেহারাও বদল
হইয়াছে। যের পরে সে আর সূক্ষ্মত্ব
গ্রহণ করে না (কলমের মুখে করিতে পারে,
কিন্তু জিহ্বাশ্রে করে না) —সংস্কৃত-বিধান-
মতে সে কোথাও স্ত্রীলিঙ্গে আকার মানে না,
এইজন্য সে অধোনাকে অধোনি বলে। সে
যদি নিজেকে সংস্কৃত বলিয়া পরিচয় দিতে
চাহুক হউত, তবে “পাঠা” হউতে “পাঠি”
হউত না, “বাঘ” হউতে “বাবিনি” হউত না।
কলু হউতে কলুনি, ঘোড়া হউতে ঘুড়ি, পুরুষ
হউতে পুরুষনি নিষ্পন্ন করিতে হইলে, যুদ্ধ-
বোধের স্ত্রী টুকরা টুকরা এবং বিদ্যাবাণী-
শের ঢাকা আগুন হইয়া উঠিত।

পণ্ডিতমশায় বলিবেন, ভিঁড়ি ও কথা-
শুলা অকিঞ্চিৎকর, উচ্চাদের সম্বন্ধে কোন
ব্যাক্যব্যয় না করাই উচিত। তাহার উত্তর
এই যে, “কম্পি নেট ভোক্তাঃ” পণ্ডিত-
মশায়ও যের মতো কলুর স্ত্রীকে “কলী”
অথবা “তৈলবস্ত্রপরিচালিকা” বলেন না,
সে মূলে আমরা কোন্ ছার! মাকে মা
বলিয়া স্বীকার না করিয়া প্রণিতামহীকেই
মা বলিতে বাওয়া দোষের হয়—সেইজন্য
বাংলাকে বাংলা না বলিয়া কেবলমাত্র
সংস্কৃতকেই যদি বাংলা বলিয়া গণ্য করি,
তবে তাহাতে পাণ্ডিত্যপ্রকাশ হইতে পারে,
কিন্তু কাণ্ডজ্ঞানের পরিচয় থাকে না।

পণ্ডিত বলেন, বাংলা স্ত্রীলিঙ্গসম্বন্ধে

তুমি দীর্ঘ ঈ ছাড়িয়া ঐ ও পড়িলে যে ?
আমি বলিব, ছাড়িলাম আর কট ? এক-
তলাতেই বাহার বাস, তাহাকে যদি জিজ্ঞাসা
কর, নীচে নানিলে যে, সে বলিবে, নানিলাম
আর কট, নীচেই ত আছি। “ঘোটকী”র
দীর্ঘ হউতে দাবি আছে; সে ব্যাকরণের
প্রাক্তন সনন্দ সেখানেতে পারে,—কিন্তু
“বুড়ি”র তাহা নাই। প্রাচীন ভাষা তাহাকে
এ অধিকার দেয় নাই, কারণ, তখন তাহার
জন্ম হয় নাই, —তাহার পরে জন্মাবধি সে
তাহার ইকারের পৈতৃক দীর্ঘতা খোয়াইয়া
বসিরাছে। উপজুলতানের কোন বংশধর
যদি নিতেন্দ্রে নৈশুরের রাজা বলেন, তবে
তাহার পারিধন্য তাহাতে সার দিতে পারে,
কিন্তু রাজার মিলিবে না। হুব ইকে জোর
করিয়া দীর্ঘ লিখিতে পার, কিন্তু দীর্ঘ
মিলিবে না। যেখানে বাস্ বাংলা স্ত্রীলিঙ্গ-
শব্দ, সেখানে হুব ইকারের অধিকার, স্ত্রীর
দীর্ঘ ঈর সেখানে হউতে ভাবুরের মত দূরে
চলিয়া যাওয়াই কর্তব্য।

পণ্ডিতমশায় বলিবেন, বানানের মধ্যে
পূর্ক ইতিহাসের চিত্র বজায় রাখা উচিত।
দেখা যাক্, “মেহনি” কথাটার মধ্যে পূর্ক
ইতিহাস কতটা বজায় আছে। ২, স এবং
বফলা কোথায় গেল ? মরে একার কোন্
প্রাচীন ব্যবহারের চিত্র ? “ন”টা কোথা-
কার কে ? ওটা কি মন্তজীবিনীর “ন” ?
তবে জীবটা পেল কোথায় ? এমন আরো
অনেক প্রশ্ন হইতে পারে। সহস্রর এই
যে, ২ এবং স বাংলায় ছ হইয়া গেছে—এই
“ছ”ই ২ এবং সদের ঐতিহাসিক চিত্র,
এই চিত্র বাংলা “বাচা”শব্দের মধ্যেও

নব অশ্বরাশির অধিক প্রাচীনতায়,

পক্ষ্ম-বাণীসি অধিনীত!

গোবিন্দবাল মহাশয়ের বলিবার অভি-
প্রায় একপ নহে যে, রাধিকার রাগ সর্বদা
পক্ষ্মেই চড়িয়া আছে। ইহা হইতে স্পষ্ট
দেখা বাইতেছে, সন্ধ্যাক্তের “রাগিণী” কথাটা
সংস্কৃত প্রত্যয়ের দ্বারা তৈরি। “অমুর্ধাণী”
কথাটাও সেইরূপ।

পণ্ডিতমশায় বলিবেন, সে যেমন হটক,
এ সমস্তই সংস্কৃতভাষার ব্যবহার হইতে
উৎপন্ন, আমিও সে কথা স্বীকার করি।
প্রমাণ হইয়াছে, একটী মূল হটকে “হংস”
এবং টংরাহি “গ্যাণ্ডার” শব্দ উৎপন্ন।
কিন্তু তাই বলিয়া “গ্যাণ্ডার” সংস্কৃত “হংস”-
শব্দের ব্যাকরণগত নিয়ম নানেনা, এবং
তাহার প্রাণিক “গ্যাণ্ডার” না হইয়া “গুন্” হয়।
ইহাও প্রমাণ হইয়াছে, একই অর্থাপিঠানহ
হইতে বণ্, বার্ণক্, প্রকৃতি ব্রহ্মাণ্ডীয় শাব্দিক
ও বাঙালি ব্যাকরণগত পণ্ডিত জন্মিয়াছেন,
কিন্তু ব্রহ্মাণ্ডীয় পণ্ডিতরা ব্যাকরণকে যে
বিজ্ঞানসম্মত ব্যাণকভাবে দেখেন, আমা-
দের পণ্ডিতরা তাহা দেখেন না; অতএব
উৎপত্তি একই হইলেও ব্যুৎপত্তি ভিন্ন প্রকা-
রের হওয়া অসম্ভব নহে। “ইন্” প্রত্যয়
হইতে বাংলা “ই” প্রত্যয় উৎপন্ন হইয়াছে
বটে, তবু তাহা “টন্” প্রত্যয়ের সমস্ত নিয়ম
মানিয়া চলে না,—এইজন্য এই দুটিকে ভিন্ন
কোঠায় না ফেলিলে কাল চাপাইবার
অনুবিধা হয়। লাভলের কলার লোহা
হইতে ছুঁচ তৈরি হইতে পারে, কিন্তু তাই
বলিয়া সেটী ছুঁচ দিয়া মাটি চাষিবার চেষ্টা
করা পাণ্ডিত্য নহে

বস্তুত প্রত্যেক ভাষার নিজের একটা
ছাঁচ আছে। উপকরণ যখন হইতেই সে
সংগ্রহ করুক, নিজের ছাঁচে ঢালিয়া সে
তাৎক্ষণিক আপনায় স্থাবিধান্ত করিয়া বান-
াইয়া লয়। সেই ছাঁচটাই তাহার প্রকৃতিগত,
সেই ছাঁচেই তাহার পরিচয়। উদ্ভূতভাষার
পারসি আরবি কথা ঢের আছে, কিন্তু সে
কেবল আপনায় ছাঁচেই চতুর ভাষাতত্ত্ব-
বিদের কাছে ছিন্দীস বৈমান্য সহোদর
বলিয়া ধরা পড়িয়া গেছে। আমাদের বাঙালি
কেহ যদি মাথার হ্যাট্, পায়ে বুট্, গলায়
কলার এবং সর্জাসে বিলাতী পোশাক পরেন,
তবু তাহার রঙে এবং বেহেহে ছাঁচে কুল-
লক্ষণ প্রকাশ হইয়া পড়ে। তাহার সেই
প্রকৃতিগত ছাঁচটা বাহির করাই ব্যাকরণ-
কারের কাজ। বাংলায় সংস্কৃতশব্দ কটা
আছে, তাহার তালিকা করিয়া বাংলাকে
চেনা যায় না, কিন্তু কোন্ বিশেষ ছাঁচে
পড়িয়া সে বিশেষরূপে বাংলা হইয়া উঠি-
য়াছে, তাহা সংস্কৃত ও অন্ত ভাষার আন-
বানিকে কি ছাঁচে ঢালিয়া আপনায় করিয়া
লয়, তাহাই নির্ণয় করিবার জন্য বাংলা
ব্যাকরণ। সুতরাং ভাষার এই আলস
ছাঁচটি বাহির করিতে গেলে, এখনকার
ব্যয়গড়া কেতাবি ভাষার বাহিরে দিয়া চলিত
কথার মধ্যে প্রবেশ করিতে হয়। সে শব্দ
কথা গ্রন্থ হইতে পারে, ছাপাখানার
কালির ছাপে বসিত হইতে পারে, সাহু-
ভাষার ব্যবহারের অযোগ্য হইতে পারে,
তবু ব্যাকরণকারের ব্যবস্থা রক্ষা করিতে
চাইলে, তাহাদের মনোভী পতিবিধি বাধিতে
হয়।

সাবেক কালে “গদন” শব্দটাকে বর্ণা “৩” দ্বারা লেখা চলিত—ফোর্ট উটলিংহাম্ কলে-
জের পণ্ডিতরা সংস্কৃতের “গ”-বর্ণের
অনুরোধে বর্ণা লকে অথবা ব করিয়া লই-
লেন, অথচ “কণ”-বর্ণের মূৰ্দ্ধন্য লকে বাংলার
বস্ত্র ন-ই রাখিয়া দিলেন। তাহাতে, এই
“গদন” শব্দটা একাদৌহৃত হরগৌরীর মত
হইল—তাহার।

আবতালে শুদ্ধ অথবা নাহে,

আবতালে বস কবীর থাকে।

দৌস্তান্যাক্রমে আধুনিক পণ্ডিতরা খাঁটি
বাংলাশব্দকে অবজ্ঞা করিয়া তাঁহাদের
রচনাশক্তির মধ্যে পারস্পরিক তান ঘেন
নাই—কেবল যে সকল ফিরা ও অন্যান্য পদ
নহিলে নয়, সেইগুলিকে সংস্কৃত বানানের
দ্বারা বখালাখা শোধান করিয়া লইয়া তবে
তাঁহাদের লেখার মধ্যে প্রবেশ করিতে
হিস্যছেন। এইরূপ অধিকাংশ বাস্ বাংলা-
কথা-সবকে এখনো আমাদেব অভ্যাস খাতিপ
হয় নাই—সেগুলার খাতি বাংলা বানান্
চালাইবার সময় এখনো আছে।

আমরা এ কথা বলিয়া থাকি, সংস্কৃত-
ব্যাকরণে বাহ্যকে পিচ্চ বসে, বাংলার
তাহাকে পিচ্চ বসে যায় না। ইহাতে যিনি
সংস্কৃত-ব্যাকরণের অপমান বোধ করেন,
তিনি বলেন, কেন পিচ্চ বসিব না, অবস্ত
বসিব। কবির নবীন সেন মহাশয়ের দুইটি
লাইন মনে পড়ে—

কেন বাতিব না অবস্ত পাইব,

পাতে না কি কেত প্রথম দিগনে ?

“পিচ্চ” শব্দসম্বন্ধে পণ্ডিতগণের
সেইরূপ অটল চেতনা তিনি বলেন, পিচ্চ—

কেন বলিব না, অবস্ত বলিব !

যলে না কি কেত প্রথম দিগনে ?

আমরা ব্যাকরণে পণ্ডিত নই, তবু আমরা
বতটা বুঝিয়াছি, তাহাতে “পিচ্” একটা
সঙ্কেতমাত্র—যেখানে সে সঙ্কেত বাটে না,
যেখানে তাহার কোনই অর্থ নাই। পিচ্চের
সঙ্কেত বাংলার বাটে না, তবু পণ্ডিতমণ্ডল
বহিঃকপটাকে বাংলার চাপাইতে চান
তবে তাহার অর্থ এই গীড়ায় যে, সংস্কৃত
নৌকা পাড়ে চলে, অতএব বাংলা কন্যলব
কেতে পাড়লু চলিবে কেন, নিশ্চয়ই পাড়
চলিবে কিছু পাড়-কিন্তু প্রত্যস্ত দামী
উৎকৃষ্ট কিন্নি হইলেও তবু চলিবে না।
এখানু যে নিয়মে “প্রাধি” হয়, সেই নিয়মে
“তন্” পাড়ব “ত” “প্রাধি” হইয়া ও পরে
ইকারযোগে “প্রাধিত্তে” হইত ! হয় ত
খুব ভালই হইত, কিন্তু হয় না যে,
সে আমার বা মহামহোপাধ্যায় হর-
প্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের দোর নহে।
সংস্কৃতে পঠ্যাত্তর উত্তরে পিচ্ প্রত্যয়
করিয়া পঠন হয়, বাংলায় সেই অর্থে পড়-
পাড় হইতে “পঠান” হয়, “পাড়ন” হয় না।
অতএব যেখানে তাহার সঙ্কেতই কেহ
মানিবে না, সেখানে অগানে অকারনে
বৃদ্ধ পিচ্ সিংহাল্য তাহার প্রাচীন পতাকা
কুলিয়া কেন বসিয়া থাকিবে, সে নাই-ও।
তাহার স্থলে আর একটি যে সঙ্কেত বসিয়া
আছে, সে হয় ত তাহারই শ্রীমান পৌর,
আমাদের তত্ত্বিকাজন পিচ্ নহে;—কৌলিক
সাদৃশ্য ত কিছু থাকিবেই, কিন্তু ব্যবহারের
সংস্কৃতিতে তাহার আভ্যাস থাকা পড়ে। তবু
যদি বাংলার সেই পিচ্-পাড়াই আছে

বলিতে হয়, তবে অপদের প্রতি সম্মান দেখাইবার জন্য কাব্যগদ্যিক চৌতাল নাম দিলেও ঘোষ হয় না। প্রতিবাদে লিখিত হইয়াছে—“যে সকল শব্দ গইয়া অভিনব ব্যাকরণ নির্মাণের চেষ্টা হইতেছে, উহা একান্ত অকিঞ্চিৎকর। ঐ সকল শব্দের বহুলপ্রয়োগে ভাষার শুক্ল ও স্বাধুর্বা কন্দুর রক্ষিত হইবে, তাহা নির্ণয় করা সম্ভব নহে।”

বাংলা বলিয়া একটা ভাষা আছে, তাহার শুক্ল-মাধুর্য্য ওজন করা ব্যাকরণ-কারের কাজ নহে। সেট ভাষার নিয়ম বাহির করিয়া লিপিবদ্ধ করাটী তাহার কাজ। সে ভাষা যে উচ্ছা বাবলার কক্ক বা না কক্ক, তিনি উদাসীন। তাহারও প্রতি তাহার কোন আশ্রয় নাই অনুশাসন নাই। জীবন্তবিন্দু কুকুরের বিষয়ও লেখেন, শেয়ালের বিষয়ও লেখেন;—কোন পণ্ডিত যদি তাহাকে ভৎসনা করিতে আসেন যে, তুমি যে শেয়ালের কথাটা এত আত্মপূরক লিখিতে বসিয়াছ, শেষকালে যদি লোকে শেয়াল পুথিতে আরম্ভ করে! তবে, জীবন্তবিন্দু তাহার কোন উত্তর না দিয়া তাহার শেয়ালস্বকীর পরিচ্ছেদটা শেষ করিতেই প্রবৃত্ত হয়। বঙ্গদর্শনসম্পাদক যদি তাহার কাগজে দাছের তেলের উপর বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ লেখেন, তবে আপা করি, কোন পণ্ডিত তাহাকে এ অপবাদ দিবেন না যে, তিনি দাছের তেল মাখার মাখিবার জন্য পাঠকদিগকে অন্তর উত্তেজিত করিতেছেন।

প্রতিবাদলেখক মহাশয় ভাটরঙ্গের অব-

তারণা করিয়া লিখিয়াছেন—“যদি কেহ লেখেন ‘বিন্দুটির স্রোতসীকে বলিলেন—‘প্রিয়ে তুমি যে কথা বলিতেছ তাহার বিন্দুমোদারই গলদ’ তাহা হইলে প্রয়োগটি কি অস্তিত্বশূন্য হইবে?”

প্রয়োগের শোভনতাঘটার ব্যাকরণের কাজ নহে, অলঙ্কারশাস্ত্রের কাজ—ইহা পণ্ডিতমহাশয় জানেন না, এ কথা বিদ্যাপ করিতে আমাদের সাহস হয় না। উল্লিখিত প্রয়োগে ব্যাকরণের কোন ভুলই নাই—অলঙ্কারের ঘোষ আছে। “বিন্দুমোদার গলদ” কথাটা এমন আরম্ভতেও বসিতে পারে, যেখানে অলঙ্কারের ঘোষ না হইয়া শুণ হইবে। অতএব পণ্ডিতমহাশয়ের রসিকতা এখানে ব্যক্ত স্বরূপ হইল। দাঁতারা প্রাকৃত বাংলার ব্যাকরণ লিখিতেছেন, তাহারা এই হাস্যবাহে বাসার গিয়া মরিয়া থাকিবেন না। শ্রীমুক পণ্ডিতমহাশয় এ কথাও মনে রাখিবেন যে, চলিত ভাষা অন্ত্যানে বসাইলেই যে কেবল ভাষার প্রয়োগদোষ হয়, তাহা নহে; বিগত সংস্কৃত-শব্দ বিগত-সংস্কৃত-নিয়মে বাংলায় বসাইলেও অলঙ্কারদোষ ঘটিতে পারে। কেহ যদি বলেন, “আপনার মূল্যবী বক্তৃতা শুনিয়া অশ্রুকার সভা আপ্যায়িত হইয়াছে,” তবে তাহাতে বর্গীর বোপদেবের কোন আপত্তি থাকিবার কথা নাই, কিন্তু স্রোতারা গভীরায়না না করিতেও পারেন।

বাঁচি বাংলা কথাগুলির নিয়ম অভ্যাস;—“উটু” কথাটাকে কোনমতেই ক্রী-লিঙ্গে “উটা” করা যাইবে না, অথবা “হাপ”-শব্দের উত্তর কোনমতেই “টর” প্রত্যয়

করিয়া “বাগিত” হইবে না, টগাতে সংস্কৃত ব্যাকরণ বড়ই চম্ রক্তবর্ণ করন্! কিন্তু সংস্কৃতশব্দের বেলায় আমাদের স্বাধীনতা অনেকটা বেশি। আমরা টঙ্কা করিলে “এই মেয়েটি বড় সুন্দরী” টহাও বলিতে পারি, আবার “এই মেয়েটি বড় সুন্দর” ইহাও বলা চলে। আমাদের পণ্ডিতমণ্ডল এক জারপার লিখিয়াছেন, “বিদ্যা বশের হেতুক্রমে প্রতীকমান হইবে।” “প্রতীকমান” কথাটা তিনি বাংলা ব্যাকরণের নিয়মে ব্যবহার করিয়াছেন, কিন্তু যদি সংস্কৃত-নিয়মে “প্রতীকমানা” লিখিতেন, তাহাও চলিত। আর এক জারপার লিখিয়াছেন, “বিত্তবিক্রমণী ভাষ্যটোকে বক্তব্যের অধিকার হইতে নিষ্কাশিত করিয়া দিতে পারেন”—ছাত্র-শব্দের এক বিশেষণ “বিত্তবিক্রমণী” সংস্কৃত-বিধানে হটল, অল্প বিশেষণ “নিষ্কাশিত” বাংলা নিয়মেই হটল। টহা হইতে দেখা যাউতেছে, সংস্কৃতশব্দ বাংলা ভাষায় সুবিধামত কখনো নিজেই নিয়মে চলে, কখনো বাংলা নিয়মে চলে। কিন্তু খাঁটি বাংলা কথার সে স্বাধীনতা নাই,— “কথাটা উপযুক্ত হইয়াছে” এমন প্রয়োগ চলিতেও পারে; কিন্তু “কথাটা ঠিক হইয়াছে” না বলিয়া যদি “ঠিকা হইয়াছে” বলি, তবে তাহা সহ্য করা অন্তর্য হইবে। অতএব বাংলা রচনায় সংস্কৃতশব্দ কোথায় বাংলা-নিয়মে, কোথায় সংস্কৃত-নিয়মে চলিবে, তাহা ব্যাকরণকার বাধ্য হইবেন না, তাহা অলঙ্কারশাস্ত্রের আলোচ্য। কিন্তু বাংলা শব্দ ভাষার ভূষণ নহে, তাহা ভাষার অঙ্গ-ভূষণ; তাহাকে

যোগদেবের হৃৎ মেড়ে দিলে চলিবে না, তাহাতে সমস্ত ভাষার গায়ে ব্যথা লাগিবে। এইজন্যই, “ভ্রাতৃবৎ একাকী আছেন” অথবা “একাকিনী আছেন,” দুইই বলিতে পারি—কিন্তু “আমার ভাগ একলা আছেন” না বলিয়া “একলানী আছেন”, এমন প্রয়োগ প্রাপ্য সঙ্কেত পড়িলেও করা যায় না। অতএব, বাংলা ভাষায় সংস্কৃত শব্দ কিরূপ নিয়মে ব্যবহার করা যাইবে, তাহা লইয়া পণ্ডিতে পণ্ডিতে বড় ইচ্ছা লড়াই করুন, বাংলা বৈয়াকরণের সে যুদ্ধে রক্তপাত করিবার অদকাশ নাই।

আমার প্রবন্ধে আমি টংখাজি mono-syllabic অর্থে “একমাত্রিক” কথা ব্যবহার করিয়াছিলাম, এবং “দেখ্যৎ” প্রভৃতি ধাতুকে একমাত্রিক বর্ণনাছিলাম, টহাতে প্রতিবাদী মহাপুরুষ অত্যন্ত রাগ করিয়াছেন। তিনি বলেন—“ব্যাকরণশাস্ত্রানুসারে ভূষ-স্বরের একমাত্রা, দীর্ঘস্বরের উটমাত্রা, প্লুত-স্বরের তিনমাত্রা ও বঞ্জনবর্ণের ঋক্‌মাত্রা গণনা করা হয়।” অতএব তাহার মতে “দেখ্-” ধাতু আড়াইমাত্রিক। এই বৃক্তি অনুসারে “একমাত্রিক” শব্দটাকে তিনি বিদেশী বলিয়াই গণ্য করেন।

ইহাকেই বলে বিস্ময়োৎপন্ন গল্প! নাহা ইংরাজিই কি, বাংলাই কি, আর সংস্কৃতই কি! যদিচ প্রাচীন ভারতবর্ষ আধুনিক ভারতের চেয়ে অনেক বিষয়ে অনেক বড় ছিল, তবু “এক” তখনো “এক” ট ছিল এবং “দুই” ছিল “দুই”। পণ্ডিত-মণ্ডলে যদি যথেষ্ট পরিমাণে ভূবিজ্ঞান দেখেন, তবে তর তর বৃত্তিতে পারিবেন, গণিতশাস্ত্রের

এক ইংলণ্ডেও এক, বাংলাদেশেও এক এবং ভীষ্মভ্রাণ-ভীষ্মার্জুনের নিকটও তাহা একই ছিল। তবে আমরা দেখানে এক ব্যবহার করি, অন্যত্র সেখানে দুই ব্যবহার করিতে পারি। যেমন, আমরা এক হাতে খাট, ইংরাজ দুই হাতে খাট, লক্কেয়ার রাবণ হয় ত দশ হাতে খাইতেন, আমরা কেবল আমাদেরই খাওয়ার নিয়মকে অবন করিয়া ঐ সকল 'বাহ্যাত্মিক' খাওয়ার 'ঐক্যাত্মিক' বলিয়া বর্ণনা করিতে পারি না। সংস্কৃত ভাষার যে শব্দ 'আড়াইমাত্র' কাল ধরিয়া উচ্চারিত হইত, বাংলায় সেট: যদি একমাত্রা কাল লইয়া উচ্চারিত হয়, তবুও তাহাকে আড়াইমাত্রিক বলিবই,—সংস্কৃত ব্যাকরণের খাতিরে যদি প্রতি এতটা ক্লম দৃষ্ট হয় না। পণ্ডিতমহাশয়কে যদি লান্ধা পড়িতে হয়, তবে "পাত সংগ্রহ উপপকরণ" কথাটা তিনি কতক দরিয় উচ্চারণ করেন বাংলা ব্যবহারে তাঁহার মাতা: হয়—সংস্কৃত-মতে যোগ। তিনি যদি পাণ্ডিনীর প্রতি লক্ষ্য রাখিবার জন্য যোগমাত্রার পাত-পাত-তে-উ-ম-প-ক-ন উচ্চারণ করিতেন, তবে তাঁহার অপেক্ষা নির্দোষ ভেগে দ্রুত আড়াইটা বিয়া ক্রমে তাঁহার উপরে উঠিয়া থাকিত। সংস্কৃত ব্যাকরণকেই যদি মানিতে হয়, তবে কেবল মাত্রায়ে কেন, উচ্চারণেও মানিতে হয়। পণ্ডিতমহাশয়ের যদি লক্ষ্য-নাশা বলিয়া চাকর থাকে এবং তিনি অষ্টা-ধ্যায়ী মতে দীর্ঘ ব্রহ্ম-সূত্র শব্দের মাত্রা ও কৰ্ভা-ভালবা-মুণ্ডনোর নিয়ম রাখিয়া "লব্ধ-মৌ-নাগরজ" বলিয়া ডাক পাড়েন, তবে একা লক্ষ্যনাশা কেন, ভাব-বাক-স্বাক্ষর আমরা

হাসির হয়। কানেটে বাংলা "ক" সংস্কৃত "ক" নহে এবং বাংলার মাত্রা সংস্কৃতের মাত্রা নহে, একথা বাংলাব্যাকরণকার এচা কর্তব্য বোধ করেন। এইজন্য শব্দ মাত্রা সরাসরীও যখন বাংলা বলেন, বাঙালির ভেলেবা তাহা নিজের মাকুতাবা বলিয়া চিনিতে পাবে—তবে তাঁহারই বরপুর হইয়া পণ্ডিতমহাশয় বাংলা ভাষার বাংলা নিয়মের প্রতি এত অসহিষ্ণু কেন? তিনি অত্যন্ত উদ্ধত হইয়া বলিয়াছেন যে, তিনি আর কিছুই প্রতি বুদ্ধপাতমাত্র করিবেন না, কেবল "একমাত্রিক শব্দের দৌলি ব্যাকরণ ও অভিধানানুগারী অষ্ট গ্রহণ" করিবেন! তাই করুন, আমরা: বোধ: দিব না। কিন্তু ইহা দেখা গাইতেছে, অর্থ ভিনিষটাকে গ্রহণ করিব বলিলেই কড়া যায় না। অভিধান-ব্যাকরণ অপের দৌলার সিদ্ধক—তাহারা অর্থ বিতে পারে না, বচন করিতে পারে না। চাবি লাগাটয়া সেট অর্থ লটতে হয়।

প্রতিবাদী মহাশয় তাঁহার প্রবকের এক-দলে প্রশ্ন করিয়াছেন, "রবীন্দ্রবাবু লিখিতা-ছেন 'প্যালো মাংস'—এই প্যালোটো কি?" অবশেষে শ্রান্ত, বিষম্ব, হতাশ হইয়া গণিতে-ছেন—"মনেককে বিজ্ঞাপ্তা করিলাম কেহই বলিতে পারিলেন না। কলিকাতার অভি-বাদী অগত বাহাদের গৃহে সাহিত্যচর্চাও আছে এবং নির্মিলেবে মন্তমাংসের গতি-বিধিও আছে এমন ব্যক্তির নিকট বিজ্ঞাপ্ত হইয়াছি তাহাতেও কোন ফল হয় নাই।" পণ্ডিতমহাশয়ের যে এত প্রচুর শ্রম ও চেষ্টার কারণ চট্টাডি, উত্তরে নিজেই দিয়ার দিতে উচ্চা: হয়! আমার প্রবন্ধ

বহন করিয়া আত্মপদান্ত পরিবর্তিতক।
 বাহির হয় নাট, এবং পণ্ডিতমহাশয় আমার
 পাঠে তুমিরাষ্টে প্রতিবাদ লিখিতে প্রবৃত্ত
 হইয়াছেন, এ কথা স্বীকারই করিয়াছেন।
 অতএব, এখন আমি “বাংলা” বলিয়াছিলুম,
 তখন যদি বক্তার দ্রুতদৃষ্টিতে শ্রোতা
 “বাংলো”ই তুমিরা থাকেন, তবে সেজন্য
 বক্তা ক্ষমা প্রার্থনা করিতে প্রবৃত্ত আছেন।
 কিন্তু জিজ্ঞাস্য এই যে, ত্রুটিকারীকে তৎ-
 ক্ষণে শাসন না করিয়া যে সকল নিত্যস্থ
 নিরীহ নিরপরাধ লোক কলিকাতায় বাস
 করেন অথচ সাহিত্যচর্চা করেন এবং মন্ত-
 যাংস খাটয়া থাকেন, তাহাদিগকে খামকা
 জবাবদিহিতে ফেলিলেন কেন ? প্রতিবাদী
 মহাশয় যদি কোন অঙ্গোঙ্গে পরিবর্ত-পত্রিকার
 প্রচ্ছদ সংগ্রহ করিয়া তাহাতে এই ভুল
 দেখিয়া থাকেন, তবে সেজন্যও আমাকে
 ক্ষমা করিবেন। চাপার ভুলে যদি দণ্ডিত
 হইতে হয়, তবে দণ্ডনাগর পণ্ডিতমহা-
 শয়েরও সম্মান হইতে বঞ্চিত হইব না।

এরূপ ছোট ছোট ভুল খুঁটিয়া মূল-
 প্রবন্ধের বিচার সম্ভব নহে। “বাংলো”,
 শব্দটা রাখিলে বা বাহু দিলে আসল কথা-
 টার কিছুই আসে যায় না। বাংলা “আল্”
 প্রত্যয়ের দৃষ্টান্তমূলে স্রমক্রমে যদি “বাচাল”
 সংস্কৃত কথাটা বসিয়া থাকে, তবে সেটাকে
 অন্যায়সে উৎপাটন করিয়া ফেলা যায়,
 তাহাতে বিবেচ্য বিষয়ের মূলে আঘাত করে
 না। “হাগল” যদি সংস্কৃত-শব্দ হয়, তবে
 তাহাকে বাংলা “ণ” প্রত্যয়ের দৃষ্টান্তগতী
 হইতে বিনা ক্রেশে মুক্ত করিয়া দেওয়া
 নাটকে পারে। এটি বাংলা দৃষ্টান্ত

অনেক পাওয়া যাইবে। ধানের ক্ষেতের
 মধ্যে যদি দুটা একটা গজ বৎসরের ববেয়
 ঐষ উঠিয়া থাকে, তাহাকে রাখ বা ফেলিয়া
 দাও, বিশেষ আসে যায় না, তাই বলিয়াই
 ধানের ক্ষেতকে ববেয় ক্ষেত বলা চলে না।

সেই কথাটার এবং আসল কথাটার
 উপর দৃষ্টি না রাখিয়া অত্বীক্ষণহাতে ছোট
 ছোট খুঁজ বহিবার চেষ্টায় বেড়াইলে খুঁজ
 সর্বত্রই পাওয়া যায়।—যে গাছ হইতে ফল
 পাড়া যাইতে পারে, সে গাছ চাইতে কীটও
 পাওয়া সম্ভব, কিন্তু সেট কীটের দ্বারা
 গাছের বিচার করা যায় না।

একটু গল্প মনে পড়িল। কোন রাজ-
 পুং গৌকে চাড়া দিয়া রাগার চলিয়াছিল।
 একজন পাঠান আনিয়া বলিল, লড়াই কর !
 রাজপুং বলিল, খামকা লড়াই করিতে
 আসিলে, বরং কি স্বী-পুং নহে ? পাঠান
 বলিল, আছে বটে, আজ্ঞা তাহাদের একটা
 বন্দোবস্ত করিয়া আসিগে। বলিয়া বাড়ি
 গিয়া সব কটাকে কাটা-কুটা নিঃশেষ
 করিয়া আসিল। পাঠান দ্বিতীয়বার
 লড়াইয়ের প্রস্তাব করিতেই রাজপুং জিজ্ঞাসা
 করিল, আজ্ঞা তাই, তুমি যে লড়াই করিতে
 বলিতেছ, আমার অপরাধটা কি ? পাঠান
 বলিল, তুমি যে আমার সামনে গৌক
 তুলিয়া আছ, সেই অপরাধ। রাজপুং তৎ-
 ক্ষণে গৌক নামাইয়া দিয়া কহিল, আজ্ঞা
 তাই, গৌক নামাইয়া দিতেছি।

প্রতিবাদী মহাশয়ের কাছে আমারও
 প্রশ্ন এই যে, ঐ “হাগল”, “বাচাল”,
 “বাংলো” এবং “নৈমিত্তিক” শব্দ কয়েকটি
 নইয়াই কি আমার সঙ্গে তাঁহার বিবাদ ?

আজ্ঞা আমি গোক নামাইয়া লইতেছি—ও দশ করটা একেবারেই ত্যাগ করিলাম। তাহাতে মূলপ্রবন্ধের কোনই ক্ষতিবৃদ্ধি হইবে না। ইহাতে বিবাদ মিটেবে কি? প্রতিবাদী বলিবেন, অকিকিংকর কথাগুলো বাংলার চোকাইয়া তুমি তাহাটাকে মাটি করিবার চেষ্টার আঁচ। আমার বিনীত উত্তর এই যে, ঐ কথাগুলো আমার এবং তাঁহার বহুপূর্ব পিতামহ-পিতামহীয়া প্রচলিত করিয়া গেলেন, আমি তাহাদের রাখিবারই বা কে, মারিবারই বা কে?

প্রতিবাদী সচাপরের চকু ম হঠতে পারে, আজ্ঞা বেশ, ভাগ্য আছে থাক, তুমি ওগুলার নিধম আলোচনা করিবে না! কিন্তু এ চকু ম চলবে না! গোফের এই ভগাটুকু নামাইতে পারিব না।

যে কথাগুলি লইয়া আর এত তর্ক উদ্ভিল, তাহা এতই সোজা যে, পাঠক ও প্রোক্তাদের এবং 'সাহিত্য-পরিষৎ'-সভার সম্মানের প্রতি লক্ষ্য করিয়া চূপ করিয়া থাকাই উচিত ছিল। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, শেক্সপিয়ার বাহা বলিয়াছেন, তাহা সকলের পক্ষেই খাটে; তিনি বলেন, দুর্ভাগা একা আপেল না, দলবল সঙ্গে করিয়াই আসে। প্রতিবাদী মহাশয়ও একা নহেন, তাঁহার দলবল

আছে। তিনি শাসাইয়াছেন যে, "বিশ্ববিদ্যালয়ের অনেক বি, এ, এম্, এ উপাধিধারী" এবং "বর্তমান সময়ে যে সকল লেখক ও লেখিকা গ্রন্থ প্রণয়ন করিতেছেন" তাঁহারা, এবং "ইংলণ্ড-প্রচ্যাপ্ত অনেক কৃতবিদ্যা" তাঁহার দলে আছেন।—ইহাতে অকস্মাৎ বাংলা ভাষার এক চিট্‌চিট্‌বী অস্তিত্বাত্মকের ভিত্তি দেখিবা এতকালের উপেক্ষিতা মাতৃ-ভাষার জন্ত আশাও জন্মে, অগচ নিজে অসহায়তার ভ্রমকল্পও উপস্থিত হয়। সেই কারণে পণ্ডিতমহাশয়ের দল তাহাইয়া লইবার জন্তই আমার আশ্রিকার এই চেষ্টা। তাঁহাদিগকে আমি আশ্বাস দিতেছি, এ দলে আসিয়াও তাঁহারা "ভাষার বিত্তি ও মাধুর্য্য রক্ষার" মনোযোগ করিলে আমার। কেহ বাধা দিব না, চাই কি, আমরাও শিক্ষালাভ করিতে পারিব।

কেবল তাঁহাদিগকে এই অত্যন্ত সহজ কথাটুকু স্বীকার করিতে হইবে যে, বাংলা ভাষা বাংলা ব্যাকরণের নিয়মে চলে এবং সে ব্যাকরণ সম্পূর্ণরূপে সংস্কৃত-ব্যাকরণের দ্বারা শাসিত নহে। ইহাতে তাঁহাদের কৃত-বিদ্যতা ও ইংলণ্ডপ্রচ্যাপনবের গৌরব ক্ষুণ্ণ হইবে না, অগচ আমিও যথেষ্ট সন্মানিত ও মহাশয়ানু হইব।

বঙ্গদর্শন।

মাতা মনু।

আমরা এ প্রবন্ধে যে দুইটি শব্দের
ব্যাখ্যা লইয়া আলোচনা করিব, সম্ভাব্য সে
শব্দ দুইটি এই—

১। বম্বে নৃ-রিখ কত্র-ন্ আদিভ্যাম্ উত।

যজ্ঞা যজ্ঞঃ ধনং মনুজাতং দৃতপ্রবন্।

১—৪৫ মূ—১ম—৪৫৫।

২। মাতঃ পরেণ ধর্মণা বৎ সনুতিঃ সহাতুবাঃ।

শিতা বৎ কলাপস্তাণিঃ শ্রদ্ধা মাতা মনুঃ কবিঃ।

১০—১০ মূ—আগ্নেয়পর্ব সান্ন।

ভক্ত্য সাধারণতাবান্—

হে অগ্রে বহিঃ কর্ণবি ববানীন্ আ যজ। উত অপি
চ জনং অন্তমপি দেবতারূপং প্রাপিনঃ বহ।
কীদৃশন্? যজ্ঞঃ শোভনব্যাপকঃ মনুজাতঃ
মনুনা প্রজাপতিনা উৎপাদিতঃ দৃতপ্রবন্ উৎকল্য
সেকারন্। ১।

হে অগ্রে বং পরেণ উৎকৃষ্টেন ধর্মণা
আবানাদিকর্ষণা জাতঃ প্রাকৃত্তোহসি। বৎ বঃ
সনুতিঃ যজ্ঞে সহ বর্তন্তে ইতি সনুতঃ ধর্মজঃ তৈঃ
সহ অনুবঃ কৃমিসবন্ধিযজ্ঞে বর্তসে। কতপস্তাণি-
রিত্যোক্তয়োঃ পরস্পরঃ বিতর্কিত্যভ্যাসঃ। বৎ যজ্ঞাঃ
কতপঃ শিতা শ্রদ্ধা মেবী মাতা চ মনুঃ কবিঃ

ক্রান্তকর্ণা মেবানী না মনুর্দৈবমতঃ শ্রোতা জানীৎ।
সোহপ্রিথগমানাহ অতীষ্টঃ ধনঃ প্রযচ্ছতু। অনেন
নৃচিতদুশাখ্যানঃ ব্রাহ্মণঃ পুংসে ত্রষ্টব্যন্।

আমরা সাধারণের ভাষাে সঙ্কষ্ট হইতে
পারিলাম না। কেন না, আমাদেরিগের ধারণা
ও বিশ্বাস যে, উল্লিখিত দুইটি শব্দের
একটিতেও মনুশব্দ পুমান্ মনু অর্থাৎ
প্রজাপতি মনু অথবা বৈবস্বত মনুর বাচক
নহে। এই মনুশব্দ দ্বারা কতপের অন্ততম
স্ত্রী মহামতি মনু অববোধিত হইবেন
ও হইয়াছেন। এবং তাঁহারই গর্ভে জন্ম-
পরিগ্রহ করিয়া আমরা মানবনামে সমাখ্যাত
হইয়াছি। পুমান্ চতুর্ধনজন মনু আমাদেরিগের
বহু-বংশের পিতৃহানীর বলিয়া গণ্য বটেম,
কিন্তু আমাদেরিগের মানবনাম পুরুষ মনু
হইতে ব্যুৎপাদিত হয় নাই।

পাঠক, প্রথম শব্দে গুরুপ্রণেতা ঋষি
যেমন ভিন্নমাতৃক বহু, কত্র-ও আদিভ্যা-
গণের যজ্ঞনের কথা বলিতেছেন, তেমনই
মনুজাত আর একটি স্বতন্ত্র দেবতার কথাও

নির্দেশ করিতেছেন। শাস্ত্রে দেবতার
৮টি শ্রেণীতে বিভক্ত। যথা—

আদিত্যা বলবো রুদ্রাঃ সাধা বিধে মরুৎগণাঃ ।

তুৰ্য্যগোছিরসৈক্বে চক্ৰৌ দেবগণাঃ কৃত্যঃ ।

২—২ অ. বায়ু উত্তরখণ্ড ।

ইহার মধ্যে রুদ্র, মরুৎ ও আদিত্যগণ
কল্পপাদ্যজ, ৩ সূতরাং ইহারায় আরম্ভবৎ
অনন্তরবৎ । কেন না, মরুৎ পুত্র মরীচি,
মরীচির পুত্র কল্পপ—

“মরীচোঃ কল্পপঃ পুত্রঃ কল্পপাত্, ইমাঃ প্রজাঃ ।”

মহুসংহিতাতে মরীচি মরুৎ তনয় বলিয়া
বিবৃত হইয়াছেন। সূতরাং প্রথম অঙ্কের
রুদ্র ও আদিত্যগণ মরুৎ সম্বন্ধে হইলেও,
কল্পপ্রপেতা অর্থাৎ “কল্পান্” ও “আদিত্যান্”
এই বচনভাষ্য পদ ভিন্ন একবচনান্ত
একটি “মহুজাত” শব্দের দ্বাৰা প্রয়োগ
করিয়াছেন, এই মহু কখনই সেই পুরুষ
আরম্ভবৎ মঃ অর্থাৎ প্রজাপতি মহু নহেন।
সারণ সাহস করিয়া উহাকে চতুর্ধশতত্তর
অন্ত কোন পুরুষ মরুৎ সম্বন্ধে বলিয়াও
ব্যাখ্যা করেন নাই। সূতরাং এই মহু কখনই
পুরুষ মহু নহেন।

যে অঙ্কে ইতিহ্য কর্তৃক বঙ্গদেহে বহু বহু
কান্ অষ্ট বর্ষপুত্রান্ কহেন একাদশাঙ্ককান্ আদি-
ত্যান্ বাবদ্যকান্ বিধিবান্ কশ্যাপাশ্বকান্ তথা
বৃত্তপ্রবঃ বৃত্তসেকাঃ বৃত্তাভিপ্রাভাঃ বঙ্গতঃ
শোকবদশীলঃ মহুজাতঃ দক্ষকশ্যাপসুগ্রবঃ মানব-
বোকে বঙ্গ ।

দেবতাদেশে স্ত্রীমৈত্রেয়ানবগণও দেব-

সংজ্ঞায় সংজ্ঞিত হইতেন। ইহারায় বর্গভেদ
হইয়া দেবত্ব হইতে বিচ্যুত হন। মরুৎ-
গণ ও অক্লগণ মরুৎ হইয়াও কেবল বর্গাধি-
বাস-নিবন্ধন পুনরায় দেবত্ব লাভ করেন, ঐ
অঙ্কের বহুস্থলে বরং সারণও তাহা
স্বীকার করিয়াছেন। বৈতাশানবগণ “পূর্ক-
দেবাঃ” বলিয়া প্রখ্যাত। মহুও আদিত্যদের
পূর্কপুরুষদিগকে পূর্কদেব বলিয়া সংজ্ঞার
করিয়া গিয়াছেন। যথা—

অজোযনাঃ শৌণেয়াঃ সততঃ ব্রহ্মজাযিঃ ।

নাভলপ্তা মহাত্যাসাঃ পিতরাঃ পুরুষেনতাঃ । ১২২ ।

কথিতাঃ পিতরো জাত্যঃ পিতৃত্যো দেবদানবাঃ

দেবেভ্যস্ত কপং সকাঃ চরঃ বৃণ্ণপুরুষাঃ । ২০২ ।

তৃতীয় অধ্যায় ।

সূতরাং মহুজাত মানব-দেবগণের ভা-
নার কথা যে এ অঙ্কে বিবৃত হইয়াছে,
তাহা প্রবই। এই মহু মাতা মহু, পিতা
মহু নহেন। পিতা মহু হইলে, পিতা মরুৎ
সম্বন্ধে রুদ্রাদিত্যের পুনরাবৃত্তি ঘটিত না,
এক “মহুজাত” শব্দে তাহারও অববোধিত
হইতে পারিতেন।

দ্বিতীয় অঙ্কটিতেও সারণ যে মহুকে
বৈবস্বত মহু বলিয়াছেন, উহা সঙ্গত হয়
নাই। কেন না, “পিতা কল্পপ” শব্দের সাবর্চ্য
ও সাতৃশব্দের সান্নিধ্য বলত আমরা এই
“মহু” শব্দকেও মাতার সহিত সমানাদিকরণ
করিতে সম্মতীবি। এই অঙ্কের শেষাঙ্কের
অর্থ এই যে, পিতা কল্পপ ও অশ্রোহা

১ আদিত্যা ব্রহ্মতো রুদ্রা বিজ্ঞেতাঃ কল্পপাদ্যজাঃ ।

সাধ্যাক বলবো বিধে বর্ষপুত্রান্ কহো যথাঃ । ৩—২ অ. উত্তরখণ্ড, বায়ু ।

৪ অনবঃ কল্পপঃ তে চ মরুত্যাঃ, মরীচিঃ সন্তো অস্ততঃসানবতঃ । প্রতি ।

মাতা মমু—যদিও কবি অর্থাৎ প্রোডা ছিলেন।

অবশ্য এখানে এই বিতর্ক হইতে পারে যে, কল্পণের মহানামে কোন স্ত্রী অপবা মহানামে কোন স্ত্রীলোকের সন্তান কথা এ অগৎ অবগত নহে। তা ঠিক। মহাভারতে কল্পণের এক স্ত্রী “মুনি” নামে সমাখ্যাতা, বিষ্ণুপুরাণ ও মহাভারতের অঙ্গুগমন করিয়াছেন। কিন্তু দিতির পুত্র বৈতা বা অদিতির পুত্র আদিত্যের ছাত্র, মুনির পুত্র “মৌনেয়” নামে কেহ আছেন, তাহাও কেহ অবগত নহেন। বিষ্ণুপুরাণেও অঙ্গুরোগণকে মুনির সন্তান বলিয়াছেন, কিন্তু আমরা উহা লিপিকরপ্রকার বলিয়া পরিগণনা করিয়া থাকি। আরও দেখ, পূর্বকালে দেব, বৈতা, দানব, বৈনতেয়, কাশ্যবেয়, সকলেই মাতৃনামে পরিচিত হইতেন। যথা—

“বিবোধকঃ সর্ব এষ প্রোডাতে মাতৃনামজিঃ”

যাহুপুরাণের এই উক্তি দ্বারাও জানা যাইতেছে যে, দিতির পুত্র বৈতা, অদিতির পুত্র আদিত্য, বিনতার পুত্র বৈনতেয়, কল্পণ পুত্র কাশ্যবেয় ও মমুর পুত্র দানবেয়, সকলেই মাতৃনামা। তবে, মানবেয় বেলা কেন এ ব্যক্তিত্বের ঘটিবে? যদি মানবশব্দ পুরুষ মমু দ্বারা যুৎপাদিত হইত, তাহা হইলে এই মানবশব্দ দ্বারা দায়জুব মমুর অনন্তর-বস্ত্র বৈতা, দানব, আদিত্য প্রভৃতি সকলেই সংশ্লিষ্ট হইতেন। কিন্তু আমরা কি বৈতা-দানবাদিকে কখনও ‘মানব’ বলিয়া অবগত আছি? কখনই নহে। তবে এ ‘মানব’ শব্দের নিদান কি? মমুশব্দ দ্বারা যে

কোন স্ত্রী মমু সৃষ্টিত হইতেন, তাহারই বা প্রমাণ কোথায়!

আমরা দেখিতেছি, মমুবৎ জগন্মান্য রামায়ণে বিস্তৃত আছে—

এমাপতেত মক্ষমা মমুবুর্জিত নঃ কৃতম্ ।

মুষ্টিহৃদিতয়ো রাম বশবিজ্ঞো মহাবলঃ ৷ ১০ ৷

কল্পণঃ প্রতিজ্ঞাহ তাসামস্তৌ হুবধায়াঃ ।

অদিতিক দিতিকৈশ্চ সন্মুগৈ চ কলেকাব্ ৷ ১১ ৷

তাসাঃ ক্রোধবশাকৈশ্চ মধুকংগানসামপি ।

তাস্ত কস্তান্ততঃ প্রীতঃ কস্তপঃ পুনরবনীৎ ৷ ১২ ৷

আর্য্যাকাণ্ড.

হেমচন্দ্র-সম্পাদিত সংস্করণের ১৪৩ সর্গ।

অতএব কল্পণের এক স্ত্রীর নাম “মমু,” ইহা প্রতিপন্ন হইতেছে। অবশ্য পুরাণান্তরে কল্পণের স্ত্রী ১০ট বলিয়া বিস্তৃত এবং সেই তেরটির মধ্যে মমুর নাম দৃষ্ট হয় নাই। কিন্তু বিষ্ণুপুরাণ ও মহাভারতের “মুনি”-নাম যেরামায়ণের মমুর বিপর্য্যয়িত, তাহাতে কোন সন্দেহই নাই। যদি বল, মমু হইতে যে মহুয়া বা মানবগণ সন্মুৎপন্ন, তাহার প্রমাণ কোথায়? তাহার প্রমাণও রামায়ণের উক্ত সর্গেই বর্ণিত রহিয়াছে। যথা—

মমুবৃক্ষম্যান জননঃ কল্পপাত্ৰ মহাদনঃ ৷ ২২ ৷

অতএব এই মমু কল্পণের সহধর্ম্মিণী ত্রিভুজকশ্যপের পিতামহ অর্থাৎ মরীচিপিতা দায়জুব মমু, ইহা সিদ্ধ হইতে পারে না। এই মমুর স্ত্রী ও কশ্যপসহধর্ম্মিণীও নিত্যা-পতিভেই স্বীকার করিতে হইতেছে। যদি তাহা স্বীকার কর, তাহা হইলে ইহাও স্বীকার করিতে হইবে যে, সামবেদ ও ঋগ্বেদের উল্লিখিত-জক-সংহ মমুশব্দও পুনান্ মমুর বাচক নহে।

জর্মানগণেরা এখনও আপনাদিগকে মনু'র সন্তান বলিয়া দাবি করিয়া থাকেন। এবং সেই মনুকে আবার তাঁহারা টুইকোপুত্র বলিয়া অবগত আছেন। বলা—

Although without a common name the ancient Germans believed that they had a common origin, all of them regarding as their fore-father Mannu the first man the son of god Tuisco.

Encyclopedia Britannica.

আমরা এই অঙ্ককার হটতেই এই আলোকে উপনীত হইতেছি যে, যেমন আমরা মাতা মনুর কথা অবগত নহি, পিতা মনুর কথাই অবগত, তেমনই আদিদিগের বেশ হইতে শকসহস্রগংসহস্রানী জর্মানগণও

সেই পিতা মনু'র জ্ঞান লইয়া গমন করিয়া ছিলেন। কিন্তু আমরা মনুকে বৈরাগ্য বা বির্যহীন'র বলিয়া অবগত, তাঁহারা টুইকোর আদ্বজ বলিয়া বিদিত। তাহাতেই বোধ হইতেছে ইউরোপগত জর্মানগেরা এক্ষণ এক মনু'র কথা অবগত, ছিলেন, বাহার পিতা বির্যহীন' নহেন, টুইকো।

এদিকে আমরা স্মারাগে দক্ষকে মনুর পিতা বলিয়া বিবৃত দেখিতেছি। টুইকো (Tuisco)- শব্দ যে দক্ষশব্দের লঘোবিকৃতি, তাহাতে কোন সন্দেহই নাই। অতএব জর্মান-দিগের মনু যে আমাদের স্মারাগ ও দাম-বেদের মাতা মনুর সহিত অভিন্ন, তাহা প্রত্যেক চেতমান ব্যক্তিই স্বীকার করিবেন। যদি তাহা স্বীকৃত হয়, তাহা হইলে স্মারাগেরও অগ্নি খট্টিয়াছে, ইহা মনে করিতে হইবে।

ঐউমেশচন্দ্র দাস গুপ্ত।

চোখের বালি।

—(২২)—

(২২)

পরদিন স্নান স্নান করিয়া বিছানা হইতে উঠিয়া-
যাত্রী একটা মনু'র আবেগে মহেন্দ্রের দ্বার
পূর্ণ হইয়া গেল। প্রত্যন্তের স্থাণালোক
যেন তাহার সমস্ত ভাবনা-বাসনা সেনা
মাখাইয়া দিল। কি মনু'র পুণিবা, কি

মনু'র আকাশ, বাতাস যেন পুণ্যতরু
মত সমস্ত মনকে উড়াইয়া লইয়া বাইতেছে।
সকালবেলায় বৈক্যব ঝিল্লুক ঝোল-
করতাল বাজাটায় গান জুড়িয়া বিধাডিল।
বরোয়ান তাড়াইয়া দিতে উদ্যত হইলে
মহেন্দ্র বরোয়ানকে ভৎসনা করিয়া ভাবনি

ভাষাবিগকে একটা টাকা দিয়া ফেলিল।
বেহারী কেরোসিনের ল্যাম্প লইয়া যাটবার
সবর অদাৰ্থানে ফেলিয়া দিয়া চুইয়ার
করিল,—মহেন্দ্রের মূখের দিকে তাকাইয়া
করে তাহার প্রাণ শুকাইয়া গেল। মহেন্দ্র
তিরকারমাত্র না করিয়া প্রসন্নমুখে কহিল,
“ওরে ওখানটা ভাল করিয়া কাঁট দিয়া
ফেলিও—যেন কাহারো পায়ে কাঁচ না
কোটে!”—আজ কোন ক্ষতিকেই ক্ষতি
বলিষা মনে হইল না।

প্রেম এতদিন মেগথোর আড়ালে লুকা-
ইয়া বসিয়াছিল—আজ সে সম্মুখে আসিয়া
পর্দা উঠাইয়া দিয়াছে। জগৎ-সংসারের উপর
হইতে আশ্রয় উঠিয়া গেছে। প্রতিদিনের
পৃথিবীর সমস্ত ভুঙ্খতা আজ অগ্রহীত
হইল। গাছপালা, পশুপাখী, পথের জনতা,
নগরের কোলাহল, সকলই আজ অপরূপ!
এই বিশ্বখ্যাপি-নৃতনতা এতকাল ছিল
কোথায়!

মহেন্দ্রের মনে হইতে লাগিল, আজ যেন
বিনোদিনীর সঙ্গে অন্তরিনের মত সামান্ত-
ভাবে মিলন হইবে না। আজ যেন
কবিতার কথা বলিলে এবং সঙ্গীতে ভাব-
প্রকাশ করিলে তবে ঠিক উপযুক্ত হয়।
আজিকার দিনকে ঐক্যবোধ-সৌন্দর্য্যে পূর্ণ
করিয়া মহেন্দ্র স্বটিছাড়া সমাজছাড়া
একটা আশ্রয় উপন্যাসের অদৃষ্ট দিনের
মত করিয়া তুলিতে চায়। তাহা সত্য
হইবে, অথচ যশ হইবে—তাহাতে সংসারের
কোন বিধি-বিধান, কোন দারিদ্র্য, কোন
বাণ্টবিকতা থাকিবে না।

আজ সকাল হইতে মহেন্দ্র চকল হইয়া

বেড়াইতে লাগিল, কলেজে যাইকে পারিল
না; কারণ, মিলনের লম্বট কখন অকস্মাৎ
আবিষ্কৃত হইবে, তাহা ত কোন পল্লিকার
লেখে না।

গৃহকাণ্ডে রত বিনোদিনীর কণ্ঠস্বর
মাঝে মাঝে তাঁহার হইতে—রাগাধর হইতে
মহেন্দ্রের কানে আসিয়া পৌছিতে লাগিল।
আজ তাহা মহেন্দ্রের ভাল লাগিল না—
আজ সে বিনোদিনীকে মনে মনে সংসার
হইতে বহুদূরে স্থাপন করিয়াছে।

সময় কাটিতে চায় না। মহেন্দ্রের
স্নানোহার হইয়া গেল—সমস্ত গৃহকর্ণের
বিশ্রমে মধ্যাহ্ন নিশ্চল হইয়া আসিল। তবু
বিনোদিনীর দেখা নাই। দুঃখে এবং জুখে,
অধৈর্য্যে এবং আশার মহেন্দ্রের মনোবস্ত্রের
সমস্ত তারগুলো বৃত্ত হইতে লাগিল।

কালিকার কাড়াকাড়ি-করা সেই বিষ-
বৃক্ষখানি নীচের বিধানার পড়িয়া
আছে। দেখিবামাত্র সেই কাড়াকাড়ির
দৃষ্টিতে মহেন্দ্রের মনে পুলকাবেশ প্রাপিয়া
উঠিল। বিনোদিনী যে বালিশ চাপিয়া
ভুইয়াছিল, সেই বালিশটা টানিয়া
লইয়া মহেন্দ্র তাহাতে মাথা রাখিল; এবং
বিষবৃক্ষখানি তুলিয়া লইয়া তাহার পাত
গুলটাইতে লাগিল। ক্রমে কখন একসময়
পড়ার বন লাগিয়া গেল, কখন পাঁচটা
বাজিয়া গেল,—হুঁ হুঁ হইল না।

এমন সময় একটি যোগদাবাদী খুকের
উপর খালার কল ও সন্দেশ এবং ত্রেকাবে
বরকচিনিগন্ধযুক্ত সুগন্ধি দলিৎ ধর্ম্ম লইয়া
বিনোদিনী ঘরে প্রবেশ করিল এবং
মহেন্দ্রের সম্মুখে রাখিয়া কহিল—“কি করি-

তেজ ঠাকুরপোঃ ? তোমার হইল কি ? পাঁচটা বলিয়া গেছে, এখনো তোমার হাত-মুখ-ধোরা—কাপড়-ছাড়া হইল না ?”

মহেন্দ্রের মনে একটা ধাক্কা লাগিল। মহেন্দ্রের কি হইয়াছে, সে কি বিজ্ঞানা করিবার বিষয় ? বিনোদিনীর সে কি অগোচর ধাক্কা উচিত ? আজিকার দিন কি অস্ত্র বিনোদিনী মত ? পাছে বাহা আশা করিয়াছিল, হঠাৎ তাহার উ-টা কিছু বেধিতে পার, এই প্রয়ে মহেন্দ্র গতকলাকার কথা মরণ করাইয়া কোন দাবী উপাধন করিতে পারিল না।

মহেন্দ্র খাইতে বসিল। বিনোদিনী ছাতে-বিছানো, রোঁর-রোঁর মহেন্দ্রের কাপড়গুলি ভ্রতপদে ঘরে বহিয়া আনিয়া মিশ্রণহস্তে ভাঁজ করিয়া কাপড়ের আল-মারির মধ্যে তুলিতে লাগিল।

মহেন্দ্র কহিল, “একটু রোসো, আমি খাইয়া উঠিয়া তোমার সাহায্য করিতেছি।”

বিনোদিনী ঝোড়হাত করিয়া কহিল—“মোহাই তোমার, আর যা কর, সাহায্য করিয়ে না।”

মহেন্দ্র খাইয়া উঠিয়া কহিল, “বটে ! আমাকে অকর্ণণ্য ঠাওরাইয়াছ ! আচ্ছা, আজ আমার পরীক্ষা হোক।”—বলিয়া কাপড় ভাঁজ করিবার বৃথা চেষ্টা করিতে লাগিল।

বিনোদিনী মহেন্দ্রের হাত হইতে কাপড় কাড়িয়া লইয়া কহিল—“ওগো মশায়, তুমি রাখ, আমার কাজ বাড়াইয়ো না।”

মহেন্দ্র কহিল—“হবে তুমি কাজ করিয়া যাও, আমি দেখিরা শিকালার করি।”—বলিয়া আলমারির সমুখে বিনোদিনীর কাছে আসিয়া মাটিতে আলন করিয়া বসিল। বিনোদিনী কাপড় আড়িবার চলে একবার করিয়া মহেন্দ্রের পিঠের উপর আছড়াইয়া কাপড়গুলি পরিপাটিপূর্ণক ভাঁজ করিয়া আলমারিতে তুলিতে লাগিল।

আজিকার মিলন এমন করিয়া আরম্ভ হইল। মহেন্দ্র প্রত্যাষ হইতে বেতন কলনা করিতেছিল, সেই অশুভতার কোন লক্ষণই নাট। একপ ভাবে মিলন কংবো লিখিবার, সঙ্গীতে গাহিবার, উপভাসে রচিবার যোগ্য নহে। কিন্তু তবু মহেন্দ্র উঃখিত হইল না—বরক একটু আরাম পাইল। তাহার কাল-নিক আবলকে কেমন করিয়া খাড়া করিয়া রাখিত—কিছুপ তাহার আয়োজন, কি কথা বলিত, কি ভাগ প্রকাশ করিতে হইত, সকলপ্রকার সামান্ত্যকে কি উপায়ে দূরে রাখিত, তাহা মহেন্দ্র ঠাওরাইতে পারিতেছিল না—এই কাপড় খাড়া ও ভাঁজ করার মধ্যে হাসি-তামাসা করিয়া সে যেন বরচিত একটা অসম্ভব দ্রুত আঘর্ষের হাত হইতে, নিষ্কৃতি পাইয়া বাঁচিল।

এমন সময় রানলক্ষী ঘরে প্রবেশ করিলেন। মহেন্দ্রকে কহিলেন, “মহিন্, বট কাপড় তুলিতেছে, তুই ওখানে বসিয়া কি করিতেছিন্ ?”

বিনোদিনী কহিল—“দেখ ত পিদিয়া, মিচানিছি কেবল আমার কাজে দেখি করাইয়া দিতেছেন !”

মহেন্দ্র কহিল—“বিগলন ! আমি আরো
ওঁর কাজে সাহায্য করিতেছিলাম।”

রাজলক্ষ্মী কহিলেন—“আমার কপাল !
তুই আবার সাহায্য করিবি ! আন বউ,
মহিনের বরাবর ঐ রকম ! চিরকাল মা-
পুড়ির আদর পাইয়া ও যদি কোন কাজ
নিষেধ হাতে করিতে পারে !”

এই বলিয়া মাতা পরমন্ত্রেহে কর্ণ-
অণুটু মহেন্দ্রের প্রতি নেত্রপাত করিলেন।
কেমন করিয়া এই অকর্ণণ্য একান্ত-মাতৃ-
স্নেহাশ্রয়ী বরষ সন্তানটিকে সর্গশ্রকার
আরাগনে রাখিতে পারিবেন, বিনোদিনীর
সহিত রাজলক্ষ্মীব সেই একমাত্র পরামর্শ।
এই পুরসেবাব্যাপারে বিনোদিনীর প্রতি
নিষ্ঠা করিয়া তিনি নিতান্ত নিশ্চিত, পরম
স্বামী। সম্প্রতি বিনোদিনীর মর্গ্যাদা যে মহেন্দ্র
বুঝিয়াছে, এবং বিনোদিনীকে রাখিবার
অন্ত তাহার যত্ন হইয়াছে, ইহাতেও রাজলক্ষ্মী
আনন্দিত। মহেন্দ্রকে শুনাইয়া শুনাইয়া
তিনি কহিলেন, “বউ, আজ ত তুমি মহিনের
পরম কাপড় যোগে দিয়া তুলিলে, কাল
মহিনের নূতন কমালগুলিতে উহার নামের
অক্ষর খেলাট করিয়া দিতে হইবে।
তোমাকে এখানে আনিয়া অবধি বস্ত্র-আদর
করিতে পারিলাম না বাছা, কেবল খাটা-
ইয়া মারিলাম !”

বিনোদিনী কহিল, “পিসিমা, অমন
করিয়া যদি বল, তবে সুখি, তুমি আমাকে
পর ভাবিতেছ।”

রাজলক্ষ্মী আদর করিয়া কহিলেন—
“আহা মা, তোমার মত আপন আমি পাব
কোথায় !”

বিনোদিনীর কাপড়-তোলা শেষ হইলে
রাজলক্ষ্মী কহিলেন—“এখন কি তবে সেই
চিনির রসটা চড়াইয়া দিব, না, এখন তোমার
অন্য কাজ আছে !”

বিনোদিনী কহিল—“না পিসিমা, অন্য
কাজ আর কই ? চল, মিঠাইগুলি তৈরি
করিয়া আসি গে !”

মহেন্দ্র কহিল—“মা, এইমাত্র অল্পতাপ
করিতেছিলে ড'হাকে খাটাইয়া মারি-
তেছ, আবার এখন কাজে টানিয়া লইয়া
চলিলে ?”

রাজলক্ষ্মী বিনোদিনীর চিবুক স্পর্শ
করিয়া কহিলেন, “আমাদের লক্ষী ঘের
যে কাজ করিতেই ভালবাসে !”

মহেন্দ্র কহিল—“আজ সন্ধ্যাবেলার
আমার হাতে কোন কাজ নাই, তাহা-
ছালাম খালিকে লইয়া একটা বই পড়িব।”

বিনোদিনী কহিল—“পিসিমা, বেশ ত,
আজ সন্ধ্যাবেলা আমরা দুজনেই ঠাকুর-
পোর বই-পড়া শুনিতে আসিব— কি বল ?”

রাজলক্ষ্মী ভাবিলেন, “মহিন্ আমার নিতান্ত
একলা পড়িয়াছে, এখন সকলে মিলিয়া
তাহাকে তুলাইয়া রাখা আবশ্যক।”—
কহিলেন—“তা বেশ ত, মহিনের দাবার-
তৈরি শেষ করিয়া আমরা আজ সন্ধ্যাবেলা
পড়া শুনিতে আসিব। কি বলিস্ মহিন্ ?”

বিনোদিনী মহেন্দ্রের মুখের দিকে
কটাক্ষপাত করিয়া একবার দেখিয়া গেল।

মহেন্দ্র কহিল—“আজ্ঞা !” কিন্তু তাহার
আর উৎসাহ রহিল না। বিনোদিনী
রাজলক্ষ্মীর সঙ্গে সঙ্গেই বাহির হইয়া গেল।

মহেন্দ্র রাগ করিয়া ভাবিল, “আমিও

আজ বাহির হইয়া যাইব—ঘেরি করিয়া বাড়ী করিব।” বলিয়া তখন বাহিরে বাইবার কাপড় পরিল। কিন্তু সন্ধ্যা কাণ্ডে পরিণত হইল না। মহেন্দ্র অনেকক্ষণ ধরিয়া ছাতে পাশচারী করিয়া বেড়াইল, সিঁড়ির দিকে অনেকবার চাহিল, শেষ ঘরের মধ্যে আসিয়া বসিয়া পড়িল। বিরক্ত হইয়া মনে মনে কহিল—“আমি আজ মিঠাই স্পর্শ না করিয়া থাকে জানাইয়া দিব, এত দীর্ঘকাল ধরিয়া চিনির রস আল দিলে তাহাতে মিষ্ট থাকে না।”

আজ আহাের সময় বিনোদিনী রাজলক্ষ্মীকে সঙ্গে করিয়া আসিল। রাজলক্ষ্মী তাহার হাঁপানির ভয়ে প্রায় উপরে উঠিতে চান না, বিনোদিনী তাহাকে অহরোধ করিয়াই সঙ্গে আনিয়াছে। মহেন্দ্র অত্যন্ত গভীর মুখে খাইতে বসিল।

বিনোদিনী কহিল—“ও কি ঠাকুরপো, আজ তুমি কিছুই খাটতেচ না যে?”

রাজলক্ষ্মী বাগ্ধ হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—“কিছু অল্পখ করে নাই ত?”

বিনোদিনী কহিল—“এত করিয়া মিঠাই করিলাম, কিছু মুখে বিতেই হইবে! ভাল হয় নি বুঝি! তবে থাক! না, না, অহরোধে পড়িয়া আঁতরিয়া থাওয়া কিছু নয়। না, না, কাজ নাই!”

মহেন্দ্র কহিল—“ভাল মুক্লেই ফেলিলে। মিঠাইটাই সব চেয়ে খাইবার ইচ্ছা, লাগিতোছে ও ভাল, তুমি বাধা দিলে তনিব কেন?”

দুইটি মিঠাই মহেন্দ্র নিঃশেষপূর্বক খাইল—তাহার একটি দানা—একটু গুঁড়া পর্যন্ত ফেলিল না!

আহারান্তে তিনজনে মহেন্দ্রের শোবার ঘরে আসিয়া বসিলেন। পড়িবার প্রত্যাশা মহেন্দ্র আর তুলিল না। রাজলক্ষ্মী কহিলেন—“তুই যে কি বই পড়িবি বলিয়াছিলি, আরম্ভ কর না!”

মহেন্দ্র কহিল—“কিন্তু তাহাতে ঠাকুর-দেবতার কথা কিছুই নাই, তোমার তনিকে ভাল লাগিবে না!”

ভাল লাগিবে না! যেমন করিয়া হোক, ভাল লাগিবার জন্য রাজলক্ষ্মী কৃতসঙ্কল্প! মহেন্দ্র যদি তুর্কি-ভাষাও পড়ে, তবু তাহার ভাল লাগিতেই হইবে! আহা বেচারী মহিন্, বউ কালী গেছে, একলা পড়িয়া আছে—তাহার যা ভাল লাগিবে, মাতার তাহা ভাল না লাগিলে চলিবে কেন?

বিনোদিনী কহিল—“এক কাজ কর না ঠাকুরপো, পিসিমার ঘরে বাংলা শাস্ত্রশতক আছে, অল্প বট রাখিয়া আজ সেইটে পড়িয়া শোনও না! পিসিমারও ভাল লাগিবে, সন্ধ্যাটাও কাটিবে ভাল!”

মহেন্দ্র নিতান্ত কল্পভাবে একবার বিনোদিনীর মুখের দিকে চাহিল। এমন সময় বি আসিয়া খবর দিল, “মা, কারেৎ-ঠাকুরণ আসিয়া তোমার ঘরে বসিয়া আছেন।”

কারেৎ-ঠাকুরণ রাজলক্ষ্মীর অন্তরঙ্গ বন্ধু। সন্ধ্যার পর তাহার সঙ্গে গল্প করিবার প্রলোভন সংবরণ করা রাজলক্ষ্মীর পক্ষে দুঃসাধ্য। তবু বিকে বলিলেন—“কারেৎ-ঠাকুরণকে বল, আজ মহিনের ঘরে আগায় একটু কাজ আছে, কাল তিনি যেন অবশ্য অবস্ত করিয়া আসেন!”

মহেন্দ্র তাড়াতাড়ি কহিল—“কেন মা, তুমি তার সঙ্গে দেখা করিয়াই এস না !”

বিনোদিনী কহিল—“কাজ কি পিসি-মা, তুমি এখানে থাক, আমি বরফ কাঠে-ঠাকরণের কাছে গিয়া বসি পে !”

রাজলক্ষ্মী প্রলোভন সংবরণ করিতে না পারিয়া কহিলেন—“বউ, তুমি ততক্ষণ এখানে বস—দেখি যদি কাঠে-ঠাকরণকে বিদায় করিয়া আসিতে পারি। তোমরা পড়া আরম্ভ করিও না—আমার ক্ষত অপেক্ষা করিয়ো না !”

রাজলক্ষ্মী ঘরের বাহির হইবারাত্র মহেন্দ্র আর থাকিতে পারিল না—বলিয়া উঠিল, “কেন তুমি আমাকে ইচ্ছা করিয়া এমন করিয়া বিভ্রামিভি পৌড়ন কর ?”

বিনোদিনী ঘেন্না-চর্গা হইয়া কহিল—“সে কি ভাই ? আমি তোমাকে পৌড়ন কি করিলাম ? তবে কি তোমার ঘরে আসা আমার দোষ হইয়াছে ? কাজ নাই, আমি বাই !”—বলিয়া বিমর্ষন্থে উঠিবার উপক্রম করিল।

মহেন্দ্র তাহার হাত ধরিয়া কেলিয়া কহিল, “অমন করিয়াই ত তুমি আমাকে বন্ধ কর !”

বিনোদিনী কহিল—“ইস্ আমার বে একতজ, তাহা ত আমি জানিচাম না ! তোমারও ত প্রাণ কঠিন কম নয়, অনেক সহ্য করিতে পার ! খুব বে ঝগুসিয়া পুড়িয়া গেছ, চেহারা দেখিয়া তাহা কিছু বুঝিবার জো নাই !”

মহেন্দ্র কহিল, “চেহারা কি বুঝিবে !”

—বলিয়া বিনোদিনীর হাত বলপূর্বক গইয়া নিজের বুকের উপর ঢাপিয়া ধরিল।

বিনোদিনী “উঃ” বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিতেই মহেন্দ্র তাড়াতাড়ি হাত ছাড়িয়া দিয়া কহিল, “বাগিল কি ?”

দেখিল, কাণ বিনোদিনীর হাতের খোঁচাটা কাটিয়া গিয়াছিল, সেইখান দিয়া আবার রক্ত পড়িতে লাগিল। মহেন্দ্র অল্পতপ্ত হইয়া কহিল, “আমি তুলিয়া গিয়া-ছিলাম—ভারি অজ্ঞান করিয়াছি। আজ কিন্তু এখন তোমার ও কাণগাটা বাঁধিয়া ওখু লাগাইয়া দিব—কিছুতেই ভাড়িব না।”

বিনোদিনী কহিল—“না, ও কিছুই না। আমি ওখু দিব না।”

মহেন্দ্র কহিল—“কেন দিবে না ?”

বিনোদিনী কহিল—“কেন আবার কি ? তোমার আর ভাক্তারী করিতে হইবে না, ও যেমন আছে থাক !”

মহেন্দ্র বৃহত্তর মনো-গভীর হইয়া গেল—মনে মনে কহিল—“কিছুই বুঝিবার জো নাই ! জীলে!কের মন !”

বিনোদিনী উঠিল। অভিমাত্রী মহেন্দ্র বাধা না দিয়া কহিল, “কোথার বাইতেছ ?”

বিনোদিনী কহিল, “কাজ আছে !”—বলিয়া দীরপদে চলিয়া গেল।

মিনিটখানেক বসিয়াই মহেন্দ্র বিনোদিনীকে কিরাইয়া আনিবার অস্ত্র ক্রান্ত উঠিয়া পড়িল;—সিঁড়ির কাছে পর্দাখান দিয়াই কিরিয়া আসিয়া একলা ছাদে বেড়াইতে লাগিল।

বিনোদিনী অহরহ আকর্ষণ ও কষ্টে, অথচ বিনোদিনী একদৃষ্ট তাঁড়ে আসিতে ও

যেহ না। অত্রে তাহাকে জ্বিনিতে পারে না, এ গর্গ মহেশ্বরের ছিল, তাহা সে সন্ততি বিনশ্চন্দ্র দিরাছে,—কিন্তু সে চেষ্টা করিলেই মৃতকে জ্বিনিতে পারে, এ গর্গ-চুইও কি রাধিতে পারিবে না? আজ সে হার মানিল, অথচ হার মানাইতে পারিল না! কদম্বক্ষেত্রে মহেশ্বরের মাথ? বড় উজ্জ্বল ছিল—সে কাহাকেও আপনায় সম-কক্ষ বলিয়া জানিত না—আজ সেইখানেই তাহাকে ধূলার মাথা লুটাইতে হইল! যে প্রেততা হারাষ্টল, তাহার বদলে কিছু পাইলও না! তিস্তকের মত রক্তবায়ের সম্মুখে সন্ধ্যার সময় রক্তহস্তে পথে গাড়াইয়া থাকিতে হইল!

কাম্বন-চৈত্র-মাসে বিহারীদের জমিদারি হইতে শর্বে কুলের মধু আসিত, প্রত্ন-বংশই সে তাহা রাজলক্ষ্মীকে পাঠাইয়া দিত—এবারও পাঠাইয়া দিল।

বিনোদিনী মধুভাত লইয়া বয়ঃ রাজ-লক্ষ্মীর কাছে গিয়া কহিল—“পিসিমা, বিহারি-ঠাকুরপো মধু পাঠাইয়াছেন।”

রাজলক্ষ্মী তাহা ভাঁড়ারে তুলিয়া রাখিতে উপদেশ দিলেন। বিনোদিনী মধু তুলিয়া আসিয়া রাজলক্ষ্মীর কাছে বসিল—কহিল, “বিহারি-ঠাকুরপো কখনো তোমাদের তথ্য লইতে ভোলেন না। যেচরার নিজের মা নাই না কি, তাই তোমাকেই মার মত দেখেন।”

বিহারীকে রাজলক্ষ্মী এমনি মহেশ্বরের ছায়া বলিয়া জানিতেন যে, তাহার কথা তিনি বিশেষ কিছু ভাবিতেন না—সে তাঁহাদের বিনা মূল্যে, বিনা যত্নে, বিনা চিন্তায়

অমূল্য লোক ছিল। বিনোদিনী যখন রাজলক্ষ্মীকে মাতৃহীন বিহারীর মাতৃবানীয়া বলিয়া উল্লেখ করিল, তখন রাজলক্ষ্মীর মাতৃ-জ্বর অকস্মাতঃ স্পন্দ করিল। হঠাৎ মনে হইল,—‘তা বটে, বিহারীর মা নাই এবং আনাকেই সে মার মত দেখে।’ মনে পড়িল, রোগে তাপে সঘটে বিহারী বরাবর বিনা আত্মানে—বিনা আত্মবরে তাঁহাকে নিঃশব্দ নিষ্ঠার সহিত সেবা করিয়াছে; রাজলক্ষ্মী তাহা নিখাস প্রদানের মত সহজে গ্রহণ করিয়াছেন এবং সেজন্য কাহারো কাছে কৃতজ্ঞ হওয়ার কথা তাঁহার মনেও উদয় হয় নাই। কিন্তু বিহারীর খোঁজবয়র কে রাখিয়াছে? যখন অন্নপূর্ণা ছিলেন, তিনি রাধিতেন বটে—রাজলক্ষ্মী ভাবিতেন, ‘বিহারীকে বশে রাখিবার জন্য অন্নপূর্ণা দেহের আত্মবর করিতেছেন।’

রাজলক্ষ্মী আজ নিখাস ফেলিয়া কহিলেন—“বিহারী আনার আপন ছেলের মতই বটে!”

বলিয়াই মনে উদয় হইল, বিহারী তাঁহার আপন ছেলের চেয়ে চেয়ে বেশি করে—এবং কখনো বিশেষ কিছু প্রতিদান না পাইয়াও তাঁহাদের প্রতি, সে তত্ব কিয়ৎ রাখিয়াছে। ইহা ভাবিয়া তাঁহার অন্তরের দহা হইতে দীর্ঘনিশ্বাস পড়িল।

বিনোদিনী কহিল—“বিহারি-ঠাকুরপো, তোমার হাতের রান্না খাইতে বড় ভাল-বাসেন।”

রাজলক্ষ্মী সম্বোধন করিলেন, “আর কারো মাছের ঝোল তাগার মূখে যোচে না।” বলিতে বলিতে মনে পড়িল, অনেকদিন

বিহারী আসে নাই। কহিলেন, “আজ্ঞা বউ, বিহারীকে আজকাল দেখিতে পাই না কেন ?”

বিনোদিনী কহিল—“আমিও ত তাই ভাবিতেছিলাম পিসিমা। তা, তোমার ছেলেটি বিবাহের পর হইতে নিজের বউকে লইয়াই এমনি মাতিয়া রহিয়াছে—বন্ধু-বাড়বরা আসিয়া আর কি করিবে বল ?”

কথাটা রাজলক্ষ্মীর অত্যন্ত সন্তোষ বোধ হইল। স্ত্রীকে লইয়া মহেন্দ্র তাহার সমস্ত হিতৈষীনের দূর করিয়াছে ! বিহারীর ত অভিমানে হইতেই পারে—কেন সে আসিবে ! বিহারীকে নিজের দলে পাইয়া তাহার প্রতি রাজলক্ষ্মীর সমবেদনা বাড়িয়া উঠিল। বিহারী যে ছেলেবেলা হইতে একান্ত নিঃস্বার্থভাবে মহেন্দ্রের কত উপকার করিয়াছে, তাহার অন্ত কতবার কত কষ্ট সহ করিয়াছে, সে সমস্ত তিনি বিনোদিনীর কাছে বিবৃত করিয়া বলিতে লাগিলেন—ছেলের উপর তাহার নিজের ঘা' নাগিল, তা' বিহারীর বিবরণদ্বারা সমর্থন করিতে লাগিলেন। ছ'দিন বউকে পাইয়া মহেন্দ্র যদি তাহার চিরকালের বন্ধুকে এমন অনাদর করে, তবে সংসারে স্ত্রীর অস্তিত্ব রহিল কোথায় !

বিনোদিনী কহিল—“কাল রবিবার আছে, তুমি বিহারী-ঠাকুরপোকে নিমন্ত্রণ করিয়া খাওয়াও, তিনি খুসি হইবেন।”

রাজলক্ষ্মী কহিলেন, “ঠিক বলিয়াছ বউ, তা হইলে মহিন্কে ডাকাই, সে বিহারীকে নিমন্ত্রণ করিয়া পাঠাইবে।”

বিনোদিনী। না পিসিমা, তুমি নিজে নিমন্ত্রণ কর !

রাজলক্ষ্মী। আমি কি তোমাদের মত লিখিতে পড়িতে জানি !

বিনোদিনী। তা হোক, তোমার হইয়া না হয় আমিই লিখিয়া দিতেছি।

বিনোদিনী রাজলক্ষ্মীর নাম দিয়া নিজেই নিমন্ত্রণটি লিখিয়া পাঠাইল।

রবিবার-দিন মহেন্দ্রের অত্যন্ত আগ্রহের দিন। পূর্বরাত্রি হইতেই তাহার কলন উদ্ভাস হইয়া উঠিতে থাকে, যদিও এ পর্য্যন্ত তাহার কলনার অঙ্গুরণ কিছুই হয় নাই—তবু রবিবারের ভোজের আগে তাহার চক্ষে মধু-বর্ষণ করিতে লাগিল। জাগ্রত নগরীর সমস্ত কোলাহল তাহার কানে অপক্লপ সঙ্গীতের মত আদিয়া প্রবেশ করিল।

কিন্তু ব্যাপারখানা কি ? মার আজ কোন ব্রত আছে না কি ? অন্যদিনের মত বিনোদিনীর প্রতি গৃহকন্দের ভার দিয়া তিনি ত বিভ্রান্ত করিতেছেন না ! আজ তিনি নিজেই বাস্ত হইয়া বেড়াইতেছেন।

এই হাঙ্গামে দশটা বাজিয়া গেল—ইতি-মধ্যে মহেন্দ্র কোন ছুতার বিনোদিনীর সঙ্গে একমুহূর্ত্ত বিরলে দেখা করিতে পারিল না। বই পড়িতে চেষ্টা করিল, পড়ার কিছুতেই মন বলিল না—খবরের কাগজের একটা অনাবৃত্তক বিভাগনে পনেরো-মিনিট দৃষ্টি আবদ্ধ হইয়া রহিল। আর থাকিতে পারিল না। নীচে গিয়া দেখিল, মা তাহার ঘরের বায়ান্নার একটা তোলা উনানে রাঁধিতে-ছেন এবং বিনোদিনী কটিদেশে দৃঢ় করিয়া আঁচল অড়াইয়া জোপানু দিতে ব্যস্ত।

মহেন্দ্র বিজ্ঞাসা করিল—“আজ তোমাদের ব্যাপারটা কি ? এত মুমুখান যে !”

রাজলক্ষ্মী কহিলেন —“বউ তোমাকে বলে নাই ? আজ যে বিহারীকে নিমন্ত্রণ করিয়াছি !”

বিহারীকে নিমন্ত্রণ ! মহেন্দ্রের সর্বশরীর জলিয়া উঠিল। তৎক্ষণাৎ কহিল—“কিন্তু না, আমি ত থাকিতে পারিব না।”

রাজলক্ষ্মী। কেন ?

মহেন্দ্র। আমার যে বাহিরে যাইতে হইবে।

রাজলক্ষ্মী। যাওয়া-যাওয়া করিয়া যান, বেশি দেখি হইবে না।

মহেন্দ্র। আমার যে বাহিরে নিমন্ত্রণ আছে !

বিনোদিনী মুহূর্ত্তের অন্ত মহেন্দ্রের মুখে কটাক্ষপাত করিয়া কহিল—“নদি নিমন্ত্রণ থাকে, তা হইলে উনি যান্ না পিসিমা ! না হয় আজ বিহারি-ঠাকুরপো একলাই যাইবেন।”

কিন্তু নিভের চাতের বহের রাস্তা মহিন্কে যাওয়াইতে পারিবেন না, ইহা রাজলক্ষ্মীর সহিবে কেন ? তিনি যতই পীড়াপীড়ি করিতে লাগিলেন, মহিন্ ততই বাকিয়া পাড়াইল,—‘অত্যন্ত লজ্জা নিমন্ত্রণ, কিছুতেই কটাইবার জো নাই—বিহারীকে নিমন্ত্রণ করিবার পূর্বে আমার সহিত পরামর্শ করা উচিত ছিল’—ইত্যাদি।

রাস করিয়া মহেন্দ্র এইরূপে মাকে শান্তি দিবার ব্যবস্থা করিল। রাজলক্ষ্মীর সমস্ত উৎসাহ চলিয়া গেল। তাঁহার ইচ্ছা হইল, রাসা ফেলিয়া তিনি চলিয়া যান। বিনোদিনী কহিল, “পিসিমা, তুমি কিছু ভাবিলো না—ঠাকুরপো মুখে আকাশন

করিতেছেন, কিন্তু আজ তাঁহার বাহিরে নিমন্ত্রণে যাওয়া হইতেছে না।”

রাজলক্ষ্মী মাথা নাড়িয়া কহিলেন, “না বাছা, তুমি মহিন্কে জান না, ও বা একবার ঘরে, তা কিছুতেই ছাড়ি না।”

কিন্তু বিনোদিনী মহেন্দ্রকে রাজলক্ষ্মীর চেয়ে কম জানে না, তাহাই প্রমাণ হইল। মহেন্দ্র বুঝিয়াছিল, বিহারীকে বিনোদিনীই নিমন্ত্রণ করাইরাছে। ইহাতে তাহার হৃদয় ঈর্ষার দ্বতই পীড়িত হইতে লাগিল, ততই তাহার পক্ষে ঘুরে যাওয়া কঠিন হইল। বিহারী কি করে, বিনোদিনী কি করে, তাহা না দেখিয়া সে বাঁচিবে কি করিয়া ? দেখিয়া জলিতে হইবে, কিন্তু দেখা-ও চাই !

বিহারী আজ অনেক দিন পরে নিমন্ত্রিত-আত্মীয়ভাবে মহেন্দ্রের অন্তঃপুরে প্রবেশ করিল। বাল্যকাল হইতে যে ঘর তাহার পরিচিত, এবং যেখানে সে ঘরের ছেলের মত অব্যাহিতভাবে প্রবেশ করিয়া ঘোঁরাছা করিয়াছে, তাহার দ্বারের কাছে আসিয়া মুহূর্ত্তের অন্ত সে ধমকিয়া পাড়াইল—একটা অশ্রুতরঙ্গ পলকের মধ্যে উজ্জ্বলিত হইয়া উঠিবার অন্ত তাহার বুকঃকথাটে আঘাত করিল। সেই আঘাত সংবরণ করিয়া লইয়া সে স্নিগ্ধহাস্তে ঘরে প্রবেশ করিয়া লজ্জাস্ত রাজলক্ষ্মীকে প্রণাম করিয়া তাঁহার পারের থুলা লইল। বিহারী যখন সর্বদা বাতায়ন করিত, তখন একদল অতিবাহন তাহাদের প্রথা ছিল না। আজ যেন সে বহুদূর প্রবাস হইতে পুনরায় ঘরে কিরিয়া আসিল। বিহারী প্রণাম করিয়া উঠিবার

সবর রাজলক্ষ্মী সঙ্গেতে তাহার মাথার হস্ত-
স্পর্শ করিলেন ।

রাজলক্ষ্মী আজ নিগূঢ়-সহায়ত্ব-বশত
বিহারীর প্রতি পূর্বের চেয়ে অনেক বেশি
আদর ও বেহে প্রকাশ করিলেন । কহি-
লেন—“ও বেহারি, তুই এতদিন আসিস্
নাই কেন ? আমি যোগ মনে করিতাম,
আজ নিশ্চয় বেহারী আসিবে, কিন্তু তোর
আর দেখা নাই ।”

বিহারী হাসিয়া কহিল—“রোজ আসিলে
ও তোমার বিহারীকে যোগ মনে করিতে
না মা ! মহিন্দা কোথায় ?”

রাজলক্ষ্মী বিমর্ষ হইয়া কহিলেন,
“মহিনের আজ কোথায় নিমন্ত্রণ আছে, সে
আজ কিছুতেই থাকিতে পারিল না ।”

তুনিবামাত্র বিহারীর মনটা বিকল হইয়া
গেল । আশ্রয় প্রাপ্তের শেষ এই পরি-
ণাম ? একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া মন
হইতে সমস্ত বিষাদবাপ উপস্থিতমত
তাড়াইয়া দিবার চেষ্টা করিয়া বিহারী
জিজ্ঞাসা করিল, “আজ কি রাত্রি হইয়াছে
তুনি !”—বলিয়া তাহার নিম্নের প্রিয় ব্যঞ্জন-
গুলির কথা জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল ।
রাজলক্ষ্মীর রন্ধনের দিন বিহারী কিছু
অতিরিক্ত আড়ম্বর করিয়া নিম্নেকে লুচ্
বলিয়া পরিচয় দিত,—আহারলোভুপতা
দেখাইয়া বিহারী মাতৃদয়শালিনী রাজ-
লক্ষ্মীর স্নেহ কাড়িয়া লইত । আজও তাহার
স্বয়ংচিত-ব্যঞ্জন-সবকে বিহারীর অতিমাত্রায়
কৌতুহল দেখিয়া রাজলক্ষ্মী হাসিতে হাসিতে
তাহার লোভাতুর অভিধিকে আশ্বাস
দিলেন ।

এমন সময় মহেন্দ্র আসিয়া বিহারীকে
শুধুস্বরে স্বস্তরমত জিজ্ঞাসা করিল, “কি
বিহারি, কেমন আছ ?”

রাজলক্ষ্মী কহিলেন, “কই মহিন, তুই
তোর নিমন্ত্রণে গেলি না ?”

মহেন্দ্র লজ্জা ঢাকিতে চেষ্টা করিয়া
কহিল—“না, সেটা কাটাইয়া দেওয়া গেছে ।”

মান করিয়া আসিয়া বিনোদিনী যখন
দেখা দিল, তখন বিহারী প্রথমটা কিছুই
বলিতে পারিল না । বিনোদিনী ও
মহেন্দ্রের যে দৃষ্ট সে দেখিয়াছিল, তাহা
তাহার মনে বৃদ্ধিত ছিল ।

বিনোদিনী বিহারীর অনতিদূরে আসিয়া
শুধুস্বরে কহিল—“কি ঠাকুরপো, একেবারে
চিনিতেই পার না নাকি ?”

বিহারী কহিল, “সকলকেই কি চেনা
যায় ?”

বিনোদিনী কহিল—“একটু বিবেচনা
পাকিলেই যায় ।” বলিয়া খবর দিল, “মিসি-
মা, খাবার প্রস্তুত হইয়াছে ।”

মহেন্দ্র-বিহারী থাইতে বসিল ; রাজ-
লক্ষ্মী অদূরে বসিয়া দেখিতে লাগিলেন এবং
বিনোদিনী পরিবেষণ করিতে গেলিল ।

মহেন্দ্রের খাওয়ার মনোযোগ ছিল না,
সে কেবল পরিবেষণে পক্ষপাত লক্ষ্য
করিতে লাগিল । মহেন্দ্রের মনে হইল,
বিহারীকে পরিবেষণ করিয়া বিনোদিনী যেন
একটা বিশেষ স্বপ্ন পাইতেছে । বিহারীর
পাতেই যে বিশেষ করিয়া মাছের মুড়া ও
মহির সর পড়িল, তাহার উত্তম কৈফিয়ৎ
ছিল—মহেন্দ্র ঘরের ভেঁলে, বিহারী নিম-
ন্ত্রিত । কিন্তু মুগ জুড়িয়া নাগিল করিবার

ভাল হেতুবাদ ছিল না বলিয়াই মহেন্দ্র আরো বেশি করিয়া জলিতে লাগিল। অসময়ে বিশেষ সন্ধানে তপ্‌সি-মাছ পাওয়া দিরাহিল, তাহার মধ্যে একটি ভিন্নওয়াল ছিল; সেই মাছটি বিনোদিনী বিহারীর পাতে দিতে গেলে বিহারী কহিল—“না, না, মহিন্দ্রাকে যাও, মহিন্দ্রা ভালবাসে।”—মহেন্দ্র তীব্র অভিমানে বলিয়া উঠিল—“না, না, আমি চাই না।” গুনিয়া বিনোদিনী দ্বিতীয়বার অহরোধমাত্র না করিয়া সে মাছ বিহারীর পাতে ফেলিয়া দিল।

আহারান্তে দুই বন্ধু উঠিয়া ঘরের বাহিরে আসিলে বিনোদিনী তাড়াতাড়ি আসিয়া কহিল—“বিহারি-ঠাকুরপো, এবমি ঘাইয়ো না, উপরের ঘরে একটু বসিবে চল।”

বিহারী কহিল, “তুমি খাটতে খাটবে না।”

বিনোদিনী কহিল,—“না, আর একা দলী।”

নিষ্ঠুর বিজ্ঞপের একটি হুঙ্গ হস্তরেখা বিহারীর গটপ্রান্তে দেখা দিল—তাহার অর্থ এই যে, একাদশী করা-ও আছে! অশ্রুভানের ক্রটি নাট!

সেই হাঙ্গের আভাসটুকু বিনোদিনীর দৃষ্টি এড়ায় নাই—তবু সে যেমন তাহার হস্তের কাটা বা সঙ্ক করিয়াছিল, তেমনি করিয়া ইহাও সঙ্ক করিল। নিতান্ত মিনতির ঘরে কহিল—“আমার মাথা যাও, একবার বসিবে চল।”

মহেন্দ্র হঠাৎ অসমতভাবে উত্তেজিত হইয়া বলিয়া উঠিল—“তোনাথের কিছুট ত বিবেচনা নাই—কাজ থাক্‌ কন্ড থাক্‌,

ইচ্ছা থাক্‌ বা না থাক্‌, তবু বসিতেই হইবে! এক অধিক আঘরের আমি ও কোন মানে বুঝিতে পারি না।”

বিনোদিনী উচ্ছ্বাস করিয়া উঠিল—কহিল, বিহারি-ঠাকুরপো, শোন একবার, তোমার মহিন্দ্রার কথা শোন! আঘরের মানে আঘর, অভিধানে তাহার আর কোন দ্বিতীয় মানে লেখে না। (মহেন্দ্রের প্রতি) “গাই বল ঠাকুরপো, অধিক আঘরের মানে শিওকাল হইতে তুমি বত পরিষ্কার বোঝ, এমন আর কেহ বোঝে না।”

বিহারী কহিল, “মহিন্দ্রা একটা কথা আছে, একবার গুনিয়া যাও!”—বলিয়া বিহারী বিনোদিনীকে কোন বিবাসসম্ভাষণ না করিয়া মহেন্দ্রকে লইয়া বাহিরে গেল। বিনোদিনী বারান্দার রেলিং ধরিয়া চুপ করিয়া পাড়াইয়া শূন্য উঠানের শূন্যতার দিকে তাকাইয়া রহিল।

বিহারী বাহিরে আসিয়া কহিল, “মহিন্দ্রা, আমি জানিতে চাই, এখানেই কি আমা-ঘের বন্ধু শেষ হইল?”

মহেন্দ্রের বৃকের ভিতর তখন জলিতছিল, বিনোদিনীর পরিহাস-হাস্ত বিছাৎ-শিখার মত তাহার মস্তকের এক প্রান্ত হইতে আর এক প্রান্ত বারংবার কিরিয়া কিরিয়া বিঁধিতেছিল—সে কহিল, “মিট্‌ম্যাট্‌ হইলে তোমার তাহাতে বিশেষ সুবিধা হইতে পারে, কিন্তু আমার কাছে তাহা প্রার্থনীর বোধ হয় না। আমার সংসারের মধ্যে আমি বাহিরের লোক ঢুকাইতে চাই না—অন্তঃপুরকে আমি অন্তঃপুর রাখিতে চাই।”

বিহারী কিছু না বলিয়া চলিয়া গেল । ২ না—তাহার পরে বিনোদিনীর সহিত সাক্ষা-
ইর্ষানন্দ্রর যত্নে একবার প্রতিজ্ঞা তের প্রত্যাশার ঘরে-বাহিরে, উপরে-নীচে
করিল—বিনোদিনীর সঙ্গে দেখা করিব ছট্‌কট্‌ করিয়া বেড়াইতে লাগিল ।

ক্রমশঃ ।

কয়েকখানি প্রাচীন বাংলা ব্যাকরণ ।



১৭৭৮ খ্রীষ্টাব্দে হালহেড্-সাহেব বাংলা-
ভাষার সর্বপ্রথম একখানি ব্যাকরণ প্রণ-
য়ন করেন । চাল'স উইলকিন্স-সাহেব
এই সময়ের বহুতে জুড়িয়া ও চালিয়া এক-
সেট বাংলা অক্ষর প্রস্তুত করিয়াছিলেন,
সেই অক্ষর দ্বারা তাঁহার বহু হালহেড্-
সাহেবের ব্যাকরণ হগলীতে মুদ্রিত
হইয়াছিল । এই ব্যাকরণের ভূমিকার
শেষে একটি অমৃত বিজ্ঞাপন দৃষ্ট হয় ;—
“বিজ্ঞাপন—এতদ্বারা এই অমুরোধ করা
বাইতেছে যে, এই পুস্তক যেন গ্রীষ্মকাল
আরম্ভ না হইলে বাইত্তি করিতে না
দেওয়া হয়, যেহেতুক ইহার অধিকাংশ
বর্ষাকালে ছাপা হইয়াছে ।”

এই পুস্তকখানিকে ঠিক ব্যাকরণ-সংজ্ঞা

দেওয়া সম্ভব কি না বলা যায় না ; তাহা-
হয়-সম্বলনের কিছু চেষ্টা ইহাতে না আছে,
এমন নহে ; কিন্তু তাহা বড় অসম্পূর্ণ ।
পুস্তকখানির অনেকাংশ জুড়িয়া বাংলা শব্দ
ও রচনার ইংরেজী অমুবাদ প্রদত্ত হইয়াছে,—
আবার বাংলা পাঠীগণিতের অনেক কথা
ইহাতে লিপিবদ্ধ হইয়াছে । এই পুস্তক
কতকটা শিশুবোধকের মত । ব্যাকরণের
নাম দিয়া ইহাতে বাঙলাভাষাসম্বন্ধে অনেক
কথাই আলোচনা করা হইয়াছে ।

হালহেড্-সাহেব পুস্তকখানির একটি
দীর্ঘ ভূমিকা লিখিয়াছেন, তাহাতে বাংলা-
ভাষার ভাংকালিক-অবস্থা-সম্বন্ধে অনেক
কথা জানা যায় । এই ভূমিকা পাঠে জানা
যায়, বাংলা-ভাষার সেই সময় বন্ধবশের

• ADVERTISEMENT.

It is recommended not to bind this book till the setting in of the dry season as the greatest part has been printed during the rains."

সমস্ত কার্য নিষ্পাদিত হইত। এ দেশের সমস্ত দলিল, পাট্টা, লম্বীকারবারের চিঠিপত্র ও ব্যবতীর্ণ লেখাপড়া, আড়ঙ্গুলির হিসাবপত্র, বন্ধুবাচকের নিকট পত্রাদি, সমস্তই বাংলা-ভাষায় লিখিত হইত। বড় বড় জমিদারবর্গের মধ্যেও অতি অল্পসংখ্যক ব্যক্তিই পার্শী কি আরবীতে অধিকার ছিল; বহিঃ কাৰিদের বিচারগৃহে পার্শীর চর্চা হইত, তথাপি পার্শী দলিলপত্রের একটা বাংলা অমুবাদ দেওয়া অপরিহার্য ছিল,—প্রত্যেক বিচারালয়েই বাংলা-অমুবাদক (মতরজম্) নিযুক্ত থাকিতেন এবং সাধারণের অবগতির জন্য যে সকল পার্শী বিজ্ঞাপন প্রচারিত হইত, তাহার সকলগুলির সঙ্গে সঙ্গেই একটা বাংলা অমুবাদ দেওয়া আবশ্যক হইত। জমিদারগণ প্রজাধিপত্যকে বাংলাভাষায় লিখিত দলিলপত্র প্রদান করিতেন।

সুতরাং মনে হইতে পারে, ইংরেজ-বিপ্লবের আগমনের পূর্বেই বাংলা গদ্য এতাদৃশ বিকৃত প্রচারবার্য বিশেষ-পুষ্টিলাভ করিয়াছিল। কিন্তু তাহা হয় নাই। যে ভাষাকে চালহেড্-নাহেব বাংলা-ভাষা-সংজ্ঞার অভিহিত করিয়াছেন, তাহা প্রকৃতপক্ষে কি প্রকারের সামগ্রী, তাহা সর্বদা মন্তব্য পাঠেই অবগত হওয়া যায়;—“বে

সকল ব্যক্তি বাঙলা জিয়াবাচক শব্দের সঙ্গে সর্কালেক্। বেই আরবী কি পার্শী নাম-লক্ষ ব্যবহার করিয়া থাকেন, তাহাদের বাংলাই বিশেষ প্রশংসনীয় বলিয়া পরিচিত।”^১ পাঠকগণ সাবেকী দলিলপত্র অনেকই দেখিয়া থাকিবেন, চালহেড্-নাহেব নিম্নলিখিত দলিলট উদ্ধৃত করিয়া বাংলাভাষায় স্বরূপের পরিচয় দিয়াছেন—

“ ৭ + জিয়াম।

গবিবনে ওক শোলামত—

আমার জমিদারি পরগনে কাকভোন তাহার দুই গ্রাম দরিয়া নীকতি হইয়াছে। সেই দুই গ্রাম পরগী হইয়াছে চাক্লে এক-বরপুয়ের শ্রীরেক্তক চৌধুরী আকবার অবরদত্তী দখল করিয়া ভোগ করিতেছে আমি মালজুমদারি শরবরাহতে মারা পড়িতেছি উমেদওয়ার যে শরকার হইতে এক আমিন ও এক চোপদার শরজমিনতে পহচিয়া ভোরফেলকে তলব দিয়া লইয়া আদালত করিয়া হক দেলোয়া দেন ইতি সন ১১৮৫ সাল তারিখ ১১ আবেণ। কিম্বি
অপতবির বার”

ব্রাহ্মণপণ্ডিতগণ এই বাংলাকে অবজ্ঞা করিতেন; বাহার্য যখনশুই সমস্ত ভ্রবাই পরিহার্য করিতেন, তাহার্য যে এক্সপ বাংলায় প্রতি স্থগা ও উপেক্ষা প্রদর্শন

* “And at present those persons are thought to speak this compound idiom with the most elegance who mix with pure Indian verbs the greatest number of Persian and Arabic nouns.”

+ এই “৭” কের প্রয়োগ করা হইত, তাহা রাজা রামমোহন রায় বাণ্যো করিয়াছেন—“পত্রাদির উপরিভাগে (৭) এই সর্ব সংখ্যার অর্থ বাহার্য বার্য ওওকার লাম্বুতে বর্ণনাকে বোঝে হয়, নিম্নলিখিত ভাষাকে কেহ ক্রম লিপিতে থাকেন।”

করিবেন, তাহাতে আশ্চর্যের বিষয় কিছুই নাই । হালহেড্-নাহেব লিখিয়াছেন—
 “কিন্তু ব্রাহ্মণবর্গ এবং অপরাপর সুশিক্ষিত হিন্দু, তাহার সরকারী উক্তনবদ্য প্রাপ্তির আকাঙ্ক্ষার নিকট তাত্ত্বিকতা বিসর্জন দেন নাই, তাহার্য এখনও একান্ত অসুযোগ ও বিশ্বাসের সহিত তাহাদের প্রাচীনভাষারই (সংস্কৃতের) চর্চা করিয়া থাকেন ।” * বাংলা-গদ্য-সম্বন্ধে হালহেড্-নাহেব লিখিয়াছেন,—
 “খুদিভাইভিসের পূর্বে গ্রীকভাষার যে অবস্থা ছিল, এখন বাংলাভাষার কতক-পরিমাণে সেইরূপ অবস্থা দৃষ্ট হয় । যদিও বৈয়াকরণিক বাণিজ্যাদি ব্যাপার ও সরকারী কার্যের জন্য বাংলা-পদ্য সর্বদা ব্যবহৃত দৃষ্ট হয়, তথাপি দর্শ, ইতিহাস কিংবা নীতি সম্বন্ধীয় কোন গুরুতর বিষয়ে কিছু লিখিতে হইলেই বাঙালীরা পদ্যেব আশ্রয় গ্রহণ করিয়া থাকেন ।” †

বাঙালীরা যে ভাবে পূর্বে লেখনী পরিচালনা করিতেন. এখন সে দৃষ্ট আর মূলত নহে । প্রাচীন লেখকসমূহের যে অদ্ভুত ভঙ্গি এখনও নিত্য অপরিচিত হইয়া

গড়ে নাই, কিন্তু বোধ হয় কালে উহা সম্পূর্ণরূপে অবিদ্যমানযোগ্য হইয়া পড়িয়াইবে । হালহেড্-নাহেব অতীব বিষয়ের সহিত বাঙালী লেখকের লেখনীচালনাকার্য লক্ষ্য করিয়াছিলেন । “তাহারা যে হস্তে লেখনী ধারণ করেন, সে হস্তে মুষ্টিবদ্ধ থাকে এবং মধ্যম অঙ্গুলীর অগ্রভাগ দ্বারা লেখনীটিকে বুডাঙ্গুলীর তলবেশে ঠেকাইয়া ধরেন । তাহাদের চেয়ার কিংবা টেবিল নাই, সুতরাং তাহাদের লিখবার প্রণালী অদ্ভুত রকমের, তাহারা গুল্ক কিংবা জাহুয় নিম্নভাগের উপর ভর দিয়া উপবেশন করেন এবং তাহাদের বামহস্ত ডেস্কের কাছ করে, কারণ লিখবার কাগজখানি সেই হস্তের উপর বসিত হয় ।” ‡

ডোডো-পক্ষীর স্তায় এই লেখকের মূর্তিও যে ধরাপৃষ্ঠে ক্রমশ অতীব হস্তাপা হইয়া পড়িতেছে, তাহার আব সন্দেহ নাই ।

নাহেব বাংলা লিখিতে যে কষ্ট পাইয়াছিলেন, তাহাও বিশেষভাবে উল্লেখ করিয়াছেন ; প্রথমত কোন ব্রাহ্মণই তাহাকে বাংলা লিখাইতে সম্মত হন নাই, বহুকষ্টে

* “But the Brahmins and all other well-educated Jentoos, whose ambition has not overpowered their principles, still adhere with a certain conscientious tenacity to their primeval tongue.”

† I might observe that Bengal is at present in the same state with Greece before Thucydides, when poetry was the only style to which authors applied themselves and studied prose was utterly unknown. Letters of business, petitions and public notifications &c. are necessarily and of course written in prose, but all compositions dedicated to religion, history and morality are in poetry.

‡ They write with the hand closed in which they hold the pen pressing it against the ball of the thumb with the tip of the middle finger. As they have neither chairs nor tables their posture in writing is very different from ours. They sit upon their heels or sometimes upon their huns, left hand serves as a desk whereupon to lay the paper on which they write.

স্বয়ং সঙ্কলন করিয়া যোজক, পার্থক্যহতক, সম্বন্ধহতক, হেতুবোধক, ভাববোধক অথবা লক্ষণগুলির শ্রেণিবিভাগ করিয়াছেন। বহু-বিশেষণ, প্রত্যাহার বিশেষণ প্রভৃতিসকল বিবৃতি বর্ণনা আছে। ক্রিয়াগুলির কাল-বিচার করিতে সিয়াযোগ্য বর্তমান, বর্তমান-সামীপ্যভূত বিহিত বর্তমান প্রকৃতির উল্লেখ ও উদাহরণ সঙ্কলিত হইয়াছে। বলা বাহুল্য, সংকলনভিত্তিক নিকট এই পুস্তক-খানি একটি চূর্ণকোষ প্রবেশিকার ন্যায় বোধ হইবে। নামশব্দের বিভক্তি-নির্ণয় ও ক্রিয়ার রূপান্তর সংক্রমে বৈয়াকরণন্যায়ের স্বাধীনভাবে বাংলার জনা হু'একটি স্বয়ং সঙ্কলনের চেষ্টা করিয়াছিলেন, তাহা নিতান্ত অসম্পূর্ণ। তথাপি এই প্রাচীন পুঁথিখানি যত্নের সহিত রক্ষিত হইয়া প্রকাশিত হইলে ভাল হয়। বাংলাভাষার ভাষাতত্ত্বসম্বন্ধে এহু লিখিতে হইলে এই পুঁথিখানি হইতে কিছু-না-কিছু সাহায্য পাওয়া যাইবে।

রাজা রামমোহন রায়ের বিলাতবাস্ত্রের অব্যবহিত পূর্বে ফুল-বুদ্-সোসাইটি তাঁহাকে একখানি বাংলা ব্যাকরণ প্রণয়ন করিতে অনুরোধ করেন। তখন তিনি বিলাত-বাস্ত্রের উল্লোকে বাত ছিলেন, হুতব্রা-অতি তাড়াতাড়ি একখানি ব্যাকরণ লিখিয়া শুদ্ধ ক্রিয়ার ভাব ফুল-বুদ্-সোসাইটির উপর অর্পণ করিয়া তিনি বিলাতবাস্ত্র করেন। এই পুস্তকখানির ৪টি সংস্করণ প্রকাশিত হয়। প্রথমবারে ১০০০খানি, দ্বিতীয়বারে ৫০০, তৃতীয়বারে ১০০০, চতুর্থবারে ১০০০, এবং পঞ্চমবারে (১৮৫৬ খ্রীষ্টাব্দে) ১৫০০ পুস্তক, মোট

৫০০০ পুস্তক মুদ্রিত হইয়াছিল। বহীখানি ডিমাই ১২শে মার্চ ১০৬ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। আকারে ক্ষুদ্র হইলেও এ কথা নিশ্চিতরূপে বলা যাইতে পারে যে, বাংলাভাষাতত্ত্বের যদি স্বয়ংসঙ্কলনের কোন চেষ্টা হইয়া থাকে, তবে এই পুস্তকখানিতেই তাহার নিদর্শন বিশেষরূপে প্রাপ্ত হওয়া যাইবে। মৌলিকতা, অগ্রদৃষ্টি এবং বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে তাহার স্বয়ং উদ্ভাবনের নিদর্শন এই পুস্তকে যথেষ্ট প্রাপ্ত হওয়া যায়। বাংলাভাষার ব্যাকরণ-প্রণয়ন-কালে এই প্রতিভাশালী মহাজন যেটুকু অস-স্বীকার করিয়াছিলেন, তাহার মূল্য নাই;—বক্তৃৎসবাবুর কথার বলিতে গেলে, “ইহা মুক্তি-ভিক্ষা হইলেও স্ববর্ণের মুক্তি।”

রাজা রামমোহন রায় বাংলাভাষার যে সঙ্কলন করিয়াছিলেন, তাহারি কয়েকটি এতদূর্লভ উল্লেখ করা যাইতেছে। আনন্দের হৃৎগুলি রাজার তাহার না দিয়া অনেকগুলোই সংক্ষেপে আমাদের তাহার লিপিবদ্ধ করিয়াম।

১। কর্তৃকারকে সাধারণত নামশব্দের পরিবর্তন হয় না, যথা—হরিদাস কহিলেন।

২। কিন্তু ক্রিয়া সর্বপুঙ্খ হইলে কখনও কখনও কর্তৃকারকে নামশব্দের অন্ত্যবর্ণের পূর্বে “এ”কার যুক্ত হয়, যথা—বেবে কহিলেন। যোড়ার তাহাকে যারিলেক।

৩। কর্তৃ ছইপ্রকার, যথা—গৌণ ও মুখ্য কর্তৃ। গৌণকর্তৃ অনেকসময়েই “কে” যুক্ত হয়, যথা—হরি বহু ধন হরিদাসকে দিলেন। কিন্তু কখনও কখনও যদি মুখ্য-কর্তৃদত্ত মন্থা নিশ্চিতরূপে ভেদ হয়,

তাহার অন্তেও “কে”বিত্তি সংযুক্ত হইয়া থাকে, যথা—আগন পুরকে আমাকে বেণে ।

৪। অধিকরণের চিহ্ন, “এ”, “র” এবং “এতে” ।

যে সকল নামশব্দের শেষে “আ” থাকে, অধিকরণকারকে তাহাদের উত্তর “তে” কিংবা “র” হয়, যথা—মুত্তিকাতে, মুত্তিকার ।

যে সকল নামশব্দের শেষে “ই”, “ঈ”, “উ”, “ঊ”, “এ”, “ঐ”, “ও”, “ঔ”, এই সকল বর্ণের কোন বর্ণ থাকে, তাহার অন্তে “তে” হয়, যথা—ছুরি, ছুরিতে । হাতী, হাতীতে ।

৫। যদি নামশব্দ হলন্ত কিংবা অকারান্ত হয়, তবে সম্বন্ধবোধের নিমিত্ত তাহার অন্তে “এর” সংযোগ করা হয়, যথা—রামের ঘর, কৃষ্ণের ঘর । এতদ্বিত্ত বর্ণ শব্দের অন্তে থাকিলে তাহার সম্বন্ধবোধের জন্য কেবল রেকের সংযোগ করা যায়, যেমন—রাণার ঘন, বাণীর শব্দ ।

৬। করণকারকের জন্য পূর্ণক নিয়মের আবশ্যক নাই । যদি শব্দ অপ্রাণিবাচক হয়, তবে তদন্তরে অধিকরণের চিহ্ন “তে”র আগম হয়, যথা—ছুরিতে কাটিলেক । অন্যান্য স্থলে “বির্য্য” কিংবা “ঘার্য্য” শব্দের যোগে সিদ্ধ হয় ।

৭। বক্তব্যার মনুষ্যবাচক কিংবা মনুষ্যের গুণবাচক শব্দসকলের বহুবচনে একবচনের রূপ থাকে না, যথা—পণ্ডিত, পণ্ডিতেয়া । কিন্তু বস্তবাচক শব্দের বহুবচি-প্রায়ে একবচনের রূপই থাকে,—শুধু তাহার উত্তরে বহুবচক শব্দের প্রয়োগ হইয়া থাকে, যথা—গোদ, গোদসকল । কিন্তু

যখন গোক, পত্ত ইত্যাদি শব্দ মূৰ্খতা-জ্ঞাপনের জন্য মনুষ্যের প্রতি প্রযুক্ত হয়, তখন বহুবচনে তাহাদের রূপের অভ্রাণ হয়, যথা—গোকরা, গোকদিগকে । বহুব-বাচক শব্দ সময়ে সময়ে মনুষ্যের অন্তেও প্রযুক্ত হইয়া থাকে, যথা—মনুষ্যসকল ।

৮। তুচ্ছতাবোধের জন্য নামশব্দের অন্ত্যবর্ণ পরিবর্তিত হইয়া থাকে, আর সেই পরিবর্তিত অবস্থায় অভ্রান্ত কারকের চিহ্ন বর্তিয়া থাকে, যেমন—রান, তুচ্ছার্থে “রামা”; তৎপর অভ্রান্ত কারকে, “রামাকে,” “রামার,” “রামাতে” ।

হলন্ত শব্দ এবং অকারান্ত শব্দের উত্তর তুচ্ছার্থে “আ” হয়, যথা—রান, রামা ; কৃষ্ণ, কৃষ্ণা । কিন্তু “যে সকল হলন্ত শব্দ এক-প্রথমে উচ্চারিত হয় না, তাহার উত্তর ‘এ’কার আইসে, যেমন—মা-ণিক, মাণিকে, গো-পাল, গোপালে । কিন্তু যে সকল শব্দ শব্দান্তরে মিলিত হয়, এবং তাহার শেষ শব্দে দীর্ঘবর না থাকে, সে সকল শব্দের একপ্রথমে উচ্চারিত শব্দের স্তায় রূপ হইয়া থাকে, যথা—রামধন, রামধনা । আর যে সকল শব্দের অন্তে ই, ঈ থাকে, তাহার পরিবর্তে একার হয়, যেমন—হরি, হরে, কান্ধী—কানে ও কেশে । উকারান্ত শব্দের উকারের স্থানে ওকার হয়, যেমন—শত্ৰু, শস্তো । যে সকল শব্দ আকারান্ত-বরধরবৃত্ত হয় ও তাহার প্রথম অক্ষরে ‘আ’ থাকে, তাহার প্রথম আকারের একারে ও দ্বিতীয়ের ওকারে পরিবর্তন হয়, যেমন—রাধা, রেধো । কিন্তু অভ্রহলে প্রায়ই পরি-বর্তন হয় না, যথা—রাম, জামা, ইত্যাদি ।”

কুত্র পুস্তকখানির আদ্যস্ত এই ভাবে
বাংলাভাষার উপযোগী স্বতন্ত্র ব্যাকরণ
প্রস্তুত করিবার চেষ্টা দৃষ্ট হয়,—ভূঃধের
বিষয়, এই চেষ্টার বিকাশের জন্য তাঁহার
পরে আর কেহ আগ্রহ হন নাই । পরবর্ত্তী
ব্যাকরণগুলি সংস্কৃত-ব্যাকরণের আদর্শে,
তদুপ-অনুবাদে ছাত্রগণের জন্য প্রস্তুত
হইয়াছে । কিন্তু বাংলাভাষাকে বৈজ্ঞা-
নিকের চক্ষে দেখিয়া,—ইহার জন্য সাধারণ
মুত্র সঙ্কলন করা আবশ্যিক হইলেও তদুপ-

যোগ্য প্রতিভাবান ব্যক্তি এ বিষয়ে হৃদ-
ক্ষেপ করিতেছেন না,—ইহা নিতান্ত পরি-
তাপের বিষয় ।

হালি রায়মোহন তাঁর আদ্যন্তর প্রাচীন
বাংলা কবিতাগুলিকে বড় আদরের চক্ষে
দেখিতেন না । আলোচ্য পুস্তকখানির পদ্য-
রচনার অধারে লিখিয়াছেন—“দোহমুদ্রা
না কিতের সুখলা আছে, না দোহমুদ্রার
ভাষাতে কবিতার পারিপাট্য উত্তমরূপ
আছে।”*

ঐন্দ্রিনেশচন্দ্র সেন ।

মানসী ।

ধরা যে তোমার পাব,	কেমনে—কোথায় ?—
সেলিহান দীর্ঘ তৃষা:	মিটাই কেমনে ?
কোন্ রূপে বহরুপী,	ছব্ব-বেলায়—
তোমাতে করিয়া বন্দী,	নিবাই চরণে
অশেষ-বাসনা-উদ্ভি—	সংস্কৃত-জীবনে ?
ধান বল, প্রেম বল,—	নিষ্ফল প্রয়াস !
পাইলেও পাই নাই—	মিটে না তির্যাক ।
চিত্র উপভোগ মেশা—	চিত্র অবেশণে !
অড়রূপে দেখা দিলে,—	গদা কীড়ে গ্রাণ
চেতনার সাড়া পেতে,—	অসুখী যখন,—
বরষ-পরশ-আশে	জ্বলি স্নিগ্ধমাণ ;—
বেহ-প্রাণ ধরি এলে,—	কোথা সে মিলন
তব অঙ্গে প্রতি-অঙ্গ	পাবে পরিভ্রাণ,
গ্রাণ পাবে তব গাণে	নিশ্চিন্ত নির্দাণ ?

ঐপ্রিয়নাথ সেন ।

* প্রথমট পুস্তক পূর্বেই আদ্যন্তর হস্তগত হইয়াছিল কেবল স্থানভাষে এতদিন প্রকাশিত হইয়া
উঠে নাই । ক. প. ১ ।

সার সত্যের আলোচনা ।

—১০৪—

বুদ্ধি, মন এবং প্রাণের

কার্যগত প্রভেদ ।

ডাক্টরের শাস্ত্র-অনুসারে যোগাত্মকের
উৎকর্ষন (survival of the fittest) সৃষ্টির
প্রধান প্রযুক্তি এবং নিয়ামক । আমার
ইচ্ছা হইতেছে, ডাক্টরের ঐ কথাটির উপরে-
উপরে তানিধা না বেড়াইয়া উপর ভিতরে
কি আছে, তাহা একবার চুব দিয়া দেখিতে ;
অতএব দেখা যাক্ : —

যে-কোনো সীমাবদ্ধ বস্তু হউক্ না কেন,
—যেমন তুমি বা আমি—সেই সীমাবদ্ধ ক্ষুদ্র
বস্তুটিকেই সমস্ত জগতের একতম খণ্ড
বলিয়া ধরা যাইতে পারে । কোনো এক
ব্যক্তিকে—যেমন দেবদত্তকে—যদি সমস্ত
জগতের একতম খণ্ড বলিয়া ধরা যায়, তবে
কাজেই পাড়ার যে, দেবদত্তের শরীরের সীমার
বাহিরে জগতের মধ্যে আর আর বস্তু কিছু
পদার্থ আছে, সমস্তের মোট বাধিলে যাহা পাড়ার,
তাহা নিখিল জগতের অত্যন্তম খণ্ড । তবেই
হইতেছে যে, নিখিল জগৎ ছুই খণ্ডে বিভক্ত ;
এক খণ্ড হ'চ্ছে দেবদত্ত নিজে, আর-এক
খণ্ড হ'চ্ছে দেবদত্তের শরীরের সীমার বাহিরে
যেখানে যাহা কিছু আছে, তা-সবার সমষ্টি ।
ত্বপকঙ্কলে বণা যাইতে পারে যে, তুমি
নিজে একজন এবং তোমার শরীরের সীমার

বাহিরে যেখানে বস্তু-কিছু পদার্থ আছে,
সমস্তের সমষ্টি আর-এক জন । তোমার
দুইজন প্রকৃত-প্রস্তাবে দুই নহ ; পরন্তু
একেরই দুই অপরিহার্য অঙ্গ ;—সে এক
কি ? না, সমস্ত জগৎ । তুমি, এবং তোমা-
ছাড়া জগতে আর যাহা কিছু আছে সমস্ত—
এই দুই ক্ষুদ্র এবং সূচৎ খণ্ড-পদার্থ—যখন
একেরই দুই অপরিহার্য অঙ্গ, তখন দুয়ের
মধ্যে ঐকান্তিক বিচ্ছেদ অসম্ভব—মূতরাং
দুয়ের মধ্যে যোগ অবশ্যস্বাভাবী । এই তো
পাটলায় যোগ । এখন যোগাত্মা কি—
তাহাই ভিজ্ঞাত ।

যে-কোনো সীমাবদ্ধ বস্তু হউক্ না
কেন, তাহার যোগাত্মা বলিতে বুঝায় আর
কিছু না—তাহার নিজের সীমার বাহিরের
বস্তুসকলের সহিত যোগ-ক্ষমতা । তুমি
যদি তোমার পরিবার-বর্গের সহিত—স্বা-
পুত্রবিশেষের সহিত—কৃতবিদ্যা ব্যক্তিগণের
সহিত—বাবসাহী ব্যক্তিগণের সহিত—এক
কথায় সময়ের সহিত যোগে চলিতে পার,
তবে তোমাকে বলিব যোগ্য-চূড়ামণি ।
কিন্তু যোগের পাত্র-ভেদ আছে—সেটা
ভুলিলে চলিবে না । এটা পাত্র-ভেদের
ব্যাপারটি চরাচর সমস্ত লক্ষ্যে ছুড়িয়া

নিরন্তর চণিতভে, হুতরাং ডাকটনের
 ভায় একজন বিচকণ বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতের
 অস্থপক্ষান-চক্রে তাহা গোপন থাকিতে
 পারে না। ডাকটন তাহার নাম দিয়াছেন—
 Natural selection নৈসর্গিক পাত্র-নির্বা-
 চন। চোর-ডাকাত প্রভৃতি যে সকল দুষ্-
 লোক জন-সমাজের যোগ-ভঙ্গ করিতেই
 সর্বদা তৎপর, তাহারা যোগের অস্থপক্ষ
 পাত্র। এইজন্য যে রাজা দুষ্টের সহিত
 যোগযুক্ত হইয়া শিষ্টের মিথ্যাতন করেন, সে
 রাজাকে যোগ্য রাজা বলিতে পারা যায়
 না। ফলেও আমরা সেটী রাজ্যকেই বলি
 যোগ্য রাজ্য, যিনি শিষ্টের সহিত যোগযুক্ত
 হইয়া দুষ্টের দমন করেন। শিষ্টের সহিত
 যোগই প্রকৃত যোগ। “শিষ্ট” কিনা
 শ্রেণিতে—পরিণত (finished—accom-
 plished)। জ্ঞান-শব্দ হইতে যেমন জ্ঞেয়-
 শব্দ এবং জ্ঞাত-শব্দ হইয়াছে, শ্রেণ-শব্দ
 হইতে তেমনি শিবা-শব্দ এবং শিষ্ট-শব্দ
 হইয়াছে। গুরু বাহাকে পরিণত করিয়া
 তুলিতেছেন—পাকাটীয়া তুলিতেছেন—
 finish করিয়া তুলিতেছেন—শ্রেণিত করিয়া
 তুলিতেছেন—তিনিই শিবা; এবং যিনি
 শ্রেণিত হইয়াছেন, তিনিই শিষ্ট। শিষ্ট
 হ'লে finished product of শিক্ষা
 (“শিক্ষা” অর্থাৎ শ্রেণিত হইবার ইচ্ছা বা
 চেষ্টা), এবং প্রকৃতির দ্বারা finished pro-
 duct of nature। প্রকৃতির গতিই শিষ্টের
 দিকে—দুষ্টের দিকে নহে; কেন না, দুষ্টের
 কালে আপনাদের দোষেই আপনারা মারা
 পড়ে। শিষ্টেরাই জনসমাজের যোগবন্ধনের

ভিত্তিমূল; শিষ্টের সহিত যোগই প্রকৃত
 যোগ। কাজেই গাড়াটীতেছে যে, জন-
 সমাজে যিনি যে পরিমাণে শিষ্টদিগের সহিত
 যোগ-ক্ষম, তিনি সেই পরিমাণে যোগ্য ব্যক্তি।
 কিন্তু তাহার মধ্যে একটি কথা আছে :—
 কথার বলে, “ঠক বাড়িতে গা উজাড়”।
 ফলেও এইরূপ দেখিতে পাওয়া যায় যে,
 জন-সমাজে কেহ বা বেশী দুষ্টি, কেহ বা কম
 দুষ্টি; কেহ বা কম শিষ্ট, কেহ বা বেশী শিষ্ট;
 তা বটে, একেবারেই পরম শিষ্ট কোথাও
 খুঁজিয়া পাওয়া যাউতে পারে না; এক
 কণার—দুষ্টি এবং শিষ্টের মধ্যে অলক্ষ্যনীয়
 প্রান্তরের ব্যবধান নাট; ব্যবধান না থাকি-
 যারই কথা; যেহেতু শিষ্ট এবং দুষ্টি—রাম-
 রাবণ—উভয়েই প্রকৃতি-মাতার সন্তান।
 এমন কি, রাবণ না থাকিলে রামারণই
 হইতে পারিত না। দুষ্টি এবং শিষ্ট দুয়ের
 মধ্যে যদি অলক্ষ্যনীয় প্রান্তর থাকিত,
 তবে চৈতন্য-মহাপ্রভু জগাট-মাধাইকে শিষ্ট
 করিয়া তুলিতে পারিতেন না। যে রাজা
 শিষ্টের সহিত যোগযুক্ত হইয়া দুষ্টের দমন
 করেন, তিনি সুযোগ্য রাজা। তাহাতে আর
 সন্দেহ নাই; কিন্তু তাহা অপেক্ষাও যোগাত্মক
 রাজা যদি থাকেন, তবে তিনি সেই রাজা—
 যিনি তাহা করিয়াই ক্ষান্ত হ'ন না, পরন্তু
 দুষ্টকে আপন সঙ্গুণের দৈবী মায়ার
 প্রভাবে শিষ্ট করিয়া তোলে। জীবের
 গ্রাণ যেমন নির্জীব অল্পকে সজীব রক্ত
 করিয়া তোলে—মহাপুরুষদিগের প্রেম এবং
 দয়া তেমনি অধম পাপীকেও উত্তম সাধু
 করিয়া তোলে। এ সকল আশপাশের

কথা এখন ঘাইতে দেওয়া হো'ক। প্রকৃত বক্তব্য তাহা, তাহা এই যে, নামাবলি বস্তুগণের মধ্যে, যে বস্তু যে পরিমাণে আপন সীমার বাহিরের বস্তুসকলের সহিত যোগে চলিতে পারে, সে বস্তু সেই পরিমাণে যোগা-পন্থের বাহ্য। মোটামুটি সকলেই জানে যে, তরু-লতা অপেক্ষা পত্র-পক্ষী, এবং পত্র-পক্ষী অপেক্ষা মহুবা যোগাতর জীব; কিন্তু সে-প্রকার জানা কাজের কানা নহে। স্ব স্ব নির্দিষ্ট গতির মধ্যে সকলেই তো যোগ্য; তবে কেন একজনকে বলা হয় যোগ্য, আরেক জনকে বলা হয় অযোগ্য? যে যোগ্য, সে কিসে যোগ্য—ইহার একটা ত্রিক-টাক উত্তর দিতে পারা চাই;—তা যদি ভূমি না পার, তা'র, তবুও যদি বল যে, “আমি জানি যে, উদ্ভিদপদার্থে অপেক্ষা অধম-জন্ত এবং অধম-জন্ত অপেক্ষা মহুবা যোগাতর জীব”, তবে সেজন্য জানা বিজ্ঞানের কোনো কার্যে আসিতে পারে না। প্রকৃত কথা এই যে, উদ্ভিদপদার্থ অপেক্ষা মৃচ্ছজীব এবং মৃচ্ছজীব অপেক্ষা মহুবা যে কিসের গুণে অধিকতর যোগ্য, তাহার একটু কন্ট-পাথর আছে; তাহা যদিও দেখিলেই—যে যোগ্য, সে কিসে যোগ্য, তাহা তৎক্ষণাৎ বলা পড়ে। সে কন্ট পাথর যে কি, তাহা বলিতেছি।

সীমাবদ্ধ বস্তু-মাত্রেরই যোগ্যতার অভি-জ্ঞান-চিত্র বা নিদর্শন কি—যদি জিজ্ঞাসা কর, তবে তাহার নিজস্বের সীমাবহিত্ব বস্তুসকলের সহিত তাহার যোগের দৌড় কতদূর পর্য্যন্ত, তাহা একবার ভাব করিয়া ঠাহর করিয়া দেখ। সাধারণ যোগের দৌড়

আপন শরীরের সীমা ছাড়াইয়া যত বেশীদূর যার, সে সেই পরিমাণে অধিকতর যোগ্য। উদ্ভিদপদার্থ-সকলের যোগের দৌড় তাহা-দের শরীরের সীমা-বাসী পদার্থ-সকলেতেই পর্য্যাপ্ত;—তার সাক্ষী—তাহারা তাহাদের মূল-বাসী মৃত্তিকা হইতে রসাকর্ষণ করে, পত্র-বাসী বায়ু হইতে কার্বনাসি অন্ন আহরণ করে, ইত্যাদি। পক্ষ্যাত্মক মৃচ্ছজীবদিগের যোগের দৌড় চলে তাহাদের শরীরের সীমা ছাড়াইয়া; তাহার ঐ-দিকে অনেকদূর পর্য্যাপ্ত। তার সাক্ষী—মোমাত্তিরা পাকে মোটাকে, মধু অন্বেষণ করে সরোবরের পদ্মবনে। এ বিষয়ে, মহুবা এবং নিকট জন্তুবিগের মধ্যে প্রভেদ এই যে, আর আর জীবদিগের যোগের দৌড় বড়ই দূরে প্রসারিত হইক না কেন, তথাপি তাহা নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে অবরুদ্ধ; মহুবার কিন্তু তাহা নহে; মহুবার যোগের দৌড় কোনোপ্রকার প্রাচীরের অবরোধ মানে না; মহুবার যোগের দৌড় আকাশ-পাতাল-বাসী সমগ্র সত্তা প্রধাবিত হয়; মহুবা সমগ্র আশ্বার সমাকৃতি চরিতার্থতা চায়; তাহারই জন্য “সার সত্যের আলোচনা”। সার সত্যের আলোচনা পত্র-পক্ষীদিগের অধিকার-বহিত্ব।

এখন দেখিতে হইবে এই যে, উদ্ভিদ-পদার্থ-সকলের যোগের নিদান তাহাদের প্রাণ; মৃচ্ছ-জন্তুবিগের যোগের নিদান তাহা-দের মন; মহুবার যোগের নিদান তাহার বুদ্ধি। সেই সঙ্গে আর-একটি দেখিতে হইবে এই যে, প্রাণের বিচরণ-ক্ষেত্র অব্যাক্ত সত্তা; মনের বিচরণ-ক্ষেত্র প্রাণিত্ব।

ভাসিক সত্তা ; বুদ্ধির বিচরণ-ক্ষেত্র বাস্তবিক সত্তা ।

পূর্বে যেমন বলিয়াছি—একটা ত্রিকের কণা উল্লিখিত তাহার পঞ্চাৎ পঞ্চাৎ দশটা ত্রিক সারি বাঁধিয়া আনিয়া হুড়াহুড়ি আরম্ভ করে । বুদ্ধগতা, পণ্ডপকী, মনুষ্য, এই ত্রিকটি বেঁধে ভাক তুলিয়া সম্মুখে ধরিয়া যান হইল, আর অমনি ত্রিকের প্রেী-পরম্পরা—এটির পঞ্চাতে ওটি—ওটির পঞ্চাতে সেটি—দেখা দিতে আরম্ভ করিল । প্রথমে দেখা দিল—তোপ, কর্ণ, জ্ঞান ; তাহার পরে দেখা দিল—প্রাণ, মন, বুদ্ধি ; এখন আবার আরেক ত্রিক আনিয়া উপরিত হুড়াহুড়ি অব্যাক্ত সত্তা, প্রাতিভাসিক সত্তা, বাস্তবিক সত্তা । ত্রিকের ভিত্তির চাকের দ্বা দিলে আর নিস্তার নাই ! প্রাণ, মন এবং বুদ্ধি, তিনের মধ্যে প্রভেদ কিরূপ স্থাপ্যে । অগচ্চ একাত্ম-ভাব কিরূপ সুপূর্ণ, তাহা দেখাইবার জন্য প্রতিজ্ঞাকৃত হইয়া বাহির হইয়াছিলাম, পথের দাক্ষ্যানে ত্রিকের ভিত্তি সানলাইতে না পারিয়া, সে প্রতিজ্ঞা মন হইতে সরিয়া পড়িবার উপক্রম হইয়াছে । নূতন অভ্যা-গত ত্রিকটিকেও সম্বন্ধে করা চাই এবং প্রতি-জ্ঞাত বিষয়টিরও সীমাংসা করা চাই ; দুই কুল রক্ষা করা চাই ; তাহারই এখন চেষ্টা দেখা বাইতেছে ।

অভ্যাগত ত্রিক হ'লে—অব্যাক্ত সত্তা, প্রাতিভাসিক সত্তা, বাস্তবিক সত্তা ; অধি-বাসী ত্রিক হ'লে—প্রাণ, মন, বুদ্ধি । দুয়ের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ রহিয়াছে—তাহা এইরূপ :—
জীবের অভ্যন্তরে কার্য্য করিবার সময়,

প্রাণ কার্য্য করে অব্যাক্ত-ভাবে, মন এবং বুদ্ধি কার্য্য করে ব্যাক্ত-ভাবে । শরীরের ভিতরে প্রাণ একাকী একশত ব্যক্তির কার্য্য করে,—অন্য পরিণাক করে, অঙ্গের নির্ধারণ রক্তে পরিণত করে, রক্ত শোষণ করিয়া তাহাকে বিহা সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ স্যায়ামত করাইয়া লয়—ইত্যাদি-প্রকার কত যে কার্য্য করে, তাহার সংখ্যা নাই ; অথচ সে সমস্ত কার্য্য এমনি অব্যাক্ত-ভাবে নিষ্পাদন করে যে, শরীরের বিনিঃসৃষ্টস্বামী, তিনি তাহা জানিতেও পারেন না । পক্ষা-ত্তরে, মন যখন গোড়ের চাবুক কলিয়া জীবকে সম্মুখস্থিত বিষয়ের প্রতি প্রধাবিত করে, অথবা তরের তাড়া দিয়া সম্মুখস্থিত বিষয় হইতে কিরাইয়া আনে, তখন দুইই সে করে ব্যাক্ত-ভাবে । বুদ্ধির তো কথাই নাই ;—রাঙা যখন বুদ্ধিপূর্বক রাজ-কার্য্য নিষ্পাদন করেন, অথবা সেনাপতি যখন বুদ্ধ-ক্ষেত্রে দ্বাঃ-রচনা করেন, তখন ভূত-ভবিষ্যৎ-বর্তমান তাহাদের চক্ষের সম্মুখে হব্যাক্ত-ভাবে বিরাজ করিতে থাকে । এইরূপ বেধিতে পাওয়া বাইতেছে যে, প্রাণ অব্যাক্ত সত্তার ভিতরে ডুব দিয়া কার্য্য করে ; মন এবং বুদ্ধি উভয়েই ব্যাক্ত সত্তার আলোকে বিনির্গত হইয়া কার্য্য করে । বুদ্ধি এবং মন দুয়েরই কার্য্যের সহিত প্রাণের কার্য্যের ঐ-যেমন প্রভেদ দেখা গেল ; বুদ্ধি এবং মনের আপনাদের কার্য্যের মধ্যেও তেমনই আর-এক দিকে আরেক-প্রকার প্রভেদ আছে—সে প্রভেদটিও বিবেচ্য । সে প্রভেদ এইরূপ ;

মনের নিকটে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে উপস্থিত বিষয়ই বাস্তব হয়; আর, অজ্ঞ-সংস্কার-দ্বারা উপস্থিত বিষয়ের সহিত অস্পষ্টত বিবয়ের যোগ অস্বত্ব হয়। পক্ষান্তরে, বুদ্ধির নিকটে উপস্থিত-এবং-অস্পষ্টত-উভয়-সংবলিত সমগ্র আলোচ্য বিষয় প্রতিভাত হয় এবং (অজ্ঞ-সংস্কার-দ্বয়ে নহে, পরন্তু) বাস্তবিক সত্তার বহন-দ্বয়ে সমস্তের সহিত সমস্তের যোগ অস্বত্ব হয়। বুদ্ধি এবং মনের মধ্যে এট যে কার্যগত প্রভেদ, ইহা একপ্রকার যোগের প্রকার-ভেদ; যথা:—

যোগ দুই-প্রকার—(১) প্রতিযোগ এবং (২) সংযোগ। যোজ্য বস্তুর সহিত তাহার অব্যবহিত-পরবর্তী বস্তুর যে যোগ (যেমন পারস্পর্য্য-দ্বয়ে ক-এর সহিত খ-এর, খ-এর সহিত গ-এর, গ-এর সহিত ঘ-এর যে যোগ), তাহারই নাম প্রতিযোগ; আর যৌলিক-একতা-দ্বয়ে সমস্তের সহিত সমস্তের যে যোগ (যেমন কঙাভা-দ্বয়ে কণ্ঠগব্ধ এই পাঁচটি বর্ণের সকলের সহিত সকলের যোগ), তাহারই নাম সংযোগ। এখন আমি দেখাইতে চাই এই যে, মন প্রতিযোগ-স্তরের ধাক্কার ধাক্কার পম্যাপথে অগ্রগত হয়, বুদ্ধি সংযোগ-দ্বয়ে অগ্রপক্ষ্যৎ বেটন করিয়া পরিশি-পরস্পর্য্য-ক্রমে পম্যাপথে অগ্রগত হয়।

মনে কর, আমি বিদেশে একটা বৃহৎ-পাছশালায় দুই-চারি-দিন-মাত্র বাস করিয়াছি। পরদিন প্রাতঃকালে আমি নগর-পার্শ্বটন করিয়া যখন সেই পাছশালায় যার-দেশে উপনীত হইলাম, তখন কাহাকেও

বেধিতে পাইলাম না—সকলেই খ্যাগ্রহণ উপলক্ষে গলাবানে গিয়াছে। পাছশালায় গ্রাহকের দশদিক্ দিয়া দশটা হুঁড়ি পথ গিয়াছে; কোন্ পথটা আমার ঘরে পৌছিবার পথ, তাহা ঠিক করিতে পারিতেছি না। একদিকের একটা পথ ধরিয়া চলিয়া আর্মীর ঘরে ঘাইবার সিঁড়ি বেধিতে পাইলাম। সিঁড়ি ভাঙিয়া উপরে তো উঠিলাম, কিন্তু আমার বামে একটা এবং আমার ডাহিনে একটা, দুই দিকে দুটো বারাত্তা রহিয়াছে—কোন্টা আমার ঘরের পানের বারাত্তা, তাহা ঠিক করিয়া উঠিতে পারিলাম না। ব্যাকুলভাবে চারিদিক্ নিরীক্ষণ করিতেছি, ইতিমধ্যে বামদিকের বারাত্তার এক কোণে একটা প্রস্তরমূর্তি রহিয়াছে—তাহার প্রতি আমার চক্ষু পড়িল; চক্ষু পড়িবামাত্র আমার মনে হইল যে, আমার ঘরের দ্বারের একপার্শ্বে একটা শ্বেত-প্রস্তরের মূর্তি ইতিপূর্বে যেন আমি দেখিয়াছি। তখন আমি সেট প্রস্তরমূর্তিটির সন্নিধানবর্তী একটি দ্বারে উঁকি দিবামাত্র বেধিতে পাইলাম যে, আমার ঘরের জিনিসপত্র বেধানকার বাহা, সমস্তই ঠিকঠাক সাভানো রহিয়াছে। সিঁড়ি আমাকে বারাত্তার পৌছাইয়া দিল, বারাত্তা আমাকে প্রস্তরমূর্তিতে পৌছাইয়া দিল, প্রস্তরমূর্তি আমাকে ঘরে পৌছাইয়া দিল। ক আমাকে খ-এ পৌছাইয়া দিল, খ আমাকে গ-এ পৌছাইয়া দিল, গ আমাকে ঘ-এ পৌছাইয়া দিল। এইরূপ পূর্ব-পূর্ব-নিরপেক্ষ উত্তরোত্তর ক্রমই মনের ক্রম। “পূর্ব-পূর্ব-নিরপেক্ষ” অর্থাৎ

যখন আমি স্ব-এ পৌঁছানাম, তখন স্ব-এর
প্রতিযোগে আমার মনে গুণ যেমনি আবি-
র্ভূত হইল, ক'রমনি মন হইতে তিরোভূত
হইল। পূর্ববর্তী ক'র আমার মন হইতে
সম্মিমা পলাইল, উত্তরবর্তী গুণ আনিয়া
ভাবার স্থানে জড়িয়া বসিল; ইহারই নাম
পূর্ব-পূর্ব-নিরপেক্ষ উত্তরোত্তর জ্ঞান।
বুদ্ধির ক্রম কিন্তু আর-এক-প্রকার; সে
ক্রমের নাম যেওয়া ঘাটতে পারে—বুদ্ধি-
পূর্বক বিচরণ-পদ্ধতি বা বিচার-পদ্ধতি।
বিচার-পদ্ধতি আর কিছু না—অগ্র-পশ্চাত্তের
সহিত যোগ্য রক; তদ্বিষয় পরপরবর্তী পথে পা-
বাড়ানো। পাশ্চাত্ত্যের যিনি কঠোর, তাহার
মনোবল্যে পাশ্চাত্ত্যের কোথায় কোনও
কোথায় যাইবার কোনও পথ, সমস্তই নপ-
বর্ণনে প্রতিবিম্বিত রহিয়াছে; কাম্বই, তিনি
যখন পাশ্চাত্ত্যের কার্য্যালয় হইতে ভোজন-
লয়ে গমন করেন—তখন সমস্ত পাশ্চাত্ত্যের
সমস্ত-বস্তুর-সহিত সমস্ত-বস্তুর কিরূপ যোগা-
যোগ, তাহা স্পষ্ট উপলব্ধি করিয়া
সমস্তের মধ্যে হইতে একটি সুনির্দিষ্ট পথ
বাছিয়া ল'ন, এবং সেই পথ অবলম্বন করিয়া
গম্যস্থানে উপনীত হ'ন। পাঠশালার
একটি কচি বালককে যদি লিচ্ছাসা করা
যায় যে, গুণের পরে কোন অক্ষর, তবে সে
শুৎকণ্ঠ্য বলিবে য; কিন্তু যদি লিচ্ছাসা
করা যায় যে, ক-বর্ণের চতুর্থ বর্ণ কি? তবে
সে হী করিয়া দাঁড়াইয়া থাকিবে। এতদপ
বে হয়, তাহার কারণ কি? কারণ অতীব
সুস্পষ্ট—বালকটির বুদ্ধি এখনো পরিপূর্ণ
হয় নাই। ক'র বলিলে তাহার মনে স্ব-আসিয়া

পড়ে, স্ব-বলিলে গুণ আসিয়া পড়ে, গুণ বলিলে
য স্ব-আসিয়া পড়ে; প্রথমেই প্রতিযোগে
যিতীয় আসিয়া পড়ে, যিত্তোত্তর প্রতিযোগে
তৃতীয় আসিয়া পড়ে, ইত্যাদি; তাই বই প্রথম,
যিত্তীয়, তৃত্তীয়, চতুর্থ, পঞ্চম, সমস্তের মোট
বাছিয়া যে একটি বর্ণ হয়,—ক-বর্ণ হয়;
আর, য যে নেই ক-বর্ণের চতুর্থ বর্ণ; এতদপ
বুদ্ধিসূচক বিচার একটি কচি-বালকের নিকট
হইতে প্রতাপ। ক'রই পাগলামি। ক'র হইতে
স্ব, স্ব হইতে গু, গ হইতে য, এতদপ করিয়া
মন যখন উপরিভ বিবরণ হইতে অল্পপস্থিত
বিষয়ে প্রাবলি হয়, তখন উপরিভ বিবরণের
ভাবের টানে অল্পপস্থিত বিষয়ের ভাব মনো-
বল্যে আপনা-আপনি আসিয়া পড়ে; আর,
ভাবের পশ্চাতে ভাবের সমাগম দ্বারা ঐক্যে
সংঘটিত হয়, তাহার দার্শনিক নাম ভাবের
অনুবন্ধিতা অর্থাৎ ইংরাজিতে বাহাকে বলে
association of ideas। যথেষ্ট মনো-
বল্যে ভাবের অনুবন্ধিতাই সমস্ত প্রাক্তি-
ভাসিক বৃত্তের মূল উৎস। আগ্রংকালে
নির্দিষ্ট পথ অতিবাহন করিয়া নির্দিষ্ট সময়ে
নির্দিষ্ট ঠিকানায় পৌঁছিতে হয়; যথেষ্টকালে
তাহার কিছুই করিতে হয় না; যথেষ্ট অনুজ্ঞা
হইলে যে-সে পথ দিয়া যেখানে-সেখানে
উত্তীর্ণ হওয়া বাইতে পারে। হইয়াছে
নিকট হইতে রামচন্দ্র যে-দিন অশোক-
বনের সংবাদ শুনিলেন, খুশ সন্তুষ্ট যে, সে-
দিন রাত্রিকালে তিনি যথেষ্টকালে অশোক-
বনে সীতার দর্শন লাভ করিয়া আনন্দে
মূলকিত হইয়াছিলেন; তখন, সমুদ্রে সেতু
বাঁধিবার জন্য তাহার একমুহূর্তও উপায়-

চিত্তা করিয়া কষ্ট পাইতে হয় নাট। এখানে
জাগ্রৎকালের বাস্তবিক সত্য এবং স্বপ্নের
প্রাতিভাসিক সত্য, দুয়ের প্রত্যেক স্পষ্ট ধরা
পড়িতেছে। বাস্তবিক সত্যর স্বাভাবিক বস্তু-
সকলের সংযোগের ব্যবস্থা অতীব সুনির্দিষ্ট ;
তারতম্য হইতে ইংলণ্ডে বাইবার পথ অতীব
সুনির্দিষ্ট ; পৃথিবী হইতে সূর্য্য-চন্দ্র-তারকা
একুটি জ্যোতিষ পদার্থসকলের দূরত্ব অতীব
সুনির্দিষ্ট ; কার্য্য-কারণের পারস্পর্য্য-সুস্থলা
অতীব সুনির্দিষ্ট ; সংযোগ বস্তুসকলের
পরস্পরের সহিত পরস্পরের বাধা-বাধকতা
অতীব সুনির্দিষ্ট। পক্ষাঘ্নে, স্বপ্নের প্রাতি-
ভাসিক স্বাভাবিক দেশকালবচন বৃহৎ-নিকট-
দূরত্বও কোনো ঠিকানা নাই—নিক-
বিনিকেরও কোনো ঠিকানা নাই—কার্য্য-
কারণের যোগাযোগাতারও কোনো ঠিকানা
নাই ; স্বপ্নের প্রাতিভাসিক স্বাভাবিক সবই
সব-দ্বানে সম্ভবে—পক্ষুঃপক্ষ প্রিয়লজ্জন
সম্ভবে, মরুভূমিতে উৎসের উৎসারণ সম্ভবে ;
সব-কার্য্যই সব-কারণে সম্ভবে ; জোনাক-
পোকার মশালে অসংখ্য প্রজাতির হইয়া
উদ্ভিত্তে পারে, ডেক হস্তীকে গিলিয়া খাটতে
পারে। অতএব এটা হিরণ্যে, যে-স্বাভাবিক-
বিক-বিকের ঠিকানা আছে, যে-স্বাভাবিক-
ভিন্ন ভিন্ন বস্তুর মধ্যে দেশের ব্যবধান
সুনির্দিষ্ট ; যে-স্বাভাবিক প্রত্যেক বস্তুর ভিন্ন
ভিন্ন অবস্থার মধ্যে কালের ব্যবধান
সুনির্দিষ্ট ; যে-স্বাভাবিক কাহা-কারণ প্রবাহের
পারস্পর্য্য-ব্যবস্থা সুনির্দিষ্ট ; যে-স্বাভাবিক
বিভিন্ন বস্তুসকলের পরস্পর বাধা-বাধকতা
সুনির্দিষ্ট ; সেট স্বাভাবিক বাস্তবিক সত্যের
স্বাভাবিক ; আর, সেই বাস্তবিক সত্যের স্বাভাবিক

বুদ্ধির বিচরণ-ভূমি। বিচরণ-ভূমি এবং
বিচার-ভূমি—এই দুই শব্দের একই অর্থ। এই
যে বাস্তবিক সত্য—স্বাভাবিক বুদ্ধির বিচার-
ভূমি—তাহা একই অর্থবোধী সত্যের বিশ্ব-
ব্যাপী বহন-সূত্র। হ্রাসোকে, বৃদ্ধোকে, অত-
রীকে, যেখানে বস্তু কিছু বস্তু আছে, সমস্তই
ঐ একই বহন-সূত্রের টানে পরস্পরের সহিত
যোগে বিধৃত রহিয়াছে। পাহাশালার গৃহ-
স্বামী মনোমধ্যে যেমন—পাহাশালার
কোথার কোন্ ঘর, কোথায় কোন্ পথ,
কোথায় কোন্ কাগাশালা, সমস্তই নখদর্পণে
প্রতিবিম্বিত রহিয়াছে ; এক অর্থবোধী সত্যে
সেইরূপ সমস্ত বস্তুর সংযোগ-ব্যবস্থা নখ-
দর্পণে প্রতিবিম্বিত রহিয়াছে ; সে সংযোগ-
ব্যবস্থা যৎপরোনাস্তি সুনির্দিষ্ট এবং পরিপাটী ;
তাহা নিরন্তর বহন ; তাহার একচুলও
এদিক-ওদিক হটবার নহে। শাস্ত্রে যে
বলে—“বুদ্ধি নিশ্চয়াদিক মনোবৃত্তি”, তাহার
অর্থই ঐ। নিশ্চয়াদিক-শব্দের অর্থই
হ'ছে—বাস্তবিক-সত্য-মূলক সংযোগ-ব্যবস্থার
নিশ্চয়ীকরণ তাহার মুখ্যতম কার্য্য। বুদ্ধি
যখন নিশ্চয় করে যে, ইহা মুক্তিকা, ইহা জল,
ইহা বায়ু ইত্যাদি, তখন প্রত্যেক নিশ্চয়-
ক্রিয়ার সঙ্গে এই একটি মৌলিক নিশ্চয়-ক্রিয়া
জোড়া-লাগানো থাকে যে, ইহা বাস্তবিক
পদার্থ। অতএব এটা হিরণ্যে, সত্য-নিশ্চয়ই
গোড়ার নিশ্চয়, প্রথম নিশ্চয়, এবং চরম
নিশ্চয়। পুনশ্চ, শাস্ত্রে বলে যে, মন সংকল্প-
বিকল্পাদিক। সংকল্প-বিকল্প কি ? না, কল্পনা-
বিকল্পনা। ভাবনা-বিভাবনাও তাহারই
নামান্তর। বর্তমান প্রবন্ধের গোড়াতেই
বর্ণিত যে, ভাবন-সকল দু'ধাতু হইতে

হইয়াছে—তাহার অর্থ হওয়ানো। মনো-
মধ্যে ধোর বস্তু হওয়ানো, মনোমধ্যে ধোর
বস্তু পড়িয়া তোলা, মনোমধ্যে ধোর বস্তু
কল্পনা করা, একই কথা। সংকল্প-বিকল্প
আর কিছু না—মনোমধ্যে তাবের তরঙ্গ-
তরঙ্গ। বুদ্ধির সত্তা-নির্ণয় বাস্তবিক-সত্তা-
মূলক-সংযোগ-প্রধান; মনের সংকল্প-বিকল্প
কবিতাজন্মের লঘু-গুরু মাত্রার ভাষা প্রতি-
যোগ-প্রধান; আর সেই প্রতিযোগের মূল
প্রবর্তক হচ্ছে—ভাবের অঙ্গবন্ধিতা (asso-
ciation of ideas)। যত্নে একতর গটনা
কিছুই বিচিত্র নহে যে, এই আনি উদ্ভাসে
বসিয়া লক্ষ্যের কলহর তুলিতেছি, পরস্পরেই
উদ্ভাস অরণ্য-বৃষ্টি ধারণ করিয়া উঠিল এবং
তাহার মধ্য হঠাৎ বর্ণনের গঙ্গন-দর্শন জ্বলা
বাইতে লাগিল। উদ্ভাস ভাঙিয়া গেল,
অরণ্য গঠিত হইয়া উঠিল। এইরূপ ভাঙন-
গড়নই সংকল্প-বিকল্প এবং উভয়ের পরস্পরের
প্রতিযোগিতা।

এইরূপ দেখা বাইতেছে যে, প্রাণ, মন
এবং বুদ্ধির মধ্যে প্রত্যেক পূর্বই স্পষ্ট।
প্রাণের সহিত মনোবুদ্ধির প্রত্যেক এই যে,
প্রাণ অব্যক্ত সত্তার ব্যাপ্ত হইয়াছে—প্রাণের
ব্যাপার-ক্ষেত্র অব্যক্ত সত্তা। মন এবং বুদ্ধি
উভয়েরই ব্যাপার-ক্ষেত্র ব্যক্ত সত্তা। ব্যক্ত
সত্তা আবার দুই থাকে বিতক্ত—(১) প্রাতি-
ভাসিক সত্তা এবং (২) বাস্তবিক সত্তা।
মনের ব্যাপার-ক্ষেত্র প্রাতিভাসিক সত্তা;
বুদ্ধির ব্যাপার-ক্ষেত্র বাস্তবিক সত্তা।
যাহা বাস্তবিক, তাহা আদোষাত্মক সত্তা।
যদিহা বাস্তবিক। একটা কাগজ তাহার

এ-পিট ও-পিট এবং চারিধার, সবটা ধরিয়া
বাস্তবিক-কাগজ। পক্ষান্তরে, ও-পিটের
সহিত লক্ষ্য-বিক্ষিত এ-পিট, এবং ও-পিটের
সহিত লক্ষ্য-বিক্ষিত চারিধার, দুইই
অব্যক্তবিক। “বুদ্ধিতে বাস্তবিক সত্তা
প্রকাশ পায়”, এ কথার অর্থ এই যে,
বুদ্ধিতে আলোচ্য-বিষয়ের কেন্দ্রে হইত
পরিধি পর্যন্ত সবটা একযোগে প্রকাশ
পায়, আর সেই সঙ্গে কেন্দ্র, পরিধি এবং
অগ্রাবলী (radii) প্রকৃতি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের
পরস্পরের মধ্যে কিরূপ সংযোগের ব্যবস্থা,
তাহাও প্রকাশ পায়। পক্ষান্তরে, মন যখন
এ-পিটে ব্যাপ্ত হইয়া, তখন ও-পিটের কোনো
তোয়াকা রাখে না। মন যখন যে-পিটে
ব্যাপ্ত হইয়া, তখন সেই পিটের প্রাতিভাসিক
সত্তাই তাহার নিকটে ব্যক্ত হইয়া। মন
প্রাতিভাসিক সত্তা লইয়া—ঐকান্তিক সত্তা
লইয়া—এক-পিট লইয়া কারবার করে।
এইজন্য মন এ-পিট হইতে ও-পিটে, ও-পিট
হইতে চারিধারে ঘুরিয়া বেড়ায়, ক হইতে খ-এ,
খ হইতে গ-এ ঘুরিয়া বেড়ায়। মন সর্বদাই
ইতরূপ বিকল্প হইয়া; বিকল্প হইবারই
কথা—কেন না, কোনো আংশিক সত্তাই
আপনাতে আপনি পর্যাপ্ত নহে। মন
এলোমেলো ভাবনার তরঙ্গে একরূপ অটোম্যাটিক
তরঙ্গিত হইয়া যে, একমগ্নও তাহাকে
যেখানি না যে, সে নিজ নিকটনে তর-
পুর জমাট বাধিয়া বসিয়া আছে। জমাট
ভাব, সমাহিত ভাব, বা সমাধি,
পরিপক বুদ্ধির লক্ষণ প্রজ্ঞার লক্ষণ।
এক অবিভীর্ণ বাস্তবিক সত্তার বাহিরে

দ্বিতীয় কিছুটাই নাই ; কারণেই, প্রজ্ঞা যখন
কেন্দ্র হইতে পরিধি পর্য্যন্ত সবটা ধরিয়া
সমগ্র বাস্তবিক সত্য ব্যাপ্ত হইবে ; তখন সে-
সত্য হইতে সে যে পদস্থলিত হইয়া তাহার
বাহিরে পড়িয়া যাইবে, তাহার সম্ভাবনা থাকে
না ; কেন না, তাহার বাহিরই নাই, তাহার
বাহিরে পড়িবে কিরূপে ? মন আংশিক
সত্য লইয়া কারবার করে, এইজন্যই তাবের

অশুদ্ধতা (association of ideas)
তাহাকে নাকে নড়ি দিয়া ক হইতে খ-এ,
খ হইতে গ-এ, গ হইতে ঘ-এ ক্রমাগতই
সুন্নাইয়া লটয়া বেড়ায় ।

এই তো গেল, প্রাণ, মন এবং বুদ্ধি, এই
তিনের মধোকার প্রভেদ । তিনের মধো
একান্তভাবে কিরূপ, তাহা ব্যাখ্যার আলো-
চনার অস্তরহিল ।

শ্রীবিজ্ঞাননাথ ঠাকুর ।

সুন্দর ।

—০—

ও গো সুন্দর ! আগিবে যখন
বসন্ত কুতূহলে
ধূল-বাগিত নব পাতবাস
লুটায় ধরদীপ্তলে ।
মলিন-বিকল বধূর চরণে
দুপুর উঠিবে বাজি,
শাখা শাখায় শিহরি উঠিবে
রক্ত অশোকরাজি ।
তুমি এস' নাথি' নির্মল নীল
উজ্জল বেশ' হ'তে,
আমারে লইয়ো আমারে লইয়ো
তুলিয়া তোমার রথে ।

ও গো সুন্দর ! আগিবে যখন
বরষা এলারে কেশ ।
সজল আঁধারে দিন হবে নীন
উদাস নিরুদ্দেশ ।

ধন-নির্ধোবে বরহশব্দনে
 গোপনে কাহিনী হবে,
 ধীর্ঘ বামিনী জাগিয়া আগিয়া
 কাহিনী ক্রান্ত হবে,—
 ওগো স্নানর ! নামিয়ে তখন
 উজ্জল বেশ হ'তে,—
 আমারে লইয়ো আমারে লইয়ো
 তুলিয়া তোমার রথে ।

ওগো স্নানর ! শায়ক-রজনী
 তুচ্ছ শব্দকি বেষে,
 আপনার রূপে দ্বিত-বিস্মিত
 দাঁড়াবে আকাশে এসে ।
 তরুর তলায় করিবে হেলার
 শেকলি-পুষ্প-রাশি,
 অগদ্যদ্বিকা নর-নারী-মুখে
 তুচ্ছবে মধুর হাসি,—
 ওগো স্নানর ! নামিয়ে তখন
 উজ্জল বেশ হ'তে,
 আমার অঙ্গ দুহারে আমারে
 লইয়ো তোমার রথে ।

ঐনরেস্তানার তটচাৰ্য্য ।

কালিকানন্দ ।



কালিকানন্দ ভট্টাচার্য্য নবদীপ-অঞ্চলে বাস করেন। নিষ্ঠাবান্ শাক্ত বলিয়া সর্বত্র তাঁর খ্যাতি; দুর্গোৎসব এবং কালীপূজা বিশেষ সমারোহে তিনি সম্পন্ন করিয়া থাকেন। সকলেই জানেন, বঙ্গীয় বৈষ্ণব-ধর্মের ভিত্তিভূমি শ্রীধাম নবদ্বীপ কোনকালে চৈতন্যধর্মের পক্ষপাতী নহে। এখনও এই মধুর ভাবের নবাহৃত অধুরাগোজ্জ্বলিত দিনে পান্ড্যভা-শিক্ষাগোরব বিস্তৃত হইয়া বঙ্গীয় তত্ত্বগণ যখন পটানন্দনের জন্মভূমি-দর্শনকামনার ছুটিয়া চলিয়াছেন, নবদ্বীপ-বাসী কান্তিকী পূর্ণিমাঃ রাসলীলার মহোৎসব শান্তিপুরে বিদায় দিয়া নিজেরা তত্ত্বোক্ত দশবহাবিধ্যাহুস্তির আরাধনার বিভোর হইয়া আছে। শান্তিপুরের রাসরসিক কৃষ্ণচন্দ্র নবদ্বীপের “পট-পূর্ণিমাঃ” আদৌ আমল পান না। অতএব নিমাই-পণ্ডিত নিজগ্রামে চিহ্নদিন “গেরো বোপী” রহিয়া গেলেন। সেখানকার শিষ্টসমাজে অজ্ঞাত তাঁহার অবতারত্ব বীজিত নহে। সে কথা তনিলে অশিশয়া হইয়া উঠে, এখনও এমন লোকের অসম্ভাব নাই।

কালিকানন্দ ভট্টাচার্য্য তাহারই এক-জন—গৌড়া শাক্ত নামে বণে। বৈষ্ণব-

বৈষ্ণবীনের প্রতি বিবেচকু কখন রাখিয়া-চাকিয়া প্রকাশ করিতে জানেন না। বৈষ্ণব-বাহাদুরীয়া কষ্টা পরিয়া শিখা রাখিয়া খুলির সহায়তায় হরিনাম করে, অথচ কাছা দেয় না, তাঁহার ঢংক এমন চাকরকর বাপার এ বিশ্বত্রকাণ্ডে আর বিভীষ নাট। তথাপি রক্তাক্ষমালা দারণ করিয়া রক্তচন্দনচর্চিত মেহে কালীনামাঙ্কিত নানাবলী গারে নিজে তিনি “জগদম্বা” এবং “ভৃগু ভৃগুভিত্তিহাসিনী”কে ভক্তিগঙ্গালকণ্ঠে যখন ডাকেন, প্রেমাক্রান্তে তাঁহার গন্তবল ভাষিয়া যায়।

বৈষ্ণববিবেচ ভট্টাচার্য্য-নহাশয়ের অস্থি-মক্ষাগত হইলেও তাঁহার নিজকুটুম্বেরা সকলেই গ্রাম বৈষ্ণববংশীয় এবং কাটোয়া-অঞ্চল-বাসী। একমাত্র পুত্র সর্দানন্দকেও বৈষ্ণববংশে বিবাহ দিতে হইয়াছে, কিন্তু ইহাতে তাঁহার হাত ছিল না। সর্দানন্দের যখন ছয়বৎসরমাত্র বয়স, পিতামহ পুরা-তন-কুটুম্ব-গৃহে নিমন্ত্রিত হইয়া বান এবং তিনমাসের একটি টুকুকে মেরেকে প্রাপণে বিভূত ক্ষুদ্রশয্যায় স্থাবাক্রিয়ণে খেলিতে দেখিয়া তাহাকেই “নাত-বউ” করিবেন প্রতিশ্রুত হইয়া আসেন। কাজেই পুত্রীয় কষ্টা মহাশয় আর বচনের পৌত্রকে

ছয়-বৎসরের গোষ্ঠীতে পরিত্যক্ত করিয়া
সুখে গলাগাভ করিতে চাহিলে, পিতৃভক্ত
কালিকানন্দ তাহাতে বাধা দিতে পারেন
নাই ।

সেই বিবাহের পর দ্বাদশবর্ষ উত্তীর্ণ
হইয়া গিয়াছে । সর্দানন্দ ক্যাম্বেল স্ট্রেডি-
কেস হুলে পাস্ করিয়া বেহারে সরকারী
ডাক্তার নিযুক্ত হইরাছেন এবং তাহার পত্নী
যোগমায়, বছর-দুই হইল, স্বামীর সহিত
মিলিত হইয়া প্রবাস-গৃহে একটি পুত্র-
রূপে তাহাকে উপহার দিয়াছেন । ত্রয়ো-
দশ বর্ষে বিয়াগমনের পর একবারমাত্র
বধূমাতা শ্বশুরের ঘর করিয়াছিলেন,
তাহাও বাস-ছয়কের জন্ত । অতএব
সর্দানন্দ শ্বশুর-শাতড়ীর ঐক্যাবন-বাটার
সুযোগ পাইয়া সেই সঙ্গে বধূকে কন্দুতানে
আনাইয়া লগ্নয়ার সস্ত্রীক কালিকানন্দ বড়
অলঙ্কৃত হইরাছিলেন—বউ ঘর করিল না
বলিয়া নবদীপের প্রতিবেশিনীমণ্ডলে দিন-
কতক খুব হাসি-টুটুকারি এবং নিন্দা-
কুংসার ধুম পড়িয়া গেল । তাহাদের মতে
শ্বশুরের বাস্তভিটা-টুকুই গৃহনামের মোগা
এবং বধূ সেইখানে থাকিয়া ঘর-সংসার
করিলেই হইল “ঘর-করা” । স্বামীর সঙ্গে
প্রবাসে বাস, সেটা বোধ করি “বন-করা”—
কেন না, জনকনন্দিনী যে কর বছর বাহিরে-
বাহিরে ছিলেন, তাহার নাম বনবাস !

বেহাই এবং বেহান বে ভীষ্মবাক্যের
পাথে—বিশেষত বৈকবদের চরমভীষ্ম
ঐক্যাবনের পথে বধূমাতাকে সঙ্গে লইয়া
গিয়াছিলেন। ইহাতে কালে ছেলের উপর
রাগ পড়িলেও কালিকানন্দ তাহাদের তিন-

জনের উপর হাড়ে চট্টা রাহিলেন । বছর
দেড় পরে পুত্রের এক বছর পত্রাতাসে পুত্র-
বধুর সম্ভাবিত সম্ভাব্যতা জানিয়া গৃহিণীকে
বলিলেন, “তোমার-আমার সেখানে যাওয়া
হ’তে পারে না । সেই নেড়ানেড়ীর দল
বুন্দাবন থেকে এলে যা হয় করুক !” কিন্তু
মায় মন ইহাতে বুকিবে কেন ? পুত্র না
ওরকে সর্দানন্দের গর্ভধারিণী অনেক সাধা-
সাধনার একাই বেহারে দাইবার অমুমতি
পাইলেন ।—সঙ্গে গেল বামা চাকরানী—সে
ইতিপূর্বে আর কখন গ্রামের বাহির হয়
নাই । শ্বশুর মধো প্রধান শ্বশু গ্রাম্য
বক্তৃতামঞ্চে—যথা, মেয়েদের মনের ঘাটে—
এবং পাড়ার কৌদল বাধিলে তাহার মোড়া
নাই । গ্রামের হুগসিক কাবাচকু-মহাশয়
একদিন সেই বক্তৃত্তা তিনিয়া ব’লিয়াছিলেন—
“বামাসুন্দার, নামটি তোমার দাধা, তাহাতে
অমন কস্তুর মত গোভা পাথ না ! বামা
কিনা অবলা !” তিনিয়া বামা-কৈবর্তানী
ওরকে বামাসুন্দারী দাগী মাথায় কাপড়
টানিয়া দিয়াছিল বটে, কিন্তু অসুর-সাত্রাজীর
মতনই ক্রতঙ্গী করিয়া তাহাকে বাধা শুনা-
ইয়া দিয়াছিল, অম্বর করিয়া বুকিলে তাহার
মানে গাড়াহ—“বামা আর্মি না তুমি ?”

কালিকানন্দ বামার কদর বুঝিতেন ।
এই বামাদাগী এবং পুত্রের প্রেরিত বাতালী
কল্যাণভাগর সঙ্গে তিনি গৃহিণীকে বেহারে
পাঠাইয়া দিলেন ।

ইহার বাস-দুই পরে সবুর মা পৌত্রদুখ
সম্বর্শন করিলেন । তাহার আজ্ঞাপ রাখি-
বার ঠাই রহিল না । বচকীর প্রসববেদনা
আরম্ভ হইতে না হইতে ‘দুগুণা দাইয়েয়া

“সোহর” গাতিতে আরত করিয়া দিখাছিল। তাহার ভিতর সূ-শবন, নন্দ্রাগী ও নন্দ-লালা ছাড়া আর কোন কথা কহা মাকুরাষ্ট্র বড় ভয়ঙ্কর হইতেছিল না। মহা বাস্তবতা ও উদ্বেগের মধ্যে মাঝে-মাঝে কৰ্ত্তাটিকে মনে পড়িতেছিল এবং এত সময়ে সূ-শবনের গান শুনিতে তিনি কেমন পাণে-মুখে চড়াই-তেন, সে মৃত্ত ও তদীয় মানসচক্রে এড়াইতে পারিতেছিল না। বামাহুদী বাই-দের পুরুষোচিত পরণে বস্ত্রপরিধান দেখিয়া প্রথম-প্রথম হাসিয়া লুটাইয়া পড়িত এবং গুইচারিদিনের ভিতর তাহাদের মান-করণ করিয়াছিল—“যেয়ে বরদী।” তাহাদের কীইমাই গান শুনিয়া আজ তাহার জারি হাসি পাষ্টেছিল, কিন্তু বউমার মুখ চাহিয়া সে তাহা সংবরণ করিল। থোকা ভূমিষ্ট হইলে সেট সংসৃষ্ট হস্তগতরার উৎস সে খুলিয়া দিল এবং কপ্তমার নৃতন একটি বয়স্কটিল বলিষ্ঠ শতবার তাহাকে অভি-নন্দন করিল।

সর্দানন্দকে ডাকিয়া মা বলিলেন—“সবু, তাঁকে এখনি চিঠি লেখ বাবা! আমার জ্বানি লেখ যে, এ আমার টাকার হুদ,—বড় মিষ্ট! তিনি যেন শীপুগির একবার আগেন।” সবু লজ্জিত হইয়া কহিল, “আর কাউকে দিখে গেবাও মা, আনি পারবেনা।” পুত্রের সে লজ্জানব্র মুখ দেখিয়া মাতার চক্ষু আনন্দাশ্রুতে পূরিয়া উঠিল।

কিন্তু কৰ্ত্তা ত আদিগেন না। গৃহীণর চিঠিতে বারংবার বেহারে আসার নিময়ণ পাইয়া তাহার উপর পর্য্যন্ত চটয়া গেলেন। একিকে সর্দানন্দ-নন্দন বামাদারীর বিবিধ

পকারের মুখতরী এবং সোহাগে-আহরে হাসিয়া হাসিয়া পিতামহীর ক্রোড়ে শনি-কলার মত বাড়িতে বাড়িতে ছর মাসের হইল। তখন সর্দানন্দ মাতার অমুরোবে ছুটির দরখাস্ত করিল, দেশে গিয়া ছেলের অরপ্রাশন হইবে। গৃহগাত্রার সকল বন্দোবস্ত ঠিক হইয়াছে, এমন সময়ে খবর আসিল, ছুটি মজুৎ ছর নাই। ইহাতে গোসার মুখে সর্দানন্দ চাকরী ছাড়িয়া দেশে গিয়া ডাক্তারি করিয়া বাইবে, অমুপস্থিত সরকার-বাহাদুরকে গুইচারিবার একপ শাপাইয়াছিল বাটে, কিন্তু শেষে আবার ছুটি চাহিলেই পাইবে ভরসা করিয়া গুই-চারিদিনে জল হইয়া গেল। থোকা প্রবাসে ডাক্তারগার ঠাকুরমা আনর করিয়া নাম দিলেন—“ভাকুথোর!” বামা নাম রাখিল, “যেদুয়াবাদী।”

পৌত্রের অরপ্রাশনোপলক্ষে সবারোহ করিবার অভিপ্রায়ে কালিকানন্দ যে-কিছু উন্মোগ করিয়াছিলেন, সর্দানন্দের বিদায়-বিদ্রাটে তাহার সকলই পণ্ড হইয়া গেল। ইহাতে তিনি বড় দুঃখিত হইলেন, কিন্তু ভ্রমেও সন্দেহ করিলেন না যে, ছুটির এই গোলযোগ পুত্র এবং পুত্রবধূর ইচ্ছাকৃত,—একটা বাহানামাত্র। ইহাতে কিন্তু প্রতি-বেশী বিশেষত প্রতিবেশিনীদের মন উটিল না। যোগমায়া এই উপলক্ষে আর এক-বার তাহাদের সমালোচনার অরিপণীকায় পড়িলেন। জাতিকত্তা হাবুর মা কিছু উৎসাহিত হইয়া কালিকানন্দের সমীপ-বর্ত্তিনী হইলেন। বলিলেন—“আর তুনেচো দাদা, গারে ডিতি হ’য়ে গেল কে!”

কালিকানন্দ কিছু মিতভাষা, বিহ্বল বা অদ্ভুত রসের দ্বারা বড় ধারেন না। শ্রিত-মুখে বীরে উত্তর দিগেন—“কি ভগিনি?”

ইহাতে হাবুর মা ওরকে নিপবরী ঠাকুরাণীর করুণরস উড়লিরা উঠিল। বস্ত্রাকালে চক্ষু মুছিয়া কিছু বেগের সহিত তিনি বলিলেন, “আহা দাদা, তোমার হৃৎপুং বেগে আমার বড় হৃৎপুং হয়। চেলে-বউ তারা ত পেরাছিই করে না, বউও কিনা পর হ'য়ে পেল।” এটা ত্রিক করুণরস কি হস্তরস, বুঝিয়া উঠিতে ভট্টাচার্য্য-মহাপ্রবের একটু ঘেরি হইল। সহজেই তাহার মনে পড়িল, বিধবা ভাগিনেরীট পণ্ডিত চটলে সহজে তাহাকে পাক করিয়া খাটতে চটরাছিল, জাতি-ভাট-ভগিনীর। তখন ভাবিয়া স্থান নাই। অতএব কিছু কোদহনী চেষ্টা তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন যে, ব্যাপারখানা কি? উত্তরে শুনিলেন যে, পুত্র। সমুখে, বলিদান দেখার ভয়ে স্বপ্ন বউ মাকি চল করিয়া বাড়ী আসিল না। ইহার পর কপাটা নানা-মুখে অনেকবার তাহার কর্ণগোচর হইল। নেড়ানেকড়ীর বংশে সকলই সম্ভব, এবং জানিয়া কালিকানন্দ পুত্রকে চিঠি লিখিলেন যে, “ভ্রামাপুত্রার পর আমি সতীক তীর্থ-দর্শনে বাহির হইব ত্বর করিয়াছি, বত স্বপ্ন হইতে পারে, তোমার পর্জন্যারীকে বাড়ী পাঠাইবে। বধুমাভাবের এখন পাঠাইবার প্রয়োজন নাই।”

নিত্যন্ত অনিচ্ছায় পৌত্রকে সহস্রবার চুহন করিয়া সাক্ষররনে কজী ঠাকুরাণী গৃহে কিরিয়া গেলেন। দেশের কপাই-দাল এবং বড়ির টক নলে পড়ায় বানো-দাদীরও আর

মন ঠিকিল না। তবে যোগমায়ার মত লক্ষ্মী বউটিকে, বিশেষত খোকাবাবুকে ছাড়িয়া বাইতে তাহারও প্রথম-প্রথম মন-কেমন করিয়াছিল।

গৃহিণীর মুখে পুত্রবধূর অতিরিক্ত প্রশংসা শুনিয়া ভট্টাচার্য্য বৃত্তিতে পারিলেন যে, নেড়ানেকড়ীর পুত্রকভারা তবে বাহুকরী বিধবাও জানে! কিন্তু নগনাকার ভরে মনের সন্দেহ স্পষ্টীকৃত করিতে পারিলেন না। নাস্তি দেখিতে ঠিক তাহারই মত হইয়াছে শুনিয়া ভাবি,পুণী হইলেন; ত্বর করিলেন, মাতামহগৃহে কখন তাহাকে বাইতে দিবেন না।

বানাহুন্দরী প্রায় দশমাস বেহার-অকালে বাস করিয়া অভ্যন্ত গালিত্বলির পুণি বাড়ীয়া আসিয়াছিল, সে যেন কতকটা অল্পে শাপ দেওয়ার মত। পাড়ার লতক-পুয়াবীরা নিরীহ খটবার নিম্মা রটাইয়াছে শুনিয়া, “ভরত জবানে” উদ্দেশে সে হিন্দী “গারি”গুলির যেকোন সংকীর্ত্ত ও লঘাবহার করিয়াছিল, তাহার পরিচয়ের আর কাজ নাই।

এই সকল ঘটনার প্রায় দেড়বৎসর পরে সর্দানন্দ ছুটী লইয়া বাটা আসিল। তখন পুলা আগন্তপ্রাণ, শরতের শ্রিত যৌত্র বন্ধের ভ্রামল প্রান্তরে এবং হিরোলিত খাতকেন্দ্রে প্রতিষ্ঠাত হইতেছিল। পরি-পূর্ণা ভাগীরথীর অপেক্ষাকৃত নির্ধন ঘাটে সর্দানন্দের নৌকা আসিয়া লাগিয়াছে। তখন বেলা প্রায় দেড়প্রহর। দানাত্তিক শেব করিয়া, বড়ন পারে, নানাবর্ণী গায়, স্বয়ং কালিকানন্দ দেখানে বিচরণ করিতেছিলেন।

রক্তচন্দনচর্চিত ললাটতল কুঁকড় করিয়া
 যে ভাবে তখন তিনি হৃদার্থ এবং সুন্দর
 শুষ্কপ্রভাগ দক্ষিণকরে লাহিত করিতে-
 ছিলেন, তাহাতে সেই পুরাকালের ভীষ্মমূর্ত্তি
 কাঁপালিকের মাদুস্ত কতকটা অহুত
 হইতেছিল। দেখিয়া মরণা যোগমার
 অপরাধিনীর মত ভয়ে শুকাইয়া উঠিল।
 সর্কানন্দ সপত্নে নৌকা হইতে অবতরণ
 করিয়া পিতৃপদ বন্দনা করিল।

থোঁকাবাবু হাঁটিতে শিখিয়াছেন এবং
 কথাবাতীও বিত্তর বলেন, কিন্তু তার
 পন্থা-আনা তিন-পাঠি চলা। বামাদারীর
 কোলে চড়িয়া পিতামহের সমীপবর্তী হইয়াই
 বলিলেন—“দেলাম মহারাষ্ট্র।” তিনি
 ক্রোড়ে লইয়াব জন্ত বাচ প্রদারণ করিলে,
 তাহার দীর্ঘ গুফ দুই কড়িকড়ি চাতে
 অধিকৃত করিয়া হৃদাটল—“তুন্ কোন্ হার
 হো।”

চন্দ্রিশযন্ত্রীর ভিতর এই চাতুখোর
 শিশুটি ঠাকুরদাদার সঙ্গে দিবা সখাসংস্থাপন
 করিল। পিতামহের অভয়ানন্দ-নাম অবাব-
 হারে পোষাকী কাপড়ের মত এতদিন ভোলা
 ছিল, অতএব প্রথম-প্রথম তাহাতে অভিহিত
 হইলে থোকা বাগিয়া বলিত—“হাস্কো গাতি
 নেতা হার ?” মার কাছে ছুটিয়া শিখা দুই-
 চারিবার নালিশও সেবস্ত করিয়াছিল।
 কালিকানন্দ পোত্রের সর্লকার্যে অপূর্ণ
 সৌন্দর্য্য দর্শন করিতে লাগিলেন, যুদ্ধের
 ভায় অহোরাত্র তাহার অহরণ করেন।
 পূজা-আত্মিকের সময় অভয়ার চরণকমল
 ভাবিতে ভাবিতে অভয়ানন্দকে তাঁর মনে
 পড়িয়া যায়। তার পর পূজাশেষে তাহার

বিমল ললাটতলে কোঁটা কাড়িয়া দিয়া
 তাহাকে বকে চাপিয়া ধরেন। এবং গদগদ-
 কণ্ঠে ডাকেন—“চুর্গে চুর্গে, একি মারার
 কেলিলে !”

যোগমারা কৈশোরে যত্নরকে দেখিয়া-
 ছিল, বৈষ্ণববেশা গোড়াপাক বলিয়া পিতৃ-
 গৃহে তাহার বে নান ছিল, তাহাতেই
 সে বরাবর বড় ভয় পাইত। কিন্তু ছেলে
 অভয়ানন্দ তাহার সে ভয় ভাঙিয়া দিল।
 ঠাকুরদাদার ফোরে অভয়ানন্দভাবে খেলিতে
 খেলিতে যখন-তখন বলিয়া উঠিত “মা
 যাব” এবং এতরূপে দিনে দশ-বার-বার
 সে তাহাকে মাতার সারিধো লইয়া যাইত।
 শেষে কালিকানন্দ ঝগড়া করিতেন—“তোমার
 মা না আমার মা।” তখন সেই বুক ভাইতে
 ও শিশু ভাইতে মা লইয়া ঝুটোপুট বাধিয়া
 যাইত।

বাত্তবিক কালিকানন্দ দেখিলেন গৃহি-
 ট্রর কথা লতা, লক্ষী বউটি তার। গৃহ-
 কণ্ঠে তার বিরাম-বিশ্রাম নাই, অথচ মুখে
 কথাটি নাই; যত্নর-শান্তভীর দেবার
 তাহার যেমন আনন্দ, তেমনই তত্ত্বহতা,
 বিস্ত্রণ প্রতিবেশিনীয়া পর্গাত তাহার আচ-
 রণের সমালোচনার সুর বদলাইতে বাধ্য
 হইয়াছে। সেহে যত্নর বলিলেন—“বউমা,
 আমার ত মেয়ে নাই, তোমার পেয়ে সে
 অতাব আমার দূর হয়েচে। আমার সঙ্গে
 কথা কহিয়ে মা, লক্ষা করিলে চলবে
 না।” ছেলে পিতামহের অহুকরণ করিয়া
 আধ-আধ সরে বলিত—“কথা কও মা, কথা
 কও।” শান্তভী ওনিয়া ওনিয়া হাসি-
 তেন, আর বলিতেন—“সাতাই ত বউমা,

আমাদের আর কে আছে ?” তবু যোগ-
মায়া স্বভাবের কাছে যথ স্তুতে পারিত
না, তবে ক্রমে দীর্ঘ ঘোমটাকে সংবত করিয়া
আনিল বটে ।

স্বভাব প্রবন্ধ মধুর প্রকৃতিতে যুদ্ধ
হইলেন বটে, কিন্তু বৈষ্ণবীর বেটীটি যে
শাক্তধর্মিণী, এ সম্বন্ধ কিছুতে তাঁর ভুল হয়
না । স্বধন-তখন গৃহীণীকে উপলক্ষ্য করিয়া
বলেন—“বৈষ্ণবীর বেটী আক পদ্যস্ত বাড়ীর
পূজো কখন দেখেন নি, এবার সে গুণ
আমার ঘূচবে ।” সখর মা অপ্রস্তুত হইয়া
উত্তর করেন—“কিন্তু বউমা; আমার বড়
মারাবী আর ভীত, বলিদান দেখতে
পারবে না !” টহাতে কালিকানন্দ উচ্চ হইয়া
উঠেন—“তোমার যেমন কথা, শাক্ত-স্বভাবের
বউ, বলিদান না দেখলে শুক হয় না ।”

নবদীপুত্রের দিন মধ্যাহ্নে তটাত্য-
গৃহে বড় ধুম—ঢাক-ঢোলের বাজনা কান
পাতা যায় না । বলিদান-স্তব হইতে আর
বড় বেশি নাই, মহিষশাবকটা মৃত হইয়া
যুগকাঠে বাধা রহিয়াছে, অনুন ২৫০০টা
ছাগ আর্জনেহে কাপিতেছে, তাগদের
গলার হাড়িধারীরা কোমরে গামছা জড়াইয়া
উৎসবমুখে গুতকণের প্রতীক্ষা করিতেছে ।
কর্মকার ভীত অসি উন্মাত করিয়া ছর্ণা-
নার জপিতেছিল, মহিষ এবং ছাগের দল
ছর্ণা ছর্ণাভিহারিণীকে আশ্রয়ে ডাকিতে-
ছিল কি না, বলিতে পারি না ।

কালিকানন্দ পৌত্রকে ক্রোড়ে করিয়া
চণ্ডীমণ্ডপসমূহে- পাড়াইলেন । বলিদান
মুক্ত হইয়া গেল । সহসা অন্তরপণে আর্ত-

কণের ককণ চাঁৎকার পদমিত হইয়া উঠিল ।
কিন্তু চণ্ডীমণ্ডপতল কম্পিত করিয়া “জয়
জগদেব” রব তখন আকাশে উঠিতেছিল, সে
জোহন এক সর্দানন্দ ছাড়া আর কাহারও
কর্ণে প্রবেশ করিল না । মাতা ডাকিয়া
পাঠাইতে না পাঠাইতে সর্দানন্দ ঘটনাপ্রসঙ্গে
উপস্থিত হইল—দেবিল, তাহার অস্থান
সত্য, পত্নশোণিতপাতের সে বিকট দৃষ্ট
সহ করিতে না পারিয়া যোগমায়া মুহুর্ন্ত
হইয়াছে । মাতা এবং অত্যন্ত আত্মীয়স্ব
বাতিবাস্ত হইয়া তাহার মুখে-চোখে জল-
সেচন করিতেছেন ।

বলিদান শেষ হইতে না হইতে থোকাও
বড় ভয় পাইয়া গেল । “মা গাৰ” বলিয়া সে
এমন চকল হইয়া উঠিল যে, কালিকানন্দ
সেখানে আর দি়র থাকিতে পারিলেন না ।

যোগমায়া মুর্ছা ভাঙিল বটে, কিন্তু
আত্মকে তাহার অধিকার হইল ।
মাতার অস্থখে অত্যানন্দ রাজিহীন
কামিতে লাগিল, ঘুমের ঘোরে শোণিত-
মাত উন্মাতফলস্বামী দাতকের দৃষ্টি মনে
করিয়া সে চাঁৎকার করিয়া উঠিল । বিকার-
বস্তার যোগমায়া প্রায় বলিত—“মাগো, এ যে
রক্তের নদী, কি করে পার হব !”

লক্ষীসুরপা প্রবন্ধ রূপগণব্যাপার্ষে
বসিয়া বসিয়া কালিকানন্দ মনোহর করি-
লেন, ভবিষ্যতে বলিদান উঠাইয়া দিবেন ।
যোগমায়া ভাগ্যে-ভাগ্যে সারিয়া উঠিল ।
কালিকানন্দের গৃহে সেই হইতে বলি উঠিয়া
নিয়াছে—বলিদান হয় বটে, কিন্তু সে কেবল
ইন্দু, লাউ ও কুমড়ার ।

শ্রীশ্রীশচন্দ্র মজুমদার ।

ভারতের অধঃপতন ।

—১৯৪৭—

ভারতবর্ষের একখানিও সম্পূর্ণ ইতিহাস আজ পর্যন্ত লিখিত হয় নাই। কতদিনে যে হইবে, তাহা বলা যায় না। জাতীয় জীবন বৈজ্ঞানিক-ভাবে দেখা আমাদের প্রকৃতিগত নহে। ইতিবৃত্ত লিপিতে বসিলেই আমরা পুরাণ গড়িয়া ফেলি। কাজে কাজেই পাশ্চাত্য পণ্ডিত ব্যাটীত “নাস্তি গতি-রজ্জ্বা” কিন্তু যে দেবতাদিগের উপর আমাদের ষোল-আনা নিভর, তাহারা ভারত-বর্ষের বহু ঐতিহাসিক সভ্যতালিকে অস্তিত্ব দিয়া এক বিপুল প্রমাণস্বরূপ অঁকিয়া থাকেন। তাহাদেরই বা মোহ কি? যুরোপীয় ব্রাহ্মণিক রটীন লাগ চন্দ্রার দ্বারা হিন্দু সঙ্কল্প কার্য-কলাপ ও রাষ্ট্র-নীতি পর্যবেক্ষণ করিলে স্বরূপের পরিবর্তে বৈরূপাই প্রতিভাত হইবে। বসন্তলি ভারত-বর্ষের ইতিহাস আছে, সকলগুলিই যেন গোড়া-তাড়া-দেওয়া। অনেক অসংখ্য ঘটনাবলিকে প্রতীচ্যস্বভাবস্বগত কল্পনাডোরে মোহ করিয়া কার্যকারণভাবে সংযোজিত করা হইয়াছে। যখন আমাদের ইতিবৃত্তের এইরূপ দুরবস্থা, তখন ভারতের অধঃপতন-বিবরণী প্রাথমিক লিখিয়া উঠা একপ্রকার অসম্ভব। তবে এই প্রবেশে দুই-একটা কথা অবতারণা করা যাইবে, যাহা ভবিষ্যতে তথ্যনিরূপণকায়ে গণ্যিত পারে।

ইুরোপে ষোড়শ শতাব্দীর দ্ব্যবিসম্বের পর হইতে অনেকের ধারণা হইয়াছে যে, পূর্ক্কতন মত বা প্রথার বিরুদ্ধে যত সংগ্রাম ঘটয়াছে বা ঘটবে, তাহা সকলই জ্ঞাযা ও বীরোচিত। ‘বিশ্রোহ’ শব্দটি তাহাদিগকে একবারে নাভোদ্বারা করে। এই যুরোপীয় বিশ্রোহিদল বৈদিক ব্রাহ্মণ্যধর্মের ঘোর বিরোধী; ইহাদের দৃষ্টিতে বেদবিশ্রাবৌ বৌদ্ধ-মত অত্যন্ত উচ্চ; কেন না, ইহা পুরাতনকে ভাঙিয়াছে। ক্রমভঙ্গ প্রবণ যুরোপীয় বিবেক বেববিহিত বর্ণবর্গকে মানবকুলের বৈরী বলিয়া ভূণা করে, বেদান্তের নির্ভগ্নব্রহ্ম-জ্ঞান ও নানাবাদকে পরিহাস করে, কিন্তু নাস্তিকবৌদ্ধমার্মকে স্বর্গে তোলে। এই বিশ্রোহবিকৃত দৃষ্টিই আমাদের পুরাতন ইতিহাসে অলৌকতার আরোপ করিয়াছে। ব্রাহ্মণ্যধর্মই হিন্দুতানের অধঃপতনের মূল-কারণ—এই ভ্রমসমূহ লিঙ্কান্তে পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা উপনীত হইয়াছেন। তাহাদের মতে বৌদ্ধদিগের অভ্যুদয়ে ভারতের অত্যা-দয়। বৌদ্ধদিগের আবির্ভাবের পূর্বে ভারত কি অন্ধকারময় ছিল না এবং তাহা-দিগের তিরোভাবে ভারত কি আবার অজ্ঞানতমিস্রার আচ্ছাদিত হয় নাই? ঘটনা-গুলির পারস্পর্য ঠিক বটে, কিন্তু তাহারা কার্যকারণসূচ্যায় সম্বন্ধ নহে।

হিন্দু দুই ভাগে বিভক্ত;—ধর্ম এবং জ্ঞান। ধর্ম ব্যবহারিক। ইহা বিধিনিষেধ-ব্যবস্থাপক। জ্ঞান পারমার্থিক। ইহা চিত্ত-পরিমুক্তি নিত্যবস্তুর পরিচায়ক। বেদ ও সাহিত্য ধর্মের আধার। বেদান্ত জ্ঞানের ভাণ্ডার। ধর্ম জ্ঞানবিরহিত হইলে সমাজ কীদগ্ৰাণ ও অধোপাখ্য হইয়; বাহ্যিকের ভাবকে মারিরা ফেলে; পুণ হৃদয়ের উপর আধিপত্য করে; অর্জু প্রকৃতি চিন্তাস্বাক্ষকে পঙ্কলিত করে। প্রকমকালপ্রভাবে ব্রাহ্মণ্যধর্মের জ্ঞানভ্রান্তি ঘটয়াছিল; বাগ-বজ্র, ক্রিয়াকলাপ ইত্যেবাহীন হইয়াছিল। জ্ঞানের আবির্ভাব—কণ্ঠকণ ভাগে কারয়া কর্ম করা—সাহিত্যে কণ্ঠের বক্তন পুষ্টিয়া যায়। এই মহান্ আদর্শে জ্ঞান ও কণ্ঠের সমন্বয় হয়। কিন্তু এই আদর্শদুই হইলে কর্ম-চক্রের পেষণে পিষ্ট হইতে ও কলসেছোঁও হয় না, নোকলাত ওয় ন। বুকের আবির্ভাবের অনতিপূর্বে হিন্দুস্থানেরা পুত্র, বিত্ত ও ধর্মের এবাণ্ডে দুঃ হইয়া মোকবিমুখ হইয়াছিল। পরমার্থবিমোহিত রসবিবর্জিত সকলবৈরাগ্যভিত্তি ভাঙ্গাঙ্গিকে তেজোহীন করিয়াছিল। এই হীনতার কারণ কি? যুরোপীয়েরা বলিবেন—ব্রাহ্মণ্যধর্ম। বত দোষ নন্দযোষ। অন্ধকারে ভ্রমিমায়ে লক্ষ্যদুই হইতে হয়। যে আদর্শের কক্ষা উপরে বলা হইয়াছে, তাহা অনিন্দনীয়। ধীরে ধীরে নিঃশব্দে প্রস্তুতির বজ্রকে নির্ধাপিত করিয়া অবেত-শাস্তিলাগরে বৈতকে নিঃশেষ করাই সমগ্র ব্রাহ্মণ্যধর্মের উদ্দেশ্য। যদি লক্ষ্য এত বড়, তবে লোকের ইঙ্গা ভাঙে

কেন? অবিন্যাগ্রহত কণ্ঠনিরস্ত্রিত কালকে লিঙ্কায়া কর। এই প্রশংসনীয় ভাবে স্থিতির ভঙ্গ আছেই আছে। দলপারে থাকিয়া কালকে এড়াইয়া কড়বিন-খাকা যায়। বত বড়ই সমান হউক না কেন, কালবশে তাহা নিতেই অবিনাশ-প্রাপ্ত হইবেই হইবে। আর্ঘ্যসভানেরা সহস্র সহস্র বৎসর ধরিয়া কালের তরলকে তুলু করিয়া অনন্তের দিকে অগ্রসর হইয়া-ছিল। এই উদ্যমের অবশান অবশ্রম্ভাবী।

পাকাতা পণ্ডিতেরা বলেন যে, হিন্দুরা কর্মবিমুখ বণিয়া অদ্যাপিও হটরাতিলা। হিন্দুরা কর্মবিমুখ নহে, কিন্তু কণ্ঠকলবিমুখ। তাহার কণ্ঠকে ভালবাসে, কিন্তু কর্মকণিত ঐশ্বর্যকে পরিবর্জন করে। কোন্ দেশে বিশিষ্ট চক্রবর্তী রাজা রাজভোগ ভাগ করিয়া বার্ত্তকো তিক্তরত অবলম্বন করি-তেন? কর্মক্ষেত্রে যুদ্ধ করিয়া কতবিক্ত হইয়া ঘাই বয়সে হইত, বিত্ত সঞ্চিত হইত, বিনা সংসারচেটায় ফলভোগের সময় আসিত, অমনি সর্ব্ব ভাগ করিয়া আর্ঘ্যগ্রহণ বনে প্রয়াণ করিত। এই বথার্থ কর্মাইলাপ। কোন ব্রাহ্মণ বা ক্ষত্রিয় যদি স্বধর্ম্মাহমোদিত কর্ম ভাগ করিয়া গৃহস্থিতামহাগত ঐশ্বর্যের উপর আপনায়সস্থান প্রতিষ্ঠিত করিতে বাইত, তাহা হইলে বেই কাশুক্য লাহিত ও পরিত্যক্ত হইত। অস্ত্রান্ত বশে সামাজিক প্রতিষ্ঠা কর্মগত সন্মতের উপর নির্ভর করে। কিন্তু আর্ঘ্যবর্ন্তে কণ্ঠের উপরে পদমণ্ডালা আলমি-ছিল। একথা সত্য বটে যে, কলকামনা ভাগ করিলে উদ্যমের উফতা কামরা যায়। অর্থাৎ

তুক প্রেম কিছু শাশ্বত হইবে। অলঙ্কারের
কল্প পতিকে ভালবাসিলে প্রেমের আলো-
ভনটা অধিক হয় বটে, কিন্তু মঙ্গলভাব-
প্রণোদিত প্রণয় তির ও গভীর হইয়া থাকে।
আমাদের কর্মসুচর্য্যগ ঘটেতুক, তাই আমরা
হির ও শান্তিপ্রিয়। আর তাহার ঐশ্বৰ্য্যের
জন্ত কর্মকে ভালবাসে, তাহাদের উদ্যোগের
আশায় উত্তর, দক্ষিণ, পূর্ব, পশ্চিম, সূর্য ও
প্রাণীভূত। আমরা কর্মক্ষেত্রে ভালবাসি।
ভালবাসিয়া তাহাকে ভয় করিব। যে হিরতা
ও শান্তিতে কর্মবর্য্য হুইয়া যায়, তাহাই
অবলম্বনীয়। ঐশ্বর্য্যবাসিনামস্তুত হ্রদাশ
প্রতাপ আমাদের কাজ নাই।

উপরি-বর্ণিত হিন্দু প্রকৃতি, প্রতীক সঙ্ক-
নেরা বুঝেন না। বলিয়াই বেদ-বেদান্তের
উপর তাহাদের এত রোষ। গভীরভাবে
বেধিলে বুঝা যায় যে, নিকামকর্মেই হিন্দু-
জাতির মহত্ব প্রতিষ্ঠিত, ঐশ্বর্য্যসমুদ্রে নহে।
কিন্তু নিকামকর্মসাধন, বিতভাগপূর্ব্বক
কুলগতকর্মরক্ষা, বাক্যকো বনপ্রদান, দুর্ব্বল
মানবের পক্ষে সম্ভব নহে। তাহাচ আর্গ্য-
সন্তান ভীত হন নাই;—প্রকৃতির সহিত
সংগ্রাম করিতে পরাশ্রয় হন নাই। এই
কলভাগের কল কি হইয়াছে? বেদান্ত-
বিজ্ঞান আবিষ্কৃত হইয়াছে। মানববুদ্ধি
আধ্যাত্মিক জ্ঞানের চরমস্থি লাভ করি-
য়াছে। কিন্তু কলে চূর্ণ করিয়া বসিয়া
ছিল না। ধীরে ধীরে অসীম চেষ্টার
ভিত্তিতে অবলাদ আনিয়াছিল। অবসরভা-
গত হিন্দুসন্তান উচ্চ জ্ঞানের পথে আর
চলিতে পারেন না। অবশেষে কালের
ভয় হইয়াছিল।

বেদান্তের নিকামধর্ম ও নিষ্ঠুরত্বজনক
যে দুঃপ্রায় হইয়াছিল, তাহার অস্ত্র এক
কারণ আছে। কালক্রমে আর্ঘ্য ও অনাৰ্ঘ্য,
দ্বিজে (আর্ঘ্য) ও শূদ্রে সংমিশ্রণ হইয়া
বর্ণগত্বের উদ্ভব হইয়াছিল; আর্ঘ্যরক্ত
দূষিত হইয়াছিল। বর্ণধর্ম ভিন্নকে অভিন্ন
করে। প্রথমে দুইএর মধ্যে বান্ধা বাধিয়া
যেয়; পরে তাহারো যেমন সম্মেলনের অহু-
কুল অবস্থা লাভ করে, অমনি বাধাবান্ধা
তুলিয়া যেয়। প্রথমে দ্বিজে ও শূদ্রে কঠোর
প্রভেদ ছিল। ক্রমশ তাহারো মিলিত
গেল। কিন্তু এট মিলনে ভাগও হইল,
মলও হইল। বর্ণগত্বগুলি নিকামধর্মের
নর্থ তত বৃদ্ধিতে পারিল না। আর্ঘ্যসমাজ
নিবৃত্তির অহুশাসনে শাসিত ছিল। এই
অহুশাসন অভ্যাগতদিগের একটা বোকা
বলিয়া মনে হইত। তাহারো নিশিরাছিল
বটে, কিন্তু আর্ঘ্যসমাজের অস্তঃপুরে প্রবেশ
করিতে পারে নাই। এই আগন্তুক অজ্ঞ
নিবৃত্তিবিরোধী সম্বন্ধাতিসকল আর্ঘ্য-
সমাজের বকে একটা গুরুভারের স্তায়
চাপিয়া বসিয়াছিল। তাই উন্নতির পথ
শীঘ্র শীঘ্র রুদ্ধ হইয়া গেল। ব্রাহ্মণ্যধর্মের
উদারতাই আর্ঘ্যজাতির পতনের কারণ।
অহুযার ব্রাহ্মণ্যধর্মের জন্ত হিন্দুজাতি হীন
হইয়া পিঠাচে—এইরূপ নিম্না কালনিক।
আর্ঘ্যেরা যেরূপ উদারতা দেখাইয়াছিলেন,
তাহার তুলনা আছে কি না, সন্দেহ। এমন
সাদার-কালোর মিলন আর কোথাও এ-
পর্যায় হয় নাই।

যখন হিন্দুজাতি সংসারসংগ্রামে অবসর
হইয়াছিল, বৈদ্যনাথেন্দ্রেনে অসীমচেষ্টা হইয়া-

ছিল,—লক্ষ্যবিশীন চরিত্র কণ্ঠচক্রে দুর্গাভয়মান
হইতেছিল, তখন বৃদ্ধ আবির্ভূত হইলেন।
তিনি কণ্ঠচক্রে হইতে সংসারকে রক্ষা করি-
বার সংবাদ ঘোষণা করিলেন। তেজবাহী
বৈদিকধর্মের পরিবর্তে মৈত্রেয় সংস্থাপন
করিতে, ক্রিয়াকলাপের আড়ম্বর দূর
করিয়া মনুষ্যজাতিকে মধ্যার্থতাবোধ
করিতে, কলনাপ্রসূত বেদান্তের ব্রহ্ম-
জ্ঞানের দ্বানে ব্যক্তিগতসাধনসম্বৃত নির্লিপ-
নাস্তি ধান করিতে, বৃদ্ধ অবতীর্ণ হইয়াছেন
—এই সংবাদ শুণ্ডভাষ্যগ্রন্থ আখ্যানান্তির
অন্তি নিষ্ট লাগিয়াছিল। জ্ঞানবিশীন কণ্ঠ-
চক্রেও বিরুদ্ধে বৌদ্ধধর্মের প্রতিবাদ বে-
জ্ঞানসমস্ত, তাহা স্বীকার্য। কিন্তু তাহারা
প্রাচীর ভাঙিতে গিয়া অস্বপ্নের প্রতিভা
কেলিল। তেজবাহী বৃদ্ধ করিতে গিয়া হিন্দুর
সারধন আত্মিকাবুদ্ধি ও বর্ণধর্মের ন্যূন
কুঠারাবাস্ত করিল। তৎকাল শব্দগাঢ়া
বৌদ্ধধর্মকে “বৈনাশিক” নামে অভিহিত
করিয়াছেন। বৈনাশিকবৌদ্ধবিশ্রোহ অব-
সারের ঈদলতাকে উচ্চ করিয়া তুলিল।
বিশেষত নিরস্ত্রের সঙ্গরজাতিরা মৈত্রেয়-
তত্ত্বমবোধি উৎসাহের সহিত গ্রহণ
করিল। তাহাদের নৃপত্র গিয়াছিল
বটে, কিন্তু স্বার্থ আর্থ্য লাভ হয় নাই।
তৎকাল আর্থ্যসংহিতাবন্ধন হইতে মুক্তি-
লাভ করিতে তাহাদের আগ্রহাতির্নয়
হইয়াছিল। তাহারা দলে দলে বৌদ্ধধর্ম
গ্রহণ করিল। বিত্তধর্ম আর্থ্যোত্তর অনেক
পরিমাণে বিচলিত হইলেন। অবসারের
আবলো প্রস্তুতি হইলে পুণ্ড্রতনের
উপর কেমন একটা বিশেষ প্রভা, কোন

একটা নৃতন পথের উচ্চ প্রাপ্তি: কেমন
করে। তাই তেজবাহীন আর্থ্যোত্তর বৌদ্ধ-
মত সাধারণ গ্রহণ করিয়াছিলেন।

বৌদ্ধধর্মের প্রসারের আর একটা বিশেষ
কারণ আছে। বৌদ্ধধর্মের বৈনাশিকতা
ধর্মের পরিচ্ছন্ন পরিয়া আসিয়াছিল।
বুদ্ধ ঈশ্বরের স্থান অধিকার করিয়া উপাসিত
হইতে লাগিলেন। প্রমত্তের আচার্য্য হইয়া
বসিলেন। সংহিতার পরিবর্তে ধর্মপত্র প্রস্তু-
তি হইল। শব্দবোধাদুপলব্ধিসম্বিত গৈরিক-
বাল্যবৃত্ত নৃপত্রবাহ ভারতবর্ষকে আচ্ছন্ন
করিল। হিন্দুরা ধর্মপ্রাণ। ধর্মের আকার
বেশিয়া তুলিয়া গেল। আর সেট যোগি-
বাহিত নির্লিপনুক্তির কথা কোন হিন্দুকে বৃদ্ধ
না করে? কিন্তু নির্লিপনুক্তির ভিতর হইতে
যে শুদ্ধাশ্রয়তর ব্রহ্মজ্ঞান তাঁকিয়া বাহির
করিয়া লওয়া হইয়াছিল। তাহা আর্থ্যোত্তর
বৃত্তিতে পারেন নাই। না বৃত্তিরা বাগ্-
জালে ভড়িত হইয়াছিলেন। যুরোপের
বৈনাশিকতা (nihilism) ভারতে কখনই
দান পাইতে পারে না। ইহা আত্মিক
ভাবে পরিপূর্ণ। ইহা ধর্মকে পদবলিত করে,
ধর্মের নাম পর্যন্ত সঙ্গ করিতে পারে না।
বৌদ্ধধর্ম নাস্তিকতা হইলেও ধর্মের আকারে
আসিয়াছিল। তাহা গ্রহণের হইয়াছিল।
যদি বৈনাশিকতার পরিপোষক,
তবে ভারত বৌদ্ধধর্মের বৌদ্ধপ্রভায়ে
জাতীয়বহু লাভ করিয়াছিল। সগ-
দ্যোত্তর মহিমা বেশিয়া কে না বিশিত,
হয়? রাজনীতির পরিপুষ্টি, বাণিজ্যের বৃদ্ধি,
সমুদ্রযাত্রা হইয়া বিবেচনাতা, আর্থ্যোগাল-
প্রতিষ্ঠা, সার্বজনীনবৈদ্যালয়সংস্থাপন, শির-

বিজ্ঞানের উন্নতি, বৌদ্ধভারতই চটখাছিল
নাট্যিকতার কি এত গুণবল আছে ?

সুবিচারদূতের গতি পর্যালোচনা করিলে
দেখা যায় যে, নাট্যিকতার বা উচ্ছ্বলতার
গুণবল নাই,—সম্বলকারিতা নাই, কিন্তু
একটা স্বাভাবিক ভেজ—উদ্দাম ভেট।
আছে ;—বাহার নিকট আশ্রিত্যবৃদ্ধি-
জনিত ধর্মবিধিনির্মিত প্রিয়-সন্তোর মঙ্গল-
জ্ঞাপন পান্থিক ব্যবহারে হার মানিয়া যায়।
গৃহত্যাগে বেচ্ছাচালিত বিবিধবিভূত বালক
গুরুজনবর্গে ভালকের অপেক্ষা সাহসে,
উদ্যমে, কিপ্রকারিতায়, বিস্রাম্যভারে, ব্যব-
হারশক্তিভার, নির্মাণমকতার নিশ্চয়ই গরী-
মান হইয়া থাকে। কিন্তু তাহার কর্মকুল-
তার আভিমান, বৃত্তিতে হুল ও পান্থ-
করিয়া ফেলে, ধর্মধর্মজ্ঞানকে নশ্ব করে।
আর কুলশ্রলপান্ বালক অরে খন্ডে বাড়িয়া
উঠে ও অবশেষে হৃদয় আশ্রয়িতা লাভ
করে। বৈয়াক্ষিক শক্তির মধ্যে বিনামবিধ
নিষিদ্ধ থাকে। তাই তাহার মত্ততা ও
আত্মালন অধিক। কিন্তু আত্মালন মরিবার
জগৎ। সুনির্মিত শক্তির বট। ও আত্মার অর,
কিন্তু বারিধ অমর। আর বৌদ্ধধর্ম ভারত
হইতে বিতাড়িত হইয়াছে—কোথায় বা
সেই মগধরাজ্য, কোথায় বাল্লভবন ও
জিগীটক!—সব বিপুল হইয়াছে। কিন্তু
নিপীড়িত, অসমর্থ আত্মপান্থ আবার জাগিয়া
উঠিয়া আপনাতঃ প্রকৃতিবিত্তার করিয়াছে।
বেতন শীতপ্রধান দেশে তুষারগর্ভে পুষ-
লতার বীজলকল হিদের অত্যাচার হইতে
রক্ষিত থাকে ও বসন্তময়ামে পুনরুজ্জ্বলিত
হয়, মেঠকণ ব্রাহ্মণাদির আত্মপ্রকৃতিগে

রক্ষিত হইয়াছিল। শব্দপ্রবুধ মগধানৌদিগের
আত্মপান্থ আবার জাগরিত হইয়াছে।

জাগরিত হইল বটে, কিন্তু সে পুরাতন
ভেজ কিরিয়া আসিল না। বৌদ্ধধর্ম আত্ম-
জাতির উচ্ছ্বলিতক নীচগামী করিয়া দিয়া-
ছিল। শূত্রপাদের কচ্ছটিতে উপনিষদের
গভীর জ্ঞান একপ্রকার অস্তিত হইয়াছিল।
হিন্দুর নিরুত্তির বিবেক আর মন ছিল না।
আত্মিকাবৃত্তিবিরতি হইয়া আত্মসন্তোষের
প্রবৃত্তির অধীন হইয়া পড়িয়াছিল। শকরা-
চাণ্য এখন তাহার বেনায়েতের ভেরী বাজাই-
লেন, তখন মৃতকর বাজনারে সজীবিত হইল
বটে, কিন্তু তাহাতে পূর্ণতার সন্ধান হইল
না। হিন্দুসমাজের অস্তিত্ব সর্ব অসাড়
হইয়াছিল। কাননপ্রাণ বহিল, কিন্তু অতি-
কৌশল্যে। বেনায়েতের জ্ঞান পুনরুজ্জ্বল হইল,
কিন্তু জনসাধারণে তাহা বুকিল না। বৌদ্ধ-
তন্ত্র হিন্দুর চরিত্রকে এত কলঙ্কিত করিয়া-
ছিল যে, কামনাবিবর্তিত সাধন তাহাদের
নিকট অত্যন্ত অকটিকর হইয়া উঠিয়াছিল।
নিরুত্তিমার্গ আর তাহাদের ভাল লাগিল
না। শত শত মাস্ত্রমারিক প্রবৃত্তিমার্গ বেশক
ছিন্নবিছিন্ন করিয়া ফেলিল। হিন্দুসমাজ
পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হইল, কিন্তু কত্রিয়দিগের মধ্যে
আর একতা রহিল না। এখন জানে একা
নাই, লক্ষ্যে একা নাই, তখন ব্যবহারে
কিভাবে থাকিতে পারে ? একাবিহীন
হইয়া এখনদিগের পন্থনত হইতে হইল।

রামনৈতিক অনৈক্য অপেক্ষা পান্থ-
মাতিক অনৈক্য হিন্দুজাতিকে অধিকতর
হীন করিয়াছে। আদামাদেরই বেনা-
য়ানের অবিকার িল। সকলেই এক-

যেযাতিতীরের তত্ত্ব শিক্ষা করিত, বেদগাথা পাঠিত, উপনিষদের মন্ত্র অভ্যাস করিত । তাহাদের মধ্যে সংসারের কর্মে, ব্যবহারে, পরমার্থানুরাগ প্রভেদ ছিল, কিন্তু পরমার্থবিষয়ে সমানধিকার ছিল । পিতার সহিত সকল সম্বন্ধেই—জানী বা অজানীর, মৃত্যু বা বিজ্ঞের, ধনী বা দরিদ্রের—ভ্রুশা সমত । পুত্র অজানী বলিয়া ভ্রুতা বা কোন উত্তর পুরুষকে পিতৃকে বরণ করে না । পিতাকেই পিতা বলে । কিন্তু আমাদের এমনটী ভ্রুতগা যে, প্রতিবংশসমূহ নবীন হিন্দু উপনিষদের মন্ত্রপণ্ডিত তত্ত্ব আবৃত্তিতে পারে না । কেবল ভ্রুতকৃত লোকের দ্বারা বৌদ্ধধর্মের মন্ত্রণার এটী ভ্রুতগা ঘটিয়াছে । আর ঠাট্টা বা সংস্কারের নূতন প্রবর্তনা করিয়াছিলেন, ঠাট্টা বা বিপ্রোচরণে অত্যন্ত রক্ত হইয়াছিলেন । অতঃপর হস্তে বেদগ্রন্থ বসিত দেন নাই, পাঠে আবার বৌদ্ধধর্মের জ্ঞান ধর্মের মূল খুঁড়িয়া ফেলে । এটী ব্যবহার ফল বিষম হইয়া উঠিয়াছে । দেশের অপিতাংশ লোক চেম্বারী ও প্রকৃতিমার্গের উপাসক হইয়া যাউতেছে । গতদিন না আর্ধ্য-সম্মানের পূর্বের জ্ঞান পরমার্থবিষয়ে এক বর, ততদিন ভারত অধোগামী থাকিবে ।

এখন দেখা যাউতেছে যে ভারতের অধঃপতনের মূল কারণ তিনটি—(১) অহৈতুককর্মকৃত নৈসর্গিক অবদান ; (২) আর্ধ্যানার্যের অত্যাচারসম্মেলন ; (৩) বৌদ্ধ-বিপ্রোহ । যুরোপীয়েরা ষ্টিক ইজার বিপরীত সিদ্ধান্ত করিয়াছেন । তাহারা বলেন, হিন্দুজাতির কর্মবৈশিষ্ট্য, ব্রাহ্মণধর্মের অশ-

মারিতা ও বৈদিক আশ্রমধর্মের পুনরাবি-
র্ত্ত্য—এই তিন কারণে ভারতবর্ষ পতিত
হইয়াছে । এই বিদেশীয় সিদ্ধান্ত আশা-
দ্বিপাকে স্রাস্ত করিয়াছে । আমরা স্বীকার
করিয়া গইরাছি যে, আমরা কর্মবিমুখ ।
তদ্ব্যতীত আমরা আর্ধ্য আদর্শ ত্যাগ করিয়া
প্রভীতা আদর্শ গ্রহণে উৎসুক হইয়াছি ।
সকলের লক্ষ্য কর্ম না করিলে বিজিগীষা
(competition) হয় না ; আর বিজিগীষা
না হইলে ছফোহু, মাঝামাঝি, কাটাকাটি
হয় না,—কর্মের ভূমি প্রশস্ত হয় না,—
ঐশ্বর্যলাভ হয় না । বেদবিহিত আশ্রম-
ধর্ম বিজিগীষার ক্ষুধা হঠাৎ পারে
না, অতএব বিপ্রোচরণ পরতা উত্তোলন
করিয়া বর্ধধর্মকে দেশ হঠাৎ তাড়াইয়া
দাও । এই সন্ধানক রেজুতা আমাদের
শিক্ষিত সম্প্রদায়কে অভিভূত করিয়াছে ।
বৌদ্ধবিপ্রোহে হিন্দুগণের সর্পনাশ হইয়া
গিয়াছে ; এতবারকার বিপ্রোহে হিন্দুজাতি
একবারে বিনষ্ট বা হয় । এই ঘোর সমুদ্রে
আর্ধ্য আদর্শ পুনঃস্থত না করিলে নিশ্চয়ই
কালকালে পড়িতে হইবে । আশ্রমধর্ম
সেই আদর্শে গঠিত । কৃপণত্ব কর্ম ও
সক্রে অন্যাক্ষি, বর্ধধর্মপাক্ষে পরিপুষ্ট হয় ।
বর্ধধর্মভ্রোহে আতীর হীনতা আসিয়াছে ।
গতদিন হিন্দুগণের আশ্রয় হইয়া কর্মকল-
লিপা পরিবর্তন করিয়া কর্মনিষ্ঠ না হয়,
ততদিন ভারতের উদান চরাচর ।

আশা করা যায় যে, এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে
যাহা বলা হইয়াছে, তাহাতে দুই-একটা চিত্র-
প্রচলিত ঐতিহাসিক ভ্রম নূ্য হইতে পারে ।

ঐত্বজ্ঞানকর উপাধ্যায় ।

বঙ্গদর্শন ।

চোখের বালি ।

(৩০)

আশা একদিন অল্পপূর্ণকে জিজ্ঞাসা করিল,
“আজ্ঞা মালীমা, বেশেষমশরৎকে তোমার
মনে পড়ে ?”

অল্পপূর্ণা কহিলেন—“আমি এগারো-
বৎসর বয়সে বিধবা চটরাড়ি, স্বামীর মৃত্তি
চায়ার মত মনে হয় ।”

আশা জিজ্ঞাসা করিল, “মাসি, তবে
তুমি কাহার কথা ভাব ?”

অল্পপূর্ণা ঈষৎ হাসিয়া কহিলেন, “আমার
স্বামী এখন বাহার মধ্যে আছেন, সেই
ভগবানের কথা ভাবি ।”

আশা কহিল—“তাহাতে তুমি হুখ
পাও ?”

অল্পপূর্ণা সমেচে আশার মাথার হাত
ফ্লাইয়া কহিলেন—“আমার সে মনের কথা
তুই কি বুঝিবি বাছা ! সে আমার মন
জানে, আর যার কথা ভাবি, তিনিই
জানেন ।”

আশা মনে মনে ভাবিতে লাগিল,
“আমি যার কথা বাহির্দিন ভাবি, তিনি কি

আমার মনের কথা জানেন না ? আমি
ভাল করিয়া চিঠি লিখিতে পারি না বলিয়া
তিনি কেন আমাকে চিঠি-লেখা ‘ভাড়িয়া
দিয়াছেন ?”

আশা করবিন মহেন্দ্রের চিঠি পার
নাই। নিশ্চয় ফেলিয়া মনে মনে সে
ভাবিল—“চোখের বালি যদি হাতের কাছে
থাকিত, সে আমার মনের কথা ঠিকরত
করিয়া লিখিয়া দিতে পারিত ।”

কুলিখিত কৃষ্ণপত্র স্বামীর কাছে আদর
পাইবে না মনে করিয়া চিঠি লিখিতে
কিছুতে আশার হাত সন্নিহিত না। বতই
বর করিয়া লিখিতে চাহিত, ততই তাহার
অক্ষর খারাপ হইয়া গাইত। মনের কথা
বতই ভাল করিয়া শুদ্ধাটয়া লইবার চেষ্টা
করিত, ততই তাহার পদ কোনমতেই
সম্পূর্ণ হইত না। যদি একদিন
“শ্রীচরণেহু” লিখিয়া নাম গৃহি করিলেই
মহেন্দ্র অস্বপ্নামী দেবতার মত সকল কথা
বুঝিতে পারিত, তাহা চট্রাণেই আশার চিঠি-
লেখা সাধক হইত। বিধাতা এতপানি

ଡାଲବାସା ଦିଆଦେନ, କିନ୍ତୁଧାନି ତାହା ଦେନ
ମାଟି କେନ ?

ସନ୍ଧିରେ ସନ୍ଧ୍ୟାନ୍ତର ପରେ ଗୁଡ଼େ କିରିଆ
ଆସିଲା ଆମା ଅନ୍ଧପୂର୍ଣ୍ଣା ପାରେର କାନ୍ଧେ
ବସିଲା ଆତ୍ରେ ଆତ୍ରେ ତାହାର ପାରେ ହାତ
ବୁଲାଇଲା ଦିଡେ ଲାଗିଲା । ଅନେକକ୍ଷ
ନିଃସନ୍ଦେହ ପର ବଳିଳ—“ସାମି, ତୁମି ବେ ବଳ
ସାମୀକେ ସେବତାର ସତ କରିଆ ସେବା-କରା
ସ୍ତ୍ରୀର ସର୍ବ, କିନ୍ତୁ ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ସର୍ବ, ସାହାର ବୁଦ୍ଧି
ନାହିଁ, କେମନ କରିଆ ସାମୀର ସେବା କରିଡେ
ହେ ବେ ଜାନେ ନା, ସେ କି କରିବେ ?”

ଅନ୍ଧପୂର୍ଣ୍ଣା କିଛିକ୍ଷଣ ଆମାର ମୁଖେ ଚିକେ
ଚାହିଆ ରହିଲେନ— ଏକଟ ଡାମା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟାସ
କେଲିଲା କହିଲେନ, “ବାଡ଼ା, ଆସିବ ତ ସର୍ବ,
ତବୁ ତ ଡଗବାନେର ସେବା କରିଆ ପାକି !”

ଆମା କଲେ, “ତିନି ବେ ତୋମାର ସନ
ଜାନେନ, ତାହି ଖୁସି ହେନ । କିନ୍ତୁ ସନେ କର,
ସାମୀ ସନ୍ଧି ସୁଖେର ସେବା ଖୁସି ନା ହେନ !”

ଅନ୍ଧପୂର୍ଣ୍ଣା କହିଲେନ “ସକଳେ ଖୁସି
କରିବାର ଶକ୍ତି ସକଳେର ଧାକେ ନା ବାଡ଼ା ! ସ୍ତ୍ରୀ
ସନ୍ଧି ଆତ୍ମିକ ଅନ୍ଧାନ୍ତକ୍ରିୟାରେ ସେ ସାମୀର
ସେବା ଓ ସଂସାରେର କାର୍ଯ୍ୟ କରେ, ତବେ ସାମୀ
ତାହା ଡୁଞ୍ଚ କରିଆ କେଲିଆ ଦିଲେ ଓ ସର୍ବ
ଜଗତୀୟର ତାହା ବୁଝାଇଲା ନୁଁ ।”

ଆମା ନିରନ୍ତରେ ଚୁପ କରିଆ ରହିଲ ।
ସାମୀର ଏହି କଥା ହୃଦେ ସାନ୍ତ୍ବନାପ୍ରାପ୍ତରେ
ଅନେକ ଚେଟା କରିଳ, କିନ୍ତୁ ସାମୀ ସାହାକେ ଡୁଞ୍ଚ
କରିଆ କେଲିଆ ଦିବେନ, ଜଗତୀୟର ଓ ସେ
ତାହାକେ ସାର୍ବକଥା ଦିଡେ ପାରିବେନ, ଏକଥା
କିଛିତହିଁ ତାହାର ସନେ ଲଟେ ନା । ସେ
ନତସୁଖେ ବସିଲା ତାହାର ସାମୀର ପାରେ ହାତ
ବୁଲାଇଲା ଦିଡେ ଲାଗିଲା ।

ଅନ୍ଧପୂର୍ଣ୍ଣା ତଥନ ଆମାର ହାତ ସରିଆ
ତାହାକେ ଆତ୍ରେ କାନ୍ଧେ ଡାନିଆ ଲୁଇଲେନ ;
ତାହାର ସନ୍ଧକଚୁବନ କରିଲେନ ; କନ୍ଧକଠକେ
ସୁଡ଼େଟାର ସାମାନ୍ୟ କରିଆ କହିଲେନ, “ହୁନି,
ହୁଏ-କଟେ ସେ ନିକା ଲାତ ହେ, ତବୁ କାନେ
ଗୁନିଆ ତାହା ପାହିବି ନା । ତୋର ଏହି
ସାମୀ ଓ ଏକଦିନ ତୋର ସର୍ବସେ ତୋରହିଁ ସତ
ସଂସାରେର ସର୍ବେ ସନ୍ଧ କରିଆ ଦେନାପାଂନାର
ସମ୍ପର୍କ ପାଡିଆ ବସିଆଛିଲା । ତଥନ ଆମିଓ
ତୋରଟି ସତ ସନେ କରିଡାମ, ସାହାର ସେବା
କରିବ, ତାହାର ସନ୍ଦେହ ନା ତାନ୍ଦିବେ କେନ ?
ସାହାର ପୁଞ୍ଜ କରିବ, ତାହାର ପ୍ରମାଦ ନା ପାଟିବ
କେନ ? ସାହାର ଡାଲର ଚେଟା କରିବ, ସେ ଆମାର
ଚେଟାକେ ଡାଲ ବାରିବ; ନା ବୁଝିବେ କେନ ?
ପଦେ ପଦେ ଦେଖିଲାମ, ସେନ୍ଧ୍ର ହେ ନା । ଅବ-
ଶେଷେ ଏକଦିନ ଅଳ୍ପ ହଟେ; ସନେ ହଟେ,
ପୃଥିବୀରେ ଆମାର ସମସ୍ତଟ ବାଧ ହେଇଆଛି—
ସେଟିନିନି ସଂସାର ତାମ୍ବ କରିଆ ଆସିଲାମ ।
ଆମେ ଦେଖିଡେ ଆମାର କିଛିଟି ନିଷ୍ଫଳ ହେ
ନାହିଁ ! ଓଡ଼େ ବାଡ଼ା, ସାହାର ସର୍ବେ ଆମେ ଦେନା-
ପାଂନାର ସମ୍ପର୍କ, ସିନି ଏଟି ସଂସାରହାଟେ
ସୁଲ ସହାଜନ, ତିନିହିଁ ଆମାର ସମସ୍ତଟ ଲୁଇଡେ-
ଛିଲେନ, ଡ଼ବେ ବସିଆ ଆମେ ସେ କଥା ସୀକାର
କରିଆଛେନ । ତଥନ ସନ୍ଧି, ଜାନିଡାମ ! ସନ୍ଧି
ତାହାର କର୍ମ ବଳିଆ ସଂସାରେର କର୍ମ କରିଡାମ;
ତାକେ ଦିଲାମ ବଳିଆଟି ସଂସାରେ କର୍ମ
ସିଡାମ, ତା ହେଲେ କେ ଆମାକେ ହୁଏ ଦିଡେ
ପାରିତ !”

ଆମା ବିଛାନାର ଗୁଣ୍ଡା ଗୁଣ୍ଡା ଅନେକ
ତାରି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନେକ କଥା ଡାବିଲ, ତବୁ ଡାଲ
କରିଆ କିଛିଟି ବୁଝିଡେ ପାରିଲ ନା । କିନ୍ତୁ
ପ୍ରମାଦୀ ସାମୀର ପ୍ରତି ତାହାର ଅସୀମ ତତ୍ତ୍ୱ

ছিল, সেট মাসার কথা সম্পূর্ণ না বুঝিলেও এক প্রকার নিরোদাশ্য করিয়া গেল। মাসী সকল সংসারের উপরে গীতাক্ষে দৃষ্টিতে স্থান দিয়াছেন, তাঁহার উদ্দেশে অন্ধকারে বিছানার উদ্ভিদা বসিয়া গড় করিয়া প্রণাম করিল। বলিল—“আমি বালিকা, তোমাকে জানি না, আমি কেবল আমার স্বামীকে জানি, সে-জন্তে অপরাধ লটেছে না। আমার স্বামীকে আমি যে পূজা দিই, ভগবান্, তুমি তাঁহাকে তাহা গ্রহণ করিতে বলিয়াছ। তিনি যদি তাহা পারে তৈলিখা দেন, তবে আমি আর বাঁচিব না। আমি আমার মাস'মার মত পূণ্যভাটী নই, তোমাকে আশ্রয় করিয়া আমি রক্ষা পাইব না।” এই বলিয়া আশা বারবার বিছানার উপর গড় করিয়া পণাম করিল।

আশার ভ্যাগানশাওর কিরিবার সময় হইল। বিদ্যার পূর্ণসংস্কার অস্বপ্নী আশাকে আপনাতঃ কোলে বসাইয়া করিলেন—“তুমি, যা আমার, সংসারের শোক-ভাং-অমঙ্গল হইতে তোকে সর্বদা রক্ষা করিবার শক্তি আমার নাই। আমার এট উপদেশ, যেখান থেকে যত কষ্টে পাস্, তোর বিধান—তোব ত্রুষ্টি তির রাখিস্, তোর স্বপ্ন বেন্ অটল পাকে।”

আশা তাঁহার পারের ধূলা লইয়া কহিল—“আমি সর্বদা তব মাসীমা, তাই হইবে।”

(৩১)

বিনোদিনীর সহিত প্রথম সংঘাত মহেন্দ্রের মনে যে বিক্ষোভ উপস্থিত করিয়াছিল, অভ্যাসক্রমে তাহা শাশ্বত হইয়া আসিল।

বিনোদিনী এবং মহেন্দ্রের মাঝখানে যে একটা বাধেব রত ছিল, তাহা প্রত্যাহ তলে তলে ছিলে ছিলে কইরা আসিয়া। মহেন্দ্রের সমস্ত আত্মজ্ঞানকে কোন্ একসময় পথ ছাড়িয়া দিয়াছে, এখন সে আর নিজের ভিতরে কোন একটা বিবোধ অনুভব করে না। এখন মহেন্দ্রের দৈনিক জীবনযাত্রায় বিনোদিনী কলের উপর পশ্চাদ্ধ বহু অতি সহজেই ভাসিতেছে।

রাভলন্দী সর্বদাই মনে করেন, “আজ আমার গুরুত্বালীর ভিতর বিনোদিনীকে কেমন সুন্দর মানাইয়াছে! বিধাতা উহাকে সর্বোৎকৃষ্ট এই বধের তরুতে গড়িয়াছিলেন কেবল মহেন্দ্রের নির্মুক্তি এবং অস্বপ্নীয় চক্রান্তট বিনোদিনী বধের হইয়াও যত্নে আসিল না।” রাভলন্দীর মনের এক প্রান্তে এই কথাটা ছিল যে, যাকে অতিক্রম করিয়া অস্বপ্নীয় চলপনোভানে মহেন্দ্র যে কিরূপ প্রভাবিত হইয়াছে, তাহা সে বোঝে,—মনে মনে অনুভব করে, এবং গর্ভদারিণী মা এবং খুড়ির মধ্যে কে যে বথার্থ আপনাতঃ, তাহা প্রত্যাহ উপলব্ধি করে। বিনোদিনী কালে-কর্ণে অবসরবিনোদনে যতই মহেন্দ্রের পক্ষে দিনে দিনে অত্যাশঙ্ক্য হইয়া পড়িতেছে, রাভলন্দী ততই মনে মনে খুশি হইয়া বলিতেছেন, “কেমন, তখন যে বড় ব্যাধ পছন্দে পছন্দ হইল না!” সংসারকাণ্ডের উপযোগিতার আশা বিনোদিনীর তুলনার অকিঞ্চিৎকর হইয়া বাইতেছে, ইহাতে রাভলন্দী অস্বপ্নীয় হার-ও নিজের মিত বলিয়া মানিতেছেন। এতজন্ত যুগ্মীন গুণে বিনোদিনীর স'হিত মহেন্দ্রের এতটা,

মেলানেশ্য অর্থাৎ ৪৪৭৩, ৪৫৭৩ খ্রীঃাব্দে একপ্রকার অন্ধ হইয়া ছিলেন। বিশেষত তিনি বেথিভেন, আজকাল মহেন্দ্র একদিনও কালেজ কামাই করে না; তাহার আনাহার-পত্রন বিনোদিনীর বাবদ্য ঠিক বাড়ির কপের মত সম্পন্ন হইতেছে। প্রস্তুতি উজ্জ্বল হইয়া উঠিলে ভীষনদ্বারাও উজ্জ্বল হইয়া উঠে, আশা ও মহেন্দ্রের প্রথম মিলনকালে তাহার পরিচয় পাওয়া গিয়াছিল;—এখন সমস্ত পরিপাটি—জল-যত। অতএব এখন আপত্তার বিষয় বাক্ত হইতে কিছুই দেখা দাইতেছে না।

আশা কিংবা আসিল। বিনোদিনী তাহার পরে গৃহ অভিমান করিল।—“বলি, এতদিন বিশেষে রচিতল, একখানা চিঠি লিখিতে নাই?”

আশা কহিল—“তুমিই কোন্ লিখিলে তাই বলি।”

বিনোদিনী। আমি কেন প্রথমে লিখিব? তোমারই ত লিখিবার কথা!—”

আশা বিনোদিনীর পলাতক হইয়া ধরিয়া নিষেধ অপরাধ স্বীকার করিয়া লটল। কহিল, “জান ত তাই, আমি ভাল লিখিতে জানি না। বিশেষ তোমার মত পণ্ডিতের কাছে লিখিতে আমার লজ্জা করে।”

বেথিভেন দেখিতে হইলেই বিবাহ বিট্টায়া দিয়া প্রণয় উবেলিত হইয়া উঠিল।

বিনোদিনী কহিল, “দিনগ্রাঙ্গি সঙ্গ দিয়া তোমার স্বামীটির অভ্যাস তুমি একেবারে খারাপ করিয়া দিয়াছ। একটি কেহ কাছে নহিলে থাকিতে পারে না।”

আশা। সেইজন্যই ত তোমার উপরে

তার দিয়া গিয়াছিল। কেনন করিয়া সঙ্গ দিতে হয়, আমার চেয়ে তুমি ভাল জান!

বিনোদিনী। দিনটা ত একরকম করিয়া কালেজে পাঠাইয়া নিশ্চিত হইতাম, কিন্তু সন্ধ্যাবেলায় কোনমতেই ছাড়িয়া দিই নাই—গম করিতে হইবে, বই পড়িয়া জন্মাইতে হইবে, আবদারের শেষ নাই!

আশা। কেনন জন্ম! লোকের মন তুলাইতে যখন পার, তখন লোকের বা ছাড়িবে কেন!

বিনোদিনী। সাবধান থাকিস্ তাই। ঠাকুরপো যে-রকম বাড়ীবাড়ি করেন, এক-একবার সম্বন্ধ হয়, যুক্তি বল করিবার বিদ্যা জানি বা!

আশা হাসিয়া কহিল, “তুমি জান না ত কে জানে। তোমার বিদ্যা আমি একটুখানি পাইলে বাঁচিয়া ঘাটতাম।”

বিনোদিনী। কেন, তার সঙ্গনাশ করিবার চেষ্টা হইয়াছে! ঘরে যেট আছে, সেইটিকে রক্ষা কর, পরকে ভোলাইবার চেষ্টা করিস্ নে তাই বলি! বড় লাগে!

আশা বিনোদিনীকে হস্তধার্য তর্জন করিয়া বলিল, “আঃ, কি বলিস্ তার ঠিক নেই।”

কান্দী হইতে কিংবা আসার পর প্রথম সাক্ষাতেই মহেন্দ্র কহিল, “তোমার শরীর বেশ ভাল ছিল দেখিতেছি, দিবা যোটা হইয়া আসিয়াছে!”

আশা অত্যন্ত লজ্জাবোধ করিল। কোনমতেই তাহার শরীর ভাল থাকি উচিত ছিল না,—কিন্তু সূচ আসার কিছুই ঠিকমত চলে না; তাহার মন যখন এত

খাবার ছিল, তখনো ভাতার পোড়ানরীর ঘোটা হঠাৎ উঠিগাঙিল; একে ত মনের তার ব্যাক্ত করিতে কথা কোটে না, ভাতাতে আবার লগ্নীরটাও উঠা বলিতে থাকে !

আশা মুহূৰ্ত্তে জিজ্ঞাসা করিল—“তুমি কেনন ছিলে ?”

আশে হটলে মহেন্দ্র কতক ঠাট্টা, কতক মনের সঙ্গে বলিত—“মরিয়া ছিলাম ;”—এখন আর ঠাট্টা করিতে পারিল না, গলায় কাছের আসিয়া বাধিয়া গেল। করিল, “বেশ ছিলাম, মন্দ ছিলাম না।”

আশা চাহিয়া দেখিল, মহেন্দ্র পূর্বের চেয়ে যেন রোগাই হঠরাছেন,—ভাতার মুখ পাতুবর্ণ, গোখে একপ্রকার ভীত দীপ্তি। একটা যেন আভ্যন্তরিক ক্ষুধার ভীহাকে অস্থিরিত্ব দিয়া লেহন করিয়া খাইতেছে। আশা মনে মনে বাগা অশ্রুত্ব করিয়া ভাবিল, “ভাগ্য, আশাও বামী ভাল ছিলেন না, কেন আমি উঁহাকে ফেলিয়া কানী চলিয়া গেলাম !”—স্বামী বোকা হইলেন, অথচ মিছে ঘোটা হটল, ইহাতেও নিজের স্বাভাব্য প্রতি আশার অভ্যস্ত বিচার করিল।

মহেন্দ্র আর কিক কথা তুলিবে ভাবিতে ভাবিতে বানিক বাধে জিজ্ঞাসা করিল—“কাকিয়া ভাল আছেন ত ?”

সে প্রেমের উত্তরে কুলসংবাদ পাইয়া তাহার আর বিতীর্ণ কথা মনে আনা দুঃসাধ্য হইল। কাছে একটা ছিন্ন পুরাতন খবরের কাগজ ছিল, সেইটে টানিয়া লইয়া মহেন্দ্র অস্তমনস্কভাবে পড়িতে লাগিল। আশা মুখ নীচু করিয়া ভাবিতে লাগিল, “এতদিন পরে

দেখা হটল, কিন্তু তুমি আমার সঙ্গে কেন ভাল করিয়া কথা কহিলেন না, এমন কি, আমার মুখের দিকেও যেন চাহিতে পারিলেন না। আমি তিন-চার-দিন চিঠি লিখিতে পারি নাট বলিয়া কি রাগ করিয়াছেন, আমি মাসীর অহুরোধে বেশিদিন কানীতে ছিলার বলিয়া কি বিরক্ত হইয়াছেন ?” অপরাধ কোন্‌ ছিন্ন দিয়া কেনন করিয়া প্রবেশ করিল, ইহাও সে নিত্যন্ত ক্রটি জনয়ে সন্ধান করিতে লাগিল।

এদিকে বিনোদিনী অদৃষ্ট। তাবটী এই যে, যাতার সম্পত্তি তিনি আসিরাছেন, এখন আমি নিকাল বুঝাইয়া দিয়া থালাস হইলাম। অন্তদিন যানের ঘরে দিয়া মহেন্দ্র একটা ছোট রূপার বাড়িতে চন্দন-ঘা প্রস্তুত দেখিত, গ্রীষ্মেব দিনে স্নানান্তে তাহা গারে মাগিয়া আরাম বোধ করিত, আর আর তাহা নাট। যানের পর কাপড় প্রস্তুত পাইল বটে, কিন্তু ভাতাতে বস্তুসের এসেলের নিয়মক কেহ মাখাইয়া রাখে নাট। মধ্যাহ্নভোজনের সময় বিনোদিনী অহুপস্থিত। শানের মধ্যে কেরাখয়েরের সে গন্ধইহু নাই। আহাতির পর মহেন্দ্র গাড়ি-তৈরির খবর পাইল, কিন্তু নিত্য-প্রথাহুগারে বিনোদিনী আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল না, “আজ বিকালে তোমার জন্তে সময়ক তৈরি করিয়া রাখিব, না, হোটেল হইতে তুমি আইস্ক্রীম লইয়া আসিবে ?” মহেন্দ্র অনর্থক চিন্তাশূন্যতা ভোগ না করিয়া অনায়াসে আশাকে বলিতে পারিত, ‘গোখের বালিকে একবার ডাকিয়া দাও।’ কিন্তু মুখ ফুটিয়া ভাগা বলিতে পারিল না।

মনে হটল, বিনোদিনীর মান মুখে আনিলেই যেন নামের চেয়ে অনেক বেশি বাস্তব হইয়া পড়িবে, আশার কাছে যেন কিছুট ভাণা থাকিবে না।

বুধা আশাকে মহেন্দ্র কলেক হটতে করিয়া আসিল। অপরাহ্নে জলপানের সময় রাজলক্ষ্মী ছিলেন, আশাও ঘোঁসিটা দিয়া অদূরে চুপচাপ দিয়া দাঁড়াইয়া ছিল, কিন্তু আর কেউ ছিল না।

রাজলক্ষ্মী উদ্বিগ্ন হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, “আজ কি তোরা অল্প করিয়াছে মইন্?”

মহেন্দ্র বিবর্ত্তভাবে কহিল, “না মা, অল্প কেন কোরবে?”

রাজলক্ষ্মী। তবে তুই যে কিছু খাইতেছিলি না।

মহেন্দ্র পুনরায় উত্থানকর কহিল, “এই ত, থাকি না ত কি?”

মহেন্দ্র গ্রীষ্মের সন্ধ্যায় একঘাটা পাংলা চাকর পাতে চামের এখানে ওখানে বেড়াইতে লাগিল। মনে বড় আশা ছিল, তাহাদের নিঃশব্দ পড়াটা আজ ক্ষান্ত থাকিবে না। আনন্দমঠ গ্রাম শেষ হইয়াছে, আর শুভি-দ্বইতিন অখ্যার বাকি আছে মাত্র,—বিনোদিনী বত নিষ্ঠুর হোক, সে করুণা অখ্যার আজ তাহাকে নিশ্চয় পুনাইয়া যাইবে। কিন্তু সন্ধ্যা অতীত হইল, সময় উত্তীর্ণ হইয়া গেল, সন্ধ্যার নৈরাত্ত বহিরা মহেন্দ্রকে ভইতে বাইতে হইল। নিষ্ঠুরা বিনোদিনী তখন অত্যন্ত বয়ে আশার গোঁপার আশা জড়াইয়া, তাহার চোখে তাজল পড়াইয়া, তাহার ওষ্ঠাধরে ঈষৎ আনন্দ ভাড়াইয়া সমাধায়া দিতেছিল।

সজ্জিত লক্ষ্যবিত্ত আশা ধীরে ধীরে শয়নগৃহে প্রবেশ করিল। ঘেঘিল, বিভা-নাথ মহেন্দ্র শুইয়া পড়িয়াছে। তখন, কেমন করিয়া অগ্রসর হইবে, তাবিয়া পাইল না। বিচ্ছেদের পর কিছুক্ষণ একটা নতুন লক্ষ্য আসে,—বেথানটিতে ছাড়িয়া যাওয়া যায়, ঠিক সেখানটিতে মিলিবার পূর্বে পরস্পর পরস্পরের নিকট হইতে নতুন সম্ভা-বনের প্রত্যাশা করে। আশা তাহার সেই চিরপরিচিত আনন্দলব্ধ্যটিতে আজ অনাহুত কেমন করিয়া প্রবেশ করিবে? যারের কাছে অনেকক্ষণ দাঁড়াইয়া রহিল—মহেন্দ্রের কোন সাজা পাইল না। অত্যন্ত ধীরে ধীরে একপা একপা করিয়া অগ্রসর হইতে লাগিল। যদি অন্তর্গত নৈবাৎ কোন গহনা বাজিয়া উঠে ত সে লক্ষ্যের নরিয়া যায়। কল্মিভঙ্গরে আশা মশারির কাছে আসিয়া অনুভব করিল, মহেন্দ্র ঘুমাইতেছে। তখন তাহার নিজের সাক্ষরতা তাহাকে সর্ব্বাঙ্গে যেটন করিয়া পরিচাল করিতে লাগিল। ইচ্ছা হটল, বিভাদ্-বেগে এ ঘর হইতে বাহির হইয়া অস্ত্র কোথাও গিয়া শোহ।

আশা বশামত্যা নিঃশব্দে সজ্জিতে হইয়া ঘাটের উপর গিয়া উঠিল। তবু তাহাতে একটুক্ষণ শব্দ ও নড়াচড়া হটল যে, মহেন্দ্র যদি সত্যি ঘুমাইত, তাহা হইলে তাগিয়া উঠিত। কিন্তু আজ তাহার চক্ষু খুলিল না, কেন না, মহেন্দ্র ঘুমাইতেছিল না। মহেন্দ্র ঘাটের অপর প্রান্তে গাশ করিয়া শুইয়া ছিল, সন্ধ্যায় আশা তাহার পশ্চাতে শুইয়া রহিল। আশা যে নিঃশব্দে অগ্রপাত করিতেছিল, তাহা পিঁড়ন ফিরিয়াও মহেন্দ্র

শ্পষ্ট বৃত্তিতে পারিতেছিল। নিজের নিষ্ঠুর-
তার তাহার হৃৎপিণ্ডটাকে যেন কঁাঠায় মত
শেষণ করিয়া বাধা দিতেছিল। কিন্তু কি
কথা বলিবে, কেমন করিয়া আদর করিবে,
মহেন্দ্র তাহা কোনমতেই ভাবিয়া পাইল
না;—মনে মনে নিজেকে স্ত্রীর কশাঘাত
করিতে লাগিল,—ভাড়াতে আঘাত পাইল,
কিন্তু উপায় পাইল না। ভাবিল, “প্রান্তঃ-
কালে ত ঘুমের ভাণ করা যাটবে না, তখন
মুখোমুখি হটলে আশাকে কি কথা বলিব?”

আশা নিজেই মহেন্দ্রের সে সঙ্কট দূর
করিয়া দিল। সে অতি প্রত্যুষেই অপ-
মানিত লাজসন্ধ্যা লটয়া বিধানা ডাড়িয়া
চলিয়া গেল, সেও মহেন্দ্রকে মুখ দেখাতে
পারিল না।

(৩২)

পরদিনও বিনোদিনী মহেন্দ্রকে দশন
দিল না। মহেন্দ্রের দিবসের অধিকাংশ
মূর্ছিত বাহ্যকে অবলম্বন করিয়া ছিল,
মহেন্দ্রের ভোজন, শয়ন, উপবেশন, অধারন,
অনবাস, মহেন্দ্রের সমস্ত নিত্যকৃত্য যে
একটি বৃত্ত আশ্রয় করিয়া ছিল, সে অপস্থত
হইবামাত্র তাহার বাহা কিছু, সমস্ত যেন
উল্টাপাল্টা হইয়া পড়িল। মহেন্দ্র
কখনো হাসে, কখনো ঘরে, কখনো বাহিরের
বান্ধাব্যায় ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল।
কালেজে বাইতেও পারিল না, অথচ শয়ন-
ঘরেও কিছুতেই তাহার মন টিকিল না।

প্ৰহুদিন ঘুরিতে ঘুরিতে মধ্যাহ্নে মহেন্দ্র
মাঝের ঘরে গেল। বা তখন আহারান্তে
বিজ্রামের উদ্দেশ্যে করিতেছিলেন।

পূর্বে এক দিন ছিল, তখন মহেন্দ্র সময়-

অসময় বিচার না করিয়া যখন-তখন মার
ঘরে আসিয়া উপরিভ হইত, কিন্তু সে দিন
আর নাই। তাই বহুকাল পরে রাজলক্ষী
মহেন্দ্রকে মধ্যাহ্নে তাহার ঘরে আসিতে
দেখিয়া আনন্দবোধ করিলেন। মহেন্দ্র
আজ পূর্বের মত মার কাছে আসিয়া তাহার
বিধানাধ গুইয়া পড়িল। বা পুলকিত-
হেঁহে মহেন্দ্রের মাথার চুলের মধ্যে আঙুল
বুলাইয়া দিয়া তাহাকে ঘুম পাড়াইতে চেষ্টা
করিতে লাগিলেন।

কিন্তু ঘুম মহেন্দ্রের চোখে কোথায়?
মহেন্দ্র কেন প্রত্যেক ক্ষণ চমকিয়া উঠিতে-
ছিল, কেন ক্ষণে ক্ষণে ঘরের দিকে বায়
দৃষ্টিপাত করিতেছিল? অনেকক্ষণ যেন
কাহার কণ্ঠ অপেক্ষা করিয়া অবশেষে কেন
সে ক্ষীণবাক্য ভয়কণ্ঠে ডাকিয়া উঠিল—
“মা!”

মা উৎসুক হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—
“কি মহিন্?”

মহেন্দ্র কহিল—“কিছুই না মা!”
মা সালুনিব্বত কহিলেন—“কি বলিতে
চান, বল মহিন? আবার কাছে লুকান্?”
মহেন্দ্র পুনরায় কহিল—“না, কিছুই
না!”

বলিয়া মহেন্দ্র মাতার একটি পদতল
জান হাতে চাপিয়া ধরিয়া তাহার কোলের
উপরে মাথা রাখিল। মাতা উদ্বিগ্নচিত্তে
বিগলিতহেঁহে মহেন্দ্রের মাথায়, ললাটে,
কণোলে, হাত বুলাইয়া দিতে লাগিলেন।

এই সময়ে প্রতিদিন বিনোদিনী রাজ-
লক্ষীর পাকচুল তুলিয়া বাতাস করিয়া ঘুম
পাড়াইয়া দেয়। আজ সে আর ঘরে প্রবেশ

করিল না । মহেন্দ্র একসময়ে হঠাৎ অবৈধবা
হইয়া উঠিয়া বসিল । যা করিলেন, “কোথায়
যাসু বহিন্, একটু শ্বশুরো না !”

মহেন্দ্র কহিল, “নাঃ, আমার বাহিরে
কাজ আছে !”

বলিয়া মহেন্দ্র ঘরের বাহিরে গেল ।
অতঃপরে যে ঘরে বিনোদিনী থাকে, দূর
হইতে সেইদিকে চাহিল । দেখিল, ঘর
ভিতর হইতে বন্ধ । ব্যগ্রদৃষ্টির দৃষ্টি কোন
শক্তি থাকিত, তবে কতবার তৎক্ষণাৎ বিবীর্ণ
হইয়া খুলিয়া বাটত ।

এদিকে বিনোদিনী কুণ্ঠিত আশাকে
বিরলে আপনার ঘরে টানিয়া লইয়া হাসিয়া
জিজ্ঞাসা করিল—“তার পরে তাই চোখের
বালি, অনেকদিন পরে দেখার পর কাল
ঠাকুরপো তোমাকে কি বলেন ?”

ছাখের ভাৱে আশার মুক পুরিয়া উঠিয়া-
ছিল, তবু আশা কোন কথা বলিল না,—
প্রাণপণশক্তিতে স্নানমুগ্ধ একটুখানি হাসি
আনিল ।

বিনোদিনী তাহার গলা গুড়াইয়া ধরিয়া
কহিল—“আবার কাছে লক্ষ্য কিসের ভাই !”

আশা তবু কোন উত্তর করিল না,
কোনমতে আর একবার হাসিল মাত্র ।

পীড়াপীড়ির পালা সাক্ষ হইলে বিনো-
দিনী কহিল, “আর তাই, আর আবার
তেমনি করিয়া মাঝাইয়া দিই ।”

এ প্রস্তাব যেন আশাকে বেত মারিল ।
তাহার সমস্ত অন্তঃকরণ বিদ্বব হইলেও, সে
বিনোদিনীর কাছে কেমল করিয়া স্বীকার
করিবে যে, আমার আস সাক্ষসজ্ঞার দর-
কার নাই !

বিনোদিনী আশার অঙ্গপ্রত্যঙ্গের গঠন
ও সুখশ্রীর প্রশংসা করিতে করিতে
বীর্ষকাল ধরিয়া বহুদীরে বহুদীরে বহুদী
তাহাকে মাঝাইল, ততই আশা অন্ধ-অন্ধে
বদ্ধ হইতে লাগিল । তবু এই প্রশংসার
যজ্ঞ সে পরমধৈর্যে সহ করিল । সব শেষ
করিয়া বায়হাতে আশার গাল টিপিয়া
ধরিয়া চানহাতের তঙ্কনীর অগ্র দিয়া বধন,
বিনোদিনী আশার চুই চোখে কাজল
পরাইয়া দিল, তখন হঠাৎ তাহার চুই চোখ
বাহিয়া ছুই করিয়া বল পড়িতে লাগিল ।

বিনোদিনী ব্যস্ত হইয়া কহিল—“তাঁট,
নখের খোঁচা লাগিল কি ?”

আশা “নাঃ, বিশেষ কিছু হয় নি” বলিয়া
তাড়াতাড়ি উঠিয়া চলিয়া গেল । উপরের
তলায় একটু নির্জন ঘরের মধ্যে গিয়া
আশা তাহার সমস্ত সাক্ষসজ্ঞা খুলিয়া
ফেলিল । বল দিয়া আলতার রাগ, কাজ-
লের দাগ, সমস্ত ধুইয়া দিল—একখানি
সাদাসিধা কাপড় পরিয়া বস্ত্রাকল মাথায়
টানিয়া কিঞ্চিৎ অধিক রাতে নিঃশব্দপদে
শয়নগৃহে প্রবেশ করিল ।

পূর্বরাত্রের মতট মহেন্দ্র শয্যাশেবে
পাশ কিরিয়া শুইয়া আছে । ঘুমের ঘোরে
মাথুব যেইকু নড়েককে, তাহাও তাহার
নাই ; মস্তকান অচেতন ব্যক্তি যেমন আড়ত-
ভাবে মাথল আঁকুড়াইয়া থাকে, সে তেমনি
করিয়া পাশ-বালিশ ধরিয়া আছে ।

আশা স্থির করিল, মহেন্দ্র ঘুমাইতেছে ।
দীরে দীরে সে বিভানার মধ্যে প্রবেশ করিল,
ছুটি চাত ছোড় করিয়া বলিল—“তাহার
নাসীনা সে দেখতাকে ডাকেন, সেই দেখ-

তাকে গড় করিয়া প্রণাম করিল। আশে
আশে একবার মহেন্দ্রের স্বপ্নমুখ দেখিবার
চেষ্টা করিল, কিন্তু কিছুতেই দেখা গেল
না। মহেন্দ্র একটা হাল তুলিয়া মুখ ঢাকিয়া
ভুটরা ছিল। পরদিন আশা বুঝ-হইতে
জানিয়াই দেখিল, মহেন্দ্র তাহার পূর্বেই
কখন উঠিয়া চলিয়া গেছে।

(৩৩)

আশা ভাবিতে লাগিল, “এখন কেন
হইল ? আমি কি করিয়াছি ?” বে কীরগার
বখার্বি বিপদ, সে তারগার তাহার চোখ পড়িল
না। বিনোদিনীকে যে মহেন্দ্র ভালবাসিতে
পারে, এ সম্ভাবনাও তাহার মনে উদয় হয়
নাই। সংসারের অভিজ্ঞতা তাহার কিছুই
ছিল না। তা ছাড়া বিবাহের অনতিকাল
পর হঠাৎ সে মহেন্দ্রকে ঘাঘা বলিয়া
নিশ্চয় জানিয়াছিল, মহেন্দ্র যে তাহা
ছাড়া আর কিছুই হঠাৎ পারে, ইহা কখনো
তাহার কল্পনাতেও আসে নাই।

মহেন্দ্র আজ সকাল-সকাল কলেজে
গেল। কলেজবাতাকালে আশা বস্ত্রাবর
জানালার কাছে আসিয়া দাঁড়াইত, এবং
মহেন্দ্র গাড়ি হইতে একবার মুখ তুলিয়া
দেখিত, ইহা তাহাদের চিরকালের নিত্য-
প্রথা ছিল। সেই অভ্যাস অল্পসারে গাড়ির
শব্দ শুনিবামাত্র বস্ত্রালিঙ্গের মত আশা
জানালার কাছে আসিয়া উপস্থিত হইল।
মহেন্দ্রও অভ্যাসের খাতিরে একবার
চকিতের মত উপরে চোখ তুলিল ; দেখিল,
আশা দাঁড়াইয়া আছে—তখনো তাহার জান
হয় নাই,—মলিন বস্ত্র, অসংগত কেশ, শুষ্ক
মুখ—দেখিয়া নিমেষের মধ্যেই মহেন্দ্র চোখ

নাড়াইয়া কোলের বট দেখিতে লাগিল।
কোথার চোখে-চোখে সেই নীরব সম্ভাষণ,
সেই ভাবাপূর্ণ হাসি !

গাড়ি চলিয়া গেল ; আশা সেইখানেই
মাটির উপরে বসিয়া পড়িল ; পৃথিবী,
সংসার, ক্ষুদ্র নিদ্রা হইয়া গেল। কলি-
কাতার কর্ণপ্রবাহে তখন দোদুল্লর আশিবার
সময়। সাড়ে দশটা বাজিয়াছে—আপিসের
গাড়ির বিগ্রহ নাই, ট্রামের পন্দাতে ট্রাম
ছুটতেছে—সেই বাত্ৰতাবেগবান্ কর্ণকরো-
লের অনুরে এই একট বেনদ্যস্ত্রিত মুখ-
মান ভগ্ন অস্ত্র বিদগ্ধ।

হঠাৎ এক-সময় আশার মনে হইল,
“ঝুঁঝুটি ! ঠাকুরপো! কালী দিয়াতিলেন,
সেই খবর পাটরা উনি রাগ করিয়াছেন।
ইহা ছাড়া চিত্তমধ্যে আর ত কোন
অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটে নাই। কিন্তু আমার
তাহাতে কি দোষ ছিল ?”

ভাবিতে ভাবিতে অকস্মাৎ একমুহূর্তের
জন্ত যেন আশার জন্মলীন বন্ধ হইয়া
গেল। হঠাৎ তাহার আশঙ্কা হইল, মহেন্দ্র
বুঝি সন্দেহ করিয়াছেন, বিহারীর কালী
বাওয়ার সঙ্গে আশারও কোন যোগ আছে !
হুইজনে পরামর্শ করিয়া এই কাজ ! হিহিহি
এমন সন্দেহ ! কি লজ্জা ! একে ত
বিহারীর সঙ্গে তাহার নাম অঙ্কিত হইয়া
ধিকারের কারণ ঘটরাছে, তাহার উপরে
মহেন্দ্র যদি এমন সন্দেহ করে, তবে ত
আর প্রাণ রাখা যায় না। কিন্তু যদি কোন
সন্দেহের কারণ হয়, যদি কোন অপরাধ
ঘটয়া থাকে, মহেন্দ্র কেন ল্পট করিয়া
বলে না—“খচার করিয়া তাহার উপযুক্ত

দণ্ড কেন না দেয় ! মহেন্দ্র খোলসা কোন কথা না বলিয়া কেবলি আপাকে খেন এড়াইয়া বেড়াইতেছে, তাই আপনার বার-বার মনে হইতে লাগিল, মহেন্দ্রের মনে এমন কোন লক্ষ্যে আগিচ্চাছে, যাহা নিজেই সে অভ্যাস বলিয়া জানে, তাহা সে আপনার কাছে লুপ্ত করিয়া বীকার করিতেও লক্ষ্য-বোধ করিতেছে। মহিলে এমন অপরাধীর মত তাহার চেহারা চটবে কেন ? জুড় বিচারকের ত এমন কুপ্তিভাব হইবার কথা নহে।

মহেন্দ্র গাড়ি হটতে চকিতের মত সেট বে আপনার দ্রাব্য কক্ষস্থ দেখিয়া গেল, তাহা সমস্তদিনে সে মন হটতে মুড়িতে পারিল না। কলেক্টর লেকচারের মধ্যে, জেরীক্স ডায়নামীর মধ্যে, সেই বাস্তব, আপনার সেই অস্বাভাবিক কক্ষ, সেই মলিন বস্ত্র, সেই ব্যক্তিগত দৃষ্টিপাত স্থল-রেখার বারংবার অস্তিত্ব হঠাৎ উঠিতে লাগিল।

কলেজের কাজ সারিয়া সে গোপনীয়তার বারে বেড়াইতে লাগিল। বেড়াইতে বেড়াইতে সন্ধ্যা হইয়া আসিল; আপনার সঙ্গে কিন্তু ব্যবহার কর্তব্য, তাহা সে কিছুতেই ভাবিয়া পাইল না—সদর চলনা, না অকণ্ট নিষ্ঠুরতা, কোন্টা উচিত ? বিনোদিনীকে পরিত্যাগ করিবে কি না, সে তর্ক আর মনে উন্নয়ই হয় না। দয়া এবং প্রেম, মহেন্দ্র উভয়ের দাবী কেমন করিয়া রাখিবে ?

মহেন্দ্র তখন মনকে এই বলিয়া বুঝাইল যে, আপনার প্রতি এখনো তাহার বে ভাল-বাসা আছে, তাহা আর দ্বার ভাগ্যে ছোটে। সেট বেহ—সেই ভালবাসা পাটলে আপা

কেন না লম্বট থাকিবে ? বিনোদিনী এবং আপা, উভয়কেই স্থান দিবার মত প্রলম্ব ভবন মহেন্দ্রের আছে। বিনোদিনীর সহিত মহেন্দ্রের যে পবিত্র প্রেমের লবঙ্গ, তাহাতে স্থানান্তরীতির কোন ব্যাঘাত হইবে না।

এইরূপ বুঝাইয়া মহেন্দ্র মন হইতে একটা ভার নামাইয়া ফেলিল। বিনোদিনী এবং আপা কাহাকেও ভাগ না করিয়া দুইচন্দ্রসেবিত গ্রহের মত এইভাবেই সে চিরকাল কাটাইয়া দিতে পারিবে, এই মনে করিয়া তাহার মন প্রফুর হইয়া উঠিল। আজ রাত্রে সে সকাল-সকাল বিছানার প্রবেশ করিয়া আহারে, বস্ত্রে, শ্রিত আপায়ে, আপনার মন হইতে সমস্ত বেদনা দূর করিয়া দিবে, টাঙ্গা নিশ্চয় করিয়া ক্রতপদে বাড়ী চলিয়া আসিল।

আহারের সময় আপা উপস্থিত ছিল না, কিন্তু সে একসময় শুইতে আসিবে ত, এট মনে করিয়া মহেন্দ্র বিভ্রামার মধ্যে প্রবেশ করিল। কিন্তু নিশ্চয়ই সেট পূর্ণশস্যার মধ্যে কোন দৃষ্টি মহেন্দ্রের দৃষ্টিতে আবিষ্ট করিয়া তুলিল ? আপনার সহিত নবপরিণয়ের নিতানূতন লীলাধোনা ? না। স্বর্গালোকের কাছে জ্যোৎস্না যেমন মিলাইয়া যায়, সে সকল দৃষ্টি তেমনি কীর্ণ হইয়া আসিয়াছে,—একটি তীব্র-উজ্জ্বল তরুণীমূর্তি, সরলা বালিকার সলজ্জ মিষ্টমুখিক কোণার আবৃত-আচ্ছন্ন করিয়া ধীপামান হইয়া উঠিয়াছে ! বিনোদিনীর সঙ্গে বিশ্বক লইয়া সেই কাড়া-কাড়ি মনে পড়িতে লাগিল; সন্ধ্যার পর বিনোদিনী কপালকুণ্ডলা পড়িয়া শুনাইতে শুনাইতে ক্রমে রাত্রি হইয়া আসিত, বাড়ীর

লোক ঘুমাইয়া পড়িত, বাহ্যে নিদ্রিতকণ্ঠের সেই শুষ্ক নির্জনতার বিনোদিনীর কণ্ঠস্বর যেন আবেশে মূহুর্ত ও কণ্ঠপ্রার হইয়া আসিত, হঠাৎ সে আশ্চর্যবরণ করিয়া বই ফেলিয়া উঠিয়া পড়িত, মহেন্দ্র বলিত—
“তোমাকে সিঁড়ির নীচে পর্য্যন্ত পৌঁছাইয়া দিয়া আমি”;—সেই একদিন মনে পড়ে, বিনোদিনীর নিবেদনস্বত্ব মহেন্দ্র নির্দোষদীপ অন্ধকার সিঁড়িতে তাহাকে সম্বাদন করিতে গেল, অবশেষে অন্ধকারে একমনে হঠাৎ অনিবার্য আবেগে বিনোদিনীকে বেঠেন করিয়া ধরিয়া তাহাকে চুম্বন করিল, বিনোদিনী প্রথম ছই-এক-দুহুর্ন্ত বিহ্বলভাবে সে চুম্বনে বাধা দিল না, তাহার পর অকস্মাৎ সক্রোধে “বৎ” বলিয়া মহেন্দ্রকে বল-পূর্ব্বক তেলিয়া নিভেকে বিচ্ছিন্ন করিয়া লইয়া ছুটিয়া চলিয়া গেল;—সেই সকল কথা বারংবার মনে পড়িয়া তাহার সমস্ত পূজক-সন্মার করিতে লাগিল। রাত্রি বাড়িয়া চলিল—মহেন্দ্রের মনে মনে ঈষৎ মাগকা হইতে লাগিল, এখনি আশা আসিয়া পড়িবে—কিছু মাগা আসিল না। মহেন্দ্র ভাবিল, “আমি ত কর্তব্যের জন্য প্রস্তুত ছিলাম, কিছু আশা যদি অন্তর্যাপ্ত করিয়া না আসে ত আমি কি করিব?” এই বলিয়া নিশীথরাজে বিনোদিনীর দানকে বনৌত করিয়া তুলিল।

যড়িতে যখন একটা হাঙ্গিল, তখন মহেন্দ্র আর থাকিতে পারিল না, মশাখি ধুলিয়া বাহির হইয়া পড়িল। ভাতে আসিয়া দেখিল, ঐশ্বর্য ভোজ্যস্বাদি বড় রমণীয় হইয়াছে। কলিকাতার প্রভাত নিঃশব্দ।

এবং স্থপ্ত যেন শুষ্কবৃক্ষের কলগাণধ স্তম্ভ স্পর্শগদা বলিয়া বোধ হইতেছে—অসংখ্য হর্ষাভ্রের উপর দিয়া মহানগরীর নিভ্রাকে বিবিড় করিয়া বাতাস মুহূর্ণমনে পদচারণ করিয়া আসিতেছে।

মহেন্দ্রের বহুদিনের কষ্ট আকাঙ্ক্ষা আপনাকে আর ধরিয়া রাখিতে পারিল না। আশা কানী হইতে কিরিয়া অবধি বিনোদিনী তাহাকে দেখা দেয় নাই। ভোজ্যস্বাদ-বিহ্বল নির্জনরাত্রি মহেন্দ্রকে বোহাবিষ্ট করিয়া বিনোদিনীর দিকে তেলিয়া লইয়া যাত্রতে লাগিল। মহেন্দ্র সিঁড়ি বিহা নামিয়া গেল। বিনোদিনীর ঘরের সম্মুখের বারান্দার আসিয়া দেখিল, ঘর বন্ধ নাই। ঘরে প্রবেশ করিয়া দেখিল, বিজানা তৈরি রহিয়াছে, কেহ শোয় নাই। ঘরের মধ্যে পদশব্দ শুনিতে পাইয়া ঘরের দক্ষিণদিকের খোলা বারান্দা হইতে বিনোদিনী জিজ্ঞাসা করিয়া উঠিল, “কে ও?”

মহেন্দ্র অভিভূত আগ্রহে উত্তর করিল,
“বিনোদ, আমি।”

বলিয়া সে একেবারে বারান্দার আসিয়া উপস্থিত হইল।

ঐশ্বর্য্যব্রিতে বারান্দার স্নায়ু পাতিয়া বিনোদিনীর সঙ্গে হাজলস্রী শুইয়াছিলেন—
তিনি বলিয়া উঠিলেন, “মহীন, এতদ্বারা কুই এখানে যে!”

বিনোদিনী তাহার ঘনকক ভবুণের নীচে হইতে মহেন্দ্রের প্রতি বজ্রাঘি নিক্ষেপ করিল। মহেন্দ্র কোন উত্তর না দিয়া দ্রুত পদে সেখান হইতে চলিয়া গেল।

সার সত্যের আলোচনা ।

অনুপ্রাণিতকথা-

বুদ্ধি, মন এবং প্রাণের মধ্যে
একাত্মত্বের সূচনা ।

বুদ্ধি, মন এবং প্রাণের মধ্যে একাত্মত্বের
কিরূপ, তাহা দেখিতে হইলে, বুদ্ধির নিতা-
ধিকারের অভ্যন্তরেই মন এবং প্রাণ কিরূপ
এক-যোগে কার্য্য করে, তাহার প্রতি প্র-
ধান করা কর্তব্য । বুদ্ধি বড়, মন মেঝে,
এবং প্রাণ চোটে । যিনি যখন বড় হ'ন,
তিনি ছোটো এবং মেঝের ধাপে মাড়াইয়া
বড়'র ধাপে উন্নীত হ'ন । বুদ্ধি—প্রাণ এবং
মনের ধাপে মাড়াইয়া নিতাধিকারে সম্মান
করিয়াছে ; কারণেই মন এবং প্রাণের মধ্যে
সব বাহা কিছু আছে, সবই বুদ্ধির মধ্যে
একাত্মত্বের সজ্জিত থাকিবারই কথা । বুদ্ধির
নিতাধিকারে মন এবং প্রাণ কি তাহে
সজ্জিত রহিয়াছে, তাহা দেখিতে হইলে,
বুদ্ধির অন্তঃপ্রত্যয় পৃথক্ পৃথক্ করিয়া
নিরীক্ষণ করা আবশ্যক—সর্বপ্রথমে
তাহাই করা বা'ক্ ।

বুদ্ধির অন্তঃনিরীক্ষণ ।

কি পক্ষ, কি পক্ষী, কি মনুষ্য—নূতন নূতন
অভাব-বোধ সকলকেই নূতন নূতন
কার্য্যে প্রবৃত্ত করে । একটা বন-মাল্লু-
য়ে টাটপূর্বে কোনো ভয়ে ভলে নাহে নাহে,

তাহাকে যদি একদল শিকারী ঘেরাও করে,
তাহা হইলে—পলাইবার আর কোনো পথ
না থাকিলে—সম্মুখিত মনোভাৱে স্বপ্নপ্রধান
করিয়া সাঁতরাইয়া মনো পার হওয়া তাহার
পক্ষে কিছুট বিচিত্র নহে বন-মাল্লুয়ের
এইরূপ যতপ্রকার বুদ্ধির কার্য্য দেখিতে
পাওয়া যায়, সমস্তই শুদ্ধ-কেবল অভাব-
বোধের উত্তেজনার উপস্থিত-মতে ঘটিয়া
পাকে । বন-মাল্লু কেন—এরূপ সজ্জিত
পড়িলে জাহা, মানুষও অভাব-বোধের
উত্তেজনার উত্তেজনা নহে পার হয় । কিন্তু
মনুষ্য তাহাতেই ক্ষান্ত থাকে না । মনুষ্যের
মনে যখন “মনো পার হওয়া আবশ্যক”
এইরূপ একটি অভাব-বোধ উপস্থিত হয়,
তখন সে—আর কোনো ভয় নহে সজ্জ-
রণ করে কি না, তাহা চিন্তা করে ; তাহার
পরে হংস কিরূপে সজ্জরণ করে, যত্ন কিরূপে
সজ্জরণ করে, নৌমীন (Nautilus) কিরূপে
সজ্জরণ করে, তাহা অনুসন্ধান করে ; তাহার
পরে, হংসের মুখা অববাহের আদর্শ-অনুসারে
একটা কাঠের বাহন নির্মাণ করে ; হংসের
পক্ষের আদর্শ-অনুসারে তাহার দুইটা
পাড় নির্মাণ করে ; যত্নের ল্যাক্সারি আদর্শ-
অনুসারে তাহার হাঁটল নির্মাণ করে,
নৌমীনের আদর্শ-অনুসারে তাহার পাটল

নিৰ্মাণ করে; এইরূপ একটি বাচন নিৰ্মাণ করিয়া তাহার নাম দ্যায়—নৌকা।

মনে কর, কুপ হইতে কল তুলিবার ক্ষমতা আমার একটা পাত্রের প্রয়োজন হইয়াছে; অথবা বাহা একই কথা—আমার মনে ঐরূপ একটা পাত্রের অভাব-বোধ হইয়াছে। প্রথমত সে পাত্রের উদয় ক্ষতি হওয়া চাই—কেন না, তাহা হইলে তাহার অভাবের যথেষ্ট-পরিমাণ জল ধরিবে; দ্বিতীয়ত তাহার কণ্ড উদয় অপেক্ষা সক্ষ ও দ্রুত হওয়া চাই এবং সুধরক্কুর চতুর্পাশ্ব বাহিরের দিকে বিকৃতিত হওয়া চাই—কেন না, তাহা হইলে তাহার কণ্ডে রজু বাঁধিয়া তাহাকে কুলাইবার সুবিধা পাইবে। তৃতীয়ত তাহার উদয় এবং কণ্ডের মধ্যে পরিমাণের সৌম্য থাকিবে। এক কথায় তাহা মানান্-সই হওয়া চাই; কেন না, তাহা যেমান্ হইলে আমার মন সুস্থ হইবে এবং সেই কারণে তাহাকে ফেলিয়া দিতে ইচ্ছা হইবে। স্মৃতিকার উপাদানে আমি এইরূপ একটা পাত্র নিৰ্মাণ করিয়া তাহার নাম দিলাম—ঘট। তাহার পরে আমি ভাবিয়া দেখিলাম যে, স্মৃতিকার উপাদানেই যে ঘট নিৰ্মাণ করিতে হইবে, এমন কোনো বাধা-বাধকতা নাই;—যে-কোনো কঠিন উপাদানে ঐরূপ একটা পাত্র নিৰ্মিত হইতে পারে, তাহাতেই আমার কার্য সিদ্ধ হইতে পারে। অতএব স্মৃতিকার উপাদান ঘটের সুখ অঙ্গ নহে। ঘটের সুখ অঙ্গ কি? না, জন-ধারণ-কম কাঠিত—ক্ষীত উদয়, দ্রুত

কণ্ড, বিকৃতিত সুধরক্কু, এবং সমস্তের আয়তনের পরিমাণ-সৌম্য; এষ্টগুলি ঘটের সুখ অঙ্গ। এইরূপে, ঘটের মধ্য হইতে তাহার সুখ অঙ্গবগুলি বিকৃত করিয়া লগ্নরূপে বিবেচনা করি।

মনে কর যেন আমিই ঘটের প্রথম উদ্ভাবন-কর্তা এবং লোক-মধ্যে তাহার ব্যবহার-প্রচারের আমিই আদি-গুরু। আমি ভাবিয়া-চিন্তিয়া ঘট উদ্ভাবন করিয়াছি, এইজন্য ঘট দেখিলেই একটি যুক্তি আমার মনে অতীব সুস্থ হইবে আকারে প্রতিভাত হয়। সে যুক্তি এষ্ট:—

যে-হেতু চহা জন-ধারণ-কম কঠিন, ক্ষীণোদয়, দ্রুত-কণ্ড, বিকৃতিত-সুধরক্কু, এবং আদোষাত্মক মানান্-সই, অতএব ইহা ঘট। যেহেতু এবং অতএবের মধ্যে এই যে যোগ, ইচ্ছা-ইচ্ছা নাম যুক্তি। যুক্তি-শব্দের অর্থ যে এক-প্রকার যোগ-ক্রিয়া, তাহা তাহার গারে লেখা রহিয়াছে। কিসের সহিত কিসের যোগনা? যেহেতুর সহিত অতএবের যোগনা; অথবা বাহা একই কথা—প্রমোদের সহিত প্রমাণের যোগনা। প্রমাণ-শব্দের যে অর্থ কি—তাহাও তাহার গারে লেখা রহিয়াছে। প্রমাণ কি? না, সমুখবর্তী বিষয়ের মান-কায় কিম্বা মাপন-কার্য। “হস্ত প্রসারণ করা” বলিলে বুঝায়—হস্তকে সমুখ-দিকে সারণ করা কিম্বা সরানো বা বাড়ানো। “প্রত্যাপ-যুক্তি” বলিলে বুঝায়—সমুখ-দিকে তাপের বা প্রত্যাপের যুক্তি। তেমনি “প্রমাণ” বলিলে বুঝায়—সমুখবর্তী বিষয়ের মান-ক্রিয়া বা মাপন-ক্রিয়া। ভাল-

প্রমাণ তরঙ্গ বলিবে বুঝায় যে, তরঙ্গ এত উচ্চে উঠিতেছে যে, তাহা তাণ-গাণি বিদ্যা মাণিয়া দেখিবার বস্তু। কোনো বস্তুকে মাণিয়া দেখিতে হইলে তাহার পাতে নান-বস্তু যোজন্য করিতে হয়। যদি বলি যে, এই বস্ত্রখানি এক-হাত লম্বা, তবে তাহার প্রমাণ দেখাইতে হইলে, সেই বস্ত্রখানির দৈর্ঘ্য-অংশ বিস্তারিত করিয়া তাহাতে হস্ত-যোজন্য করা আবশ্যক হয়। তেমনি “এটা ঘট”, ইহার প্রমাণ দেখাইতে হইলে, ঘটের গায়ে ঘটকের যোজন্য করিতে হয়;—ঘটকের যোজন্য কিরূপ? না, ইতিপূর্বে যে কয়েকটি ভাবকে ঘটের মুখা অবয়ব বলিয়া নিদ্ধারণ করিয়াছি—সেইগুলির একত সমাবেশ। বলিতেছি “এটা ঘট”—আজ্ঞা দেখা থাক্ তোমার কথা কতদূর সত্য;—উহার উত্তর চৌকোণ: ব্যাক্তার মতো;—অতঃ-এব উহা ঘট নহে; উহার কণ্ড কৃষ্ণার মতো দীর্ঘ—অতঃ-এব উহা ঘট নহে। পক্ষান্তরে এ বস্তুর উত্তর ক্ষীত, কণ্ড হ্রস্ব, মুখরন্ধ্র বিকৃত, অতঃ-এব এই বস্তুটা ঘট। এত-রূপ দেখা যাইতেছে যে, বস্তুর দৈর্ঘ্য-অংশে হস্তযোজন্য করিয়া আমরা যেমন বলি যে, বস্ত্রখানি এক-হাত লম্বা; তেমনি ঘটের গায়ে ঘটকের ভাব যোজন্য করিয়া যখন আমরা দেখি যে, এই বস্তুটির গায়ে এই ভাবটির চিক্ নিল রহিয়াছে, তখন আমরা বলি যে, এটা ঘটই ঘটে। বস্তুর ব্যালায়—বস্ত্র প্রবেশ, মানবও প্রমাণ; ঘটের ব্যালায় ঘট প্রবেশ, ঘটও প্রমাণ। বস্ত্রে মানবওর যোজন্য এবং ঘটে ঘটকের যোজন্য—ভট্টর প্রমাণ-শব্দের বাচ্য; এবং বিপেবত শব্দের

প্রকার যোজন্য—অর্থাৎ ঘটে ঘটকের যোজন্য—বৃত্তি-শব্দের বাচ্য।

যেন কর, আমি একটা ঘটের দোকান খুলিয়া, তাহাতে কাংস্ত-ঘট, স্রোপা-ঘট, মৃদ্যট প্রভৃতি নানাপ্রকার ঘট লাগাইয়া রাখিলাম। অচিরে আমার সেই দোকানে ক্রেতাপদের সমন্বয়গমন হইতে লাগিল। একজন ক্রেতা আমার দোকানে আসিয়া ব্যস্তব্যস্ত কাংস্ত-ঘট ক্রয় করিয়া লইয়া গিয়াছে। আমার দোকানে কাংস্ত-ঘট যত ছিল, সব যখন উঠিয়া গিয়াছে, তখন সে ব্যক্তি পুনরায় আমার দোকানে ঘট ক্রয় করিতে আসিল। আমি তাহাকে একটা মৃদ্যকার ঘট দেখাইলাম; তাহা দেখিবামাত্র সে বলিল যে, এটা ঘটই ঘটে। এ বাহা সে বলিল—কিসের জোরে বলিল? আমি যখন ঘটের নূতন সৃষ্টিকার, আর, ইতিপূর্বে কোনো ক্রেতার নিকটে আমি যখন মৃদ্যটের কথা পর্যন্ত উপস্থাপন করি নাই, তখন উপস্থিত ক্রেতা ইতিপূর্বে মৃদ্যট চক্ষে দেখে নাই, ইহা নিঃসংশয়; অথচ আমি তাহার সম্মুখে একটা মৃদ্যট উপস্থিত করিবামাত্র, তৎক্ষণাৎ সে বলিল, “এটা ঘটই ঘটে।” এ বাহা সে বলিল, কিসের জোরে বলিল? কিসের জোরে বলিল, তাহা দেখিতেই পাওয়া যাইতেছে। ক্রেতাট আমার দোকানে আসিয়া অনেকবার অনেকগুলি কাংস্ত-ঘট ক্রয় করিতে, ঘট যে কিরূপ বস্তু, সে-দৃষ্টে তাহার মনোমধ্যে একটা সংস্কার বদ্ধ-মূল হইয়া গিয়াছে; মৃদ্যট দেখিবামাত্র সেই-তাহার-মনের-সংস্কারট উপস্থিত মৃদ্যটে বৃত্তিমান হইয়া উঠিল। তাহার ভিতরের

সংস্কারটো ভিত্তর হঠাৎে বাহিরে বিচরণ করিল—মনের মধ্য হঠাৎে ঘটে বিচরণ করিল, আর অমনি সে বলিয়া উঠিল—“এটা ঘট”। তাবের এইরূপ বিচরণ-ক্রিয়ার নাম বিচার; ইংরাজিতে বাহ্যকে বলে—Judgment। এখানে বিশেষ একটি দ্রষ্টব্য এই যে, সেই যে ঘটের ভাব, বাহ্য ক্রোড়ার নিজেরই মনোমধ্যে বদ্ধনুল হইয়া রহিয়াছে, তাহা যে কি, তাহা সে জানে না; কেন না, সে-ভাবটি তাহার মনের মধ্যে এখনো বিবেচনা দ্বারা কুটাইয়া তোলা হয় নাই। সে বন্ধন বলিতেছে যে, “এটা ঘট”, তখন তাহার সেই বিচারকামোতেই প্রকাশ পাঠতেছে যে, ঘটের ভাব তাহার মনোমধ্যে আছে। তাহা যে তাহার মনোমধ্যে আছে—এটা তাহার কাছে প্রকাশ পাঠতেছে; কিন্তু তাহা যে কি, তাহা তাহার দ্রষ্টানে প্রকাশ পাইতেছে না। সে ব্যক্তি অভ্যন্তর সংস্কারের বলে তিক্ই বিচার করিয়াছিল যে, এটা ঘট; কিন্তু হইলে হইবে কি—তাহা একটা সংস্কার বই নহে। পরদিন তাহার একজন বন্ধু তাহাকে বলিল—“ওটা নেণ্ডি হাঁড়ি!” ইহা শুনিয়া তাহার মনে সংশয় উপস্থিত হওয়াতে, সে আবার দোকানে আসিয়া আমাকে বলিল, “তুমি আমাকে একটা হাঁড়ি দিয়াছ।” আমি তাহাকে বলিলাম যে, হাঁড়ির কঁঠ এতরূপ কম-চওড়া হয় না, এবং হাঁড়ির ওঠ এতরূপ বিকৃতিত হয় না। তখন তাহার চক্ষু ফুটল। প্রথমে তাহার মনে সহজেই এইরূপ একটা বিচার উপস্থিত হইয়াছিল যে, “এটা ঘট”; কিন্তু সে বিচার অক-সংস্কার-মূলক। এবারে তাহার মনে

সেই বিচারটো দৃঢ়তা-প্রাপ্ত হইল—কিন্তু এবারকার বিচার পূর্বের জ্ঞান অঙ্গ সংস্কার নহে; এবারকার বিচার বিবেচনামূলক এবং বুদ্ধি-সম্ভাবিত। এবারে সে—ঘটের কিসে হয়, তাহা বিবেচনা-দ্বারা নিকাসন করিয়া এবং সেই ঘটকে ঘটের সহিত সোজন্য করিয়া বুদ্ধি-পূর্বক বিচার করিল যে, এটা ঘট।

এখানে একটি অতি নিগূঢ় রহস্য আছে; পেটা একে তো বুদ্ধিতে আৱত্ত করা কঠিন—তাহাতে আবার মনে বৃথিলেও, যুগ্মে কিংবা লৈখনীতে বাহির করা কঠিন। কিন্তু তাহা কঠিন বলিয়া তাহাকে সরাইয়া রাখা উচিত হয় না। আমাদের শাস সন্ন্যাস বলিয়া তাহার আঁটিও যে সন্ন্যাস হইবে, এতরূপ মনে করা অজ্ঞান। এতটু এখানে বিবেচনা করা উচিত যে, ভূমিতে আনের আঁটি সমাধান করিলেই আন-গাছ গজাইয়া ওঠে; তাহার পরিবর্তে আনের রস সিকন করিলে কোনো ফলই বেশে না। বিষয়টা এই—

অগ্নির দুই অঙ্গ—আলোক এবং উত্তাপ। যে অগ্নির উত্তাপই সর্বশব্দ, অগ্নি আলোকই সর্বশব্দ, সে অগ্নি অঙ্গহীন। যে অগ্নির উত্তাপ আছে—আলোক নাট, সে অগ্নি পরিশুট অগ্নি নহে; তেমনি আবার, যে অগ্নির আলোক আছে—উত্তাপ নাই, সে অগ্নি কাজের অগ্নি নহে। অগ্নির যেমন দুই অঙ্গ—উত্তাপ এবং আলোক; বুদ্ধির তেমনি দুই অঙ্গ—শক্তি এবং জ্ঞান। বুদ্ধির বিচার-শুষ্টি বা বিচরণ-শুষ্টি তাহার শক্তিপ্রদান অঙ্গ এবং বিবেচনা তাহার জ্ঞানপ্রদান অঙ্গ। যে বুদ্ধির বিবেচনা অপেক্ষা বিচার-শুষ্টি বেশী প্রবল—সে বুদ্ধি উপার্জিত বুদ্ধি।

যে বুদ্ধি বিচারে অপর, ঐক্য বিবেচনার
 অনুপূর্ণ, সে বুদ্ধি বৈজ্ঞানিক বুদ্ধি। না
 উপস্থিত বুদ্ধি—না বৈজ্ঞানিক বুদ্ধি—অথচ
 দুইই একাধারে, এইরূপ হৃদয় আর-এক-
 প্রকার বুদ্ধি আছে; তাহার নাম প্রতিভা।
 উপস্থিত বুদ্ধি বিচার-প্রধান; বৈজ্ঞানিক
 বুদ্ধি বিবেচনা-প্রধান; প্রতিভা বুদ্ধি-
 প্রধান। বুদ্ধি-বশে এখানে বৃত্তিতে হইবে
 জ্যোতি বুদ্ধি;—মৃত কারণাত্মক বুদ্ধি বা
 পুণ্ডিত বুদ্ধি বৃত্তিতে চলিবে না। এক-
 জন প্রতিভাশালী হুইজ চিকিৎসক যেরূপ
 বৃত্তিতে রোগের রোগনির্ণয় করেন, তাহা
 যত্ন; এবং একজন বৈদ্য ঔষধ-সংস্কৃত-
 উপাদি-মানার বিহীনত আনাড়ি চিকিৎসক
 যেরূপ বৃত্তিতে রোগ নির্ণয় করেন, তাহা
 যত্ন। নেশোনিয়ন খোনাপার্ট্ বেরূপ
 বৃত্তিতে দুধকেই দ্বাহ সাজাইতেন, তাহা
 যত্ন এবং তাহার বিপক্ষদের সেনাপতি
 বেরূপ বৃত্তিতে দ্বাহ সাজাইতেন, তাহা যত্ন।
 পুণ্ডিত বুদ্ধি বৃত্তির একপ্রকার ভাণ-
 তা বই তাহা প্রকৃত বুদ্ধি নহে।

বিচারই বুদ্ধির শক্তি-অঙ্গ। বিচার-
 প্রধান বুদ্ধি যার শক্তি-প্রভাবে উপস্থি-
 তকে কার্যোদ্ধার করে বলিয়া তাহার নাম
 আশ্রয় দিই—উপস্থিত বুদ্ধি। বিচার
 যেমন বুদ্ধির শক্তি-অঙ্গ—বিবেচনা তেমন
 বুদ্ধির জ্ঞানার্ণব। বিচার বুদ্ধির হাত-পা—
 বিবেচনা বুদ্ধির চক্ষু। যে বৃত্তিতে উপস্থিত
 বিচার এবং বৈজ্ঞানিক বিবেচনা, দুইই বৃত্তি-
 হুইবে প্রথিত—তাঁহাট বৃত্তি-প্রধান বৃত্তি।
 বৃত্তি-প্রধান বৃত্তিতে সমস্তহৃদয় বুদ্ধি এবং

তাহারই আর-এক নাম প্রতিভা। বিচার
 বুদ্ধির হাতে কার্য করে, বিবেচনা বাম হাতে
 কার্য করে; বৃত্তি এক হাতে দুই হাতেরই
 কার্য করে। এ বাহা আমি জনকজলে
 হৈয়ালিঙ্কে বলিলাম—ইহার একটি দৃষ্টান্ত
 বিতেছি, তাহা হইলেই তাহার প্রকৃত তাৎ-
 পর্য্য লক্ষণেরই বোধগম্য হইবে। একটি
 শিশুরে আমিরা বলি অবোধ শিশু; কেন
 না, তাহার বুদ্ধি এখনো পরিপূর্ণ হয় নাই।
 তাহার বুদ্ধিরূপী অগ্নির উত্তাপ আছে, কিন্তু
 আলোক নাই। সেই অবোধ শিশুর বুদ্ধি-
 চালনা করিয়া মাতৃভাষা আশ্রয় করে—
 শুদ্ধ-কেবল স্বাভাবিক বিচারশক্তির
 প্রভাবে। একজন ঔষধ বিশ বৎসর
 ধরিয়া বাঙলা-ভাষা শিক্ষা করিলেও, সে,
 বাঙলা-ভাষা বীতিমত আশ্রয় করিতে
 পারে না; কিন্তু একটি বাঙালীর
 ছেলে মাত বৎসরের মধ্যেই বাঙলা-ভাষা
 আশ্রয় করিয়া ফালে। ইহাতেই প্রমাণ
 হইতেছে যে, স্বাভাবিক বিচার-দৃষ্টির শক্তি
 বেশী—যদিও তাহার দৃষ্টি কম। তাহার
 পরে, যে মাতৃভাষা বালক প্রাথমিক
 আছে, তাহাট বিদ্যালয়ে নুতন করিয়া শেখে।
 বিদ্যালয়ে বালকের বিবেচনা মার্জিত হয়—
 দৃষ্টি মার্জিত হয়। তাহা যখন হয়—তখন
 বালক তাহার পূর্ব-শিক্ষিত মাতৃভাষা হইতে
 ভাষার সুখ অলঙ্ঘন ক্রমে ক্রমে বিবিক্ত
 করিয়া লয়। তখন সে বৃত্তিতে পারে—
 ভাষা পদার্থট। কি। কিন্তু তাহা বৃত্তিতে
 পারিলেও—একধারি পর লিখিতে তাহার
 বিষয় খিত্রাট উপস্থিত হয়। তাহার যেমন

বিবেচনা কতকটা ব্যাপ্তিলাভ করিয়াছে—
 তাহার বিচার-শক্তিও সেই পরিমাণে
 বর্দ্ধিত হওয়া চাই—কিন্তু তাহা তাহার
 এখনো হয় নাই। পিত্রালয়ে বালক
 স্বাভাবিক বিচার-শক্তি উপার্জন করিয়া-
 ছিল; বিজ্ঞালয়ে মার্জিত বিবেচনা-দৃষ্টি
 উপার্জন করিল। তাহার পরে সে যখন
 বিজ্ঞালয় হইতে কৰ্ম্মালয়ে প্রবেশ করিল,
 তখন সে যুক্তি-দ্বারা স্বাভাবিক বিচার
 এবং শিক্ষিত বিবেচনা, দুয়ের যোগ-বন্ধন
 করিয়া সাধুভাবার চিহ্নপত্রাদি লিখিতে
 আরম্ভ করিল। যুক্তি-দ্বারা বিচার এবং
 বিবেচনার মধ্যে এই যে যোগ-বন্ধন, ইহার
 কতক আভাস ইতিপূর্বে আমি জ্ঞাপন
 করিয়াছি;—তাহা আরকিছু না—যেহেতু
 সহিত অতএবের যোগ-বন্ধন। যেহেতু
 এ পদধানি বিষয়-কৰ্ম্ম-যতি—অতএব
 ইহার উত্তর দিতে হইবে সংক্ষিপ্ত প্রাক্কল
 ভাষায়; যেহেতু এ পদধানি বাড়ীর
 লোকের নিকট হইতে আসিয়াছে, অতএব
 ইহার উত্তর দিতে হইবে ঘরাণ্ড ভাষায়।
 যেহেতু এ পদধানি বিজ্ঞান সংক্রান্ত,
 অতএব ইহার উত্তর দিতে হইবে বৈজ্ঞা-
 নিক ভাষায়। উপযুক্ত ভাষা দ্বারা সুনিপুণ-
 রূপে কাজ চালাইতে হইলে—তৎ-কেবল
 অস্তঃপুরের অশিক্ষিত বিচার-শক্তি দ্বারাও
 তাহা সম্ভাবনীয় নহে। আর, তৎ-কেবল
 পুৰ্ব্বগত বৈরাগ্যবৃত্তি ও তত্ত্ব-বিবেচনা
 দ্বারাও তাহা সম্ভাবনীয় নহে। কাজের
 সময়, অশিক্ষিত বিচার এবং শিক্ষিত-বিবে-
 চনা, দুয়ের মধ্যে পদে পদে যোগ-বন্ধন
 করা নিত্যশ্রুত প্রয়োজনীয়; অতএব

এবং যেহেতু মধ্য পদে পদে যোগ-বন্ধন
 করা নিত্যশ্রুত প্রয়োজনীয়। কাজের শোক
 হইতে হইলে, বালক হইলেও চলিবে না,
 তট্টাচার্য্য হইলেও চলিবে না। নিজের যুক্তি-
 অংশের পদে পদে যেহেতু এবং অত-
 এবের সহিত যোগ-বন্ধন করিতে না
 পারিলে, কাজের মতো কোনো কাজ
 কাহারো কর্তৃক সম্ভাবনীয় নহে।

বালক যখন পিত্রালয় হইতে বিজ্ঞালয়ে
 প্রবেশ করিয়া ব্যাকরণ, ইতিহাস, ভূগোল
 প্রভৃতির জ্ঞানোপার্জন-পথে কিয়দূর অগ্র-
 সর হয়, তখন সে নূতন তত্ত্ব নব নব বিজ্ঞার
 আলোকে অত হইয়া অস্তঃপুরের অশিক্ষিত
 সহজ জ্ঞানকে আগাগোড়া কুসংস্কার বলিয়া
 মনে মনে ঠিক দিরা রাখে, এবং সমস্তেরই
 প্রতিবাদ করিবার এক কোমর বাঁধিয়া
 দাঁড়ায়। কিন্তু সেই বালক যখন আর-
 কিছু-কাল পরে কৰ্ম্মালয়ে প্রবেশ করিয়া
 শিক্ষিত বিজ্ঞাকে পরীক্ষানলে গলাইয়া
 তাহাকে কাজে খাটায়, তখন সে অস্তঃপুর-
 মহলের অকৃত্রিম সহজজ্ঞানের মৰ্যাদা
 বুঝিতে পারে। তখন সে বুঝিতে পারে যে,
 অস্তঃপুর-সমন্বিত এবং তৎ-ক-পন্থীর নৈসর্গিক
 সহজজ্ঞানের দ্বারা এক হিসাবে যেমন
 পণ্ডিতের মার্জিত জ্ঞান অপেক্ষা অনেক
 কম, আর-এক হিসাবে তেমনি তাহা
 অপেক্ষা অনেক বেশী। বাহ্যিক আধীন্য
 চতুষ্পাশীতে ব্যাকরণ পড়িয়া প্রৌঢ়বয়সে
 অসামান্য বৈরাগ্যবৃত্তি হইয়া উঠেন, আর,
 সেই ব্যাকরণ-জ্ঞানকে মহাজ্ঞান মনে করিয়া
 সমস্তের বুক ফুলাইয়া বেড়াইন। তাহার
 একেবারেই কাজের বাঁহী হইয়া যান।

শক্তিরে, বাহ্যিক শিক্তি ব্যাকরণ-জ্ঞানকে ব্যবহায্য-ভাষার মাঝে মাঝেই। সেই ভাষাকে কাজের ভাষা করিয়া দাঁড় করান, আর, সেই কলপ্রদর্শিনী ভাষার ব্যবহারে ক্রমে যখন তাঁহাদের হাত পাকিয়া ওঠে, তখন তাঁহাদের ভাষা কিরেকির্তি আবার বল্লুর ভাষার ভাষা বা ভাষিক উজ্জ্বলের আকার ধারণ করে। অন্তঃসূক্ত-মন্ডলের এবং কৃত-পক্ষীর ভাষা সঙ্গল সময়ে ব্যাকরণ-সঙ্গত না হইতে পারে; কিন্তু তাহাতে বক্তার মনের ভাব একরূপ অকৃত্রিম সহজ-শোভন ভাবে উদ্বেলিত হয় যে, কবির নিকটে তাহার নৃণ্য আঁটাগাঁটা গোবাক-পর্যায় কৃত্রিম ভাষা অপেক্ষা পতনহস্ত-গুণ অধিক। প্রথম ধাপের অশিক্ষিত ভাষাতে বাস্তবিক উজ্জ্বলের ভাবই—কোষার ভাবই—প্রধানত দেখিতে পাওয়া যায়; দ্বিতীয় ধাপের বিস্তারিত ভাষাতে বক্তার ভাব—নিঃস্বের ভাব—ব্যবহার ভাব—প্রধানত দেখিতে পাওয়া যায়; তৃতীয় ধাপের পরিপক্ক ভাষাতে, উজ্জ্বলের ভাব এবং বক্তার ভাব, দুইই একাধারে স্ফূর্তি পায়; আর, সেট-কারণ-বশত তৃতীয় ধাপের ভাষাতে নীরের দুই ধাপের ভাষার দুই প্রকার গুণ বিগুণ হইয়া উঠে, এবং দুই প্রকার দোষ প্রকাশিত হইয়া যায়। প্রথম ধাপের ভাষার গুণ অকৃত্রিম স্ফূর্তি—দ্বিতীয় ধাপের ভাষার গুণ সুব্যবস্থা। তৃতীয় ধাপের ভাষার দুয়ের ঐ দুই গুণ একত্র জনটি বাধিয়া যায়; আর সেই সঙ্গে দুয়ের দুই দোষ প্রকাশিত হইয়া

যায়। প্রথম ধাপের ভাষার দোষ হচ্ছে—অব্যবস্থিত স্ফূর্তি; দোষ প্রকাশিত হইয়া যায়; এবং দ্বিতীয় ধাপের ভাষার দোষ হচ্ছে—কৃত্রিম কারিকরি; তাহাও প্রকাশিত হইয়া যায়। এই দুটোত্রটির মধ্যে প্রথম ত্রুটি এই যে, প্রথম ধাপের ভাষাজ্ঞান বিচার-প্রধান উপস্থিত বুদ্ধির যোগে সংঘটিত হয়; দ্বিতীয় ধাপের ভাষাজ্ঞান বিবেচনা-প্রধান বৈজ্ঞানিক বুদ্ধির যোগে সংঘটিত হয়; তৃতীয় ধাপের ভাষাজ্ঞান সূক্ত-প্রধান ব্যুৎপন্ন বুদ্ধির যোগে সংঘটিত হয়।

দ্বিতীয় ত্রুটি এই যে, বাস্তবিক বিচার-সূক্তি বুদ্ধির শক্তি-প্রধান অঙ্গ; বিবেচনার নিরম-বন্ধন বুদ্ধির ভাবনা-প্রধান অঙ্গ; এবং দুয়ের একত্র সমাবেশ-জনিত প্রয়োগ-নৈপুণ্য বুদ্ধির সূক্ত-প্রধান পূর্ণাবয়ব।

বতদূর সহজ প্রদর্শনীতে বুদ্ধির অঙ্গ-নিকাচন করা সম্ভবে—উপরে তাহা আমি সাধ্যমতে করিলাম। ভাষার দুটো উল্লেখ করিলাম কেন? না, যেহেতু ভাষা বুদ্ধিরই গাফাং অতিবাচক। তার সাক্ষী—জ্ঞানগর্ভ ভাষা প্রবণ করানোর নামই বুদ্ধি-দান করা; আর, জ্ঞানগর্ভ ভাষা প্রবণ করার নামই বুদ্ধি-গ্রহণ করা। ভাষাকে ছাড়িয়া বুদ্ধিকে নগাল পাওয়াও কঠিন—আর, ভাষা-বাহুর সাহায্য ব্যতিরেকে বুদ্ধির আশ্রয় ধরানোও কঠিন। এইজন্য বুদ্ধির ব্যাপার বুঝিবার এবং বুঝাইবার পক্ষে ভাষার দুটোই খুব কাজে লাগে। Logic শব্দ Logos শব্দ হইতে হইয়াছে। Logos শব্দের অর্থ Reason এবং language দুটো একাধারে।

এতকণের আলোচনার, বুদ্ধির তিনটি মুখা অবয়বের লক্ষ্যন পাওয়া গেল; সে তিনটি অবয়ব হচ্ছে—বিচার, বিবেচনা এবং বৃত্তি। বিচার কি? না, বিচরণ; মনের ভাব হইতে লক্ষ্য-বস্তুতে বিচরণ—অথবা মনের ভাবকে লক্ষ্য-বস্তুতে চাড়াইয়া দেওয়া। তাহা আর কিছু না—“এটা ঘট” এই বাক্য উচ্চারণ করিয়া ঘটস্থের ভাবকে লক্ষ্য-পরিপূজনান ঘটে প্রতিকলিত দেখা। বিবেচনা কি? না, দৃষ্টমান ঘট হইতে ঘটের ভাবকে বিবিক্ত করিয়া (অর্থাৎ বিবৃত্ত করিয়া) দেখা। বৃত্তি কি? না, ঘটস্থের ভাব দিয়া বিশেষ বিশেষ ঘটকে মাপিয়া দেখা। বৃত্তিতে বিবেচনা এবং বিচার, দুইই একযোগে ‘দৃষ্টি’ পায়; আর, এক-

যোগে ‘দৃষ্টি’ পায় বলিয়াই তাহার নাম হইয়াছে বৃত্তি। একজন পাকা জহরী প্রথমত “ভাল হীরা” কাহাকে বলে, তাহা জানে—এইরূপ জানা বিবেচনার কার্য; দ্বিতীয়ত হীরা দেখিলেই বলিতে পারে যে, এটা অমূল্য মূল্যের হীরা; এইরূপ বলিতে পারি বিচার-শক্তির কার্য। তৃতীয়ত কিরূপ ক্রেতাকে কিরূপ হীরা পছন্দীতে হইবে—ইহা ঠিক করা বৃত্তির কার্য। বৃত্তিতে বিবেচনা এবং বিচার, বেছেতু এবং অতএব, দুইই একযোগে কার্য করে।

বুদ্ধির অপ-নির্দোষন মাত্র কঠিরাই এ-যাত্রা ক্ষান্ত হইতেছি; বুদ্ধির স্তিত্বের মন এবং প্রাণ কি-ভাবে সমুদ্র রহিয়াছে, তাহা বায়ান্তরের আলোচনার ক্ষমতা রহিল।

শ্রীবিজ্ঞাননাথ ঠাকুর ।

বন ও বৃষ্টি ।

—বন ও বৃষ্টি—

তরুলতাচিহ্নরহিত উন্মূল প্রান্তর অপেক্ষা জঙ্গলাকীর্ণ স্থানে অধিক বৃষ্টিপাত হয়,—এই কথাটা আমরা বহুকাল হইতে শুনিয়া আসিতেছি, কিন্তু এই উক্তির মূল কতটা সত্য আছে, বিজ্ঞানগ্রন্থে তাহার সম্পূর্ণ আলোচনা বড়-একটা দেখা যায় না।

বৃহৎ-মণ্ডলের বৃষ্টিবাত্যাধি-সম্বন্ধীয় অবস্থা যে ভৌগোলিক অবস্থান ও বাণিজ্যবাহু (Trade-winds) প্রভৃতি দ্বারা বায়ুপ্রবাহ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। ভারতের পশ্চিমঘাট-পর্বতশ্রেণীতে দক্ষিণপশ্চিমের বায়ুপ্রবাহচালিত মেঘব্রাশি

বাধাপ্রাপ্ত হয়,—এবং তাহাব্যতী কলে বাটনগ্নিহিত হানে প্রচুর বারিপাত দেখা যায়। এতকন্তই দাক্ষিণাত্যের বারিক বারিপাত-পরিমাণ গড়ে ঐন ইকির অধিক না হইলেও, বাটের নিকটবর্তী প্রদেশের বারিপাত প্রায়ই ৮০ ইকিরও অধিক হইয়া পড়ে। কিন্তু একটা নিদিষ্টদানেন্দ্র কল্লেকবর্ণমাইলবিশৃঙ্খিত বনভূমি এবং টিক্ সেই দানেন্দ্রই সম-আয়তন-বিশিষ্ট একটি উৎকৃত প্রান্তরের বারিক বারিপাত-পরিমাণ তুলনা করিলে উভয়ের যে একতা দেখা যাইবে, এ কথা কেহই বলিতে পারেন না,— পরীক্ষা করিলে বনারত-ভূমির বারিপাত-পরিমাণ, উৎকৃত প্রান্তরে পতিত বৃষ্টির তুলনায় নিম্নতরই অধিক-দেখা যাইবে।

এখন দেখা খাউক, বৃক্ষসজ্জমান অপেক্ষা বনভূমিতে অধিক বৃষ্টিপাতের কারণ কি। পার্থক্যপাটিকাগ্নি বোধ হয় জানেন, মিছরি বা কটকিরি প্রকৃতি কোন দানাদার পদার্থ জলে মিশ্রিত করিলে এবং তাহাতে উক্ত পদার্থের মিশ্রণ প্রচুর হইলে,—সেই পদার্থই আবার জলের মধ্যে আপনিষ্ট দানা বাধিয়া যায়। কিন্তু সেই মিশ্রিত পদার্থটাকে যদি স্থির রাখা যায়, তাহা হইলে তাহাতে প্রায়ই দানা পতিত হয় না;—দানা বাধাই-বার অল্প বাহির হইতে একটা উত্তেজনা আবশ্যক। সেই উত্তেজনা দ্বারা একবার দানা বাধিতে আরম্ভ করিলে, জলমিশ্রিত সমস্ত পদার্থটী ক্রমে দানাময় হইয়া যায়। এইমত মিছরি-প্রস্তুত করিতে হইলে, দানা উৎপাদনের উত্তেজনাপ্রদ একধণ্ড বহু চিনির রসে নিক্ষেপ করিতে হয়;

এবং প্রচুর-কটকিরি-মিশ্রিত জল হইতে জমাট কটকিরি পুন উৎপন্ন করিতে হইলে, মিশ্র পদার্থটাকে ক্রিফিং আলোড়িত করা বা তাহাতে তক্ষাতীয় একধণ্ড দানাদার পদার্থ নিক্ষেপ করা আবশ্যক হইয়া পড়ে। জলদাক্ষিণ্য হানের অত্যন্ত বৃক্ষসকল, প্রচুর-জলীয়বাষ্পপূর্ণ যেহে,—সেই চিনির রসে নিক্ষিপ্ত হুতের দ্বারা কার্য করে। যখন আকাশের নিম্নতরত বর্ণগোম্বুধ মেঘরাশি বায়ুপ্রবাহে চলিতে থাকে, বর্ণের অল্প তখন ইহাতে আর নূতন বাষ্পলকারের আবশ্যকতা থাকে না; বর্ণগোম্বুধের অল্প কেবল একটা উত্তেজনায় অভাব থাকিয়া যায় মাত্র। তা'র পর উক্ত বৃক্ষলির আহত হইয়া সেই উত্তেজনা প্রাপ্ত হইলে, সমস্ত মেঘই বনভূমিতে বর্ণন করিতে থাকে।

এতদ্বাতীত যে কারণে বায়ুচালিত মেঘ-রাশি পর্জতপাথে পতিত হইয়া প্রচুর বারিবর্ণন করে, সেটাকেও আরগ্যাভূমির বর্ণগাধিক্যের কারণরূপ চম্বেষ করা যাইতে পারে,—এইপ্রকার বর্ণন উপকূলত বনভূমি ও অরণ্যবহুল দীপে প্রায়ই দেখা গিয়া থাকে।

এই ত সেল বাহুল্যভিত্তিক বর্ণগাধিক্যের কথা। ইহা ছাড়া বনভূমিতে অধিক বর্ণের আরো কতকগুলি কারণ চম্বেষ করা যাইতে পারে। বৈজ্ঞানিকগণ পরীক্ষা করিয়া দেখি-রাছেন, রৌদ্রতাপে বনভূমির বৃক্ষসজ্জা হইতে প্রতিদিন যে জলীয় বাষ্প উৎপন্ন হইয়া আকাশে হয়, তাহার পরিমাণ এত অধিক যে, সেই বাষ্প মেঘাকারে পরিণত হইয়া বর্ণন করিলে, তাহার কারণ দৈনিক বারি-পাতের পরিমাণ প্রায় এক-ইকি হইয়া

পড়ে। পত্রকাণ্ডাদি হইতে প্রতিদিন কি পরিমাণে জলীয়-বাষ্প উৎপন্ন হয়, তাহা স্থির করিবার জন্য একটা স্থলীয় পরীক্ষাপদ্ধতি প্রচলিত আছে। এই পরীক্ষার প্রথমে কোন এক সম্ভাব্য বৃক্ষশাখা একটা জলপূর্ণ বৃহৎ-পাত্রে অহোরাত্র নিমজ্জিত রাখা হয় এবং পাট্রে কি-পরিমাণ জল আছে, তাহা পূর্বেই স্থির করিয়া রাখা হয়। তা'র পর উক্ত সম্ভাব্য শাখার শোষণজনিত পাত্রেই জল কতটা কম পড়িল, তাহা তিক্ করা হইয়া থাকে। এই পরীক্ষাপদ্ধতিক্রমে গণনা করিলে দেখা যায়,—একটি পরিণত বৃক্ষ ভূপৃষ্ঠ হইতে প্রতিদিনই প্রায় ৫৫মণ জল পত্রশুলাদি দ্বারা শোষণ করিয়া লয় এবং তিক্ সেই-পরিমাণ জলই প্রতিদিন বাষ্পাকারে আকাশে উৎক্ষিপ্ত করে।

স্থানীয় উষ্ণতা এবং পরীক্ষারলের বায়ু ও আকাশের অবস্থা ইত্যাদির পরিবর্তনের সহিত উৎপন্ন বাষ্পের পরিমাণও পরিবর্তিত হয়,—এইজন্য পূর্ববর্ণিত পরীক্ষাপদ্ধ গণনার আল্লাদিক ভ্রম অবশ্যস্বাভাব্য। কিন্তু বৃক্ষের পত্রকাণ্ডাদি হইতে প্রতিদিনই যে প্রভূত জলীয়-বাষ্প আকাশের হইয়া মেঘোৎপত্তির সহায়তা করিতেছে, তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। বৎসরের নানা সময়ে শীতপ্রধান দেশের অরণ্যভূতলের অবস্থা পরীক্ষা করিলে পূর্বোক্ত উক্তির সত্যতা প্রত্যক্ষ দেখিতে পাওয়া যায়। শীতকালে ঐ সকল অরণ্যভূমির অধিকাংশ স্থানই ঘন সন্ধ্যাবর্ণে সিক্ত থাকে, কিন্তু অপর ঋতুতে, এমন কি বর্ষাকালেও, তথায় তড়প আশ্রয় দেখা যায় না। বৈজ্ঞানিকগণ বলেন, ঋতুবিশেষে শীতপ্রধান-

দেশজ উদ্ভিদের তলশোষণশক্তির অত্যধিক হ্রাসবৃদ্ধি হয় বলিয়া, পূর্বোক্ত বিশদূর্ণ ঘটনাত আশ্রয় দেখিতে পাই। বর্ষাকালে প্রচুর বৃষ্টিপাত হয় সত্য, কিন্তু সেই ঋতুতে বৃক্ষাদির জৈবক্রিয়া পূর্ণভাবে চলিতে থাকে, কাজেই ভূশোষিত হওয়ার পর যে জল উদ্ধৃত থাকে, তাহার সকলই উদ্ভিদশুল দ্বারা শোষিত হইয়া যায়, অরণ্যভূতলে জল সঞ্চিত থাকিতে পারে না। যদি তলসঞ্চিত জলের তুলনায় বৃক্ষের পত্রকাণ্ডাদির স্থান জল হইয়া পড়ে, তাহা চটলেও তলশোষণের বিরাম হয় না,—উদ্ভিদসকল স্বতই সদ্য-উদগত শাখাপত্রাদিতে ভূষিত হইয়া সন্ধ্যা জলের স্থান-সংকুলান করিয়া লয়। এইপ্রকারে অতিবর্ষণ-সময়েও অরণ্যভূতল অপেক্ষাকৃত শুষ্ক থাকে। কিন্তু শীতপ্রধান দেশের অধিকাংশ উদ্ভিদকে শীতের প্রারম্ভ হইতেই ভ্রষ্টপত্র হইয়া স্তম্ভবত্তার থাকিতে দেখা যায়, এই সময়ে ইহাদের মূলের আর পূর্ববৎ রসাকর্ষণ-শক্তি থাকে না,—কাজেই হীনবীৰ্য্য-সৌর-ক্রিয়ায় বাষ্পীভূত এবং ভূশোষিত হওয়ার পর যে জল উদ্ধৃত থাকে, তাহা ক্রমে সঞ্চিত হইয়া অরণ্যভূতলাকে আশ্রয় করিয়া তোলে। যে সকল বৃক্ষের শোষণশক্তিতে বর্ষণবিহীন শীতকালেও অরণ্যভূতল পড়িল হইয়া পড়ে এবং অজস্র-বারিষাত-সময়েও যে সকল বৃক্ষের জলশোষণশক্তিসাহায্যে বর্ষাকালেও বনভূমি শুষ্কপ্রায় থাকিয়া যায়, সেই সকল অরণ্যভূতল দ্বারা প্রতিদিন কত জল শোষিত হইয়া বাষ্পীভূত হইতেছে, তাহা বোধ হয় পাঠকপাঠিকাগণ এখন কতকটা অস্বাভাব্য করিতে পারিবেন।

বৈজ্ঞানিকগণ বলেন :—আগ্ন্য-
বৃক্ষ-পরিভ্রাতৃ উল্লিখিত বিশাল বাষ্পরাশি
বনভূমির বর্ষণাধিকার আর একটি কাবণ ।
পাঠকপাঠিকাগণ যোগ্য হইয়া জানেন,—
এক দীর্ঘাবধি তানোর নিষ্কটপরিমাণ বাষ্প-
রাশি কমাটয়া তরলীভূত করিবার যুগত
হইলি উপায় আছে । প্রথম চাপপ্রয়োগ,
দ্বিতীয় শৈত্যানুযোগ । একটা গোলকের
মধ্যবর্তী আবদ্ধ বাষ্প বরফদ্বারা শীতল কর,
শৈত্যের পরিমাণ প্রচুর হইলে, বাষ্প ছবিয়া
যাইবে । আবার সেই বাষ্প সঙ্কুচিত করিয়া
হা বাহির হইতে গোলকে আবে। বাষ্প
প্রবিষ্ট করাটয়া; তাহার চাপবৃদ্ধি কর,
তাহা হইলেই দেখিবে, বাষ্প তরলীভূত
হইয়া পড়িয়াছে । আকাশ প্রচুর মেঘে
আচ্ছন্ন, কিন্তু বর্ষণ নাট,—ইহার কারণও
পূর্ণোক্তচাপ বা শৈত্যের অভাব ব্যতীত
আর কিছুই নহে । শীতল-বায়ু-সংশ্লিষ্ট
কারণে সেই বাষ্পরাশির তাপের হ্রাস হইলে
বা নূতন বাষ্প সঞ্চারিত হইয়া তাহার
চাপবৃদ্ধি করিলে, সেই মেঘই আবার জলে
পরিণত হইয়া বর্ষণ করে । বৈজ্ঞানিকগণ
বলেন, উচ্চতাত্ত্বিক বা চাপবরতা প্রযুক্ত
বর্ষণের অল্পপোষী উল্লিখিত মেঘসকল যখন

বায়ুবিভাজিত হইয়া; বনভূমির উপর দিয়া
ভ্রামিয়া যায়, আগ্ন্যবৃক্ষপরিভ্রাতৃ সেই
সঙ্কুচিত বাষ্পরাশি তাহাতে সংযুক্ত হইয়া
বর্ষণোপযোগী চাপের অভাব পূরণ করে
এবং সঙ্গে সঙ্গে তদ্বারা বনভূমিতে প্রচুর
বারিপাত হইয়া যায় ।

বান্দীভূত হইবার সময় পর্যায়মাত্রেরই
চাপের ক্ষয় হয়—তানের পর পাত্তাংশের জল
শারীরিক ও বাহ্যিক তাপে বাষ্পীভূত হই-
বার সময়, সেই তাপের অনেকটুকু : আগ্ন্য-
বৃক্ষের ক্ষেপে, এতদন্ত আমরা জানিতে
বেন একটা শৈত্য অস্তিত্ব করিতে পারি ।
সেইপ্রকারে বৃক্ষপাত্তাংশের জলার মত
বাষ্পীভূত হইবার সময় আগ্ন্যবৃক্ষের
উপরিস্থ বায়ুরাশির অধিকাংশ তাপই অস্থ-
বিত হইয়া যায় এবং কাজেই তদ্বারা আগ্ন্য-
বায়ুতে একটা মিথুতার উৎপত্তি হয় । এই
মিথুতা বনভূমির বর্ষণাধিকার অন্তত-
কারণ-স্বরূপ উল্লেখ করা যাউতে পারে ।
মেঘরাশি ভাসিতে ভাসিতে বনভূমির
উপরিস্থ সেই শীতল বায়ুর সংস্পর্শে আসিবা-
নাত তাহার উচ্চতার হ্রাস হইয়া যায়,—
কাজেই এই অবস্থায় বনভূমিতেই অধিক
বর্ষণ হইয়া পড়ে ।

শ্রীজগদানন্দ রায় ।

কাঁদিয়া জানালে বাণ্য বল বেধি কতু সেথা
হয় প্রতিকার !
হেণাকার মত প্রাণে বসন্ত কি নাহি আনে
মব আগরন,
কুলের গ্রন্থমহাস, কোকিলের কুহুতাষ,
মন্ত সন্মারণ ?
সেথাও উল্লাসগোল, শিশুর মধুর বোল,
প্রেম-আলাপন
অশ্রুনের চিত্তাধূমে সহসা কি চিরস্থমে
চর সমাপন ?
লভ প্রাণ, ভিক্ষা মাগি, একবার উঠ আদি'
বল ছুটি কথা,
তার পথে চিরতরে লহ মোরে লাগি করে'
সাধিব না বুঝা !

শ্রীহরিশচরপ্রসাদ বোষ ।

প্রাচীন ভারতের “একঃ” ।

বৃক্ষ ইব ততো বিবি ভিত্তাতোক-
জেনেং পূর্ণি পুরুষঃ সৰ্ব্বঃ ।

বৃক্ষের স্তায় আকাশে শুভ্র হইয়া
আছেন—সেই এক । সেট পুরুষে—সেই
পরিপূর্ণে এ সমস্তট পূর্ণ ।

যক্ষ সোম্য বরাংসি যাসৌবক্ষঃ সজ্জতিষ্ঠতে । এবং
ই বৈ তৎ সৰ্ব্বং পর আত্মনি সজ্জতিষ্ঠতে ।

হে সৌম্য, পক্ষিসকল যেমন বাসবক্ষে
আসিয়া স্থির হয়, যেমন এই বাহ্য
কিছু, সমস্তই পরমাত্মার প্রতিষ্ঠিত হইয়া
থাকে । =

নদী যেমন নানা বক্রপথে—সরলপথে,

নানা শাখা-উপশাখা বহন করিয়া, নানা
নির্করধারায় পরিপূর্ণ হইয়া, নানা বাধা-
বিপত্তি ভেদ করিয়া এক মহাসমুদ্রের দিকে
ধাবমান হয়—মহুঘোর চিত্ত সেইরূপ পদা-
স্থান না জানিয়াও অসীম বিশ্ববৈচিত্র্যে
কেবলি এক হইতে আর একের দিকে
কোথায় চলিয়াছিল ? কুতূহলী বিজ্ঞান
ধণ্ডধণ্ড পদার্থের দ্বারে দ্বারে অণু-পরমাণুর
মধ্যে কাহার সন্ধান করিতেছিল ? যে-
ক্রীতি পদে পদে বিরহ-বিসৃতি-মৃত্যুবিজ্ঞেদের
দ্বারা পীড়িত হইয়া,—অগ্রহীন তৃষ্ণার

খায়া ভাড়িত হইয়া,—পথে পথে কাহাকে
প্রার্থনা করিয়া ফিরিতেছিল? তথাহুয়া
তক্তি তাহার পূজার অর্থ মত্তকে লইয়া
অগ্নি-বৃথা-বান্ধ-বন্ধ-মেঘের মধ্যে কোথায়
উদ্ধৃত হইতেছিল?

এমন সময় সেই অন্তঃকরণ পথপরিশ্রম
জানামান দিশাহারা পথিক ভূমিতে পাইল—
পথের প্রান্তে ছায়া-নিবিড় তলোবনে গম্ভীর
মন্ত্রে এই বাক্য উদ্যত হইতেছে—

বৃক্ষ ইব তুচ্ছো দিব্য ত্রৈলোক্য-

তেনেবঃ পূর্বঃ পুরুষেণ মনস্৷

বৃক্ষের ন্যায় থাকিলে তুচ্ছ হইয়া
আছেন—সেই এক । সেই পুরুষে—সেই
পরিপূর্ণে এ সমস্তই পূর্ণ ।

সমস্ত পথ শেষ হইল, সমস্ত পথের কষ্ট
দূর হইয়া গেল । তখন অন্তঃকরণ কাব্য-
কারণের ক্লাস্তিকর শাখা-প্রশাখা হইতে
উত্তীর্ণ হইয়া জ্ঞান বাগল—

একৈবমাত্মত্বমাত্মনোভবমতঃ প্রথম্ ।

বিভিন্ন বিশ্বের চকল বহুত্বের মধ্যে
এই অপরিমের এককে একধার দেখিতে
হইবে । সহস্র বিভাবিকা ও বিশ্বের
মধ্যে দেবতাসম্মানপ্রাপ্ত তক্তি তখন
বলিল—

এব সর্বৈবর এব তুত্মাখপতিঃষ তুতপাল এব
সেতুর্বিবরন-এবঃ সোকাশাসমুদেদার ।

এই একই সকলের ঈশ্বর, সকল জীবের
অধিপতি, সকল জীবের পালনকর্তা—
এই একই সেতুপুরুষ হইয়া সকল লোককে
ধারণ করিয়া ধরস হইতে রক্ষা করিতে-
ছেন । বাহিরের বহুতর আঘাতে-আকর্ষণে
ক্লিষ্ট-বিকল প্রেম করিল

তবেতৎ প্রেতঃ পুরাৎ প্রেতো বিস্তাৎ, প্রেতোহন্য-
ন্যৎ সঙ্গমাবগবতঃ যবনমাত্মঃ ।

সেই যে এক, তিনিই সকল হইতে
অন্তঃকরণ পরমাত্মা, তিনিই পুত্র হইতে
প্রিয়, বিত্ত হইতে প্রিয়, অন্য সকল
হইতেই প্রিয় । সুহৃৎসেই বিশ্বের বহুবিশ্বো-
দেহ মধ্যে একের প্রবশান্তি পরিপূর্ণ হইয়া
দেখা দিল,—একের সত্য, একের অর্ন্তর,
একের আনন্দ, বিচ্ছিন্ন ভগৎকে এক
করিয়া অপ্রমেয় সৌন্দর্যে গাণিয়া তুলিল ।

শিশির-নিষিক্ত শীতের প্রত্যাশে পূর্ব-
দিক্ যখন ‘অকণবর্ণ, গন্যাপাচ্ছন্ন বিশাল
প্রান্তরের মধ্যে আসন্ন আগরুণের একটি
অশুভ পাত্তি বিস্তাকমান,—যখন মনে হয়,
যেন জীবধাতুী নাতা বহুছায়া ত্রাস্তসুহৃৎসে
প্রথম নের উদ্ভাণন করিয়াছেন, এখনো
সেই বিশ্বগেহিনী তাহার বিপুল গৃহের
অসংখ্যদীবালালকাদি আরম্ভ করেন নাই,
তিনি যেন, দিবসারম্ভে ওজস্বন্ত
উজ্জারণ করিয়া ভগ্নস্থানিরের উদ্ভাটিত
অর্থতোষণবারে ত্রাণাওপতির নিকট মত্তক
অবনত করিয়া তুচ্ছ হইয়া আছেন—তখন
যদি চিন্তা করিয়া দেখি, তবে প্রতীতি হইবে,
সেই নির্জন নিঃশব্দ নীহারমণ্ডিত প্রান্তরের
মধ্যে প্রাণের অন্ত নাই । প্রত্যেক তুণ-
বলেত অগুতে অগুতে জীবনের বিভিন্ন চোঁটা
নিরন্তর, প্রত্যেক শিশিরের কণার কণার
সংযোগন-বিযোগন-আকর্ষণ-বিকর্ষণের কার্য
বিশ্রামবিহীন । অথচ এই অশ্রান্ত
অপরিমের কর্মব্যাপারের মধ্যে শান্তি-
সৌন্দর্য অচল হইয়া আছে । অন্য এই
সুহৃৎসে এই প্রকৃত পৃথিবীকে যে প্রচণ্ড-

শক্তি প্রবলবেগে শূন্যে আকর্ষণ করিয়া লইয়া চলিরাছে, সে শক্তি আমাদের কাছে কখনো না আসিবে, তাই আমরা বলিতেছিলাম না। অথচ এই মুহূর্তে পৃথিবীকে পরিবেষ্টন করিয়া সমস্ত মহাশয়ই যে লক্ষ্য করিয়া লক্ষ্য করিতেছে, শতশতাব্দী ধর্মনির্ভর যে কল্যাণ উদ্ভিষ্টেছে, অরণ্য-অরণ্যে যে আশ্রয়, পল্লব-পল্লব যে অশ্রুধারা, আমরা তাহার কি জানিতেছি! বিশ্বব্যাপী যে মহাকর্ষ-শক্তি দ্বারা লক্ষ্যে পৌঁছিয়াছে, তাহার অনন্ত কলরব কাহাকে বোধ করিরাছে?—তাহার গতি ও প্রবাহের দৃশ্য কাহাকে পিত্ত করিতেছে? এই কল্যাণবোধিত পৃথিবীকে যখন সূর্য-ভাবে দেখি, তখন দেখি, তাহা চিরদিন অজ্ঞাত, অস্পষ্ট প্রাণ, হৃদয়—এত কথ্যে, এত চেষ্টায়, এত চেষ্টায়—হৃদয়বোধের অবি-জ্ঞান চক্রের দ্বারা সে চিত্ত, চিত্ত, তাহার জ্ঞান হয় নাই। চিরদিনই তাহার প্রভাভ কি সৌন্দর্য, তাহার মধ্যস্থ কি শান্ত-গভীর, তাহার সাধ্য কি করুণ-কোমল, তাহার স্রাব কি উদার-উদাসীন! এত বৈচিত্র্য এবং প্রবাহের মধ্যে এই চির শান্তি এবং সৌন্দর্য, এত কলরবের মধ্যে এই পরিপূর্ণ সঙ্গীত কি করিয়া সম্ভবপর হইল? ইহার এক উত্তর এত যে—

যদি ইহা কোনো বিশিষ্ট জিনিস—

মহাকাশে সূর্যের দ্বারা তরঙ্গ হইয়া আসিলে—সেই ঐক্য। সেটুকুই বৈচিত্র্য ও সূর্য এবং বিশ্বকর্ষের মধ্যেও বিশ্বব্যাপী শান্তি বিচলিত।

গভীর রাতে অনায়াসে আকাশতলে চারিদিকে কি নিভৃত এবং নিঃশব্দে কি একাকী বলিয়া মনে হয়! অথচ তখন আলোকের অবনতি। অপসারিত হইয়া গিয়া চৈতন্য আমরা জানিতে পাই যে, অন্ধ-কার সভ্যতলে স্রোতাক্রমে অনন্ত জনতার মধ্যে আমরা গভীরমান! এ কি অপরূপ আশ্চর্য, অনন্ত জগতের নিভৃত নির্জনতা! কত জ্যোতির্বিদ্য এবং কত জ্যোতির্বিদ্য মহাশয়মণ্ডল, কত অপরূপ জ্যোতির্বিদ্য জগতের সূর্য, কত উদার বায়ুমাধ্যম, কত ভীষণ অগ্নি-উজ্জ্বল—তাহারই মধ্যস্থলে আমি সম্পূর্ণ নিভৃত—একান্ত নির্জন পৃথিবী—শান্তি এবং বিরামের সাম্য নাটক—এমন সম্ভব হইল কি করিয়া? ইহার কারণ—

যদি ইহা কোনো বিশিষ্ট জিনিস—

নহিলে এই জগৎ, বাহ্যে বিচিত্র, বাহ্যে অপরূপ, বাহ্যে প্রত্যেক কণা-কণিকাটিও কম্পিত-বৃত্তিত, তাহা কি উজ্জ্বল! বৈচিত্র্য যদি একবিধ হইত, তাহা হইত এক-রকমের প্রাণিত না হইত, উদার শক্তিসম্বল যদি শুধু একের দ্বারা গৃহীত হইত। না থাকে, তবে তাহা কি করিল, তবে বিশ্বসৃষ্টির কি অনি-র্জন্যের বিস্তারিত! তবে আমরা দুর্ভাগ্য-জগৎপুঞ্জের মধ্যে তাহার বলে এত নিভৃত-হইয়া আছি? এই মহা-অপরিচিত, বাহ্যে প্রত্যেক কণিকাটিও আমাদের কাছে চৈতন্য-রহিত, তাহার বিখ্যানে আমরা ইহাকে চৈতন্য-রহিত নাহুৎকোড়ের মত অগ্রহণ করি-তেছি! এই যে আমাদের উপর আদি-এখনই বাসিয়া আঁচ, তাহার মধ্যে সংজ্ঞা-

বিবোধনের যে মহাশক্তি কাজ করিতেছে, তাহা এই আনন্দ হইতে আশ্রয় করিয়া সূর্য্য-লোক-নক্ষত্রলোক পর্য্যন্ত অবিচ্ছিন্ন-অখণ্ড ভাবে চলিয়া গেছে, তাহা সুখসুখান্তর হইতে নিরন্তরভাবে লোকলোকান্তরকে পিণ্ডীকৃত-পৃথক্কৃত করিতেছে, আমি তাহারই ক্রোড়ের উপর নির্ভর্যে অত্যাশ্রয় বসিয়া আছি, তাহার ভীষণ সত্বকে ভানিতেও পারিতেছি না—সেই বিশ্বব্যাপী বিরাট্-ব্যাপার আমার বিশ্রামের লেশমাত্র ক্ষতি করিতেছে না । ইহার মধ্যে আমার খেলিতেছি, গৃহনির্মাণ করিতেছি—এ আমারদের কে ? ইহাকে পূত্র করিলে কোনই উত্তর দেন না । ইহা দিকে দিকে আকাশ হইতে আকাশান্তরে নিকরেশ হইয়া শতখা-সহস্রখা চলিয়া গেছে এটী মৃত মৃত মহা-বহুত্বপূর্ণ মধ্যে কে আমারদের এমন প্রিয়, পরিচিত, আত্মীয়সম্বন্ধ বাধিয়া দিয়াছেন ? তিনি—যিনি,

বৃক ইব শুভো বিসিদ্ধিতোকঃ ।

এই এককে আমরা বিশ্বের বৈচিত্র্যের মধ্যে জ্বলন এবং বিশ্বের শক্তির মধ্যে শান্তি-বৃদ্ধকে দেখিতেছি, তেমনি মাহুয়ের সংসারের মধ্যে সেই শুভ একের ভাবটি কি ? সেই ভাবটি মঙ্গল । এখানে আঘাত-প্রতি-ঘাতের নীচা নাই, এখানে হুৎহুৎ, বিরহ-বিলন, বিপৎসম্পন্ন, লাভক্ষতিতে সংসারের সর্ব্বের সর্ব্বকণ বিস্তৃত হইয়া আছে । কিন্তু এই চাকলা—এটী সংগ্রামের মধ্যে সেটী এক নিরন্তর শুভ চইয়া আছেন বলিয়া সংসার প্রঃসপাপ্য হয় না । সেটী বস্তুটী নানা বিরোধ-বিবেচনের মধ্যেও পিতামাতার সন্ততি

পুত্র, ভ্রাতার সন্ততি ভ্রাতা, প্রতিবেশীর সহিত প্রতিবেশী, নিকটের সন্ততি দূর, প্রত্যাহ প্রতিমুহূর্ত্তেই এগিত হইয়া উঠিতেছে । সেটী ঐক্যভাব আমার অধিকের আক্ষেপে বতই ছিন্নবিচ্ছিন্ন করিতেছি, ততই তাহা আপনি ছোড়া নাগিরা যাটতেছে । যেমন খণ্ডভাবে আমরা ভগ্নতের মধ্যে অসংখ্য কদম্বাভা দেখিতে পাই, কিন্তু তাহা সবও সমস্ত ভগ্নং মহাদোকর্ষ্যে প্রকাশিত—তেননি খণ্ডভাবে সংসারে পাণতাপের সীমা নাই, তথাপি সমস্ত সংসার অবিচ্ছিন্ন মঙ্গল-হুত্রে চৈবদিন দৃঢ় চইয়া আছে । ইহার অংশের মধ্যে কত অশান্তি কত অসামন্তস্ত দেখিতে পাই, তবু দেখি, ইহার সমগ্রের মঙ্গল-আদর্শ পিতৃতে নষ্ট হয় না । সেই-জন্ত মানুষ সংসারকে এমন মচড়ে আশ্রয় করিয়া আছে । এত বৃহৎ লোকসংখ্য, এত অসংখ্য অনাড়ম্বর, এত প্রবল বার্ষ-সংবাত, তবু এ সংসার রমণীয়, তবু ইহা আমাদের দক্ষা ও পানন করিবার চেষ্টা করে, নষ্ট করে না । ইহার হুঃখতাপও মহামঙ্গলসঙ্গীতের একতানে অপূর্ণ হলে মিলিত চইয়া উঠিতেছে—কেন না,

বৃক ইব শুভো বিসিদ্ধিতোকঃ ।

আমরা আমাদের জীবনকে প্রতিক্ষেপে খণ্ড-খণ্ড করি বলিয়াই সংসারতাপ হুঃপহ হয় । সমস্ত ক্ষুদ্র বিচ্ছিন্নতাকে দেই মহান একের মধ্যে এগিত করিতে পারিলে, সমস্ত আক্ষেপ-বিক্ষেপের হাত চইতে পরিত্রাণ পাই । সমস্ত ভগ্নবস্ত্তি-সমস্ত কদম্বভাঙকে ঠাঁহা হাণ্ড সমাধির করিয়া পুণ্ডিল কোন বাদ্য

আমার অধীরতা, কোন্‌ বিয়ে আমার নৈরাত্ত, কোন্‌ শোকের কণার আমার কোভ, কোন্‌ সক্ষমতার আমার অহতাহ, কোন্‌ বিকলতার আমার মানি ! তাহা হটলেই আমার সকল কর্ণের মধ্যেই ধৈর্য ও শান্তি, সকল চক্ষুর মধ্যেই সৌন্দর্য ও মঙ্গল উদ্ভাসিত হয়, চঃখতাপ পুংগো বিকশিত এবং সংসারের সমস্ত আঘাতবেদনা মাধুর্যে উজ্জ্বলিত হইয়া উঠে। তখন সর্বত্র সেই শুদ্ধ একের মঙ্গলবন্ধন অপ্রভব করিয়া সংসারে চঃখের অস্তিত্বকে চূর্ণেরা প্রহেলিতা বলিয়া গণ্য করি না—চঃখের মধ্যে, শোকের মধ্যে, অভাবের মধ্যে নতমস্তকে ঠাঁচাকেই স্বীকার করি—বীতার মধ্যে হৃৎস্পৃগাত্তর হইতে, সমস্ত ভগৎসংসারের সমস্ত চঃখতাপের সমস্ত তাৎপর্য অবশু মঙ্গলে পরিণমাপ্ত হইয়া আছে।

যুত্যাঃ স বুদ্ধাম্যোগোতি য ইহ নানেন পত্ততি ।

যুত্বা হইতে সে যুত্বাকে প্রাপ্ত হয়, যে ইহাঙ্কে নানা করিয়া দেখে।

খণ্ডতার মধ্যে কদম্বতা, সৌন্দর্য্য একের মধ্যে; খণ্ডতার মধ্যে প্রহাস, শান্তি একের মধ্যে; খণ্ডতার মধ্যে বিরোধ, মঙ্গল একের মধ্যে; তেননি খণ্ডতার মধ্যেই যুত্বা, অমৃত সেট একের মধ্যে। সেই এককে ভিন্নবিভিন্ন করিয়া দেখিলে, সহস্রের হাত হইতে আপনাকে আর বন্ধা করিতে পারি না। তবে বিষয় প্রবল হইয়া উঠে, 'ধনতমমান বড় আকার ধারণ করিয়া আমাদিগকে ঘুরাইতে থাকে, অশ্ব-রথ-ট্টক-কাঠ মর্গাদিলাভ করে, ব্রহ্মাসামগ্রী-সংগ্রহচেষ্টার অন্ত থাকে না,

প্রতিবেশীর সহিত নিরন্তর প্রতিযোগিতা জাশিয়া উঠে, জীবনের শ্রেষ্ঠদিন পণ্ডিত কাড়াকাড়ি-হানাহানির মধ্যে নিভেকে খণ্ড-খণ্ড করিতে থাকি, এবং যুত্বা বধন আমা-দের এই ভাগ্যবাহার চইতে আমাদিগকে অকস্মৎ আকর্ষণ করিয়া লইয়া যায়, তখন সেট শেষ যুত্বা হইতে সমস্ত জীবনের বহুবিদ্যো-দের সক্তি স্তুপাকার ব্রহ্মাসামগ্রীগুলিকেই প্রিবত্তব বলিয়া, আত্মার পরম আশ্রয়স্থল বলিয়া, অস্ত্রমবলে বকে আকর্ষণ করিয়া ধরিতে চাহি।

মনসৈবেদমাশ্রয়াঃ নেহ নানান্তি কিকন ।

মনের দ্বারাষ্ট ইচ্ছা পাওয়া যায় যে, ইচ্ছাতে 'নানা' কিছুট নাট।

বিষয়গুলির মধ্যে সে অগ্রমের প্রব রহিষাভেন, তিনি বাহ্যত একভাবে কোথাও প্রতিষ্ঠাত নভেন,—মনট নানার মধ্যে সেই এককে দেখে, সেট এককে প্রার্থনা করে, সেট এককে আশ্রয় করিয়া আপনাকে চরিতার্থ করে। নানার মধ্যে সেই এককে না পাটলে মনের শ্রুখ-শান্তি-মঙ্গল নাট, তাহার উদ্ভাস-ভ্রমণের অবসান নাই। সেট প্রব একের সহিত মন আপনাকে যুত্বাবে যুক্ত করিতে না পারিলে, সে অমৃতের সহিত যুক্ত হয় না—সে খণ্ডখণ্ড যুত্বাভাগ আদত, তাড়িত, বিক্লিষ্ট হইয়া বেড়ায়। মন আপনার আত্মবিক-বর্ণনামস্তটই কখনো জানিয়া, কখনো না জানিয়া, কখনো বক্রপথে, কখনো সরলপথে, সকল জ্ঞানের মধ্যে—সকল ভাবের মধ্যে অচরত সেট পরম ঐশ্ব্যর পরম আনন্দকে সন্ধান করিয়া ফিরে। যখন পায়, তখন

একমূর্ত্তেষ্ঠ বলিয়া উঠে—আমি অমৃতকে
পাঠিয়াছি,—বলিয়া উঠে—

বেদাচরিতঃ পুত্রঃ মহাত্ম-

স্বাধিত্যর্থঃ তমসঃ পরমাত্মং ।

য এতৎসিদ্ধমুত্তমং তদস্মি ।

অঙ্ককারের পাঠে আমি এটী জ্যোতিষ্মত
মহান্ পুরুষকে আনিয়াছি । তাহারাই হাকৈ
জ্ঞানেন, তাহারাই অমর হন ।

পত্নী মৈত্রেয়ীকে সমস্ত সম্পত্তি দিয়া
যাজ্ঞবল্ক্য বধন বান ঘাটতে উদ্যত হইলেন,
তখন মৈত্রেয়ী স্বামীকে কিস্তাসা করিলেন—
এ সমস্ত লইয়া আমি কি অমর হইব ? যাজ্ঞ-
বল্ক্য কহিলেন, না, তাহার উপকরণ লইয়া
পাঠে, তাহাদের যেক্রপ তোমারও সেইরূপ
জীবন হইবে । তখন মৈত্রেয়ী কহিলেন—

যেনঃ নাত্যন্তা স্তাং কিমচ্যং তেন বৃথাঃ ?

যাহার দ্বারা আমি অমৃত না হইব, তাহা
লইয়া আমি কি করিব ?

যাহঃ বহু, যাগা বিচ্ছিন্ন, যাহা মৃত্যুর
দ্বারা আক্রান্ত, তাহাকে পরিত্যাগ করিয়া
মৈত্রেয়ী অশ্বত্থ অমৃত একের মধ্যে আশ্রয়
প্রার্থনা করিয়াছিলেন । মৃত্যু এটী ভগন্তের
সহিত, বিচিত্রের সহিত, অনেকের সহিত,
আমাদের সর্বকর্তার পরিবর্তন করিয়া দেয়—
কিন্তু সেই একের সহিত আমাদের পরিবর্তন
ঘটাটতে পারে না । অতএব যে সাধক
সমস্ত অশ্বত্থকরণের সহিত সেই এককে
আশ্রয় করিয়াছেন, তিনি অমৃতকে বরণ
করিয়াছেন ; তাহার কোন ক্ষতির ভয়
নাই, বিচ্ছিন্নের আশঙ্কা নাই । তিনি
জ্ঞানেন, জীবনের সুখভোগ নিরন্তর চকল,
ব্রহ্ম তাহার মধ্যে সেই কল্যাণরূপী

এক শুদ্ধ চৈতন্য রচিয়াছেন, শান্তকতি
নিভা আদিত্যে-চৈতন্যে-চৈতন্যে, কিন্তু সেই এক
পরমলাভ আশ্রয় নথ্য শুদ্ধ চৈতন্য বিস্ময়
করিতেছেন ; বিপৎসম্পদে দুর্দৃষ্টে-দুর্দৃষ্টে
আবস্থিত হইতেছে, কিন্তু—

১ এতান্য পরমা পুষ্টিঃ, এতান্য পরমা সম্পৎ, এত-
ৎস পরমা লোকঃ, এতৎস পরমা আনন্দঃ—

সেই এক রহিয়াছেন—যিনি জীবের পরমা
পুষ্টি, যিনি জীবের পরমা সম্পৎ, যিনি জীবের
পরমা লোক, যিনি জীবের পরমা আনন্দ ।

ব্রহ্ম-পশু-মানুষ-বন-কাঠ-গোষ্ঠে,
ঘর্ণ-রৌপ্য-লটরা কে বিরোধ করিবে ?
তাহার আমার কে ? তাহার আমাকে
কি দিতে পারে ? তাহার আমার পরম-
সম্পৎকে অপরায়ণ করিতেছে, তাহাতে
বিবাহারের মধ্যে লেশমাত্র ক্ষোভ অনুভব
করিতেছি না, কেবল তাহাদের পূজীকৃত
সক্রে গম্ভীর করিতেছি ! হস্তি-অশ্ব-
কাঠ-প্রভৃতিরই গৌরব, আদ্যার গৌরব
নাই, পুত্র জনমে জনমেবৈব, স্থান
নাই ! সর্গাপেক্ষা চীনতম দীনতা যে
পরমাচীনতা, তাহার দ্বারা সমস্ত অশ্বত্থ-
করণ রিক্ত, শ্রীহীন, মলিন, কেবল বসনে-
ভূষণে, উপকরণে-আয়োজনে আমি ক্ষীণ !
অগম্যবৈবের কাণ করিতে পারি না ; কেন
না, শব্দ-আগম-বৈব-ভূষার কাছে বাসবৎ
নিখিয়া দিয়াছি, অড়-উপকরণ-ভজালোর
কাছে যথা বিকটিয়া বলিয়াছি—সেই সকল
ধূলিময় পদার্থের ধূলা জড়িতেই আমার
দিন যায় !—ঐবৈবের কাছে আমার কিছু
দিবার সামর্থ্য নাই, কারণ ব্রহ্ম-পদার্থ-অশ্ব-
রথে আমার সমস্ত দান নিঃশেষিত ! সমস্ত

মঙ্গলকণ্ঠ পাড়িয়া ব্রহ্মণ্য, কারণ পাঁচজন
 যুগে নিজেই নামকে প্রসিদ্ধি করিয়া তুলিয়া
 আত্মবলে জীবনধারণ করিতেই আমার
 সমস্ত চেষ্টার অবসান ! শত-চিত্র কলসের
 মধ্যে ভলসকর করিবার জন্য জীবনের শেষ-
 দুই পূর্ণতা বাপ্ত হইয়াছে, অবশিষ্ট
 অমৃতপায়ার সমুদ্রে শুষ্ক হইয়া রহিয়াছে :
 যিনি সকল সত্যের সত্য, অন্তরে-বাহিরে
 জানে-ধর্ম কোণাও তাঁকে দেখি না—
 এত বড় অজ্ঞতা নষ্টা আমি পবিত্র !
 যিনি আনন্দরূপময়, যে আনন্দের কণা-
 নাত্র আনন্দে সমস্ত জীবজন্তুর পাণের চোটা,
 মনের চোটা, প্রীতির চোটা, পুণ্যের চোটা উৎ-
 সাহিত রহিয়াছে, তাঁহাতে আমার আনন্দ
 নাই, আমার আনন্দ আমার গর্গ স্বেদন
 উপকরণসামগ্রীতে,— এমন বৃহৎ চতুর্থে
 আমি পবিত্র ; যাঁহার অঙ্গাঙ্গীর্ণাঙ্গীর্ণে
 জীবপ্রকৃতি অজ্ঞাত অক্লিষ্ট সহস্রনন্দ
 বৎসরের মধ্য দিয়া গর্ভে চটতে পরমার্থে,
 বেজ্ঞাচার চটতে সংযমে, এককতা চটতে
 সমাজতন্ত্রে উপনীত হইয়াছে, যিনি মহন্তরং
 বজ্রমুখ্যতম, যিনি যত্নেই টানলঃ, সর্ব-
 কালে সর্বলোকে যিনি আমার দ্রব,
 তাঁহার আদেশবাক্য আমার কর্ণগোচর
 হয় না, তাঁহার কর্ণে আমার কোন আশ্রয়
 নাই, কেবল জীবনের করেদিনমাত্র
 যে করেকটি লোককে পাঁচজন বলিয়া জানি,
 তাহাদেরই ভঁরে এবং তাহাদেরই চটুকায়
 চালিত হওয়াই আমার চর্চা মানবজন্মের
 একমাত্র লক্ষ্য— এমন মহামুঢ়তার দ্বারা
 আমি সমাজের ! আমি জানি না, আমি
 দেখিতে পাই না—

যুগ ইহা শুধো দিবি ত্রিভুজক-

যেমনঃ পূর্ণ পুরুষের নন্দ ।

আমার কাছে সমস্ত ভগ্নং ত্রিবিধি, সমস্ত
 বিজ্ঞান খণ্ডবিখণ্ড, সমস্ত জীবনের
 লক্ষ্য ক্ষুণ্ণ ক্ষুণ্ণ সহস্র অংশে বিভক্ত-বিধীর্ণ !

হে অনন্ত বিশ্বসংসারের পঞ্চম এক
 পঞ্চমাত্মন, তুমি আমার সমস্ত চিত্তকে গ্রহণ
 কর ! তুমি সমস্ত ভগ্নভেদে সঙ্গে সঙ্গে
 আমাকে পূর্ণ করিয়া শুষ্ক হইয়া রহিয়াছে,
 তোমার সেই পূর্ণতা আমি আমার দেখে-
 নেন, অন্তরে বাহিরে, জানে-কণ্ঠে-ভাবে যেন
 প্রত্যক্ষ উপলব্ধি করিতে পারি ! আমি
 আপনাকে সর্বতোভাবে তোমার দ্বারা
 আবৃত রাখিয়া নীরবে নিঃসৃতমানে তোমার
 কণ্ঠ করিতে চাই ! অচরিত তুমি আদেশ
 কর, তুমি আদেশ কর, তোমার প্রদ-
 দ্বীপ্যতা আনন্দে আনন্দ দাও, তোমার
 দক্ষিণবাহুদ্বারা আমাকে বল দান কর ।
 অবসানের চক্ষু যখন আসিবে, বজ্রের
 যখন নিরন্তর হইবে, লোকের যখন, লাহুনা
 করিবে, আহুত্যা যখন চর্চা চটবে, তুমি
 আমাকে পরাণ-চুলুটি চটতে দিগো না ;—
 আমাকে সহস্রের সুধাপেক্ষী করিও না ;
 আমাকে সহস্রের ভয়ে ভীত, সহস্রের বাক্যে
 বিভলিত, সহস্রের আকর্ষণে বিক্লিষ্ট হইতে
 যেন না হয় ! এক-তুমি আমার চিত্তের
 একাসনে অধীশ্বর হও, আমার সমস্ত কর্ণকে
 একাকী অধিকার কর, আমার সমস্ত অভি-
 মানকে দমন করিয়া আমার সমস্ত
 প্রতীককে তোমার পরপ্রাণে একত্রে সংযত
 করিয়া রাখ ! হে অক্ষরপুঙ্গব, পুরাতন
 ভাবতবর্ণে তোমা চটতে যখন পুণ্যি প্রজা

প্রস্তুত হইয়াছিল, তখন আমাদের সরলদ্বয়
 পিতামহগণ ব্রহ্মের অভয়, ব্রহ্মের আনন্দ
 যে কি, তাহা জানিয়াছিলেন। তাহারা
 একের বলে বলী, একের তেজে তেজস্বী,
 একের মৌরবে মহৌরাস্ হইয়াছিলেন। পতিত
 ভারতবর্ষের অন্ধ পুনর্জার সেই প্রজ্ঞালোকিত
 নির্মল নির্ভর জ্যোতিষের দিন তোমার
 নিকটে প্রার্থনা করি ! পৃথিবীতলে আর
 একবার আমাদেরকে তোমার সিংহাসনের
 দিকে মাথা তুলিয়া ঠাঙাটতে দাঁড়াও ! আমরা
 কেবল সুত্বিগ্রহ, যন্ত্রস্তম্ভ, বাণিজ্যব্যবসায়ের
 দ্বারা নহে, আমরা যুক্তনৈরূপ নির্মল সন্তোষ-
 বলিত ব্রহ্মচর্যের দ্বারা মতিমোহিত হইয়া
 উঠিতে চাহি ! আমরা রাজত্ব চাই না,
 প্রভুত্ব চাই না, ঐশ্বর্য চাই না, প্রতাপ
 একবার তুহুংবগণেকের মধ্যে তোমার
 মহাসভাতলে একাকা দত্তপ্রদান হইবার
 অধিকার চাই ! তাহা হইলে আর আমা-
 দের অপমান নাট, অধীনতা নাট, দারিদ্র্য
 নাই ! আমাদের বেশভূষা দান হউক,
 আমাদের উপকরণসামগ্রী প্রদান হউক,
 তাহাতে যেন বেশভাষা লজ্জা না পাই—
 কিছ্র চিন্তে যেন তর না থাকে, ক্ষুত্রতা না
 থাকে, বন্ধন না থাকে, আত্মার মর্যাদা
 সকল মর্যাদার উর্দ্ধে থাকে, তোমারি
 দীপ্তিতে ব্রহ্মপরায়ণ ভারতবর্ষের দুষ্টিবিহীন
 উন্নত লগাট যেন জ্যোতিষ্য হইয়া উঠে !
 আমাদের চতুর্দিকে সভ্যতাজিমানী বিজ্ঞান-
 মদমত্ত বাহুবলগর্ভিত স্বাধিনিষ্ঠুর জাতিরা
 বাহা লইয়া অহরহ নথপত্র শাণিত করিতেছে,
 পরস্পরের প্রতি দতক-ধৃষ্ট কটাক নিক্ষেপ
 করিতেছে, পুনর্বারে আতঙ্কে কম্পাশিত ও

ভ্রাতৃশোণিতপাতে পঙ্কিল করিয়া তুলিতেছে,
 সেই সকল কামাধস্ত এবং সেই পরিত্যক্ত
 আত্মাভিমানের দ্বারা তাহার কবরই অমর
 হইবে না, তাহাদের বস্ত্রস্ত, তাহাদের
 বিজ্ঞান, তাহাদের পরতত্ত্বপ্রদান উপকরণ
 তাহাদিগকে রক্ষা করিতে পারিবে না।
 তাহাদের সেই বলমত্ততা, ধনমত্ততা, সেই
 উপকরণবহুলতার প্রতি ভারতবর্ষের দোষ
 লোভ না জন্মে ! হে অবিভার এক, তপ-
 বিনী ভারতভূমি যেন তাহার বহুলবলন
 পরিয়া তোমার দিকে তাড়াতীয়া প্রবাহিনী
 মৈত্র্যের সেই মধুরকণ্ঠে বলিতে পারে—

যোহং নানুভা স্তং কিমহং তেন কৃণাম্—

বাহা দ্বারা আমি অনুভা না হইব, তাহা
 লইয়া আমি কি করিব ?

কামান-ধূম্র এবং স্বর্ণধূম্রের দ্বারা সমাজের
 তমসাত্ত্বিত রাষ্ট্রগৌরবের দিকে ভারতের
 দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া না ; তোমার সেই
 অনঙ্ককার গৌরবের প্রতি দীন ভারতের মন্ত-
 লির উদ্বিগত কর।

যোহং নানুভা স্তং কিমহং তেন কৃণাম্—

ন সর চাসহিব এব কেনসঃ ।

যখন তোমার সেই অনঙ্ককার আবিস্কৃত
 হয়, তখন কোথায় দিবা, কোথায় রাত্রি,
 কোথায় সং, কোথায় অসং ! শিব এবং
 কেবলঃ, তখন কেবল শিব, কেবল মঙ্গল !

নমঃ শতবার চ ময়োভব চ,

নমঃ শতবার চ মনোভব চ,

নমঃ শিবায় চ শিবতরায় চ !

হে শঙ্কর, হে ময়োভব, তোমাকে নমস্কার ;
 হে শঙ্কর, হে মনোভব, তোমাকে নমস্কার ;
 হে শিব, হে শিবতর, তোমাকে নমস্কার

বর্ণাশ্রমধর্ম ।



বর্ণাশ্রমধর্মের কথা উপাশন করিলেই জাতৃত্বাবাপন্ন নব্য সন্তোঃরা নাসিকাত্রা লাক্ষ্য-কিত করিয়া থাকেন। আরকাল জাতি-ওতম-সমর্থনচেষ্টে। অংগলীভূত (anglicised) হিন্দুর নিকট ধুটতা ওঁর আর কিছুই নহে। বেধবিহিত বর্ণধর্ম একগে হস্তপরিহাসের বিষয় হইয়া উঠিয়াছে।

ইদানীন্তন ব্রাহ্মণবংশোদ্ভব রায়মহা-শয়ের বংশধরপ্রপণ্ট উপলব্ধিক। কিন্তু লংকিভোজনকালে তিনি ঠাণ্ডার বংশ-মধ্যমারূপে অতিশয় পটু। লক্ষপতি বহুজাই চউন, আর বেদান্তজ দস্তরায়ী জাহ্নন—সাম্য কি গে, ঠাণ্ডাকে অতিক্রম করিয়া কেহ সপিত্ত কনলাপন অধিকার করেন। অথবা বিদ্যার বলে বংশধর-প্রহারবেদনার অতীত হওয়া যায় না। আবার বর্ণাশ্রমধর্মের কি প্রভাব!

হুগলার দেবপ্রাণী হাঁওমুখ—মারিলে কৌক করে না, পাড়ে 'ক' উচ্চারণ হয়—ব্রাহ্মণের প্রসাদভরণে বর্ণধর্ম সন্ধানিত ও পরিপুষ্ট হয়। কিন্তু দৌরতহ তত্ত্ববাস্য হুবিদ্যান্ অংগলদেশবাসীরা সহিত একটু ক্রামপর্শিরস (চা) পান করিলে সনাক্রম হইতে হয়।

এই ত তোমার বর্ণধর্ম! থিক্ হিন্দুজকে, বাহা এই বিষবব্র পোষণ করে।

সাম্যবাদী সভ্যদের এইরূপ নিম্নাব্যয় সাধরে স্বীকার করি। স্বীকার করি বলি-

রাই পাঠদের সহিত ঘোষণা করিতে পারি যে, বংশধরবংশাবলী রায়মহাশয় ও হস্তিধর্ম ব্রাহ্মণবর ও নব্য হিন্দুসন্তান—তিন জনে মিলিয়া-মিশিয়া বর্ণাশ্রমধর্মদ্বারা বহুপরিচর হওয়াতে ভারতের পুনরুজ্জীবন একপ্রকার অসম্ভব হইয়া পড়িয়াছে।

আমি গত বৈশাখমাসে—হিন্দুজাতির একনিষ্ঠতা—এতদ্বীর্ণক প্রবন্ধে লিখিয়া-ছিলাম যে, বর্ণাশ্রমধর্ম ও তত্ত্বপ্রণোদিত একনিষ্ঠতা হিন্দুজের ভিত্তি। একনিষ্ঠতা কি, তাহা সংক্ষেপে বলিয়াছি। সমস্তি ভিত্তির দিয়া বাটিকে দেখা—কেবল গর্ভে বহুধর সমাধান করাট একনিষ্ঠতা। কিন্তু কি প্রকারে এই একনিষ্ঠতা বর্ণাশ্রমধর্মরূপে প্রকটিত হইয়া হিন্দুজাতিতে প্রতিষ্ঠাপন্ন করিয়াছিল, তাহাট এত প্রবন্ধে পর্দা-লোচিত হইবে।

কোন বিষয়ের পথ্যালোচনা করিতে গেলে অসম্ভব ধৈর্যের প্রয়োজন। তবে ধৈর্যেরও ত সীমা আছে। হুরোপীয়-বেশধারী কালাবাহালী প্রকৃতপক্ষে সাহেব হইতে পারে কি না, লম্বা বাঁড়কাক ময়ূর হইতে পারে কি না—এবংপ্রকার প্রশ্ন কেহ যদি উপাশন করে, তাহা হইলে প্রশ্নকারীকে সাহেবি-ভাবার দুই-একটা পালি না দিয়া থাকিতে পারা যায় না। সেটরূপ বর্ণধর্মকে যথিরা-নাতিয়া খাড়া করা যায় কি না, আর কাণ্যকে শাস্য করা যায় কি না—এ দুই

একই কথা। জাতিভেদটা আনাগোড়া
অচাচায়ে তব। অচাচায়ে উপর জন্ম,
অচাচায়ে ইহার পূর্ণি মনুষ্যত্ব গতদিন
থাকিবে, ততদিন স্রাতিবৈবক্ষমিত ঐশ্বর্যের
চবি হিন্দুধর্মকে কলঙ্কিত করিবে। শূত্রকে
পুত্র অপেক্ষা নীচ কর। আর বাক্যকে
দেবতার অপেক্ষা বাড়ান-উচাট ত বর্ণ-
ধর্মের সারত্ব। বড় বড় যুরোপীয় উচ্চ-
তাসবেস্তারা যারা শিক্ষার করিষাছেন ও
দিল্পক্ষ দেশী সংস্কারকেতা যারার অনুমানন
করিষাছেন, তাগাব বিপকে দলিতে পাওয়া
বাতুলতামাত্র। এতট: এখন অমৌখতা, তখন
পথ্যাগোচর চলা পড় লক্ষ্য কথা। উচ্চত
প্রথমে ধর্মোৎসাহন করিতে চটবে

শূত্রজাতিবিরোধ বর্ণনা যে বর্ণধর্মের
নিকা আছে, তাগা অনুলক পুরাঙ্গাল
কক্ষকার কঠিনপ্রবৃত্তিপ্রভাদিপুত্রক অমা-
দ্যোয়ট শূত্র বর্ণনা অভিহিত চটত।
তাঁহারা আর্গাভদ্রের ঘোব বিরোধী ছিল।
তাঁহাদের সতিত সংনিপ্রণে পাতে আর্গাবক্ষ
দুখিত চব ও সত্তবজাতিব উৎপত্তি হয় ও
বেধধর্মের বিধ হয়, এট আশঙ্কায় তাহাদিগকে
দূরদূর রাখিতে চটয়াছিল। কোন উচ্চ-
জাতির সতিত বিকলধর্ম ও নীচ জাতির সহ্যা
সম্মেলনে ক্রমোন্নতিব পথ বন্ধ চটয়া যায়।
পরীক্ষানু অংশ লবু চটয়া পড়ে ওলখীমানের ও
জাতিবিক তেজ অবলম্ব চটয় যায়। আনা-
দের দেশের ফিরিস্তীরা বিববসংযোগের
প্রকৃষ্টে উদাহরণস্বল সত্তবসুটবিত্রাট-
নিবারণের চক্ৰট সতিতাকারেবা শূত্রজাতি-
সংস্কে অন্নপানীয় পদার্থ পবিত্তবর্ণ: বলিয়া
বিধি নিষাছেন আনাগোব স্বভাব এট

বে, যাহাদের সতিত আনাগোব আচরণান,
তাঁহাদের সতিত আনাগোব আদানপ্রদান
চটয়া থাকে। আনাগোব নিকট আহাঃ-
সংসর্গ সামাজিক সমতার পরিচায়ক। এই
প্রাচ্য সত্তবস্বভাব বেগ বিধিবিধোদি যারা
অনিষত হওয়াতে, আর্গাভাতির বর্ণ ও ধর্ম ও
তত্ত্বজা রকিত হইয়াছিল। যদি দূরদর্শী
শাস্ত্রকারেরা শূত্রের সতিত আচরণব্যবহরি
অনুচরণে বিধিবদ্ধ না করিতেন, তাহা হইলে
আনাগোব যেটুকু আর্গাভ অবশিষ্ট আছে,
তাগাও থাকিত না। ঐশ্বর্য প্রভ বাকপুতানা
আজ চেপ্টা নাক আর 'পল্ল্যা'কিতে তরিয়া
গাইত। কননমুখী হিন্দুধর্মের তানে চিপ-
কলাণী ও উমানুখীরা কাব্যকানন
শোভিত করিতেন। উচ্চবিধিপ্রবর্তক
মুখা অনীষরোপাসক ঈশ্বরজাতিগণকে বত
কঠোররূপে ব্যবজ্ঞির করিষাছেন, মহাদি
সংহিতাকারগণ বেধে চব তত কঠোরতার
পরিচয় দেন নাট। সাধারণতঃ সভা মার্কিন-
দেশে যেতচর্ম ও কৃষ্ণচর্ম এখনও বে
কঠিন ব্যবধান আছে, পুরাঙ্গালে আর্গো ও
অন্যো তত প্রভেদ ছিল কি না, সন্দেহ।
এরূপ সামাজিক ব্যবধান ত অনেক সময়ে
মঙ্গলপ্রদ। বেগনপ্রবৃত্তি যদি বৈরিষী হয়,
আর কোনপ্রকার বিধি না মানে, তাহা
হইলে ক্রমবিকাশের সম্ভাবনা চলিয়া যায়।
অংগলদেশে সেদিন যে নবখনপ্রভ হুগোউ
কাক্সিরাভক্ষ্যাব জীমান্ লবঙ্গুলকে পূর্ণ-
চন্দ্রপ্রভ: বিংখটা টংরক্কুগোস্তবা কোন
জীমতী বরণ করিবেন বলিয়। ধর্মব্যাক্ষকের
মধ্যে এক মতা চলহুগ পড়িয়া গিয়াছিল,
তাগা কি বিশেষ 'নিমার' কবর ? আভ

যদি ইংরেজেরা এতদূর বিবেচনা প্রদান করে, তাহা হইলে তাহাদের জাতীয় চীনতা ও বিকৃতি কি হইবে না? বিশেষভাবে পর্যালোচনা করিলে দেখা যাইবে যে, প্রধানত বর্ণসঙ্করত্বটিতেই এই আখ্যান-নাথের মধ্যে আহার্যমানাদিগণের ব্যবহারগত ভেদ করিয়া দেওয়া হইয়াছিল। পরিসাধনানিও ভয় ছিল। কেন না, অন্যায়েরা সংসারধীন প্রকৃতিপ্রণোদিত মার্গের উপাসক ছিল। যেমন আধুনিক মার্ক্সিত-মতাবলম্বীরা কৃষকরাবলভ্যাপন্ন পরিবারে কল্যাণকর করিতে কৃষ্টিত চন, তরুণ আর্থো-রাও পাবলোভিক ইষ্টার্মির ভয়ে শূন্যগণের সহিত আদানপ্রদান করিতেন না।

কিন্তু এই ভেদভুক্ত কঠোরতা ক্রমশঃ দৃঢ় হইয়াছিল। যেমন অন্যায়েরা আদানপ্রদানে উন্নত ও সংস্কৃত হইতে লাগিল, তেমন তাহাদের সহিত ব্যবসায়সম্বন্ধে উদারতা বাড়িতে লাগিল। নতুন বিধি-অনুসারে—যে বাহার কৃষিকর্ম করে, যে পুস্তকাক্রমে আপন বংশের মিত্র, যে বাহার গোপালন করে, যে বাহার দাসত্ব করে ও যে বাহার ক্ষৌর-কর্ম করে, শূন্যের মধ্যে তাহাবিগের অস-তোজন করা যায় এবং যে বাহার নিকট আশ্র-সম্পর্ক বা আশ্রয়নিবেশন করিয়াছে, তাহারও অসতোজন করা যায় (নতুন-চিত্তা. ২৪৩)। দাস, গোপালক, কুলমিত্র, অর্দ্ধসীতা (অর্থাৎ বাহার সহিত এক জনিতে আধাআধি করিয়া চাব দেওয়া হয়), দাসিত এবং যে সর্বভোক্তারে আশ্রয়সম্পর্ক করে, শূন-জাতির মধ্যে কেবল টগাবিগের অস তোজা (যাজবদ্য—৯৬)। পরামর্শসংহিতা ৫৩

একাদশ অধ্যায়ে শূন্যের অস তোজা, এইভাবে বিধি আছে। শূন্যসম্বন্ধে রাষ্ট্রশাসনসংহিতায় যে অনুদারতা আশ্রয় করা চট্টোজ, তাহা কাল্পনিক। ইংরেজের নিকট কালো ব্রাউ শূন্যবর্ণ। আদানপ্রদান বর্ণবিধিবিধৌ দ্রাভুতাবা-পর সংসারকর্মের দল থেকে শূন্য কালো-কালো জনকতক বাচাই করিয়া যদি একটা বিলাতে উপনিবেশ (colony) স্থাপন করা যায়, তাহা হইলে সাহেব-মহোদয়-বিশ্বকে আশঙ্কিত দ্রাভুতপ্রেমের উজ্জ্বল রোধ করিবার জন্য চট্টোজপানি অনুদারিতা অপেক্ষা কড়াকড়া শাসনপ্রণালী প্রস্তুত করিয়া ফেলিতে হয়। তখন আদানপ্রদান সংসারকর্মের বৃত্তিতে পারিবেদন দে, সাহেবদের বাচনিক দ্রাভুতাবের গোটে তিন্মুভাতির হীনতা স্বীকার করিয়া পিতৃপুত্রবিশিষ্ট নামটী জুঝান বড় ভাল কাজ হয় নাই।

আরও দেখা যায় যে, এই আহার্যমান-নিবেশ আদানপ্রদানে বাচাইয়া রাখিয়াছে। মুসলমানের জন পর্বাশ্র চট্টোজ নাই—এই-রূপ কঠোর বিধি যদি না থাকিত, তাহা হইলে একটা ভাতিবিভ্রাট ঘটয়া বাইত। শনি যেমন গ্রানের ভলের ছুতা করিয়া শ্রীবৎস ব্রাত্যকে পাঠিয়া বসিয়াছিল, তেমন মুসলমানেরা পানীর ভলের ছুতা করিয়া তাহাদের হিন্দুসমীপনিগণদিশা চরিতার্থ করিয়া ফেলিত। অগ্রেই বলা হইয়াছে যে, অসতোজন আদানপ্রদানের কাছে সামাজিক নৈকট্য অথবা মিলনের প্রবর্তক ও পরিচায়ক; সাহেবদের নিকট তাহা নহে। তাহারা তাহাদের জুতাবস্ত্রবস্ত্রের চোটে বাইতে পারে এবং তাহাকে জুতায় নারিত্তে পারে।

আমাদের নেতারা তাঁর গোড়া মারিয়া রাখিয়াছিলেন। মূলমানেই সব লওয়া হইল—শোষাক, ব্যবহার, বিদ্যা, রীতি-নীতি, কিন্তু বলটা বন্ধ। এই কঠোরতা আমাদেরকে বাচাইয়াছে। আজকাল আবার ইংরেজ আসিয়াছে এখন আমাদের কেহ নেতা নাই। তাই ইংরেজের খানা-খাইবার বড় খুব পড়িয়া গিয়াছে। ইংরেজ বড় গর্হিত জাতি, তজ্জন আমাদের বড়-একটা গ্রাহ্য করে না। আমাদের সভ্য-বলের তাহাদের উপর যেতল টান, তজ্জন যদি ইংরেজদের আমাদের প্রতি টান হইত, তাহা হইলে আর কতলত শ্রমতী হেমলতা ও মৃণালিনী, 'মিসেস্ ফক্স' (Mrs. Fox) ও 'মিসেস্ হগ' (Mrs. Hogg) হইয়া দাঁত, আর বেশটা জবজবী জাতিকিরী-জিতে ভরিয়া বাটত। দৌডাঙ্গারনে ইংরেজরা একলখেঁড়ে, তাই বন্ধ। কিন্তু কি জানি কেন্দ্রিন বা তাহাদের প্রাক্ত-প্রেমের উপর হয়। তাই আগে থাকিতেই পক্ষগণের হয় দেখাটয়া খানাটা বন্ধ করিয়া দিলেই ভাল হয়।

এই ত গেল মর্ধ্যমানার্থের ভেদবৃত্তান্ত। দিলেন উত্ততি হয়, কিন্তু নিলন ঘটবার পূর্বে বেলনীর বস্তুর কতকটা পরিপুষ্টি আবশ্যক। সেই পরিপুষ্টির জন্য ভেদব্যবধানের প্রয়োজন হয়। একখাটা সভা বটে। কিন্তু অশ্লবভব্যবসারী রায়মহাশয়কে বা হস্তি-মূর্খ ব্রাহ্মণমহাশয়কে যে ব্রাহ্মণের মর্ধ্যমা দেওয়া হয়, তাহা কি যোর অজ্ঞান নহে? ব্রাহ্মণের সম্মান হইলেই হইল। তাহার কর্ম দেখিবার আবশ্যক নাই, জন্ম দেখি-

লেই হইবে। ঠিক যে মধ্যকার কারণে যে, ঈশ্বরগত মর্ধ্যমাই বর্ণভেদের মূল? এই অসঙ্গত অজ্ঞান প্রমাণে মানবসমাজে কখন চলিয়াছে বা চলিতে পারে, তাহা তাবিয়া উঠিতে পারে না। এইরূপ বর্ণভেদবিধি কর্মনাশের বলে চলিয়া গিলে ভাল হয় না? প্রতিরোধে ভয়।

সকল সংস্কার এই বিধি যে, কর্মব্রীতি হইলেই বর্ণমর্ধ্যমা নষ্ট হয়। মনু বলিয়া-ছেন—চৌর, নাস্তিক, বৈদ্যধর্মমুক্ত, প্রতিমা-পরিচারক বেৎন, মাদ্যবিক্রয়ী, বাণিজ্যভাষী, রাজকৃত্তা, কুণীভাষী, পত্নপালক, মিথ্যা-শাক্তর সৃষ্টিকর্তা, নিম্নবর্গীয়, সোমলতা-বিক্রয়ী ও মদ্য প্রস্তুত আচারহীন ও উদ্যোগ-মামী ব্রাহ্মণগণকে ১৭ ও ১৮ টা উত্তর কর্ণেই পরিভাগ করিবে (মহাভারত—৩, ১৫০ বইতে ১৮৩)। পরাম্পরমহি তাহুসারে উপাসনা-বঞ্চিত বৈদ্যধর্মমুক্ত ব্রাহ্মণকে বুল বল। আশাস্ত্রানবিশেষের নিকট কুলগত-কর্মভাগ অপেক্ষা অধিকতর কাপুরুষতা আর কিছুই ছিল না। কোন দিল যদি কোলিক ধর্মকর্ম পরিবন্ধন করিয়া উপাসনা-জরে প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে দাঁত, তাহা হইলে তাহার শাহনার আর সীমা থাকিত না। স্বধর্ম নিধনঃ শ্রেয়ঃ পরধর্মো ভয়া-বহঃ—এই বাক্য শ্রবণ করিলে কোন্ হিন্দুর শোণিতপ্রবাহ থরতর না বহিতে গাকে? বর্ণধর্ম কর্মকে অবহেলা করিয়া মর্ধ্যমাকে কেবল কুলভেদেই আবদ্ধ করিয়া রাখে নাই। আর্গবিশেষের প্রতিষ্ঠা কেবল কুলগত ভিল-কর্মগত ভিল না, একলমত যোর প্রমাণ ভিল আর কিছুই নহে।

যদি কৰ্ম ছাড়িয়া প্রতিষ্ঠা বা মৰ্যাদা হইতে পারে না, তবে কেবল গুণ বা প্রসুতি বা নৈসর্গিক পটুতা দেখিয়া কৰ্মবিত্তাগ কেন করা হয় নাই ? কৰ্মকে কেন কুলোহ্বারী করা হইয়াছিল ? কুলের গুণবড়ি দিয়া গুণকে বাঁধিয়া রাখিবার কি প্রয়োজন ? এই বাঁধাবাধিতেই আৰ্যাবিপের প্রতিষ্ঠা নষ্ট হইয়া গিয়াছে। কুলপতকৰ্ম্মরক্ষাতেই ভারতের অধঃপতন হইয়াছে ! এই অপবাদ সত্য নহে। বেদবতী বৈরগতি কৰ্ম্মনবীকে কুল দিয়া বাঁধিয়া রাখিতে ভারত ভূমি ধার নাই, কিন্তু সমুদ্রকিনালীই হইয়াছিল। বরং কুলের বাধ ছাড়িয়া দেওয়াতে ভারতের ঐ তাসিয়া গিয়াছে। আৰ্য্যাবর্ষে কৰ্ম্মকে কেন কুলপত করা হইয়াছিল, তাহার বিশেষ কারণ আছে।

হিন্দুদের ভিত্তি একনিষ্ঠতা। হিন্দুর চিন্তা-প্রণালী, হিন্দুর ধৰ্ম্ম, বেদ, বেদান্ত, স্মৃতি, সাংহিতা, পুরাণ—সমস্তই একমুখীন। বস্তু একই, চুই নহে একই বহুরূপে প্রতিভাত হয়—টহাই হিন্দুদিগের চরম সিদ্ধান্ত। সমগ্র বেদগাথাই একেই মহিমা বর্ণিত আছে। অগ্নির দেবতা অগ্নি, বায়ুর দেবতা বায়ু, সূর্য্যের দেবতা সূর্য্য। কৰ্ত্তাই কার্য্যরূপে প্রতিবিম্বিত, স্রষ্টাই সৃষ্টিকৰ্ণে প্রতিকলিত। জ্ঞাতা, জ্ঞেয় ও জ্ঞান, কৰ্ত্তা, কৰ্ম্ম ও কৰ্ত্তব্য, বাতা, প্রীতি ও দান—এই তিনের পারস্পরিক একত্ব বেদমন্ত্রে আভাসিত হইয়াছিল, আর বেদান্তের আনন্দ-মোক্ষভিতে বিশীন হইয়া ব্যাবহারিক ত্রিংশ-সমূহ বস্তুঘটন একত্রে পূৰ্বাবসিত হইয়াছে।

আজকাল যুরোপের বিদ্যা শিক্ষা আমাদের ধাবণা হইয়াছে যে, কাজ করাই মনুষ্যজীবনের উদ্দেশ্য। কিন্তু কৰ্ম্মকে জলাঞ্জলি দিয়া বহুরূপে প্রতিষ্ঠিত হওয়া হিন্দুর পথম আদর্শ। প্রতিষ্ঠা,—বিত্তি,—টিকিরা থাকাই, অগ্নির স্বরূপ। প্রতিষ্ঠার অভাবে,—ভিত্তির অপূৰ্ণতাপূরণে,—টিকিরা থাকার বিত্ত-অপসারণে, কৰ্ম্ম বা চেষ্টা বা সাধনার উদ্ভব হয়। কৰ্ম্ম অভাববৃত্তকে, অপূৰ্ণতার পরিচায়ক। যেখানে পূৰ্ণ, প্রতিষ্ঠা,—যেখানে আত্মতাঃ, সেখানে কার্য্য তিষ্ঠিতে পারে না। কেহ কেহ বলিতে পারেন—অগ্নির কি তবে বাখেই পূৰ্ণতা লাভ করে ? প্রেমজনিত হয় কি অগ্নির চরম বিকাশ ? যদি প্রেম চটুকটু করাতেই হয়,—শান্তিতে না হয়, আকাঙ্ক্ষার অতৃপ্তিতে হয়,—মিলনের পর্যাাপ্তিতে না হয়, তবে প্রেমের অভাবই অগ্নির সার। আর যদি ভিন্নরূপে একতার মধ্যে সমাহিত করিয়া গতিপ্রদান প্রেম হয়, তাহা হইলে অগ্নির প্রেমময়, শিবময়, আনন্দময়। বাসনার বহুরূপে প্রশমিত করিয়া, চেষ্টাকে পূৰ্ণবৃত্তিতে পরিণত করিয়া, বৈতকে নাঃশেষ করিয়া, অধৈতানকে প্রতিষ্ঠিত হওয়া আৰ্য্যাবিপের লক্ষ্য ছিল। কিন্তু সাধনা নহিলে সিদ্ধি হয় না। অধৈতপ্রতিষ্ঠা লাভ করিতে গেলে কৰ্ম্মবন্ধন ছিন্ন করা প্রয়োজন। সকাম কৰ্ম্ম করিলে বৈতচক্রে নিপাট হইতে হয়, আর নিরাম কৰ্ম্ম করিলে কৰ্ম্মবন্ধন শিথিল হয়,—আত্মতত্ত্বের দ্বার উন্মুক্ত হয়,—অধৈতব্রহ্মপদ নিকট হয়। তত্ত্বটু ব্যত্যাগে নিরামকন্দর প্রশংসা মৌখিক

হইয়াছে। আদ্য সমাজকে দ্বারে দ্বারে এই আদর্শস্থান করা আশ্রমবর্ধনের উদ্দেশ্য।

নিকামকর্ম্মসাধনের নিমিত্ত চতুঃ-
প্রাঙ্গণের সৃষ্টি হইয়াছিল। কঠোর-প্রকটনা-
দামনে ভোগবাগিনী স্থাপিত হইত, দৈত্য-
ভার বহন করিয়াও ক্লমদর্শকপণে জীবিত-
প্রতিষ্ঠা স্থাপিত হইত, বাক্যকো পুস্তকত্রয়
বর্জন করিয়া,—কটনামা বিতৈরুণ্য পরি-
ত্যাগ করিয়া বনপ্রাঙ্গণে কামনার গ্রহি-
ত্ব হইত, বর্ষাষ্ম চতুঃ চতুঃ, কামনায়
চুবিবার জন্ত আবেগন হইত। বান-
প্রাঙ্গণের কথা স্থপতি করিলে শবীর বোমা-
কিত হইত, মন নিঃশেষে পূর্ণ হইত। কি
আশ্চর্য! সমস্ত জীবন পরিশ্রম করিয়া,
হর্ষশোকের ভরসে আলোড়িত হইয়া,
মানুষমানের বাতপ্রতিবোধে প্রসীড়িত
হইয়া, করপরাভয়ের সংগ্রামে কতবিক্ষত
হইয়া, বাই এইখান সঞ্চিত হইল, অমনি
সকল সুখেভোগে বিপত্ত হইয়া আত্ম গৃহ-
স্থেয়া বনে প্রস্থান করিতেন। তাহার কণ্ঠের
অধিকারী ছিলেন, কণ্ঠে অধিকারী ছিলেন
না। গীতার উপদেশ—কণ্ঠগোবাধিকারকে
না কলোবু কলচন। এত গীতানির্দিষ্ট
আদর্শে সমস্ত আত্মজীবন স্থানান্তরিত ছিল।
বর্ষাষ্মও এই কর্ম্মফলসাপ্রসূত-উল্লাসের
নিমিত্ত বিহিত হইয়াছিল।

সমাজ ব্যক্তিগণের সমষ্টি। ব্যক্তিগত
প্রতিষ্ঠার উপরে সমাজ প্রতিষ্ঠিত। কিন্তু
ব্যক্তি মরণশীল, সমাজ অমর। যদি ব্যক্তি-
গত প্রতিষ্ঠা মরণের সঙ্গে সঙ্গে যুত্থার অধি-
কায়ে আসিত, তাহা হইলে সমাজের স্থায়িত্ব
নষ্ট হইয়া যাউত। বর্ষাষ্ম মরে, কিন্তু তাহার

গতি, কাম প্রতিষ্ঠা বা সঞ্চয় থাকে, তাহা
মরে না। তাহার উত্তরাধিকারীরা তাহা
পায়। এত সামাজিক নিয়ম বিশ্বজনীন।

আর্য্যপুত্র বধন বন প্রাঙ্গণে তাহার
উত্তরাধিকারকে কর্ম্মোপাধিত এইখান
দ্বিগা বাইতেন, তখন তাহার অলম—জীবন্ত
চাঁপের উদাহরণ স্থপতিরূপে ব্রাহ্মী দিত
যে, কর্ম্মেতেই প্রতিষ্ঠা ও মর্গ্যাদা অবস্থিত,—
কর্ম্মফলভোগে নয়। এই বানপ্রাঙ্গণবিহিত
ঐশ্বর্য্যাত্ম্যে কর্ম্মের প্রতি এক মঙ্গলময়
অভিমান জন্মিত হইত। যে-কর্ম্মে
অভিমান জন্মে না। যে কর্ম্মের স্বাভা-
বানার পিতৃপুরুষের সঙ্কল্পটি হইয়া-
ছিলেম, যে কর্ম্মপাননে সমস্ত ঐশ্বর্য্য বর্জন
করিতে তাহারা পশ্চত ছিলেন, তাহাই
আমার পিরোখায়া। ধন দার,—প্রাণ দার,
পেও স্বাকার, তাহা পি কোলিক কর্ম্ম ছাড়িব
না। যদি কর্ম্মকে ফলনিঃসঙ্গমোহবিব-
দ্ধিত করিয়া কুলগোববে গরীমায় না করা
হইত, তাহা হইলে সমস্ত সমাজকে নিকাম-
কর্ম্মনিষ্ঠ করা অসম্ভব হইত। মর্গ্যাদার
ভিতর দ্বিগা অজ্ঞাতসারে ধীরে ধীরে পর-
মাখে লইয়া যাউতে হয়। আত্মমর্য্যাদা না
হইলে পরমার্থমুষ্টি কুটে না। ধর্ম্মের উচ্চ
উচ্চ উপদেশ দ্বিগা সাধারণ লোককে সুপথে
লওয়া; বড় কঠিন ব্যাপার। তজ্জন্তই সুব-
দনী গুণিতা—কুলমর্য্যাদা ও জাতিগতপ্রতি-
ষ্ঠার তেলোমর অভিমানবলে আত্মমর্য্য-
জকে চালিত করিয়াছিলেন। এই ঘোর
জুদ্ধিনেও সেই কন্যাস্তিমম্ববাহি নির্দোষিত
হয় নাই। তারতবর্ষে আজও সত্য শত
ব্রাহ্মণ আছেন, যাহারা দৈত্যভরপ্রত,—উদ্ব-
গত

আলার ব্যতিক্রম, কুলধর্ম ত্যাগ করিয়া পরমর্ষ গ্রহণ করিলে অশক রত্নার উপভোগ এড়াইয়া কৌশলময়নবনীভোজনে পতিতুই হইতে পারেন, তথাপি পরমর্ষী ভ্রমাবহঃ। গৃহে বাসন নাই; গৃহীতী ত্রিবিড়ীপর্ণ রত্নন করিয়া বেন; আপনাতা তাতা আনন্দের সহিত ভোজন করেন ও শিবাবিগকে ভোজন করান। মরিয়া বাটবেন, সেও ভাল, তবু বিতগ্রহণ করিয়া অধ্যাপনা করিবেন না! আহুন সকলে 'মিলি' চোপাচোপ্তানধারী পরমর্ষী ব্রাহ্মবিগকে হু হইতে সম্মান দিয়া, সেট কুলধর্মপালক পুত্রপারম ব্রাহ্মন-গণের পদধ্বনি গ্রহণ করি। তাঁহারা দীন বটেন, কিন্তু হান নন তাঁহাবিগের সম্মানে, তাঁহাবিগের গৌরবে, অর্থাৎ অধিবিগের সম্মান ও গৌরব হয় আরও শতশস্ত্র করিয় দেখা যায়, বাহারা অত্রের ভক্ত লাগারিত, কিন্তু তরবারি ছাড়িয়া অধিবিকার লেখনী ধারণ করিতে চণা করেন। আর আত বনি আমা-দের বণিকেরা কুলধর্ম চা'ইয়া চচার-পাতা টংরেজি উন্টাইয়া উকিল-ডেপুটী হইতেন, তাহা হইলে ভারতের অত্রিৎ লটরা টানা-টানি পড়িত। এখনও কুলগত কণ্ঠাতিমান হিন্দুজাতির গৌরবকে বণিকিকং রক্ষা করিয়াছে, ভারতকে অশেষ বৈভব হইতে বাঁচাইয়াছে।

কলত্যাগ করিয়া কণ্ঠকে ভালবাসা, নিজস্বকর্মসাধনে কর্মবদ্ধ ভিন্ন করাট, হিন্দু হিন্দু। বাহারা নিজের পূর্ণ অধৈর্যতা-নন্দে ডুবিত চান, তাঁহারা এই উচ্চ আকর্ষণের বর্ম বৃত্তিতে পারিবেন।

কর্মদীর' চকলপ্রবাহ জ্ঞানমাগের

বিশেষতা না গেলে নিরানুজ্ঞা লাভ হয় না। আবার কামনা ব্যতিক্রমে কর্মের স্বীকার শেষ হয় না। কণ্ঠবিভক্তিত সংসারোন্মি হইতে রক্ষা পাইবার কণ্ঠই প্রথম উপায়—যদি তাতা কামনাও না হয়। কিন্তু সাধারণের পক্ষে পুরবিত ও বর্ধের এষণা পরিচাল্য করিয়া সংসারী হওয়া অতি দুষ্কর ব্যাপার। চোটা, সাধনা, কার্য প্রাণপণে করিবে, কিন্তু সর্বের অধিকারী হইবে না। এক্ষণ বাগনাবিহিত উত্তম সহজ কথা নহে কর্মের উপর বিশেষ প্রীতি না হইলে, তাতা সহ্য নহে। এতটা ভালবাসা চাই যে, কখনো কোন অসন্তুষ্ট বস্তুর সংমিশ্রণ হইতে রক্ষা করিবার জন্য এক অভিমানের বেড়া দিয়া বেঁধে রাখিতে পারা যায়। অর্ধসমাজের অধিমান কুল-মর্যাদা হইতে, পিতৃপুত্রদের গৌরব হইতে উদ্ভাবিত করিয়াছিলেন। এই কুলমর্যাদা-রক্ষণপ্রবৃত্তি ব্যাভাবিক। এই প্রীতিপূর্ণ বংশাভিমানের ডোরে পুণপুত্র ও তাহী সন্ততিগণ বধ্যবরে বদ্ধ আছে। শোণিতের টান মুক্ত, আত ও অজাত ব্যক্তিগণকে কোলিক বা জাতীয় একবে আকৃষ্ট করে। এই শোণিতগত, বংশগত, জাতগত, মর্যাদা-পরিপুষ্ট, অভিমানসংরক্ষিত একতাই মানব-সমাজের ভিত্তি। মাঝেমাঝে এই ভাবের প্রাবাল্য ত্যাপন করিয়া কুলকর্মবৃত্তের সমাজকে ধাবিতাছিলেন। সভ্য যুরোপেও এই বংশ-মর্যাদার বেষ্টে পরাজন আছে, কিন্তু তথায় জিগীষা, প্রতিযোগিতা, ঐশ্বর্যালিপ্সা, প্রাণল্য পাঠবাছে। ভূতপ্রপককে ভয় করা, প্রকৃ-তিকে বশ করা, উচ্ছৃঙ্খল, চর্যমণীর সংসারে

প্রভূ লাভ করা—যুবোপের আদর্শ। এত আদর্শ যে মহান্ ও প্রাণসাহ, তাহার সম্বন্ধ নাই। প্রকৃতিকে ব্যবহারক্ষেত্রে জয় করা পরমার্থলাভের আর এক প্রকৃষ্ট উপায়। কিন্তু এ আদর্শ ঈশার আদর্শ নহে। ইহা যুবোপীযযভাবভুলভ, কিন্তু ঈশা-প্রণোদিত নহে। ইহা ঈশার আদর্শের একটা কার্য-ভূমিষাশ্র। অনেক সময়ে এই আদর্শে গরানক বিরোধ ঘটতে। কখন যুবোপের জয় হইয়াছে, কখন ঈশার জয় হইয়াছে। যুবোপের ক্রমোন্নতির ইতিহাস এই জয়-পরাজয়ের ইতিহাস। এই দুই আদর্শের প্রভেদ জানিয়া রাখা আবশ্যক, তাহা না হইলে যুবোপীয় ইতিহাসের বুঝা কঠিন হইবে। ভারতের আদর্শ কর্মজর, ঐশ্বর্য-লাভ নহে। তাঁট এখানে কর্মের এত অভি-মান, বর্ণধর্মের প্রতি এত ভালবাসা, জগীষার অনাবর, শাস্ত্রভাষের আদর। যুবোপের আদর্শ জয়, তাঁট সেখানে শাস্ত্রভাষের এত অভাব, প্রতিযোগতার এত বাহুল্য। হিন্দুজাতির একনিষ্ঠতা ভেদপ্রস্থ কর্মবীজকে নাশ করিয়া প্রাণমানন্দ লাভ করিবার জন্য বর্ণাশ্রমধর্মসাধন অবলম্বন করিয়াছিল, আর এই একনিষ্ঠতাই বর্ণবিভাগক্রমের প্রণোদনা করিয়াছিল।

অমৃত্যু দ্বারা প্রভাবে অমৃত্যুধর্মিক-কোষে এবিষ্ট হইয়া অমৃত্যুভারী জীবাত্ম-রূপে প্রতিষ্ঠাত হন। যেমন প্রত্যেক ব্যক্তির পক্ষকোষ আছে, তদ্রূপ সমাজেরও পক্ষকোষ আছে। জীবের অমৃত্যুকোষ বা কর্মেজিয় সমাজের শ্রমদেবাজীবীদিগের অমৃত্যু; প্রাণময়কোষ বাগীজাজীবীদিগের

সদৃশ। কেন না, ক্রমবিধরুজ্ঞ আদান-প্রদানে সমাজ বাঁচিয়া থাকে। সমাজের শাসনরক্ষণকারীদিগের দল মনোময় কোষের তুল্য। যন ইঞ্জিরদিগকে সংযত করিয়া চালন করে; কস্তিরেরাও প্রজাদিগকে শাসন করে। ভ্রাক্ষেরা বিজ্ঞানময়কোষ-প্রশিক্ষ; কারণ বিজ্ঞানময়-বুদ্ধিত অস্ত-মুখী। ঠাহাদিগের বিশেষ কার্য অধ্যাপন ও বাজন, ঠাহারা শিব্যদের অস্ত্রকরণকে যুগ হইতে যুগে গইরা যান। অস্ত্রপুষ্টি উল্কাটিত করেন। মনের সমস্তবিকরণকে এক-মুখীন করেন। সমাজাত্ম আনন্দনরকোষ-প্রতিষ্ঠ। ঠাহারা অত্যাশ্রমী বিধিনিষেধা-ধির অতীত, যদুজাগতি; সংসারের পরমার্থ-গতির মুখভার ঠাহাদেরই উপরে জুত। আনন্দ চইতেই সৃষ্টি, আনন্দেতেই বিত্তি, আনন্দেতেই বিশ্বাস-পারের পর্যাবসান। তাঁট ঠাহারা ভাগ্যানন্দভুক্ত, ঠাহারাই সন্যস্ত্র, জগদ্বন্দু।

অধিরা একমেবাবিভারের কৌমিক পক্ষী-করণ অমৃত্যুতে সমাজকে পক্ষা বিস্তৃত করিয়াছেন আর ব্যক্তিরও যে সাধন, সমাজেরও সেই সাধন ব্যবস্থা কতিয়ওছন। প্রথমে কর্মেজিয়গুলিকে সপ্রাণ জ্ঞানেজি-রের বশে আনিতে হয়; তার পর জ্ঞানে-জিরদিগকে মনের অধীন করিতে হয়; বহিমুখী মনকে আবার অন্তর্মুখী বিবেকের শাসনে রাখিতে হয়, তবে আনন্দের একম প্রতিষ্ঠিত হয়। নতিগে বিরোধ, বিরোধ ও বহলতার উপরবে জীব ক্রিষ্ট ও মঙ্গলভ্রষ্ট হয়। অগঃসমাজেও সেধরূপ ছিল চতুর্বর্ণের পারম্পর্য ও সমস্ত জীবকোষাত্ম্য

ছিল। ব্রাহ্মণেরা সকলের জ্ঞান শিক্ষা দিত, ক্রিষ্ণেরা সকলকে রক্ষা করত; বৈশ্যেরা সকলের জন্য আহরণ ও উপাঞ্জন করিত ও শূত্রেরা সকলের সেবা করিত। যেমন প্রত্যেক আচার্য্যের এক একটা বিশেষত্ব ছিল, তেমনি নির্বিশেষেও ছিল সকল অর্থেঃরই বর্ণ-নির্বিশেষে অধ্যয়ন ও বৃত্তম করিবার অধিকারি ছিল। পত্যাপ্তে বহু, যেতার মোত্তম, স্বাপত্তে পম্ব, কণিত পতাপ্ত—সকল যুগে সকল সাহিত্যকার এট সমানধিকার বিচারেইন। বাস্তবাতঃ য়োক উদ্ধৃত করিলাম না। অন্যায় শূত্রঃ যে কোন সমানধিকার পাথ নাট তাহা উল্লিখিত হইরাচে।

এটরূপ বর্ণবিভাগে কণ্ঠের আদর বিশেষভাবে বুদ্ধি পাটরাহিল পিতার বৃত্তাবত টঙ্কা চয তাহার উপাঞ্জিত প্রতিষ্ঠা সম্বানধিকার নাম করিয়া যান। হিন্দু প্রতিষ্ঠা কয়ে, তৎপন্থ সকরে মরে। তাই হিন্দু পিতঃ হিন্দু সম্বানকে কণ্ঠের অধিকারী করিয়া বাচঃন। কোন ক্রিয় বনপ্রাণকালে পুত্রবিন্যে এই বলিয়াট আদিকার করিঃন—সমুৎসমরে প্রাণ বিঃ, সমাজকে হিন্দুহিন্দু শোণিতনানে বক্ত্রনিগ্রহ হইতে রক্ষা করিঃ, কিছু বেধিঃ, বেন ঐশ্বর্যালিপ্যমোহে ক্রিয়ধর্ম-ত্রই হইয়া পিতৃপুরুষদ্বয়ের নামে কলঙ্ক আনিঃ না। ব্রাহ্মণ ও বৈশ্যেরাও এটরূপ শৌর্য্যবাহিত আদিকর্মে নামে কুলমতিমা অক্ষুঃ রাখিঃন। আর পত্যানেরাও আদৈশ্বর্য্যপুরুষদ্বয়ের ক্রমভঙ্গহিত বর্ণদ্বন্দ্বকণ-কীর্তি প্রবঃ নমন করিয়া মধ্যাপূর্ণ

হইত। যদি সাধারণ শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে কোন বিশেষ শিক্ষা দিতে হয়, তাহা হইলে বালকবিশেষের অগ্রবয়স হইতেই সেই শিক্ষা আরম্ভ না করিলে কলঙ্কতা কণ্ঠে না। শিল্প, কৃষি, বাণিজ্য, বুদ্ধ বা অন্ত কোন বিশেষ বিদ্যার নিপুণতা লাভ করিতে গেলে, যৌবনের পূর্বে হইতেই তাহার সাধন আবশ্যক। ঐশ্বর্য্যবিশীঃ শুবকের পক্ষে হৃদযবের ব্যব-সায়শিক্ষা বড়ই কঠোর। অন্ত বয়সে তাহার চণ্ডের ক্ষিপ্ৰকারিতা চলিয়া যায়। বর্ণধর্ম উত্তীঃ গিয়া আজকাল আমরা বড় বিশেষ পাটরাটি। আমাদের সম্বানদের কি শিক্ষা-টব, বৃত্তিতে পারি না। আমরা অককারে ছিল মারি। চপ্চপ বা য়েডন বর্ণবহুৎ বালকের বিশেষ প্রতিষ্ঠা না পাকিলে, মৈল-মিঃ চিত্তগতি কানো যায় না। আর কুল-ধর্মের উপদঃ আতা মট। তাই তাহাকে সুবিদ্যাসুধারী একটা বিশেষ শিক্ষালাভে (profession) বলপূর্ণক প্রবৃত্ত করি। আর না হয় তাহারা কেবল সাধারণভাবে বিদ্যাঞ্জন করিয়া উপাধিবিশিষ্ট হইয়া উকিল বা য়ে-কোন চাকরি অবলম্বন করে। যখন বর্ণ-ধর্মের প্রভাব ছিল, তখন পিতা এবং বালক, উভয়েই প্রবঃ হইতেই জ্ঞানিত যে, কোন িশেষ বিদ্যায় নিপুণ হইতে হইবে।

১ বর্ণধর্মবিভাগসময়ে অনেকগুলি আপত্তি উপাধিত হইয়া থাকে। আমাদের সংস্কারকেরা যুরোপীয় বর্ণবিভাগহীন সমাজের সন্নি-কুলনা করিয়া বর্ণপ্রমথঃপ্রব হেরঃ প্র-তি-পাথন কঃন সেই আপত্তিগুলি ও কুল-নার ব্যাখ্যাপঃ বিচার করা আবশ্যক।

বর্ণধর্মের কণ্ডের ঐদ্যাদা থাকে না।

ব্রাহ্মণের কণ্ঠ কত্রিয়ার কণ্ঠ অপেক্ষা উচ্চ-
তর, অতএব কত্রিয়ারস্থান সম্বন্ধে আপনাব
কর্ণগত হীনতা অশুভব করিয়া কর্ণের প্রতি
বীতশ্রদ্ধ হন। আর সভা যুরোপে সকল
কর্ণই আবরণীয়। কত্রিয়ার ব্রাহ্মণের চক্রে
নীচ ও ঘুগার, ইহা অনীচ কথা। তিথ্যারী
ব্রাহ্মণেরাই ত কত্রিয়ার বীরকীর্তি বোধিত
করিয়া থাকেন। মান লইতে কত্রিয়ার ঘৃণা
করেন, কিন্তু ব্রাহ্মণের আত্মবিকা প্রতিগ্রহ।
আজ যদি কোন দরিদ্র ধূলুধূলিতে নগ্নপদ
ব্রাহ্মণ তাহার লক্ষণিত কাছস্থ শিষ্যের
নিকট গমন করেন, আর সেই সীমান্তকবাসী
চার ছিন্নবসন গুরুকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম
করিয়া পদধূলি গ্রহণ করে, তাহা হইলে কি
সেই ধনিসম্মান সম্মানে হীন হইয়া যায় ?
তবে কি ব্রাহ্মণ উচ্চতর নহেন ? শিকত
যেমন সম্মানসম্বন্ধে উচ্চমান অধিকার করিলে
শিষ্যের অবমাননা হয় না, তদ্রূপ ব্রাহ্মণের
সম্মানে কত্রিয়ার হীনতা হয় না। কৃপাচার্য্য
অপেক্ষা অর্জুনের বারোটিত সম্মান অধিক-
তর ছিল, সন্দেহ নাই। কিন্তু কৃপাচার্য্য
গুরু, তদন্ত অর্জুন নিশ্চয়ই তাহার পানস্পর্শ
করিতেন। পানস্পর্শ করিতে গিয়া অর্জুন
কি কত্রিয়ার কর্ণের হীনতা অশুভব করিয়া-
ছিলেন ? বর্ণবিরোজিত কর্ণের বরক এক-
পক্ষে অমর্যাদা হইতে পারে। সফরের গজ
কর্ণ, অতএব সফর হইলেই হটল ; কর্ণটা
যেমন হটক না কেন—উচ্চ বা নীচ, শুভ
বা অশুভ। অলঙ্কার লইয়া কাজ, পতি-
কেবল একটা উপায়মাত্র।

আর এক আপত্তি, বর্ণবিভাগে অত্যন্ত
ভেদভাব হয়। বর্ণমর্যাদার অধিকাংশত

এক বর্ণের অপরে বর্ণের সমস্ত আহারপান,
আবাসন প্রভৃতি বা পরিগণ্যমত সমস্ত স্বভাবত
বহিত হইয়া যায়। যুরোপে দেখ একজন ভেদ-
ভাব নাই। ঐশ্বর্য্যলাভের প্রতিযোগিতায়
ভেদভাব চূড়ান্ত হয়। যদি কোন সামান্য বণিক
আজ কোটিপতি হয়, তাহার বাড়িতে স্বয়ং
লব্ধি ও লভ্যের ভোজন করিতে আসিবেন,
কিন্তু সেই হঠাৎ-মর্যাদা বণিকের ভ্রাতার গৃহে
কেন ?—পিতারও গৃহে তাহার কোনদিন
পর্য্যাপ্ত করিবেন না। আর ঐ বণিকের
কস্তার বিবাহের সময় যখন ভোজ হইবে, তখন
সাধা কি যে, সেই ভোজগৃহে তাহার বরিত্র
ভ্রাতা-ভাগিনী এমন কি জনকজননী পর্য্যাপ্ত
প্রবেশ করিয়া আনয়িত বড়নাথুদের সঙ্গে
একটু চা পান করেন। আর আজ এখানে
যদি কোন হাইকোর্টের জজের বাড়িতে
বিবাহ হয়, তাহা হইলে তাহার দীনদীন
কর্ণদর্শবিহীন জাতিকূট্র, যে যেখানে
আছে, সকলকেই তাহাকে গণ্যবস্ত্র হইয়া
নিমন্ত্রণ করিয়া আসিতে হইবে। তাহার
সকলে আসিয়া এক পংক্তিতে ভোজন না
করিলে, বিবাহকার্য্য পূর্ণ হইবে না।
ভেদভাব সকল সমাজেই আছে। তবে
আমাদের না কি অত্যন্ত দুর্দীপা, তাই
যুরোপীয়েরা আমাদের সঙ্গে বর্ণধর্মভাগ করিয়া
অন্তঃসম্প্রদায়িক প্রহর করিতে শিখা যেন।
আর আহারপানের নিষেধবিধি কি এতই
অস্বাভাবিক ? যদি অল্প বর্ণের সহিত আহার-
সংসর্গে বর্নিষ্ঠতা বৃদ্ধি করে ; বর্নিষ্ঠতা-আহার
যদি গুণবিশিষ্টতাকে নিশ্চয়মুদিত করে,
তাহা হইলে যথেষ্ট আহারপানের নিষেধ
কি চিত্তকর নয় ? কিন্তু একবর্ণের বিরোধ

অন্ত বর্ণের বিবাহের অপ্রচলনে কখনই নিষাধিত হন নাই। বিবাহ বলিতে সকল বর্ণের আধাধিপকে বুঝে—ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য (বসিষ্ঠসংহিতা—২ অধ্যায়)। বিবাহোত্তরই অধাধন, বস্ত্র এবং দানে অধিকার ছিল (দ্বৌতসংহিতা—১০)। ঔহাধের মধ্যে একটা মৌলিক সমতা ছিল, তর্কিত গর্ভভোজনের নিষেধাবাদানে ঔহাধা ব্যবস্থিত হন নাই। বস্ত্রবিহীন পুত্রদ্বিগেরই সহিত কেবল বাবধান ছিল। কিন্তু বধন বৌদ্ধবিপের শূত্রবাদে ভারত লক্ষ্যভ্রষ্ট হইয়া গেল, উচ্ছৃঙ্খলতা প্রবল হইল, তখনই বিব্রোহকে দমন করিবার নিমিত্ত আহাৰপান-বিধির কিছু কড়াকড়ি হইল। তবুও ভিন্ন বর্ণের সহিত ভোজন বদন হয় নাই। কেবল মধ্যাহ্নারক্ষণার্থে ভট্ট এক প্রকার ভোজনীয় ভ্রবা গ্রহণ করার নিষেধ হইয়াছে।

বর্ণভেদ যে একেবারে অদূরজন্যীয় ছিল, তাহা নহে। একবর্ণের সহিত অপর বর্ণের আশান গ্রহণ চলিত। কন্দাভিনয়কার অস্ত্র সর্বাধিবাহ প্রাশংসনীয় বলিয়া বিহিত হইয়াছিল। কিন্তু লোকস্বার্থে অহুলাম বা প্রতিশোধ বিবাহ শাস্ত্রসম্মত ছিল। বিপ্র হইতে ক্ষত্রিয় স্ত্রীতে উৎপন্ন পুত্রের নাম মূর্ধাভিষিক্ত; বৈজ্ঞাতীয়া স্ত্রীতে উৎপন্ন পুত্রের নাম অঘট; এবং শূদ্রসন্তান স্ত্রীতে উৎপন্ন পুত্রের নাম নিষাধ বা পাশশব। ক্ষত্রিয়ের অহুলামভাত পুত্র বৎকালে নাহিবা ও উগ্র, আর বৈজ্ঞাত অহুলামভাত পুত্র করণ বলিয়া কথিত হয়। প্রতিশোধক্রমে ব্রাহ্মণের গর্ভভাত পুত্র হইত, বৈদেহক ও চাণাল, ক্ষত্রিয়ের নাগর্ভ ও কন্ত; আর বৈজ্ঞাত অহু-

গব নামে অভিহিত হইয়া থাকে (ব্রাহ্মবস্ত্র—১৬)। প্রতিশোধবিবাহ আধারদ্বীপ ছিল না; বিশেষতঃ শূদ্রের প্রতিশোধসম্পত্তা অত্যন্ত নিকমীয় ছিল। হীনজাতির কন্তা গ্রহণ করার তত ক্ষতি হয় না, বত কন্তাবাদে হয়। কোল-ভিলোয়া যদি আমাদের কন্তা-গুলিকে লইয়া যায়, তাহা হইলে আমরা কি মর্মে মর্মে আহত হই না? বিবাহবর্ণের মধ্যে অহুলাম বা প্রতিশোধভাত পুত্র বিবাহ বলিয়া পরিগণিত হয়। মেধাভিষিক্ত মতে প্রতিশোধভাত পুত্রেরও উপমহন কর্তব্য (মহুসংহিতা—১০, ২৮)। এত সকল অসবর্ণ-সম্মেলনসমুহ জাতিসকল বর্ণোৎকর্ষ ও লাভ করিত (ব্রাহ্মবস্ত্র—১)। মহু বলেন যে, শূদ্রও ক্রমে ক্রমে উৎকৃষ্টভাতিতাবাপন্ন হয় (১০ম অধ্যায়—৩৩৫)। এখানে ইহা বলা আবশ্যক যে, বর্ণোৎকর্ষণভাত এক পুরুষে হইত না, কারণ বর্ণধর্ম ব্যক্তিগত কর্মের উপর প্রতিষ্ঠিত নয়, কিন্তু কৌলিক কর্মের উপর প্রতিষ্ঠিত। যদি কোন অধঃবংশ তিনচার-পুরুষ শুদ্ধব্রাহ্মণাচারী হয়, তাহা হইলে সেই বংশ বিপ্র লাভ করে—এইরূপ বিধি বেধিতে পাওয়া যায়। যদি কেবল এক পুরুষ ব্রাহ্মণধর্মী হয়, আর সেই ধর্ম পুরুষ-পরম্পরাগত না হয়, তাহা হইলে ব্রাহ্মণ-লাভ হয় না।

বর্ণবিভাগ যে কেবলমাত্র ভেদভাবের পোষণ করে, ইহা সত্য নহে। ইহা অবশ্যই-সায়ে উদায় হয়। কালে ইহা এত উদার হইয়া উঠিল যে, শূদ্রসম্মেলনভাত সত্ত্বেও বর্ণের গুরুভারে আর্গোয়া ভারাক্রান্ত হইয়া পড়িয়াছিল। এত সত্ত্বেও ভাতিয়া আর্গো-

জাতির উচ্চ লক্ষ্য বুঝিতে পারে না। তাহার আর্থ্যতন্ত্রের ভিতর বৈষম্য আনিয়া-
ছিল, নিরুত্তিমার্গকে প্রবৃত্তির দ্বারা কলুষিত
করিয়াছিল। বৈষম্যবোধে আর্থসমাজ
অবসর হইয়া পড়িল। এই অবসাদ
বৈমানিক বৌদ্ধবাদের প্রদরুনি হইয়া-
ছিল। ভারত আর্থ্য-আদর্শ-বিরহিত হইয়া
অধঃপতিত হইল। যে আর্থোত্তর লক্ষ্যবাহ-
তার অস্ত্র বিখ্যাত, তাহারাই আজ অসুখের
বলিয়া নিশ্চিত। আর কিনা করে কারা?—
যারা পরাজিত জাতিসকলের মতিত কখনও
মিলিতে পারে না, বরঞ্চ তাহানিকে নাপ
করে। ইংরেজের হস্তে মার্কিনের আদিম
জাতির অস্ত্র হইল। হইয়াছে
আফ্রিকা ও অস্ট্রেলিয়াতেও ঐশ্বর্য চ-
কেবল পুণ্ডিত উদারতার আড়লের বেধির
আমরা আবারে পূরপূর্ণবাদগণকে অসুখের
ও নিচুর বংশের গুরুনিম্নপাতকে পাতকী
হইয়াছি।

যুরোপের বর্ণভেদ নাই বলিয়া তথায়
সামাজিক ভেদভাব নাই, এই ধারণা মন-
সূজা। সেখানে ঐশ্বর্যপানীতে আর ধীন অব-
লোবীতে এত প্রভেদ যে, তাহাদের জিগীষার
আদর্শ নিষাঙ্গের পরিণত হইয়াছে। বৈনা-
শিকেরা (nihilist) ও সামাজিক সাম্য-
বাদীরা (socialist) তাহার লক্ষ্য। প্র-
লোবীবিষয়ের বিপুল ধর্মবটনকল যুরোপকে
স্বাস্ত করিয়াছে, বিরোধের ভরসার ছবি দেখা-
ইয়া যুরোপীয় সমাজকে ভীত করিয়াছে।

বর্ণধর্মে জিগীষা প্রবৃত্তির পরিণতি হয় না,
মানববুদ্ধি কর্মবদ্ধ হইয়া পড়ে ও কালের
পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে উন্নতির পথে অগ্রসর

হইতে পারে না। যুরোপে তরুণ বহন নাই,
তাই তথায় জিগীষা আছে, বিজয়লক্ষ্যের
গোড়া আছে, প্রতিভার ক্ষুধার ভক্ত প্রপত্ত
ভূমি আছে, উন্নতির অনন্ত পথ খোলা
আছে। আর এখানে কোন ব্যক্তি যদি
কৌলিক কর্ম করিতে অগতু হয়, যদি তাহার
প্রতিভা পরিশ্রমপালনে প্রত্যবত ধাবিত হয়,
তাহা হইলে তাহার আর কোন উপায় নাই।
তাহাকে বর্ণের বেড়ার মধ্যে বদ্ধ থাকিয়া
তাহার নৈসর্গিক বুদ্ধিকে বিনষ্ট করিতে
হয়। বর্ণধর্ম প্রকারে অপ্রপত্ত নয়। বর্ণ-
ধর্মপালনে প্রতিভার যথেষ্ট উৎকর্ষ হইত।
তাহাতে প্রতিভার স্বাধীনতা নষ্ট হইত না।
জনক করির হওয়া ব্রাহ্মণের গুণ হইয়া-
ছিল। ব্রাহ্মণাচার্য ব্রাহ্মণ হইয়া অসংখ্য
করিয়াছিলেন। লক্ষণে আপন-আপন বর্ণ-
ধর্মপালন করিবে, এষ্টরূপ শাসন ছিল বুটে,
কিন্তু প্রতিভাপালী ব্যক্তির এই শাসন যে
অতিক্রম করিতে পারিত না, এমন নহে।
আর আপনকালে বা গোত্রকর্তব্যে জনসাধা-
রণে পরধর্ম গ্রহণ করিতে পারিত। গৌতম
বলিয়াছেন—আপনকালে ব্রাহ্মণ, ব্রাহ্মণ ভিন্ন
অস্ত্র জাতির নিকট হইতে বিদ্যাপিক্ষা
করিবে এবং যে পর্যন্ত শিক্ষাদমাস্তি না
হইবে, সে পর্যন্ত তাহাদের গুরুবা এবং
অমুগমন করিবে (গৌতমসংহিতা—৭)।
ব্রাহ্মণ স্বকীয় ধর্মপালনে প্রেতভা লাভ
না করিতে পারিলে, কতিয়বৃত্তি বা বৈজ্ঞানিক
অবলম্বন করিতে পারে ও কালের আক্রমণ
হইতে বাচিবার অস্ত্র ব্রাহ্মণ বা বৈজ্ঞানিক
কতিয়বৃত্তি গ্রহণ করিতে পারে। কৌলিক
কর্মে নিরত থাকার বিধি ছিল।

কিন্তু বিবি লোকচিত্রের ভক্ত। তত্ক্ষণে বিবি-সকলকে কানাহুসারে প্রসারিত বা সংকুচিত করিতে হয়। যদি রাজ্য বিদেশীয় হয়, তাহা হইলে কুলধর্মনিষ্ঠ। আর জীবিকার বিরোধে হইয়া থাকে। তখন একটা সাম-ভক্ত হওয়া আবশ্যক। অবস্থার পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে কুলধর্মাব্য-ব্রজা হয়, অথচ ক্রিতিভঙ্গ না হয়—এই সংতিতাকারমিপের উদ্দেশ্য ছিল। আর্থানিগের ইতিহাসে সকল সময়ে ক্রিতি ও পরিবর্তনের সামঞ্জস্য বর্ণনা হইয়াছিল কি না, তাহা বিচার করা এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নহে। তবে ইতিহাসপাঠে জানা যায় যে, বর্ণধর্ম ক্রিতি-শীল হইলেও কালের গতির সহিত অগ্রসর হইতে পারে।

অনেক সময় দেখা যায় যে, বঙ্গদৌরবের দ্বারা চালিত না হইলে সমাজ কর্মহীন হইয়া পড়ে। বিন্যাসে বর্ণধর্ম নাই। তথায় মোটামুটি ঐশ্বর্যলাভানুসারে কর্মের আদর। তাই আজ দেখানে বুদ্ধ বাটবাব ভক্ত লোক পাওয়া বাটতেছে না। লর্ড ক্রিচনের ভূষণপ্রকাশ করিয়া বর্ণিষ্ঠাছেন যে, আনাড়ি লোক পাঠাইলে আর চলিবে না। পত্রাবলম্বয়ে তত পরমা আসে না, তত প্রতিষ্ঠা নাই; তত্ক্ষণে লোকের ইচ্ছাতে তত আগ্রহ নাই। রাজপুত্র-বোরা ভগ্নাব বলপূর্ণক লোকনিসকে ক্রিতিধর্ম অবলম্বন করাইবার প্রয়াস করিতেছেন। কর্ম কুলগত হইলেই যে হীন হয়, আর স্বাধীন হইলেই যে শোভন হয়, এমন নহে।

এক হইতেই বহু হইয়াছে বা একই বহুভূষণে প্রতিষ্ঠাত হইয়াছে। বাহ্যতে

একেতেই আবার সব পর্যাবসিত হয়, তাহাই আবারের সাধন। কর্ম নিষ্কাম হইলে কর্ম-হুই যিনটে হয়। কিন্তু সাংসারে ভ্রমোত্তপ্ত হই প্রাণনা। অথচ রমোত্তপ্তের উত্তমাংশ এই উত্তমাংশকে চালিত করিলে প্রকৃতি সমাহুকুল হয়। পরমার্থতত্ত্ব রমোত্তপ্তিট প্রকৃতিতে ভাল তান পার না। তত্ক্ষণে সেই প্রকৃতিকে রমোত্তপ্ত হইতে চালনার দ্বারা সুপথে লইয়া যাওতে হয়। অতএব কথিত আশ্রমধর্মনিয়মিত কুলধর্মাব্য-ভিত্তিতে কর্মকে প্রতিষ্ঠিত করিয়া কলিঙ্গ-দোষ হইতে উদ্ধাকে সংকুচিত করিয়াছিলেন। বর্ণবিভাগ রক্ত ও সত্ত্বের বিবেচনায় ভঙ্গ করে, রমোত্তপ্তকে সমাহুকুল করে, প্রকৃতিকে সামান্যতর আনন্দের উদ্দেশ্য করে। এই একনিষ্ঠতার আদর্শ অসুখ রোগ ও সমাজকে রাজনৈতিক আভ্যন্তরীণ ভিত্তির দ্বারা সাময়িক পথে লইয়া যাওয়া অতি দুষ্কর। নেতারা জানী ও তাগী না হইলে আদর্শ নষ্ট হইবার আভ্যন্তরীণ। এই দুষ্কর নেতৃত্বভার লইবার ভক্ত ভ্রমণবর্ণের উদ্ভাবন। তাহাও বর্ণ-বিশেষ কার্য অধ্যাপন ও বাক্য। তাহা-বর্ণ আভ্যন্তরীণ প্রাধান্য প্রতিগ্রহ অর্থাৎ অধাচিত মানের উপর নির্ভর করিত। ঐশ্বর্যসকল ভ্রমণের পক্ষে নিষিদ্ধ ছিল। কঠোর শ্রমধর্মসংগমে তাহাও জীবন নিষ-মিত ছিল। ধর্মভ্রষ্ট হইলে তাহারা অব-মানিত, লাঞ্চিত, পরিবর্জিত হইতেন। বহু বলেন—যে বিজ বৈদ্যপাঠন না করিয়া অস্ত্র বিষয়ে পরিশ্রম করে, সে টহলদেই মধ্য-শ্রম প্রাপ্ত হয়। বসিষ্ঠ বলেন—যে বর্ণিত ভ্রমণ হইলে তাহার অতিক্রমে

ব্রাহ্মব্রাত্ৰুদয় নঃ পশ্চিমঃ (১৩) ।
সমাজকে একত্রে প্রদীপ্ত কবিস্বর ইং-
রেই উপর তার তিল । ইংলান্ড বাবসার
তিলেন না, শত্রুজীবী তিলেন না । তাই
তাদের স্বপ্নের দ্বারা প্রণোদিত হইবার অল্প
সম্মতি না ছিল। ইংরেজ রাজনীতি শুদ্ধবায় ও
মত্তবিক্রমীদিগের হস্তে লাড়কা লাগ কত
না কলুষিত হইয়াছে ? সমাজনীতি, ধর্মোচিত,
রাজনীতির শুদ্ধবায় রাধিব্যব কষ্টই নেতাদিগকে
বার্ষিক শুদ্ধতার কুচিত করা হইয়াছিল ।

একনিষ্ঠ ব্রাহ্মব্রাত্ৰুদয় আশ্রমধর্ম হিন্দুধর্ম
ভিত্তি । এই আশ্রমধর্ম হিন্দুভাষিকের দ্বারা
বিদ্রোহবশত হঠাৎ রক্ষা করিয়াছে, আশ্রমকে
দ্বারী করিয়াছে । X হিন্দুধর্মের এক অটল
ভিত্তি আছে, এইরূপ বোধ ও আশ্রমধর্ম
উদ্ভাবিত করিব্যব অল্প এই প্রবন্ধ গণিত
হইয়াছে । এত আশ্রমগালা বাতীত বর্ত-
মান হিন্দুসমাজের সংস্কার করিতে নৌনে
উচ্ছলতা আসিয়া পড়িবে ।

শ্রী ব্রাহ্মব্রাত্ৰুদয় উপাধ্যায় ।

উপকথা ?

—১৮৭৫—

প্রথম প্রার্থনা ।

রামশঙ্কর দ্বারা বিকালবেলায় মূলের বাগানে
প্রবেশ করিয়াছিলেন, সঙ্গে ছোট-
ছোট পোত-পোতী, দোহিরা-দোহিরা ।
তাহারা বাগামশরকে বাগানের মধ্যে
বেকের উপর বসাইয়া ফলফুলপত্রপল্লবে
তাঁহাকে সজ্জিত করিয়া দিল । পোতী-
দোহিরা ফুলের মালা গাঁপিয়া পলায়
পুল্লাইল, পোত-দোহিরা পল্লপত্র কামি-
নার একটি কুশলাবা তাঁহার মস্তকে
চুড়ার দ্বারা বাঁধিয়া সেই চৈতন্যসেই রাম-
শঙ্কর আয়োজন-উদ্বেগ করিল । এমন
সময় ঠাকুরবাড়ীতে পঞ্চ-বটী নিদ্রাভিত্ত
হইয়া বিগ্রহের পাক অর্থাৎ হুঁত হইল ।
অর্থাৎ-অন্তে সোদন ঠাকুরবাড়ীতে কীর্ত-

নের কথা ছিল,—তাহারা প্রভাবিত রাম-
শঙ্কর পরিভ্রমণ করিয়া সেট দিকে ছুটিল ।

সে দিন পূর্ণিমা । দেখিতে দেখিতে
দুঃখ আশ্রমের মাথার উপর দিবা পূর্ণ-
চন্দ্র উদয় হইল । চৈতন্য শেষ ; অগ্নি
মুগ্ধবায়ু মুগ্ধবায়ু করিয়া বহিতে আরম্ভ
করিল । চারিদিকে মালতী, বেল, মল্লিকা,
রজনীগন্ধা ফুটরা বাগান প্রভূত, হাসিময়
করিয়া তুলিল । আর কোকিল ?—সে তো
ডাকিয়া আকুল !—অনন্তর আসিল ।

সেই চন্দ্রালোকমুখ, 'ফুটফুট'বায়োমিত্ত
কুহুমমুখরিত উদ্ভানে রামশঙ্কর একাকী
বসিয়া রহিলেন । তাহার বয়স ষাটবৎসর
উত্তীর্ণ হইয়াছিল । মস্তকে বিরল কেশ,
তাহার পক্ষ, শরীর বালত, দন্ত খলিত ।

কিছু দান ও খুঁ মচোয়ো; তাহার জগৎ-
শরীরও যেন কটাক্ষিত হইয়া উঠিল। জুল
বৃক্কবৃক্কীয়া সাক্ষাতেও কোটে, বৃক্কের
সাক্ষাতেও কোটে; অব্যাহিত বায়ু অব্যাহ-
বৃক্কবৃক্ক মক্কের শরীরেই বৃক্ক প্রবেশ হইল;
গাছে বসিয়া বসন কোকিল ডাকিতে আরম্ভ
করে, তখন প্রোচারণ যোবন কি বাক্ত্য
কিছুই লক্ষ্য করে না। আর পুর্ণিমার
চাঁদ? সে তো পুর্ণিমার উত্তরা হালি
হুড়ার; হুড়-বৃক্ক, অক-কুজ বাজে না, কল-
হুল বিচার করে না, কীট-পতঙ্গ, পাছাড়-
পর্জন্ত, ভেতন-অভেতন, কোন প্রবেশ মানে
না। বলিয়া বলিয়া দেখিয়া উনিয়া রাম-
শঙ্কর রায়ের জগৎশরীর কটাক্ষিত হইয়া
উঠিল। দীর্ঘনিশ্বাস ছাড়িয়া রামশঙ্কর
ভাবিলেন—সেই জুল কোটে, সেই কোকিল
ডাকে, সেই বাতাস ব'হিয়া যায়, সেট চাঁদ
হাসে, সেই আমিও আছি; চক্ক, কর্ণ, নাসিকা,
বৃক্ক, মক্কলই তো আছে;—তবে কেন জুল
ছুটরাও কোটে না, কোকিল ডাকিয়াও
ডাকে না, চাঁদ হাসিয়াও—” রামশঙ্কর
ধাঁড়াইলেন, কাতরকণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন—

“বিধাতা, কেন এমন হইল?”

যোগেশ্বর বিধাতা পুরুষ রামশঙ্করের
সম্মুখে আবির্ভূত হইয়া বলিলেন—

“কি, রামশঙ্কর, কি গো?”

রামশঙ্করের শিরায় শিরায় প্রবলবেগে
রক্তপ্রবাহ ছুটিতেছিল, তিনি হাত জোড়
করিয়া বলিলেন—

“এক, কামনা সূত্রায় নাট, কাম্যবস্ত্রতে
সংসার ভরা, ভোগের শক্তি কেন মষ্ট করি-
য়াছ?—জুল কোটে, চাঁদ উঠে,—চক্ক কেন

কোরগায় ঢাকা? কোকিল ডাকে, পাণিয়ার
ডাকে, কর্ণ—”

বিধাতা। প্রামশঙ্কর, তোমার প্রার্থনা
কি?

রাম। সেই চক্ক, সেই কর্ণ বাও; সেই
হাত, সেই পদ, সেই শরীর-মন বাও।

বিধাতা। কোন্ চক্ক, কোন্ কর্ণ?

রাম। পাঁচশব্দস্বর বহনকালে যে
চক্ককর্ণ, দেহমন ছিল, তাহা কিরাইয়া বাও।

বিধাতা পুরুষ “তপস্বী” বলিয়া অস্বস্তি

হইলেন। রামশঙ্কর চাহিয়া দেখিলেন,—

বলয়পুর্ণিমার চন্দ্রবিধে কত শোভা হই-

য়াছে! চন্দ্রালোকপ্রস্থর মৌগাকালে কত

জ্বলর, কত শতসহস্র গ্রহতারা শোভা

পাঠিতেছে! মালতী-মালিকা-মুখী কেমন

হাসিতেছে,—মুগ্ধ মলয়সমীপে কেমন

জ্বলিতেছে! কত কোকিল ডাকিতেছে,

কি মধুমাখা স্বর! তাহার শরীর পিহরিয়া

উঠিল নিজেই দিকে চাহিয়া দেখিলেন,—

সে বলিষ্ঠ জগৎদেহ আর নাই; কি অগতি

বলিষ্ঠ গৌরবাহ, কি বিলাসবিভার বক!

মস্তকে হাত দিয়া দেখিলেন, অমতিবৃহৎ

নিবিড় কেশদান বায়ুস্পর্শে কম্পিত হই-

তেছে! চক্কর কি নবীন পরিহার বৃষ্টি!

বহুবলমানোত কলবিহঙ্গনিদানও তাহার

কর্ণে প্রবেশ করিল! সমস্ত শরীরে উৎসাহ,

জ্বল উৎকল! বাহ্যবিকার করিয়া, বাক

শীত করিয়া, রামশঙ্কর কুসুমজ্বালিত সেই

মলয়প্রবাহে নিশ্বাস গ্রহণ করিতে লাগি-

লেন; অভিনব উদ্ভবে কুহ উল্ফন দিয়া

পদযুগল ও কটিকেশর মুক্তা ও সমস্ত শরী-

রের নবীন সজীবতা পরীক্ষা করিয়া অব-

শেষে স্মিতমুখে মুখে রামশঙ্কর গুপ্তবাহু হইল। অগতির পথনক্ষত্র উপস্থিত হইলেন।

পথনক্ষত্র প্রবেশ করিয়া কাহাকেও দেখিতে পাইলেন না। এক কোণে প্রাচীনা গৃহিণীর একখানি আয়না ছিল, তাহার পায়বলেণ দ্বারা উত্তীর্ণা গিয়াছিল, সেখানি আলোর নিকট আনিয়া রামশঙ্কর তাহাতে আপনার মুখ দেখিলেন। স্বয়ং বিধাতার বয়ঃ রামশঙ্করের সে ক্ষুণ্ণ ললাট, কোটর-গত চক্ষু, শুভ্র জু, বিবলমুখ মুখ আর নাট! পঞ্চবিংশতিবর্ষের নবান বৃদ্ধের মনোহর স্ত্রী তাহার আবার কিরিয়া আসিয়াছে। এমন সময় কে যেন বারান্দা তটতে বিজ্ঞাসা করিল—

“কিরেছ কি?”

গৃহিণী! রামশঙ্করের ধর্মমীমধ্যে শোণিতপ্রবাহ পরস্রোতে ছুটিয়া চলিল। তিনি স্নিগ্ধমুখে চকণচরণে উত্তীর্ণা দাঁড়াইলেন। বলিলেন—

“কিরেছি গো, এস।”

গৃহিণী। এত রাত, বাগানে না ঘুরিলে কি হয় না?—পদ্মি, কানী—

গৃহিণী যেরূপ প্রবেশ করিয়া তন্ত্রিত হইয়া দাঁড়াইলেন।—এ কে? মনে পড়ে-পড়ে, যত্নের কথা, বহুদিনের কথা! রামশঙ্কর স্নিতমুখে চকণচরণে অগ্রসর হইয়াছিলেন, গৃহিণীকে দেখিয়া তিনিও থামিলেন।—এ কি রূপ?

বসন্তরীনা, পক্ষকনৌ, জীর্ণশির্ণভঙ্গী—
ঠাকুরাণীদিগির উপযুক্ত। গৃহিণী! মধুর প্রাপ্তসন্তোষ আর উচ্ছ্বাসিত হইল না, হস্তাবনমনত উত্তোলিত তর অধনমিত

হইল। কনকাল উজ্জ্বল নীলব—নিমল চট্টা গ্রহণের বৃদ্ধা গৃহিণী স্মৃতিমন্দি-
ত্বের দ্বার উন্মাদন করিলেন, চিনিলেন; নবীন বয়সের সেই অতিরামরূপ স্বামীকে সাক্ষাতে দেখিয়া তাহার সর্বাঙ্গ পুলকপূর্ণ হইয়া উঠিল; তরুণ স্বামী প্রাচীনা গৃহিণীর সেই জীর্ণশির্ণভক্ত বিক্রমমূর্ত্তি দেখিয়া চক্ষু মুগ্ধিত করিলেন।

গৃহিণী। “কি গো, বসন্ত কি আবার কিরণ?—তক তরতে যে নূতন মজরী!

হাম। কহ নূতন মজরী?—বসন্ত কিরিয়াছে কই?

তখন উভয়ে কথা হইল। বিধাতার বরে যে নূতন বয়স ফোঁড়িয়া পাইয়াছেন, স্বামী তাহা বলিলেন। তখন বসন্তরীনা গৃহিণী বলিলেন—

“নূতন বয়স পাচখাচ, নূতন গৃহিণী আন; এ বিক্রম মূর্ত্তিতে তো আর তোমার তৃপ্তি হইবে না!”

রামশঙ্কর রায় উত্তিলেন। বলিলেন—

“তুমি একটুকু বসো; আমি আসিতেছি।”

রামশঙ্কর বাহিরে চলিয়া গেলেন।

গৃহিণী বহু—বহুকাল হইল বিগত, শুধু স্মৃতির সাহায্যে মানসক্ষে মনোদ্রিত, নিম্নের ঘোড়ার হৃদয় মূর্ত্তি ও কমনীর কান্তির কথা ভাবিতে ভাবিতে অশ্রুবিপল্লব করিতে লাগিলেন।

দ্বিতীয় প্রার্থনা।

রামশঙ্কর দার ভক্তসঙ্গে স্থলের বাগানে সেই স্থানে উপস্থিত হইয়া করজোড়ে কাতর-
কণ্ঠে কহিলেন—

“বিধাতা, এ কেমন কাজেলে?”

বিধাতা পুরুষ আবির্ভূত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—

“কি হইয়াছে, রামশতর?”

তাম। কি করিব এ বুঝাবল্য নিজা, ঘরে গৃহিণী যে বয়ীঘনী!”

বিধাতা। তোমার প্রার্থনা কি? ও

“রাম। আমার নবীন বরণ আমাকে কিরাইয়া দিহাও, পাখে বয়ীঘনী স্ত্রী, এ বিড়ম্বনা কেন? যদি বরাই করিওত ত্রু, তবে আমার সে বরসের সেই নবীনা স্ত্রী কিরাইয়া দাও।

“তৎপাত” বলিয়া বিধাতা ক্ষুব্ধিত হইলেন।

রামশতরের দর নৃত্য করিয়া উঠিল। তিনি ক্ষতবস্ত্রে রাশিহীন মলিকা-মাগতী, হুঁই-বেল চেন করিয়া নিভের পরিত্রিত বস্ত্র-প্রান্তে বাধিয়া দাঁটলেন। যন্ত্র লতাহুত্রে একটা স্ত্রম্য মাগা গাড়িয়া সঙ্গে লইলেন; আর বিলম্ব করিলেন না; নবীন আশা, নবীন উদ্যমে লখনগুহের দিকে চলিলেন।

এদিকে লখনগুহে অকস্মাৎ বয়ীঘনী পুৰিণীর ছন্দ পরিত্রিয়া উঠিল; মহুগতি যন্ত্রপ্রবাহ হঠাৎ ঠাহার শিয়ার শিয়ার উদ্ভূসিত হইয়া উঠিল। ত্রু বৃত্তিপ্রসার পরিত্রুত, বিদ্রুত হইল। অরপ্রত্যক্ষসকল যেন নবীন উৎসাহ-উদ্যমে নৃত্য করিয়া উঠিল। গৃহিণী উঠিয়া ঘর্ণণে আপনাত যুগ নিরীকণ করিয়া উৎসূর হইয়া উঠিলেন। আর সে নৃত্য নাই; অষ্টাদশ-বয়ীয়ায় “সুভারতজগাব্যাসের অধরোষ্ঠ, সুগোল পূর্ণপদ্ম, সুগতিত পবর অংগদেশ,

সুদীর্ঘ বৈবিক তেপরাশ বোঝা গৃহিণীর চিত্র উবেলতরঙ্গময় চরণা উঠিল। তিনি বামীর প্রতীক্যে চকিতমননে ঘরের নিকট অপেক্ষা করিতে লাগিলেন।

এমন সময় স্বামী সে ঘরে উপস্থিত হইলেন। সাক্ষাৎ বিধাতার বর! স্মৃতি-রাজ্যে চিরবিহারিত সেই যৌবনসঙ্গিনীকে সমুখে দেখিয়া রামশতর মনে মনে বিধাতার উদ্দেশে শতপ্রণাম করিলেন। আলোর নিকটে বসিয়া তখনে কত কথা হইল, কত প্রশ্ন হইল; পূর্ণিবা নন্দনকানন হইল। এমন সময় কোতপোহবধু সুহাসিনী ত্রয়কমলগুণ-পারিত্রিত মনচুটীরের মুহুত্ৰ-সুহু লগে বাগান। নিন্দিত করিয়া সেই গৃহঘারে উপস্থিত হইল। সুহাসিনী পকরণ বর্ষ এখনো অতিক্রম করে নাই; চাকসুখে নিতাবিজ্ঞানিত হাসিরাকরণ এইয়া বাবা-মশায়ের লখনগুহে প্রবেশ করিল। প্রতি-দিন সন্ধ্যার পর বৃদ্ধ বাবামশায়ের লজ পানে ছোঁটয়া আনে, আজও আনি। বৃদ্ধ বাবামশায় গ্রেহে তাহাকে নাম ধরিয়া ডাকেন, মস্তক স্পর্শ করিয়া আশীর্বাদ করেন এবং পোতের সঙ্গে ভাণ্ডারিনিমেষের ভর দেখান। আর কি ত্রু প্রবেশ করিয়া লগেতর উপর অপরিচিত বুরক-বুতীকে দেখিয়া সুহাসিনী ঘমাকিয়া হুঁকা-ইল। রামশতর বলিলেন—

“আন, দিদি, পান এখনে রাখ।”

স্বর শুনিয়া সুহাসিনী অতিক্রমে সে ঘর হইতে ক্ষতবেগে চলিয়া গেল। সুহাসিনী ভাবিল, “বাবামশায়ের লখনগুহে ইংরাজা কে বসিয়া?”—সে তাড়াতাড়ি আপনাত লখন-

ককে বাণীর নিকট এই অপরিচিত গ্রী-
পুরুষের আগমনের কথা বলিতে গেল।

এবিকে রামশঙ্কর বলিলেন—

“ওগো, আরও কি ছেঁড়া পান খাটব ?”

গৃহিণী বলিলেন—

“কেন ? আমি পান লাঞ্ছিতা হিব
এখন।”

রামশঙ্কর বাগান হইতে আনীত ফুল-
রাশি দিয়া গৃহিণীকে সজ্জিত করিয়াছেন।
গৃহিণীর পশার ফুলের মালা, কানে ফুল,
মাথায় ফুল, বেণীতে ফুল, শব্দায় কত ফুল
পড়িয়া রহিয়াছে !

এমন সময়ে পুত্র অবিদ্যাপঙ্ক পিতা-
মাতাকে প্রণাম করিবার ভক্ত সে ঘরে
প্রবেশ করিলেন। প্রবেশ করিয়াই বেধি-
লেন,—এ কি ? পিতার শরনগৃহে পুত্র-
পুত্রপুত্র বসিয়া নাকি ?—অবিদ্যাপঙ্ক লক্ষ্য
তদুৎপত্তি সে ঘর পরিভ্রমণ করিয়া গেলেন।

রামশঙ্কর ডাকিলেন—

“বাবা এসেছি ! এস. এস।”

অবিদ্যাপঙ্ক বেধিলেন, এ তো ঠিক পুত্র
প্রত্যাপঙ্কের ঘর ! ভাবিলেন, পুত্র-পুত্রবধু
বৃষ্টি আল স্নানিতে এ ঘরে শয়ন করিবে।
নিষ্ঠুর জানিবার ভক্ত কিছু দূরে দাঁড়াইয়া
“প্রত্যাপ” “প্রত্যাপ” বলিয়া পুত্রকে ডাকি-
লেন। অপর এক ঘর হইতে উত্তর দিয়া
প্রত্যাপ পিতার নিকট উপস্থিত হইল।
অপর ঘর হইতে তাৎক্ষণিক বাদির হইতে
বেধিয়া অবিদ্যাপঙ্ক জিজ্ঞাসা করিলেন—

“কর্তার ঘরে তুমি ভিলে না ?”

প্রত্যাপ। না ; আমি তো আমার ঘর
হইতে আনিতেছি।

অবিদ্যাপ। তবে কর্তার ঘরে কাহার
বসিয়া ?

প্রত্যাপ। জানি না। আমিও জানি-
নাছি, সে ঘরে যেন কাহারো বসিয়া আছেন।

অবিদ্যাপ। যাব কি আর এখানে
আসিয়াছে ?

যাব তাঁহার আশ্রয়। প্রত্যাপ বলিল—

“না ; যাববাবু তো আর আসেন
নাই।”

অবিদ্যাপ। তবে কে হাঁহারা—তুই বা ;
আমি জানিরা আসি।

অবিদ্যাপঙ্ক পুনরায় পিতার শরনগৃহের
দিকে অগ্রসর হইলেন। তাঁহার আগমনের
শব্দ শাইয়া রামশঙ্কর ডাকিয়া বলিলেন—

“কে ও ? অবিদ্যাপ নাকি ? এস, ঘরে
এস।”

অবিদ্যাপঙ্কের বয়স চম্পিত হইয়াছে ;
তাঁহার মস্তকে, প্রকৃতি পকতেন দেখা
দিয়াছে। গৃহে প্রবেশ করিয়া অসঙ্কোচে
অবস্থিত যুবকযুবতীকে দেখিয়া তিনি
অবাক হইয়া রহিলেন।

হাম। কি অবিদ্যাপ, অমন করিয়া
রহিলে কেন ?

এই তরুণবয়স লোকটা তাঁহার নাম
ধরিয়া ডাকিতেছে, ‘তুমি-আমি’ বলিয়া
কথা বলিতেছে,—কে এ ? গানে বলিয়া
এই তরুণীই বা কে ?—অবিদ্যাপঙ্ক
মহা চিন্তায় পড়িলেন।

হাম। অবিদ্যাপ, বাপাতিটা কি ?

অবিদ্যাপ। বাপাতিটা কি, বৃষ্টিতে
পারিতেছি না। আপনারা কে ?—কোথা
হইতে আসিয়াছেন ?

রাম। সে কি রে! আমাকে 'চিনিতে পারিস্ না ?—ইনি তোরা ভ্রমণী।

গৃহিণী বলিলেন—“কিহে, এখনি কুশলি ?”

অধিনাপট্রের দ্বন্দ্ব বাক্য নাই! হঠাৎ তখন রামশব্দের মনে পড়িল। পুরুষ বলিলেন—

“তা তোমার কোণ নাই। আমাঘের এ বেশ, এ বয়স বেহিভেত; কেমন করিয়া চিনিবে? বিধাতার বরে আজ আমরা নবীন বয়স ফিরিয়া পাইয়াছি। আমাদিগকে প্রণাম কর।”

পুরুষদ্বন্দ্ব-দ্বন্দ্বমান সেট দ্বন্দ্বদ্বন্দ্ব-তীর দ্বন্দ্বের দিকে সিঁহিতনেহে চুইনিকেশ করিয়া অধিনাপট্র তাঁহাদের চরণে প্রণাম করিলেন। প্রদিশাতকালে পুরুষ পুরুষ, আগতপ্রায় বার্কর। বেধিয়া গৃহিণী বড় লজ্জিতা হইলেন। অধিনাপট্র সে ঘর হটতে চলিয়া গেলেন।—বিধাতার বর, কিছ এ কি বিড়ম্বনা!

পুরুষ চলিয়া গেলে গৃহিণী স্বামীর দিকে চাহিয়া বলিলেন—

“এ কিসে ‘রক্তম হটল ?—কুশল রামার সেজেগেজে এই নবীন বয়সে আমরা বৃদ্ধ পুরুষের প্রণাম লইব না কি ?”

রামশব্দ বলিলেন—

“তাই তো, এ কেমন হটল!—কুমি একটুকু বসো; আমি আর একবার বেধিয়া আসি।”

তৃতীয় প্রার্থনা ।

রামশব্দ তখন শুণ্ডার বিদ্যা পুনরাব

স্থলের বাগানে উপস্থিত হইয়া কাতঃস্বরে ডাকিলেন—

“প্রভু, এ কি রক্তম হটল ?”

বিধাতা পুরুষ পুনরাব আবির্ভূত হইয়া বলিলেন—

“কি, রামশব্দ ?—আবার কেন ?”

রাম। এও যে বেন কেমন হইল! ত্রীপুরুষ আমরা দ্বন্দ্বদ্বন্দ্বী হইয়াছি; কিন্তু বৃদ্ধ পুরুষ আসিয়া অভিধ্বনন করে। যার বয়সী পুরুষ আসিয়া প্রণাম করিবে ?

বিধাতা। কি উচ্ছ্বাস তোমার ?

রাম। ইহার একটা উপায়, একটা প্রতি-বিধান কর; নতুবা এ নবীন বয়স পাইয়াও দ্বন্দ্ব হটতেছে না। মদ্যে বৃদ্ধ পুরুষদ্বন্দ্ব; বুঝা পৌত্র-পৌত্রবধু; আর আমরা এই বেধে বিলাসে মত্ত হইব ?—প্রভু, ইহার একটা উপায় করিয়া দাও

বিধাতা। উপায় করিব ?—ভাল, তোমার পুরুষত্ব, পৌত্র-পৌত্রিত্ব, পুরুষ-পৌত্রবধু—সকলে পরলোকে চলিয়া আসুক; তোমরা দ্বন্দ্ব-দ্বন্দ্বী ত্রী-পুরুষ নিঃসঙ্কোচে সংসারে যা কিছু কামা আছে, উপভোগ কর।

রাম। সে কি, প্রভু! এত ঘোষের পুন-পৌত্র, কস্তা-দৌহিত্র—সকলে চলিয়া যাইবে ?—আর আমরা বাঁচিয়া থাকিব ?

বিধাতা। তবে কি করিতে চাও ? কুমি পঞ্চাশবর্ষ বয়সের রূপদোহন উপভোগ করিবে, অগত এই সকল পুরুষ-পৌত্র, কস্তা-দৌহিত্র, সকলই তোমার থাকিবে, এও কি সম্ভব হয় ? কুমি এখন পণ্ডিত বৎ-

সরের ছিলে, তখন কি তোমার এ সকল ছিল ? তোমার পুত্র অবিদ্যায় তখন তিন বৎসরের শিশুভায়ে ছিল, সেট শিশু-পুত্র তোমার থাকিবে ; আর সকলে চালিয়া যাইবে।

রান : পৌর প্রতাপ, অকর, বহু ; দৌহির পরম, বিপিন ; কত প্রাণ ; পুত্র-বহু সুধানিনী, মণিনী, মাধুসী—

বিধাতা। সকলকেই আমি পরলোকে পাঠাইব।

রামশঙ্কর ভোড়হুতে বলিলেন—

“প্রভু, তাহা সত্যিই পারিব না। সকল ছাড়িয়া কি লটখা থাকিব ?”

বিধাতা। রূপদোহন লটখা, রূপবতী সুবতী ভাড়া লটখা, কাননার বস্ত্রপূর্ণ এই বিপুল সংসার লটখা।—দেখিতেছ না, ইহারা কেহই তোমাদিগকে চিনিতে পারে না। তোমার যৌবনে ইহারা কোথায় ছিল ? কেমন করিয়া তোমাদিগকে চিনিবে ? রাত্রিশেষে উঠরা চালিয়া যাইবে।

রামশঙ্করের চক্রে জল আসিল। তাঁহার নবযৌবনোদ্ভাসিত মনোহর মুখশ্রীতে কালিমার ছায়া পড়িল। ভোড়হুতে কাতরকণ্ঠে রামশঙ্কর বলিলেন—

“কি করিব রূপদোহন, মিয়া ?—একটি-দুটি করিয়া এত কালে যে এত বেহবন্দনে মনকে বাঁধিয়াছি, একদিনে সে সমস্ত ছিন্ন করিব ?—কি শোভে, কিসের বিনিময়ে ? রূপদোহন ! চাহি না প্রভু, চাহি না ;—বুদ্ধবই আমার ভাল।”

বিধাতা। নিভের যৌবন, স্রীর রূপ-

দোহন, ধনদাজে ভরা এই সংসার,—এ সকলে তোমার তুলি হইবে না ?

রান। রূপ, যৌবন, সংসার—! কিন্তু প্রভু, এই যে কিশোরকাল হইতে আমি পর্যন্ত স্বামী-স্ত্রী একত্র বাস করিয়াছি, সুখে-দুখে, সম্পদে-বিপদে, অবসার পত পরি-বর্তনের সঙ্গে কত-সহস্র মধুর স্মৃতিতে জীবন পরিপূর্ণ রহিয়াছে, সে সকল স্মৃতিও থাকিবে না ?

বিধাতা। না। পচিবৎসর বয়সের সুখ হইয়াছে, সেই বয়সের-পরের স্মৃতি তোমার কিছুই থাকিবে না ; সমস্ত তুলিয়া যাইবে। তাহার পর তোমার পুত্র-কত, পৌত্র-পৌত্রী, বহা কিছু চইয়াছে, সকল চালিয়া যাইবে। আবার তোমাদের নতুন জীবন আরম্ভ করিতে হইবে।

রান। তাগা পারিব না, প্রভু ; চাহি না রূপদোহন ; দে বাককা আমার, তাহাই কিরাইয়া যাও।

“তপাস্ত” বলিয়া বিধাতা পুরুষ সেই চন্দ্রলোককূট নীলাকাশে লীন হইয়া গেলেন।

এদিকে গৃহিণীর আবার অদ্ভুত পরি-বর্তন হইল। বিবাহের আবার শুভ, নীরল হইল ; সুরমা মস্তশ্রেণী লোপ হইল ; কম-নীর মুখমণ্ডল, সমস্ত দেহ—বলিত, লোলচর্মে হইল ; চক্ষুর সে বিশদ দৃষ্টি যোর হইল ; নিবিড় নীল কেন্দ্রামের পরিবর্তে মস্তকে পক্ষ বিয়ল কেন্দ্র দেখা গিল ! বৃদ্ধ রামশঙ্কর গৃহে আসিয়া সেই পুরুষকান্দুবীণা বজা ভাড়াইর শুভমুখ বন্ধে ধরিয়া পরম তুলি বোধ করিলেন !

তখন পুণ্ড্র ডাকিলেন ; পোত, দৌহিত্র, কত্যা, পুত্রবধূ, পৌত্রবধূ, সকলকে ডাকিলেন ; সকলের শিরশ্চূষন করিয়া দীর্ঘমুখী হইবার আশীর্বাদ করিয়া রামশতর দ্বার বলিলেন—

“বাছাশকল, আজ আমি এক বন্দ

নেমিচ্ছিলাম ;—বিধাতার বরে যেন আমার পুঁঠিন-বংশের বরদের ভগদৌবন কিরিয়া আশীর্বাদিল ;—কিন্তু তোমাদিগকে হারা-ইতে বলিয়াছিলাম । ঈশ্বর-আশীর্কামে সে বন্দ মিথ্যা হইয়াছে।”

শ্রীভবানীচরণ যোষ ।

গ্রন্থ-সমালোচনা ।

সরসার সুখ । “পরিণয়কাহিনী”-প্রণেতা প্রণীত । মৃগা,—কাল্পি কামঃজর মলাট একটোকা ; উৎকট বিনাতি বাক্যই পটেনিকা ।

উপজ্ঞানখানি পড়িয়া বোতের উপর শ্রীত হইরাছি । গ্রন্থকার সঙ্গবধ । কৃণীন-কল্পাবিগের হুঃবেত্তিনি সে ব্যপিত-সঙ্গর, তাহার পরিসর আনরা ইতিপূর্বে তাহার রুচি ‘পরিণয়-কাহিনীতে’ পারায়াছিলেম । এই পুস্তকে সেই চিত্রই অধিকতর বিবৃতা-ভাবে এবং উজ্জ্বলতর বর্ণে চিত্রিত হইরাছে । পালিষ্ঠেরা নিজের পাশাহুটানের দ্বারা ই নিজের সর্বনাশ কেমন করিয়া ডাকিয়া আনে, তাহা অনন্তবাবু চরিত্রে পরিচায়-ত্বে এবং জ্বলন্তভাবে প্রদর্শিত হইরাছে । সরমা ও সুবর্ণের বিবাহ যে ঘটল না, সরমা যে মরিয়া গেল, ইহাতে সাদারগ বাঙালী পাঠক—বিশেষত উৎকট সবাধ-সংহারকের

দল—বোধ হয় বড়ই ক্ষুব্ধ হইবেন ; কিন্তু আনরা শ্রীত হইরাছি । বেঙ্গল চরিত্র-লম্বাষণ, বেঙ্গল ঘটনা-পরম্পরা, তাহাতে সঙ্গবধ মরিয়া বাওরাই তিক হইরাছে । অতঃপর হইলে, গুণগ্রামী বাঙালী পাঠকেরা হয় ত সন্তুষ্ট হইতেন, কিন্তু কাব্য-দৌন্দর্য্যের অপচয় হইত ।

কৃণীন-গৃহের চিত্রে যেন বাসিকটা অস্বাভাবিকতা দেখিলাম । আনরা নিজের জানেও জানি, এবং বিভাসাগর-মহাশয়ের পুস্তক পড়িয়াও জানি যে, কৃণীন-গৃহে কতরাই তান, কতরাই প্রভু ; পুত্রবধূর দ্বান দেখেনে নাই, থাকিলেও এত সামান্ত যে, তাহা দর্শনোত্তর মধ্যে নহে । ভবানী-বাবুর অস্তিত্ব চিত্রে তাহাব ব্যতিক্রম দেখি-লাম । কিন্তু যে পুস্তক পড়িয়া শ্রীত হই-রাছি, তাহার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বোধ ধরিবার প্রয়োজন দেখি না ।

শ্রীচন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায় ।

বঙ্গদর্শন ।

বারোয়ারি-মঙ্গল ।

আমাদের দেশের কোন বন্ধু অথবা বড়লোকের মুক্তার পথ আমরা বিশেষ কিছুই করি না। এইজন্য আমরা পরস্পরকে অনেকদিন হইতে অল্পতস্ত বলিয়া মিনা করিতেছি—অথচ সংশোধনের কোন লক্ষণ দেখা বাটতেছে না। দীক্ষা যদি আন্তরিক হইত, লক্ষ্য যদি যথার্থ পাঠ্য, তবে এত দিনে আমাদের ব্যবহারে তাহার কিছু-না-কিছু পরিচয় পাওয়া যাউত।

কিন্তু কেন আমরা পরস্পরকে লজ্জা দিই, অথচ লজ্জা পাই না? ইহার কারণ আলোচনা করিয়া দেখা কর্তব্য। যা মারিলে যদি মরজা না খোলে, তবে দেখিতে হয়, তালা বন্ধ আছে কি না।

বীকার করিতেই হইবে, মুক্ত মাজ্জ-বাক্তির জন্ত পাথরের মূর্তি গড়া আমাদের দেশে চলিত ছিল না; এইপ্রকার মার্কল-পাথরের শিঙাননগণা আমাদের কাছে অভ্যস্ত নহে। আমরা তাৎকাল করিয়াছি, অঙ্গপাত করিয়াছি, বলিয়াছি, 'আচ্ছা' দেশের

এত-বড় লোকটাও গেল—কিন্তু কমিটির উপর দৃষ্টিরকার ভার দিই নাই।

এখন আমরা শিখিয়াছি এইরূপট কর্তব্য, অথচ তাহা আমাদের সংস্কারগত হয় নাই, এইজন্য কর্তব্য পালিত না হইলে যুখে লজ্জা দিই, কিন্তু হৃদয়ে আঘাত পাই না।

ভিন্ন মানুষের জগৎব্যবস্থার তুলনা হইলেও বাস্তবে তাৎকাল প্রকাশ নানা- কারণে নৈসর্গিক হইয়া থাকে। ইংরাজ প্রিয়বাক্তির মৃতদেহ মাটির মধ্যে ঢাকিয়া পাথরে ঢাপা দিয়া রাখে, তাহাতে নাম-ধাম-তারিখ খুঁদিয়া রাখিয়া দেয় এবং তাহার চারিদিকে ফুলের গছ করে। আমরা পরমাস্ত্রীর মৃতদেহে অশ্রুতান তত্ত্ব করিয়া চলিয়া আসি। কিন্তু প্রিয়বাক্তির প্রিয়ত্ব কি আমাদের কাছে কিছুমাত্র অরণ্য? ভাল-বাসিতে এবং শোক করিতে আমরা জানি না, ইংরাজ জানে, এ কথা কবর এবং শ্রুতানের সাক্ষ্য; এতটা ঘোষণা করিলেও, মরণ তাহাতে দায় দিতে পারে না।

টহার অসুস্থত তক এই যে, “প্যাক্স”র প্রতিবাঁকা আমরা বাংলায় ব্যবহার করি না, অতএব আমরা অসুস্থজ্ঞ। আমাদের দ্বারা ইহার উদ্ভব এই বলিয়া দেও যে, কৃতজ্ঞতা আমরা যে আছে, আমিই তাহা জানি, অতএব “প্যাক্স”বাক্য ব্যবহারই যে কৃতজ্ঞতার একপ্রকার পরিচয়, তাহা হঠাৎই পাসের না।

“প্যাক্স”—পক্ষের দ্বারা হাতে-চাতে কৃতজ্ঞতা প্রাণিয়া ফেলিবার একটা চেষ্টা আছে, সেটা আমরা অব্যবহৃত বলিতে পারি। যুরোপ কাহারো কাছে বাধা থাকিতে চাহে না—সে স্বতন্ত্র। কাহারো কাছে তাহার কোন দাবী নাই, স্বতন্ত্র বাধা পায়, তাহা সে পাবে রাখে না। তথিরা তখন নিষ্কৃতি পাইতে চায়।

পরস্পরের প্রতি আমাদের দাবী আছে, আমাদের সমাজের গঠনই সেটরূপ। আমাদের সমাজে যে ধনী, সে দান করিবে; যে গৃহী, সে আতিথা করিবে; যে জ্ঞানী, সে অধ্যাপন করিবে; যে শ্রমী, সে সেবা করিবে;—ইহাই বিধান। পরস্পরের দাবীতে আমরা পরস্পর রাখা। ইহাই আমরা মঙ্গল বলিয়া জানি। প্রাণী যদি কিরিয়া যায়, তবে ধনীর পক্ষেই তাহা অসুস্থ, অস্তিত্ব যদি কিরিয়া যায়, তবে গৃহীর পক্ষেই তাহা অকল্যাণ। শুভকর্ষ কর্তৃকর্তার পক্ষেই শুভ। এইমত নিমন্ত্রণকারীই নিমন্ত্রিতের নিকট কৃতজ্ঞতাব্যক্তির করেন। আহুতবর্গের দ্বারা যে একটি মঙ্গলজ্যোতি গৃহ পরিবাস্ত করিয়া উদ্ভাসিত হয়, তাহা নিমন্ত্রণকারীর পক্ষেই পুরস্কার। আমাদের দেশে নিমন্ত্রণের প্রধান-

তম ফল নিমন্ত্রিত পায় না, নিমন্ত্রণকারীই পায়—তাহা, মঙ্গলকর সুসঙ্গ করিবার আনন্দ, তাহা রসনাভূষিত অপেক্ষা অধিক।

এই মঙ্গল যদি আমাদের সমাজের সুখা অবলম্বন না হইত, তবে সমাজের প্রকৃতি এবং কর্তৃক অসুস্থ রকমের হইত। স্বার্থ এবং স্বাতন্ত্র্যকে যে বড় করিয়া দেখে, পরের মঙ্গল কাঙ্ক্ষা করিতে তাহার সর্বদা উত্তেজনা আবশ্যক করে। সে দ্বারা দেখ, অসুস্থ তাহার একটা রসিগ লিখিয়া রাখিতে চায়। তাহার যে ক্ষমতা আছে, সেই ক্ষমতার দ্বারা অস্তিত্ব উপরে সে যদি প্রভাব বিস্তার করিতে না পারে, তবে ক্ষমতা প্রয়োগ করিবার যথেষ্ট উৎসাহ তাহার না থাকিতে পারে। এইমত স্বাতন্ত্র্যপ্রধান সমাজের ক্ষমতালানী গোত্রের কাছ হইতে কাজ আহার করিবার মত সর্বদা বাহবা দিতে হয়; যে দান করে, তাহার যেমন সমারোহ, যে গ্রহণ করে, তাহারও তেমন অনেক আয়োজনের দরকার হয়। প্রত্যেক সমাজ নিজের বিশেষ প্রকৃতি এবং বিশেষ আবশ্যক অনুসারে নিজের নিয়মে নিজের কাজ উদ্বারে প্রবৃত্ত হয়। দাতা দান করিয়াই কৃতার্থ, এই ভাবটার উপরেই আমরা অত্যন্ত যৌক দিয়া থাকি; আর গ্রহীতা গ্রহণ করিয়া কৃতার্থ, এই ভাবটার উপরেই যুরোপ অধিক যৌক দিয়া থাকে। স্বার্থের দিক্ দিয়া দেখিলে যে গ্রহণ করে, তাহারই গরজ বেশি, মঙ্গলের দিক্ দিয়া দেখিলে যে দান করে, তাহারই গরজ বেশি। অতএব আদর্শভেদে ভিন্ন সমাজ ভিন্ন পথ দিয়া নিজের কাজে যাতা করে।

কিন্তু স্বাধের উত্তরনা মানব প্রকৃতিতে মঙ্গলের উত্তরনা অপেক্ষা সহজ এবং প্রবল, তাহাতে সন্দেহ নাই। অর্থনীতি-শাস্ত্রে বলে, ডিম্বাঙ্ক অল্পদারে প্রাপ্তি অর্থ্যৎ চাহিদা অল্পদারে যোগান্ হইয়া থাকে। বহিঃস্বার্থের তরফে যেখানে অধিক মূল্য দাঁকে, বাবসাদারের তরফ হইতে সেইখানেই অধিক মাল আনিয়া পড়ে। যে সমাজে ক্ষমতার মূল্য বেশি, সেট সমাজেই ক্রমতা-শালীও চেষ্টা বেশি হইয়া থাকে, ইত্যাদি সহজ স্বভাবের নিয়ম।

কিন্তু আমাদের সৃষ্টিছাড়া ভারতবর্ষ বরাবর সহজ স্বভাবের নিয়মের উপর জরা হইবার চেষ্টা করিয়াছে। অর্থনীতিশাস্ত্র আর সব জায়গাতেই বাটে, কেবল ভারত-বর্ষেই তাহা উলটপালট হইয়া যায়। ভোট-বড় সকল বিষয়েই ভারতবর্ষ মানব স্বভাবকে সহজ স্বভাবের উল্টে রাখিতে চেষ্টা করিয়াছে। ক্ষুধাতৃষ্ণা হইতে আরম্ভ করিয়া ধনমানমন্তোপ পদাশ্রয় কোন বিষয়েই তাহার চালচলন সহজরকম নহে। আর কিছু না পার ত অল্পত তিপিনকরের দোহাই দিয়া সে আত্মাধের স্বভাব বাচা-বিক প্রবৃতিগুলিকে পথে-পথে প্রতিহত করিয়া রাখে। এই হুঃসাধ্য কার্যে সে অনেকসময় সূত্রতাকে সহায় করিয়া অবশেষে সেই সূত্রতার দ্বারা নিজেই লক্ষ্যনাশ-সাধন করিয়াছে। তথা হইতে, তাহার চেষ্টার একান্ত লক্ষ্য কোন দিকে, তাহা বুঝা যায়।

দুর্ভাগ্যক্রমে মানুষের দৃষ্টি সঙ্গাণ। এট-কল্প তাহার প্রবল চেষ্টা এমন-সকল উপায়

অবলম্বন করে, তাহাতে শেষকালে সেই উপায়ের দ্বারাতেই সে মারা পড়ে। সমস্ত সমাজকে নিকাম মরণকর্মে দীক্ষিত করিবার প্রবল আবেগে ভারতবর্ষ অন্ধতাকেও প্রয়োজ্ঞান করিয়াছে। এ কথা ভুলিয়া গেছে যে, বরক স্বাধের কাজ অন্ধভাবে চলিতে পারে, কিন্তু মঙ্গলের কাজ তাহা পারে না। সত্যান ইচ্ছার উপরেই মঙ্গলের মঙ্গল্য প্রতিষ্ঠিত। কলেই হটক, আর বলেই হটক, উপযুক্ত কাজট করাইতা লইতে পারিলেই ব্যবসাধন হয়, কিন্তু সম্পূর্ণ বিবেকের সঙ্গে কাজ না করিলে কেবল কাজের দ্বারা মঙ্গলসাধন হইতে পারে না। তিপিনকরের বিভ্রাটিকা এবং অন্যান্যদ্বয়ের সম্প্রতিঃ পোত বারা মঙ্গল-কাজ করািব্যার চেষ্টা করিলে, কেবল কাজই করান হয়, মঙ্গল করান হয় না। কারণ, মঙ্গল স্বার্থের জ্ঞান অল্প লোকের অপেক্ষা করে না, মঙ্গলেই মঙ্গলের পূর্ণতা।

কিন্তু বৃহৎ জনসমাজকে এক আদর্শে বাধিবার সময় মানুষের দৈখ্য থাকে না। তখন কল্যাণের প্রতি তাহার আগ্রহ ক্রমে যতই বাড়িতে থাকে, ততই উপায়সমূহে তাহার আর বিচার থাকে না। রাষ্ট্র-হিতৈষ্য যে-সকল দেশের উচ্চতম আদর্শ, সেখানেও এই অন্ধতা দেখিতে পাওয়া যায়। রাষ্ট্রহিতৈষ্যের চেষ্টাযেগ যতই বাড়িতে থাকে, ততই সত্যনিখ্যা, জ্ঞান-অজ্ঞারের বৃদ্ধি তিরোহিত হইতে থাকে। চিন্তাশালকে অলীক করিয়া, প্রতিজ্ঞাকে লজ্বন করিয়া, তদ্রনীতিঃক উপেক্ষা করিয়া, রাষ্ট্রমহিমাকে বড় করিবার চেষ্টা হয়,

অঙ্ক অঙ্করকে প্রাচীন অনুষ্ঠান করিয়া
তোলাকেও প্রের বলিয়া বোধ হইতে
থাকে—অবশেষে, ধর্ম, ধিনি সকলকে ধারণ
করিয়া রাখা করেন, তাঁহাকে সবলে আঘাত
করিয়া নিজের আশ্রয়সাধনকেই ছেঁদন
করা হয়। ধর্ম কালের মধ্যেও বিনষ্ট হন,
বলেয় দ্বারাও বিক্ষিপ্ত হইয়া থাকেন।
আমরা আমাদের মঙ্গলকে কালের মধ্যে
ধরিয়া রাখিতে পিরা মারিয়া কেলিমাছি,
যুরোপ পার্শ্বভিত্তিকে বলপূর্ব্বক চাপিয়া
রাখিতে পিরা প্রত্যাহা বিনাশ করিতেছে।

অতএব, আমাদের প্রাচীনসমাজ আজ
নিজের মঙ্গল হারাইয়াছে, দুর্গতির বিস্তীর্ণ
আলয়ের মধ্যে অন্ধ-প্রত্যাহা চড়ীভূত হইয়া
আছে, ইহা প্রত্যক্ষ দেখিতেছি বটে; তবু
বলিতে হইবে, মঙ্গলকেই খাত করিবার
জন্ত ভারতবর্ষের মঙ্গলোৎসে চেষ্টা ছিল।
স্বাধীনতার প্রয়াসই যদি স্বাভাবিক সহজ
নিয়ম হয়, তবে সে নিয়মকে ভারতবর্ষ
উপেক্ষা করিয়াছিল। সেট নিয়মকে উপেক্ষা
করিয়াই যে তাহার দুর্গতি ঘটয়াছে, তাহা
নাহে; কারণ, সে নিয়মের বশবর্তী হইয়াও
শুভতর দুর্গতি বটে—কিন্তু সমাজকে সকল
দিক্ হইতে মঙ্গলদ্বালা জড়িত করিবার
এবল চেষ্টার অঙ্ক হইয়া, সে নিজের চেষ্টাকে
নিজে বাধ করিয়াছে। ঐশ্বর্যের সহিত
যদি জ্ঞানের উপর এই মঙ্গলকে প্রতিষ্ঠিত
করিবার চেষ্টা করি, তবে আমাদের সাং-
স্কৃতিক আদর্শ সভ্য জগতের সমুদ্র আদর্শের
অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হইবে। অর্থাৎ আমাদের
পিতামহদের শুভ উচ্ছ্বাসে যদি কালের
দ্বারা সকল করিবার চেষ্টা না করিয়া

জ্ঞানের দ্বারা সকল করিবার চেষ্টা করি,
তবে ধর্ম আমাদের সহায় হইবেন।

কিন্তু কল-ভিনিষটাকে একবারে
বিস্তারিত করা যায় না। এক এক বৈষম্যের
এক এক বাহন আছে—সম্প্রদায়বৈষম্যের
বাহন কল। বহুতর লোককে এক আদর্শে
গঠিত করিতে গেলে বোধ করি বারো-
আনা লোককে অঙ্ক অভ্যাসের বশবর্তী
করিতে হয়। জগতে যত ধর্মসম্প্রদায়
আছে, তাহাদের মধ্যে সম্মান নিষ্ঠাসম্মান
লোক বেশি পাওয়া যায় না। খ্রীষ্টান-
জাতির মধ্যে আন্তরিক খ্রীষ্টান কত অল্প,
তাহা উভয়দিক্বে আমরা জানিতে পারি-
রাছি। এবং হিন্দুদের মধ্যে অসংস্কার-
বিশুদ্ধ যথার্থ জ্ঞানী হিন্দু যে কত বিলম্ব,
তাহা আমরা চিরায়তের জড়তাবশত
ভাল করিয়া জানিতেও পারি না। সকল
লোকের প্রকৃতি যখন এক হয় না, তখন
এক আদর্শকে প্রতিষ্ঠিত করিতে গেলে
অনেক বাধে মালমসলা আসিয়া পড়ে।
যে সকল বাহা-বাহা লোক এই আদর্শের
অনুসারী, তাহারা সাম্প্রদায়িক কালের
ভাবটাকে প্রাণের দ্বারা ঢাকিয়া লন।
কিন্তু কলটাই যদি বিপুল হইয়া উঠিয়া
প্রাণকে লিখিয়া ফেলে, প্রাণকে খেলিবার
স্থিতি না দেয়, তবেই বিপদ। সকল
দেশেই মাঝেমাঝে মহাপুরুষেরা উঠিয়া
সাম্প্রদায়িক কালের বিরুদ্ধে সকলকে সচেতন
করিতে চেষ্টা করেন—সকলকে সতর্ক করিয়া
বলেন, কালের অঙ্ক গতিতেই সকলে প্রাণের
গতি বলিয়া যেন ভ্রম না করে। অল্পদিন
হইল, ইংরাজসমাজে কালাইন এহঙ্কপ

চেষ্টার প্রবৃত্তি হইয়াছিল। অতঃপর বাহনটাই যখন সমাজসেবার কাষের উপর চড়িয়া বসিবার চেষ্টা করে, গদ্য যখন বস্ত্রী-কেট নিজেই বস্ত্রবস্ত্রণ ক্রিয়ার উপক্রম করে, তখন সমাজে ও সমাজের কলে যাকেরায়ে হুটাপুটি বাধা যায়। মানুষ যদি সেই বুদ্ধি কলের উপর জরী হর ত ভাল, আর কল যদি মানুষকে পরাভূত করিয়া ঢাকার নীচে ঢাপিয়া রাখে, তবেই সর্বনাশ।

আমাদের সমাজের প্রাচীন কলটা নিজের গচেতন আদর্শকে অগ্রসর করিয়া ফেলিয়াছে বলিয়া, অর্থাৎ অজ্ঞানে জানকে সে আধমারা করিয়া পিতৃরার মতো আবদ্ধ করিয়াছে বলিয়া, আমরা যুরোপীয় আদর্শের সহিত নিজেকে আদর্শের তুলনা করিয়া গৌরব অশ্রুতব ক্রিয়ার অবকাশ পাই না। আমরা কথার-কথার লক্ষ্য পাই। আমাদের সমাজের জুড়িয়া গড়তুল হিন্দুসভ্যতার কীর্তিগুণ নহে—ইহার অনেকটাই সুদীর্ঘকালের অবসরকৃত ধূলা-মাঝ। অনেকসময় যুরোপীয় সভ্যতার কাছে থিকার পাঠ্য: আমরা এই ধূলি-তুলপকে লইয়াই গারের জোরে গরু করি—কালের এই সমস্ত অদ্রুত আবজ্ঞান-রাশিকেই আমরা আপনাতর বাগরা অতিমান করি—ইহার অভ্যন্তরে যেখানে আমাদের বর্ণাধ পঙ্কের ধন হিন্দুসভ্যতার প্রাচীন আদর্শ আলোক ও বাহুর অভাবে খুঁজা-যিত হইয়া পড়িয়া আছে, সেখানে দৃষ্টিপাত ক্রিয়ার পথ পাই না।

প্রাচীন ভারতবর্ষে যথ, স্বাথ, এমন কি ঐশ্বর্যকে পদাংগ পদ্য করিয়া মনকেই যে

ভাবে সমাজের প্রতিষ্ঠাপন করিবার চেষ্টা করিয়াছিল, এমন আর কোথাও হয় নাই। অজ্ঞানে ধনমানের কৃত, প্রভু-অর্থনের জন্ত, হানাহানি-কাড়াকাড়ি করিতে সমাজ প্রত্যেককেই উৎসাহ দিয়া থাকে। ভারত-বর্ষ সেট উৎসাহকে সর্বপ্রকারে নিয়ন্ত করিয়াছে; কারণ যথোচিত তাহার লক্ষ্য ছিল না, মঙ্গলই তাহার লক্ষ্য ছিল। আমরা—ইংরাজের ভার আম বণিকেরি, এই প্রতি-যোগিতা—এই গন্যমান্যের অভাবে আম-দের আম গুণিত হইয়াছে। প্রতিযোগিতার উত্তরোত্তর প্রসারে টাল-কুলা-অর্থাদি-রাশিরা-আমেরিকাকে ক্রমশঃ ক্রমশঃ উগ্র হিংস্রতার দিকে টানিয়া লইয়া বাইতেছে, ক্রমশঃ প্রচণ্ড সংঘাতের মুখের কাছে দাঁড় করাইয়াছে, সভানীতিকে প্রতিদিন ক্রমশঃ বিপর্যস্ত করিয়া দিতেছে, তাহা দেখিলে প্রতিযোগিতাপ্রধান সভ্যতাকেই চরম সভ্যতা বলিতে কোনমতেই প্রবৃত্তি হয় না। বলবৃদ্ধি ও ঐশ্বর্য স্রষ্টব্যবের একটা অঙ্গ হইতে পারে, কিন্তু শান্তি, সামঞ্জস্য এবং মঙ্গল কি তদপেক্ষা উচ্চতর অঙ্গ নহে? তাহার আদর্শ এখন কোথায়? এমনকার কোন বণিকের আপিলে, কোন বণিকেরে? কোন কালো কোর্টার, লাল কোর্টার বা খাণি কোর্টার সে সাক্ষিত হইয়াছে? সে ছিল প্রাচীন ভারতবর্ষের হুটীরাশ্রয়ণে গুজ উত্তরীয় পরিয়া। সে ছিল ব্রহ্মপরিয়াণ তপস্বীর ত্রিমিত ধ্যানমগ্নে, সে ছিল বর্ষ-পরিয়াণ আর্থা গৃহস্থের কণ্ঠস্থব্রিত বজ্র-লগায়। দল বাধা পূজা, কামিট করিয়া লোক বাচা দা ক'র: কৃতজ্ঞতা প্রকাশ, এ

আবহের জাতির প্রকৃতিগত নহে, এ কথা
আমাদিগকে স্মৃতি করিতে হইবে। এ
গৌরবের অধিকার আমাদের নাই—কিন্তু
তাই বলিয়া আমরা লজ্জা পাইতে প্রস্তুত
নহি। সংসারের সর্বত্রই বরণ-পূরণের
নিয়ম আছে। আমাদের বা-দিকে কৃতি
বাল্মীকিও ডান-দিকে বাহুতি থাকিতে
পারে। যে গ্রন্থে, তাহার ডান বাহু, কিং
পা ছোট; যে দোড়ার, তাহার পা বড়, কিং
ডান নাই।

আমাদের দেশে আমরা বলিগা থাকি, মহাশয়বের নাম প্রাচীনত্বের। তাহা কৃতজ্ঞতার স্বপ্ন ভাববার জন্য নীচ ভক্তি-ভাষনকে বিবসারপ্রে, যে ব্যক্তি ভক্তিভাবে শ্রবণ করে, গ্রহীর মঙ্গল হয়—নহণুত্ব-বের তাহাও উৎসাহিত হয় না, যে ভক্তি করে, সে ভাল হয়। ভক্তি-করা প্রত্যেকের প্রাচীনিক কর্তব্য।

কিন্তু তবেও একটু। নবୀ নামের মালা
পাঁচিরা প্রত্যহ জ্বাড়াতে হয় এবং সে
মালা ক্রমশঃ বাড়িয়া চলে। তাহা হয়
না। যথার্থ তর্জিই দেখানে উদ্দেশ্য, দেখানে
মালা বেশি বাড়িতে পারে না। তর্জি
যদি নিষ্ফল না হয়, তবে সে বীনের খণ্ড-
অনুসারে গ্রহণ-ব্যয়ন করিতে থাকে,
কেবলি শূন্য করিতে থাকে না।

পুত্রক কঠই প্রকাশিত হইতেছে—
 কিন্তু যদি অবিচারে নকর করিবার প্রবৃত্তি
 না থাকে, যদি মনে করি, কেবল যে বট-
 জলি যথাযথই আমায় প্রিয়, বাহা আমার
 পক্ষে চিরদিন পড়িবার যোগ্য, সেটগুলিই
 বলা করিব, তবে পুত্রকম্বর পদাশ্রয় করিব

আমার পাঠ্যগ্রন্থ আমার পক্ষে হুতব হওয়া উঠে না।

যেমন আমার প্রকৃতি যে মহাশয়দের
 প্রভাৎস্বপ্নবোধে বশিরা তুলি করে,
 তাহাদের নাম দাঁক উচ্চারণ করি, তবে কত-
 টুকু মনঃ পথ? প্রত্যেক পাঠক যদি
 নিজের মনে চিত্রা করিয়া দেখেন, তবে
 কয়টি নাম তাহাদের মূখে আসে? তুলি
 বাহাদুরকে স্তব্ধে মনঃ করিয়া না থাকে,
 বাহিরে তাহাদের পানরের মূর্তি সজিয়া
 রাখিলে আমার প্রভাৎ কি লাভ?

তাহাদের জাগতে লাগে আছে, এমন
 কথা উল্লিখিতও পারে। গোকে মল বাধিয়া
 প্রতিমা স্থাপন করিবে, অথবা মৃতদেহ
 বিশেষ স্থানে সমাধিত হওয়া পোষক প্রাপ্ত
 হইবে, এই আশা স্পষ্টতঃ বা অলক্ষ্যে ননকে
 উৎসাহ দিতেও পারে। কবরের দ্বারা
 খ্যাতি লাভ করার আর একটা মোহ আছে,
 তাহা তাজমহল প্রভৃতির দাঁতস্থান হইতে
 জানা যায়।

কিন্তু আমাদের সমাজ সংস্কারাঙ্গিকে
সেই বেতন দিখা বিদ্যায় করিতে চাহে
নাই। আমাদের সমাজে নাহিয়া সম্পূর্ণ
বিনা-বেতনের। ভারতবর্ষে অধ্যাপক,
সমাজের নিকট হইতে আশ্রয়ের প্রার্থ্য দান-
দক্ষিণা গ্রহণ করিয়া থাকেন, কিন্তু অধ্যা-
পনার বেতন শোধ করিখা দিয়া আমাদের
সমাজ ঠাংহাঙ্গিকে অপমানিত করে না।
পূর্বেই বলিয়াছি, মঙ্গলকণ্ঠ দিনি করিবেন,
তিনি নিজের মঙ্গলের জন্যই করিবেন,
টাকাট ভারতবর্ষেই আদায়। কোন বাহুমুণা
লভতে গেলেই মঙ্গলের মূল্য কমিয়া যায়

দলের একটা উৎসাহ আছে, তাহা সংক্রামক—তাহা মৃত্তকায় পরস্পরের মধ্যে লক্ষ্যিত হয়—তাহার অনেকটা অলীক । “গোলে হরিবোল” ব্যাপারে হরিবোল বসটা থাকে, গোলের মাথা গাছা অপেক্ষা অনেক বেশি হটরা পড়ে । দলের আন্দোলনে অনেকসময় তুচ্ছ উপলক্ষ্যে ভক্তির বড় উত্তীর্ণে পারে—তাহার সাময়িক প্রবলতা বসট চোকে না কেন, ঝড়-ঝিনবটা কখনই স্থায়ী নহে । সংসারে এমন কতবার কতশত দলের দেবতার অকস্মাতঃ সৃষ্টি হইয়াছে এবং জয়জয় বাকিতে বাঁধিতে অনলম্পর্শ বিদ্যুতির মধ্যে তাহাদের বাস-অর্জন হইয়া গেছে । পাপেরে মূর্তি গড়িয়া অবস্থান্ত্র করিয়া কি কাহাকেও মনে রাখা যায় ? ওয়েষ্টমিনস্টার আবেশিত কি এমন অনেকের নাম পাপেরে পোনা হয় নাট, ইতিহাসে বাহাদের নামের অক্ষর প্রত্যহ ক্ষুদ্র ও স্নান হইয়া আসিতেছে । এই সকল ক্ষণকালের দেবতাপ্রসঙ্গে দলীয় উৎসাহে চিরকালের আসনে বসারবার চেষ্টা করা, না দেবতার পক্ষে ভাল, না দলের পক্ষে শুভকর । দলগত প্রবল উত্তেজনা যুদ্ধে-বিগ্রহে এবং প্রমোদ-উৎসবে উপযোগী হইতে পারে, কারণ ক্ষণিকতাই তাহার প্রকৃতি—কিন্তু বেহ-প্রেম-দয়া-ভক্তির পক্ষে সংবর্ত-সমাহিত শান্তিই শোভন এবং অমূল্য, কারণ তাহা অকৃত্রিমতা এবং প্রবর্তা চাহে, উদ্ভাস্ততার তাহা আপনাকে নিঃশেষিত করিতে চাহে না ।

যুরোপেও আমরা কি দেখিতে পাই ? সেখানে দল বাঁধিয়া যে ভক্তি উদ্ভাসিত

হয়, তাহা কি বসার্থ ভক্তিভাজনের বিচার করে ? তাহা কি সাময়িক উপকারকে চিরন্তন উপকারের অপেক্ষা বড় করে না, তাহা কি গ্রামাদেবতাকে বিশ্বদেবতার চেয়ে উচ্চে বসায় না ? তাহা যুগের দল-পতিগণকে বহু সম্মান দেয়, নিতৃতবাসী মহাত্মাধীর্ষিককে কি তেমন সম্মান দিতে পারে ? স্তনিয়াছি লর্ড পানারুটনের সমাধিকালে যেদ্রপ বিরাট সম্মানের সমাস্রাহ হইয়াছিল, এমন কুচিৎ চইয়া থাকে । দূরে হইতে আমাদের মনে একথা উদয় হয় যে, এই ভক্তিতে কি প্রেরণ ? পানারুটনের নামই কি তাৎপরের প্রত্যঃস্মরণীয় মনে—লর্ডাং-গণনীয়ের মধ্যে স্থান পাটল ? দলের চেষ্টার বহিঃকৃত্তিম উপারে সেট উদ্বেগ প্রিয়ংপরিনামে দীক্ষিত হইয়া থাকে, তবে দলের চেষ্টাকে প্রশংসা করিতে পারি না— যদি না হটরা থাকে, তবে সেট চুহং আড়-হরে নিশেষ গোরব করিবার এমন কি কারণ আছে ?

বাঁহাদের নামস্মরণ আমাদের সমস্ত দিনের বিভিন্ন মঙ্গলচেষ্টার উপযুক্ত উপ-ক্রমণিকা বলিয়া গণ্য হইতে, পারে, তাহাওই আমাদের প্রাতঃস্মরণীয় । তাহার অধিক আর বোধাই করিবার কোন দরকার নাই । ব্যয়কাতর কৃপণের ধনের মত, ছোট-বড়-মাঝারি, একণিক এবং চিরন্তন, সকলপ্রকার মাধ্যমকেই শাদা পাথর দিয়া ঢোপা দিয়া রাখিবার প্রবৃত্তি যদি আমাদের না হয়, তবে তাহা লইয়া লজ্জা না কারণেও লে । ভক্তিকে যদি প্রতি-দিনের ব্যবহারযোগ্য কারণে হয়, তবে

তাহা হইতে প্রতিদিনেও অত্যাগত অনা-
বস্ত্র ভাষগুলি বিবাহ করিবার উপায়
রাখিতে হয়, তাহার বিশ্রীত প্রণালীতে
সমস্তই স্থাপকার করিবার চেষ্টা না করাই
ভাল ।

যাহা বিনষ্ট হইবার, তাহাকে বিনষ্ট
হইতে দিতে হইবে, যাহা অগ্ৰেতে বড় হই-
বার, তাহা তৎ হইয়া থাকুক ! যতদূর যদি
লুপ্ত হইয়া না বাটত, তবে পুণিবীতে জীব-
নের অবকাশ থাকিত না, ধরাতল একটি
একান্ত অবস্থান হইয়া থাকিত । আমা-
দের জীবনের তন্ত্রিতে পূর্ণবয়স ছোট এবং
বড়, খাটি এবং ছুটা, সমস্ত বড়য়ের গোর-
তান করিয়া রাখিতে পারি না । যাহা
চিরজীবী, তাহাট পাক; যাহা মৃতবেহ, অক-
বাদের-কাল কাটের খাত্ত হইবে, তাহাকে
মৃতদেহে ধরিয়া রাখিবার চেষ্টা না করিয়া
শোকের সহিত অথচ বৈরাগ্যের সহিত
স্বপ্নানে তত্ত্ব করিয়া আসাট বিচিত্র । পাছে
জুলি, এটী আশঙ্কায় নিভেতে উত্তেজিত
রাখিবার জন্য কল বানাইবার চেষ্টা তোলাই
ভাল । ঈশ্বর আমাদিগকে দয়া করিয়াই
বিস্মরণশীল হিরাছেন ।

সকল নিত্যই অধিক হইয়া উঠিতে
থাকিলে, বাছাই-করা গুণসাধা হয় । তাহা
ছাড়া সকলের নেশা বড় দুর্ভাগ্য নেশা—এক-
বার যদি হাতে কিছু জমিয়া যায়, তবে
জমাইবার ষোঁক আর সামলানো যায় না ।
আমাদের বেশে ইহাকেই বলে—নিরা-
নকইয়ের দাড়া । যুরোপ একবার বড়লোক
জমাইতে আরম্ভ করিয়া এটী নিরানকইয়ের
আবের্ডের মধ্যে পড়িয়া গেছে । যুরোপে

দেখিতে পাঠি, কেহ বা ডাকের টিকট জমায়,
কেহ বা দেশলাইয়ের বাস্তব কাগজের
আচ্ছাদন জমায়, কেহ বা পুরাতন ছুটা,
কেহ বা বিজ্ঞাপনের ছবি জমাইতে থাকে—
সেই নেশার যোগে পতট চড়িতে থাকে,
ততই এই লোক জিনিষের একটা কৃত্রিম
মূল্য অসম্ভবরূপে বাড়িয়া উঠে । তেমনি
যুরোপে মৃত বড়লোক জমাইবার যে একটা
প্রচণ্ড নেশা আছে, তাহাতে মূল্যের বিচার
আর থাকে না । কাগজের আর যাব
দিতে ইচ্ছা করে না । যেখানে একটুখান
উচ্চতা বা বিশেষত্ব আছে, সেখানেই
যুরোপ তাড়াতাড়ি সিঁদুর মাখাইয়া দিয়া
ঘণ্টা নাড়িতে থাকে । দেখিতে দেখিতে
ধল ছুটিয়া যায় ।

বস্তুত মাহাত্ম্যের সঙ্গে কমতা বা প্রতি-
ভার প্রভেদ আছে । মহাত্ম্যই আমাদের
কাছে এমন একটি আদর্শ রাখিয়া দান,
যাহাতে ঐহাদিগকে ভক্তিভরে শ্রবণ
করিলে জীবন বহুয়ের পথে আকৃষ্ট হয়,
কিন্তু কমতালোকে শ্রবণ করিয়া আমরা
যে কমতা প্রাপ্ত হইতে পারি, তাহা নহে ।
ভক্তিভাবে শ্বেক্সপিয়রের শ্রবণমাত্র আমা-
দিগকে শ্বেক্সপিয়রের গুণের অধিকারী
করে না, কিন্তু ধর্বার্থভাবে কোন সাধুকে
অথবা বীরকে শ্রবণ করিলে আমাদের
পক্ষে সাধু বা বীর কিরূপ পরিমাণেও
শ্রবণ হইয়া আসে ।

তবে গুণিসংকে আমাদের কি কর্তব্য ?
গুণিকে তাহার গুণের দ্বারা শ্রবণ করাই
আমাদের প্রাতিমিক কর্তব্য । শ্রদ্ধার সহিত
তানসেনের গানের চর্চা করিয়াই গুণমুগ্ধ

পায়কগণ তানপেনকে গদ্যবৃত্তাবে শ্রবণ করে শ্রবণ ভূমিতে বাহার গায়ে জর আসে, দে-ও তানপেনের প্রতিমা পড়িবার মত চাঁদা দিয়া ঐহিক-পাতরিক কোন কলগাত করে, এ কথা মনে করিতে পারি না। সকলকেই যে গানে ওস্তাদ হইতে হইবে, এমন কোন অবশ্যাবধাতা নাই। কিন্তু সাধুতা বা বীর্য সকলেরই পক্ষে আবশ্য। সাধুনিগেহ এবং মহৎকণ্ঠে প্রাণ-বিশুদ্ধনপর বীরবিগের দৃষ্টি সকলেরই পক্ষে মঙ্গলকর। কিন্তু দল বাধিয়া গণ-শোধ-করাকে সেই দৃষ্টিপালন কহে না, ইহা প্রত্যেকের পক্ষে প্রত্যাহের কর্তব্য।

দুরোপে এটী কন্মতা এবং বাহ্যেদ্বার প্রভেদ লুপ্তপ্রায়। উভয়েরই বহুসংখ্য একট-রকম—এমন কি, বাহ্যেদ্বার পতাকাই যেম কিছু থাকে। পাতকগণ অহু-ধাবন করিয়া দেখিলেই দৃষ্টিতে পারিবেন, বিলাতে অভিনেতা আর্ভিওর সম্মান পরম-সাধুর প্রাপ্য সম্মান অপেক্ষা অল্প নহে। রামমোহন তায় আর গনি ইংলণ্ডে বাইতেন, তবে তাহার গোরব ক্রিকেট-খেলাঘাড় রঞ্জিতনিংহের গোরবের কাছে খর্ব হইয়া থাকিত।

আমরা কবিচরিত্রনামক প্রবন্ধে উল্লেখ করিয়াছি, দুরোপে কন্মতাশালী লোকের জীবনচরিত্র লেখার একটা নিয়তিপর উদ্যম আছে। দুরোপকে চরিত্রবাহুগ্রস্ত বলা বাইতে পারে। কোনমতে একটা যে-কোন-প্রকারের বড়লোকের অতীত গুরুত্ব পাটনেট তাহার সমস্ত চিত্রিত, গল্পগব, প্রাতঃহিক ঘটনার সমস্ত অব-

স্থানা সংগ্রহ করিয়া মোটা দুই ভাগুমে জীবনচরিত্র লিখিবার মত লোকে হাঁ করিয়া বসিয়া থাকে। যে নাচে, তাহার জীবনচরিত্র, যে গান করে, তাহার জীবন-চরিত্র, যে হাসাইতে পারে, তাহার জীবন-চরিত্র—জীবন বাহার যেমনই হোক, যে লোক কিছু-একটা পারে, তাহারই জীবন-চরিত্র! কিন্তু যে মহাত্মা জীবনব্যাক্তার আবশ্য দেখাইয়াছেন, তাহারই জীবনচরিত্র সার্থক—বাহ্যের সমস্ত জীবনের দ্বারা কোন কাজ করিয়াছেন, তাহারই জীবন আলোচ্য—যিনি কবিতা লিখিয়াছেন, গান তৈরি করিয়াছেন, তিনি কবিতা এবং গানই দান করিয়া গেছেন, তিনি জীবন দান করিয়া দান নাহ, তাহার জীবনচরিত্রে তাহার কি প্রয়োজন? টেনিসনের কবিতা পড়িয়া আমরা টেনিসনকে বড় বড় করিয়া জানিয়াছি, তাহার জীবনচরিত্র পড়িয়া তাহাকে তাহা অপেক্ষা অনেক ছোট করিয়া জানিয়াছি মাত্র!

কৃত্রিম আধাশে সাহসকে এটরূপ নিবি-বেক করিয়া তোলে। বেক এবং খাঁটির এক দর হইয়া আসে। আমাদের বেশে আধুনিক কালে পাপপুণ্যের আধা কৃত্রিম হওয়াতে তাহার ফল কি চইয়াছে? ব্রাহ্ম-ণের পারের দ্বারা লওয়া এবং গঙ্গার দান করাও পুণ্য, আবার অচৌর্য ও সত্য-পরায়ণতাও পুণ্য, কিন্তু কৃত্রিমের সহিত খাঁটি পুণ্যের কোন আতিবিচার না থাকতে, যে ব্যক্তি নিত্যা গঙ্গাদান ও আত্মবপান করে, সম্যকে অসুখ ও সত্য-পরায়ণের অপেক্ষা তাহার পুণ্যের সম্মান

কম মছে, বরক বেশি। যে ব্যক্তি যবনের অন্ন খাইরাছে, আর যে ব্যক্তি জাল মক-দমার যবনের অন্নের উপায় অপহরণ করি-রাছে, উভয়েই পান্নির কোঠার পড়ার প্রথ-মোক্ত পান্নির এনি রূপা ও দণ্ড যেন যাত্নার বাড়িয়া উঠে।

দ্ব্যত্থোপে তেমনি মাহাভ্যোর মধ্যে জাতি-বিচার উঠিয়া গেছে। যে ব্যক্তি ক্রিকেট-খেলায় শ্রেষ্ঠ, যে অভিনয়ে শ্রেষ্ঠ, যে নামে শ্রেষ্ঠ, যে সাধুতার শ্রেষ্ঠ, সকলেই গ্রেট মান্ন। একট-জাতীয় সম্মানবর্ণে সকলেরই সমলতি। ইহাতে ক্রমেই যেন ক্ষমতার অর্থ্য মাহাভ্যোর অপেক্ষা বেশি ঠাড়াইরাছে। দলের হাতে বিচায়েস তার থাকিলে, এইরূপ ঘটাই অনিবার্য। যে খাচারপরায়ণ, সে ধর্মপরায়ণের সমান চটরা ঠাড়ার, এমন কি, বেশি হইয়া ওঠে; যে ক্ষমতাপালী, সে মহাত্মাদের সমান, এমন কি, তাঁহাদের চেয়ে বড় হইয়া দেখা দেয়। আমাদের সমাজে দলের লোক যেনম আচারকে পূজা করিয়া ধর্মে বর্গ করত, তেননি বুয়োপের সমাজে দলের লোকে ক্ষমতাকে পূজা করিয়া মাহাভ্যাকে ছোট করিয়া ফেলে।

বর্বার তক্তির উপর পূজার তার না দিয়া মোকারগোর উপর পূজার তার দিলে দেবপূজার ব্যাঘাত ঘটে। বারোয়ারির দেবতার বস্তু হুম, গৃহদেবতা—ইষ্টদেবতার তত্ত্ব ধুম নহে। কিন্তু বারোয়ারির দেবতা কি হুখাত একটা অবস্থার উত্তেজনার উপলক্ষ্যমাত্র নহে? ইহাতে তক্তির চর্কা না হইয়া তক্তির সম্মাননা হয় না কি?

আমাদের দেশে আধুনিক কালের বারোয়ারির শোকেস মধ্যে—বারোয়ারির শ্রুতিপালনচেষ্টার মধ্যে, পণ্ডীর শ্রুতত: দেখিয়া আমরা পদে-পদে হুহু হই। নিজেস দেবতাকে কেন্ন এাণে এমন কৃত্রিম সত্যার উপস্থিত করিয়া পূজার অক্তি-নয় করা হয়, বৃদ্ধিতে পারি না। সেই অক্তিদের আয়োজনে যদি মানুষল্লা কিছু কম হয়, তবে আমরা পরম্পরকে লক্ষ্য দিই—কিন্তু লক্ষ্যার বিষয় সোড়াতেই। যিনি তক্ত, তিনি মহত্তের মাহাভ্য: কীর্তন করিবেন, ইহা স্বাভাবিক এবং সকলের পক্ষেই শুভফলপ্রদ; কিন্তু মহাভ্যাকে লইয়া সকলে মিলিয়া একদিন বারোয়ারির কোণাচল তুলিয়া কর্তব্যসমাধার চেষ্টা লক্ষ্যকর এবং নিফল।

বিজ্ঞানাগর আমাদের সমাজে তক্তিশ্রুত করেম নাট, একথা কোনমতেই বলা যায় না। তাঁহার প্রতি বাঙালিমান্নেরই তক্তি অকৃত্রিম। কিন্তু বাহায়া বর্ষে বর্ষে বিজ্ঞানাগরের স্রগলভা আছান করেম, তাঁহার বিজ্ঞানাগরের শ্রুতিরকার তক্ত সমুচিত চেষ্টা হইতেছে না বলিয়া আক্ষেপ করিতে থাকেন। ইহাতে কি এই প্রমাণ হয় যে, বিজ্ঞানাগরের জীবন আমাদের দেশে নিফল হইয়াছে? তাহা নহে। তিনি আপন বহুবাহায়া দেশের জ্বরে সমরহান অবিকার করিয়াছেন, সম্বেহ নাই। নিফল হইয়াছে তাঁহার স্রগলভা। বিজ্ঞানাগরের জীবনের যে উদ্দেশ্য, তাহা তিনি নিজের ক্ষমতাবলেই সাধন করিয়াছেন—স্রগলভার যে উদ্দেশ্য, তাহা সাধন করিবার ক্ষমতা স্রগলভার নাট, উপায় সে জানে না।

মঙ্গলতাব্দ স্বভাবতঃ আমাদের কাছে
কত পূজা, বিজ্ঞাপনর তাহাও দৃষ্টান্ত । তাঁহার
অসামান্য কথটা অনেক ছিল, কিন্তু সেই
সকল কথায় তিনি আমাদেরকে আকর্ষণ
করেন নাই । তাঁহার দয়া, তাঁহার অকৃত্রিম
অশ্রান্ত লোকহিতৈষ্যই তাঁহাকে বাংলা-
দেশের আখ্যাতবিশিষ্টতার দ্বারা প্রতীতি
করিয়াছে । নূতন কালনের টানে পড়িয়া
আমরা যতই আড়ম্বর করিয়া যত চেষ্টাই
করি না কেন, আমাদের অন্তঃকরণ স্বভাবতই
শক্তি-উপাসনার ঘাড়ে না । ক্ষমতা আমা-
দের আরাধ্য নহে, মঙ্গলই আমাদের আরাধ্য ।
আমাদের ভক্তি শক্তিও অন্তঃকরণে লিঙ্ক-
বারে নহে, পুণ্যের সিন্ধু-বিকৃত দেবমন্দিরেই
সম্পন্ন নত করে ।

আমরা বলি—কীৰ্ত্তিবন্ত স ভীষতি ।
যিনি ক্ষমতাপন্ন নোক, তিনি নিজের
কীৰ্ত্তির মধ্যেই নিজে বাঁচিয়া থাকেন ।
তিনি যদি নিজেকে বাঁচাইতে না পারেন,
তবে তাঁহাকে বাঁচাইবার চেষ্টা আমরা
করিণে তাহা চাতুর্যের হয় । বন্ধনকে কি
আমরা স্বচ্ছন্দচিত্ত পাখরের মুক্তিবারা
অবরুদ্ধভাবে সহ্যতা করিব ? আমাদের
চেষ্টে তাঁহার ক্ষমতা কি অধিক ছিল না ?
তিনি কি নিজের কীৰ্ত্তিকে স্থায়ী করিয়া
যান নাই ? হিমালয়কে স্রবণ রাধিব্যার
অন্ত কি চাওয়া করিয়া তাহার একটা কীৰ্ত্তি-
তত্ত্ব স্থাপন করার প্রয়োজন আছে ?
হিমালয়কে দর্শন করিতে গেলেই তাহার
দেখা পাইব—অন্ততঃ তাহাকে স্রবণ করিবার
উপায় করিতে যাওয়া মৃত্যু । কৃতিবাসের
অনুগানে বাঙালি একটা কোন পকারের

মুম্বাম করে নাট বলিয়া বাঙালি কৃতি-
বাসকে অবজ্ঞা করিয়াছে, এ কথা কেমন
করিয়া বলিব ? যেমন "পদ্ম পুঁজি পদ্মা-
জলে", তেমনি বাংলাদেশে মুহুরি হোকান
হইতে রাজ্যের শ্রোণাদ পণ্ডিত কৃতিবাসের
কীৰ্ত্তিবারাই কৃতিবাস কত শতাব্দী ধরিয়া
প্রত্যাহ পুঁজিত হইয়া আসিতেছেন । এমন
প্রত্যাহ পুঁজা আর কিসে হটতে পারে ?

যুরোপে যে দল বাঁধিবার ভাব আছে,
তাঁহার উপযোগিতা নাট, এ কথা বলা
মৃত্যু । যে সকল কাজ বলসাম্য,—বহু-
লোকের আলোচনার দ্বারা সাধা, সে সকল
কাজে দল না বাঁধিলে চলে না । দল
বাঁধিয়া যুরোপ যুকে, বিগ্রছে, বাণিজ্যে, রাষ্ট্র-
ব্যাপারে বড় হইয়া উঠিয়াছে, সন্দেহ নাই ।
মৌমাছির পক্ষে যেমন ঢাক-বাঁধা, যুরোপের
পক্ষে তেমনি দল-বাঁধা প্রকৃতিসিদ্ধ । সেই-
অন্ত যুরোপ দল বাঁধিয়া দয়া করে, ব্যক্তি-
গত দয়াকে প্রেরণ দেয় না ; দল বাঁধিয়া পুঁজা
করিতে যার, ব্যক্তিগত পুঁজাতিকে মন দেয়
না, দল বাঁধিয়া তাগ স্বীকার করে, ব্যক্তি-
গত ভাগে তাহাদের আভা নাই । এট
উপারে যুরোপ একপ্রকার মন্থর লাভ
করিয়াছে, অস্ত্রপ্রকার মন্থর ব্যোহায়াছে ।
একাকী কর্তব্যকর্ম নিশ্চয় করিবার উৎসাহ
তাঁহার নাই । আমাদের সমাজে প্রত্যেককে
প্রত্যাহই প্রত্যেক প্রেরণেই ধর্মপালন করিতে
বাধ্য বলিয়া জানে । যুরোপে ধর্মপালন
করিতে হইলে কমিটিতে বা ধর্মসভার
বাটতে হয় । সেখানে সম্মতধারণগণই মন্থর-
ঠানে রত—সাধারণ লোকেরা স্বার্থসাধনে
তৎপর । ক্রিমি উত্তেজনার দোষ এট যে,

তাহার অভাবে নাহুৎ অসংখ্য হইয়া পড়ে। দল বাধিণে পরস্পর পরস্পরকে ঠেলিয়া ঝাড়া করিয়া রাখে, কিন্তু মনের বাহিরে, নাহিয়া পড়িতে হয়। আমাদের দেশে প্রত্যেকের প্রত্যাহার কর্তব্য ধর্মকর্মরূপে নির্দিষ্ট হওয়াতে আবাগবৃদ্ধবিন্যাসকে বখা-সজ্জা নিজেই ধর্মপ্রবৃত্তি ও পত্রপ্রকৃতিকে সংঘত করিয়া পরের গুণ নিজেই উৎসর্গ করিতে হয়, ইহাই আমাদের আদর্শ। ইহার অন্ত সজা করিতে বা খবরের কাগজে রিপোর্ট পাঠাইতে হয় না। এই গুণ সাধারণত সমস্ত হিন্দুসমাজে একটী সার্বিক ভাব বিরাজমান—এখানে ভোট-বড় সকলেই বঙ্গলচর্চায় রত, কারণ গৃহে তাহাদের বঙ্গলচর্চায় স্থান। এই যে আমাদের ব্যক্তি-গত বঙ্গলভাব, ইহাকে আমরা শিক্ষার দ্বারা উন্নত, অভিজ্ঞতার দ্বারা বিবৃত এবং জ্ঞানের দ্বারা উচ্ছন্ন করিতে পারি; কিন্তু ইহাকে নষ্ট হইতে দিতে পারি না, ইহাকে অবজ্ঞা করিতে পারি না,—যুরোপে ইহার প্রাদুর্ভাব নাই বলিয়া ইহাকে লক্ষ্য দিতে এবং ইহাকে লইয়া লক্ষ্য করিতে পারি না—বঙ্গদেশেই একমাত্র বেৎতা জ্ঞান করিয়া তাহার নিকট ইহাকে গুলিলুপ্ত করিতে পারি না। যেখানে দল-বাধা অভাবাত্মক, সেখানে যদি দল বাধিতে পারি ও ভাল, সেখানে অন্যতর, এমন কি, অসম্ভব, সেখানেও দল বাধিবার চেষ্টা করিয়া শেষ-কালে মনের উন্নত নেশা যেন অভ্যাস না করিয়া বসি। সর্বপ্রায়ে সর্বপ্রায়ে নিজের ব্যক্তিগতকৃত্য। তাহা প্রাথমিক, তাহা চিরস্থায়ী; তাহার পরে দ্বিতীয় কর্তব্য, তাহা

বিশেষ আবশ্যকসাধনের জন্য কণকালীন— তাহা অনেকটা-পরিমাণে যন্ত্রাভ্যাস, তাহাতে নিজের ধর্মপ্রবৃত্তির সর্বতোভাবে সম্পূর্ণ চর্চা হয় না। তাহা সর্বসাধন অপেক্ষা প্রয়োজনসাধনের পক্ষে অধিক উপযোগী।

কিন্তু কালের এবং তাবের পরিবর্তন হইতেছে। চারিদিকেই দল বাধিয়া উঠিতেছে—কিছুট নিভৃত এবং কেহট গোপন থাকিতেছে না। নিজের কীর্তির মধ্যেই নিজেকে কৃতার্থ করা, নিজের মঙ্গলচেষ্টায় মধ্যেই নিজেকে পুরস্কৃত করা, এখন আর টেকে না। শুভকস্ম এখন আর সহজ এবং আয়বিস্তৃত নহে, এখন তাহা সর্বদাই উত্তেজনার অপেক্ষা রাখে। যে সকল ভাল কাজ ধর্মিত হইয়া উঠে না, আমাদের কাছে তাহার মূল্য প্রতিদিন কমিয়া আসিতেছে, এইজন্য ক্রমশ আমাদের গৃহ পরিভ্রম, আমাদের জনপদ নিঃসঙ্গ, আমাদের অধ্য-গ্রাম ভোগদীর্ঘ, আমাদের পনীর সরোবর-সকল পত্রদূষিত, আমাদের সমস্ত চেষ্টাই কেবল সভ্যসমিতি এবং সংবাদপত্রদ্বারা মধ্যে। স্রষ্টার এবং স্রষ্টাকে ছাড়িয়া বাহিরে ফিরিতেছে, দ্বন্দ্ব এখন দীনকে ছাড়িয়া সংবাদদাতার হস্তের উপর চড়িয়া পড়িয়াইতেছে এবং লোকচোঁটেরা এখন লোককে ছাড়িয়া রাজদ্বারে খেতাব খুঁজিয়া বেড়াইতেছে। ম্যাজিষ্ট্রেটের তাকান্না বাইলে এখন আমাদের গ্রামে স্থল হয় না, রোগী গৃহে পায় না, দেশের জনকট দূর হয় না। এখন পানি এবং পত্রবাদ এবং কলতালির নেশা এখন ক্রমে চড়িয়া উঠিয়াছে, এখন সেট প্রয়োজনের বাধ্যতা রাখিতে হয়।

ঠিক যেন বাহুরটাকে কশাইখানার বিক্রয় করিয়া হুক-বেওয়া দুধের ব্যবসার চালাতে হইতেছে ।

অতঃপর আমরা যে দল বাধিয়া শোক, দল বাধিয়া কৃতজ্ঞতা প্রকাশের দল পরস্পরকে প্রাণপণে উৎসাহিত করিতেছি, এখন তাহার সময় আসিয়াছে । কিন্তু পরিবর্তনের সন্ধিকালে ঠিক নিয়মমত কিছুই হয় না । সকালে হয় ত শীতের আভাস, বিকালে হয় ত বসন্তের বাতাস দিতে থাকে । দিলি হাকা কাপড় গায়ে দিলে হঠাৎ সর্দি লাগে, বিলাতি মোটা কাপড় গায়ে দিলে ঘর্ম্মাক্রমে বর হইতে হয় । সেইজন্য অত্যধিক বেশি ও বিলাতি কোন নিয়মই পুরাপুরি পাটে না । যখন বিলাতি-প্রথার কাজ করিতে গঠি, বেশি সংস্কার অলক্ষ্যে হৃদয়ের অন্তঃপুরে থাকিয়া বাধা দিতে থাকে, আমরা লক্ষ্যের দিক্‌দ্বারা অস্থির হইয়া উঠি—দেশভাবের বধন কাজ ফাঁদিয়া বসি, তখন বিলাতের রাজ-অভিধি আসিয়া নিজের সসিবার উপযুক্ত আসন না পাইয়া নাসা কুণ্ঠিত করিয়া সমস্ত নাট করিয়া দেয় । সভ্যসমিতি নিয়মমত ডাকি, অথচ তাহা সফল হয় না,—চাঁদার খাতা খুলি, অথচ তাহাতে খেটুকু অসুপাত হয়, তাহাতে কেবল আমাদের কলহ সুটিয়া উঠে ।

আমাদের সমাজে বেক্রম বিধান ছিল, তাহাতে আমাদের প্রত্যেক গৃহস্থকে প্রতিদিন চাঁদা দিতে হইত । তাহার তথবিল আত্মীয়স্বজন, অতিথি-অভাগত, দীনদুঃখী, সকলের জুটাই ছিল । এখনো আমাদের দেশে যে দরিদ্র, সে নিজের ভোট ভাইকে স্থলে

পড়াইতেছে, ভগিনীর বিবাহ দিতেছে, পৈতৃক নিত্যনৈমিত্তিক জিরা সাধন করিতেছে, বিধবা পিসী-মাসীকে সদগুন পালন করিতেছে । ইহাই দিলিমতে চাঁদা, ইহার উপরে আবার বিলাতিমতে চাঁদা লোকের সহ্য হয় কি করিয়া ? ইংরাজ নিজের বয়স ছেনেকে পর্য্যন্ত খতম করিয়া দেয়, তুমার কাছে চাঁদার দাবী করা অসম্ভব নহে । নিজের ভোগেরই ভক্ত বাহার তহবিল, তাহাকে বাছ উপায়ে স্বাধীনতা করাইলে ভালই হয় । আমাদের কলজন লোকের নিজের ভোগের ভক্ত কতটুকু উত্তর থাকে ? ইহার উপরে বারোমাসে তেজোপত নুতন-নুতন অমুষ্ঠানের দল চাঁদা চাহিতে আসিলে বিলাতি সভ্যতার উত্তেজনাসম্বন্ধে গৃহীর পক্ষে বিনয়রক্ষা করা কঠিন হয় । আমরা ক্রমাগতই লজ্জিত হইয়া বলিতেছি, এত-বড় অমুষ্ঠানপত্র বাহির করিলাম, টাকা আসিতেছে না কেন, এত-বড় ঢাক পিটাইতেছি, টাকা আসিয়া পড়িতেছে না কেন, এত-বড় কাজ আরম্ভ করিলাম, অথাভাবে বন্ধ হইয়া বাইতেছে কেন ? বিলাত হইলে এমন হইত, তেমন হইত, হুহ করিয়া যুবলধারে টাকা বসিত হইয়া বাইত,—কবে আমরা বিলাতের মত হইব ?

বিলাতের আদর্শ আসিয়া পৌছিয়াছে, বিলাতের অবস্থা এখনো বহুদূরে । বিলাতী মতের লক্ষ্য পাইয়াছি, কিন্তু সে লক্ষ্য নিবারণের বহুশূলা বিলাতী বস্ত্র এখনো পাই নাই । সকলদিকেই টানাটানি করিয়া মরিতেছি । এখন সর্বসাধারণে চাঁদা দিয়া যে-সকল কাজের চেষ্টা করে,

পূর্বে আমাদের দেশে ধনীরা তাহা একাকী করিতেন—তাহাতেই তাহাদের ঘনের সার্থকতা ছিল। পুঙ্কেই বলিয়াছি, আমাদের দেশে সাধারণ গৃহস্থ সমাজকৃত্য শেষ করিয়া নিজের স্বাধীন ভোগের জন্য উৎকৃষ্ট কিছুই পাতিত না, হুতরাং অতিরিক্ত কোন কাঞ্চনা করিতে পারা তাহার পক্ষে সম্ভব বিধি ছিল না। যে সকল ধনীর ভাণ্ডারে উৎকৃষ্ট অর্থ থাকিত, ইষ্টাপূর্ত্তভাজের জন্য তাহাদেরই উপর সমাজের সম্পূর্ণ দাবী থাকিত। তাহারা সাধারণের অভাবপূরণ করিবার জন্য ব্যয়সাধ্য নগ্নলব্ধ—প্রস্তুত না হইলে সকলের কাছে নাক্তিত হইত—তাহাদের নামোচ্চারণ অশ্রুতকর বলিয়া গণ্য হইত। ঐশ্বর্যের আড়ম্বরটি বিলাতী ধনীর প্রধান শোভা, মঙ্গলের আরোহণ ভারতের ধনীর প্রধান শোভা। সমাজস্থ বহুবিগকে বচন্থা পাবে বচন্থা ভোজ দিয়া বিলাতের ধনী তৃপ্ত, আহুত-বাহুত-অনাহুতবিগকে তৃণার পাতার অন্নদান করিয়া আমাদের ধনীরা তৃপ্ত। ঐশ্বর্যকে মঙ্গলদানের মধ্যে প্রকাশ করাই ভারত-বর্ষের ঐশ্বর্য—ইহা নীতিশাস্ত্রের নীতিকথা নহে—আমাদের সমাজে ইহা এককাল পর্যন্ত প্রত্যাহই ব্যক্ত হইয়াছে—সেইজন্যই সাধারণ গৃহস্থের কাছে আমাদেরিগকে চাঁদা চাহিতে হয় নাট। বিনীরাই আমাদের বেশে চুক্তিকালে অন্ন, ভলাভাবকালে ভল দান করিয়াছে,—তাহারাষ্ট দেশের শিক্ষা-বিধান, শিল্পের উন্নতি, আনন্দকর উৎসব-রক্ষা ও শত্রুর উৎসাহসাধন করিয়াছে। হিতাহুতানে আজ যদি আমরা পূর্ণাভ্যাস-

ক্রমে তাহাদের দ্বারস্থ হই, তবে সমাজ কল পাইয়া অথবা নিষ্কল হইয়া কেন কিরিয়া আসি? বরক আমাদের মধ্যবিত্ত-গণ সাধারণ কাজে যেরূপ ব্যয় করিয়া থাকেন, সম্পদের তুলনা করিয়া দেখিলে ধনীরা তাহা করেন না। তাহাদের দ্বার-বান্ধন বহুদেশের অভাবকে দেউড়ি পায় হইয়া প্রাণাদে ঢুকিতে দেয় না—অসম্মে ঢুকিতে হিলেও কিরিবার সময় তাহার মুখে অধিক উন্নানের লক্ষণ দেখা যায় না! ইহার কারণ, আমাদের ধনীদের ঘরে বিলাতের বিলাসিতা প্রবেশ করিয়াছে, অথচ বিলাতের ঐশ্বর্য নাট। নিজের ভোগের জন্য তাহাদের অর্থ উৎকৃষ্ট থাকে বটে, কিন্তু সেই ভোগের আদর্শ বিলাতের। বিলাতের ভোগের তারবিধীন স্বাধীন ঐশ্বর্যশালী, নিজের ভাণ্ডারের সম্পূর্ণ কর্তা। সমাজবিধানে আমরা তাহা নহি। অথচ ভোগের আদর্শ সেই বিলাতি ভোগের অমুতপ হওয়ারে বাটে-পাণকে, বসনে-ভূষণে, গৃহসজ্জায়, পাড়িতে-জুড়িতে আমাদের ধনী-বিগকে আর বদান্ততার অবসর দেয় না—তাহাদের বদান্ততা বিলাতী জুতাওয়াল, টুপিওয়াল, ব্যাঙ্কলঠনওয়াল, চৌকিটেবিল-ওয়ালার মূহুরৎ পকেটের মধ্যে নিজেকে উজাড় করিয়া দেয়, শীর্ণ কজালগায় বেশ রিকহুত্তে রানমুখে গাড়িয়া থাকে। দেশী গৃহস্থের বিপুল কর্তব্য এবং বিলাতি ভোগের বিপুল ভোগ, এই দুই ভার একলা করজনে বহন করিতে পারে?

কিন্তু আমাদের পরাধীন দরিদ্র দেশ কি বিলাতের সঙ্গে ববাবর এমনি করিয়া

উক্ত বিষয় চলিবে ? শত্রুর চূড়ান্ত আদর্শে সন্মত হইয়া উত্তীর্ণ কঠিন চেষ্টার কি উৎকর্ষে প্রাপ্তাঙ্গ করিবে ? নিজেদের চিরকালের সহজপথে অবতীর্ণ হইয়া কি নিরঙ্কুশ লক্ষ্য হইতে রক্ষা করিবে না ?

বিজয়সঙ্গীর বগেন, বাহা ঘটতেছে তাহা অনিবার্য, এখন এই নূতন আদর্শেই নিজেদের গড়িতে হইবে । এখন প্রতি-যোগিতার যুদ্ধক্ষেত্রে নামিতে হইবে, শক্তির প্রতি শক্তি-অস্ত্র হানিতে হইবে ।

এ কথা কোনমতেই মানিতে পারি না । আমাদের ভারতবর্ষের যে মঙ্গল-আদর্শ ছিল, তাহা যুগ আদর্শ নহে, তাহা সকল সভ্যতার পক্ষেই চিরন্তন আদর্শ এবং আমাদের অন্তরে-বাহ্যরে কোথাও শুষ্ক, কোথাও সম্পূর্ণ আকারে তাহা বিরাজ করিতেছে । সেই অংশ আমাদের সমাজের মধ্যে থাকিয়া যুরোপের স্বার্থপ্রধান, শক্তি-প্রধান, স্বাতন্ত্র্যপ্রধান আদর্শের সহিত প্রতি দিন যুদ্ধ করিতেছে । সে যদি না থাকিত, তবে আমরা অনেক পূর্বেই ফিরিঙ্গি হইয়া বাইতাম । কণে কণে আমাদের সেই ভীষ-পিতামহত্ব প্রাচীন সেনাপতির পরাজয়ে এখনো আমাদের হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া বাইতেছে । বতরুণ আমাদের সেই বেদনাবোধ আছে, ততরুণ আমাদের আশা আছে । মানবপ্রকৃতিতে স্বার্থ এবং স্বাতন্ত্র্যই যে মঙ্গলের অপেক্ষা বৃহত্তর সত্য এবং হ্রস্বতর আশ্রয়স্থল, এ নাস্তিকতাকে যেন আমরা প্রত্যাখ্যে না দিই । আশ্বত্থাঙ্গ যদি স্বার্থের উপর জঘী না চেষ্টা, তবে আমরা চিরদিন বস্তুর থাকিয়া যাটতাম ।

এখনও বহুপরিমাণে বর্ষব্যাপী পশ্চিমদেশে সভ্যতার নানাবলী পরিচাি বিচরণ করিতেছে বলিয়াই তাহাকে সভ্যতার অপরিহার্য অঙ্গরূপে গ্রহণ করিতে হইবে, আমাদের ধর্মবুদ্ধির এমন ভীকতা যেন না ঘটে ! যুরোপ আজকাল সভ্যযুগকে উচ্চতরভাবে পরিচালন করিতেছে বলিয়া আমরা যেন সভ্যযুগের আশা কোনকালে পরিত্যাগ না করি ! আমরা যে পথে চলিয়াছি, সে পথের পাথের আমাদের নাই—অপমানিত হইয়া আমাদের গিরিতেই হইবে । দুর্য্যাস্ত করিয়া এ পর্গায় কোন দেশই রাষ্ট্রনীতিতে বড় হয় নাই, অধীনে থাকিয়া কোন দেশ বাণিজ্যে স্বাধীন দেশকে দূরে ঠেকাইয়া রাখিতে পারে নাই—এবং ভোগ-লিপাসিতা ও ঐশ্বর্যের আড়ম্বরে বাণিজ্য-জীবনের সহিত কোন জুমিহীবিশেষ সম্বন্ধতা রাখিতে পারে নাই । যেখানে প্রকৃতিগত এবং অবগত বৈষম্য, সেখানে প্রতিযোগিতা অপবাতুমুহুর কারণ । আমাদের দ্বারে পড়িয়া, বিপদে পড়িয়া, একদিন ফিরিতেই হইবে—তখন কি লক্ষ্যের সহিত মতশিরে ফিরিব ? ভারতবর্ষের পর্ণ-কুটীরের মধ্যে তখন কি কেবল দারিদ্র্য ও অবনতি দেখিব ? ভারতবর্ষ যে অলক্ষ্য ঐশ্বর্যবলে দরিদ্রকে শিব, শিবকে দরিদ্র করিয়া তুলিয়াছিল তাহা কি আধুনিক ভারতলক্ষ্যনের চাকটিকা-অঙ্ক চক্ষে একে-বারেই পড়িবে না ? কখনই না । ইহা নিশ্চয় সত্য যে, আমাদের নূতন শিক্ষাই ভারতের প্রাচীন মাহাত্ম্যকে আমাদের চক্ষে নূতন করিয়া সজীব করিয়া দেখাইবে, আমাদের

কণিক বিচ্ছেদের পরেও চিরন্তন আত্মীয়-
তাকে নবীনতর নিবিড়তার সহিত সমস্ত
জন্য দিয়া সম্পূর্ণভাবে গ্রহণ করিতে
পারিব। চিরমহিমা তার ওপর বাহিরের
রাগহাট হইতে তাহার সম্মাননের গৃহ-

প্রভাবস্থানের প্রতীক। করিয়া আছে; গৃহে
আমাদিগকে কিরিতের চটবে, বাহিরে
আমাদিগকে কেহ আশ্রয় দিবে না এবং
ভিকার করে চিরকাল আমাদের পেট
তরিবে না।

মার মতের আলোচনা ।

বুদ্ধির নিজাববিকারে মন এবং প্রাণের
অভিসঙ্গ-চিত্র ।

প্রথমে দেখা যাক—বুদ্ধির নিজাববিকারে
মন কি-বেশে বিচরণ করে এবং কি-ভাবে
কার্য্য করে ।

বলিঘাতি যে, বুদ্ধির মধ্য অবস্থার তিনটি
—বিচার, বিবেচনা এবং যুক্তি; আর, সেই
সঙ্গে বলিঘাতি যে, বিচার বুদ্ধির শক্তি-
প্রধান অবস্থার; বিবেচনা বুদ্ধির জ্ঞান-
প্রধান অবস্থার । এখানে বিশেষ একটি
দ্রষ্টব্য এই যে, লোকের প্রথম উদ্যমের
বিচার-কার্য্য প্রায়শই উপস্থিতমতে চটপট
সারিয়া ফালা হইয়া থাকে—সে কার্য্যে
বিবেচনাকে বড়-একটুকু কর্তব্য ফলাইতে
অবকাশ দেওয়া হয় না । পাতে বিবেচনা
মনের চির-পোষিত সংস্কারের বিরুদ্ধে
কোনো কথা বলে, এই ভয়ে গতাহুগতিক
লোকেরা সচরাচর বিবেচনাকে ঘাটাইতে
চাহে না । এক ব্যক্তিকে দেখিলাম।

আমি বলিলাম, “এ ব্যক্তি গণ্ডমূৰ্খ”;
দ্বিতীয় ব্যক্তিকে দেখিলাম। বলিলাম, “এ
ব্যক্তি মহাপণ্ডিত” তৃতীয় ব্যক্তিকে
দেখিলাম। বলিলাম, “এ ব্যক্তি মত্তমনী” ।
তর তর আমার সমস্ত কথাই আগ-পোড়া
হুল । প্রথম ব্যক্তি অনেকাংশে শাস্ত্রা-
লোচনার বাগ্‌বাজার মাঝখানে মুখে ভিপি
অঁটরা চুপ করিয়া বলিয়া আছে—ইহা
দেখিয়া আমার মনে হইল, “এ ব্যক্তি গণ্ড-
মূৰ্খ”; কিন্তু তাঁহাকে যে ব্যক্তি চেনে, সে
মনে জানে যে, ইনি একজন মহাপণ্ডিত ।
দ্বিতীয় ব্যক্তি ভূরিভূরি অদৌর পুথির বচন
উদ্ধার করিয়া সত্য মাঝখানে ব্যাপকতা
করিতেছে—ইহা দেখিয়া আমার মনে হইল,
“এ ব্যক্তি মহাপণ্ডিত”; কিন্তু সত্য এই
যে, তিনি তাঁহার নিজের মূখ-বিনিঃসৃত
শাস্ত্র-বচনের অর্থ নিজেই বোঝেন না—
অথবা সোজা অর্থ নাকা বোঝেন; মূলের
পরিষ্কার অর্থ নানালোকের স্বপনতাত্ত্ব-
বাদী টাকা এবং ভাষ্যের কর্দম দ্বারা ঘোলা-

ইয়া ক্যালেন। কৃত্রিম ব্যক্তির ভ্রমকালে।
পোষাক দেখিয়া আমার মনে হইল, “এ
ব্যক্তি মত্ত ধনী” ; কিন্তু বাস্তবিক এই যে,
সে ব্যক্তি তাহার একজন ধনাঢ্য বন্ধুর
নিকট হইতে ধার করিয়া আনা পোষাক
পরিয়া নিমন্ত্রণ-রক্ষা করিতে আসিয়াছে।
যাহাই হোক—ভুলই হোক আর সত্যই
হোক—ব্যক্তির বিচার-ক্রিয়া উপস্থিতমতে
অষ্টগ্রহই চলিতে থাকে—তাহা একমুহূর্তও
ব্যর্থ নহে না ; এমন কি—ধনী ব্যক্তিও
মহোচ্চ বিচার-পন্থির স্থান বিচারের
উপরে আপনার মনের অধরূপ নির্দিষ্ট বিচার
রূপে ছবি না চালাইয়া কাণে গাণ্ডিতে পারে
না। লোকের প্রথম উদ্যোগের বিচার
কার্য্য প্রায়শই পুরাতন সংস্কারের প্রবল
স্রোতের টানে ভাঙ্গিয়া চলে। সেক্ষণ সম্রা-
ট্রিক-রক্ষকের বিচার-কাণ্ড জ্ঞান-মূলক তত
নহে—বল শক্তি-মূলক ; আর সে-যে
শক্তি, তাহা একপ্রকার গায়েব জোর ;
তাহাতে ব্যক্তির ভেদ কপাই নাই—বিবে-
চনারও স্পষ্ট কোনো চিহ্ন দেখিতে পাওয়া
যায় না। বলিলাম—“গায়েব জোর” ;
তাহার ভাবার্থ আর-কিছু না—পুরাতন
সংস্কারের বল। পুরাতন-সংস্কার-জনিত
বালনা এবং রাগ-দেব মনের ধর্ম ; আর
সেই সকল রজ্জালের মধ্য হইতে সত্যকে
টানিয়া বাহির করা ব্যক্তির ধর্ম ; এ কথা
সকলেই স্বীকার করেন।

এটাও কিম্বদেখা চাই যে, অন্তকে পক্ষ
হইতে উদ্ধার করিতে হইলে, আপনার
গায়ে পক্ষ না লাগাইয়া সে কার্য্য করিয়া
উঠিতে পারা সম্ভবে না। ব্যক্তি গণন

মনের নানাপ্রকার সংস্কারের মধ্য হইতে
সত্য-মহন করিয়া বাহির করে, তখন সেই
সকল সংস্কারের কেণ্ডের ভিত্তি ব্যক্তির নির্যা-
ধিকারে উপসংক্রমণ করে। বাঙালী স্ব-
কেন্দ্রা যেমন ঈশ্বরে গিয়া লণ্ডন-নগরে
বাঙালি-টোলা পত্তন করে, মন তেমনি
ব্যক্তির নির্যাধিকারের ব্যক্তের মাঝে—ল-
বল লইয়া অবস্থিত করিতে পারিবার মতো
একটা উপনিবেশ পত্তন করে। পুনশ্চ,
ইংলণ্ড-বাণী বাঙালী স্বকেন্দ্রের ছাটিকোটের
মধ্য দিয়া যেমন বাঙালির কুটুম্ব বাহির হয়,
তেমনি ব্যক্তির জোড়গতিত মনের নব-প্রাক-
টিত বিচার-চক্রের মধ্য দিয়া পুরাতন সংস্কা-
রের অধরূপ কুটুম্ব বাহির হয়। এ যাহা
আমি বলিতেছি, ইহার ছুড়ি-মুঠাও অনেক
আছে ; তাহার মধ্যে নিম্নের উপমাটি
সর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর লম্ব-লম্বত বলিয়া বোধ
হইতেছে। মনোরাগের এক-ধাপ-নীচের
প্রাণরাজ্যে উহার একট উপমা দেখিতে
পাওয়া যায় এইরূপ :— ৩

রসায়ন-বিজ্ঞান দুই শ্রেণীতে বিভক্ত—(১)

ভৌতিক রসায়ন (inorganic chemistry),
এবং (২) শারীরিক রসায়ন (Organic
chemistry)। বিরাটপুস্তকে ভীষ যেমন
পাচকবেশে দাখ্য দিয়াছিলেন, শরীরপুস্তকে
ভৌতিক রসায়ন তেমনি শারীরিক-রসায়ন-
বেশে আবিস্কৃত হয়। অন্ন-জলাদির
ভৌতিক শক্তি প্রাণের সংলগ্নে প্রাণ-মূর্ত্তি
গঠন করিয়া উঠে। কিন্তু তথাপি সময়ে-
সময়ে নূতন-পিনক প্রাণের আবরণের মধ্য
দিয়া ভৌতিক শক্তি আপনার পূর্ব্বতন
অপ্রাণিক সার পরিত্যক্ত প্রদান করিতে ছাড়

না; অজীর্ণ অন্ন প্রাণের শাসন না; মানিষ্য সময়ে-সময়ে শাকসলীতে বিশ্রোহ উপস্থিত করিতে ছাড়ে না। তাহা হো'ক— তাহাতে বিশেষ কিছুই আইগে যায় না;— অন্ন-জলের সন্নিবেশ প্রাণের সহিত মিশিয়া প্রাণ হইয়া যায়, ইহা সকলেরই জানা কথা। তেমনি, মন যখন বুদ্ধির নিত্যাদিকারে অবশ্য করে, তখন, শরীর যেমন অন্নের ভৌতিক শক্তিকে আপনায় প্রাণের সহিত মিশাইয়া আপনায় করিয়া লয়, বুদ্ধি তেমনি আপনায় ক্রোড়ান্তিত মনকে আপনায় জ্ঞানের সহিত মিশাইয়া আপনায় করিয়া লয়। পুনশ্চ, শাকসলী যে পরিমাণে অভ্যাগত অন্নকে আপনায় করিয়া লয়, সেই পরিমাণে যেমন শরীরে বলাধান হয়; তেমনি, বুদ্ধি যে পরিমাণে মনকে আপনায় করিয়া লয়, সেই পরিমাণে তাহার বিচার-কার্য্যে বল পৌছে। প্রাণ যেমন ভুক্ত অন্নকে চর্চয়ামনে গলাইয়া তাহাকে আত্মসাৎ করে, বুদ্ধি তেমনি মনের সমস্ত পূর্ব্বতন প্রাতিভাসিক সংস্কারকে জ্ঞানানন্দে গলাইয়া আত্মসাৎ করে; আর তাহাই-উপস্থিত বুদ্ধির স্বাভাবিক-বিচার-শক্তি-রূপে পরিণত হয়। স্বাভাবিকী বিচার-শক্তি কিয়ৎকাল ধরিয়া হামাগুড়ি দিতে-বিতে ক্রমে যখন ধাঁড়াইতে দেখে, তখন বিবেচনা তাহাকে পথ প্রশ্রয় করে এবং বিবেচনার দেখাইয়া-দেওয়া পথে বৃত্তি তাহাকে হাত ধরিয়া পারচাঙ্গি করাইয়া লইয়া বেড়ায়।

বুদ্ধির প্রগলভতার বিচার-কার্য্যের সহিত যখন, অবসর বৃত্তিরা অগ্নে-অগ্নে পা

বাড়াইয়া, বিবেচনা আশিষা ছোট, তখন বিচার-কার্য্যের মধ্য চইতে "আমি বিচার করিতেছি", এইরূপ একটা কর্তৃত্ব-বোধ ছুটিয়া বাহির হয়;—সাংখ্য-দর্শন এইপ্রকার কর্তৃত্ব-বোধের নাম দিয়াছেন অহঙ্কার। কর্তৃত্ব-বোধ জন্মে কখন? না, যখন বিবেচনা আশিষা বিচারা-বিষয়ের অল্প-প্রত্যক্ষ পৃথক্ পৃথক্ করিয়া নিরূপণ করে—"ইহার নাম কর্ত্তা, ইহার নাম কণ্ঠ, ইহার নাম ক্রিয়া", এইরূপে পৃথক্ পৃথক্ করিয়া নিরূপণ করে। কিন্তু তাহার পূর্ব্বে—বিবেচনার আগ-মনের পূর্ব্বে—বিচার-কার্য্য, কতক বা স্বাভাবিক সংস্কারের টানে, কতক বা শিক্ষিত সংস্কারের টানে, উৎস-উৎসারণের ভায় সহজ-ভাবে চলিয়া যাটতে থাকে। মহাযোর এক-প্রকার স্বাভাবিক বিচার-শক্তি আছে—ইংরাজিতে বাহাকে বলে common sense। বিবেচনা এবং বৃত্তি আশিষা সেই লৌকিক জ্ঞানের (common sense এর) ভূমির উপরে মাজিত জ্ঞানের বা বিজ্ঞানের মূল গঠন করে। বুদ্ধির নিত্যাদিকারের সীমার অভাবেরে যদি পুরাতন মানসিক সংস্কারের, এক কথায়—মনের, নূতন বৃত্তি দেখিতে চাও, তবে লৌকিক জ্ঞানের স্বাভাবিক বিচারশক্তিই সেই বুদ্ধি-বাঁসা মন বা মন-বাঁসা বুদ্ধি, বাহার ভূমি দর্শনাকাজী।

এতক্ষণ ধরিয়া যাহা বলিলাম, তাহাতে এটা বেশ বৃত্তিতে পারা যাটতেছে যে, বুদ্ধি মনকে আপনায় ক্রোড়ে তুলিয়া আপনায় করিয়া লয়। সেনা যেমন সেনাপতিত্ব বল বা শক্তি বা তেজ, এবং সেনাপতি যেমন সেনার চক্ষু বা মস্তক বা নিদানক; মন

ভেদনি বুদ্ধির শক্তি, এবং বুদ্ধি ভেদনি মনের চক্ষু । বুদ্ধি শুধু যে কেবল মনকেই নিষ্কাশিত করে টানিয়া তুলিয়া আপনায় করিয়া লয়, তাহা নহে, প্রাণকেও আপনায় করিয়া লয় । আমরা অনেক সময়ে বলি যে, “অনুককে আমি প্রাণকূলা ভালবাসি” ; কিন্তু একটি-বারও কাহারো মূখ দিয়া একপ কথা বাহির হয় না যে, “আমি অনুককে মনকূলা ভালবাসি” । ইহাতে প্রমাণ হইতেছে এই যে, মন যদিও প্রধান এবং প্রাণ যদিও কনিষ্ঠ, তথাপি সেও যেহেতু নিয়মাবধি, এইকল্প বুদ্ধির ভালবাসা মেজাজে কিছুটাই ছোটো’র প্রতি দোড়ায়, মনকে ভিত্তিষ্টা প্রাণের প্রতি দোড়ায় । প্রাণ অপেক্ষা মন বরষে বুদ্ধি নিকটবর্তী, ইহা খুবই সত্য ; কিন্তু তথাপি বুদ্ধি আপনায় জ্ঞানের চরম পরিপক্বতার আদর্শ প্রাপ্তিতে যেমন সূর্তিমায়ু দেখিতে পায়, মনেতে ভেদন নহে । মনেতে তাহা দেখিতে না পাউবারই কথা ; যাজ্ঞবল্কের দীর্ঘবিত্ত যাজ্ঞ মুক্তিকা-প্রাপ্তি বোধেই আপনায় সাদৃশ্য দেখিতে পায়, মাৎসর্য বৃত্ত এবং পত্ন্যবিত্ত তাহা দেখিতে পায় না ; উন্নত বিজ্ঞান যেমন মূল-জানীর বেদোপনিষৎ-মাত্র চরম জ্ঞানের কথা খুঁজিয়া পায়—মধ্যম-জানীর পূজাপাদিতে ভেদন নহে । ফল কথা এই যে, মনের প্রতি দৃষ্টিপাত করিবার বিক্ষেপের ভাব প্রথমেই মূখকের চক্ষে পড়ে ; এ ভাবটি অপেক্ষাকৃত অস্পষ্ট-কর । পক্ষান্তরে প্রাণের সঙ্গে একপ্রকার নিরাকুল প্রসাদবির ভাব সঙ্গদাট লাগিয়া আছে—সে ভাবটি জ্ঞানের আদর্শ-জানীর ।

জীবের অন্তর-মহলে স্থবর্ণ এবং বাহ্য-মহলে তরলতাদি উদ্ভিদ-পদার্থ প্রাণের মূখ্য বসতিস্থান । কতি বাগল বধন নিস্ত্রা য়, তখন তাহার সর্পগর্ভের, বিশেষতঃ মূখমণ্ডলে, নিকষেণ প্রসাদবির ভাব কেমন মনোহর-সুস্থি ধারণ করে—মাতা যেমন তাহার মণ্ডল, এমন আর কেহই নহে । তরলতাদিতে কি-বে-এক বন্যীর সর্পগর্ভ অটল বৈষ্ণবের ভাব বিস্তারমান বহিয়াছে—কবি যেমন তাহার মণ্ডল, এমন আর কেহই নহে । কালিদাস বলিয়াছেন :—

“বসন্তবিরিহি বৃক্ষঃ পাদপশ্চিবৃক্ষঃ
পশ্চতি পরিতাপঃ হারতঃ সন্ত্রিভানাম্”
বসন্তকে পাদপ সঙ্গে যৌক্তের প্রকাশ ।
হারতামনে আশ্রিতের ত্যগ করে মোগ ।

প্রাণের নিরাকুল প্রসাদি এবং অটল বৈষ্ণব, শির-বুদ্ধির প্রধানতম আদর্শ । বিশ্রয়-রজনীর ঝিলীর-ব-নির্দাষিত নিশ্চকতার সহিত নিবিড় অর্থ-বট-বৃক্ষের নিশ্চকতার সুর মেলে কেমন চমৎকার ! বিশ্রয়-রজনীতে যেমন নিশ্চিত জগতের প্রাণ নিশ্চকভাবে লক্ষিত হয়, আবেগ্যক ওষধি-বনস্পতির মধ্যে সেইরূপ নিশ্চক-ভাবে প্রাণকিয়া চলিতে থাকে ।

বলিতেছি বটে যে, নিশ্চিত বাগলের এবং তরলতাদি উদ্ভিদ-পদার্থের বেদান্তিত প্রাণ-জিয়ার নিরাকুল প্রসাদ-ভাব, শির-বুদ্ধির আদর্শবল ; কিন্তু তাহা কিরূপ আদর্শবল ? শিরের অসারিক ময়লতা যেমন প্রবীণ জানীদিগের আদর্শ-মূল, ইহা সেইরূপ ঐক্য-শিক আদর্শবল ; তা বই, সাংসারিক আদর্শবল নহে । স্পষ্টই দেখা

ঘাইতেছে যে, জল-বায়ু-মৃত্তিকার নির্গতসই বৃক্ষলতাদিহি পান; মাতার গুত্র-দুহই কচি বালকের প্রাণ; দৌহার প্রাণের স্বেল দৌহার হাতের কাছেই অষ্টগ্রহর বাধা রহি-
রাছে; এক্সণ অবস্থার, জীব প্রাণত্ব এবং নিরাকুল হইবে না তো কি? —তাহা তো হইস্তরই কথা। কিন্তু একটা আরণ্যক সিংহের কুবার উত্তরক হইলে তাহাকে কত করিয়া নিপুণবিক্রম অবস্থান করিতে হয়, কত কষ্ট করিয়া শিকার সংগ্রহ করিতে হয়? এক্সণ প্রাচীনক কালের কতকালের মধ্যেও সিংহ যে আপনায় রক্তকীট বৈর্য্য এবং শাস্ত্রীয়া রক্ষা করিতে সমর্থ হয়—ইহাই আশ্চর্য্য! প্রাণের বৈর্য্য-শাস্ত্রীয়া মনের নিজাধিকারে প্রবেশ করিলে তাহা বৈর্য্য মূর্ত্তি ধারণ করে, তাড়াতী আমরা সিংহেতে দেখিতে পাই; কিন্তু সেট প্রাণের বৈর্য্য বধন আরো একথাপ উপরে উত্থান করে; মনের বাপ চাড়াইয়া বুদ্ধির নিজাধিকারে উত্থান করে; প্রাণের বৈর্য্য বধন বুদ্ধির বৈর্য্যরূপে পরিণত হয়; তখন তাহা অপর কোনো জীবেরই খুঁজিয়া পাওয়া যায় না— কেবল নিষেধ বিশেষ প্রভাবশালী মনুষ্যো-
তেই আদর্শীকৃত দেখিতে পাওয়া যায়। জীবন বুদ্ধির প্রারম্ভ-কালে বধন বিপক্ষ-
বলের সৈন্ত-সামন্ত চতুর্দিক দিয়া কাঁকিয়া পড়িয়া প্রথম নেপোলিওনের সেনা-মণ্ডলীকে গ্রাস করিবার জন্য উদ্যত; প্রথম নেপো-
লিওন তখন রণ-ক্ষেত্রে বসিয়া পারিস্-
নগরের বালিকা-বিদ্যালয়ের শিক্ষা-প্রণালী
কিছুপ হইলে ভাল হয়, তাহার একটা
সমীচীন ব্যবস্থা-প্রণালী লিপিবদ্ধ করিতে-

ছেন; লিপিবদ্ধ করিয়াই তাহা দূতযোগে
পারিস্-নগরের কর্তৃপক্ষদিগের নিকটে
প্রেরণ করিলেন। পারিস্-নগরে বিজ্ঞোহের
তদ্ব্যজ্ঞাধিত অনল কখন কোন্ দিক দিয়া
হুঁড়িয়া বাহির হয়, তাহার ঠিকানা নাই;
পেশ্বলের কোন্ দিক দিয়া এলয়াগির বন্ধ-
বৃত্তি আরম্ভ হয়, তাহার ঠিকানা নাই—
এক্সণ অবস্থার চারিদিকের মহাজীবন বাপা-
রের মধ্যে বুদ্ধিরেবের কত বুদ্ধিকে স্থির
রাখাই কঠিন; কিন্তু সেট পৃথিবীর গুলটু-
পালটেই সময় নেপোলিওন তখন যে বুদ্ধিকে
স্থির রাখিতেছেন, তাহা নহে—বুদ্ধিকে
সম্যক বিবেকপূর্ণতার সহিত কাযে খাটাইতে-
ছেন; একটা বুদ্ধিকে দিয়া দশটা বুদ্ধির
কাৰ্য্য করাইয়া লইতেছেন। জ্ঞানবান্
মহুবার এইরূপ যে অস্ত্র-করণের বৈর্য্য,
তাহার গোড়া'র কথা—স্বাভাবিক সংস্কারও
নহে—অস্ত্র সংস্কারও নহে—তাহার
গোড়া'র কথা বুদ্ধির বৈর্য্য।

প্রাণ উদ্ভিদ-পদার্থের তার তির-ভাবে
স্পন্দিত হয়, মন পতঙ্গকীর্ত্তনের স্তায়
দৌড়াদৌড়ি করিয়া ছুটিয়া বেড়ায়। দুয়েরই
পানে দুইপ্রকার গুণ এবং দুইপ্রকার
দোষ লক্ষ্যে রাখিয়াছে। দুয়ের দুই গুণও
পতঙ্গের বিপরীত; দুয়ের দুই দোষও
পতঙ্গের বিপরীত। বৃক্ষলতাদিহি গুণ
বৈর্য্য, দোষ অমরোদয়বাপিতা এবং লক্ষ্যতা;
পতঙ্গকীর্ত্তনের গুণ সচেতনতা এবং বহু-
দোষবাপিতা; দোষ বিবেক এবং চক্ৰলতা।
মনের বিবেক এবং প্রাণের বৈর্য্য, দুইকেই
বুদ্ধি নিজাধিকারে টানিয়া তুলিয়া আপনায়
করিয়া লয়; টানতে ফল চয় এট যে, দুয়ের

দুই প্রকার ঘোষ পরম্পরের সংঘর্ষে মার্জিত হইয়া যায় ; এবং দুয়ের দুই প্রকার গুণ পরম্পরের সংসর্গগুণে ঘৈষণা লাভ করে । একজন স্থির-বুদ্ধি রাজাকে দেখে—দেখিবে যে, তিনি বহুধা-বিচিত্র রাজকাৰ্য্যের মধ্যে আপনার মনের ঠেঁহুঁ-গাভীর্ণ্য রক্ষা করিতেছেন । বহুধা-বিচিত্র বিষয়ে বিক্লিষ্ট-হওয়া মনের ধর্ম ; পক্ষান্তরে বহুধা-বিচিত্র কার্য্যে লিপ্ত হইয়াও বিভ্রান্ত-না-হওয়া বুদ্ধির ধর্ম । স্থির-ভাবে বাঁধা-নিয়মে নিখাল-প্রস্থান প্রকৃতি কাগা ঢালানো প্রাণের ধর্ম ; পক্ষান্তরে, রাজদর্শে অচলের ভ্রাব স্থির থাকিয়াও চোকোণো-ভাবে সমস্ত রাজ্যের ভূভাগের বার্তা-গ্রহণ-করা ও তৎপরতা এবং বিচক্ষণতার সহিত ভাবব সাহায্য এবং অণুভবের প্রতীকার করা বুদ্ধির ধর্ম । এইরূপ, বুদ্ধিতে বখন একদিকে প্রাণের ঠেঁহুঁ এবং আর-এক দিকে মনের বহুধাপ্রতিভা, দুইই একাধারে মিলিত হয়, তখন দুয়ের দুই দোণ খণ্ডিত হইয়া যায়, এবং চত্বের দুই গুণ বিগুণিত হয় । বুদ্ধি বখন মন এবং প্রাণকে নিভাধিকারে টানিয়া তুলিয়া উঠকে আপনায় করিয়া লয়—তখনই বুদ্ধি পরিপকতা লাভ করে ;

তখন বুদ্ধির অভ্যন্তরে একদিকে বহুধা একত্ব-গর্ভ হইয়া জ্ঞানের জোতি বিকীর্ণ করে এবং আর-এক দিকে একত্ব বহুধা-গর্ভ হইয়া শক্তির বলবত্তা সাধন করে । এইরূপ পরিপক বুদ্ধির অভ্যন্তরে প্রাণও থাকে, মনও থাকে ; থাকে দুইট, তবে কি না, প্রাণের সংসর্গ-গুণে মনের চঞ্চলতা সংশোধিত হইয়া যায়, এবং মনের সংসর্গ-গুণে প্রাণের অড়তা সংশোধিত হইয়া যায় । প্রাণ বা মনের নিজ-গুণে একরূপ হয় না ;—হয় তা কেবল বুদ্ধির সংস্পর্শ-গুণে । একবারি ভলে মিহিরির ডালা এবং বাতামা ফেলিয়া দিলে, সেই মিহিরির ডালা এবং বাতামা কপেরই সংস্পর্শ-গুণে একীভূত হইয়া যায়, তাহাদের আপন-গুণে নহে ; তেমনি বুদ্ধিরই নিজগুণে বুদ্ধির নিভাধিকারে মন এবং প্রাণ একীভূত হইয়া যায় । এবারে পাঠকবর্গের ধারণার উপ-যোগ্য করিয়া অনেকগুলি নিগূঢ় কথা উপমাঙ্কলে বলিলাম ;—কিন্তু ঐ কথা-গুলির ভিতরে প্রকৃত তত্ত্ববাহা প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে, তাহা এখনো বিবৃত করিয়া বলা হইল না । সমগ্রান্তরে অবকাশমতো এই বিষয়টির প্রকৃত তত্ত্ব অবতীর্ণ হওয়া বাটবে—এবারে তাহার একটা সুব্রূপতা করা হইল মাত্র ।

ঐদ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর ।

চোখের বালি ।

(৩৫)

পরদিন প্রভাত হইতে ঘনঘটা করিয়া আছে। কিছুকাল অসহ্য উত্তাপের পর মিতম্রামল বেধে দত্ত আপ্যন জুড়াইয়া গেল। আজ মতেন্দ্র সমগ্র চট্টবার পূর্ণের্ত কলোজে গেছে। তাহার ভাড়া-কাপড়গুলো বেকের উপর পাড়িয়া। আশা মতেন্দ্রের মরলা কাপড় গাখিয়া গাখিয়া, তাহার চিহ্নাব রাখিয়া ঘোবাকে বুটাইয়া দিতেছে।

মতেন্দ্র স্বভাবত ভোগানন অসাবধান লোক; এইরূপ আশার প্রতি তাহার অগ্ররোধ ছিল, ঘোবার বাড়ী দিবার পুঙ্কে তাহার ভাড়া-কাপড়ের পকেট তদন্ত করিয়া লওয়া হয় যেন। মতেন্দ্রের একটা ভাড়া-জামার পকেটে হাত দিতেই একখানা চিঠি আশার হাতে তৈকিল।

সেই চিঠি বহি বিবধর ম্যপের দূর্ভি ধরিয়া তখনই আশার অঙ্গুলি ধংশন করিত, তবে ভাল হইত;—কারণ উগ্র বিদ্য শরীরে প্রবেশ করিলে পাঁচমিনিটের মধ্যেই তাহার চরমকল ফলিয়া শেষ হইতে পারে, কিন্তু বিব বনে প্রবেশ করিলে সূতায়ত্রণা আনে—সূত্যা আনে না!

খোলা চিঠি বাহির করিবামাত্র দেখিল, বিনোদিনীর চত্ৰাক্ষর। চকিতের মধ্যে আশার মুখ পাণ্ডুবর্ণ চটয়া গেল। চিঠি হাতে লইয়া সে পাশের ঘরে গিয়া পড়িল :—

“কাল রাতে তুমি যে কাণ্ডটা করিলে, তাহাতেও কি তোমার তৃপ্তি চটল না? আজ আবার কেন ফেমীর গাত বিয়া আমাকে গোপনে চিঠি পাঠাইলে? তি তি সে কি মনে করিল? আমাকে তুমি কি ভগতে কাহারো কাছে মুখ দেখাইতে দিবে না?”

আমার কাছে কি চাপ তুমি? ভাল-বালা? তোমায় এ ডিক্কাভুতি কেন? ক্রমকাল হইতে তুমি কেবল ভালবাসাই পাইয়া আসিতেছ, তবু তোমার লোভের অন্ত নাই!

ভগতে আমার ভালবাসিবার এবং ভালবালা পাটবার কোন স্থান নাই। তাই আমি খেলা খেলিয়া ভালবাসার খেল মিটাইয়া থাকি। যখন তোমার অবসর ছিল, তখন সেই মিথ্যা খেলার তুমিও যোগ দিয়াছিলে। কিন্তু খেলার ছুট কি সুরায় না? ঘরের মধ্যে তোমার ঠাক পড়িয়াছে, এখন আবার খেলার ঘরে উঁকিভুঁকি কেন? এখন খুলা ঝড়িয়া ঘরে বাও। আমার ত ঘর নাই, আমি যেন যেন একলা বসিয়া খেলা করিব, তোমাকে ডাকিব না।

তুমি লিখিয়াছ, আমাকে ভালবাস। খেলার খেলার সে কথা শোনা ঘাইতে পারে—কিন্তু যদি সত্য বলিতে হয়, ও কথা বিশ্বাস করি না। একসময় মনে করিতে

তুমি আমাকে ভালবাসতে, দেও মিথ্যা, এখন মনে করিতেছ তুমি আমাকে ভালবাসিতেছ, এও মিথ্যা । তুমি কেবল নিজেকে ভালবাস ।

ভালবাসার তুফান আমার দ্বার হইতে বন্ধ পৰ্য্যন্ত শুকাইয়া উঠিয়াছে—সে তুফান পূরণ করিবার সম্ভব তোমার হাতে নাই, সে আমি বেশ ভাল করিয়াই দেখিয়াছি । আমি তোমাকে ব্যর্থবার বলিতেছি, তুমি আমাকে ত্যাগ কর, আমার পক্ষেতে কিরিয়ে না ; নির্লজ্জ চইয়া আমাকে লজ্জা দিয়ো না । আমার পেলার সবও মিটিয়াছে ; এখন ডাক দিলে কিছুতেই আমার লাড়া পাইবে না । চিঠিতে তুমি আমাকে নির্মূল বলিয়াছ—সে কথা সত্য হইতে পারে ; কিন্তু আমার কিছু দয়াও আছে—তাই আজ তোমাকে আমি দয়া করিয়া ত্যাগ করিলাম । এ চিঠির যদি উত্তর দাও, তবে বুঝিব, না পালাইলে তোমার হাত হইতে আমার আর নিষ্কৃতি নাই !”

চিঠিখানি পড়িলাম। এ যুগের মতো চারিদিক হইতে আমার সমস্ত সবলবন বেন বলিয়া পড়িয়া গেল, শত্রীর সমস্ত দারুণশক্তি যেন একবারেই হাল ছাড়িয়া দিল,—নিশ্চয় লটবার ক্ষমতা বেন বাতাসটুকু পর্য্যন্ত রহিল না, স্বর্গ তাহার চোখের উপর হইতে সমস্ত আলো বেন তুলিয়া লইল । আশা প্রথমে দেখাল, তাহার পর আলমারি, তাহার পর চৌকি ধরিতে ধরিতে মাটিতে পড়িয়া গেল । অগত্যা পরে সচেতন হইয়া চিঠিখানি আর একবার পড়িতে চেষ্টা করিল, কিন্তু উদ্ভ্রাণেতে কিছুতেই তাহার

অর্থগ্রহ করিতে পারিল না—কালো-কালো ক্ষণকাল তাহার চোখের উপর নাচিতে লাগিল । এ কি ! এ কি হইল ! এ কেমন করিয়া হইল ! এ কি সম্পূর্ণ সর্বনাশ ! সে কি করিবে, কাহাকে ডাকিবে, কোথায় যাইবে, কিছুই ভাবিয়া পাইল না । ভাতার উপরে উঠিয়া মাছ যেমন খাবি খায়, তাহার বৃকের ভিতরটা ভেদনি করিতে লাগিল । মজ্জমান ব্যক্তি যেমন কোন-একটা আলার পাইবার জন্য জনের উপরে হস্ত প্রসারিত করিয়া আকাশ খুঁজিয়া বেড়ায়, তেমনি আশা মনের মধ্যে একটা-দা-হয়-কিছু প্রাপণে আঁকড়িয়া ধরিবার জন্য একান্ত চেষ্টা করিল, অবশেষে বুক চাপিয়া উর্দ্ধ্বাসে বলিয়া উঠিল, “মালি মা !”

এই মেহের সম্ভাবন উজ্জ্বলিত হইবামাত্র তাহার চোখ দিয়া ঝন্ঝন্ঝ করিয়া জল পড়িতে লাগিল । মাটিতে বলিয়া কান্নার উপর কান্না, কান্নার উপর কান্না বহন করিয়া করিয়া শেষ হইল, তখন সে ভাবিতে লাগিল, “এ চিঠি লইয়া আমি কি করিক ?” স্বামী যদি জানিতে পারেন, এ চিঠি আশার হাতে পড়িয়াছে, তবে সেই উপলক্ষ্যে তাহার নিদারুণ লজ্জা স্মরণ করিয়া আশা অত্যন্ত কুণ্ঠিত হইতে লাগিল । দ্বিধা করিল, চিঠিখানি সেই কাড়া-জামার পকেটে পুনরায় রাখিয়া জামাটি আলোয় খুলিয়া রাখিবে, ধোবার বাড়ী যিবে না ।

এই ভাবিয়া চিঠিহাতে সে শয়নপুহে আসিল । ধোবাটা টতিমতো ময়লা কাপড়ের গাঠির উপর তৈম দিয়া ঘুমাইয়া পড়িয়াছে । মেহেরে কাড়া-জামাটা তুলিয়া লইয়া আশা

ভাষার পকেটে চিঠি পূরিবার উল্লেখ করিতেছে, এমন সময় সাড়া পাইল, “ভাট বাসি!”

ভাড়াভাড়ি চিঠি ও আমাটা খাটের উপর ফেলিয়া সে তাহা চাপিয়া বসিল। বিনোদিনী ঘরে প্রবেশ করিয়া কহিল, “ঘোঁড়া বড় কাপড় বদল করিতেছে। যে কাপড়গুলার মার্কী দেওয়া তখন নাই, সেগুলি আমি শইয়া দাই।”

আশা বিনোদিনীর মুখের দিকে চাহিতে পারিল না। পাছে মুখের ভাবে সকল কথা লুপ্ত প্রকাশ পায়, এতজন্য সে জানালার দিকে মুখ ফিরাইয়া আসানোর দিকে চাহিয়া রহিল, টোটে টোটে চাপরা রহিল, পাছে চোখ দিয়া চল বাহির হইয়া পড়ে।

বিনোদিনী ধমুকিয়া দাঁড়াইয়া একবার আশাকে নিরীক্ষণ করিয়া দেখিল। মনে মনে কহিল, “ওঃ ধুকিয়াছি! কল হাতের বিবরণ তবে জানিতে পারিয়াছি! আমার উপরেই সমস্ত রাস! যেন অপরাধ আমারই!”

বিনোদিনী আশার সঙ্গে কথাবার্তা কহিবার কোন চেষ্টা করিল না। বান-করের কাপড় বাড়িয়া গিয়াছে। দ্রুতপথে ঘর হইতে চলিয়া গেল।

বিনোদিনীর সঙ্গে আশা যে এতদিন সরলচিত্তে বহুস্থ করিয়া আসিতেছে, সেট লক্ষ্য নিদারুণ চোখের মধ্যে ও তাহার চরণে পুঞ্জীকৃত হইয়া উঠিল! ভাটার মনের মধ্যে সখীর যে আদর্শ ছিল, সেট আদর্শের সঙ্গে মিষ্ট চিঠিখানা আর একবার মিলাইয়া দেখিবার উচ্ছ্বাস চলিল।

চিঠিখানা পুলিশের ঘোঁষিতেছে, এমন সময় ভাড়াভাড়ি মহেন্দ্র ঘরের মধ্যে আসিয়া প্রবেশ করিল। হঠাৎ কি মনে করিয়া কালেক্টরের একটা লেকচারের মাঝখানে ভঙ্গ দিয়া সে ছুটিয়া বাড়ী চলিয়া আসিয়াছে।

আশা চিঠিখানা সকলের মধ্যে লুকাইয়া ফেলিল। মহেন্দ্রও ঘরে আশাকে দেখিয়া একটু ধমুকিয়া দাঁড়াইল। তাহার পর ব্যঙ্গদৃষ্টিতে ঘরের এদিক ওদিক চাহিয়া দেখিতে লাগিল। আশা ব্যস্তাছিল, মহেন্দ্র কি খুঁজিতেছে; কিন্তু কেমন করিয়া সে হাতের চিঠিখানা অলক্ষিতে ধরাগানে রাখিয়া পালাইয়া যাইবে, ভাবিয়া পাইল না।

মহেন্দ্র তখন একটা একটা করিয়া ময়লা কাপড় তুলিয়া তুলিয়া দেখিতে লাগিল। মহেন্দ্রের সেট নিচ্ছল প্রয়াস দেখিয়া আশা আর থাকিতে পারিল না, চিঠিখানা ও আমাটা নেকের উপর ফেলিয়া দিয়া ডান হাতে খাটের খানটা ধরিয়া সেই হাতে মুখ লুকটিল। মহেন্দ্র বিভ্রান্তবেগে চিঠিখানা তুলিয়া লইল। নিমেষের জন্য বন্ধ হইয়া আশার দিকে চাহিল। তাহার পরে আশা মিড়ি দিয়া মহেন্দ্রের দ্রুতগমনের পথ অনিতে গাইল। তখন গোবা ডাকিতেছে, “মাঠাকরুন, কাপড় দিতে আর কত দেরি করিবে? বেলা অনেক হইল, আমার বাড়ী ত এখানে নয়।”

(৩৬)

রাহুলদ্বীপ আর সকাল হইতে আর বিনোদিনীকে ডাকেন নাট। বিনোদিনী নিরমমত ভাঁড়ারে গেল, দেখিল, তাকালদ্বীপ মুখ তুলিয়া চাহিলেন না।

সে তাহা লক্ষ্য করিয়াও বলিল—“পিসিমা, তোমার অশ্রুধর করিয়াছে বুঝি ? করিবারই কথা । কাল রাতে ঠাকুরপো যে কঁঠি করিলেন ! একেবারে পাগলের মত আনিয়া উপস্থিত । আমার ত তার পরে ঘুম হইল না ।”

রাজলক্ষ্মী মুখ তার করিয়া রহিলেন, হাঁ, না, কোন উত্তরই করিলেন না ।

বিনোদিনী বলিল—“হর ত চোখের বাণির সঙ্গে সামান্য কিছু খিটমিট হইয়া থাকিবে, আর দেখে কে ! তখনি নালিশ কিংবা নিষ্পত্তির অন্তে আমাকে ধরিয়া লইয়া যাওয়া চাই, রাত পোহাইতে তার সম্ভ না ! বাই বল পিসিমা, তুমি রাগ করিয়ে না, তোমার ছেলের সঙ্গে গুণ থাকিতে পারে, কিন্তু ঐশ্বর্যের লেশমাত্র নাই ! ঐ অন্তই আমার সঙ্গে কেবলি ঝগড়া হয় ।”

রাজলক্ষ্মী কহিলেন—“বউ, তুমি মিথ্যা বক্তিতেছ—আমার আল আর কোন কথা ভাল লাগিতেছে না ।”

বিনোদিনী কহিল—“আমারও কিছু ভাল লাগিতেছে না পিসিমা । তোমার মনে আশ্রয় লাগিবে, এই তরেই মিথ্যা কথা দিয়া তোমার ছেলের দোষ ঢাকিবার চেষ্টা করিয়াছি । কিন্তু এমন হইয়াছে যে আর ঢাকা পড়ে না ।”

রাজলক্ষ্মী । আমার ছেলের দোষ-গুণ আমি জানি—কিন্তু তুমি যে কেমন মারামিণী, তাহা আমি জানিভায় না ।

বিনোদিনী কি-একটা বলিবার অন্ত উদ্ভূত হইয়া নিজেকে সংবরণ করিল—কহিল, “সে কথা ঠিক পিসিমা,—কেহ কাহা-

কেও জানে না । নিজের মনও কি সবাই জানে ? তুমি কি কখনো তোমার বউয়ের উপর বেধ করিয়া এই মারামিণীকে দিয়া তোমার ছেলের মন ভুলাইতে চাও নাই ? একবার ঠাঠর করিয়া দেখ দেখি ?”

রাজলক্ষ্মী অমির মত উদীপ্ত হইয়া উঠিলেন—কহিলেন—“হতভাগিনি, ছেলের সম্বন্ধে মার নামে তুই এমন অপবাদ বিধে পারিস্ ? তোমার জিব খসিয়া পড়িবে না ?”

বিনোদিনী অবিলম্বে কহিল—“পিসিমা, আমরা মারামিণীর আত্ম, আমার মধ্যে কি মারা ছিল, তাহা আমি ঠিক জানি নাই, তুমি জানিয়াছ,—তোমার মধ্যেও কি মারা ছিল, তাহা তুমি ঠিক জান নাই, আমি জানিয়াছি । কিন্তু মারা ছিল নাহিলে এমন ঘটনা ঘটত না । যদি আমিও কতকটা জানিয়া এবং কতকটা না জানিয়া পাতিয়াছি, যদি তুমিও কতকটা জানিয়া এবং কতকটা না জানিয়া পাতিয়াছ । আমরা-দের জাতের ধর্ম এইরূপ,—আমরা মারামিণী ।”

রোবে রাজলক্ষ্মীর বেন কর্তৃত্ব হইয়া গেল—তিনি বর ছাড়িয়া ক্রতপদে চলিয়া গেলেন ।

বিনোদিনী একলা-বরে কলকানের অন্ত হির হইয়া ঝাঁড়াইয়া রহিল—তাহার হুই চক্ষে আশ্রয় জলিয়া উঠিল ।

সকাল-বেলাকার গৃহকাণ্ড হইয়া গেল রাজলক্ষ্মী মহেন্দ্রকে ডাকিয়া পাঠাইলেন । মহেন্দ্র বৃষ্ণিল, কাল রাজিকার ব্যাপার লইয়া আলোচনা হইবে । তখন বিনোদিনীর কাছ হইতে পত্রোত্তর পাইয়া তাহার মন

বিকল হইয়া উঠিয়াছিল। সেই আঘাতের প্রতিফল-রূপে তাহার সমস্ত তরঙ্গিত হৃদয় বিনোদিনীর দিকে সবগে ধাবমান হইতেছিল। ইহার উপরে আবার মার সঙ্গে উত্তর-প্রত্যুত্তর করা তাহার পক্ষে অসম্ভব। মহেন্দ্র আনিত, না তাহাকে বিনোদিনী-সম্বন্ধে তৎসনা করিলেই বিজ্ঞোহিতাবে সে বর্থাৎ মনের কথা বলিয়া ফেলিবে এবং বলিয়া ফেলিলেই নিদাক্ষণ গৃহস্থ আরম্ভ হইবে। অতএব এ সময়ে বাঁচি হইতে চুরে গিয়া সকল কথা পরিষ্কার করিয়া তাহারা দেখা দরকার। মহেন্দ্র চাকরকে বলিল—“মাকে বলিস্, আজ কালেক্সে আমার বিশেষ কাজ আছে, এখনি বাইতে হইবে, কিরিয়া আসিয়া দেখা চাইবে।” বলিয়া পলাতক বালকের মত তখন তাড়াতাড়ি কাপড় পরিয়া না খাইয়া ছুটয়া বাহির হইয়া গেল। বিনোদিনীর যে দাক্ষণ চিঠিখানা আজ সকাল হইতে বারবার করিয়া সে পড়িয়াছে এবং পকেটে লইয়া কিরিয়াছে, আজ নিতান্ত তাড়াতাড়িতে সেই চিঠিগ্রন্থ আঁচা ছাড়িয়াই সে চলিয়া গেল।

একপল্লী ঘন বৃষ্টি হইয়া তাহার পরে বাদ্যার মত করিয়া রহিল। বিনোদিনীর মন আজ অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া আছে। মনের কোন অনুৰূপ হইলে বিনোদিনী কানের মাজা বাঁড়ার। তাই সে আজ বস্ত্রাভ্যাসের কাপড় গুড করিয়া চিত্র দিতে আরম্ভ করিয়াছে। আশার নিকট হইতে কাপড় চাহিতে গিয়া আশার সুখের ভাব দেখিয়া তাহার মন আরো বিগুড়াইয়া গেছে। সংসারে যদি অপরাধই হইতে হয়,

তবে অপরাধের যত লাহন তাহাই কেন ভোগ করিবে, অপরাধের যত সুখ তাহা হইতে কেন বঞ্চিত হইবে?

সুপ্তসুপ্তে চাশিয়া বৃষ্টি আসিল। বিনোদিনী তাহার ঘরে মেকের উপরে বসিয়া। সমুখে কাপড় জুপাকার। ছেমোলাসী এক-এক-খানি কাপড় অগ্রসর করিয়া দিতেছে, আর বিনোদিনী মার্কী দিবার কালী দিয়া তাহাতে অক্ষর মুদ্রিত করিতেছে।

মহেন্দ্র কোন সাজা না দিয়া দরজা খুলিয়া একেবারে ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিল। ছেমোলাসী কাজ ফেলিয়া মাথার কাপড় দিয়া ঘর ছাড়িয়া ছুটিল।

বিনোদিনী কোলের কাপড় মাটিতে ফেলিয়া শিরা বিগ্নস্ববেগে উঠিয়া পাড়াইয়া কহিল—“বাও, আমার এ ঘর হইতে চলিয়া যাও!”

মহেন্দ্র কহিল, “কেন, কি করিয়াছি?”

বিনোদিনী। কি করিয়াছি! ভীক কাপড়ব! কি করিবার সাধ্য আছে তোমার? না জান ভালবাসিতে, না জান কর্তব্য করিতে? মাঝে হইতে আমাকে কেন লোকের কাছে নষ্ট করিতেছ?

মহেন্দ্র। তোমাকে আমি ভালবাসি নাই, এমন কথা বলিলে?

বিনোদিনী। আমি সেই কথাই বলিতেছি। তুমি যদি আমাকে তেমন কোর করিয়া পুরুষের মত ভালবাসিতে, যদি আমাকে কাজিয়া লইতে, লুট করিয়া লইতে, তবে আমারও মন তুমি পাঠিতে। তা নয়, লুচাহুরি, তাড়াতাড়ি, একবার এতদ্ এক-

বার ওদিক্—তোমার এই চোবের মত
অবুত্তি যোগ্য আমার গুণা ভিন্না গেছে ।
আর ভাল লাগে না ! তুমি যাও ।

মহেন্দ্র একেবারে মুহূমান হইয়া কহিল,
“তুমি আমাকে গুণা কর বিনোদ ?”

বিনোদিনী । হাঁ গুণা করি । আর
একটু হইলেই তোমাকে আমি ভালবাসিতে
পারিতাম—কিন্তু কিছুতেই ভালবাসিতে
দিলে না, দিনরাত্রি কেবল নিম্ন করিয়া
সমস্ত নষ্ট করিলে ।

মহেন্দ্র । এখনো প্রায়শ্চিত্ত করিবার
সময় আছে বিনোদ ! আমি যদি আর বিধা
না করি, সমস্ত পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া
যাই, তুমি আমার সঙ্গে যাইতে প্রস্তুত আছ ?

বিনোদিনী । এখন আর হয় না ! কিছু-
তেই না ! কিছুকাল পূর্বে আর একদিন
যদি বলিতে, তবে হাঁ বলিতে দেরি করি-
তাম না ।

মহেন্দ্র । সে দিন যার নাই, সে দিন যার
নাই ! আমি যখন তোমার পায়ের কাছে
আমার সমস্ত সংসার ফেলিয়া দিতেছি, তখন
সে দিন আমার কিবিয়াছে !

বলিয়া মহেন্দ্র বিনোদিনীর হই হাত
সালে ধরিয়া তাহাকে কাছে টানিয়া লইল ।
বিনোদিনী কহিল, “ছাড় আমার গাঙ্গি-
তেছে ।”

মহেন্দ্র । তা লাগুক ! বল, তুমি
আমার সঙ্গে যাইবে !

বিনোদিনী । না, যাইব না ! কোন-
মতেই না !

মহেন্দ্র । কেন যাইবে না ? তুমিই
আমাকে সকলকালের যুখে টানিয়া আনিয়াছ,

আজ তুমি আমাকে পরিত্যাগ করিতে
পারিবে না ! তোমাকে যাইতেই হইবে !

বলিয়া মহেন্দ্র হৃদয়বলে বিনোদিনীকে
বৃকের উপরে টানিয়া লইল, জোর করিয়া
তাহাকে ধরিয়া রাখিয়া কহিল—“তোমার
গুণাও আমাকে কিরাইতে পারিবে না, আমি
তোমাকে লইয়া যাইবই, এবং যেমন করি-
য়াই হোক, তুমি আমাকে ভালবাসিবেই ।”

বিনোদিনী সবলে আপনাকে বিজ্রিম
করিয়া লইল ।

মহেন্দ্র কহিল—“চারিদিকে আগুন জালা-
ইয়া তুলিয়াছ, এখন আর নিবাইতেও পারিবে
না, পালাইতেও পারিবে না ।”

বলিতে বলিতে মহেন্দ্রের গলা চড়িয়া
উঠিল, উচ্চঃস্বরে সে কহিল—“এমন খেলা
যেন খেলিলে বিনোদ ? এখন আর ইহাকে
খেলা বলিয়া মুক্তি পাইবে না ! এখন
তোমার-আমার একই মৃত্যু !”

রাজলক্ষ্মী ঘরে ঢুকিয়া কহিলেন—“মহীন,
কি কর্চিস্ ?”

মহেন্দ্রের উন্নত দৃষ্টি এক নিমেষমাত্র
মাতার মুখের দিকে ঘুরিয়া আসিল ; তাহার
পরে পুনরায় বিনোদিনীর দিকে চাহিয়া
মহেন্দ্র কহিল, “আমি সব ছাড়িয়া চলিয়া
যাইতেছি, বল তুমি আমার সঙ্গে যাইবে ?”

বিনোদিনী ক্রুদ্ধ রাজলক্ষ্মীর মুখের দিকে
একবার চাহিল । তাহার পর অঙ্গের হইয়া
অবিচলিতভাবে মহেন্দ্রের হাত ধরিয়া কহিল,
“যাইব ।”

মহেন্দ্র কহিল—“তবে আজকের মত
অপেক্ষা কর, আমি চলিতাম, কাল হইতে
তুমি ছাড়ি আমায় আর বেহায়া হবে না ।”

বলিয়া যথেষ্ট চলিয়া গেল ।

রাজলক্ষ্মী কহিলেন, “বো, এ সব ব্যাপার কি ?”

বিনোদিনী । সমস্তই ত চোখের সামনে দেখিলে শিসিয়া! হিজায়া আর কি করিতেছে ?

রাজলক্ষ্মী । এমন কতদিন চলিতেছে ?

বিনোদিনী । আশ হইতে পুরাপুরি আরম্ভ হইল ।

রাজলক্ষ্মী । তবে এখন হইতে কি এখন করিয়াই চলিবে ?

বিনোদিনী । সে আমার চোরে ভূমি ভাল জান দিসিয়া—তোমার ছেলে, ভূমি নিজের হাতে গড়িয়াছে। তবে একথা ঠিক বটে, চিরকাল চলিবার মত ভাবধানা নয় ।

রাজলক্ষ্মী । ভূমি কি করিবে বউ ?

বিনোদ । ঠাকুরপো ফিরিয়া আসুন, কাল দেখিতে পাইবে ।

রাজলক্ষ্মী জোড়হাত করিয়া কাতর-কণ্ঠে কহিলেন—“আমার সর্জনশ করিয়ে না বউ । এতদিন আমি তোমাকে ঘরের লোকের মত রাখিয়াছিলাম, আমার একটিনাত্র ছেলেকে পর করিয়া দিয়া দাইয়ে না ।”

একর-সবর ধোবা আসিয়া বিনোদিনীকে কহিল, “মঠাকরুন, আর ত বলিতে পারি না । আজ যদি তোমাদের ফুলগু না থাকে ত আমি কলি আসিয়া কাণ্ড লইয়া যাইব ।”

কেহী আসিয়া কহিল, “মঠাকরুন, শব্দ বলিতেছে, দানা হুইয়াই গেছে ।”

বিনোদিনী সাত দিনের দানা ওজন

করিয়া আস্তাবলে পাঠাইয়া দিত, এং নিজে জানলার কাড়াইয়া খোকার খাওয়া দেখিত ।

গোপাল-চাকর আসিয়া কহিল, “বো-ঠাকরুন, কড়ু-বেছারা আজ দাদামশায়ের (সাগুচরণের) সঙ্গে বগড়া করিয়াছে । সে বলিতেছে, তাহার কেহোসিনের হিসাব বুঝিয়া লইলেই সে সরকার-বাবুর কাছ হইতে বেতন চুকাইয়া লইয়া কাজ ছাড়িয়া দিয়া চলিয়া যাইবে ।”

সংসারের সমস্ত কর্মই পূর্ণবৎ চলিতেছে ।

(৩৭)

বিহারী এতদিন মেডিকাল কলেজে পড়িতেছিল । ঠিক পচীকা দিবস পূর্ণেই সে ছাড়িয়া দিল । বেহু মন্দ্র প্রকাশ করিলে বলিত, ‘পরের স্বাস্থ্য পরে দেখিব, আপাতত নিজের স্বাস্থ্য রক্ষা করা চাই ।’

আলপ কথা, বিহারীর উদ্যম অপেক্ষ; একটা-কিছু না করিয়া তাহার থাকিবার ভাৱ নাই, অথচ যশের তুচ্ছতা, টাকার লোভ এবং জীবিকার লজ্জা উপার্জনের প্রয়োজন, তাহার কিছুমাত্র ছিল না । কলেজে ডিগ্রি লইয়া প্রথমে সে শিবপুরে এতিনিয়ারিং শিখিতে গিয়াছিল । বতইটু জানিতে তাহার কৌতূহল ছিল এবং হাতের কাজে বতইটু দক্ষতালাভ সে আবশ্যক বোধ করিত, সেইটুই সংগ্রহ করিয়াই সে মেডিকাল কলেজে প্রবেশ করে । যথেষ্ট এক-বৎসর পূর্ণে ডিগ্রি লইয়া মেডিকাল কলেজে ভর্তি হয় । কলেজের বাঙালী ছাত্রদের নিকট তাহাদের ছই ওনের বন্ধুর বিখ্যাত ছিল । তাহার ঠাটা করিয়া তাহাদের প্রভাবকে ভ্রামদেয়ী জোড়ানন্দ বলিয়া ডাকিত ।

গতবৎসর মহেন্দ্র পরীক্ষার ফেল্ করিতে
হই বহু এক স্নেহিতে আসিয়া নিলিল। এমন-
সময় হঠাৎ জোড় কেন যে ডাঙিল, তাহা
হাজেরা বুঝিতে পারিল না। তেজ বেখানে
মহেন্দ্রের সঙ্গে দেখা হইবেই, অথচ তেমন
করিয়া দেখা হইবে না, সেখানে বিহারী
কিছুতেই হাইতে পারিল না। সকলেই
জানিত, বিহারী ভালরকম পাস্ করিয়া
নিশ্চয় সম্মান ও পুরস্কার পাইবে, কিন্তু তাহার
আর পরীক্ষা দেওয়া হইল না।

তাহাদের বাড়ীর পার্শ্বে এক কুটীরে
রাজেন্দ্র চক্রবর্তী বলিয়া এক গরীব ব্রাহ্মণ
বাস করিত;—হাণখানার আরো-টাকা
বেতনে কম্পোজিটার করিয়া সে জীবিকা
চালাইত। বিহারী তাহাকে বলিল, “তোমার
ছেলেকে আমার কাছে রাখ, আমি উহাকে
নিজে লেখাপড়া শিখাইব।”

ব্রাহ্মণ নাচিয়া গেল। পুসি হইয়া তাহার
আটবছরের ছেলে বসন্তকে বিহারীর হাতে
সমর্পণ করিল।

বিহারী তাহাকে নিজের প্রণালীবশত শিক্ষা
দিতে লাগিল। বলিল, “দশবৎসর বয়সের
পূর্বে আমি উহাকে বই পড়াইব না, সব মুখে-
মুখে শিখাইব।” তাহাকে লইয়া খেলা করিয়া,
তাহাকে লইয়া গড়ের মাঠে, মিউজিয়ামে,
আলিপুর-পতশালার, শিবপুরের বাগানে
ঘুরিয়া বিহারী দিন কাটাইতে লাগিল।
তাহাকে মুখে-মুখে ইংরাজি শেখান, ইতিহাস
গল্প করিয়া শোনান, নানাপ্রকারে বালকের
চিত্তবৃত্তি পরীক্ষা ও তাহার পরিণতিসাধন,
বিহারীর সমস্ত দিনের কাজ এই ছিল—সে
নিজেকে মর্শ্বমাত্র অবসর দিত না।

সেদিন সন্ধ্যাবেলায় বাহির হইবার জো
ছিল না। হুপুরবেলায় মুষ্টি খামিয়া আবার
বিকাল হইতে বর্ণণ আরম্ভ হইয়াছে।
বিহারী তাহার দোকানের বড় ঘরে আলো
জালিয়া বসিয়া বসন্তকে লইয়া নিজের নুতন
প্রণালীর বেলা করিতেছিল।

“বসন্ত, এ ঘরে কটা কড়ি আছে, চট্ট
করিয়া বল। না, গুণিতে পাইবে না।”

বসন্ত। কুড়িটা।

বিহারী। হার হইল; আঠারটা।

ফল্ করিয়া খড়খড়ি খুলিয়া ভিজাসা
করিল, “এ খড়খড়িতে কটা পান্না
আছে?”—বলিয়া খড়খড়ি বন্ধ করিয়া দিল।

বসন্ত বলিল—“ছয়টা।”

“জিৎ! এই বেকটা লম্বার কত হইবে?
এই বইটার কত ওজন?” এমন করিয়া
বিহারী বসন্তর ইশ্রিয়বোধের উৎকর্ষসাধন
করিতেছিল, এমন-সময় বেহাগা আসিয়া
কহিল,—“বাবুজি, একাঠো ঠেরং—”

কথা শেষ করিতে না করিতে বিনোদিনী
ঘরের মধ্যে আসিয়া প্রবেশ করিল।

বিহারী আশ্চর্য হইয়া কহিল—“এ কি
কাত্ত ঘোঠা’গ?”

বিনোদিনী কহিল, “তোমার এখানে
তোমার আয়ীর গ্রীলোক কেহ নাই?”

বিহারী। আয়ীরও নাই, পুরও নাই।
গিলি আছেন বেশেয় বাড়ীতে।

বিনোদিনী। তবে তোমার দেশের
বাড়ীতে আমাকে লইয়া চল।

বিহারী। কি বলিয়া লইয়া যাইব?

বিনোদিনী। দাদী বলিয়া। আমি
সেখানে ঘরের কাজ করিব।

বিহারী। পিসি কিছু আশঙ্ক্য হইবেন, তিনি আমাকে দাদীর অভাব ত জানান নাই। আগে শুনি এ সবর কেন মনে উদয় হইল ? বসন্ত, বাত, শুভেতে যাও !

বসন্ত চলিয়া গেল। বিনোদিনী কহিল, “বাহিরের ঘটনা শুনিয়া তুমি ভিতরের কথা কিছুই বুঝিতে পারিবে না।”

বিহারী। নাই বুঝলাম, না হর তুলসী বুঝি, কতি কি !

বিনোদিনী। আচ্ছা, না হর তুলসী বুঝিবে। মহেন্দ্র আমাকে ভালবাসে।

বিহারী। সে পবন ত নূতন নয়, এবং এমন পবন নয়, যাঁহা বিতীতের তুলিতে ইচ্ছা করে।

বিনোদিনী। বাতবার শুনাইবার ইচ্ছা আমারও নাই। সেইকমাই তোমার কাছে আসিয়াছি, আমাকে আশ্রয় নাও !

বিহারী। ইচ্ছা তোমার নাই ? এ বিপত্তি কে বটাইল ? মহেন্দ্র যে পথে চলিয়াছিল, সে পথ হইতে তাহাকে কে ব্রষ্ট করিয়াছে ?

বিনোদিনী। আমি কহিয়াছি। তোমার কাছে লুকাইব না, এ সমস্তই আমারই কাজ। কেন করিয়াছি, তাও খুলিয়া বলি। পুণি-বীতে আসিয়াছিলাম, কোন রূপ, কোন ভাব যে ছিল না, তাহা নয়—কিন্তু তবুও সবাই যে আমাকে কোন্ঠে ঠেলিয়া ফেলিয়া রাখিবে, কেহই যে একবার আমার দিকে ফিরিয়া চাহিবে না, এ আমি সত্য কহিতে পারি নাই। অন্যে যে আসন্ন পায়, আমি তাঁর চোরে বেশ আদর পাইবার যোগ্য,—এ আমার মিথ্যা স্বপ্ন নহে, যিনি আমাকে

গড়িয়াছেন, তিনি তাহা জানেন—তবে তিনি আমাকে কেন বঞ্চিত করিলেন ?

বিহারী। অযোগ্যকে বঞ্চিত করিলে অধিক মর্দুরতা করা হয়—যে যোগ্য, সে যোগ্যতার গৌরবে সব সহ্য করিতে পারে।

বিনোদিনী। বিহারি-ঠাকুরপো, ও সব তোমার বইপড়া কথা—ও রাখিয়া যাও। আমি মন্দ হই বা হই, একবার আমার মত হইয়া আমার অন্তরের কথা বুঝিবার চেষ্টা কর। আমার বুকের মালা লইয়া আমি মহেন্দ্রের ঘর জ্বালাইয়াছি। একবার মনে হইয়াছিল, আমি মহেন্দ্রকে ভালবাসি, কিন্তু তাহা তুল।

বিহারী। ভালবাসিলে কি কেহ এমন অগ্নিকাণ্ড করিতে পারে ?

বিনোদিনী। ঠাকুরপো, এও তোমার শাস্ত্রের কথা ! এখনো ও সব কথা শুনিবার মত মতি আমার হয় নাই। ঠাকুরপো, তোমার পুণি রাখিও একবার অন্তর্দ্বারীর মত আমার জনহের মধ্যে দূরীভূত কর ! আমার ভালমন্দ সব আমি আমি তোমার কাছে বলিতে চাই।

বিহারী। পুণি সাধে খুলিয়া রাখি বোঠাপ। জনহকে জনহেরই নিরমে বুঝিবার ভার অন্তর্দ্বারীরই উপরে থাকে, আমরা পুণির বিধান মিলাইয়া না চলিলে সেবকালে যে ঠেকাইতে পারি না।

বিনোদিনী। ঠেকাইবার চেষ্টা পরে করিবে—এখন যাঁহা বলিতেছি, তাহা ভাল করিয়া বুঝিয়া যের। আমি সত্য বলিতেছি, উপেক্ষিত নারীর ক্ষমতা ভাঙির কহিবার ক্ষমতা তোমার বক্তব্য দ্বারা আমি এই অধিকাংশ

আরম্ভ করিয়াছিলাম। সে অথ তুমি নির্মাণ করিতে পারিতে—কিন্তু না করিয়া তুমি আরো বিগুণ জাগ ইয়াছ।

বিহারী। আমি ন'গাইয়াছি? আমার যে কোনপ্রকার দাহিকা শক্তি আছে, তাহা জানিতাম না, জানিলে সাবধান হইতাম।

বিনোদিনী। না ঠাকুরপো, ঠাট্টা করিয়াও না, বরঞ্চ রাগ কর, সে ভাল। কিন্তু রাগই কর আর বাই কর, আর যখন তোমার সমুখে আদিয়া দাঁড়াইয়াছি, অজ্ঞ আমাকে তোমার বৃত্তিতেই হইবে! এখন আমার আর অপেক্ষা করিবার স্থানও গুল্মিয়ার সময় নাই—খেন খেন ঠাণ্ডা বাতাস জলের মধ্যে পড়িয়াছে, হৃদয় উঠিয়া, নদ্র ছুঁইবে। এখন ঢাকিয়া কিছু বালব না, তুমিও দয়া করিয়া লবস্তা বুঁদ কর।

বিহারী। বাহা বর্ণিত চাও, তাহা শুনিব, বুঝা না বুঝা আমার হাত নহে। মহেশ্বরের ঘরে তুমি যে আগুন ল'গাইয়াছ, আমি তাহা উদ্ভাইয়া দিয়াছি, এ কথা বৃত্তিতে বসেই সময় লাগিবে।

বিনোদিনী। তুমি ঠাকুরপো, আমি নিশ্চয় হইয়া বলিতেছি, তুমি আমাকে ফিরাইতে পারিতে। মহেশ্বর আমাকে ভালবাসে বটে, কিন্তু সে নিজেই অন্ধ, আমাকে কিছুই যোঝে না। একবার মনে হইয়াছিল, তুমি আমাকে যেন বুঝিয়াছ—একবার তুমি আমাকে প্রজ্ঞা করিয়াছিলে—লজা করিয়া বল—সে কথা অজ্ঞ চাপা দিতে চেষ্টা করিয়াও না।

বিহারী। সত্যই বলিতেছি, আমি তোমাকে প্রজ্ঞা করিয়াছিলাম।

বিনোদিনী। তুমি ক'র নাই ঠাকুরপো, কিন্তু বুঝিলেই যদি, প্রজ্ঞা করিলেই যদি, তবে সেইখানেই থাকিলে কেন? আমাকে ভালবাসিতে তোমার কি বাধা ছিল? আমি আজ নিশ্চয় হইয়া তোমার কাছে অগ্নিদ্বারি, এবং আমি আজ নিশ্চয় হইয়াই তোমাকে বলিতেছি—তুমিও আমাকে ভালবাসিলে না কেন? আমার পোড়াকপাল। তুমিও কি না আমার ভালগাধার মজিলে। না, তুমি রাগ করিতে পাইবে না! বল ঠাকুরপো, আমি কোন কথা ঢাকিয়া বলিব না! তুমি যে আমাকে ভালবাস, সে কথা তুমি যখন নিজে জানিতে না, তখনো আমি জানিতাম। কিন্তু হাস্যর মধ্যে তোমরা কি দেখিতে পাইয়াছ, আমি কিছুই বুঝিতে পারি না! ভালই বল, অজ্ঞ মনই বন, তাহার আছে কি! বিধাতা কি পুরুষের দৃষ্টির সঙ্গে অতদৃষ্টি কিছুই দেন নাই? তোমরা কী দেখিয়া—কতটুকু দেখিয়া ভোল! নির্দোষ! অন্ধ!

বিহারী উঠিয়া দাঁড়াইয়া কহিল—“আজ তুমি আমাকে বাহা শুনাইবে, সমস্তই আমি শুনিব—কিন্তু যে কথা বালবার নহে, সে কথা বলিয়াও না, তোমার কাছে আমার এই একান্ত মিনতি।”

বিনোদিনী। ঠাকুরপো, কোথায় তোমার ব্যথা লাগিতেছে, তাহা আমি জানি—কিন্তু বাহার প্রজ্ঞা আমি পাইয়াছিলাম এবং বাহার ভালবাসা পাইলে আমার জীবন সার্থক হইত, তাহার কাছে এই রাত্রে তপ, লজ্জা, সমস্ত বিনশ্চল দিয়া ছুটিয়া অগ্নিপায়, সে যে কত বড় বনশ্চল, তাহা এখন করিয়া একটু

মৈথ্য! ধর! আমি সত্যই বলিতেছি, তুমি যদি আমাকে ভাল না বাসিতে, তবে আমার দ্বারা আমার আত্ম এমন সর্ব্বনাশ হইত না।

বিহারী বিবর্ণ হইয়া কহিল—“আপার কি হইয়াছে? তুমি তাহার কি করিয়াছ?”

বিনোদিনী। মহেন্দ্র তাহার সমস্ত সংসার পরিত্যাগ করিয়া কাণ আমাকে লইয়া চলিয়া গাইতে প্রস্তুত হইয়াছে।

বিহারী হঠাৎ সর্জন করিয়া উঠিল—“এ কিছুতেই হইতে পারে না! কোনমতেই না!”

বিনোদিনী। কোনমতেই না? মহেন্দ্রকে আত্মকে ঠেকাইতে পারে?

বিহারী। তুমি পার।

বিনোদিনী বানিকজগৎ চূর্ণ করিয়া রহিল—তাহার পরে বিহারীর মুখের দিকে ছই চক্ষু হির রাখিয়া কহিল—“ঠেকাইব কাহার অন্ত? তোমার আশার অন্ত? আমার নিজের হৃদয়? কিছই নাই! তোমার আশার ভাল হউক, মহেন্দ্রের সংসারের ভাল হউক, এই বলিয়া ইহকালে আমার সকল গাৰী মুছিয়া কেনিবে, এত তাগ আমি নই—বর্ষণাত্মের পুঁথি এত করিয়া আমি পড়ি নাই। আমি ব'হা ছাড়িব, তাহার বদলে আমি কি পাইব?”

বিহারীর মুখের তাব ক্রমশ অত্যন্ত কঠিন হইয়া আসিল—কহিল, “তুমি অনেক স্পষ্ট কথা বলিবার চেষ্টা করিয়াছ, এবার আমিও একটা স্পষ্ট কথা বলি। তুমি আমাকে কাতটা করিলে, এবং যে কথাতলা বলিতেছ, ইহার অবিকার্য্যই, তুমি যে সাহিত্য পড়িয়াছ—তাছাড়া হইতে চূরি। ইহার বারো-আনাই নাটক এবং নভেল!”

বিনোদিনী। নাটক! নভেল!

বিহারী। হাঁ, নাটক, নভেল! তাও খুব উৎকৃষ্টের নয়। তুমি মনে করিতেছ, এ সমস্ত তোমার নিজের—তাছাড়া নহে। এ সবই ছাপাখানার প্রতিক্রিয়া! যদি তুমি নিত্যক নির্দোষ মূৰ্খ মরণা বাসিকা হইতে, তাহা হইলেও সংসারে ভালবাসা হইতে বঞ্চিত হইতে না—কিন্তু নাটকের নারিকী টেম্বের উপরেই পোতা পায়, ধরে তাহাকে লইয়া চলে না।

কোথায় বিনোদিনীর সেই ভীত ভেল, হৃৎসহ দর্প! মহাহত কবিতার মত যে তত্ব হইয়া—নত হইয়া রহিল। অনেকক্ষণ পরে, বিহারীর মুখের দিকে না চাহিয়া, শান্তনয়-দ্বরে কহিল—“তুমি আমাকে কি করিতে বল?”

বিহারী কহিল, “অসাধারণ কিছু করিতে চাহিয়া না। সংসার প্রাণোন্মেষের তত্ব-বুদ্ধি বাছা বলে, তাই কর! বেশে চলিয়া যাও!”

বিনোদিনী। কেমন করিয়া গাইব?

বিহারী। মেয়েদের গাফিলতে তুলিয়া দিয়া আমি তোমাকে তোমাদের ট্রেনের পর্য্যন্ত পৌছাইয়া দিব।

বিনোদিনী। আত্ম রাস্তা তব আমি এইখানেই থাকি!

বিহারী। সা, এত বিশ্বাস আমার নিজের ‘পরে নাই।

তুলিয়া তৎক্ষণাত্ বিনোদিনী চৌকি হইতে তুলিতে উঠাইয়া পড়িয়া বিহারীর প্রই পা প্রাণপণ বলে বন্ধে চালিয়া ধরিয়া কহিল—“ঐতুচ্ছ! ধন্যবাদ! রাখ ঐকুরপো!”

একেবারে পাখের দেওয়ার মত পবিত্র
হইয়ো না! বসন্তে ভাল বাসিয়া একটুখানি
বস হও!”

বলিয়া বিনোদিনী বিহারীর পদযুগ
ঝরঝর চুষন করিল। বিহারী বিনোদিনীর
এই আকস্মিক অভাবনীয় ব্যবহারে ক্ষণ-
কালের জন্য বেন আশ্চর্যবরণ করিতে পারিল
না। তাহার শরীর-মনের সমস্ত গ্রহি বেন
শিথিল হইয়া আসিল। বিনোদিনী বিহারীর
এই শুষ্ক বিদ্রলতাব অদ্ভুতব করিয়া
তাহার পা ছাড়িয়া দিয়া নিজের দুই
হাঁটুর উপর উন্নত হইয়া উঠিল, এবং
চৌকিতে আসীন বিহারীর গলদেশ বাহিতে
বেটন করিয়া বলিল, “জীবনসঙ্গত, আমি
তুমি আমার চিরকালের নও, কিন্তু আমি
একমুহূর্তের জন্য আমাকে ভালবাস!
তার পরে আমি আমাদের সেই বনে-
জন্মে চলিয়া যাইব, কাহারও কাছে কিছুই
চাহিব না। মরণপর্যন্ত মনে রাখিবার মত
আমাকে একটা কিছু দাও!”—বলিয়া বিনো-
দিনী চোখ বুজিয়া তাহার ওষ্ঠাধর বিহারীর
কাছে অগ্রসর করিয়া দিল। ব্রহ্মকালের
জন্ত দুইজনে নিশ্চল এবং সমস্ত বর নিতম্ব
হইয়া রহিল। তাহার পরে দীর্ঘনিশ্বাস
ফেলিয়া বিহারী বীরে বীরে বিনোদিনীর
হাত ছাড়াইয়া লইয়া অস্ত্র চৌকিতে গিয়া
বসিল এবং ক্রুদ্ধপ্রায় বর্ষস্বর পরিহার করিয়া
লইয়া কহিল—“আজ রাত্রি একটার সময়
একটা প্যাসেঞ্জার ট্রেন আছে।”

বিনোদিনী একটুখানি শুক হইয়া রহিল,
তাহার পরে অকটকণ্ঠে কহিল—“সেই
ট্রেনেই যাইব।”

এমন সময়—পায়ে জুতা নাই, গায়ে জামা
নাই—বসন্ত তাহার পরিপুষ্ট গৌরমুখর বেধ
লইয়া বিহারীর চৌকির কাছে আসিয়া
দাঁড়াইয়া গভীরমুখে বিনোদিনীকে দেখিতে
লাগিল।

বিহারী বিজ্ঞাসা করিল—“ওতে বাস
নি বে?”—বসন্ত কোন উত্তর না দিয়া
গভীরমুখে দাঁড়াইয়া রহিল।

বিনোদিনী দুই হাত বাড়াইয়া দিল।
বসন্ত প্রথমে একটু বিধা করিয়া বীরে বীরে
বিনোদিনীর কাছে গেল। বিনোদিনী
তাঁহাকে দুই হাতে বুকের মধ্যে চাপিয়া
ধরিয়া স্বপ্নকর করিয়া কাদিতে লাগিল।

(৩৮)

বাহা অসম্ভব, তাহাও সম্ভব, বাহা অসম্ভব,
তাহাও সম্ভব হয়, নহিলে মহেশ্বরের সংসারে
সে রাত্রি সেদিন কাটিত না। বিনোদিনীকে
প্রসন্ন হইয়া থাকিতে পরামর্শ দিয়া মহেশ্বরে
রায়েই একটা পত্র লিখিয়াছিল, সেই পত্র
ডাকযোগে সকালে মহেশ্বরের বাড়ীতে
পৌছিল।

আশা তখন শয্যাগত। বেহারা চিঠি
হাতে করিয়া আসিয়া কহিল—“বাবু,
চিঠি, চিঠি।”

আশার জংশিঙে রক্ত ধক করিয়া যা
দিল। এক পলকের মধ্যে সমস্ত আশাস ও
আশঙ্কা একসঙ্গে তাহার বকে বাজিয়া
উঠিল। শুড়াতাড়ি মাথা তুলিয়া চিঠিখানা
লইয়া দেখিল, মহেশ্বরের হাতের অক্ষরে
বিনোদিনীর নাম। তৎক্ষণাৎ তাহার মাথা
বানিশের উপরে পড়িয়া গেল—কোন কথা
না বলিয়া আশা সে চিঠি বেহারার হাতে

কিরাইয়া দিল। বেহাঙ্গা জিজ্ঞাসা করিল—
“চিঠি কাহাকে দিতে হইবে?”

আশা কহিল—“জানি না।”

রাহি তখন আটটা হইবে, মহেন্দ্র তাড়াতাড়ি বকের মত বিনোদিনীর ঘরের সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইল। দেখিল, ঘরে আলো নাই—সমস্ত অন্ধকার। পকেট হইতে একটা বেশালাইয়ের বাক্স বাহির করিয়া বেশালাই ধরাইল—দেখিল, ঘর শূন্য। বিনোদিনী নাই, তাহার জিনিষপত্রও নাই। দক্ষিণের বারান্দার গিরা দেখিল, বারান্দা নির্জন। ডাকিল—“বিনোদ!”—কোন উত্তর আসিল না।

“নির্কোঁধ! আমি নির্কোঁধ! তখনি সঙ্গে করিয়া লইয়া বাওয়া উচিত ছিল! নিশ্চয়ই বা বিনোদিনীকে এমন গল্পনা দিয়াছে যে, সে ঘরে টিকিতে পারে নাই।”

সেই কল্পনামাত্র মনে উদয় হইতেই তাহা নিশ্চয় সভ্য বলিয়া তাহার মনে বিশ্বাস হইল। মহেন্দ্র জুখির হইয়া তৎক্ষণাৎ মার ঘরে গেল। সে ঘরেও আলো নাই,—কিছু রাজলক্ষী বিজ্ঞানার ওইরা আছেন, তাহা অন্ধকারেও লক্ষ্য হইল। মহেন্দ্র একেবারেই কষ্টঘরে বলিয়া উঠিল—“না, তোমরা বিনোদিনীকে কি বলিয়াছ?”

রাজলক্ষী কহিলেন—“কিছুই বলি নাই।”

মহেন্দ্র। তবে সে কোথায় গেছে?

রাজলক্ষী। আমি কি জানি?

মহেন্দ্র অবিখাসের স্বরে কহিল—“তুমি জান না? আচ্ছা, আমি তাহার সম্মুখে চলি; লাম—সে বেখানেই থাক্, আমি তাহাকে বাহির করিবই।”

বলিয়া মহেন্দ্র চলিয়া গেল। রাজলক্ষী তাড়াতাড়ি বিজ্ঞান হইতে উঠিয়া তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিতে চলিতে বলিতে লাগিলেন—“বহিন্, বাসনে বহিন্, কিরিয়া আয়, আমার একটা কথা শুনিয়া যা।”

মহেন্দ্র একনিশ্বাসে ছুটয়া বাড়ী হইতে বাহির হইয়া গেল। বহুত পরেই কিরিয়া আসিয়া দরোয়ানকে জিজ্ঞাসা করিল—“বক্সাকুলাগী কোথায় গিয়াছেন?”

দরোয়ান কহিল, “আমাদের বলিয়া যান নাই, আমরা কিছুই জানি না।”

মহেন্দ্র গর্জিত ভৎসনার স্বরে কহিল—
“জান না।”

দরোয়ান ক্রমকোড়ে কহিল—“না মহা-
রাজ জানি না।”

মহেন্দ্র ঘনে ঘনে হির করিল—“বাইরা-
ঘের দিখাইয়া দিয়াছেন।” কহিল—“আচ্ছা,
তা হউক!”

মহানগরীর রাসপথে গ্যাসালোকবিদ্ধ
সন্ধ্যাকারে বরফওলা তখন বরফ ও
তপ্পীমাছওলা তপ্পীমাছ হাঁকিতে-
ছিল। কলবন্ধু জনতার মধ্যে মহেন্দ্র
প্রবেশ করিল এবং অদৃষ্ট হইয়া গেল।

ক্রমশঃ ।

যাত্রা ।

এত কষ্টে—এত দুখে, তোমারই অভিমুখে,
বাহিরা চ'লেছি আমি জীবন-তরুণী ;
নাহি আমি কোথা কূল, দিক্ হ'রে বার কূল,
নাহি আমি কত জন্ম ঘাইবে এমনি !

জন্ম-জন্ম অরুকারে, জীবনের কোন পারে,
দিয়ে না কি—নিধে না কি নেথা একদিন ?
জীব-যাত্রা-অবসানে, পাড়াইব কোন্ খানে,
পা'ব না কি, পুণ্যময়, তোমার পুলিন ?

এ জীবন-রাত্রি, নাথ, হ'বে না কি সুপ্রভাত,
অচির-রজনী-পরে চির-আগরণ ?
বয়সীর দুখ-তাপ, জীবনের অভিমান,
বল বল, হবে নাথ, কোথা সমাপন !

মায়ার বন্ধন-ডোর, জীবনের বোহ-বোহ,
বৃকের বাড়ব বাহ, হ্রিপুর তাকন ;—
জীবনের কোন্ তীরে, বিলীন হইবে ধীরে,
আশা-উৎসাহের এই ভাঙিবে বশন !

তোমারে তাবিত্য হুঁরে, কত জন্ম গেছে হুঁরে,
কত জন্ম ঘা'বে পুন তাও নাহি আমি !
হৃৎকোর রহস্ত-বন্ধ, নাহি স্মর—নাহি ছন্দ,
; নি-ব-জন্মি লক্ষ্য, তাই শুধু আমি !

জীবনে বা' বুঝি রাছি, তাই শুধু ধ'রে আছি,
 সত্য বাহা পাইরাছি, ক'রেছি সঞ্চয় ।
 তাহাই পাথের করি, বহি'ছি জীবন-তরী,
 অথ-দুখে করি নাই তোমারে সঞ্চয় ।

অথ-দুখ, হাটাকাই, বিবালোক, অন্ধকার,
 মহামারী—মহাকর, বহু-বাত্যা ঘোর ;—
 তোমারি করুণা হির, যে বুকেছে সেই বীর,
 হোক না জীবন-বাতা কঠিন; কঠোর ।

ভেসে বাধ ছির নীরে, সন্ধ্যা আদিবে না ঘিরে,
 অথ হোক—দুখ হোক প'ব না আশ্রয় ।
 ঠেলি বিষ দুই হাতে, ধরি উকা-বহু মাথে,
 বাগ্‌ধের মত চাই সহিতে প্রমাদ !

মধ্য-পথে যদি বাধ, নিবাইয়া দেয় আশ্রয়,
 নিরাক্ষরে সেই দিন ল'বে না কি কাছে ?
 লব্ধ-অগতের ভীরে, স্মৃতি যেন নাহি কিরে,
 পত বহুনের কোর ফেলিয়াছে পাছে ।

তোমার প্রশান্ত কূলে— সব যেন বাই কূলে,
 শুধু যেন মনে থাকে তুমি আর আমি !
 অ'ধি হ'তে আলো নিও, অগৎ সন্ধ্যায় দিও,
 তখন চাখিব শুধু তোমারেই, আমি ।

জিগিরিজন্যাত মুখোপাখ্যাত ।

বর্ণাশ্রমধর্ম ।

শ্রীযুক্ত ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় মহাশয় কর্তৃক আলোচনা-সমিতিতে পঠিত বর্ণাশ্রম-ধর্মবিষয়ক অতি উৎকৃষ্ট গ্রন্থ তুমিরা যে দুইচারিটি কথা বলে হইয়াছে, বঙ্গবর্ষনে একাংশযোগ্য বিবেচিত হইলে অগ্রগৃহীত হইব।

এবছরের সমালোচনাকালে একটা কথা উঠিয়াছিল, একালে বর্ণাশ্রমধর্মের ব্যবহা পূর্বের বত অক্ষুণ্ণ রাখা চাইতে পারে কি না। কথাটা সে সময়ে অপ্রাসঙ্গিক হইয়াছিল; কিন্তু ইহার উত্তর বোধ করি সুপ্রাপ্য নহে। কোন সামাজিক ব্যবস্থাই চিরকাল সমান-ভাবে চলিতে পারে না ও চলেও না। সমাজ যখন পরিবর্তনশীল, তখন সমাজহিতের ব্যবস্থাও পরিবর্তনশীল হইবে, ইহা স্বীকার্য। বস্তুতই মহুর সময়ের ব্যবস্থা এ সময়ে সর্বতোভাবে প্রচলিত নাই। ইংরাজির প্রভাব সমাজে প্রবেশের পূর্বেই সমাজ আপনা হইতে শাস্ত্রকারদের সম্মতিক্রমে বা নিয়োগ-ক্রমে আপনার ব্যবস্থা আপনাই পরিবর্তিত করিয়া লইয়াছে। মহুর সময়ে চারিটি মুখ্য বর্ণ ও বোধ করি বহুতর সঙ্করবর্ণ বিদ্যমান ছিল। সেই চারিটি মুখ্যবর্ণের মধ্যে এখন কেবল ব্রাহ্মণই বিদ্যমান। ক্ষত্রিয়-বৈশ্যের লোপ হইয়াছে। শূত্রের নাম আছে, কিন্তু সামাজিক অবস্থা উন্নত হইয়াছে। বলা বাহুল্য, শূত্রের এই সামাজিক উন্নতি ইংরাজিসম্মতির বহু-

পূর্বেই ঘটয়াছিল। চারিটি আশ্রমের মধ্যে কেবল গৃহস্থাস্রমটাই বর্তমান আছে। ব্রহ্মচর্য ও বানপ্রস্থের বিলোপ হইয়াছে। তিস্ত আছে, কিন্তু সে মহুর তিস্ত নহে। সে বোধ করি, বৌদ্ধ তিস্তের রূপান্তর।

তুমিতে পাই, সংহিতাকারেরাই কলিকালে তিস্তুর আশ্রম নিবেদ করিয়া গিয়াছেন। সেটা বোধ হয় তিস্তুগণের উৎপাতেই হল। তিস্তুর আশ্রম অতি কঠিন আশ্রম। তিস্তু সমাজের আশ্রমে বাস করেন ও সমাজের নিকট আপনার অগ্রবর ঘাফা কিছু আব-স্তক, তাহা আদায় করেন; কিন্তু সমাজ তাঁহার নিকট বিনিময়ে কিছু দাবী করিতে পায় না। এরূপ হলে তিস্তুর জীবন দারিদ্র-ভীন নীতিবর্জিত জীবনে পরিণত হইবার অত্যন্ত আশঙ্কা থাকে। কিন্তু সেকালের অর্থাৎ মহুর সময়ের তিস্তুকে অত্যন্ত কঠিন এপ্রেক্ষিতের পরীক্ষার উত্তীর্ণ হইয়া অত্রল্যা-শ্রমে প্রবেশ করিতে হইত।

বাহ্যিকোই প্রত্যাশাগ্রহণ বিহিত ছিল। জীবনের কার্য সম্পাদন করিয়া যখন অবসর লইবার সময়, তখনই বুছেরা পুত্র-পৌত্রাদির হস্তে সংসারভার সমর্পণ করিয়া ক্রান্তবয়েহে জরাধীর্ণ শরীর ও অবসর মন লইয়া সংসারের নিকট ছুটি লইতেন। সংসারের মধ্যে থাকিয়া সংসারের উপর আপনার বোঝা সমস্ত তাঁহারা কতকটা

অষ্টম মনে করিতেন; সংসারও তাঁহাদিগকে আর ঘোঁষনসংগ্রামে লিপ্ত রাখিয়া কষ্ট দেওয়া অকর্তব্য মনে করিতেন। উত্তর-পক্ষের সম্ভতিক্রমে তাঁহারা ছুটি গইতেন; আপনায় কৃতকার্যের পেনশনরূপ বৎ-কিকিংবাত্ত অর্থাৎ প্রাপ্যকার উপায়মাত্র সংসারের নিকট দাবী করিতেন। সংসার তাঁহাদের নিকট বিনিময়ে কিছু দাবী করিত না।

কিন্তু এই বন্দোবস্তে ভিক্ষুর আশ্রমে প্রবেশের পূর্বে বিষয় পরীক্ষা নিতে হইত। ঐ পরীক্ষা বানপ্রস্থাপ্রদ। বনবাসীর জীবন অতি কঠোর জীবন; তাহাকে বনে বসিয়া সংসারের প্রভু বৎপরোন্মত্তি সহিতে হইত। অথচ সংসারের নিকট বিশেষ কিছু পাই-তেন না। এই পরীক্ষার উত্তীর্ণ হইলে ভিক্ষুর পেনশনে অবিকার—ইহাই বোধ করি সাধারণ নিয়ম ছিল।

ভিক্ষুর আশ্রম প্রবেশে এইরূপ কঠোর নিয়মের বাধ্যবাধি থাকার নাতিহীন ও দায়িত্বহীন ভিক্ষুর উৎপাত ঘটবার সম্ভাবনা অধিক ছিল, বোধ হয় না। বানপ্রস্থের কঠোর পরীক্ষার পর ভিক্ষুর জীবন গ্রহণে লক-লের সাহসে কুলাইত, তাহা বোধ হয় না। বিজ্ঞানিতমাত্রই বুদ্ধবয়সে ভিক্ষুক হইতেন, এইরূপ মনে কবির সন্দেহ কারণ নাই। বিজ্ঞানি ভিন্ন শূদ্রপণের অর্থাৎ সমাজের অবিকালে লোকের ভিক্ষুক হইবার অধি-কারই ছিল না। কাজেই সমাজে কোনও কালে ভিক্ষুর সংখ্যা যে খুব বাড়িয়াছিল, তাহা বোধ হয় না।

কিন্তু বেলে নারিক একটা বিধি আছে,

বৈরাগ্য জন্মিমাত্র যে কেহ যে কোন বয়সে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিতে পারে। বাহার বৈরাগ্য জন্মিয়াছে, তাহাকে আটকাইয়া রাখা যায়—বুদ্ধবয়স বা শরীরচাৰ্য্য বা চৈতন্ত, কাহাকেই কেহ কোন উপায়ে আটকাইয়া রাখিতে পারে নাই। ধোঁর করিয়া আট-কাইয়াও লাভ নাই। কিন্তু আপত্তা থাকে তত্ত বৈরাগ্যের। কৃত্রিম বৈরাগ্যের আক্রমণ হইতে গৃহপ্রাশনকে রক্ষা করিবার জন্য যথাসি পারকার যে বিশেষ ব্যবস্থা করিয়াছিলেন, তাহা সঙ্গতই মনে হয়।

ফলে বৃদ্ধবয়সে কঠোর বানপ্রস্থের পর প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিবে, এই সাধারণ নিয়ম প্রচলিত থাকিলেও, সেকালেও অনেকেই বৈরাগ্য আশ্রয় করিয়া অকালে প্রব্রজিত হইত, সংশয় নাই। এবং প্রকৃত বৈরাগীর অসুস্থতায় বৈরাগীর মনের স্থিতি হইয়াছিল, ইহাও সম্ভব। বুদ্ধবয়সের সময়ে অথবা কিছু পূর্বে এইরূপ অকালবৈরাগীর দল অনেক হইয়াছিল, এবং বৈরাগ্য-আশ্রয়টা একরকম ক্যান্সন হইয়াছিল, এইরকম মনে সন্দেহ হয়।

বুদ্ধবয়সে প্রকৃত সন্ন্যাসী ছিলেন; তাঁহার সন্ন্যাসের বৈশিষ্ট্য এই যে, তিনি কর্মত্যাগ না করিয়া কর্মই জীবনের অব-লম্বন করিয়াছিলেন। এত বড় কর্মী সন্ন্যাসী ভূপৃষ্ঠকে আর কখনও পবিত্র করে নাই।

কিন্তু তিনি শাস্ত্রের ব্যবস্থা লম্বন করিয়া সন্ন্যাসগ্রহণের দ্বার অবারিতভাবে মুক্ত করিয়া দিলেন। বিজ্ঞাননির্ভরশেষে সন্ন্যাসী-পুঙ্খনির্ভরশেষে সন্ন্যাসী হইতে থাকিল। পুঙ্খের প্রব্রজ্যাগ্রহণের পর অসুস্থ হইয়া

বয়সের একটা নিয়ম করিয়াছিলেন ; অন্তত পিতামাতার অসম্মতিতে কেহ সংসার ত্যাগ করিবে না, এইরূপ একটা নিয়ম করিয়াছিলেন । এবং জীবাণিকে সম্যাসপ্রবেশের অনুমতি দিয়াও শেবে অল্পতপ হইয়া বলিয়াছিলেন, সংপ্রচারিত সঙ্কল্পের আয়ুঃকাল এইবার কমিয়া গেল ।

তাঁহার অনুতাপ অল্পচিত হয় নাই । কেন না, দেশটা কিছুদিনেই কপট সন্ন্যাসীর দলে ভরিয়া গেল । বৈদ্য সন্ন্যাসীদের মধ্যে অনেক বড় বড় সাধু মহাপুরুষ জন্মিয়াছিলেন, অনেক পণ্ডিত, পবিত্রচিত্ত মহাত্মা বহুধা অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন, সত্য বটে ; কিন্তু কপট সন্ন্যাসীর উৎপাত হইতে গৃহস্থকে রক্ষা করিবার সম্যক উপায় বুদ্ধদেব কিছুই করিয়া দান নাই । বাহ্য করিয়াছিলেন, তাহা নিশ্চল হইয়াছিল । ফলে যে সমাজবিপ্লব ঘটে, তাহাতে সনাতন ধর্ম উজ্জ্বল হইবার উপক্রম হয় । বর্ণাশ্রমধর্ম বিপর্যস্ত হইবার উপক্রম হয় । সেজ্ঞাচারী যঠধারী মহাত্ম ও ভিক্ষুকের উৎপাতে দেশ হইতে সমাচার বিলুপ্ত হইবার উপক্রম হয় ।

সাধারণ মনুষ্য পৌরুষ শক্তির অপেক্ষা অপৌরুষের শক্তিতে অধিক আবাহান । বুদ্ধদেব অপৌরুষের ঐতিহ্যে অতিক্রম করিয়া পৌরুষ হৃক্তির প্রাধান্ত প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন । প্রাচীন পরীক্ষিত ঐতিহাসিক আদর্শকে ঠেলিয়া দিয়া নূতন অপরি-
ক্ষিত আদর্শকে স্থাপিত করিয়াছিলেন । তাহার কয়েক এই সমাজবিপ্লব ও সেজ্ঞাচারের প্রাচুর্য্যব । বদি কাহারও দিগদাধকে, তিনি ভাস্কর বুদ্ধগণের ইতিহাসটা

পড়িয়া দেখিবেন । শতাব্দীরগ্রন্থেও তাহার যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায় । ইউরোপে যঠধারী মহাত্মের ও ভিক্ষুকের উপজীব রাজশাসন দ্বারা নিরাকৃত হইয়াছে । ভারত-বর্ষে রাজশাসন এ সকল স্থলে হস্তক্ষেপে সাহস করে না । কিন্তু সমাজ শেবে বিত্রোহী হইয়া উঠিয়াছিল । বৌদ্ধনাম দেশের মধ্যে ছের হইয়া পড়ে । ভারতবর্ষের বৌদ্ধগণকে কেহ হিমাশ্রমণের স্বাধিমা আসে নাই ; কিন্তু তাঁহারা আর সমাজে বনামে পরিচিত হইতে সাহস করে নাই । ভিক্ষুর আশ্রম-গ্রন্থ বোধ হয় এই কারণেই শাস্ত্রকারগণ-কর্তৃক নিষিদ্ধ হইয়াছিল ।

এই বিপ্লব হইতে সমাজরক্ষার দ্বন্দ্ব শাস্ত্রবিৎ পণ্ডিতগণ ঐতিহ্য ও ধর্মশাস্ত্রের ঘোষাই দিয়া সমাচার পুনঃপ্রতিষ্ঠার লজ্জা বধাশক্তি চেষ্টা করিয়াছিলেন । সেইদন্ত সনাতন ধর্মের পুনঃপ্রতিষ্ঠার কালে আমরা আচারের বন্ধনের দৃঢ়তা দেখিয়া বিম্বিত হই ও স্বতন্ত্রত্বকারাদিষ্টকে গালি দিই । তাঁহার ধর্মনীতির অপেক্ষা আচারনীতির অধিক আদর করিয়াছেন দেখিয়া তাঁহা-
দিগকে নানাবিধ কুবাক্য বলি । আমরা কুলিয়া বই, নীতির প্রতিষ্ঠা কোন দেশেই কোন কাগেই ব্যবস্থাপকের (legislator এর) কাজ নহে ; আইনের দ্বারা সন্নীতির প্রতিষ্ঠা কোন কাগেই হয় না, তবে সমা-
চারের প্রতিষ্ঠা হইতে পারে । এবং সমাচার—
ইংরাজিতে দ্বাহাকে decency, propriety প্রকৃতি আখ্যা দেওয়া যায়—তাহা সমাজ-
শক্তির লজ্জা একান্ত আবশ্যিক ; এবং তাহার লজ্জাই রাজশাসনের ও শাসকের শাসনের

আবশ্যকতা; নীতি-(morality)-প্রতিষ্ঠা-পক্ষে, রাজশাসনের ও শাস্ত্রের শাসনের কোনই মূল্য নাই। আধুনিক কালে যে সকল নিষেধকার ও দায়েধকার আচার-বন্ধনে সমাজকে বাঁধিবার চেষ্টা করিয়া কতকটা কৃতকার্য হইয়াছিলেন, তাঁহাদের অন্তর্ভেকেই রাজ্যশাস্ত্রে প্রতিপালিত। তাঁহারা স্বয়ং ঐশি ছিলেন না, তবে ঐশিবাক্যের মোহাই দিতেন, ও রাজ্যকে পরামর্শ দিয়া রাজশাসন নিয়ন্ত্রিত করিয়া রাজবিধিবার। সমাজাচারপ্রতিষ্ঠার সকল চেষ্টাছিলেন।

কিন্তু তারতবর্ষের দুর্ভাগ্যক্রমে এ কালের ধর্মদাম্পত্যসকলের প্রযুক্তিগত শাস্ত্রের তাৎপর্য ঠিক বুঝেন নাই। এমন কি, স্বয়ং শত্ৰুচাৰ্য্যও প্রতির সেই প্রাচীন বচনের মোহাই দিয়া বৈরাগ্যের দ্বার অব্যাহিত রাখিয়াছিলেন। পরবর্তী সন্তান-প্রযুক্তির প্রাচীন প্রাচীনিক ও বৈরাগ্যগ্রহণে নিবারণ করেন নাই। ফলে আমরা শাস্ত্র মতে ও বৈকল্য অধ্যস্তার বোধ সন্ন্যাসীকে নামাজ পরিবর্তন করিয়া বিভ্রান্ত দেখিতে পাইতেছি। বসি শত্ৰুচাৰ্য্য যে দিন গৃহস্থ বস্ত্রনিষেক পত্রায় করিয়া গৃহস্থান্ত্রের উপর সন্ন্যাসান্ত্রের প্রাধান্য সঙ্গ্রহণ করেন, সেই দিন তারতবর্ষের ইতিহাসে দুর্দিন বলিয়া গণ্য করাই সম্ভব।

এ কালে যে মর্হী সময়ের বর্ণাশ্রমধর্ম পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হইবে, ইহা কেহ আশা করেন না। বোধ করি ইচ্ছাও করেন না। সে দিন নাই, হইবেও না। কিন্তু বিপ্লব কোন কালেই বাতনীয় নহে। পুরাতন আদর্শ পুরাতন ভিত্তির উপর বলায় থাকুক, ইহাই

প্রাথমিক; সেই আদর্শ কালাহুযায়ী দুর্ভি গ্রহণ করুক, তাহাতে ক্ষতি নাই।

বিপ্লব বোধ করি কেহই চাহেন না। আধুনিক সমাজসংস্কারকেরাও চাহেন না। পরিবর্তন আবশ্যিক, ইহা সকলেই স্বীকার করেন। তবে একদিক দৃষ্টে পরিবর্তন চান, অন্যদিক দৃষ্টে চান না,—বিত্তিঙ্গল ও উন্নতিঙ্গলে বোধ করি এইমাত্র প্রভেদ। এই প্রভেদ সর্বত্রই আছে; এ দেশেও আছে; থাকিও প্রাথমিক।

তবে এ কালে সমাজব্যবস্থার রাজ-শক্তির সাহায্য পাইবার আশা নাই; পাওয়া প্রাথমিকও নহে। যখন হিন্দু রাজা ছিল, তখন যে পরিবর্তন শাস্ত্রজগণের পরামর্শে রাজসাহায্যে অব্যাহিত সন্মোদিত হইত, এ কালে তাহা হইবার উপায় নাই। কেন না, রাজশক্তি সমাজশক্তি হইতে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন। ইহা অস্বাভাবিক; কিন্তু উপায় নাই। ইহার ফলতোষে প্রমত্ত থাকিতে হইবে। যে পরিবর্তন ঘটবে, তাহা সমাজের চেষ্টার দ্বারা হইবে। অনেক প্রতিকার মোহাই দেওয়া, শাস্ত্রের মোহাই দেওয়া অনাবশ্যক মনে করেন; আমরা উহা অনাবশ্যক বোধ করি না। সত্যতঃ দেশেও—বিশ্বভাষ্য বা আনৈতিক—প্রতির মোহাই না বিশেষ কোন সমাজব্যবস্থা টেকে না। সেখানে প্রতির নাম constitution; উহা অপৌকবের; কেন না, উহা অস্বাভাবিক—উহার মূল কোথায় পুঞ্জিয়া পাওয়া যায় না ও উহা ব্যক্তিগতবৈষম্যের প্রতিষ্ঠিত নহে। অপৌকবেরের প্রতিষ্ঠা সর্বত্র।

বর্ণাশ্রমধর্মের অঙ্গ দুইটি—প্রথম বর্ণধর্ম—ইহা লইয়া আমাদের সামাজিক জীবনের প্রতিষ্ঠা—দ্বিতীয় আশ্রমধর্ম—আমাদের ব্যক্তিগত জীবনে ইহার প্রতিষ্ঠা। সমাজ-জীবনে বর্ণভেদ—ব্যক্তির জীবনে আশ্রমভেদ। বৈদিক কালে উভয় ধর্মের বে মূর্তি ছিল, এখন তাহা নাই। পরিবর্তন ক্রমশ ঘটিয়াছে—কৃতির ভিত্তি বজায় রাখিয়া পরিবর্তন ধীরে ধীরে, কিন্তু যথেষ্টপরিমাণে ঘটাইয়াছে। যেখানে কৃতির ভিত্তি ঠেলিয়া আকস্মিক পরিবর্তনের চেষ্টা হইয়াছে, সেখানেই কল শোচনীয় হইয়াছে—ইতিহাস সাক্ষী। বর্তমান কালেও সেইরূপ কালোচিত পরিবর্তন ঘটতেছে ও ঘটবে; কিন্তু কৃতির ভিত্তি ঠেলিয়া দেলা বাহ্যনীয় নহে।

দেখিতে হলে প্রাচীনকালের চারি আশ্রম এখন কেবল গৃহস্থাশ্রমেই পরিণতি পাইয়াছে। ব্রহ্মচর্য ও বানপ্রস্থ একালে নাই। তিষ্ক আছে; কিন্তু অধিকাংশ স্থলেই একালের তিষ্ক সেকালের তিষ্কুর বিকৃষ্টনামাত্র। বর্ণধর্ম কিন্তু সমাজের অস্থিহস্তার বর্তমান। এ কালের বর্ণগত প্রভেদ প্রধানত তিনটি—প্রথম শোণিত-গত—অনার্য্য সন্তানেরা হিন্দুসমাজে গৃহীত হইয়া নিম্নশ্রেণীতে স্থান পাইয়াছে। দ্বিতীয় ব্যবসায়গত—কামার, কুমার, ধোপা, নাপিত প্রভৃতির বিভেদ ব্যবসায় লইয়া—এই জাতিভেদ বেশের মধ্যে টেকনিকাল শিক্ষা বিস্তারের ও ব্যবসায়গত বার্ষরকার বর্তমানকালের একমাত্র উপায়রূপ রহিয়াছে। তৃত্যিন প্রাণে গ্রামে নূতন ধরণের টেকনিকাল স্থান বাসিতেছে ও ব্যবসায়ীদের

বার্ষরকার জন্ত বিভিন্ন সমিতি গঠিত না হইতেছে, ততদিন এই জাতিভেদ এ দেশ হইতে উঠিবে না। তৃতীয় দেশগত ভেদ—ব্রাহ্মণের মধ্যে আবার বিবিধ শ্রেণী এই প্রাণেশিক ভেদ লইয়া। সেইরূপ অজ্ঞাত জাতির মধ্যেও এই প্রাণেশিক ভেদ বর্তমান। ইংল্যান্ডের রাজ্যে রেলওয়ে-টেলিগ্রাফের দিনে এই ভেদটা কমিয়া যায়, এইরূপ একটা সূত্র সর্বত্র দেখা বাইতেছে।

ইংরাজিতে বাক্যকে discipline বলে, আমাদের সমাজে বর্ণধর্ম কতকটা সেই ডিসিপ্লিনের কাজ করে। সে দিন উপাধার-মহাশয়ের প্রবন্ধের আলোচনাকালে শ্রীযুক্ত দিনেশচন্দ্রনাথ সেন মহাশয় বক্তব্য রাখেন, ‘কৃত্তর দমন’ ও ‘প্রতিভার বিকাশ’ এই দুই বিষয়ে কতটা সফল হয়, তাহা দেখিয়া এইরূপ সামাজিক ব্যবস্থার সার্থকতা বিচার করিতে হইবে। বস্তবই তাহাই। মোটা-মুটি বলা বাইতে পারে, ইউরোপের সমাজের বন্দোবস্ত প্রুতিভার বিকাশের অহুকুল; আমাদের দেশের সমাজের বন্দোবস্ত প্রুতিভার দমনের অহুকুল। ইউরোপে যে-কোন ব্যক্তি যে-কোন পদবীতে স্থান পাইতে পারে—ইহাই সে দেশের সমাজতন্ত্রের খিতরি। বিশাভের যে-কোন শ্রমজীবী গাড়টোনের আসনে বসিবার আশা করে; ক্রাফে বা আমেরিকার যে-কোন ব্যক্তি প্রেসিডেন্ট হইতে পারে,—প্রত্যেকেই যখন এইরূপ আকাঙ্ক্ষা-পোষণের অধিকারী, তখন সে দেশের সামাজিক নিয়ম যে প্রতিভার বিকাশের অহুকুল হইবে, তাহা অসংশয়কর বিষয় নহে। কিন্তু

আকাজ্ঞা থাকিলেই আকাজ্ঞা মিটে না।
 ক্ষমতার অভাবে বা সুবিধার অভাবে বা
 ঘটনার চক্রে নিরস্ত্রের অধিকাংশ লোকই
 চিরজীবন নিরস্ত্রেরিতেই আবদ্ধ থাকে;
 বাহ্যর আকাজ্ঞা ঘেটে, সে হয় খুব প্রতিজ্ঞা-
 বান্ধু বা খুব সৌভাগ্যবাদী। সাধারণত প্রতিজ্ঞা
 ও সৌভাগ্য উভয়ই একত্র না হইলে আকাজ্ঞা
 ঘেটে না। কলে দাঁড়ায় এই, ছইচাষিন
 ক্রমতাবলে বা সৌভাগ্যবলে মাড়োনের
 পথে ওঠে বটে; কিন্তু অধিকাংশ লোকেরই
 উচ্চাকাঙ্ক্ষা অসম্পূর্ণ থাকায় একটা দারুণ
 অসন্তোষের স্রষ্টা হয়; ক্যাকটরির ভিতর
 ছাড়কাটা পরিভ্রমের পর বিলাতের দুর্ভাগা
 স্রমজীবী যখন দেখিতে পায়, তাহার
 দিনান্তে অঙ্গের সংস্থান হইল না— সে জানে,
 সে মাড়োনের আসনে বসিবার অধিকারী,
 অথচ অল্প রাত্রিটা তাহাকে হালপথে ভ্রম-
 শয্যাতেই কাটাইতে হইবে, তখন সে মনের
 ক্ষোভে বড় লোকের ঘরে ঢেলা ছুড়িয়া
 অসন্তোষের পরিচয় দেয় ও বেহু কেহ বা
 সুবিধা পাইলেই রাজারাজড়ার বুকে ভলি
 চালায়।

আমাদের দেশের ব্যবস্থা কতকটা অস-
 রূপ। চাষার ছেলে ও তাঁতির ছেলে কখনও
 মনেও ভাবে না যে, তাহার রাজত্বকে
 বা রাজদরবারে বসিবার কোনও সম্ভাবনা
 আছে। সে জানে, সে পৈতৃক আদিধর্ম ও
 জাতিব্যবসার অবলম্বনেই চিরজীবন কা-
 য়-
 রম্বে কাটাইতে বিধাতার কৃষ্ণ নিয়োজিত
 হইয়াছে। তাহার উচ্চাকাঙ্ক্ষার লেশ
 নাই। তাহার স্বাভাবিক প্রতিজ্ঞা উচ্চমুখে
 তাকায় না; উপাধি প্রতিজ্ঞা এমনই জিনিষ

যে, কতিং কোনও স্থলে চরিত্র প্রতিজ্ঞা সমা-
 জের কল্যাণের ঠেলিয়া দিয়া ক্রমপুত্রকে
 বা তাঁতির পুত্রকে রাজত্বকে বসাইয়াছে;
 অল্প উদাহরণ এ দেশের ইতিহাসেও না
 মেলে, এমন নহে। কিন্তু এইরূপ উদাহরণ
 সাধারণ দিরমের ব্যক্তিচরিত্র। সাধারণ
 নিয়মমতে প্রত্যেকেই পৈতানবিক পবিত্রেই
 চিরজীবন শাশ্বির সহিত ও সন্তোষের সহিত
 কাটাইয়া দেয়। এবং বিধাতা যদি নিত্যন্ত
 বিক্রম হইয়া দেশে দর্ভিক উপস্থিত করেন,
 তখন নিত্যন্ত সন্তোষের সহিত সুভার ক্রোড়ে
 শান্তিলাভ করে,—রাজার বুক চুরি বসায়
 না।

কোন ব্যবস্থাটা ভাল, সে কথা নাই বা
 জুলিলান। সকল জিনিষেরই ভালমন্দ দুই
 দিক্ আছে। পান্ডিত্য সমাজের ব্যবহার
 এক দিক্ ভাল, অল্প দিক্ মন্দ—আমাদের
 ব্যবহারও এক দিক্ ভাল, অল্প দিক্ মন্দ।
 তবে না হয় এই পর্যন্ত বলা যাইতে পারে,
 ওদের ব্যবস্থা উন্নতির অঙ্গুষ্ঠ, কিন্তু স্থিতির
 অঙ্গুষ্ঠ নহে। পান্ডিত্য সমাজ লক্ষণ,
 কিন্তু হয় ত ভঙ্গপ্রবণ। আমাদের ব্যবস্থা
 স্থিতির অঙ্গুষ্ঠ, কিন্তু উন্নতির তেমন অঙ্গুষ্ঠ
 নহে। আমাদের শাস্ত্রে বাহা 'লোকস্থিতির'
 সহায়, তাহারই নাম ধর্ম। আদর্শ বিহীন
 সমাজে বিভিন্নরূপ; কিন্তু এই বিভ্রমের
 অল্প কোন সমাজকে গাণি দেওয়া সম্ভব
 নহে। সমাজ অতি বৃহৎ পদার্থ—ইহা
 স্ততিনিষ্কার অতীত। নদনদীর গতির মত,
 জ্যোতিষগণের গতির মত, সমাজের গতিও
 কাহারও স্ততিনিষ্কার অপেক্ষা না করিয়া
 আপন পথে চলিয়া যায়।

কিন্তু আমাদের ব্যবহার শকে একটা কথা বলিবার আছে। সম্রাটের বলা হয়, এ দেশের লোক dignity of labour—পরিশ্রমের গৌরব বুঝে না। আমার বিশ্বাস ঠিক উল্টা। আমাদের বিশাল—‘বর্ধের নিধন’ শ্রেয়: পরবর্ধে। তদ্ব্যবহঃ—ইহার অর্থ আমি যে কর্ণে প্রেরিত ও নিযুক্ত হইয়াছি, তাহা অপেক্ষা গৌরবকর কর্ণ আমার শকে আর নাই। কর্ণযাত্রই মহৎ—যদি তাহা বধ্যাবধ-রূপে সম্পাদিত হয়। অস্ত্রের চোখে আমার কর্ণ নিষিত হউক, তাহাতে বড় আপসে যায় না—আমার নিকট আমার কর্ণ গৌরবের সামগ্রী—ইহাই যদি আমার জীবনে সম্পাদন করিয়া বাইতে পারি, তাহা হইলেই আমার জীবন সার্থক হইবে।

আমার বোধ হয়, এই তাবটা আমাদের বেশে অতি ইতর লোকের মধ্যেও বিস্তারিত আছে। তাহাদের মনে উক্ত আকাঙ্ক্ষা নাই; কিন্তু আপন কর্তব্য সম্পন্ন করিতে পারিলেই আপন জীবন সার্থক হইবে, একপ বোধই এ বেশে সাধারণ নিয়ম। চাষার ছেলে চাষার কাজকে হোন কাজ মনে করে না; তাঁতি তাঁতির কাজকে ঘৃণা করে না—বস্ত্রত সৌরবেরই বিবরণ ও স্নানার বিবরণই মনে করে। সেই কাজ না করিলেই তাহার ‘জাতি’ বার—তাহার ‘বর্ধ’ পালিত হয় না। একজন ব্রাহ্মণ তাহার ‘বর্ধ’—তাঁহার ‘জাতি-ব্যবসারে’ ঘেরুপ সৌরব বোধ করেন, একজন চাষা তাহার ‘বর্ধ’—তাহার ‘জাতি-ব্যবসারে’ তাহার অপেক্ষা কম সৌরব বোধ করে, তাহা মনে হয় না। যে ব্যক্তির ধারণা আছে, আমি রাজমন্ত্রি পাইবার

অধিকারী, তবে বৈবরণতা বা অন্যের বড় বস্ত্রের ফলে আমাকে কারখানায় মজুরি করিতে হইতেছে, তাহার বর্ধপালনে—মজুরি-কর্ণে—অভ্যুত্তর হইতেই পারে না।

এই ভাবটিকে আমি অতি উন্নত ভাবে মনে করি। যেদিন ত্রিগুণত বিপিনচন্দ্র পাল মহাশয় বলিয়াছিলেন, বিশ্বরূপদর্শনের পূর্বে মহাব্য নিকামধর্ম পালনে সমর্থ হয় না। ঠিক কথা। বিশ্বরূপদর্শন সকলের সাধ্য নহে; সে রূপমোভাগ্যসালীর সংখ্যা অল্পসি-মেধ। কিন্তু নিকাম ধর্মের আদর্শ সমুখে রাখিয়া তাহার নিকট পৌছিতে পারে; এবং এতদেশের কৃষক ও শ্রমজীবী এই নিকামধর্মের আদর্শের প্রতি দৃষ্টি অগ্রসর হইতে পারিয়াছে, ততটা আর কোন দেশে হইয়াছে, বোধ হয় না।

বস্ত্রতই আমাদের দেশে প্রত্যেক শ্রম-জীবীর জীবনে এটো মহান আদর্শ প্রতি-বিধিত দেখি। যখন দেখিতে পাই, জায়ের পর বর্ষা, বর্ষার পর শীত হইতেছে, প্রকৃতির বাবতীর অত্যাচার অকুণ্ঠিতভাবে সহ করিয়া দরিদ্র কৃষক বৎসরের পর বৎসর তাহার ক্ষেতের টুকরাটিতে পরিভ্রম করি-তেছে—কোনবার ফল পায়, কোনবার পায় না, কোনদিন উন্নত পূর্ণ হয়, কোন-দিন হয় না—কোনরূপ রামদয়বাহুর বসি-বার উক্ত আকাঙ্ক্ষা উৎসাহে উত্তেজিত করিতেছে না, স্নানটোন হইবার সে কখনও স্বপ্ন দেখে না, তাহার অবসান দূর করিবার জন্ত ও উত্তেজনাবিধানের জন্ত চা নাই, মহ নাই, খবরের কাগজ নাই, রাজনীতিবিষয়ক, ধর্মনীতিবিষয়ক, বৈজ্ঞানিক, সামাজিক,

কোন বকু তার ব্যবস্থা নাই—অথচ সে খাটে, কিছু অবগর হয় না—সে খাটে, কিছু নিজের জন্ত নহে, আপন বৃদ্ধ পিতামাতার জন্ত, পরীর জন্ত, পুত্রকন্টার জন্ত, হয় ত পিশোবাণী, তাইতসিনীর জন্ত চিরজীবন খাটে ও যখন বৃদ্ধা উপস্থিত হয়, তখন বিরান পায়—তখন আমার বোধ হয়, পৃথিবীতে নিকাম-বর্ষণালনের উদাহরণ যদি কোথাও থাকে, সে এখানে। এবং ভাববহ পরমর্ষ অবলম্বন অপেক্ষা এই বর্ষণে নিখনের কোন না-কোন স্থানে অধিক মূল্য আছে বলিয়া সংশয় নথ্যে। হইতে পারে, জীবনে তাহার বহুস্থলে পদাশ্রয় হইয়াছে, সে লোকের সহিত বিবাদ-বিসংবাদ করিয়াছে, পেটের

আগার কটুকথা ও মিছাকথা কহিয়াছে, রাগের মাথায় কাহারও শিটে লাগি বসাই-
রাছে, ভোমার-আখার ও সকলেরই মত সে
নানা ধৌর্মশ্যের পরিচয় দিয়াছে ; এবং
ইহাও নিশ্চয় যে, তাহার মৃত্যু হইলে সংবাদ-
পত্রে ঘোষণা হইবে না, কোন স্থানে শোক-
সভা বলিবে না, কোন স্থলে স্মৃতিস্তম্ভ
উঠিবে না, করেকবৎসর পরে তাহার নাম
পর্ধ্যন্ত ও পৃথিবী হইতে বিলুপ্ত হইবে ; কিন্তু
তথাপি তার আইজাক নিউটন বা মাইকেল
ফারাডে বা উইলিয়াম শেক্সপীয়ারের কৃত-
কর্মের অপেক্ষা তাহার জীবনে কৃতকর্মের
গৌরব কম, তাহা মনে করিতে আমি
সম্মতি হইতেছি।

শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী ।

ভগ্ননগরে প্রেমসম্মিলন ।

[Love among the ruins]

(রবর্ত ব্রাউনিংয়ের কবিতা হইতে)

যেথা মলম্বিতা সন্ধ্যা প্রান্তরূপে দীর্ঘারে মধুর—

ব্যাপি' বহুদূর

নিষ্কল কান্তার পরে,—গৃহস্থী যেথা মেঘপাল

অলস-নিদ্রাগ

রূপকণ্ঠ চলিয়াছে মল্যলোকে, ধানি' ক'ত চুটি,

দশ ধূতি' ধূতি'—

হোখার নগরী ছিল হর্ষবর, বিপুলবৈভব—

(জনি জনরব)

এ দেশের রাজধানী,—হোখার রাজেন্দ্র নরপাল,

গেল বহুকাল,

সমুদ্রল সত্য 'মিলি' বসিতেন মন্দির' বহুতর

সন্ধি ও সমর ।

আজি সর্কদেণমর তরুটিও অবশেষ নাহি—

ওই দেখ চাহি,

ঢালু শল্লভূমি বহু পরম্পরে মিলায় মিলায়,

এক হয়ে যায়

তধু হোখা ঠৈল হ'তে স্রোত, খারা বহি' ম'ঝে মাঝে

ভেদ রচিয়াছে ।

প্রাণাব হোখায় এক মহাকার গুণজগতীর

ছিল উচ্চশির—

উজ্জ্বল রহিত বার শতশত চূড়া অহুপম

বহুশিখাগম

শতবারবিরাজিত পূরবেষ্টী প্রাচীরের 'পর—

গঠন মর্ষর ।

প্রাচীরে দ্বাদশ সাদী ছুটে বেত পাশাপাশি এসে

সহজে, অক্লেশে ।

আজি হেথা হের এই শল্লভূমে বহুতরবৈভব

ধরনীহ্রদ ।

বেন ভ্রাম মথমলে পাতিয়াছে কোমল আভর,

আর, তা'রি 'পর

নগরীর অবশেষ হেথা-হোথা রয়েছে শয়ান—

তধু অহুমান ।—

হেথাই সে জনারণা বুঝি লক্ষ লেখ-চুখে লাগে

বহুবর্ষ আগে ।

ক'তু বা বিজয়ে প্রাণ মেতে যেত, ক'তু লক্ষ্যতম

ধমিত্ত জবাব !—

সে বিজয়, সৌকল্য—স্বপ্নমুখ্যে সবি একমত
বেচা-কেনা হ'ত ।

আজি বেথা দেবিডেহ সঙ্গহীন বক ক্ষয়কার
প্রান্তর-সীমার—

ওই যে শিকড়ে ঢাকা, বনের লতার অন্তরাল,
কণ্টকে করাল,—

হেথা-হোথা ভয়দেহে ভীর্ণজাল লতিকার কলি
চাছে মুখ তুলি'—

ওই এক তিস্তিশেষ—মহান্ জাগিত বার 'পর
প্রাসাদপিথর ।

চক্রপথে অঘিরেথা ঝলসাই বন্দবধ হবে
ছুটিত গৌরবে—

হোথা হতে রাঙ্গা, প্রির পরিজন, সখীরা, রাগিরা
হেরিতেম কীড়া ।

কিন্তু ওই আজি হবে মন্দরাগা সন্ধ্যা হেসে যায়
লইয়া বিদায়,—

গৃহে রাখি' মেঘশাল বগুড়গু গলবন্টারোলে,
শান্ত সুপ্রিকোলে,—

যত উজ্জ্বলি, যত লোভোরাগি বোহুলীর ছায়
গলে' মিলে যায়—

আজি আমি হোথা এক আত্মলাকী কুককেশী বালা
প্রতীক্ষা-উতলা—

সেই মক'পরে বেথা রথিগণ, তবীপণে চাহি'
ধাইত উৎসাহি'—

রাঙ্গা হেরিতেম,—আজি চাহি' আছে বালা, কথা নাই—
যতক্ষণে যাই ।

রাখা দেখিতেন চেরে নগরী সে, দূর চারিদিক,
বৈরাগ্য ও বিজ্ঞান,
পৈলে-পৈলে দেবগৃহ, স্থানে-স্থানে অরণ্য বিহারি'
শুভ শারিলাদি,
কত সেই অলপখ, হুলপখ, সেজুবন্ধ আর
অনন্তা-প্রসার ।—

আমি হবে উত্তরিব, বাঁকাইবে বালা বাক্য ভুলি',
ছুটি হাত ভুলি'
যোর স্বক-ছটি-'গরে, দুখ যোর প্রেমদৃষ্টি দিখা
ল'বে আলিঙ্গিয়া—
সহসা মিশিব ঘোঁষে নিতাইয়া দরশে বচনে—
ঘন আলিঙ্গনে !

কবে তারা একদিন লক্ষ্যৈস্ত পাঠাল সংগ্রামে,
দক্ষিণে ও বায়ে,—
সমুচ্চ শিতলস্তম্ভে দেবমন্ডপ হঠিল মহান্
গগনসম্মান,—
সে ঐশ্বর্য্য সে প্রতাপ, কোথা তার ছদমলমল ?
তুধু ধনবল ।

হারি হারি ! রক্ত তবে, আগে মনে অলস্ত দিকার—
এই শু সংসার !
এই তুধু, শতাক্ষীর গুণ্ণগোল-শাপ-বিনিময়ে !
থাক্, থাক্ বয়ে—
রেখে যাও তাহাদের বিকরের সৌরভের তার !
প্রেম সর্বসার !

. প্রী :—

গৌড়ীয় হিন্দুসাম্রাজ্য ।

উপক্রমণিকা ।

আধুনিক মালদহ জেলার প্রধান নগর
কলসাবশেষ । ইংলিশ-বাজারের অনতিদূরে,
মহানন্দা-নদীর উত্তর তীরে,
এখনও অনেকদূর পর্যন্ত পুরাতন গৌড়জন-
পদের ধ্বংসাবশেষ দেখিতে পাওয়া যায় ।
মহানন্দার বামতীরে পুরাতন মালদহ ও
পাণ্ডুয়া নামক স্থানে দুইটি প্রাচীন নগরের
স্থান নির্দিষ্ট হইয়া থাকে, এবং দক্ষিণতীরে
ইতিহাসবিখ্যাত গৌড়ীয় রাজধানীর অব-
স্থানের কথা শুনিতে পাওয়া যায় । এই
রাজধানীকে উত্তর দক্ষিণ দুই ভাগে বিভক্ত
করিয়া লইলে, দুক্তির পক্ষে সুবিধা হইতে
পারে । এখন উত্তর ভাগই রাজমহলের
কোড়বাহিনী ভাগীণী হইতে দূরে অবস্থিত
হইয়া পড়িয়াছে । ১ মহানন্দার উত্তরতীরেই
কোড়বাহিনীপক্ষ পলসাবশেষ বর্তমান ;—
সে সমস্তই গৌড়-জনপদের পলসাবশেষ ।
কিন্তু স্থানীয় লোক দক্ষিণতীরকে গৌড় ও
বামতীরকে পাণ্ডুয়া নামে অভিহিত করিয়া,
অন্য পুরাকীর্তিকে বিধা বিস্তৃত করিয়া
জুড়িয়াছে । কলসাবশেষ এখনও প্রত্যক-
প্রোচর ; কিন্তু গৌড়-রাজধানীর সম্রাটের
বিস্মৃতি-পর্বে লীন হইয়া গিয়াছে । ১ এখন
আর তাহার তথ্যবিবরণের চেষ্টা সম্পূর্ণ
সফল হইবার সম্ভাবনা নাই !

গৌড়-শব্দ সংস্কৃত-মূলক । তত্খন কোন
কোন ইউরোপীয় পণ্ডিত ইহাকে “গুড”-

শব্দ হইতে প্রসূত মনে করিয়া গৌড়কে
গৌড়োৎপত্তি । “ইন্ডোপন” বলিয়া ব্যাখ্যা
করিয়া থাকেন । এই
ব্যাখ্যা ব্যাকরণ-মত হইলেও, সংস্কৃত-
সাহিত্যে অপরিচিত । গৌড় কোন নগর-
বিশেষের নাম থাকার কথা প্রাচীন সাহিত্যে
দেখিতে পাওয়া যায় না । পর্তু প্রদেশ
গৌড়-নামে পরিচিত থাকার কথা ব্রহ্ম-
পুরাণে দেখিতে পাওয়া যায় । বলা :—

“সাহস্রতঃ সাক্ষরং গৌড়দেশিকোৎকলঃ ।

পক গৌড় ইতি যাতা বিজ্ঞাতঃ সর্ববাসিনঃ ।”

বিজ্ঞাতঃ উত্তরাবস্থিত এই পক গ্রন্থেই
তুল্যরূপে ইন্ডো-উৎপাদনের উপযোগী নহে ।
সুতরাং ইঙ্গুর সহিত গৌড়ের কোন বিশিষ্ট
সংগ্রহ থাকি নিতান্তই আনুমানিক কথা ।
কে কবে এই গৌড়রাজ্য ও গৌড়নগর বহ-
মেনে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন, এতকাল
পরে তাহার রহস্যভেদ করা অসম্ভব । গৌড়-
কীর্ত্তির স্থানীয় অঙ্গুদস্তাননিপুণ লেখকবর্গের
শেষ ব্যক্তি ঠৈয়ব এলাহিবক্স-অল হুসেনি-
আকবেরজাবাদী ১৮২২ খৃষ্টাব্দে পরলোকগমন
করা, তাহার স্থাপিত পায়ত্ততাবানিবন্ধ
“মুহসিব খাঁদা”নামক সুবিভূত হস্তলিখিত
ইতিহাস এক্ষণে মঃমদহের উকিল শ্রীমুক্ত
মৌলবী আবদুল আনিজ শহরে রক্ষা
করিতেছেন । তাহাতে কিংবদন্তীমূলক
গৌড়োৎপত্তির কাহিনী লিপিত আছে ।

তাহাকে আখ্যায়িকা অপেক্ষা অধিক প্রামাণিক বলিয়া গ্রহণ করা যায় না। তাহাতে দেখা যায়,—বৃষ্টাবিষ্ঠাবের ৩৯৫ বৎসর পূর্বে কোচবিহারের সিংহলদীপনামক নরপতি বহু-বিহার পরাম্বর করিয়া গৌড়নগর প্রতিষ্ঠিত করেন।

দৌড়োৎপত্তির কথা এইরূপ নানা অবিখ্যাস উপকথার সহিত অবিচ্ছিন্নভাবে মিশ্রিত হইয়া পড়িলেও, গৌড় নানাসময়ে নানা-গৌড়-নাগবলী নামে অভিহিত হইবার গৌড়-নাগবলী নামে অভিহিত হইবার বিখ্যাসযোগ্য প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। বৌদ্ধ ও হিন্দু নরপালবর্গের শাসনসময়ে “গৌড়”নামই প্রচলিত ছিল। লক্ষ্যনেন দেব তাহাকে বহুমৌখবিত্ত্বিত করিয়া “লক্ষ্যনাবতী” নাম প্রদান করিবার কথা শুনিতে পাওয়া যায়। গৌড় এই নামই মুসলমানদিগের নিকট বহুকাল পরিচিত ছিল। বাবরের পুত্র হুমায়ূঁ-বাদশাহ বহুদেশে উপনীত হইয়া ইহাকে “লক্ষ্যনাবাদ” নাম প্রদান করেন। সে নাম অধিকদিন জনসাধারণের নিকট পরিচিত হইবার অবসর লাভ করিল না। খৃষ্টীয় ১৫৭৫ অব্দে আকবার-বাদশাহের শাসনসময়ে, খান খানান্ মনাইম খানের নবাবী আমলে, এক আকস্মিক মহামারীতে এই ইতিহাস-বিত্ত্বিত মহানগর একেবারে বিলীনবনে পরিণত হইয়া গেল! তাহাই উত্তরকালে গৌড়ের ধ্বংসাবশেষ নামে পরিচিত হইয়া রহিয়াছে।

গৌড় বহুপুরাতন হইলেও, পৌণ্ড্রবর্ধন তাহা অপেক্ষাও পুরাতন বলিয়া বোধ হয়। বর্তমান পাণ্ডুয়ার পুরাতন নামই দে পৌণ্ড্র-

পৌণ্ড্রবর্ধন। বর্ধন ছিল, তাহা এক্ষণে হ্রী-কৃত হইয়াছে। পৌণ্ড্রবর্ধননামে একটি “ভুক্তি” ও একটি প্রধাননগর থাকার পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। এই প্রধাননগর ও ভুক্তি গৌড়ীয় সাম্রাজ্যের অন্তর্গত থাকিয়া একদা বাঙ্গলাদেশের অধিকাংশ জনপদেই অধিকার বিস্তার করিয়াছিল। পৌণ্ড্রবর্ধন-নামের সঙ্গে “পুণ্ড্র” বা “পুণ্ড্রক” দিগের কিছু সংলগ্ন থাকা সম্ভব। তাহার কারণ, বুদ্ধিমান, কৃষিকোশলসম্পন্ন এবং জাতি বলিয়া পরিচিত ছিল; অত্যাধি তাহাদের বংশধর-গণ মাদ্রাসের প্রত্যেক জনসাংখ্যানিরসময়ে বহুদূর বলিয়া উল্লিখিত হইতেছে। ইহার যে প্রাচীন জাতি, তাহাতে সন্দেহ নাই। মহাভারতেও ইহাদের উল্লেখ আছে। মথুরাতে পুণ্ড্রক, ৬৩৩ খ্রিষ্টাব্দে অত্যাধি জাতি ছিল, ভ্রষ্টাচারবোধে পতিত ও ভ্রাতা হইয়া চতুর্ধর্ষের অধম হইয়া পড়িয়াছিল। ইহাদের মধ্যে পুণ্ড্রকেরা পৌণ্ড্রবর্ধনের অধিপতি হইয়াছিল; একদা সমগ্র উত্তরবঙ্গ তাহাদের করতলগত ছিল। অধ্যাপক উইলসন্ বলেন,—নদীয়া, বীরভূমি, বর্ধমান, মেদিনীপুর, অনলমহাল, রাইগড়, পঞ্চকোট, পাঁশাঝো এবং চুনারের কিয়ৎংশ পর্য্যন্তও কখন-কখন পৌণ্ড্রবর্ধনের অধিকারভুক্ত হইয়াছিল। পুরাকালে কামরূপ ও পৌণ্ড্রবর্ধন ভারত-বর্ষের দুইটি প্রধান প্রাচ্য প্রদেশ বলিয়া সমধিক খ্যাতিলাভ করিয়াছিল। তখন করতোয়ার খরস্রোত এই উত্তর প্রদেশের নৈসর্গিক-রাষ্ট্রাঙ্গীভাৱে প্রবলবেগে প্রবাহিত হইত। পশ্চিমে মহানন্দাও পৌণ্ড্রবর্ধন ও মিথিলার রাজ্যসীমাক্রমে পরিণত

ছিল। তখন মিথিলা ভীরভূক্তির অন্তর্গত বলিয়া পরিচিত ছিল। “ভীরভুক্তি” এখন “জিহত” নাম ধারণ করিয়াছে। সৌড় ভীরভুক্তির অন্তর্গত এবং পাণ্ডুরা-পৌণ্ড-বর্দ্ধনভুক্তির অন্তর্গত থাকা সম্ভব। এই উভয় ভুক্তিই পুরাকালে সংস্কৃতবিদ্যালোচনার জন্য সুবিশেষ খ্যাতিলাভ করিয়াছিল।

পৌণ্ডবর্দ্ধনের খ্যাতির কথা অবগত হইয়া, হিরণ্যপদ তাহার ৩২২ হইতে ৩৪৫ খৃষ্টাব্দাব্দী সুদীর্ঘ তীর্থভ্রমণকালে পৌণ্ড-বর্দ্ধনেও উপনীত হিরণ্যপদের তীর্থভ্রমণ।

হইয়াছিলেন। তাহার “পুন্-ক-তম” বে পৌণ্ডবর্দ্ধনেরই চৈনিক নাম, তাহা এখন সকলেই একবাক্যে স্বীকার করিয়া লইয়াছেন। এ পর্য্যন্ত যে সকল বিদেশীয় লিখিত গ্রন্থাণের সন্ধান আশ হওয়া গিয়াছে, তন্মধ্যে পৌণ্ডবর্দ্ধনসম্বন্ধে হিরণ্যপদের গ্রন্থই সর্বাধিক পুরাতন। এই সময়ে সৌড়ের বিশেষ খ্যাতি ছিল বলিয়া বোধ হয় না। কাবুণ, হিরণ্য সৌড় অতিক্রম করিয়াই পৌণ্ডবর্দ্ধনে উপনীত হইয়াছিলেন; অথচ তাহার “দি-ই-উ-তি” নামক বিখ্যাত ভ্রমণকাহিনীর কোমও স্থানেই সৌড়ের নাম যেখানে পাওয়া যায় না। তাহাতে ৪০০০-লি-পরিমিত একটি রাজ্য ও ৩০-লি-পরিমিত রাজধানী পৌণ্ডবর্দ্ধননামে উল্লিখিত রহিয়াছে। এই রাজ্যের ভূমি উর্বরা, জনসংখ্যা বিপুল ও সমৃদ্ধি বেষ্ট ছিল; বহুসংখ্যক হিন্দু ও বৌদ্ধ মন্দির ও একটি অশোকস্তম্ভও পরিচালিত হইয়াছিল। এই রাজ্যের লোকে শিক্ষার সমাধার করিত। রাজধানীর ঔর ২০-লি পশ্চিমে একটি

সংসারায় ও তাহার অদূরেই অশোকস্তম্ভ এবং একটি বিহার বর্তমান ছিল। এই স্থানে হইতে পূর্বদিকে ২০০-লি গমন করিয়া একটি প্রবল নদী উত্তীর্ণ হইয়া, হিরণ্য কানরূপ-রাজ্যে উপনীত হইয়াছিলেন। এই বর্ণনাম্বারে বোধ হয় তৎকালে পৌণ্ডবর্দ্ধন-রাজ্য নদীবেষ্টিত প্রাকৃতিক সীমা অভিক্রম করে নাই। কারণ, ইহার দক্ষিণে ৩০০০-লি-পরিমিত সমুদ্রোপস্থল পর্য্যন্ত বিস্তৃত জনপদ “লমতট” নামক একটি স্বতন্ত্র রাজ্য ও রাজধানী বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে।

হিরণ্যপদ বাহ্যকে পৌণ্ডবর্দ্ধনের রাজধানী বলিয়া বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন, তাহার স্থাননির্ণয়কালে কেহ কেহ যৎ-যত্ননির্ণয়। পুরের অন্তর্গত বর্দ্ধনকোট এবং হাননির্ণয়। কেহ কেহ বস্তুর অন্তর্গত মহাহানের প্রতি অনুশিনির্দেশ করিয়াছেন। অনেকে আবার মালদহের অন্তর্গত পাণ্ডুরা-কেই পুরাতন পৌণ্ডবর্দ্ধন বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। পাণ্ডুরা এবং মহাহানের তথ্য-বশে দেখিয়া আসিয়াছি; স্মরণ্য মহাহান বা বর্দ্ধনকোট যে হিরণ্যবর্ণিত রাজধানী নহে, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। এই দুই স্থানের মধ্যে একটিও নদী হইতে ২০০-লি পশ্চিমে নহে; উভয় স্থানই করতোয়া-তীরে অবস্থিত। স্মরণ্য হিরণ্যপদ বর্দ্ধনকোট বা মহাহানের উল্লেখ করিয়াছেন বলিয়া বোধ হয় না। করতোয়া হইতে ২০০-লি পশ্চিমে আসিলে পাণ্ডুরার নিকটেই উপনীত হইতে হয়। কিন্তু পাণ্ডুরার বা তদ্রিকটবর্তী স্থানে এখন আর কোন বৌদ্ধকাণ্ডের পংস-বশে দেখিতে পাওয়া যায় না। পৌণ্ডবর্দ্ধন-

কুটির অন্তর্গত বর্তমান রাজশাহী, দিনাজপুর ও ষণ্ডড়া জেলার নানা স্থানে নানা বৌদ্ধকীর্তির ধ্বংসাবশেষ দেখিতে পাওয়া যায়। পাণ্ডুরায় ভাগ্যবিপর্যয়ের কথা ব্ররণ করিলে, তথায় কেবল পাঠানকীর্তি ভিন্ন আর কিছু দেখিতে পাওয়া যায় না কেন, তাহার নীচাংশে করা সহজ হইয়া পড়ে। পাঠানগণ তাঁহাদের

ভোগবিলাস বা ঐশ্বর্যলালসা চরিতার্থ করিবার জন্য নানানুতনপ্রসাদ-নির্মাণকালে পুরাতন অট্টালিকা ভূমিভাং করিতে কিছুমাত্র ইতস্তত করেন নাই। তথাপি বিশেষ লক্ষ্য করিয়া দেখিলে এখনও পাণ্ডুরায় ধ্বংসাবশিষ্ট পাঠান সম্মুখে মুসলমানগমনের পূর্ববর্তী প্রস্তরাদির পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়।

শ্রীঅক্ষয়কুমার মৈত্রেয় ।

কোন সুন্দরীর প্রতি ।

(Victor Hugo হইতে)

রমণীর করিতেই রমণী এ ভবে ;
—সুন্দর করিয়া তোলে তারাই তো সুবে ।
প্রকাণ্ড রহস্য-এক এ বিশ্ব-ভুবন,
—স্ববিশদ ভাষা—তার নারীর চুবন ।

প্রেমেরি হৈ কটিবন্ধ আকাশ-পাথার
সমস্ত প্রকৃতি তার দিবা অলঙ্কার ।
আম্বারে সে ঘের নিজ সৌরভ অহুল ।
নারী না গড়িলে বিধি গড়িত না হুল !

নীলকান্ত ! কোথা ভব থাকিত ক্ষুরণ
—যদি না থাকিত সেই মধুর নয়ন ।
সুন্দরী-বিহনে বল হীরা বা কোথায় ?
—সে শুধু সামান্য অস্ত্র উপদের প্রায় ।

শ্যামল-নিকুঞ্জ-মাগে স্নান-বিহনে ।
 থাকে গোলোপের কণি নিভৃত বিহনে ;
 —ঘুমার পুলিরা তার রাঙা ঠেঁটিখানি ।
 এষ টিও মুখে তার নাহি সরে বাগি ।

বাঁহা কিছু মোহময় স্বয়ম্বর হেখা,
 রমণী হইতে তাহা লভে উজ্জলতা,
 হে গরবি, মুক্তারাজি তোমা বিনা ছায় !
 মোর প্রেম তোমা ছাড়ি পল্লব বিকার !

ত্রিভোজ্যতিবিস্ত্রনাথ ঠাকুর ।

গ্রন্থ-সমালোচনা ।

মহারাজ নন্দকুমার অথবা শতবর্ষ
 পূর্বের বঙ্গের সামাজিক অবস্থা । ঐতি-
 হাসিক উপক্ৰাস । ত্রিভোজ্য সেন প্রণীত ।
 তৃতীয় সংস্করণ । মূল্য ২, দুই টাকা ।

অনেক বাহুল্য উপক্ৰাসের মলাটের
 উপর 'ঐতিহাসিক উপক্ৰাস' লেখা থাকে,
 কিন্তু প্রকৃতপক্ষে বাঙালীর ঐতিহাসিক
 উপক্ৰাস অতি কমই আছে! সেই অন্তের
 মধ্যে সমালোচ্য গ্রন্থের বিশেষ করিয়া উল্লেখ
 করা যায় । শতাব্দিক বঙ্গের পূর্বের বঙ্গদেশের
 অবস্থা বাঁহা গাড়াইয়াছি, তাহার বে চিত্র
 চিত্রাচারবাবু চিত্রিত করিয়াছেন, তাহা যে
 বর্ণনায়, স্তম্ভরূপে উপাদেয়, হইয়াছে, এ কথা
 আমরা বলিতে পারি । তখনকার ইংরেজ
 কুটিয়ালদিগের অত্যাচারের বিবরণ পড়িয়া

হানে হানে আমরা চক্ষের জল সংবরণ
 করিতে পারি নাই । ইহার অপেক্ষা অধিক
 প্রশংসা আর কি করিব ? রচনার বিশেষত্ব
 না থাকিলেও তাহা সরল, প্রাঞ্জল ও ছন্দ-
 গ্রাহী । এই পুস্তকের যখন তৃতীয় সংস্করণ
 হইয়াছে, তখন যে ইহা সাধারণ্যে আদৃত
 হইয়াছে, এ কথা বলাই বাহুল্য । এরূপ
 আদর পাইবার ইহা যোগ্যও বটে ।

সচিত্র কোমল পাঠ । প্রথম
 ভাগ । অসংস্কৃত বর্ণ । তৃতীয় সংস্করণ ।
 মূল্য ১/০ এক আনা ।

শিওদিগের বর্ণমালা ও নিত্যক সঙ্খ
 ব্যাক্য শিক্ষার বেশ উপযোগী । বিভাগসমূহ
 চলিলে দশ হয় না, বরং তালই হয়—অন্তত
 চলিবার উপযুক্ত বটে ।

ত্রিচন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায় ।